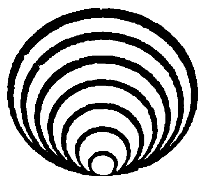
গুরুতত্ত্ব
গুরুবাদ
গুরুবাণী

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সংগ্রহণ ও পরিবেষণ
শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী



সচ্চিদানন্দ সোসাইটি, কলকাতা

প্রকাশক
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

প্রথম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী ১৪১০

প্রচ্ছদ
সাইবারওয়ার্কস
৩০ নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন
কলকাতা ৭০০০২৬

প্রাপ্তিস্থান
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
এ-১৯০ মেট্রোপলিটন সমবায় আবাসন
কলকাতা ৭০০১০৫

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

আত্মতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত
সর্বজ্ঞানে গুরুজ্ঞান গুরুজ্ঞানে সর্বজ্ঞান।
অজ্ঞান জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) বিজ্ঞান প্রজ্ঞান
গুরুই স্বয়ং সর্বাধিষ্ঠান সর্বসমাধান।।

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রকাশকের কথা

গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ গুরুবাণী-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে রাসপূর্ণিমা ১৪০৪-এ। পাঠকদের চাহিদা সত্ত্বেও তার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে নানা কারণে বিলম্ব হল। তার জন্য আমরা দুঃখিত। প্রথম খণ্ডে ১৯৬৮ সনের মে মাস থেকে আরম্ভ করে ১৯৭২ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ হতে গুরুতত্ত্বের প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাতে কালানুক্রম রক্ষা করে বিষয়বস্তুকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৩ এর জুন থেকে ১৯৯৯ এর জুলাই পর্যন্ত তাঁর প্রদত্ত ভাষণের কালানুক্রম রক্ষা করে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বানুভবলব্ধ জ্ঞানের প্রজ্ঞান জ্যোতি পাঠকদের অন্তরের মোহ অজ্ঞান আবরণের অন্ধকার দূর করে গুরুবাদ সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অভিহিত হতে সাহায্য করবে।

গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বানুভবসিদ্ধ জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে, নানা ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে গুরুতত্ত্বের বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ গুরুবাদের মাধ্যমে এক অভিনব ভঙ্গিমায় নির্বেদ সমতা ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি সহকারে ব্যক্ত হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অনবদ্য অননুকরণীয় স্বকীয়তার বিশেষ পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেন—"গুরুবাদ মূলত গুরুতত্ত্বের প্রকাশ ও ব্যবহার মাধ্যম। তত্ত্বস্বরূপে তা নৈর্ব্যক্তিক নির্গুণ নির্বিশেষ। গুরুবাদ হল তার স্বভাব। সুতরাং পরাশক্তি সহযোগে হয় তার অভিব্যক্তি। গুরুতত্ত্বের স্বরূপ প্রজ্ঞানঘন—সচ্চিদানন্দঘন; গুরুবাদের স্বরূপ হল বিজ্ঞানঘন—সচ্চিদানন্দ শক্তির সম্যক্ প্রকাশবিকাশ। তত্ত্বস্বরূপে যা স্বয়ংপ্রকাশ, বিজ্ঞানস্বরূপে তা স্বভাব ও সগুণ যোগে সত্তার অভিনব মহিমাকে সুসংযত ভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রকাশ করে। তা জীবনে অনুভবসিদ্ধির সর্বোত্তম সহায়ক হয়। এক কথায়, গুরুবাদ হল স্ববোধ-আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বিজ্ঞানময় অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন স্বভাব রূপ। জীবনের চরম উৎকর্ষ লাভের পথে অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা (অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠা), মুক্তি ও শান্তি লাভের পথে একান্ত ভাবে অপরিহার্য। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মই হল দ্বৈত এবং বহুমুখী ভাবের সঙ্গে যুক্ত। তার ফলে জীবনের ব্যবহার সর্বতোভাবে প্রাকৃত বিদ্যার প্রভাবে বস্তুতান্ত্রিক হয়। তা-ই হল আত্মবিস্মৃতির মূল কারণ। আত্মবিস্মৃতির ফলে অনাত্মার সঙ্গে হয় জীবের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির তা-ই হল মূল কারণ। গুরুবাদের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বা তার অনুশীলন দ্বারা জীবের আত্মবিস্মরণের কারণ দ্বৈতবোধ তথা অবিদ্যা-অজ্ঞান বিদূরিত হয়। তখন আবার সে তার নিত্য অদ্বয় ব্রহ্ম-আত্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

গুরুবাদের অনুশীলন করতে গেলে সাধককে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধেও অভিহিত হতে হয়। গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের বিজ্ঞানকে অনুশীলন করতে গুরুবাণী সম্যক্‌রূপে সাহায্য করে। গুরুবাদের মধ্যে তার প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও গুরুবাণীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও তার বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যাবে।

গুরু প্রসঙ্গের অমর এই গ্রন্থ অবশ্যই জিজ্ঞাসু পাঠকদের অন্তরের মল শোধন করে তাঁদের আত্মজ্ঞান লাভে এবং আপন অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সম্যক্ ভাবে সাহায্য করবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি ও তার মুদ্রণ কার্য তত্ত্বাবধানে অনেকেই সাহায্য করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অনুকম্পা তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।

জন্মাষ্টমী, ১৪১০ **সচ্চিদানন্দ সোসাইটি**

নিবেদন

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের বিভিন্ন দিনের ভাষণের অনুলিপি রচনা করতে গিয়ে যে বিরাট রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি তার মধ্য থেকে *গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ ও গুরুবাণী*-র প্রসঙ্গগুলি পৃথক ভাবে অদ্বয়তত্ত্বের এক বিশেষ রূপ বলে অনুভব করেছি। তার মধ্যে অতি অদ্ভুত সুন্দর ভাবে ব্রহ্ম-আত্মা প্রসঙ্গ এবং ঈশ্বর প্রসঙ্গ অভেদে মিশে আছে। নিত্য অদ্বৈত ভাববোধের জ্ঞানকে তিনি স্বানুভূতির ভাষায় এমন অভিনব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন যে তাতে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্বের কোনও পার্থক্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।

তিনি পরমতত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপসংহার করেছেন স্বানুভূতির জ্ঞানে। নিগূঢ় অদ্বয়তত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বকে সবার কাছে সুবোধ্য করে ব্যক্ত করার জন্য প্রথমে তিনি তত্ত্বস্বরূপের কথা ব্যক্ত করেছেন অতীব মনোরম ভাষায়। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল গুরুতত্ত্ব। এই গুরুতত্ত্বকে অবলম্বন করে তিনি ব্রহ্মাত্ম ঈশ্বর তত্ত্বকে ব্যক্ত করেছেন নানা ভঙ্গিমায় স্বতঃস্ফূর্ত গান ও কথার মাধ্যমে। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বরকম প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন গুরুবাদের তাৎপর্যকে অবলম্বন করে। আবার গুরুবাদের উপসংহার করেছেন গুরুতত্ত্বের সঙ্গে গুরুবাণীর নিত্য অভেদ সম্বন্ধ প্রকাশ করে। তার পরিচয়ও গান ও কথাব মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছেন। গুরুবাণীর মহিমাকে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সার বলে উল্লেখ করেছেন। গুরুতত্ত্বের তাৎপর্য যে ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের তাৎপর্য তাও স্বানুভূতির যুক্তিতে নানা ভঙ্গিমায়, নানা দিক থেকে ব্যক্ত করেছেন। আবার ব্রহ্মবাদও যে গুরুবাদ তাও তিনি সমবোধের বা একবোধের দৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন স্বানুভূতিব যুক্তিতে। পরিশেষে, ব্রহ্মবাণী বা আত্মবাণীই যে গুরুবাণী এবং গুরুবাণীই যে ব্রহ্ম আত্মবাণী ও সমগ্র শ্রুতিবিজ্ঞানের নির্যাস তাও তিনি স্বানুভূতিব মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বহু একম যুক্তি-বিশ্লেষণের দ্বারা অভিনব ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মৌলিকতা ও স্বকীয়তা গ্রন্থের পাতায পাতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে ছড়িয়ে আছে।

প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু সংকলন একান্ত ভাবে গুরুতত্ত্বকে অবলম্বন কবে হলেও তার মধ্যে গুরুবাদ ও গুরুবাণী নিহিত আছে। তার পরিচয় বিশদ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডগুলিতেও সন্নিবেশিত হয়েছে। গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ ও গুরুবাণী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের এক অভিনব মূর্ত রূপ। তা পরম অদ্বয়তত্ত্বের পূর্ণস্বরূপকে নির্দেশ করে। তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মার প্রজ্ঞানঘন বিজ্ঞানময় রূপ এবং বিজ্ঞানঘন প্রজ্ঞানময় রূপ আলোচ্য গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। গুরুতত্ত্বের বিজ্ঞানময় রূপ হল গুরুবাদ। গুরুবাদের বিজ্ঞানময় রূপ হল গুরুবাণী। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে এক-এ তিন ও তিন-এ এক—পরস্পব পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক।

গুরুতত্ত্বের তাৎপর্য গুরুবাদ ও গুরুবাণীর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। গুরুবাদের তাৎপর্য গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাণী সহযোগে ব্যক্ত হয়েছে এবং গুরুবাণীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদ-এর একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। *নিবেদন* (আমার কথা) লিখতে বসে আমার নিজের ব্যক্তিগত কোনও কথা যাতে না-এসে পড়ে সেই জন্য বক্তব্যের আদি-মধ্য-অন্তে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কথাই সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করেছি। তাতে আমার নিজের কোনও কথা নেই।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু রচনার কাজে আমাকে অনেকেই সাহায্য করেছে নানা ভাবে, নানা দিক দিয়ে। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কল্যাণ ও পারমার্থিক সিদ্ধির জন্য পরমেষ্ঠীগুরুর কাছে প্রার্থনা জানাই।

সর্বশেষে এই গ্রন্থের পাঠকবর্গের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যও আমি সর্বান্তকরণে প্রার্থনা জানাই।

পরাৎপরমগুরু ও ব্রহ্ম-আত্মা ঈশ্বরের কৃপা আশিস ও অনুগ্রহের যে ধারায় আমরা নিরন্তর সিঞ্চিত হচ্ছি—এই গ্রন্থপাঠের ফলে পাঠকবর্গ তা যে উত্তরোত্তর অনুভব করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গুরু ওঁ তৎসৎ

জন্মাষ্টমী, ১৪১০
৮/৩৭ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯

বিনীতা
বাণী চক্রবর্তী

শ্রীদক্ষিণামূর্তি গুরুর বন্দনা

সর্বতত্ত্বস্বরূপ সর্বজ্ঞ গুরু নিত্যাদ্বৈত অ-ভেদাভেদ বোধায়তন। তা হতে সব, তাতে সব, সবই তিনি, তিনিই সব। স্ববোধে-স্বভাবে, স্বভাবে-স্ববোধে যা প্রকাশ পায় এবং অনুভূত হয় সে সবই তাঁর পরিচয়। তিনি সর্ব প্রকাশবিকাশ ও সর্ব জ্ঞান-অনুভূতির সত্তা উপাদানই শুধু নন, তাঁর আদি-মধ্য-অন্তে যা-কিছু অনুভূত হয় তাও তাঁর পরিচয় এবং যা অনুভূত হয় না তাও তাঁর পরিচয়। অর্থাৎ ইতি-নেতি ভাব অর্থে যা-কিছু ব্যক্ত হয় সবই তিনি স্বয়ং। তাই বলা হয়, 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং'।

বেদান্তে যাঁকে ব্রহ্ম-আত্মরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে তিনিই হলেন সর্বতত্ত্বস্বরূপ, সর্বসত্যস্বরূপ, সবার আপন সত্তা-শক্তি, আপনদেবতা, আপনবোধ। এই আপনবোধকে বাদ দিয়ে কোনও বোধই অনুভূত হয় না। সর্ব-অনুভূতির মূলে হল স্ববোধ, আপনবোধ। আপনবোধ দিয়েই হয় আপনবোধের পরিচয়, অন্য বোধ দিয়ে তা সম্ভব নয়। অখণ্ড ভূমা আপনবোধই হল পরম তত্ত্বস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম। তিনি স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব পুরুষোত্তম ভগবান।' তিনিই জীবনদেবতা, সর্বভূতাত্মা পরমাত্মদেব। আপনবক্ষে আপন ভাববোধে আপনি আপনাকে অভিনব ভঙ্গিমায় নিরন্তর ব্যক্ত করে আপনি তা আপনবোধে বরণ করে নেন। এই হল তাঁর স্বাত্মলীলা স্বানুভববিজ্ঞান।

তদ্‌বক্ষে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও সত্তা-শক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব বলে তাঁর কোনও বিকল্প নেই। যে সত্যবোধে দ্বৈতের অস্তিত্ব নেই অথচ প্রতিভাত হয়, সেই সত্যবোধের ব্যবহার স্বভাবযোগে দ্বৈতবোধে হয় এবং স্ববোধযোগে অদ্বৈতবোধে হয়। স্বভাবের ব্যবহারকালে স্বভাবের ত্রিবিধ শক্তিধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ববোধের অভিব্যক্তি যখন হয় তখন অদ্বয় আপনবক্ষে দ্বৈতের ও বহুত্বের অভিনব লীলাবিলাস হয়। এই লীলাবিলাস হল স্বভাবের ভাববিন্যাসমাধুরী। মাধুরী বলার তাৎপর্য হল—ভাবের মূলে আছে বোধরসায়ন অর্থাৎ অবভাসক আপনবোধ, স্ববোধ, আত্মবোধ ও ব্রহ্মবোধ। তারই নামান্তর সদ্‌গুরুবোধ ও পরমেষ্ঠিগুরুবোধ। তাকেই স্বভাবযোগে ব্যবহারকালে আত্মগুরু, ব্রহ্মগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু ও সদ্‌গুরু আবার পরমযোগে পরমাত্মগুরু, পরমব্রহ্মগুরুরূপে অনুভূত হয়।

গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে পূর্বে (১ম খণ্ডে) যা বলা হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুবাদের প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অভিব্যক্ত হচ্ছে। সদ্‌গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে পূর্বে যে সকল অনুভূতির গুরুত্ব ও মহিমাকে প্রকাশ করা হয়েছে, গুরুবাদের মধ্যে তার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা বিশদ ভাবে পাওয়া যাবে। গুরুর দক্ষিণামূর্তির যথার্থ বর্ণনার প্রারম্ভে তাঁর সত্যস্বরূপের ভূমিকাকে সামনে রেখেই তাঁকে বন্দনা করা বিধেয়।

সত্তাবোধের বা আপনবোধের পরিচয়টি হয় হৃদয়বোধের গভীরে স্বভাবের মূল ভূমিতে সমাধির গভীরে। যখন স্বভাবযোগে স্ববোধের বিলাস হয় তখন স্বভাবের বহু মানের, বহু স্তরের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ বোধস্বরূপ ভাবের স্তরে নেমে আসেন; ভাবের স্তর থেকে নামের স্তরে, নামের স্তর থেকে রূপের স্তরে ক্রমপর্যায়ে নেমে এসে নানা ভঙ্গিমায় লীলায়িত হন। তাঁর এই লীলাবিলাসের ক্রম ধরে ভাবের যেমন অনন্ত অনন্ত বিস্তার হয়, তেমন নামের এবং রূপেরও অনন্ত অনন্ত বিস্তার হয়। এই সব প্রকাশধারায় পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ-বিয়োগ, মিলন-দ্বন্দ্ব ও বিরোধ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে প্রকাশের মানের ক্রম ধরে।

পরস্পর প্রকাশেব মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হয় প্রকাশের মানের তারতম্য অনুসারে এবং অন্তরে ভাববোধের সমন্বয়যোগে। তার ফলে বোধের প্রকাশধারার মধ্যে কেন্দ্রসত্তার দিক থেকে অভিব্যক্তির ক্রমধারা সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্ম-স্থূলরূপে; তুরীয়-সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রৎরূপে; বোধ-ভাব-নাম-রূপে; প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-জ্ঞান (জ্ঞানাভাস)-অজ্ঞানরূপে; প্রজ্ঞাবোধি-মনবুদ্ধি-প্রাণইন্দ্রিয়-দেহরূপে; তুরীয়-কেন্দ্র-অন্তর-বাহিররূপে; প্রেম-আনন্দ-জ্ঞান-শক্তিরূপে; ভক্তি-জ্ঞান-যোগ-আনন্দরূপে—এরূপ অনন্ত অনন্ত ভাবচতুষ্টয়রূপে তাঁর অনুভূতি খেলে (প্রকাশ পায়)।

গুরুর দক্ষিণামূর্তি স্তবে এ সব ভাববোধের এক অভিনব স্বানুভববিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তরে ভাববোধের প্রকাশবিকাশ যে-ভাবে সাধিত হয় তার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সংযোগ ও বিয়োগ যে-ভাবে হয় তা সব সময় এক ভাবে হয় না, নানা ভাবে হয়। যেমন—(১) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্যে স্ববোধের অভিব্যক্তির বিজ্ঞানের সঙ্গে উপরোক্ত প্রকাশ চতুষ্টয়ের এক অভিন্ন রতিসম্বন্ধযোগ প্রচ্ছন্ন ভাবে সক্রিয় আছে। বহির্দৃষ্টিতে চৈতন্যের স্থূল ব্যবহার হয় জীবের জাগ্রৎ অবস্থায়, তার সূক্ষ্ম ব্যবহার হয় স্বপ্নাবস্থায়, তার সূক্ষ্মতর ব্যবহার হয় সুষুপ্তি অবস্থায় এবং তার সূক্ষ্মতম রূপটি হল বোধের তুরীয় অবস্থা। এই তুরীয় অবস্থা হল ভাবাতীত গুণাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত কেবল বিশুদ্ধ বোধে বোধে বোধময় সত্তা। সমাধির গভীরে হয় তাঁর সাক্ষাৎ।

বাইরে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্থূল বোধের পরিচয় মেলে, অন্তরে মন-বুদ্ধির মাধ্যমে সূক্ষ্ম বোধের অনুভূতি মেলে, কেন্দ্রে শুদ্ধ চিত্তে সূক্ষ্মতর বা কারণ বোধের অনুভূতি মেলে আর তুরীয়তে ইন্দ্রিয়াতীত, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাত্মবোধের অনুভূতি স্বানুভূতিরূপে প্রকাশ পায়। স্বানুভূতির স্তরে অপর তিন স্তবের বোধের সম্পূর্ণ সমাধান বা প্রজ্ঞানুভূতি হয়। কিন্তু অপর তিন স্তরের মধ্যে যে কোনও একটি স্তরে অন্য দুই স্তরের বোধের অভাব থাকে। যেমন জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুভূতির অভাব থাকে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি স্তরের অনুভূতির অভাব থাকে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন স্তরের অনুভূতির অভাব থাকে। কেবলমাত্র অনুমান বা কল্পনার দ্বারা কোনও স্তর থেকে অন্য কোনও স্তরের বোধের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

এবার দেখা যাক গুরুর দক্ষিণামূর্তির পরিচয় কী ভাবে সুসিদ্ধ হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম-আত্মবোধ সর্ববোধের অধিষ্ঠান ও সাক্ষী। তা হৃদয়েতে কূটস্থচৈতন্য, তুরীয়তে স্ববোধনিরঞ্জন। নিদ্রাকালে স্বপ্নের স্তরে স্বপ্নের প্রভাবে যেরূপ অন্তরের বস্তুকে বহির্ভাগে স্থিত বলে মনে হয় সেরূপ মায়ার দ্বারা বিশ্ব বহির্ভাগে বিবেচিত হলেও যিনি তাকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যমান নগরের ন্যায় আপনার মধ্যে অবস্থিত বলে দর্শন করেন এবং প্রবোধকালে অর্থাৎ সমাধির গভীরে আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করেন, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ১॥

যে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে বীজমধ্যস্থ অঙ্কুরের ন্যায় অবিকৃত থাকে অথচ পুনরায় মায়ার দ্বারা কল্পিত দেশ ও কালের অপূর্ব প্রভাবের দ্বারা বিচিত্র হয়, সেই জাগ্রৎকে, যিনি মায়াবীর ন্যায় এবং মহাযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছায় বাইরে বিস্তার করেন, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। ২॥

যাঁর বহিঃপ্রকাশ সত্যবস্তুকে অবলম্বন করে হয় অথচ তাঁর প্রকাশ্য বস্তু মিথ্যা বিষয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়, যিনি আশ্রিতগণকে "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান দান করেন, যাঁর সাক্ষাৎকারের ফলে সংসারসাগরে পুনরাগমন হয় না, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৩॥

তথাপি বহু ছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে স্থাপিত উজ্জ্বল দীপের আলো যদ্রূপ স্ফুরিত হয় তদ্রূপ যাঁর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পথে 'আমি জানছি' ইত্যাদি প্রকারে বহির্দেশে প্রকাশ পায়, তিনি প্রকাশমান বলেই তৎপশ্চাৎ এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৪॥

দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়সমূহকে, এমনকী চঞ্চল বুদ্ধিকেও কেউ কেউ শূন্য বলে জানে; কিন্তু স্ত্রী, বালক, অন্ধ এবং জড়তুল্য লোকগণ ভ্রমবশত ঐ সকলকে পুনঃপুনঃ 'আমি' বলে নির্দেশ করে। মায়াশক্তির ক্রিয়া দ্বারা বিরচিত মহামোহের বিনাশকারী সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৫॥

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবং চন্দ্রের ন্যায় যিনি মায়ার সমাচ্ছাদন বশে জীবরূপে সুষুপ্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের উপসংহারবশত তন্মাত্ররূপে অবস্থিত থাকেন এবং যিনি জাগরণকালে 'আমি পূর্বে ঘুমিয়েছিলাম'—এইরূপে পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করেন, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৬॥

বাল্যাদি ও জাগ্রদাদি তথা সমস্ত অবস্থা পরিবর্তিত হলেও যে আত্মা সর্বানুগতরূপে বর্তমান থাকেন ও 'আমি আমি' এইরূপে সর্বদা অন্তঃকরণে স্ফুরিত হন, সেই আত্মাকে যিনি ভজনকারীদের সমীপে শুভমুদ্রাসহকারে প্রকটিত করেন, সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৭॥

যিনি মায়াদ্বারা চালিত পুরুষরূপে স্বপ্ন অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় বিশ্বকে কার্য ও কারণ রূপে, প্রভু ও তৎসম্পত্তি রূপে, শিষ্য ও আচার্য রূপে, অধিকন্তু পিতা ও পুত্রাদি রূপে পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করেন, সেই শ্রীগুরুরূপী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার প্রণাম। ৮॥

প্রত্যক্ষদৃষ্ট পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, যাঁর চরাচরাত্মক অষ্টমূর্তিরূপে প্রকাশিত হয়, বিবেকবানদের কাছে যে শ্রেষ্ঠ বিভু ভিন্ন অন্য কারও অস্তিত্ব নেই, সেই শ্রীগুরুরূপী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ৯॥

যেহেতু, উপরোক্ত স্তবে এই সর্বাত্মরূপ বস্তুটিকে প্রকাশ করা হয়েছে, সুতরাং এই স্তবের শ্রবণ, অর্থচিন্তা, ধ্যান এবং সংকীর্তনের দ্বারা সর্বাত্মরূপ মহাবিভূতির সঙ্গে ঈশ্বরত্ব লাভ হবে এবং প্রসিদ্ধ অনিমাদি অষ্টধা পরিণত ঐশ্বর্য স্বতঃই সিদ্ধ হবে। ১০॥

যিনি বট বৃক্ষ সমীপে ভূমি ভাগে উপবিষ্ট, যিনি সকল মুনিগণকে অপরোক্ষ ভাবে জ্ঞান দান করেন, যিনি ত্রিভুবনের গুরু, যিনি ঈশ্বর এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখের ছেদনকারী, সেই শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। ১১॥

এ বড় আশ্চর্য যে বট বৃক্ষের মূলে শিষ্যরা বৃদ্ধ ও গুরু যুবা। গুরুর মৌনতাই কিন্তু ব্যাখ্যান, শিষ্যগণের সংশয় তাতেই দূরিত। ১২॥

যিনি প্রণবের বাচ্য এবং শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রস্বরূপ, তাঁকে নমস্কার। যিনি নির্মল, প্রশান্ত, সেই শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। ১৩॥

সকল বিদ্যার আকর, ভবরোগিগণের চিকিৎসক, সকল লোকের গুরু, শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। ১৪॥

যে যুবক মৌনরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যে আচার্যগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ ঋষিকল্প শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাঁর হাতে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি আনন্দস্বরূপ, স্বাত্মারাম এবং মৌন, সেই শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে স্তুতি করি। ১৫॥

জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান

*(স্বপ্নদর্শনের সঙ্গে বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর সাদৃশ্য
ও তার সত্যতা সম্বন্ধে জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তর)*

স্বপ্নবিষয়ক সত্য সম্বন্ধে লিখিত প্রশ্ন ও পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর স্বানুভূতির দৃষ্টিতে সামগ্রিক পরমসত্যের বিজ্ঞানসম্মত যে নিত্য বিমল বোধানন্দের প্রকাশ করেছেন তার অংশবিশেষ সর্বসাধারণের অবিদ্যা-কাম-কর্ম-চিন্তাজাত মোহভ্রান্তি নিবসনের জন্য এখানে ব্যক্ত করা হল ঃ

"আত্মার দৃষ্টি অনন্ত শুদ্ধ জ্ঞান, পূর্ণ সত্যের দৃষ্টি। ইন্দ্রিয়, মনের দৃষ্টি হল গুণের দৃষ্টি, তা চিদাভাসের খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো প্রতিভাস। অর্থাৎ জ্ঞানের বক্ষে গুণের মাধ্যমে জ্ঞানাভাসের বিকৃত মলিন ব্যবহার। এক কথায়, অজ্ঞানশক্তির বিলাস হল জীবজগৎ। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর মতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞের মতে ব্রহ্মাত্মা অতিরিক্ত সমস্ত জীবজগৎ-ই হল ইন্দ্রজালবৎ, স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়ার খেলা।

আমরা মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে যা ভাবি, দেখি ও বুঝি তার কোনওটিই সত্য নয়। দৃশ্য মাত্রেই মিথ্যা অর্থাৎ আজ আছে, কাল নেই। যা বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং যা স্বল্পকালস্থায়ী অর্থাৎ অস্থায়ী, অনিত্য—তা মিথ্যা। যা সত্য তা নিত্য শাশ্বত অচ্যুত (অবিনাশী) ও অপরিণামী। তার বিকার নেই, পরিবর্তন নেই, রূপান্তর নেই। মিথ্যা দৃশ্যের পিছনে দ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপ যা নিত্যবর্তমান তা-ই একমাত্র সত্য। এই সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টাকেই ঈশ্বর বা আত্মা (ব্রহ্ম) বলা হয়। এ-ই হল আমাদের যথার্থ স্বরূপ। এই আত্মা বা সাক্ষী আমি—বিশুদ্ধ জ্ঞানসত্তা; অহংকার নয়—অহংদেব। তা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই আমি দেহ নয়, প্রাণ নয়; মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বা হস্ত, পদ কিছুই নয়। আমি শুধু চিদানন্দস্বরূপ। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ভূমা-আমির পরিচয় বিস্মৃত হয়ে অবিদ্যামায়ার বিকারী পরিণামী ত্রিগুণের খেলার সঙ্গে আমরা নিজেদের ভুল করে জড়িয়ে ফেলেছি। তার ফলে এগুলি সত্য মনে করি। আমরা দেহকেই আমি ও আমার বলে ভুল করি ও দৃশ্য জগৎকে সত্য বলে মনে করি।

'আমার দেহ'—এরূপ কথা আমরা ব্যবহার করি। সুতরাং লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে আমি দেহ নই। দেহ ছাড়া দেহের অতিরিক্ত একটা সত্তা আছে, সে শুধু নিস্পৃহ ভাবে সব কিছুর নিত্য সাক্ষিরূপে সব দেখে, শোনে বা জানে। দেহ হল একটি পোশাকমাত্র, যার মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বর, আত্মা বা ভূমা, পাকা-আমি বর্তমান। সে বস্তুজগতের বা দৃশ্য জগতের কোনও কিছুর বিকার বা ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা affected হয় না। মন হল ঈশ্বরের শক্তির বা আত্মার প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র। এই মন অহংকারবশত নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলে ভাবে এবং দৃশ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিজের বলে পেতে চায় এবং তা ভোগ বা আস্বাদন করতে চায়। এই হল শুদ্ধ আত্মার জীবরূপ ভ্রান্তিবিলাস। এই দৃশ্য বস্তু বা ভোগ্য বস্তু যখন পাই না বা তা যখন চলে যায় তখনই আমরা দুঃখ, শোক, ব্যথা, বেদনা ও অভাব বোধ করি।

আমরা আনন্দ পাই এবং উৎফুল্ল হই আমাদের প্রিয় বস্তু সম্মুখে এলে এবং অপ্রিয় বস্তু বিদূরিত হলে। আবার আমরা বিষণ্ণ বা দুঃখিত হই প্রিয় বস্তু দূরে গেলে এবং অপ্রিয় বস্তুর সম্মুখীন হলে। এটাই হল আমাদের অজ্ঞানতা। কারণ এই প্রিয় বস্তু বা অপ্রিয় বস্তু কোনওটিই সত্য নয়—সব-ই মিথ্যা। সত্য হল একমাত্র সে-ই যাঁর কাছে প্রিয় বস্তু বা অপ্রিয় বস্তু বারেবারে আসে আর যায়। ম্যাজিসিয়ান (যে magic

দেখায়) সত্য, কিন্তু তার magic খেলাটা সত্য নয়। সেরূপ আত্মা বা সাক্ষিস্বরূপ আমি সত্য কিন্তু সাক্ষিস্বরূপ আত্মা আমি-র সম্মুখে যা আসে আর যায় (তা সুখই হোক আর দুঃখই হোক) তা কখনওই সত্য নয়। যেমন আকাশের নীলিমা দৃষ্ট হলেও সত্য নয়, সেরূপ সাক্ষী-আত্মার দৃশ্যাদি দৃষ্ট ও অনুভূত হলেও যথার্থ সত্য নয়। সাক্ষীর ভাস্য হল সাক্ষ্য, তা সাক্ষীর উপাধি মাত্র। উপাধি গুণজাত এবং পাঞ্চভৌতিক দৃশ্যমাত্র। এ সবই কল্পিত দেশ-কাল-কার্য-কারণের অধীন বলে মিথ্যা ও অসত্য। সাক্ষী-আত্মাই একমাত্র নিত্যসত্য। তা সর্বরকম মায়াজাত কল্পিত গুণ, কাল, দেশাদি ভাব ও অবস্থাদির বিকারমুক্ত।

আমরা সিনেমা যখন দেখি সিনেমার পর্দার উপরে কত বৈচিত্র্যময় ছবি, সুখ-দুঃখের ছবি, বোমাবাজি যুদ্ধের ছবি, আগুন, ঝড়-ঝঞ্ঝার ছবি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির ভয়ংকর ও মর্মান্তিক ঘটনার ছবি দেখি; অথচ এ সব সিনেমার পর্দায় হওয়া সত্ত্বেও পর্দাকে কোনও মতেই বিকৃত করতে পারে না। সিনেমার দৃশ্যাবলী দর্শকের চিত্তকে নানা ভাবে অভিভূত করে কিন্তু হৃদয়স্থ নিত্যসাক্ষী আত্মাকে অভিভূত করতে পারে না। সিনেমাশো'র পরে দেখা যায় ঝড় জল আগুন কোথাও কিছু নেই। সাদা পর্দা অবিকৃত ভাবে যেমন ছিল তেমনই আছে। আমাদের প্রত্যেকের দিব্য অমৃত সত্তাস্বরূপও ঠিক সিনেমার পর্দার মতো নিত্য নির্বিকার ও স্থির। সিনেমার পর্দার মতো প্রশান্ত নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে সর্বদাই বিদ্যমান বিশুদ্ধ চিদানন্দঘন সাক্ষী-আত্মা ঈশ্বর স্বয়ং। মনের দ্বারা আত্মার বক্ষে যা-কিছু ঘটে যায় তা সবই গতিশীল। জগতের সব কিছুই গতিশীল। তাই তার নাম জগৎ। সিনেমার পর্দার মতো সাক্ষী-আমির বক্ষেই অর্থাৎ আত্মার বক্ষেই এই ঘটনাগুলি ঘটে যায় কিন্তু ঈশ্বর-আত্মা প্রশান্ত, নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাবে অন্তরে-বাহিরে সর্বদাই বিরাজমান।

ঈশ্বর-আত্মা বা সাক্ষী-আমি অখণ্ড ভূমা এক, বহু নয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা নয়। আত্মা বা সাক্ষী-আমি আকাশবৎ এক অখণ্ড ভূমা সত্তা। কাঁচা-আমি হল বুদ্‌বুদের মতো অহংকারের আমি। তার বৈশিষ্ট্যই হল দেহাত্মবোধ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম সমগ্র দৃশ্যাদি হল তার ভোগ্য। দেহাত্মবুদ্ধির জন্যই আমরা প্রত্যেকে অপরের থেকে নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করি। তা অহংকার বা কাঁচা-আমিরই লক্ষণ বা ব্যবহার। এই অহংকার বা কাঁচা-আমি হল অজ্ঞানপ্রকৃতির বিকার। দেওয়াল দিয়ে ভাগ ভাগ করে নিয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন ঘর তৈরি হয় তখন প্রতিটি ঘরের আকাশকেও ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু দেওয়াল ভেঙ্গে দিলে এক অখণ্ড আকাশই বিদ্যমান থাকে। আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা পরিচয়ও ঠিক এক আকাশবৎ অখণ্ড ভূমা সত্তা। তা দেহাদি কোনও কিছু দ্বারা কখনও খণ্ডিত হয় না বা বিকৃত হয় না। এক নিত্য ভূমা সচ্চিদানন্দসত্তাই হল সর্ব অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। ইন্দ্রিয়দৃষ্টির মূলে তা-ই হল ভূতাকাশ। অন্তর মনের মূলে তা-ই হল চিত্তাকাশ এবং সর্ব অনুভূতি ও বোধের মূলে অথবা কাঁচা-আমির বোধের মূলে তা-ই হল চিদাকাশ, চিদাম্বর বা পাকা-আমির স্বরূপ। এই হল পরম সত্যস্বরূপ, মহামুক্তি-শান্তিস্বরূপ, চিরমৌনস্বরূপ ব্রহ্মাকাশ, আত্মাকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তা-ই সবার পরমগতি, লক্ষ্য ও পরম আদর্শ। জীবজগতের এই হল মূল অধিষ্ঠান। ইনিই হলেন সবার আরাধ্যদেব। এঁকেই সর্বদেশের, সর্বজাতের মানব সর্বকালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, মতপথ ও সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে আপন আপন বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা স্বভাব অনুরূপ প্রচেষ্টা সহযোগে আরাধনা করে ও পূজা করে। আবার কেউ ধ্যান-ধারণা, জ্ঞানবিচার, বিশ্লেষণ, বিবেক-বৈরাগ্য-ত্যাগ ও অনাসক্তির মাধ্যমে এই চরম আদর্শে বা লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। এই হল সবার যথার্থ আপন অমৃত সত্তাস্বরূপ, নিত্যসত্যস্বরূপ। একে লাভ করার সাধনা বা এতে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনা বা এতে পূর্ণ লীন হবার সাধনা এ সবই অন্তর্ভাব বা স্বভাবপ্রকৃতির গুণ অনুসারে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে।

জ্ঞাতসারে সচেতনবোধে যা সাধিত হয় তা-ই শ্রেয়। অজ্ঞাতসারে যা সাধিত হয় তা প্রেয়। প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয় হল উৎকৃষ্ট। তা মহাজন দ্বারা স্বীকৃত। শ্রেয়বোধের পথ ও ধর্ম হল অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজীবন এবং

প্রেয়বোধের পথ ও ধর্ম হল জাগতিক বিজ্ঞান ও সংসার ভোগের জীবন। প্রেয়বোধের পথই অধিকাংশ মানুষ ভুলবশত বেছে নেয় জীবনে। তার পরিণামে তাকে সর্ববিধ বিকারের ফলস্বরূপ দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, জন্ম-মৃত্যু ও জরা-ব্যাধি প্রভৃতি পুনঃপুনঃ দেহধারণ করে ভোগ করতে হয় বাধ্য হয়ে। এই প্রেয় পথের আদর্শ ও ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন না-হলে, এর কার্য-কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না-হলে এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা জাগে না। কে চায় দুঃখ ভোগ করতে, জরা-ব্যাধির কষ্ট ভোগ করতে, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে এবং অনন্তকাল মৃত্যুলোকে বাস করতে? কিন্তু প্রেয়বোধের পথে, প্রকৃতির পথে অর্থাৎ সংসারজীবনে বাধ্য হয়ে তা ভোগ করতে হয়। জীবনের এই পরিণাম অমোঘ। তা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তবে অসম্ভব নয়। তা থেকে পরিত্রাণের বা মুক্তি পাবার উপায়ই হল শ্রেয় পথ অনুসরণ করা। প্রেয় পথ হল দেহাত্মবুদ্ধিপ্রধান প্রকৃতির পথ, কাম ইচ্ছা ভোগের পথ, আপাতমনোরম বিষয় সুখ ভোগের পথ। তা আপেক্ষিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত বিকারধর্মী প্রকৃতির কার্য-কারণ নীতির অধীন। এই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করার এবং তা থেকে সর্বতোভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার বা মুক্ত হবার উপায়ই হল শ্রেয় পথ বা ঈশ্বরাত্মার বিজ্ঞান।

শ্রেয় পথের ধর্মাদর্শ হল প্রথমে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্য ঈশ্বরাত্মাস্বরূপের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যা-কিছু অন্তরায় তা শোধন বা বর্জন বা পরিহার বা অপসারণ করা। এ-ই হল তার সাধন বা চেষ্টা। এক কথায়, চিত্তশুদ্ধি, বিষয়ভোগে নিরাসক্তি, ঈশ্বরাত্মার প্রতি প্রীতি অনুরাগ ভক্তি ও আসক্তি, অহংকার বা কাঁচা-আমির পরিশোধন, সমর্পণ বা বিলুপ্তি। এই হল সর্ব নিবৃত্তির পথ, মুক্তি বা নির্বাণ লাভের পথ। এর জন্য অনলস প্রচেষ্টা ও সাধন দরকার। তা সম্ভব হয় একজন অভিজ্ঞ, যথাযোগ্য মুক্ত দিব্য জীবনদিশারীর সাহায্যে। দেবমানব বা ঈশ্বরকোটি পুরুষের মাধ্যমে ঈশ্বরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত কৃপাধারা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যদিও ঈশ্বরের কৃপাবায়ু নিরন্তর সর্বস্তরেই প্রবাহিত, তথাপি তা মলিন মন, বুদ্ধি বা অহংকার বুঝতে পারে না এবং অনুভব করতে পারে না। তাদের মহদাত্মার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, যাঁর মাধ্যমে লোকে ঈশ্বরের আশিস্ কৃপা করুণা অনুগ্রহ লাভের সুযোগ পায়, তা অনুভব করতে পেরে তারা ধন্য হয়, পূর্ণ হয়, মুক্ত হয়। অবশ্য এর জন্য স্বকীয় চেষ্টা ও পুরুষকারের প্রয়োজন। তাও সদ্গুরু মহাত্মা ও ঈশ্বরের কৃপাশিস্ সাপেক্ষ। আবার এই কৃপা ও আশিস্ সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ জীবনযাপন সাপেক্ষ। সৎ কর্মাদি আবার সৎসঙ্গের প্রভাবেই হয়ে থাকে। এই সব কিছুর সামগ্রিক বা একক রূপই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, কৃপা ও করুণার বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরাত্মা স্বয়ং সাধু মহাত্মাদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেন ও আপন মহিমা ব্যক্ত করেন। তার ফলে জীব বা মানুষ প্রথম দিব্যসম্পদ বা গুণশক্তির অধিকারী হয়ে পরিণামে ঈশ্বরাত্মসত্তার সঙ্গে তদ্বোধে সংযুক্ত হয়। তার ফলে সে তার যথার্থ দিব্য মুক্তস্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সত্যস্বরূপ তার অবিদ্যাজাত কাঁচা-আমির প্রভাবে আবৃত থাকে এবং প্রেয়বোধের বিজ্ঞান দ্বারা তা বদ্ধ জীবরূপে, সসীম আমিরূপে অনুভূত ও প্রতিভাত হয়। তা শ্রেয়বোধের বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ঈশ্বরাত্মার একান্ত শরণাগতি লাভের ফলে তাঁর কৃপাশিসে সদ্গুরু মহাত্মা মহাপুরুষদের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের দ্বারা সৎমার্গগামী হয়ে সত্যের প্রভাবে রক্ষিত, বর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয়ে প্রবুদ্ধ, প্রশান্ত, সর্বমল-বিমুক্ত হয়ে আপন সত্যস্বরূপে পুনরায় ফিরে আসে। তার ফলে জীবন হয় ধন্য, পূর্ণ, দিব্য, মুক্ত, শান্ত, সৌম্য, অখণ্ড, ভূমা ও মৌন।

আমরা আমাদের এই যথার্থ স্বরূপের দিক অর্থাৎ আত্মা বা পাকা-আমির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাহ্যজগতের দিকে অর্থাৎ দৃশ্যের দিকে, যা দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সম্মুখে আসে, সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং তা সাধিত হয় কাঁচা-আমিবোধের মাধ্যমে। কাঁচা-আমিবোধই হল অহংকার-অভিমানের বোধ বা ব্যষ্টি জীবনবোধ। তা একদিকে যেমন নিজেকে পৃথক করে রেখে দেখে, শোনে ও জানে এবং তার জন্যই

সচেষ্ট থাকে; সেরূপ অপরকেও নিজের মতো পৃথক ভাবে দেখে ও জানে। এই কাঁচা-আমির বৈশিষ্ট্য হল পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও ভেদজ্ঞান এবং দেহাত্মবুদ্ধিযোগে নিজের পৃথক সত্তাবোধ, অপরের পৃথক সত্তাবোধ ও প্রিয়বোধে সব কিছু গ্রহণ, অপ্রিয়বোধে আংশিক বর্জন। এই স্ববিরুদ্ধভাব ধর্মের দ্বারা সদাই প্রভাবান্বিত হয়ে চলে বলে সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে যে নিত্য, শাশ্বত, শুদ্ধ, একতা, সমতা ও পূর্ণতা নিহিত আছে, যা পরম সত্যরূপে সব কিছুর অধিষ্ঠান এবং যার কথা ইতিপূর্বে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা এই কাঁচা-আমির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। বোঝালেও সে বোঝে না, দেখালেও সে দেখতে পায় না। তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা-কিছু তার প্রাধান্যই সর্বাধিক। তদতিরিক্ত বৃহত্তর কোনও কিছুর অস্তিত্ব সে ভয়ে হয়তো বা মানে বা স্বীকার করে কিন্তু তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সে স্বীকার করে না। তার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং তার নিত্যস্বরূপতা ও নিত্যবোধের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও অখণ্ড সত্যস্বরূপের সত্য পরিচয়কেও পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে পারে না এবং মানেও না। এই হল এই কাঁচা-আমির ত্রুটি। তথাপি এই কাঁচা-আমি ব্যষ্টিজীবনের কর্তা-ভোক্তা সেজে নিজের পৃথক অস্তিত্ব এবং অপরের পৃথক অস্তিত্বকেই বিশেষ সত্য বলে ধারণা করে। তা আপেক্ষিক সত্যের লক্ষণ। আপেক্ষিক সত্যের বেত্তাই হল কাঁচা-আমি। অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত অহংকার অভিমানের আমি। এ হল বিদ্যাভিমানী। এ অজ্ঞানের যথার্থ পরিচয় জানে না, জ্ঞানেরও জানে না এবং বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানের তো প্রশ্নই ওঠে না।

এই কাঁচা-আমির পরিশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পূর্ণ রূপান্তরের জন্য বা পূর্ণ অবলুপ্তির জন্য পূর্ণের আমি বা পাকা-আমির সাহায্য এবং তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি সর্বতোভাবে প্রয়োজন। এই পাকা-আমির বোধই হল পরম সত্যবোধ। এখানে আপেক্ষিক সত্য ও বোধের প্রভাব নেই। ঈশ্বরাত্মার শরণাগত হওয়ার মানেই হল এই পাকা-আমির শরণাগত হওয়া। আপেক্ষিক সত্যের বেত্তা যেমন কাঁচা-আমি, পারমার্থিক সত্যের বেত্তা তেমন পাকা-আমি। আপেক্ষিক সত্য বলতে যা-বোঝায় কাঁচা-আমিই হল তার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। অপর পক্ষে পারমার্থিক সত্য যা, পাকা-আমিও তা-ই। সুতরাং এই দু'টির মধ্যে যে সত্যবোধের প্রকাশ তা হৃদয়ঙ্গম হলে আর কোনও রকম ভুল, ভ্রান্তিভীতি ও সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। আসল কথা হল, সত্য আপনবোধ বা নিজবোধ অতিরিক্ত কোনও বস্তু নয়। তা আপনারই অখণ্ড পূর্ণ সত্য পরিচয়, অন্যের পরিচয় নয় এবং অন্যের পরিচয় দ্বারা তা সিদ্ধও হয় না।

সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যাদির অর্থাৎ সমগ্র বৈচিত্র্যের ধারণা ও তার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে এই পাকা-আমিরূপ ঈশ্বর বা আত্মার প্রতি আসক্ত হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত জীবনধারণ, সেবারূপ কর্ম, তাঁর নিত্য স্মরণ-মননরূপ ধর্ম, তাঁর পূজা-অর্চনা জপধ্যানরূপ অধ্যাত্মধর্ম ও তাঁর সঙ্গে নিত্য অভিন্নতা একতা সমতা ও পূর্ণবোধে তথা আপনবোধে ভালবেসে তৎপ্রেমে নিরন্তর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলা হল তাঁর সারমর্ম অবগত হওয়া অর্থাৎ সত্যকে জানা। সোজা কথায়, অখণ্ডরূপে নিজেকে দেখা, শোনা, জানা ও মানাই হল সত্যকে জানা। এর পরে কোনও গতি নেই। এই হল পরমগতি, পরমলক্ষ্য, পরাসিদ্ধি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, আত্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি, মহামুক্তি ও মহাশান্তি। এ ছাড়া আর যা-কিছু সবই ভ্রান্তি, মিথ্যা, অনিত্য ও অসত্য। লৌকিক সত্য বা জাগতিক সত্য বলতে যা-বুঝায় সবই আপেক্ষিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই আপেক্ষিক সত্য প্রকৃতির বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণ রূপ হল অব্যক্ত, তার ব্যবহারিক রূপ হল বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ যা আপেক্ষিক সত্য। এরই অন্তর্ভুক্ত হল প্রকৃতির সমগ্র স্থূল-সূক্ষ্ম প্রকাশ ও বিকাশ। সমগ্র স্থূলের প্রাধান্যে যে ব্যবহার সিদ্ধ হয় তা হল ব্যবহারিক সত্য এবং তা জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয়। সমগ্র সূক্ষ্মের প্রাধান্যে যে ব্যবহার সিদ্ধ হয় তা হল প্রাতিভাসিক সত্য এবং তা স্বপ্নের বা ধ্যানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ শুধুমাত্র অন্তরমনের দ্বারাই অনুভূত হয়। যেমন যাদুকরের যাদুখেলা সত্যরূপে প্রতিভাত

হয় এবং খেলাশেষে তা মিলিয়ে যায় এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সেরূপ প্রাতিভাসিক সত্য কিছুকালের জন্য ইন্দ্রিয়, মনের মাধ্যমে অনুভূত হলেও তা পরিণামী ও বিকারী বলে স্থায়ী নয়, পূর্ণ নয়। সেই জন্যই তা মিথ্যা। একমাত্র পারমার্থিক সত্যই হল ঈশ্বরাত্মাব্রহ্ম। তা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ বলে অখণ্ড আপনবোধে, স্ববোধে বা নিজবোধরূপ সত্যরূপে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায় বা অনুভূত হয়। এক কথায়, একেই স্বানুভূতি বলে। স্বানুভূতি হল সত্যের পরিচয় এবং সত্য হল স্বানুভূতিময়। এর বৈশিষ্ট্য হল কেবল অখণ্ড বোধরূপ আমি, আনন্দঘন আমি, নিত্যপূর্ণ আমি।

প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যের অনুভূতিকালে তা সত্য বলে অনুভূত হলেও তা যে নিত্যসত্য নয় তা বিচারবিহীন মনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আপেক্ষিক সত্যের প্রভাবাধীনে থেকে তার ব্যবহারকালে ভুলে যাই যে তা বিকারশীল, অনিত্য ও মিথ্যা। সেই জন্য সত্যদ্রষ্টাগণ বলে থাকেন যে—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবজগৎ 'ব্রহ্মৈব ন চাপর'।" ব্রহ্ম-আত্মা একই বস্তু। তা নিত্যপূর্ণ অখণ্ড। তা আপেক্ষিক নয়, তা পারমার্থিক। মহাপুরুষগণ বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করার জন্য ধ্যান, জপ, নাম প্রভৃতি করার নির্দেশ দেন। জপ বা নাম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং বাইরের আসক্তি কমে মন একাগ্র হয়। এ ভাবে অভ্যাসের ফলে ক্রমে ক্রমে জগতের মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ় হয় এবং মন অন্তর্মুখী হয় এবং নিজস্বরূপের দিকে দৃষ্টি যায়।

পারমার্থিক সত্যের দৃষ্টিতে জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত জগৎ ও তার ব্যবহারিক সত্যই যেখানে মিথ্যা সেখানে স্বপ্নকালে যা ছবির মতো দেখা যায় সেই প্রাতিভাসিক সত্য আপেক্ষিক সত্য হলেও তা যথার্থ সত্য বা পারমার্থিক সত্য কী করে হতে পারে? স্বপ্নাবস্থায় দেখা ঘটনা যদি বাস্তবক্ষেত্রে কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায় তাহলেও তা মিথ্যা, কারণ জাগ্রৎকালীন জগৎ-ই মিথ্যা। কিন্তু যে এই সব কিছু দেখে অর্থাৎ সব কিছুর সাক্ষী, সেই একমাত্র নিত্যসত্য। স্বপ্নে দেখা দৃশ্য বাস্তবে না-ঘটলেও যেমন মিথ্যা, ঘটলেও তেমনিই মিথ্যা; কিন্তু সেখানে সাক্ষিদ্রষ্টারূপে যে সে-ই হল একমাত্র পরমসত্য। কারণ সব কিছুর অভাব হলেও তাঁর অভাব হয় না। এই হল ঋষিদের মত, সত্যদ্রষ্টাদের মত।"

[সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এই সত্যটিই আমাদের ধরিয়ে দেন যুগে যুগে বারবার এসে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরও এতদিন যাবৎ আমাদের দিব্য মুক্ত পূর্ণ সত্যস্বরূপের পরিচয়,অখণ্ড আপনবোধের বা নিজস্বরূপের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছেন বা অবগত করিয়ে দিচ্ছেন বারবার সত্য আপনবোধের স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যানুভূতি বা স্বানুভূতির ভাষার মাধ্যমে এবং কী ভাবে সেই সত্যস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তার উপায়টিও ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপযোগী করে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায় জানিয়ে দিচ্ছেন।

তোমার স্বপ্ন সম্বন্ধে তোমার সংশয় হচ্ছে, হয়তো উল্লিখিত কথা থেকে তা দূর হবে। তবে বাবাঠাকুরের এত বিরাট দর্শন তোমাকে কয়েক লাইন চিঠির মাধ্যমে বোঝানো কী করে সম্ভব? দীর্ঘকাল ধারাবাহিক ভাবে শ্রবণ করে আমরাই তো এতদিন পর্যন্ত মোহ আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারছি না। তোমাকে আমি বাবাঠাকুরের বক্তব্যের থেকে লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমারও অশেষ উপকার হল। কারণ তোমার প্রশ্নের উত্তরে উনি যা বলেছেন তা আমাদের মতো সংসারীদের সবার পক্ষেই প্রযোজ্য; তবে যাদের এ বিষয়ে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা যত অধিক তারা তত অল্প আয়াসেই তার প্রভাবে সত্যের জ্যোতি বা আলো ধরতে পারবে, এই বিশ্বাস আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। তাই ভ্রান্তির বা ভয়ের কারণ থেকে মুক্ত হবার উপায় যখন পাওয়া গেছে এবং করুণাময় ঈশ্বরের কৃপাশিস্ যখন অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে তখন আমাদের আর নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। আমার কোনও কথা দ্বারা আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি না। তাঁর কথাগুলিই আমার জবানীতে লিখে দেওয়া হল পর্যায়ক্রমে। পরে তুমি এখানে এলে তোমাকে এ বিষয়ে বাবাঠাকুর আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও অনেক কথা বলেছেন সেগুলোও যেমন বলেছিলেন তেমনই লিখে দিলাম। এটা মহারামায়ণ ভেবে তুমি নিয়মিত পড়ে যেও কারণ এইগুলির মর্ম অবগত না-হলে মায়ামোহের বন্ধনও কাটে না এবং ঈশ্বরের কৃপা, করুণাও অনুভব করা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা, করুণা অনুভব করার যোগ্যতা হলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, কার্যকরী ও ফলবতী হয়। তখন সাধনভজনে নিষ্ঠা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায় এবং সহজসাধ্যও হয়। তার ফলে দুঃখকষ্টের মূল কারণ সহজে অতিক্রম করা সম্ভব হয় এবং সত্যস্বরূপে পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়। মোহ আসক্তি যে সত্যানুভূতির প্রতিবন্ধক তা অবগত হওয়ার জন্য তিনি যা বলেছেন তা নিম্নে লিখে দেওয়া হল। তা মন দিয়ে বারবার পড়া দরকার। তাহলে মন সবল, সতেজ ও উপযুক্ত সত্যাগ্রহী এবং সর্বতোভাবে মুক্ত হবার উপযোগী হবে।]

"দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকারাদি সবই হল আত্মবক্ষে অনাত্মা তথা মায়াশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি ত্রিগুণের বিস্তার বা প্রকাশ। এগুলি সবই বিকারী, পরিণামী ও স্বল্পকাল স্থায়ী; সুতরাং এগুলি কোনও মতেই সত্য হতে পারে না। তথাপি এদের মধ্য দিয়ে আত্মচৈতন্য প্রতিফলিত হয় বলে এগুলি চেতন ও সক্রিয় রূপে প্রতিভাত হয়। সবই স্বপ্নের মতো ক্ষণকাল প্রকাশ পেয়ে তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি, ব্যাধি প্রভৃতি যা-কিছু জীবনের মধ্যে ফুটে ওঠে সে সবই ত্রিগুণের বিকার। আত্মার বক্ষে এইগুলি পুনঃপুনঃ ঘটে বলে অজ্ঞানবশত বিবেক, বিচার ও সাধন রহিত সাধারণ মানুষ অভ্যাসবশত পরিদৃশ্যমান, প্রতীয়মান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচিত বা জ্ঞাত জাগতিক সব কিছুকে সত্য বলে মনে করে। এগুলি সবই সিনেমার দৃশ্যের মতো, যাদুকরের যাদুখেলার মতো, স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলীর মতো ইন্দ্রিয়-মনের কাছে ক্ষণকালের জন্য উপভোগ্য হলেও এ সবই স্বপ্নভঙ্গের পরে স্বপ্নদৃশ্যাদি যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হয়, সেরূপ আত্মজ্ঞানের বিকাশে এগুলিও যে সব মিথ্যা তা যথার্থ ভাবে জানা যায়।

স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্নের দৃশ্য ও অনুভূতিগুলিকে সকলে সত্য বলেই মনে করে, মিথ্যা বলে মনে করে না। কিন্তু স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সকলেই বোঝে ও জানে যে সে স্বপ্ন দেখছিল এবং যা দেখছিল জাগ্রৎকালীন অভিজ্ঞতার তুলনায় তা সবই মিথ্যা। স্বপ্ন হল জাগ্রৎ অবস্থার চিন্তা, ভাবনা ও কর্মের সূক্ষ্ম সংস্কারময় অবস্থার মিশ্রিত অতৃপ্ত ইচ্ছার বা বাসনার এক প্রকার বিকৃত পরিণাম। অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অভিজ্ঞতারই সূক্ষ্মসংস্কারময় স্মৃতি অবলম্বনে তার সূক্ষ্ম রূপায়ণ এবং তার ভোগ। জাগ্রৎ অবস্থার সঙ্গে কতকাংশে, কখনও কখনও বহুলাংশে তার সাদৃশ্য থাকতে পারে; আবার পূর্ব স্মৃতির সঙ্গে একেবারে কোনও সম্বন্ধশূন্য ঘটনাও স্বপ্নে ঘটতে পারে। তবে সব স্বপ্নের সঙ্গেই অতীতের এবং বাস্তব জীবনের অর্থাৎ অতীত অতীত জন্মের সংস্কার এবং বর্তমান জীবনের নানা বয়সের, নানা স্থানের, নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ অভিজ্ঞতার এলোমেলো বিকৃত ও মিশ্রিত উল্টোপাল্টা জোড়াতালি দেওয়া বহু ব্যাপারই স্বপ্নের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, যার কোনও প্রকার সত্য তাৎপর্য নেই। তা কখনও ব্যক্তিগত ভাবে সুখকর, দুঃখকর, ভয়ংকর এবং বিস্ময়কর প্রভৃতি বহু ভাবের বিষয় হতে পারে।

সব রকম স্বপ্নই হল সূক্ষ্ম দেহে অভিমানাত্মক বুদ্ধির বা অহংকারের কার্য এবং অহংকারই তার ভোক্তা। আত্মা এ সবের সাক্ষিমাত্র। শুদ্ধ আত্মা কর্তাও নয় ভোক্তাও নয়। জীবনের মাধ্যমে যা-কিছু সাধিত বা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তা সবই আপেক্ষিক সত্য। অহংকারই তার কর্তা-ভোক্তা। অহংকার হল অবিদ্যামায়ার কার্য। অবিদ্যামায়ার কার্যাদি উপরে মহদাদি থেকে নিম্নে স্থূল দেহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সবই অনাত্মা, অতএব মিথ্যা। মিথ্যার কার্যাদি মিথ্যাই হয়। পরমাত্মার বক্ষে অনাত্মা মায়ার সমগ্র কার্যই হল এই স্বপ্নময় বিশ্বজগৎ। জাগতিক দৃষ্টিতে মায়ার কার্যাদি ইন্দ্রিয়-মনের দ্বারা অনুভূত হলেও তা সত্য নয়। কারণ এ সবই ত্রিগুণ ও পঞ্চভূতের মিশ্রণ। এগুলি সবই বিকারী, পরিণামী, অস্থায়ী এবং দ্রষ্টার দৃশ্যমাত্র। দ্রষ্টার দৃশ্যাদি সবই দ্রষ্টা থেকে ভিন্ন।

সুতরাং সে সবই মিথ্যা। কেবল সাক্ষিদ্রষ্টাই হল নিত্যসত্য। সাক্ষিদ্রষ্টার যে আমি তা-ই হল ব্রহ্ম-আত্মার আমি। ব্রহ্ম-আত্মার আমি হল শাশ্বত ভূমা পূর্ণের আমি। তা নিরুপম অনাদি তত্ত্ব, আদ্যন্তবিহীন সত্য-জ্ঞান-আনন্দ; নির্বিকার নিরাকার নির্বিশেষ নির্মল নিরঞ্জন নির্বিকল্প নিরবদ্য নিত্যাদ্বৈত নিরাভাস নিরবলম্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ।

মায়াকৃত জগৎ প্রপঞ্চ হল মহা স্বপ্নবৎ। এখানে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি নিরন্তর ঘটে চলেছে। এর সামগ্রিক রূপই হল জগৎরূপ। জগতের অর্থই হল জাত হওয়া ও গত হওয়া অর্থাৎ আসা ও যাওয়া। যা আসে আর যায় তা সিনেমার পর্দার ছবির সঙ্গে তুলনীয়। ছবি কেবল ছবিই। তার কোনও সত্য মূল্য নেই। সুতরাং জাগতিক ব্যাপার সব পরিদৃশ্যমান হলেও এবং ব্যবহারিক সত্যরূপে গ্রাহ্য হলেও পরমার্থদৃষ্টিতে অর্থাৎ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের দৃষ্টিতে সব-ই অনিত্য, মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র। ভ্রমের দৃষ্টিতে যা অনুভূত হয় তা কখনওই সত্য নয়। দেহ থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই যেখানে ভ্রমমাত্র, জ্ঞানের দৃষ্টিতে সেখানে আত্মা অতিরিক্ত সত্য আর কোথায়? অহংকার, মন, বুদ্ধি, চিত্তকে অন্তঃকরণ বলে। অবিদ্যামায়ার আর এক নাম হল অব্যক্ত। অব্যক্ত থেকে জাত "ব্রহ্ম হতে দেহাদি" (এখানে ব্রহ্ম অর্থে স্রষ্টা ব্রহ্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে নয়। কারণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে কোনও সৃষ্টি বা স্রষ্টা সিদ্ধ নয়। যেমন গাঢ় ঘুমে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কোনওটাই সিদ্ধ নয়, সম্ভবও নয়) ও তৃণ পর্যন্ত সবই অনিত্য ও মিথ্যা (অদ্বয়তত্ত্বের দৃষ্টিতে)।

দ্বৈতবাদে তত্ত্বানুভূতি ও সত্যানুভূতির যোগ্যতা লাভের জন্য ঈশ্বর ও জগৎসৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে মানা হয়। অবিদ্যা-অজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা সত্যবোধের যোগ্যতা বাড়ে না এবং মিথ্যাবোধের নিরসনও হয় না। অসৎ বস্তুর অনুভূতি দ্বারা তৃপ্তিও হয় না এবং দুঃখনাশও হয় না। নিত্য, অদ্বয়, আনন্দ রসানুভূতি হল ব্রহ্মাত্মানুভূতি। ব্রহ্মাত্মানুভূতি দ্বারা চিত্তের বা মনের সব ভ্রান্তি নিরসন হয়। পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখানুভূতি লাভান্তে মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়।

আত্মবোধই হল অদ্বয়বোধ ও অদ্বয় আনন্দ। তা সর্বতোভাবে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি দ্বৈতভাব বিবর্জিত, নিরন্তর একরস বা সমরসসার। অপর পক্ষে, দ্বৈতবোধে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভাব লক্ষণাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেখানে পাকা-আমি বা আত্মার আমি আড়ালে থাকে। কাঁচা-আমি, অহংকারের আমি সেখানে প্রধান, সুতরাং তার দ্বারাই সর্ববিধ ব্যাপার সাধিত ও অনুভূত হয়।

কাঁচা-আমি বা জীব হল দ্বৈত ভাবের বেত্তা। আত্মা সমগ্র অহংকারের কার্যাবলী ও ভোগ জ্ঞানের নিরপেক্ষ সাক্ষিমাত্র। তা জীবের বা অহংকারের আমি বা কাঁচা-আমি জানে না। এটা জানা সম্ভব হয় পাকা-আমির কৃপায় এবং তখনই হয় কাঁচা-আমির রূপান্তর, পরিশোধন অথবা তার পূর্ণ অবসান। তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ. মুক্ত, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর-আত্মবোধস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ পাকা-আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অবস্থান করে। জীবনের চরম উৎকর্ষই হল এই ঈশ্বরবোধের বা আত্মবোধের প্রকাশবিকাশ। এই বোধে যিনি বাস করেন তিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। তিনিই সমগ্র কাঁচা-আমির কাছে চরম আদর্শ, দিব্য ও মুক্তস্বরূপের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তিনিই পূজ্য, তিনিই আরাধ্য। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের উত্তরোত্তর সামগ্রিক উৎকর্ষের ফলে ঈশ্বরের কৃপাশিসের যোগ্য অধিকারী হওয়া যায়। এই হল সংসারী জীবের পক্ষে চরম পাথেয়। এই পাথেয় সবাই যাতে সংগ্রহ করতে পারে বা অবলম্বন করতে পারে তার জন্য করুণাময় ঈশ্বরের অঢেল করুণা সৃষ্টির সর্বস্তরে প্রবহমান। দিব্যমুক্ত মহামানবগণ সূর্যের কিরণের মতো, দক্ষিণ সমীরণের মতো, এবং বসন্তবায়ুর অযাচিত প্রাণসঞ্চারণের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় এই কৃপাশিস্ ও করুণাকে সমগ্র জগৎকল্যাণের কাজে, ঈশ্বর-আত্মযজ্ঞে আপনার জীবন উৎসর্গ করেন এবং এই কৃপাশিস্ ও করুণার প্রমাণ রেখে যান জগতের ইতিহাসে।

সাতাশ

জাগ্রৎ অবস্থায় মানুষ ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবনের নানা স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, নানা জনের, নানা ঘটনার, নানা অবস্থার এবং তদ্‌জনিত ফলাফলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, প্রিয় ও অপ্রিয় নানাবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যুক্ত হয়। এ সবের কিছু তার মনে থাকে, কিছু ভুলে যায়; কিন্তু সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতারই একটা সংস্কার বা সূক্ষ্ম ছাপ তাদের চিত্তে অঙ্কিত থাকে। তারই অংশবিশেষ সক্রিয় হয়ে জীবনরূপ ধারণ করে। বাকি অংশ সবই সঞ্চিত থাকে। জীবনে যে অংশ সক্রিয় হয় তা-ই হল বর্তমান জীবনের পরিচালক। এর এক অংশ সূক্ষ্ম কারণরূপে ভিতরে থাকে। আরেক অংশ সক্রিয় হয়ে জীবনে কার্যকরী ও ফলবতী হয়। এই উভয় অংশের সংযোগেই জীবন চলে। এই দুই অংশের আধ্যাত্মিক নাম যথাক্রমে কারণ অংশ ও কার্য অংশ। কারণ অংশ হল দৈবভাগ বা নিয়তি এবং কার্য অংশ হল পুরুষকার।

মানুষের অতীত অতীত জন্মের চিন্তা ও কর্মের ফলকে তিন ভাগে জ্ঞানিগণ অনুভব করে ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেক জীবনেরই কায়, মন ও বাক্যজাত কর্মের ত্রিবিধ রূপ ও ত্রিবিধ ফল হয়। ত্রিবিধ কর্মের রূপ হল— শুভ, অশুভ ও শুভাশুভ মিশ্রিত। কর্মফলের তিনটি ভাগ আছে, যথা—সঞ্চিত কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম এবং অনাগত কর্ম। এদের মধ্যে প্রারব্ধ কর্মই হল বর্তমান জীবন ও ভোগের কারণ। সঞ্চিত কর্ম সুপ্ত থাকে, অজ্ঞাত থাকে। অনাগত কর্ম হল বর্তমান কর্মের যে ফল তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে কার্যকরী বা ফলবতী হবে। এই ত্রিবিধ কর্মের ফলই হল জীবনরূপ ধারণের ও সংসারবন্ধনের এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি প্রভৃতির মূল কারণ। কর্মফল অমোঘ। সেই জন্য একে দৈব বা নিয়তি বলা হয়। তা অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তার থেকে রেহাই পাবার বা মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হল অবিদ্যা-মায়ামোহের পাশ ছিন্ন করে নিত্যসত্য ঈশ্বরাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিজেকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ, অখণ্ড আত্মা বা ঈশ্বর রূপে অনুভব না-করা পর্যন্ত কর্মফলের প্রভাবমুক্ত হওয়া যায় না; প্রভাব সূক্ষ্ম ভাবে থাকেই। অপর পক্ষে এটাও বলা চলে যে কর্মফলের প্রভাবমুক্ত না-হলে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ঈশ্বরাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

নিরন্তর বিচারপূর্বক ইষ্টচিন্তা বা আত্মধ্যান দ্বারা অন্তরে যে বিবেক-বৈরাগ্য জাগে তার ফলে মুক্তির তীব্র ইচ্ছা জাগে। ঈশ্বরাত্মার বা সত্যদর্শনের জন্য তখন চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেই চিত্ত সংসারে জড়িয়ে পড়ে না। সংসার থেকে বেরিয়ে মুক্ত হবার জন্য, সমস্ত মায়ামোহের বন্ধন খণ্ডন করার জন্য সে তখন তীব্র ও ব্যাকুল ভাবে নিরলস প্রচেষ্টা করে। তার কাছে একমাত্র ঈশ্বরাত্মাই সত্য; তদতিরিক্ত কোনও সত্য, পূর্ণতা, সুখ, আনন্দ ও শান্তির উৎস নেই, দ্বিতীয় কোনও বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কর্মের উদ্দেশ্য ও ফল নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবেক-বৈরাগ্য আবৃত থাকে অবিদ্যা-অজ্ঞানের দ্বারা। বহু জন্মের সুকৃতি ও পুণ্যের ফলে এবং সাধুসঙ্গের ফলে সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মের ইচ্ছা ও সুযোগ ঘটে। তার দ্বারা তৈরি হয় সৎ সংস্কার। এই সত্য সংস্কারের প্রভাবে জীবন বহু সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে। তার ফলে তার বিবেক-বৈরাগ্য জাগে। বিবেক-বৈরাগ্য জাগার পরে সত্যবস্তু লাভের জন্য তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা জাগে। তখন বিবেক-বৈরাগ্যের ফল শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি রূপে প্রকাশ পায়। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি যোগে সাধুসঙ্গ করে সাধুসন্তের নির্দেশে সাধনভজন শুরু হয়। তা সংসারের মধ্যে থেকেও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করে অন্তরের বিবেক, বৈরাগ্য ও অনাসক্তির মানের উপরে।

সংসারীদের জন্য ধর্মের যে-সকল নির্দেশ আছে তার দ্বারা কিছু সৎ কর্মের অনুষ্ঠান ও সত্য সংস্কার লাভের সুযোগ হয় বটে কিন্তু সত্য যথার্থ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারণ সত্য নির্ণয় ইন্দ্রিয়, মন দ্বারা কখনওই সম্ভব নয়। সত্যবোধের দ্বারা সত্যকে জানা যায়, অনুভব করা যায়। এই সত্যবোধ হল আত্মবোধ বা ঈশ্বরবোধ।

আঠাশ

অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ বাহ্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্তঃকরণ বলতে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারটিকেই বোঝায়। যে কোনও একটির দ্বারাই অন্তরকে নির্দেশ করা হয়। এক অন্তঃকরণই ক্রিয়া ভেদে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত রূপে প্রকাশ পায়। মনের কাজ হল সংকল্প ও বিকল্প অর্থাৎ কিছু চিন্তা করা বা ভাবনা করা। বুদ্ধির কাজ হল কোনও কিছুর স্বরূপকে চিন্তা অনুরূপ বিচারপূর্বক যথার্থ ভাবে প্রকাশ করা বা জানিয়ে দেওয়া। অহংকারের কাজ হল দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহযুক্ত আমি-ই আত্মা এই ধারণা পোষণ করে নিজেকে অপর থেকে ও অপরকে নিজ থেকে পৃথক ভাবা, দেখা ও জানা। চিত্তের কাজ হল পূর্ব পূর্ব জ্ঞাত ও অনুভূত অংশ (সংস্কার) বিশেষকে পুনরায় উপভোগ করার জন্য স্মৃতিরূপে অহংকারকে সাহায্য করা। এ সবই হল অবিদ্যামায়ার খেলা। অবিদ্যাজাত অহংকার-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি তিন গুণ (সত্ত্ব রজ তম) জাত বলে তিন গুণের প্রভাবে তিন রকম ভাব থেকে বহুতর ভাবে কার্য করে। সেই জন্য তামসিক মন-বুদ্ধি-অহংকার, রাজসিক মন-বুদ্ধি-অহংকার এবং সাত্ত্বিক মন-বুদ্ধি-অহংকার সংসারে দেখা যায়। তাছাড়াও একাধিক বা বহু গুণের মিশ্রণে বহুবিধ মিশ্র ভাবের লক্ষণ যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেহে বহু ভঙ্গিমায় লীলায়িত হয়। সেই জন্য জীবের মধ্যে তথা মানুষের মধ্যে নানা ভঙ্গিমায় বৈচিত্র্যময় স্বভাবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ত্রিগুণের প্রভাবেই তা সম্ভব হয়। গুণের রাজ্যই হল বিশ্বসংসার। গুণাতীতে সমসার, ভেদ-দ্বন্দ্বরহিত, আকার-প্রকার-বিকাররহিত, সমরসসার, একরসসার।

এগুলি সবই গুণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে হয় বলে জীবনের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক রূপে বা ভেদরূপে প্রতীয়মান হয়। অহংকারই কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা সেজে জীবনের সব কিছু ভোগ করে। তা যথার্থ ভাবে বুঝবার জন্যই বিশদ ভাবে নানা দিক থেকে বিষয়ের সত্যতা ধরিয়ে দেওয়া হয়। সব রকম ভাবে বোঝার মূলে যে এক নিত্য শুদ্ধবোধ নিহিত তা যাতে স্পষ্ট ভাবে অনুভবগম্য হয় তার জন্যই (জীবনের সর্বস্তরে সামগ্রিক বিশ্লেষণ স্বানুভূতির দৃষ্টিতে যে ভাবে ধরা পড়ে বা অনুভূত হয়) তারই কিছু নমুনা ও লক্ষণ ব্যক্ত করা হল।

তামসিক ও রাজসিক অহংকারযুক্ত মানুষই হল সংসারবদ্ধ জীব। সাত্ত্বিক অহংকার জীবন্মুক্তির জন্য, সংসারবন্ধন খণ্ডনের জন্য, ঈশ্বরাত্মা সত্যদর্শনের জন্য তীব্র বৈরাগ্যযোগে সাধুসঙ্গ করে তাঁদের নির্দেশে অতীব নিষ্ঠাসহকারে অধ্যাত্মসাধনা করে। তাঁদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস শুদ্ধসত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাঁরা যেমন নিরলস ভাবে সাধনাতে আত্মনিয়োগ করেন তেমনই ব্যাকুলচিত্তে সত্যানুভূতির জন্য তীব্র সাধনা করেন। তাঁদের স্বভাবে তম ও রজোগুণের প্রভাব নির্মূল হয়ে যায়। এমনকী সত্ত্বগুণের প্রভাবও পরিশেষে থাকে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে তম ও রজোগুণের প্রভাব বেশি থাকে বলে তাদের অহংকার ও বুদ্ধি মলিন, মোহগ্রস্ত ও সংসারবদ্ধ থাকে। তখন পরিদৃশ্যমান ও আপাতমনোরম আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সংসারের পরিবেশকে সত্য বলেই মনে করে। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তম ও রজোগুণের প্রভাব কিছুটা শিথিল হয় কিন্তু মুক্ত হয় না। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে সাধনভজন হলে শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাব প্রকাশ পায় ও বাড়ে। তার ফলে সত্ত্বগুণের মল বা বিকার সরে যায়। তখনই আসে জীবনে দিব্যবোধ, অনুভূতি, শক্তি ও আনন্দের উত্তরোত্তর প্রকাশ ও স্বানুভূতি। এই দিব্যানুভূতির প্রকাশ হতে থাকলে তার জ্যোতিতে জাগতিক ব্যাপারের সত্যরহস্য প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়।

দিব্যানুভূতির মানে হল আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি। তা অবিদ্যামায়াজাত সর্বসংস্কারের প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ। এ-ই হল মুক্তি ও শান্তির স্বরূপ, গুণাতীত ভাবাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত, যা সর্বাত্মা সর্বেশ্বর শিববিষ্ণু শিবরাম হরিহরের স্বরূপ। এই সত্যবোধের দৃষ্টিতে মায়া, মোহ, অজ্ঞান, জগৎভ্রান্তি ও ভীতি থাকে না। কিন্তু জগতের ব্যবহারিক রূপ থাকে, তা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। তা পূর্বাপর যেমন ছিল তেমনই থাকে কেবল তার সত্যতা বা সত্যস্বরূপ আপনবোধে আত্মবোধে নিরন্তর ফুটে ওঠে। অর্থাৎ আপনবোধস্বরূপ আত্মা

ছাড়া জগতের পৃথক কোনও রূপ অনুভূত হয় না। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান আত্মবোধেরই লীলায়িত রূপ। তাতে সব একবোধেরই প্রকাশ বলে সমবোধ ব্যাহত হয় না। কোনও বিকার তাকে স্পর্শ করে না। সর্ববিকারের ঊর্ধ্বে, নির্বিকার, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাভাস, নিরবলম্ব, বিশুদ্ধ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মার বা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে মিশে থাকে। এইরূপ জীবনকেই মুক্তজীবন বা দিব্যজীবন বলা হয়।

"কথাগুলি তোমাদের কাছে খুব পরিচিত বা সহজবোধ্য মনে নাও হতে পারে, কিন্তু বুঝবার জন্য কথাগুলো বলা হল, ভুল ভাঙ্গাবার জন্যই কথাগুলো বলা হল।

গতানুগতিক জীবন ও সংস্কার সবই বিকাবাধীন। এখানে মানুষের অহংকার শুদ্ধ নয় বলে অবিদ্যা মোহ আবরণে ঢাকা আত্মার বা ঈশ্বরের সত্য পরিচয় মানুষ পায় না। মানুষ মিথ্যা মায়ামোহকেই সত্য বলে ভুল করে গ্রহণ করে ও ব্যবহার করে। তার কাছে যে সত্যবোধ তা আপেক্ষিক সত্য বলে পবম সত্যের অনুভূতি তার হয় না। পরম সত্যের অনুভূতি ছাড়া কেবলমাত্র আপেক্ষিক সত্যের ধারণা দ্বারা জীবন পরম সুখ ও শান্তি অনুভব করতে পারে না। অনন্ত সুখ ও অনন্ত শান্তিই যেখানে পরম লক্ষ্য সেখানে আপেক্ষিক সুখ ও সত্য হেয় বলে পরিত্যাজ্য। প্রেয়কে ত্যাগ না-করলে শ্রেযকে পাওয়া যায় না। চবমের বা পবমের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে তাঁকে ভালবাসতে হয়, তাঁকে আপন করে জানতে হয়, ভাবতে হয় এবং তাঁকে আপন জেনে সেবা করতে হয়। সসীমকে, অস্থায়ী বিকারী বস্তুকে, ব্যক্তিকে, কর্ম ও কর্মফলকে ভালবাসাই হল আসক্তি। এর পরিণাম দুঃখকষ্ট। এ সবের প্রতি বিচারপূর্বক যে বিরক্তি তা-ই চরম ও পরমের প্রতি আসক্তি এনে দেয়। বিষয়কে ভালবাসলে আর বিষ্ণুকে ভালবাসা যায় না। আবার বিষ্ণুকে ভালবাসলে ও জানলে বিষয়ের প্রতি মোহ, আসক্তি ও ভালবাসা থাকে না। বিষ্ণু হল আত্মা, বিষয় হল অনাত্মা। আত্মার প্রতি প্রেম ভালবাসাই হল পরম সত্য এবং অনাত্মার প্রতি আসক্তি হল মোহ-ভ্রান্তি এবং তার ফল হল মিথ্যা, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্ট। যদিও অনাত্মার প্রতি আসক্তি এবং ভোগ আপাতদৃষ্টিতে মনোরম, সত্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তথাপি আত্মবোধের দৃষ্টিতে তা মিথ্যা, মায়া ও অসত্য। সেই জন্যই তা পরিত্যজ্য। একে পরিত্যাগ না-করলে আত্মবোধের দৃষ্টি পাওয়া যায় না। মিথ্যাকে সত্য বলে জানা এবং সত্যকে মিথ্যা বলে জানা, উভয়ই মায়া। মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানা এবং সত্যকে সত্য বলে জানা হল সত্যময়ী মায়েব বা আত্মবোধেব বৈশিষ্ট্য।

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করাই হল জীবনসাধনার তাৎপর্য। এই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না-করা পর্যন্ত জীবন চলে অনাত্মার প্রভাবে অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার প্রভাবে। তার ফলে ঈশ্বরাত্মা অতিরিক্ত কেবলমাত্র দেহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবজগৎই হল সত্য—এই ধারণাই প্রবল হয়। এই ধারণার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি অধিক দৃঢ় হয় এবং দেহ-প্রীতি, স্থূল বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং জীবনে প্রেয়বোধের প্রাধান্য বেড়ে যায়। তার ফলে অন্তরে সূক্ষ্মবোধের বা শ্রেয়বোধের বিকাশ বা প্রকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয়ভোগের ফলে সহজেই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন রোগ ও ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে কিন্তু ভোগেচ্ছা বা তৃষ্ণা কমেও না, মরেও না বরঞ্চ তা অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। তখন সাধ বাড়ে সাধ্য কমে। এ-ই হল প্রেয়বোধের পরিণাম।

কিন্তু শ্রেয়বোধের আশ্রয়ে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বিবেক-বৈরাগ্যের জাগরণে সাধ্য বাড়ে, সাধ কমে; এমনকী সাধ থাকেই না। শ্রেয়বোধের পরিণামে অনাত্মার মোহবন্ধন আপনিই বিদূরিত হয়। সংসারেব মায়া-মোহ-আসক্তি আর থাকে না। সংসার তখন হয় সম + সার। তা বিশেষ ভাবে সত্যানুভূতির ফলশ্রুতি। সমসার হল সমবোধে সুসংস্থিতি, সমবোধের ব্যবহার, সমবোধে বিহার। এই সমবোধই হল অখণ্ড আপনবোধ, আত্মবোধ বা ঈশ্বরবোধ। তার-ই অপর নাম সত্যবোধ। সত্য হল অখণ্ড রসসার, রসসিন্ধু। এই রসসিন্ধুতে পরিপূর্ণ অবগাহনের জন্যই এই সত্যবোধের বিজ্ঞান যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় বলা হল। এই রসসাগরে ডুব দিলে জীবন রসময় হয়। এই রস অমৃতরস। এ শুধু সত্যময় নয়, এ বিশুদ্ধ বোধময়, আনন্দময়, অমৃতময়,

প্রেমময়, ভূমা সুখময় ও শান্তিময়। এই রসসাগরে ডুব দিলে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে অর্থাৎ দিব্যজীবন লাভ হবে। এই দিব্যজীবনে সত্যই শুধু অধঃ, উর্ধ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে, ডাইনে, বামে, অন্তরে, বাইরে ও সর্বন্তরে সমবোধে অনুভূত হবে। জীবন হবে রসগোল্লা। তার যেখানেই আস্বাদন করবে এক রসেরই আস্বাদন পাবে। এ-ই হল আত্মবোধের, ঈশ্বরবোধের ও সত্যবোধের তাৎপর্য। নিমন্ত্রণবাড়িতে রসগোল্লা পরিবেশন হয় সবার শেষে। মায়ের আমি যে নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছে তাতে শুক্‌তো থেকে আরম্ভ করে সব পদই আছে। সব পদ না-খেলে নিমন্ত্রণ খাওয়া হয় না এবং নিমন্ত্রণ না-খেলে খাওয়ার পরিপূর্ণ তৃপ্তিও হয় না। পরিপূর্ণ তৃপ্তি না-হলে পূর্ণানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। পূর্ণানন্দের আস্বাদন বিনা জীবন ধন্যও হয় না, মুক্তও হয় না এবং শান্তিতেও প্রতিষ্ঠা হয় না। সেই জন্য সচ্চিদানন্দময়ী মা অমৃতসুধা আত্মরসের সামগ্রিক তত্ত্ব ও সত্য বিকাশের জন্য ও প্রকাশের জন্য যে বিপুল আয়োজন করেছেন তাতে সর্বসম্ভারের সমাবেশ আছে। তার দ্বারাই হয়েছে এই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা। এই নিমন্ত্রণ হল নি + মন্ত্রণ। যা গ্রহণে মনের হয় শোধন, পূরণ, পুষ্টি, তুষ্টি ও রূপান্তর। মন হয়ে যায় তখন উল্টো 'নম'। এই 'নম'-র রহস্যে উদ্বোধিত হয়ে মন হয় অ-মন। অ-মন হবার পরে তা-ই হয় আত্মন, তা-ই ব্রহ্মণ, তা-ই হল পরম সত্য। রস পরিবেশনের দ্বারা রসবোধ জাগে। এই রস খেয়ে রসসাগরে ডুব দিয়ে রসগোল্লা হয়ে যাও। রসে ডুবলেই রসগোল্লা হয়। রসগোল্লার সর্ব অণু-পরমাণুতে রস সঞ্চার হয়। তার আস্বাদনে রস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। রসগোল্লা হয়ে যাবার পরেই পূর্ণ সমর্পণ সিদ্ধ হয়। রসগোল্লা নিজে খেতে নেই, নিজে ভোগ করতে নেই। ঈশ্বরকে ভোগ নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ প্রীত মনে গ্রহণ করতে হয়। তাঁকে সমর্পণ করে দিলে আর কোনও বিকার থাকে না। এই রস যদি কেউ গ্রহণ না-করে সে শুধু দুঃখকষ্টই পায়। এ সব বিকার থেকে সে সহজে মুক্ত হতে পারে না।

নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ, অমৃতময় আত্মার বক্ষে তাঁরই স্বভাবজাত অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপে প্রতিভাত হয়। অবিদ্যার প্রভাবে হয় সংসার, জীবজগৎ, মোহমায়াজনিত জন্ম-মৃত্যু, দুঃখকষ্ট প্রভৃতি ঘটনার অনুভূতি এবং বিদ্যাশক্তির প্রভাবে হয় উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্মসাধনের বিকাশ ও প্রকাশ এবং দিব্য ও মুক্তজীবনের অনুভূতি ও আস্বাদন, সত্যদর্শন, ঈশ্বরাত্মব্রহ্মদর্শন ও স্বানুভূতি।

অবিদ্যাশক্তির প্রকাশে অখণ্ড ভূমা এক ঈশ্বরাত্মবক্ষে বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ ভাসে কী ভাবে তা-ই বলা হচ্ছে—

অবিদ্যাশক্তির দু'টি ভাগ—একটি হল আবরণশক্তি অপরটি হল বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি হল তমোপ্রধান। সূর্যের তাপে তৈরি মেঘ যেমন সূর্যকেই সাময়িক ভাবে ঢেকে রাখে আবার সরে যায় বা বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে, সেইরূপ আত্মশক্তিজাত এই তামসিক আবরণশক্তি আত্মাকে সাময়িক ভাবে আবৃত করে বা ঢেকে দেয়। তখন আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাইরে প্রকাশ হতে পারে না। এই অবস্থায় তার বিক্ষেপশক্তির খেলা শুরু হয়। বিক্ষেপশক্তি হল রজোগুণের। এই বিক্ষেপশক্তি নানা ভঙ্গিমায় বৈচিত্র্যরূপে নানা ভাবে খেলে বেড়ায়। এই বৈচিত্র্যময় রূপ-নাম-ভাব, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায়। দুই শক্তির পরস্পরযোগে শুদ্ধ নির্মল আত্মবোধের বক্ষে বিকারী, পরিণামী ও বৈচিত্র্যময় এই জীবজগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো জেগে ওঠে বা প্রকাশ পায়। এর মধ্যে দিয়ে যা দেখা, শোনা, জানা ও বোঝা হয় তার কোনওটিই সত্য নয়। সত্যবোধের কোনও প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবোধ নেই, কোনও প্রতিরূপও নেই। তাঁর স্বপক্ষেও কিছু নেই, বিপক্ষেও কিছু নেই। তাঁর আপনও কেউ নেই, পরও কেউ নেই। এক কথায়, তাঁর মধ্যে ভেদ, পার্থক্য, দ্বন্দ্ব, শঙ্কা, সংশয়, ভয় প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। এইরূপ সত্য বোধস্বরূপই হল প্রত্যেকের যথার্থ পরিচয়। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধারণত এই পরিচয়টি জানা যায় না। তবে মন ও বুদ্ধি অধ্যাত্মসাধন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হলে আত্মবোধের অন্তরায় আর থাকে না। মুক্তির বিজ্ঞান সাধনের দ্বারা সাধকগণ এই মন, বুদ্ধি,

ইন্দ্রিয় সংযত করে, তাদের ক্রিয়াকে বন্ধ করে, অতীন্দ্রিয়বোধের স্তরে, শান্ত ভাবে আপনাকে শুদ্ধ আপনবোধ দিয়েই শুধু দর্শন করে। কাজেই জগৎ সত্য কী মিথ্যা তা আত্মবোধের কাছে অবান্তর, অর্থশূন্য কিন্তু অশুদ্ধ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

"মন, বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম হল তা ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম ও কর্মফল সাপেক্ষ। কোনও অবলম্বন ছাড়া মন, বুদ্ধি কাজ করতে পারে না। মন ও বুদ্ধির অবলম্বন হল দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বিষয়, ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম ও কর্মফল। এগুলি সবই বিকারী সুতরাং স্বপ্নের মতো অনিত্য, অলীক, মায়া ও মিথ্যা। বারবার এই চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা সংসারের মোহ বা আসক্তি কিছুটা শিথিল হয় বা কাটে। তখন বিবেকবিচার দ্বারা জানা যায় যে জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি, সংসারের শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি হল কতগুলি মানসিক বিকার, ভ্রান্তি ও কল্পিত কল্পনার বিষয়।

এই কথাগুলি সংসারী মানুষের কাছে মর্মস্পর্শী নয় বরং দুর্বোধ্য ও অপ্রিয়। তারা এগুলিকে গুরুত্ব না-দিয়ে আপাতমনোরম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রিয় ও পরিচিত পরিবেশ, অবস্থা, বস্তু ও ব্যক্তিকে ঘিরে নিমিত্ত কর্মে লিপ্ত থেকে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে। কাজেই তার কাছে আপাত প্রতীয়মান দৃশ্যাবলী বা মনের বিষয়গুলি সত্য বলে মনে হয়। আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির পূর্ণ অবসান না-হলে যথার্থ সত্যের পরিচয় মানুষ কখনও পেতে পারে না এবং মিথ্যাকে সত্য বলে জেনেও সে তৃপ্ত হয় না এবং তার দুর্ভোগও যায় না। আত্মজ্ঞানের স্মরণ-মনন-ধ্যান ব্যতীত এই অবিদ্যামায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

অবিদ্যাজাত অহংকারই জীবনের কর্তা সেজে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের মাধ্যমে এই বিকারজাত সব কিছুর সাথে যুক্ত থাকে এবং সব কিছুর মধ্যে ভোগানন্দ খুঁজে বেড়ায়। তার ফলে সব কিছুর দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হয়। সে-ই কল্পনা করে, কল্পনা অনুরূপ কামনা করে, কামনা অনুসারে কামনাপূরণের জন্য কর্মে লিপ্ত হয় এবং তদনুরূপ কর্ম করে কর্মফল ভোগ করে। প্রীতিকর অবস্থায় সে সুখ বা আরাম ভোগ করে, অপ্রীতিকর অবস্থায় সে দুঃখ ভোগ করে। সুখের তুলনায় তার দুঃখ যখন বেশি হয় তখন সে হায় হায় করে। আবার সুখের ভাগ বেশি হলে অভিমানে সে আরও বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই হল জাগতিক জীবনের একটা বিশেষ দিক। এই বিষয়ে কয়জনই বা সচেতন?

অবিদ্যাশক্তি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অবিদ্যাজাত অহংকারই দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় বিষয় বা ভোগ্য বিষয় আহরণ করে, সংগ্রহ করে ও তা ভোগ করে। এই অহংকার হল আত্মচৈতন্যের আভাসরূপ বা প্রতিবিম্ব। এটি হল জীবভাব—আসল চৈতন্য নয়। এর নিজস্ব কোনও চৈতন্য নেই। এই অহংকার নিজের বক্ষে কল্পনা দ্বারা বহু কিছু আরোপ করে বা সাজিয়ে নেয়। যেমন মানুষ বাড়িঘর তৈরি করে বাইরে থেকে নানা বস্তু এনে বাড়িঘর সাজায়, শূন্য ঘরকে বস্তু সামগ্রী দিয়ে ভর্তি করে নেয়, সেইরূপ বুদ্ধি বা অহংকারও কল্পনার মাধ্যমে দেহঘর তৈরি করে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি, প্রাণাদি, অন্তঃকরণাদি স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ববিধ ভাব ও তার উপকরণাদি সাজিয়ে নেয়। এরই নাম অধ্যারোপ বা অধ্যাস। এই সকল অধ্যাসের মধ্যে দিয়ে যখন আত্মচৈতন্য প্রতিফলিত হয় তা নানাবিধ বিকাররূপে প্রতিভাত হয়। আকাশে যেমন মেঘ সূর্যকে ঢেকে নানা আকৃতি-প্রকৃতিরূপে ফুটে ওঠে—অনেকটা সে রকম।

অন্যান্য কল্পনা ছাড়াও অহংকার তিনটি বিশেষ অবস্থা কল্পনা করে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রৎ অবস্থা ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্যবহার করা হয় এবং স্থূল ও বাহ্য বিষয়গুলি ভোগ করা হয়। স্বপ্নাবস্থায় এই স্থূলজগতের অনুরূপ সূক্ষ্ম জগৎ তৈরি করে, সে জাগ্রৎ অবস্থা অনুরূপ দৃশ্যাবলী কল্পনা করে ভোগ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় সমগ্র অন্তঃকরণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বিশ্রাম করে বা ঘুমায়। সেজন্য সেখানে কোনও কর্তা, কর্ম বা কর্মের ফল থাকে না। সেখানে স্থূল-সূক্ষ্ম জাগ্রৎ স্বপ্নের কর্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদির অভাব দৃষ্ট হয়। সেখানে সব অব্যক্ত।

শুধুমাত্র আত্মচৈতন্য সাক্ষিরূপে বিরাজ করে। এই সর্বাত্মা নিত্যসাক্ষিস্বরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার একমাত্র সাক্ষিরূপে বিরাজ করে। অহংকার জাগ্রৎ অবস্থায় কর্তা সেজে আপন কল্পিত সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তুর উপভোগ করে বা আস্বাদন করে। আত্মা সাক্ষিরূপে তা দর্শন করে। অহংকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অহংকারের কোনও কর্ম বা কর্মফলও তাঁকে স্পর্শ করে না। কাজেই জীবন মানে—অহংকাররূপী কল্পিত কর্তার কর্তৃত্বাভিনয়। সেই জন্য তার আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, সূর্যের মতো উদয়-অস্ত আছে। নিত্যপূর্ণ আত্মার কাছে এ সবই দৃশ্য সুতরাং অনিত্য, অস্থায়ী ও অসত্য। স্বপ্নাবস্থায় অহংকার জাগ্রৎকালীন অনুভূতি অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করে তা আস্বাদন করে। স্বপ্নের দ্রষ্টা ও দৃশ্যাবলী জাগ্রৎকালীন দ্রষ্টা ও দৃশ্যাবলী অনুরূপ হলেও তা সূক্ষ্ম ও স্বল্পকাল স্থায়ী। সে তুলনায় জাগ্রৎকালীন দ্রষ্টা ও দৃশ্যাবলী অধিকতর স্থূল ও স্থায়ী। যাই হোক সবই অহংকারের কল্পনা। তার দু-চার কথায় মন মানে না, মন বোঝেও না। আত্মবিচার দ্বারা অহংকারের মূলে আপনাকে দর্শন করতে পারলে অহংকারের অবসান হয়। তখন সব কল্পনা ও তার কর্তা অহংকারের সমূলে বিনাশ বা অবসান হয়।

অহংকারের নমুনা হল 'আমি-আমার বোধ'। 'আমি' বলতে দেহধারী নিজেকে আত্মা মনে করে। 'আমার' বলতে চারপাশে আত্মীয়পরিজনবোধে যাদের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের বোঝায়। 'আমার বোধশূন্য আমি' হলে আত্মবোধের যোগ্য অধিকারী হয়। কারণ তখন সে আমিবোধের মূল সন্ধান করে অহংকারের মূলে অহংদেব আত্মারামকে খুঁজে পায়। এই আত্মারামই হল প্রাণারাম ভগবান ঈশ্বর স্বয়ং। তা দৃশ্যের মতো ঈশ্বরদর্শন নয়। ছায়াছবির মতো কোনও দর্শনকে সত্য বলে না। সত্যদর্শনের অর্থ হল নিজবোধে আপনবোধে আপনাকে পূর্ণ করে পাওয়া, দেখা ও জানা। তদতিরিক্ত কোনও সত্যবোধ নেই। এর নামই হল আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান। মন ও অহংকারের দর্শন হল জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালীন দৃশ্যাবলীর মতো দৃশ্যরূপে প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুকে দেখা, যেমন সিনেমার পর্দায় চেতন ও অচেতন সব কিছুকেই ছবিরূপে দেখা যায়। সেখানে জীবজগৎ সবই অচেতন দৃশ্য বা ছবি রূপে অনুভূত হয়, জীবন্তরূপে অনুভূত হয় না। জীবন্ত অনুভূতি হল নিজেকে নিজবোধে দেখা। তা বোধের অন্তরে বোধের বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়-মনের বিজ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়-মনের বিজ্ঞান হল যখন পরস্পর পরস্পরকে দৃশ্যরূপে ও পৃথকরূপে দেখা হয় অর্থাৎ ছায়াছবি। নিজের থেকে পৃথক করে সব দেখাই হল জাগতিক, আপেক্ষিক বা প্রাতিভাসিক দর্শন। এই দর্শনে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়েই উভয় থেকে পৃথক। এই দর্শনে একমাত্র দ্রষ্টাই সত্য, দৃশ্য মিথ্যা যেমন যাদুকরের খেলায় যাদুকর সত্য কিন্তু তার যাদুখেলা মিথ্যা।

"সত্য যা তা নিত্যসত্যই, তা কখনও মিথ্যা হয় না এবং মিথ্যা মিথ্যাই, তা কভু সত্য হয় না। এ সব বুঝবার মতো যে যোগ্যতা, সামর্থ্য বা জ্ঞান তা সাধারণের হৃদয়ে আবৃত থাকে। এই হৃদয়ক্ষেত্রই হল ঈশ্বরাত্মার নিত্যবাস ও লীলাভূমি। হৃদয়ের আর এক নাম বুদ্ধি। সুতরাং বুদ্ধিগুহার অর্থ হল হৃদয়গুহা। এই গুহার তাৎপর্য অহংকার বা মন জীবনে সহজে পায় না বা জানে না। সে গুহার বাইরে সত্য সন্ধান করে বেড়ায়। এই গুহার বাইরে পাঁচটি দেওয়াল বা কোষ আছে যা অবিদ্যা ও অহংকার দ্বারা গঠিত। এই পঞ্চকোষ হল পঞ্চ আবরণ। তরোয়ালের যেমন খাপ আছে যার মধ্যে তরোয়াল থাকে, সেইরূপ এই কোষগুলি হল খাপের অন্তরে খাপের মতো। সর্বাপেক্ষা বাহ্য খাপ বা আবরণ হল আমাদের এই অন্নময় স্থূলদেহ। তা ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা তৈরি, তার দ্বারাই পুষ্ট এবং তার বিকৃত ব্যবহারে বা অভাবে তা বিনষ্ট হয়। আত্মার নিজস্ব কোনও দেহ নেই। অবিদ্যামায়ার প্রভাবে অহংকারযোগে তার তিনটি দেহ তৈরি হয়। তার স্থূল দেহ হল বাহ্য অন্নময় কোষে তৈরি। অন্নময় কোষের বিশেষ লক্ষণ হল যে তার উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। তা জড়, অচেতন এবং স্থূল পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে গঠিত। তা মনের দৃশ্য এবং অন্যান্য কোষের বাহ্য

পোশাক বা আবরণ। অন্ন দ্বারা তৈরি ও পুষ্ট বলে একে অন্নময় কোষ বলা হয়। এই কোষের অভ্যন্তরে এর চেয়ে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আরও একটি কোষ আছে, তার নাম প্রাণময় কোষ।

প্রাণময় কোষ বায়ু দ্বারা গঠিত। এই কোষ অন্নময় কোষকে ব্যবহার করে এবং তাকে পরিচালিত করে। এই কোষের বৈশিষ্ট্য হল যে তা গতিশীল, ক্রিয়াশীল এবং স্পন্দনশীল। তার বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুৎপিপাসা, গতাগতি, বিকৃতি, পরিণাম ও ব্যাধি। সুতরাং তা অস্থায়ী ও অশান্ত এবং বিকারী বলে তা শুদ্ধ বা পূর্ণ নয়। তার অন্তরে তা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আর একটি কোষ আছে, তার নাম মনোময় কোষ।

এই মনোময় কোষ চৈতন্যের আভাস দ্বারা গঠিত। এর বৈশিষ্ট্য হল 'আমি-আমার কল্পনা' এবং তার দ্বারা অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে পৃথকরূপে ভাবা, জানা বা দেখা এবং সর্ববিধ পার্থক্য সৃষ্টি করা। শুধু তাই নয়, কর্তা অহংকারের ভোগের নিমিত্ত নানাবিধ উপকরণাদি কল্পনা করে সৃষ্টি করে এবং ভোগ্য সম্ভার সরবরাহ করে। এ হল মনের কাজ। এর বিশেষ লক্ষণ হল কামনা, সংকল্প-বিকল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী (লজ্জা), ভী (ভয়), ধী (মেধা)—এই দশবৃত্তি। চিন্তা ও ভাবনার সমষ্টি বলে তা অস্থির, চঞ্চল ও অশান্ত। সমস্ত ভেদসৃষ্টির কারণ এই মনোময় কোষ বৈচিত্র্য সৃষ্টির কাজে সদাই রত। এর নিজস্ব কিছু না-থাকলেও এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে নিজেকেও জানে না এবং অপরকেও জানে না। সুতরাং মনের ধারণা বা বোধ কখনও শুদ্ধ আত্মবোধের পরিচয় পায় না। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মন যখন বিশ্রাম করে তখনই হয় নিদ্রা বা সুষুপ্তি। সুষুপ্তির গভীরে ডুবে যাবার আগে এ স্বপ্নময় স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। আবার সুষুপ্তি ভঙ্গ হয়ে জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরে আসার সময়ও স্বপ্নময় অবস্থার বা স্তরের মধ্যে দিয়েই ফিরে আসে। সুতরাং জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই দুইয়ের সঙ্গে স্বপ্নময় অবস্থার দু'বার পরিচয় হয়। স্বপ্নময় স্তরে অবস্থানকালে স্বপ্নদর্শন হয় কিন্তু অবস্থান না-করে সেই স্তরের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গমনাগমন কালে কখনও কখনও স্বল্প স্বপ্নাভাস জেগে উঠলেও জাগ্রৎ অবস্থায় তা মনে থাকে না। স্বপ্নভঙ্গের পর স্বপ্নের স্মৃতি সমান ভাবে ক্রিয়া করে না। জাগ্রৎকালীন দৃশ্যানুভূতির যেমন ভ্রান্তি বা বিস্মৃতি ঘটে স্বপ্নকালীন দৃশ্যাবলীরও তেমন ভ্রান্তি বা বিস্মৃতি ঘটে। কোনও কোনও স্বপ্নের স্মৃতি বিশেষ ভাবে মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। কোনও কোনও স্বপ্নের স্মৃতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে অধিকাংশ স্বপ্নেরই পশ্চাতে থাকে জাগ্রৎকালীন চিন্তা ও কর্মের সূক্ষ্ম সংস্কারের প্রভাব। অবশ্য কদাচিৎ কখনও কখনও এমন পর্যায়ের স্বপ্ন হয় যেগুলির সঙ্গে বর্তমান জীবনের কোনও ঘটনার স্মৃতি, কোনও চিন্তা ও কোনও কর্মের স্মৃতির কোনও যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের দ্বিবিধ কারণ আছে। প্রথমটি হল বহু সূক্ষ্ম সংস্কারের মিশ্রিত প্রভাবজনিত ক্রিয়ার ফল এবং দ্বিতীয়টি হল অতীত অতীত জন্মের সূক্ষ্ম সংস্কারের প্রভাবজনিত ক্রিয়ার ফল। ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর দৃশ্য কখনও কখনও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যকালে অবচেতন মনের প্রান্তদেশে ফুটে ওঠে বা প্রতিফলিত হয়।

স্বপ্নতত্ত্বাদি মানসধর্ম। সাধারণ মনের চেতনাকে যে-ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তা হল—

(১) জাগ্রৎকালীন চেতন মন। ইন্দ্রিয়, মনের ব্যবহারাদি এই চেতন মনের দ্বারাই সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয় সংগ্রহ করে এই চেতন মনের কাছে পৌঁছে দেয়। মন তা গ্রহণ করে হৃদয়স্থ বুদ্ধির কাছে এবং বুদ্ধি পরম বোধস্বরূপ আত্মার কাছে পৌঁছে দেয়। পরম বোধস্বরূপ আত্মা অনতিবিলম্বে চোখের নিমেষে সেই বোধকে আবার তাঁর স্বয়ংপ্রকাশ ধর্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় আপনবক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি তার সাড়া পায়। বুদ্ধির মধ্যে জেগে ওঠে সেই বোধের স্পন্দন। বুদ্ধির থেকে নেমে আসে মনে এবং মন থেকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় সেই বোধ। তাকেই বলে অনুভূতি। তাকেই বলে ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি। তা-ই হল বিষয়-অনুরূপ বিষয়ের ধারণা, কল্পনা ও বিষয়জ্ঞান বা চেতন।

(২) অবচেতন মন। জাগ্রৎকালীন অতৃপ্ত ভোগেচ্ছাকামের একটা বিরাট অংশ যা চেতন মনের জাগ্রৎকালীন ব্যবহারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বা অসমাপ্ত থেকে, অপূর্ণ থেকে পূর্ণ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বা প্রতীক্ষায় থেকে নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অবচেতন মনে জমা হয়। সেখান থেকে সুযোগ বুঝে স্বপ্নকালে আত্মপ্রকাশ করে। বলপূর্বক যে-সব ভোগেচ্ছা কামকে দাবিয়ে রাখা হয়, লোকলজ্জার ভয়ে যে-সকল ভোগেচ্ছা কাম আত্মপ্রকাশ করতে পারে না অথবা ধর্মীয় নীতির অনুশাসনে আত্মসংযমের বিকৃত ব্যবহারের ফলে যে-সকল ভোগেচ্ছা কাম অন্তরে সুপ্ত থাকে তা অবচেতন মনেই বাসা বাঁধে। অবচেতন মনের মধ্যে এ রকম বহু কামনা-বাসনার সংস্কার বিকৃত ভাবে জমা থাকে। এ সবই স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ও ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করে। সুযোগ বুঝে কখনও কখনও জাগ্রৎকালে অর্থাৎ চেতন মনেও প্রকাশিত হয়ে তারা প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে নানাবিধ অবৈধ, দুর্নীতিপূর্ণ, অশুভ, অধার্মিক, গর্হিত ও নিন্দনীয় নিম্ন প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মন বহুবিধ কুকাজ করে ও পশুর মতো আচরণ করে এবং তদনুরূপ ফল ভোগ করে।

(৩) মনের আর একটি স্তর হল অচেতন মন। গাঢ় নিদ্রার সঙ্গে এর পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অবশ্য মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি সব অচেতন মনেরই লক্ষণ। সুষুপ্তির সঙ্গে এর বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। আবার সমাধির সঙ্গে মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা ও সুষুপ্তির বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও এদের প্রত্যেকেরই অন্তর্লক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। মৃত্যুর সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা ও সমাধির বাহ্য সাদৃশ্য আছে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও আছে। অচেতন মনের সঙ্গে এদের বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক ভেদ বা পার্থক্য কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধদের কাছেই ধরা পড়ে। সাধারণের কাছে ধরা পড়ে না।

(৪) সর্বোপরি হল অতিচেতন মন বা অতিমানস। এর অপর নাম দিব্যচেতন মন বা পূর্ণচেতন মন। এই পূর্ণচেতন মন তার সামগ্রিক ও সর্বোত্তম অবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মচেতনের সঙ্গে অভিন্ন। এক কথায়, তা আত্মচেতনই স্বয়ং। তাতে শুধু চৈতন্যই চৈতন্যময়রূপে অনুভূত হয়, অন্যবোধ বা অন্যচেতনা সেখানে থাকে না বা থাকা সম্ভবও নয়। আত্মচেতনা থেকে যে মনের প্রকাশ ও বিকাশ হয় তার বিজ্ঞানের সাধারণ দিক ও পারমার্থিক দিক সম্বন্ধেও একটু আভাস দেওয়া হল। এর মধ্যে সার অংশ হল—চেতনের চেতনস্বরূপতা হল নিত্য, পূর্ণ, বিশুদ্ধ, অখণ্ড ও মুক্ত। কিন্তু তার ব্যবহারিক রূপ বা সক্রিয় প্রকাশরূপ, যা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, প্রতিবিম্বিত হয়, প্রতিফলিত হয়, তার ফলাফলের মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ দৃষ্ট হয় ও যার সামগ্রিক রূপ হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তা সর্বতোভাবে মনোময়, মনের দ্বারাই জাত, মনের দ্বারাই বিধৃত এবং মনের দ্বারাই অনুভূত। এই মানস স্তর ও পরমবোধির স্তরের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত জীবন চক্রাকারে মানস স্তরগুলির মধ্যেই বিচরণ করে। সমগ্র মানস স্তরই হল অবিদ্যা স্তর। তবে শুদ্ধ মানস স্তর বা অতিমানস স্তর বলে যা বলা হয়েছে তা হল বিদ্যাশক্তি বা দিব্যশক্তির স্তর। ঈশ্বরাত্মার লীলা হয় এই বিদ্যাশক্তিযোগে এবং সাধারণ জীবজগতের প্রকাশ হয় অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে। বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তির এই পার্থক্য কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধদের কাছেই সুস্পষ্ট, অপরের কাছে নয়। কারণ যদবধি অবিদ্যার প্রভাব থাকে তদবধি বিদ্যার পরিচয় জানা যায় না। আবার বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যাও তার কার্যাদি থেকে নিবৃত্ত হয় বলে অবিদ্যার কোনও লক্ষণ আর থাকে না। তাই বলা হয়, বিদ্যার ফল হল অসদ্‌নিবৃত্তি এবং অবিদ্যার ফল হল অসদ্‌প্রবৃত্তি। সুতরাং অবিদ্যা অজ্ঞানের মধ্যেই জগৎসংসার ভাসে এবং বিদ্যার উদয়ে বা জ্ঞানোদয়ে জগৎসংসার নিবৃত্ত হয়। অনুভূতির প্রকাশের পূর্ব অবস্থা বা প্রস্তুতি এবং পরবর্তী অবস্থার বা ফলশ্রুতির উল্লেখ করে প্রসঙ্গটি বলা হল।

অবিদ্যাশক্তির প্রভাবমুক্ত হওয়া যায় বিদ্যাশক্তির সাহায্যে। এই বিদ্যাশক্তির অধিকারী হল দেবমানবগণ, মুক্তপুরুষগণ, অনুভবসিদ্ধ মহাত্মাগণ। তাঁদের কথাই বারবার উল্লেখ করা হল জীবনকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত করে

তার দিব্যরূপায়ণের জন্য, এক কথায়, হারানো আপনস্বরূপকে ফিরে পাবার জন্য, স্বঘরে স্ববোধে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য।

এই মনোময় কোষের অন্তরে আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আর একটি কোষ আছে, তার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষই হল বুদ্ধিক্ষেত্র। এর দশবিধ বৃত্তি হল—বিচার, স্মৃতি, মেধা, ধ্যান, নিষ্ঠা, সত্যধারণা বা শ্রদ্ধা, বিবেক, জ্ঞান, সুখানুভূতি ও অস্মিতা বা অহংবোধ। এই দশবৃত্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানময় কোষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই ত্রিবিধ কোষের সংযোগে সূক্ষ্ম দেহ গঠিত। এই সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। বাইরে থেকে তাকে দেখাও যায় না, জানাও যায় না। ধ্যানের গভীরে বা স্বপ্নাবস্থায় আমাদের যোগাযোগ এই দেহের সঙ্গে হয়। জাগ্রৎ অবস্থার কার্যাবলী সবই যেমন অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের সংযোগে গঠিত স্থূল দেহের মাধ্যমে হয় সেইরূপ স্বপ্ন ও ধ্যানাবস্থার কার্যাবলী প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সংযোগে গঠিত সূক্ষ্ম দেহের মাধ্যমে হয়। এই সূক্ষ্ম দেহই হল তৈজস দেহ। অর্থাৎ জ্যোতি আভাস দেহ। এটি আত্মার প্রকাশমাধ্যম। কারণ এর একাংশ অর্থাৎ ঊর্ধ্বাংশ আত্মার সঙ্গে যুক্ত এবং বহিরাংশ স্থূল বাহ্য জগতের সঙ্গে অর্থাৎ স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত। এই বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে নিহিত আছে অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আনন্দময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ যেমন আত্মা ও চৈতন্যের জ্যোতিতে প্রভাসিত বা উদ্ভাসিত এবং সেই প্রকাশজ্যোতিতে সে সর্ববস্তু প্রকাশেব যোগ্যতা লাভ করেছে বলে জ্ঞাতা সেজে সে জীবনের সমস্ত ব্যাপারকে অনুভব করতে পারে, সেইরূপ আর অন্য কোনও কোষ পারে না। সব কিছুকে নির্ণয় করার ও প্রকাশ করার যোগ্যতা বিজ্ঞানময় কোষের আছে বলেই বুদ্ধির উৎকর্ষের উপরেই জীবধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যদিও বুদ্ধির উৎকর্ষ বা অনুভূতি পরম সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য, তথাপি এই জীবজগতে তা সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য এবং ভ্রান্তিবশত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

আনন্দময় কোষের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নময় অবস্থার একান্ত অভাব পবিলক্ষিত হয় এবং বৈচিত্র্যহীন একত্বের বা সমত্বের যে ভিত্তি অখণ্ড আনন্দসত্তা, তারই আভাস হল এই কোষের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তা স্থায়ী নয় বিকারী, সেই জন্য অন্যান্য কোষের কারণ অধিষ্ঠান হয়েও তা কালাধীন। সুতরাং মিথ্যা ও অসত্য। তা অবিদ্যামায়ার প্রকাশবিকাশ ও ব্যবহার বলে বিজ্ঞানদৃষ্টিতে অনিত্য ও মিথ্যারূপে স্বীকৃত। গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তির সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ। সুষুপ্তির অবস্থাই হল আনন্দময় কোষের বিশেষ প্রকাশ অবস্থা। এই অবস্থাই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বীজ অবস্থা বা কারণ অবস্থা। এই কোষের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী প্রকাশ পায় সুষুপ্তি অবস্থায় ও সমাধি অবস্থায়। সুষুপ্তি অর্থ গাঢ় নিদ্রা যখন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব নিষ্ক্রিয় থাকে। তখন নিরপেক্ষ সাক্ষী-আত্মা শুধু বর্তমান থাকে। সেই জন্য তা হল জীবাত্মাব কারণ শরীর। এর মাধ্যমেই আত্মা প্রকাশিত হয় বলে একে আত্মার প্রকাশমাধ্যম বলা হয়। সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় স্মৃতি ও তার কার্যাবলীও সুপ্ত থাকে। এই কোষ আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটে বলে ও আত্মার সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে, আনন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম তাতে ব্যাপক ভাবে বা সম্যক্ ভাবে প্রতিফলিত হয়। আনন্দ আভাসই হল এই কোষের বৈশিষ্ট্য।

আনন্দের পূর্ণ সংজ্ঞা হল যা অখণ্ড, ভূমা, অপরিণামী, নির্বিকার, নিববচ্ছিন্ন, অবিভক্ত, নির্বিশেষ এবং বাক্য, মন ও বুদ্ধির অতীত। সেই জন্য তাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। আনন্দময় কোষ ভূমা আনন্দের যথার্থ স্বরূপ নয়, সর্বোত্তম আভাস মাত্র, কারণ তা অবিদ্যামায়ার প্রকাশজাত। এটি অবগত না-হলে যথার্থ আনন্দস্বরূপ আত্মার সঙ্গে এর পার্থক্য বা ভেদ জানা যায় না, ফলে আত্মসত্তার বোধ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। ইংরাজীতে একে বলে unmanifested (অব্যক্ত)। এ-ই হল সমস্ত অজ্ঞানের পূর্ণ ভূমি। এই অব্যক্তই হল সমস্ত সৃষ্টির কারণ বা বীজ অবস্থা। এই অব্যক্তই হল সমগ্র অজ্ঞানের মূল ক্ষেত্র। এরই নামান্তর হল কারণ শরীর। এ-ই হল আবার ঈশ্বরক্ষেত্র—সুষুপ্তি হল এর বিশেষ প্রকাশলক্ষণ। সুষুপ্তিতে প্রলীন জীবচৈতন্যের নাম হল প্রাজ্ঞ।

আব কারণ শরীরের অধিষ্ঠান চৈতন্যের নাম হল ঈশ্বর। (ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানসম্পন্ন। জীবের শক্তি ও জ্ঞান হল গুণাধীন ও সসীম। ঈশ্বরের উপাধি মায়া, জীবের উপাধি পঞ্চকোষাদি। উপাধিশূন্য অবস্থায় উভয়ই এক চৈতন্য। উভয়ের ভেদ হল দ্বৈতানুভূতি ও অভেদ হল অদ্বৈতানুভূতি। উপাধিযোগে ভেদ ও উপাধিনাশে অভেদজ্ঞানে স্থিতি।) মায়ার কার্য জগৎ ও জগতের কারণ অজ্ঞান মায়া। জীব অজ্ঞান মায়ার অধীন বলে ভ্রান্ত ও বদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বর মায়াধীশ বলে শুদ্ধ, মুক্ত এবং প্রভু ও বিভু। জীবের অজ্ঞান মায়া নিরসন হয় বিদ্যার উদয়ে বা জ্ঞানোদয়ে। তখন ঈশ্বর-আত্মার সঙ্গে সে অভিন্ন ও ঐক্য লাভ করে। তখন সে গুণাতীত, ভেদাতীত ও জগদাতীত হয়। মায়ার কার্য অবস্থা হল জগৎপ্রপঞ্চ। তা-ই হল অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থা। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দু'টি অবস্থাই এই ব্যক্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে। তারা একবার অব্যক্তে লীন হয় আবার ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ পায়। অব্যক্তে লীন হওয়াই হল স্রষ্টা জীবের রাত্রি এবং তার ব্যক্ত বা প্রকাশ অবস্থা হল জীবের কাছে দিন। (এ হল ব্যষ্টির দৃষ্টিতে ব্যষ্টি দিন-রাত্রি এবং সমষ্টির দৃষ্টিতে স্রষ্টা ব্রহ্মার দিন-রাত্রি। ব্রহ্মার দিন-রাত্রি হয় সৃষ্টিতে ও তার খণ্ডলয়ে বা প্রলয়ে।)

অব্যক্তে কোনও দ্বৈতবোধের কর্তা-ভোক্তা নেই, দৃক্-দৃশ্য বা দ্রষ্টা-দৃশ্যও নেই। শুধু এক সাক্ষী-আত্মা আছে কিন্তু তাঁর বোধ অব্যক্ত বলে আবৃত। গাঢ় ঘুমের মধ্যে প্রত্যেকেই আমরা এই একাকার অখণ্ড অবিভক্ত আনন্দভাবের সঙ্গে প্রাকৃত ধর্ম অনুসারে কিছুকালের জন্য যুক্ত থাকি। কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে ও স্থায়ী ভাবে সেখানে গিয়ে মিশে থাকতে পারি না কারণ অজ্ঞানজাত কামনা-বাসনার বীজ সম্যক্ ভাবে অন্তরে সংস্কাররূপে সুপ্ত ও নিহিত থাকে, তা নির্বীজ ও নির্মূল না-হওয়া পর্যন্ত কেউই অখণ্ড আনন্দের অধিকারী হতে পারে না। অবিদ্যাজাত সমগ্র কামনার বীজ নির্মূল বা বিনষ্ট হয় একমাত্র আত্মজ্ঞানের জ্যোতি বা অগ্নি দ্বারা। তা ঘটে থাকে সমাধির গভীরে। সেই জন্য সমাধির পূর্ণ অবস্থা হল আনন্দময় কোষের অতীত অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মা। এই পূর্ণ সমাধি অবস্থা লাভ হয় তীব্র বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে; জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাসযোগে যে আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মানুসন্ধান হয় তার মাধ্যমে বা পরিণামে, অথবা পূর্ণ আত্মসমর্পণ যোগের মাধ্যমে। তখন জেগে ওঠে শুদ্ধ জ্ঞানের নির্মল প্রকাশ। তাতে সমগ্র অজ্ঞানের বীজ বিনষ্ট হয় ও তিরোহিত হয়।

সমাধির গভীরে আনন্দময় কোষ ছেড়ে একেবারে কোষাতীত তুরীয় শুদ্ধ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হয়। সেই আত্মবোধ দ্বারা জানা যায় যে আনন্দময় কোষও আত্মবোধের প্রতিবন্ধক এবং আত্মার আবরণ বিশেষ। আনন্দময় কোষের অতীত শুদ্ধ অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবার নামই হল আত্মসিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি। এরই অপর নাম পরাভক্তি বা মুখ্যভক্তি। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি কোনও সাধনার ফল নয়, তা হল সত্যস্বরূপের পরিচয় এবং মোক্ষস্বরূপ। এই মোক্ষস্বরূপে প্রতিষ্ঠা মানে হল স্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠা। স্বাত্মবোধই হল স্বানুভূতি। এই স্বানুভূতির অপর নাম পরাভক্তি, পরাজ্ঞান, পরাসিদ্ধি, পরামুক্তি ও পরাশান্তি। এই বিষয়ে কোনও মতদ্বৈত থাকলে বুঝতে হবে তা কার্য-কারণ, ধর্ম ও সাধন নীতির অন্তর্ভুক্ত অশুদ্ধ ও অপূর্ণ অবস্থার লক্ষণ। পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হলে কোনও প্রকার মনোধর্মের ক্রিয়াচাতুরী থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়; কারণ তা সর্বত্যাগের শিখরে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোত্তম বিবেক-বৈরাগ্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এরই অপর নাম 'সুধর্ম' অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠার নাম 'সুধর্ম'। স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্ববোধ-আত্মা বা ঈশ্বর স্বানুভবসিদ্ধ। স্বানুভববিজ্ঞানই হল 'সুধর্ম'। এর অপর নাম সমদৃষ্টি বা ঋষিদৃষ্টি। একেই আবার তৃতীয় নয়ন বলা হয়। সেই নয়ন একই সঙ্গে সব কিছু সমভাবে দর্শন করে। তা-ই হল সুদর্শন। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন উক্তির মধ্যে, নানা মুনির নানা মতের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সাধন পদ্ধতির মধ্যে, পৃথক পৃথক সাধনার উৎকর্ষ ও ফলশ্রুতির মধ্যে যে শাশ্বত নিত্য সামঞ্জস্য, ঐক্য সমতা ও পূর্ণতা, মালার মধ্যস্থ সূত্রাকারে এবং মৌল নির্যাসরূপে নিহিত থাকে, বর্তমান থাকে, তার পরিচয়ই দেওয়া হল। সেই জন্য বিভিন্ন প্রসঙ্গের সমাবেশে চিরন্তন সত্যের স্বরূপটি, যা সর্বোত্তমোত্তম,

প্রিয়তমোত্তম, আপনতারূপে চিরবিদ্যমান, তা বাক্যমনাতীত হলেও শুদ্ধ মনের গোচর বলে, দিব্যনয়ন বা বোধের স্বরূপ বলে, স্বানুভূতির ভাষাতেই তা ব্যক্ত করা হল। একান্ত আপনবোধের দৃষ্টিতে তাঁকে বরণ করে নিতে হয়। সুতরাং আপন দৃষ্টি প্রসারিত করে আপন বলে তাঁকে গ্রহণ করলেই আপনবোধে হয় তার মিলন। স্ববোধের সঙ্গে স্ববোধের কোনও দ্বন্দ্ব হয় না।

আপনবোধের পরাকাষ্ঠাই হল স্বাত্মজ্ঞান। সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরানুভূতি হল আপনবোধের সর্বোত্তম অবস্থা। তা সর্বতোভাবে অবাধিত, কার্য-কারণনিরপেক্ষ, আপেক্ষিক সত্যনিরপেক্ষ, সাধ্য-সাধননিরপেক্ষ, দ্রষ্টা-দৃশ্যনিরপেক্ষ, ভেদাভেদনিরপেক্ষ, আমি-আমার ও তুমি-তোমার ভাবশূন্য। এক কথায় সর্বদ্বৈত, নানাত্বভাব, কার্য-কারণ প্রভৃতির প্রভাবমুক্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত নিরন্তর অখণ্ড পূর্ণ শাশ্বত সর্বসম বিশুদ্ধ ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং। এর কোনও বিকল্প, প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যথার্থ সত্য বলতে একে লক্ষ্য করেই বলা হয়। তা জগৎদৃষ্টিতে আবৃত। জগৎদৃষ্টি হল আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ relative existence বা relative truth। তা Absolute Truth নয়। ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান হল ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ। তা তুরীয় ও তুরীয়াতীত বলে বাক্যমনাতীত। তাই অনির্বচনীয়। এরও অপর নাম অব্যক্ত। ইতিপূর্বে যে ত্রিগুণাপ্রকৃতির সাম্য অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়েছে তা হল জগতের কারণ অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় সমগ্র বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ সুপ্ত বা প্রলীন থাকে, আবার জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, প্রকাশবিকাশের অপেক্ষায় থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যথাকালে, যথানিয়মে আবার এই জগৎকারণ অব্যক্ত অবস্থা থেকে জগৎকার্য হয়ে থাকে। সেই জন্য তা প্রকৃতির বা ঈশ্বরশক্তির পরিচয়। কিন্তু দ্বিতীয় অব্যক্ত হল পরম অব্যক্ত। তার কোনও বিকার বা পরিবর্তন হয় না। তা নিত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম-আত্ম সত্য (Absolute Reality)।

সাধনভজন করে যে অনুভূতি লাভ হয় সেই অনুভূতি হল নিজের মধ্যে নিজবোধের পরিপূর্ণ উন্মেষ, বিকাশ, উৎকর্ষ, পরাকাষ্ঠা ও স্থিতি এবং তা-ই হল আত্মবোধের বা ঈশ্বরবোধের যথার্থ স্বরূপ। ঈশ্বর-আত্মা অভিন্ন হলেও ঈশ্বরবোধ দিয়ে আত্মবোধের পরিচয় এবং আত্মবোধ দিয়ে ঈশ্বরের পরিচয়, তা দ্বিবিধ সাধন বিজ্ঞানের মাধ্যমে অনুভূত হয়। অনুভূতির গভীরে ঈশ্বর-আত্মা যে এক অভিন্ন সত্য তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি না-হওয়া পর্যন্ত অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা হয় না। অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা না-হলে দ্বৈতবোধ বা ভেদজ্ঞানের প্রভাবে বিকার, ভ্রান্তি, ভীতি, অভাব, অশান্তি প্রভৃতি আগের মতো কম বেশি থেকেই যায়। এখানে যা বলা হল, নিত্য পাঠে, তা সাধননিরপেক্ষ ভাবে অনুভবসিদ্ধ হবে। স্বানুভূতিলাভের এ এক অভিনব বিজ্ঞান—স্বানুভূতির দ্বারা, স্বানুভূতির মাধ্যমে, স্বানুভূতি সিদ্ধ হয়। সূর্যের তাপ বা আলো, অগ্নির তাপ ও আলো যেমন নিত্যসিদ্ধ সেইরূপ স্বানুভববিজ্ঞানও নিত্যসিদ্ধ। তা পূর্বাপর সমভাবে, পূর্ণভাবে শুধু 'মেনে মানিয়ে চলতে' হয়।

অহংকার-অভিমানশূন্য জীবন অতীব দুর্লভ। অহংকার অভিমানই হল অজ্ঞানের লক্ষণ। এই অহংকাররূপ অজ্ঞানদেহ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। তার ফলে ভেদ, পার্থক্য, দ্বন্দ্ব, অভাব, আশা, শঙ্কা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, অতৃপ্তি ও অশান্তি প্রভৃতি জীবনে বেড়েই চলে। পরম নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জাগে না। অজ্ঞানীর বিশ্বাস দেহগত, তামসিক। সাধকের বিশ্বাস রাজসিক। সিদ্ধের বিশ্বাস সাত্ত্বিক। পূর্ণ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হলে সেই বিশ্বাস হয় শুদ্ধসাত্ত্বিক, তদূর্ধ্বে গুণাতীত ও স্বতঃস্ফূর্ত। স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস মানেই সত্যবোধ বা সত্যজ্ঞান। সেখানে বিশ্বাস, সত্যানুভূতি, আত্মানুভূতি, ঈশ্বরানুভূতি প্রভৃতি এক অর্থবোধক বা সম অর্থবোধক। তা প্রত্যেকের হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে আছে। হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত না-হলে স্বার্থবোধের সম্পূর্ণ বাধ বা উপশম হয় না এবং তা পরিপূর্ণ ভাবে শুদ্ধ ও সমর্পিত না-হলে অথবা আত্মবিচারের বা আত্মবিশ্লেষণের জ্যোতিতে তা সম্পূর্ণরূপে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট না-হলে জীবভাব অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধির অবসান হয় না।

দেহাত্মবুদ্ধির লক্ষণ বা নমুনা হল দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার যুক্ত আমি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম, কর্মফল ও পরিবেশাদি, যা আমারবোধে গ্রাহ্য, স্বীকৃত ও অনুমিত হয়। এ সবই হল তার বৈশিষ্ট্য।

আত্মবোধের 'আমি'-র লক্ষণ হল—আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের অতীত, সমগ্র জগতের অতীত, নিত্যবস্তু, শুদ্ধ, অবিকারী, অবিনাশী, অপরিণামী, অবিভক্ত, অখণ্ড, ভূমা, নিত্য, শাশ্বত, প্রশান্ত, অচ্যুত, অনন্ত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, সচ্চিদানন্দঘন অনন্যপরম। সেই 'আমি' অন্তর-বাহিরশূন্য, ভাবাভাব-শূন্য, ভেদাভেদশূন্য, দেশ-কাল-কার্য-কারণের প্রভাবশূন্য, শুদ্ধবোধস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ। তা বাক্যমনাতীত বলেই নিত্যমৌন। এই বোধে এলে আমরা আমাদের স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই। স্বঘরে ফিরে আসি। এই হল বুদ্ধির গুহায় পরম বোধস্বরূপের সত্য পরিচয়।

''ঈশ্বর-আত্মার স্বরূপই হল পূর্ণ, সত্য, নিত্য, অমৃত, বিশুদ্ধ বোধময়, অনন্ত সুখ, আনন্দঘন, প্রশান্ত, মৌন ও শান্ত। তাঁর স্বভাবশক্তির বিলাসে তাঁর বক্ষে যে বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ ফুটে ওঠে, তা সৃষ্টির অন্তর্গত মোহ ও অজ্ঞান যুক্ত জীবভাবের কাছে বৈচিত্র্যরূপেই অনুভূত হয়। স্বভাবশক্তির প্রভাবেই তা ঘটে। স্বভাবশক্তির এই প্রভাব হল চিদাভাস; অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিদ্‌ঘন আত্মার বা ঈশ্বরের স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতির প্রতিফলন হয় সমগ্র প্রকাশের উপরে, যেমন আলোর প্রতিফলন হয় নানাবিধ স্বচ্ছ বস্তুর উপরে। তাতে আলোর বা জ্যোতির প্রভা বিচ্ছুরিত হয় নানা দিকে, নানা ভঙ্গিমায়। তা আবার অন্য সব স্বচ্ছ বস্তুর উপরেও প্রতিফলিত হয়। এই ভাবে আভাসজ্যোতির প্রতিফলন পরপর নানা অবস্থার মধ্যে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিমায়, নানা বৈচিত্র্যে ও নানা মাত্রায় ঘটে থাকে। এ সবগুলির পরিচয় জানা যায় একমাত্র মূলের শুদ্ধ আত্মজ্যোতির দ্বারা বা আত্মবোধের দ্বারা।

বাইরের জ্যোতিকে বা আলোকে জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয় কারণ জ্যোতি বা আলো সব কিছুকে প্রকাশ করে এবং অন্তরের অনুভূতি বা বোধ সব কিছুকে জানিয়ে দেয়, অনুভব করিয়ে দেয় এবং প্রকাশ করে দেয়। বাইরের জ্যোতি হল অগ্নি, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি। এদের মধ্যে সূর্যই হল সব জ্যোতির মূল বা কেন্দ্র। সূর্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে বলে তাঁকে সৃষ্টির জনক বলা হয়। সমগ্র বুদ্ধির সঙ্গে এর তুলনা করা হয় এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠান দেবতারূপে তাঁকে মানা হয়। সূর্যের মধ্যে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আছেন তিনি বোধস্বরূপ নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু ভগবান। সূর্যদেব হলেন বিষ্ণুর বিশেষ অভিব্যক্তি। (আত্মার জ্যোতিতে জগৎ ভাসে, বুদ্ধির জ্যোতিতে জীবন ভাসে।)

চন্দ্রমা হল মন। তার দেবতা হল ব্রহ্মা। মানুষের মধ্যে যে প্রাণবায়ু এবং বহিঃপ্রকৃতিতে যে প্রাণবায়ু উভয়ই অভিন্ন। তার দেবতা হলেন বিষ্ণু। অহংকারের দেবতা হলেন শংকর বা শিব। প্রত্যেক দেবতা হলেন বোধসত্তা ঈশ্বরাত্মার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ অভিব্যক্তি। তাঁরা ঈশ্বরেরই স্বভাবশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু কেউই পৃথক ভাবে পূর্ণ, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়।

দেবতাদের শক্তিই হল তাঁদের স্বভাব। সুতরাং বুদ্ধি ও বুদ্ধির শক্তি অভিন্ন, মন ও মনের শক্তি অভিন্ন, প্রাণ ও প্রাণের শক্তি অভিন্ন, অহংকার ও অহংকারের শক্তি অভিন্ন। এই শক্তির স্বরূপই দেবদেবীর স্বরূপ। তাঁদের প্রত্যেকের আবার স্বরূপ ও স্বভাবশক্তি পৃথক পৃথক। তাদের কার্যাবলীও পৃথক পৃথক। তাঁরা সবাই বোধস্বরূপ ঈশ্বরাত্মার স্বভাবশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁর সৃষ্টিকার্যে স্বভাবলীলায় ভিন্ন ভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মানুষ তাঁদের পূজা আরাধনা করে, তাঁদের তুষ্ট করে, তাঁদের দর্শন পেতে পারে ও তাঁদের কাছ থেকে কামনা অনুরূপ বর ও শক্তি পেতে পারে। তাঁদের সাহায্যে মানুষ সংসারজীবনে আশানুরূপ ভোগসুখ লাভ করতে পারে। তার ফলে ইহলোকে কিছু সম্পদের অধিকারী যেমন হতে পারা যায় ও কিছুকালের জন্য সুখভোগ

করা যায় সেইরূপ পরলোকেও তার কিছু অংশ ভোগ করা যায়। কিন্তু এই ফলভোগ জাগ্রৎকালীন অবস্থার মতই স্বল্পকাল স্থায়ী। তা কখনও পূর্ণ স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। ভোগমাত্রেরই আদি-অন্ত আছে। এই সব দেবদেবী জাগতিক ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত বলে এবং সবই আভাসচৈতন্যের অংশবিশেষ বলে এঁরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে কিছু সাহায্য করতে পারেন বটে কিন্তু মুক্তি বা পূর্ণতা দানে কেউই সমর্থ নয়। পরাসিদ্ধি দেবার অধিকার এঁদের কারওরই নেই। কারণ এঁরা কেউই পূর্ণ বা মুক্ত নয়, অংশ বিশেষমাত্র। সৃষ্টিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে এবং কাম, ক্রিয়া ও কালশক্তির প্রভাবাধীন বলে এঁরাও জীবপদবাচ্য। মানুষ ও অন্যান্য জীব অপেক্ষা এঁরা শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ঠ। এঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য ও প্রাধান্য অন্যান্য জীব অপেক্ষা বেশি বলে এঁদের ক্ষমতাও বেশি। তাঁরা সত্ত্বগুণের সর্বপ্রকার ফলভোগে সমর্থ কিন্তু গুণমুক্ত নয়। এঁদের বাসস্থান হল দেবলোক ও স্বর্গলোক। জীবদেহে এঁদের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠানকেন্দ্র আছে। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেবদেবীদের সন্ধান সাধনার উৎকর্ষের ফলে নিজেদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে জানা যায়। সর্বদেবতার অধিষ্ঠান যখন পরমাত্মদেবতা এবং তাঁর আভাসস্থল হল জীবের হৃদয়কেন্দ্র, তখন জীব হৃদয়েতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মদেবতার সাক্ষাৎ, দর্শন ও অনুভূতি হলে সর্বদেবদেবীর সম্যক্ পরিচয় আপনবোধে অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। এ-ই হল অদ্বৈতানুভূতির বৈশিষ্ট্য ও মর্ম।

দেবদেবীদের মধ্যে গুণের, মানের তারতম্য অনুসারে নানাবিধ স্তরবিভাগ আছে। প্রধান প্রধান দেবদেবীদের অধীনে তাঁদের সাহায্যকারী বহু দেবদেবী আছেন; তাঁদেব অধীনে আবার তাঁদের সাহায্যকারী বহু দেবদেবী আছেন। তাঁদের অধীনে আবার উপদেবদেবী আছেন; তাঁদের অধীনে অপদেবদেবী আছেন। তাঁদের সংখ্যাও বহু। এদের মধ্যে সবারই গুণগত মানের তারতম্য অনুসারে শক্তির মানের তারতম্য এবং তদনুসারে ক্ষমতার তারতম্যও স্বাভাবিক ভাবেই আছে। এ সব বিষয়ই হল অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ও দর্শনের সারমর্ম। এই সবের যথার্থ অনুভূতি ও পরিচয় বহু সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে, ঈশ্বরের কৃপায় ও সাধুসন্তের আশীর্বাদে কদাচিৎ কেউ পেয়ে থাকে। সবাই তো আর অধ্যাত্মসাধনায় মাতে না। নিজের নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, অজ্ঞান, মোহ ও আসক্তির মধ্যেই ডুবে থাকে বলে নিজ হৃদয়স্থিত সত্যস্বরূপের পরিচয় আর জানতে পারে না।

জীবনের ব্যবহারিক দিক সাধিত হয় নিজ স্বভাবশক্তির দ্বারা। এই স্বভাব হল পূর্বে বর্ণিত আভাসচৈতন্যের অংশ। আভাসচৈতন্য দ্বারা যা-কিছু ব্যক্ত, প্রকাশিত ও সৃষ্ট হয় এবং নির্দিষ্টকালের জন্য তার অস্তিত্ব ও ব্যবহার সাধিত হয়, সে সবই ব্যবহারিক সত্য বা আপেক্ষিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত। তা শুধু ইন্দ্রিয়-মনগ্রাহ্য, দেহ-কাল-কার্য-কারণের দ্বারা সীমিত জাগতিক নিয়মের অধীন অর্থাৎ অনিত্য, অস্থায়ী, বিকারী, পরিণামী সুতরাং অসত্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য হলে তা বিকারাধীন হবেই। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যা দেখে, শোনে ও জানে সে সবই ব্যবহারিক নীতির অন্তর্গত। ব্যবহারিক নীতিই হল প্রাকৃত নীতি। এগুলি সবই কর্মাধীন ও কালাধীন, সুতরাং মৃত্যুর অধীন। কিন্তু আমাদের সত্যস্বরূপ আত্মা অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ, শাশ্বত, নিত্য, বিশুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে প্রত্যেকের হৃদয়গুহায়। এ-ই হল যথার্থ স্বরূপের পরিচয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সহযোগে তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে যারা সত্য আত্মস্বরূপকে বা ঈশ্বরস্বরূপকে জানতে চায় তারা হল মুমুক্ষু, মুক্তিকামী ও সত্যান্বেষী। গুরু ইষ্টের আশিস্, কৃপা, স্বকীয় চেষ্টা এবং পুরুষকারের প্রভাবে গুরুনির্দিষ্ট সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করে তারা সাধন করে। সাধনার পরিণামে স্বভাবের অর্থাৎ আভাসচৈতন্যের সর্ববিধ মলাবরণ শোধন করতে সমর্থ হয়। তখন তারা সর্ববিধ মলাবরণমুক্ত, বিকার ও অজ্ঞান মুক্ত, নির্মল ও শুদ্ধ আত্মবোধের বা ঈশ্বরবোধের অধিকারী হয়। তার দ্বারা আপন সত্যস্বরূপের যথার্থ পরিচয় হৃদয়ঙ্গম বা অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতি সম্পূর্ণ স্ববোধাত্মাব

অনুভূতি। নিজবোধের বা আপনবোধের অনুভূতি, এ-ই হল স্বানুভূতি, যার কথা বহু গান ও আলোচনার মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে মানুষ যা দেখে, শোনে ও জানে তা শুদ্ধবোধ বা শুদ্ধজ্ঞান নয়। তা হল জ্ঞানের স্বল্পাভাস, বিকৃত বা বিপর্যয় জ্ঞান। তা কোনও কিছুর সত্য পরিচয় প্রকাশ করতে পারে না। সব কিছুর বাহ্য অবস্থার কিছু ধারণা বা প্রতীতি প্রকাশ করে মাত্র। বেশির ভাগ মানুষ একেই জ্ঞান বলে মনে করে। তা হল তামসিক জ্ঞান, স্থূল বস্তুর সাময়িক প্রতীতি। আবার মন, বুদ্ধি দিয়ে যে চিন্তা মানুষ করে এবং যা অনুভব করে তাও শুদ্ধ জ্ঞান নয়। তা জ্ঞানাভাসের এক বিশেষ রূপ মাত্র। তা পূর্বের জ্ঞানাভাস অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বলে একেও অনেকে সত্যজ্ঞান বলে ভুল করে। এই ভুল তাদের কাছে সহজে ধরা পড়ে না। তা কেউ ভুল বলে নির্দেশ করলে, তারা তা সহজে মানেও না। এ-ই হল আভাসচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। আভাসের প্রকাশে যা-কিছু প্রতিভাসে তা সবই ফুটে ওঠে স্বভাবের বিলাসে। তা সবই স্বভাবের অন্তর্গত, যার পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব থাকে, যার উদয়-অস্ত আছে, আসা-যাওয়া আছে, গতাগতি আছে। এই হল লৌকিক জগৎ, লৌকিক দৃষ্টি ও লৌকিক ব্যবহার। এর প্রতি মোহ ও আসক্তিই হল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রতি মোহ আসক্তি, যার স্থায়িত্ব ও পরিণাম অতি অল্প।

আভাসচৈতন্যের আর একটি বিশেষ স্তব হল অধ্যাত্মসাধনায় পূর্ণসিদ্ধির পূর্বের স্তর। তাতে বহুবিধ সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় বটে কিন্তু তা অভিমান থেকে মুক্ত নয় এবং তার ভিত্তিও অস্থায়ী, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের বিষয়, যা স্বভাবের কাছে নূতন ও প্রিয় বলে স্বভাবতই মনে হয়। কিন্তু তার যথার্থ সত্যতা নেই বলে কালের কবলে তা টেকে না এবং সত্যদ্রষ্টাদের দ্বারা তা স্বীকৃত বা গৃহীতও হয় না। যাই হোক, আভাসচৈতন্যের অন্তর্গত কোনও অনুভূতিই স্থায়ী ও নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তার দ্বারা সত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। সংসারী মানুষ সংসারের সব কিছুকে মোহ, আসক্তি ও অজ্ঞানবশত সত্য বলে মনে করে। সংসারের সমগ্র রূপটি হল আপেক্ষিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য কিন্তু পারমার্থিক সত্য নয়। পারমার্থিক সত্যই হল একমাত্র সত্য যা সর্বসত্যের সত্য, যা নিত্য, সত্য, শশ্বত, অচ্যুত, অমৃত, অনন্ত, প্রশান্ত, অখণ্ড ও ভূমা।

যাই হোক, সংসারে যুক্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কাছে ব্যবহারিক সত্যই হল একমাত্র লক্ষ্য ও জীবনের অবলম্বন। কিন্তু জীবনের নানা পর্যায়ে, নানা ঘটনা, অবস্থা ও বিপর্যয় দ্বারা জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, বিভ্রান্ত হয়ে ব্যাকুল চিত্তে অনন্যোপায় হয়ে সর্বতোভাবে মুক্তির অভাব অবগত হয়ে মুক্তির প্রার্থনা করে বা মুক্তি পেতে চায়, তখনই অসহায়বোধে মানুষের সব অহংকার ও অভিমান শিথিল হয়ে পড়ে। তখন আসে ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ শরণাগতি বা প্রপন্ন আর্তিভাব। তার আগে আভাসচৈতন্যের প্রভাবে স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত বিলাসে অন্তর্ভাবের যে অভিমান ও অহংকার জেগে ওঠে তা সর্বতোভাবে জীবনে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অধিকার পেতে চায়; নিজের পৃথক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে সবার মধ্যে প্রাধান্য পেতে চায়, সবার উপরে প্রভুত্ব করতে চায়। নিজের সাধ্য বস্তু ও অধিকারের বাইরেও সে সব কিছু নিজের দখলে পেতে চায়, সে ভুলেও কখনও ভাবে না যে জীবনের বাহ্য ও অন্তরের রূপটি যতই ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা অনুভূত, স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হোক না কেন এবং অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক কার্যকরী, প্রভাবশালী ও মহত্তর হো'ক না কেন, তা কালাধীন। তা যে অনিত্য, অস্থায়ী, বিকারী এবং মিথ্যা ও মৃত্যুর অধীন তা সকলের মনে থাকে না। তা যে কিছুতেই জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না তা তারা কোনও মতেই মানে না। কাজেই বহুভাবে অহংকারে, অভিমানে বাহ্যজগতের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে জাগতিক ব্যাপারকে স্ব-দখলে আনার চেষ্টা করে। তাতে প্রতিহত হলে বা বাধাপ্রাপ্ত হলে, অকৃতকার্য হলে এবং আশানুরূপ ফল না-পেলে সে ক্ষুব্ধ, ম্রিয়মান ও বিব্রত হয় কিন্তু আশা ছাড়ে না। অভিমানের বিশেষ লক্ষণ হল তা কামনাপ্রবণ, ভোগপ্রবণ, ভীত, সন্ত্রস্ত এবং অশান্ত। সাধ্য ও

যোগ্যতার মান তার যাই থাকুক না কেন তার চাইতে তার সাধ, তৃষ্ণা ও কামনা থাকে অধিক এবং জীবনে সাধ্য ও যোগ্যতা অপেক্ষা সাধ ও তৃষ্ণাই বেড়ে চলে বেশি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাধ বা তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে বলে তা পূরণের আশা ছাড়ে না। তা-ই দেহান্তে দেহধারণের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে।

অপর পক্ষে, যাঁরা জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতার বিনিময়ে যে সত্য অমৃতস্বরূপ আত্মার বা ঈশ্বরের অনুভূতির জন্য একান্তভাবে প্রযত্নশীল এবং সম্যক্ ভাবে তাতে কৃতকার্য হয়ে কৃতকৃত্য হয়েছেন তাঁরা ভুলেও অহংকার-অভিমানের দাস হন না, সাধ ও আশার প্রশ্রয় দেন না। তাঁদের সাধ্য ও যোগ্যতা হল অখণ্ড, পূর্ণ, অনন্ত। এক কথায়, তাঁরা সাধশূন্য সাধ্যপূর্ণ। অখণ্ড ভূমা সুখশান্তির যোগ্য ও পূর্ণ অধিকারী তাঁরাই, তাঁরাই অভী, তাঁরা ধন্য, পূর্ণ, স্বস্থ ও সুস্থ। তাঁরা সত্যস্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সত্যময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় ও অমৃতময় জীবন তাঁদের এবং ভূমা, শান্তি ও সুখময় জীবন তাঁদের। তাঁরাই ঈশ্বরকোটি, ঈশ্বরস্বরূপ, পরম পূজ্য, আরাধ্য এবং সকলের কাছেই তাঁরা নমস্য, পরম আদর্শরূপে গ্রাহ্য। তাঁদের জীবনকে লক্ষ্য করে, তাঁদের আদর্শকে সর্বান্তিঃকরণে গ্রহণ করে, তাঁদের আদর্শ ও নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করে, তাঁদের মতো জীবনকে গড়ে তোলার জন্য যারা চেষ্টা করে তারাও মহানন্দের প্রভাবে ধন্য হয় এবং সাধনার অন্তে তারাও তদ্‌ভাবে ও তদ্‌বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বরাত্মসত্তায় এক হয়ে মিশে যায়। তাই তাঁরা সমগ্র বিশ্ববাসীকে নানা ভাবে—কথা, গান ও আচরণের মাধ্যমে, নানাবিধ উপদেশ আদেশ ও দীক্ষাশিক্ষার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করেন। তার জন্য তাঁরা আপেক্ষিক সত্যের প্রভাব থেকে জীবনকে মুক্ত করে পারমার্থিক সত্যে উদ্‌বোধিত করে এবং নিরন্তর তাদের ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মবোধের বিজ্ঞানকে আপনবোধে ব্যবহার করার সহজ উপায় বলে দেন। এ ব্যাপারে তাঁরা এত সচেতন যে জীবনের দিব্য অমৃতস্বরূপকে পুনরায় যাতে বিস্মৃত না-হয় তার জন্য সকলকেই তাঁরা আপনবোধের রহস্য বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেন। সংসারে সবাই স্বকল্পিত ভ্রান্তিবিলাস মোহ মায়াতে জড়িয়ে আছে। তাই মোহ মায়া আসক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য, সংসারের ভ্রান্তিবিলাসের মুখোস খুলে দেবার জন্য, সর্ববিধ লৌকিক মল/তামসিক মল[১], আণবিক মল/রাজসিক মল[২] ও মায়িক মল/সাত্ত্বিক মল[৩] পরিশোধনের জন্য এবং সর্বোপরি স্বকীয় চিন্তা, বাক্ ও কর্মজাত সমগ্র সংস্কারের প্রভাব নির্মূল করার জন্য নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে ও প্রেরণা যুগিয়ে দেন। এত সুযোগ ও সাহায্য পেয়েও সংসারীদের মধ্যে অনেকেই তা যথার্থ ভাবে গ্রহণ, বরণ ও ব্যবহার করতে পারে না। এও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। ঈশ্বরের স্বভাবশক্তির লীলাচাতুরী অতীব রহস্যপূর্ণ। কে বোঝে সত্য মর্ম? যে বোঝে সে সত্যই বোঝে। সে নাহি আর মায়াবিলাসে মজে। কিন্তু যে বোঝে না, বুঝতে চায় না বা বুঝেও বোঝে না, তাকে আর কে বোঝাবে? বোঝাবার আর কেউ থাকে না।

সংসারীদের সমগ্র জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার দ্বারা সত্যের বা ঈশ্বরবোধের অনুমানও করা যায় না। তা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপা, দৈবকৃপা, গুরুকৃপা ও আত্মকৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই কৃপা সততই প্রবাহিত হচ্ছে অন্তরে-বাহিরে জীবনের সর্বস্তরে। বিষয়াসক্ত সংসারী মন ও বুদ্ধি অহংকারবশত তা জানতে ও বুঝতে পারে না। মহতের আশ্রয়ে, মহতের কৃপাগুণে স্বকীয় চেষ্টা ও পুরুষকারের মাধ্যমে তা অবগত হতে হয় এবং তা জানতে পেরে পূর্ণরূপে তার অনুভূতির জন্য সেইরূপ যোগ্যতা ও অধিকার লাভের জন্য জীবনে নূতন পর্যায়ে মহতের দ্বারা যে চিন্তা ও কর্ম নির্দিষ্ট হয় তা-ই হল অধ্যাত্মচেতনা লাভের প্রধান সোপান। বীজ

১। তামসিক মল: দেহ ও বিষয় আসক্তি।

২। রাজসিক মল: অহংকার ও কাম, কর্ম, ভোগাসক্তি।

৩। সাত্ত্বিক মল: দ্বৈতবুদ্ধি এবং তার পরিণাম।

থেকে গাছের জন্ম ও বিকাশের মতো, তার ফুলে ফলে পরিণত হওয়ার মতো এই অধ্যাত্মচেতনা বহুবিধ স্তরের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। ক্রমপর্যায়ে অধ্যাত্মচেতনা সর্বোত্তম শিখরে পৌঁছায়, যদিও তা এক জীবনে সাধ্য নয়।

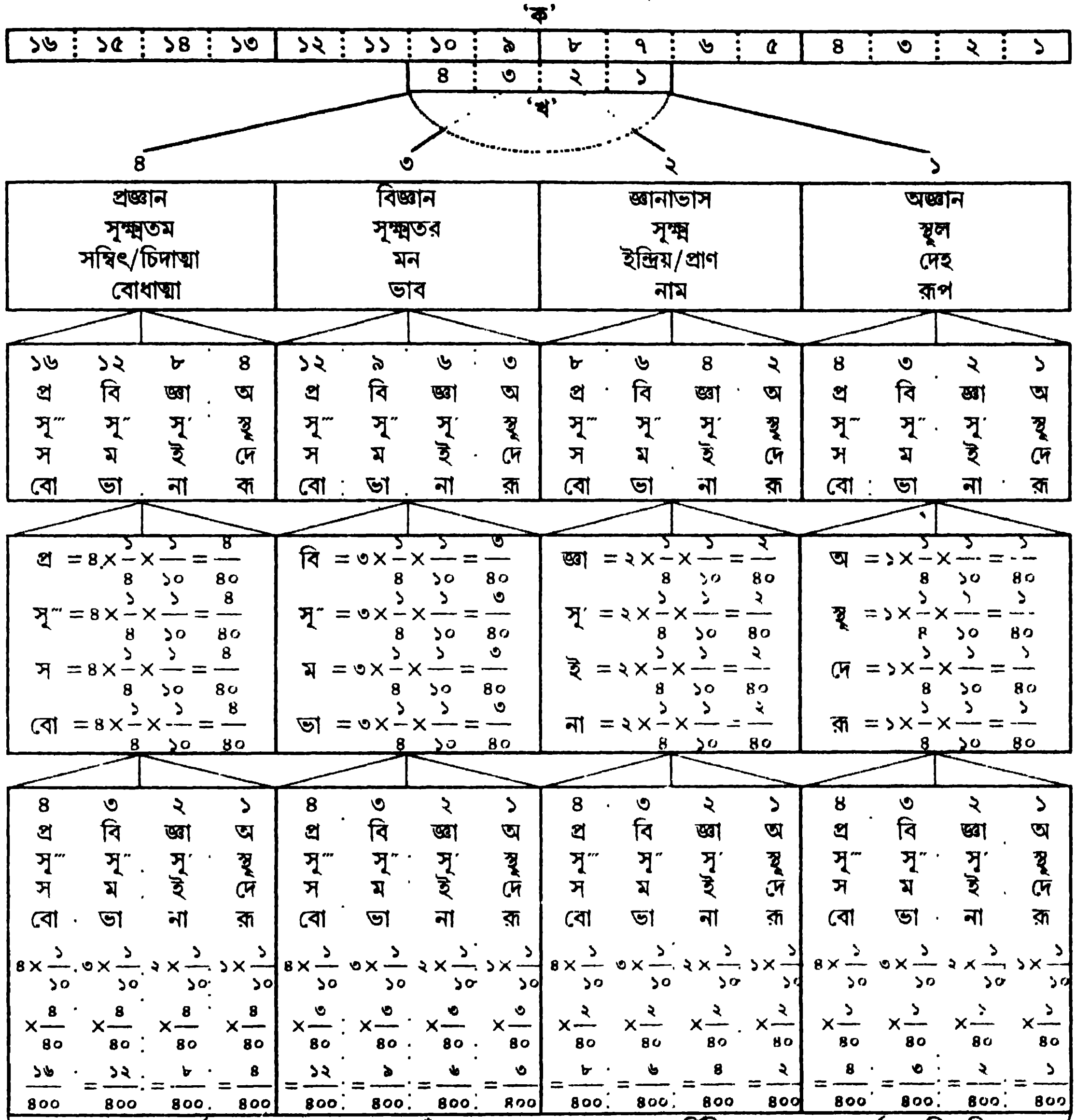
জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস, সুখ-দুঃখের ইতিহাস হল জাগতিক অভিজ্ঞতা ও আপেক্ষিক জ্ঞানের বা সত্যের অন্তর্ভুক্ত আভাসচৈতন্যের বিষয়ীভূত। অধ্যাত্মচেতনা গুরু-ইষ্টের কৃপাশিস্ দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত হয়ে, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যকে, সুখ-দুঃখের তাৎপর্যকে জানিয়ে দেয়। বৈচিত্র্যের জ্ঞানকে অতিক্রম করে, দ্বৈত ও আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করে নিত্যপূর্ণ, অদ্বয়, অব্যয়, অক্ষয়, অভীজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা এনে দেয় যা, তা-ই হল পরম সত্য। যা মানুষকে শোক-তাপ, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, ভাবনা-চিন্তা, অশান্তি, বিরক্তি, ভ্রান্তিভীতি থেকে উদ্ধার করে, রক্ষা করে আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে এবং তদ্‌বোধে দৃঢ় ভাবে, পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, তা-ই হল সেই পরম সত্য।

যা শুধু সত্যের আলোতে সত্যকেই প্রকাশ করে, যা আপনাকে আপনরূপে প্রকাশ করে, যা সত্য থেকে ভ্রষ্ট করে না, যা কোনও মতেই দ্বন্দ্ব-বিকারকে, শোক-মোহকে, ভ্রান্তিভীতিকে, দুঃখ-অশান্তিকে, বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না, স্বীকার করে না বা অধীনস্থ হতে দেয় না, তা-ই হল সেই পরম সত্য। এই পরম সত্য প্রত্যেকের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় নিহিত, তা হল প্রত্যেকের দিব্যমুক্তস্বরূপ। তা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সূক্ষ্মতম স্বরূপে অনুস্যূত ও ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান। এ-ই হল সমগ্র জীবনের সারাৎসার সমগ্র বোধ ও অনুভূতির সার, সমগ্র সুখ ও শান্তির মূল ভিত্তি। তা বাক্যমনাতীত, দেশ-কাল-কার্য-কারণাতীত, স্বতন্ত্র, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, পরম তত্ত্ব, ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ। এরই নিত্য জয়। মিথ্যার বা অসত্যের জয় কভু নয়। সবার হৃদয়ে এই নিত্যসত্য জয়যুক্ত। একেই নমস্কার। একেই নমস্কার। একেই নমস্কার।''

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি
হরিওঁ তৎ সৎ।

চিত্র নং—১

শাশ্বত অচ্যুত বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দ দিব্য অমৃত অব্যক্ত সত্তা পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম নির্গুণ-গুণী 'আমির আমি' জ্ঞানের জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমা-'ক', তাঁর $^{১}/_{৪}$ অংশ চার কলার সামগ্রিক অভিব্যক্তি বিশ্বচৈতন্য—ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-ভগবান এবং জীবজগৎ-'খ' সঙ্কোচনক্রম বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিকোণ হতে—



ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমাসত্তার বক্ষে তাঁর $^{১}/_{৪}$ অংশের 'খ' এর অন্তর্নিহিত চার কলার পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির বিশ্বচৈতন্যের দর্শন বিজ্ঞান লক্ষণের কেন্দ্রাতিগ (কেন্দ্রাপসারী বা অপকেন্দ্র) অভিব্যক্তির সামগ্রিক নক্সার পরিচয়।

১নং চিত্র—শাশ্বত অখণ্ড ষোল কলা পূর্ণ অদ্বয়সত্তার বক্ষে তাঁর $^{১}/_{৪}$ অংশ বিশ্বাত্মা অনন্ত দিব্য জীবনরূপের সঙ্কোচন ক্রমের অভিব্যক্তি চিত্র

'ক'—শাশ্বত অখণ্ড সত্তা 'খ'— ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমাসত্তার বক্ষে তাঁর $^{৪}/_{১৬}$ অভিব্যক্ত অংশ

প্রজ্ঞান	— প্র	বিজ্ঞান	— বি	জ্ঞানাভাস	— জ্ঞা	অজ্ঞান	— অ
সূক্ষ্মতম	— সূ‴	সূক্ষ্মতর	— সূ″	সূক্ষ্ম	— সূ′	স্থূল	— স্থূ
সম্বিৎ/চিদাত্মা	— স	মন	— ম	ইন্দ্রিয়/প্রাণ	— ই	দেহ	— দে
বোধাত্মা	— বো	ভাব	— বো	নাম	— না	রূপ	— রূ

চিত্র নং—২

শাশ্বত অচ্যুত বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দ দিব্য অমৃত অব্যক্ত সত্তা পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম নির্গুণ-গুণী 'আমির আমি' জ্ঞানের জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমা-'ক', তাঁর ১/৪ অংশ চার কলার সামগ্রিক অভিব্যক্তি বিশ্বচৈতন্য—ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-ভগবান এবং জীবজগৎ-'খ' সম্প্রসারণক্রম বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিকোণ হতে—

'ক'

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

১	২	৩	৪

'খ'

১	২	৩	৪
অজ্ঞান	জ্ঞানাভাস	বিজ্ঞান	প্রজ্ঞান
স্থূল	সূক্ষ্ম	সূক্ষ্মতর	সূক্ষ্মতম
দেহ	ইন্দ্রিয়/প্রাণ	মন	সম্বিৎ/চিদাত্মা
রূপ	নাম	ভাব	বোধাত্মা

১	২	৩	৪	২	৪	৬	৮	৩	৬	৯	১২	৪	৮	১২	১৬
অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র
স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''	স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''	স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''	স্থূ	সূ	সূ"	সূ"
দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স
রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো

১	২	৩	৪
অ = ১ × ১/৪ × ১/১০ = ১/৪০	জ্ঞা = ২ × ১/৪ × ১/১০ = ২/৪০	বি = ৩ × ১/৪ × ১/১০ = ৩/৪০	প্র = ৪ × ১/৪ × ১/১০ = ৪/৪০
স্থূ = ১ × ১/৪ × ১/১০ = ১/৪০	সূ' = ২ × ১/৪ × ১/১০ = ২/৪০	সূ" = ৩ × ১/৪ × ১/১০ = ৩/৪০	সূ''' = ৪ × ১/৪ × ১/১০ = ৪/৪০
দে = ১ × ১/৪ × ১/১০ = ১/৪০	ই = ২ × ১/৪ × ১/১০ = ২/৪০	ম = ৩ × ১/৪ × ১/১০ = ৩/৪০	স = ৪ × ১/৪ × ১/১০ = ৪/৪০
রূ = ১ × ১/৪ × ১/১০ = ১/৪০	না = ২ × ১/৪ × ১/১০ = ২/৪০	ভা = ৩ × ১/৪ × ১/১০ = ৩/৪০	বো = ৪ × ১/৪ × ১/১০ = ৪/৪০

১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র	অ	জ্ঞা	বি	প্র
স্থূ	সূ'	সূ'	সূ'''	স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''	স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''	স্থূ	সূ'	সূ"	সূ'''
দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স	দে	ই	ম	স
রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো	রূ	না	ভা	বো
১ × ১/১০	২ × ১/১০	৩ × ১/১০	৪ × ১/১০	১ × ১/১০	২ × ১/১০	৩ × ১/১০	৪ × ১/১০	১ × ১/১০	২ × ১/১০	৩ × ১/১০	৪ × ১/১০	১ × ১/১০	২ × ১/১০	৩ × ১/১০	৪ × ১/১০
× ১/৪০	× ১/৪০	× ১/৪০	× ১/৪০	× ২/৪০	× ২/৪০	× ২/৪০	× ২/৪০	× ৩/৪০	× ৩/৪০	× ৩/৪০	× ৩/৪০	× ৪/৪০	× ৪/৪০	× ৪/৪০	× ৪/৪০
= ১/৪০০	= ২/৪০০	= ৩/৪০০	= ৪/৪০০	= ২/৪০০	= ৪/৪০০	= ৬/৪০০	= ৮/৪০০	= ৩/৪০০	= ৬/৪০০	= ৯/৪০০	= ১২/৪০০	= ৪/৪০০	= ৮/৪০০	= ১২/৪০০	১৬/৪০০

ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমাসত্তার বক্ষে তাঁর ১/৪ অংশের 'খ' এর অন্তর্নিহিত চার কলার পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির বিশ্বচৈতন্যের দর্শন বিজ্ঞান লক্ষণের কেন্দ্রাভিগ (অভিকেন্দ্র কেন্দ্রাভিগামী) অভিব্যক্তির সামগ্রিক নক্সার পরিচয়।

২নং চিত্র—শাশ্বত অখণ্ড ষোল কলা পূর্ণ অদ্বয়সত্তার বক্ষে তাঁর ১/৪ অংশ বিশ্বাত্মা অনন্ত দিব্য জীবনরূপের সম্প্রসারণ ক্রমের অভিব্যক্তি চিত্র

'ক'—শাশ্বত অখণ্ড সত্তা 'খ'— ষোল কলা পূর্ণ অখণ্ড ভূমাসত্তার বক্ষে তাঁর ৪/১৬ অভিব্যক্ত অংশ

অজ্ঞান	— অ	জ্ঞানাভাস	— জ্ঞা	বিজ্ঞান	— বি	প্রজ্ঞান	— প্র
স্থূল	— স্থূ		— সূ'	সূক্ষ্মতর	— সূ"	সূক্ষ্মতম	— সূ'''
দেহ	— দে	য়/প্রাণ	— ই	মন	— ম	সম্বিৎ/চিদাত্মা	— স
রূপ	— রূ	নাম	— না	ভাব	— বো	বোধাত্মা	— বো

গুরুবাদের বিজ্ঞান বিশ্লেষণ

সত্তা ও শক্তি উভয়ের পরিচয় পরস্পরের মাধ্যমে হয়

শক্তির সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি তুরীয় স্তরেই নিহিত। তুরীয়বোধেই হয় তার পরিচয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত বা অনুভূত। তার সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং কেন্দ্রসত্তার বোধেই হয় তার অনুভূতি সিদ্ধ। তার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অন্তঃসত্তার সঙ্গে যুক্ত। আন্তরবোধের জ্যোতিতেই তা পরিজ্ঞাত হয় বা অনুভূত হয়। তার স্থূল অভিব্যক্তি বাহ্যসত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং তদ্‌বোধেই হয় তার পরিচয়। সুতরাং শক্তির পরিচয় সত্তার বোধে হয় এবং সত্তার পরিচয় শক্তিযোগেই হয়।

শক্তির অখণ্ডতা অদ্বয়বোধে সিদ্ধ; কিন্তু তার বৈচিত্র্য দ্বৈতবোধে সিদ্ধ

সত্তার বক্ষে শক্তির অভিব্যক্তির যে চতুর্বিধ স্তরের কথা বলা হল তা অনুভূতির ক্রম ধরে জানা গেলেও তার তাৎপর্য প্রথমে সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। তার কারণ, শক্তির প্রকাশ ও কার্যাদি নিরন্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধিত হয় বলে তাদের মধ্যে স্থিতিবোধের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও শক্তির কার্যাবলীর মধ্যে সাময়িক ভাবে যে স্থিতি পরিলক্ষিত হয় তা যথার্থ ভাবে স্থায়ী হয় না বলে তা নিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। নিত্যের পর্যায়ে কেবলমাত্র সত্তার অখণ্ড স্বরূপই স্বতঃসিদ্ধ। শক্তির অখণ্ড রূপতা অখণ্ড সত্তার সঙ্গে নিত্য অদ্বয়বোধে সিদ্ধ; কিন্তু শক্তির বৈচিত্র্যময় লীলা দ্বৈতবোধে সিদ্ধ। বোধস্বরূপ নিত্য অদ্বৈত হলেও শক্তির সঙ্গে অভিব্যক্তিকালে তা আবৃত হয় শক্তির লীলায়িত প্রকাশের অভিনব ভঙ্গিমার মাধ্যমে। তার ফলে অদ্বৈতের দ্বৈতাভাস হয় এবং দ্বৈতাভাসের পরিণাম নানাত্ব-বহুত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। অবশ্য এ সবই অনুভূতিসাপেক্ষ। অনুভূতির দ্বারাই শক্তির প্রকাশ, বিকাশ ও বিলাস হয় সিদ্ধ। এই অনুভূতির পরাকাষ্ঠাই হল সত্তা শক্তির যুগল রূপ, যুগল মূর্তি যা অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত এবং দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। এ সবই এক পরমাত্মবোধের অর্থাৎ স্বানুভূতির অন্তর্ভুক্ত এবং স্বানুভূতির মাধ্যমেই হয় তার পূর্ণসিদ্ধি।

চৈতন্যসত্তার বক্ষে তার চিৎশক্তির চতুর্বিধ প্রকাশমানের অভিব্যক্তির নাম-রূপাদি

রূপ-নাম-ভাব-বোধ ঈশ্বরাত্মশক্তিরই লীলায়িত বিলাস রূপ। শক্তিস্বরূপে শক্তি সত্তার লীলায়িত রূপ এবং সত্তাস্বরূপে সত্তা স্বয়ং শক্তির পূর্ণ ও নিষ্ক্রিয় স্থিতি রূপ। চৈতন্যস্বরূপ হল সত্তার সত্যস্বরূপ এবং চৈতন্যশক্তি বা চিৎশক্তি হল তার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং চিৎশক্তির যত রকম অভিব্যক্তিই হোক না কেন, চিৎসত্তার বক্ষে তা প্রকাশধর্মী চিৎ-এর অতিরিক্ত নয়। তা স্বানুভূতির জ্যোতিতে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত হয়েছে। তা স্মরণে না-থাকলে 'স্বানুভূতির বিজ্ঞানের' তাৎপর্য সর্বক্ষেত্রে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেই জন্য তার উল্লেখ এবং নির্দেশ মাঝে মাঝে দরকার হয়। চিৎশক্তির অভিব্যক্তির মধ্যে যে রূপ-নাম-ভাব-বোধের কথা বলা হল এদের প্রত্যেকেরই আবার চতুর্বিধ প্রকাশমানের ক্রম আছে, যথা—(১নং) অখণ্ড রূপ; (২নং) অখণ্ড নাম; (৩নং) অখণ্ড ভাব ও (৪নং) অখণ্ড বোধ। এদের প্রত্যেকেরই (I) স্থূল, (II) সূক্ষ্ম, (III) সূক্ষ্মতর ও (IV) সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি আছে। এরা আবার ব্যষ্টি-সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রসঙ্গ অবগত হওয়া যাবে। খণ্ড ও অখণ্ড তথা ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে এরা প্রত্যেকেই যে দ্বিবিধ তাদেরও বিশেষ বিজ্ঞান আছে।

(১নং) অখণ্ড রূপের ঘরে—১/ক রূপের রূপ; ১/খ রূপের নাম; ১/গ রূপের ভাব; ১/ঘ রূপের বোধ। এ সবই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

(২নং) অখণ্ড নামের ঘরে—২/ক নামের রূপ; ২/খ নামের নাম; ২/গ নামের ভাব; ২/ঘ নামের বোধ। এ সবই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

(৩নং) অখণ্ড ভাবের ঘরে—৩/ক ভাবের রূপ; ৩/খ ভাবের নাম; ৩/গ ভাবের ভাব; ৩/ঘ ভাবের বোধ। এ সবই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

(৪নং) অখণ্ড বোধের ঘরে—৪/ক বোধের রূপ; ৪/খ বোধের নাম; ৪/গ বোধের ভাব; ৪/ঘ বোধের বোধ। এ সবই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

৪/ঘ হল বোধের বোধ। তা চতুর্বিধ স্তরের অন্তর্গত চতুর্বিধ অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা; অর্থাৎ সর্বোত্তম পরিণাম, গতি ও স্থিতি। এ-ই হল অভয়পদ, অমৃতপদ, অমৃতত্ব ও মুক্তিশান্তির অধিষ্ঠান। এ সবই পরমাত্মগুরুর কৃপাসিদ্ধির ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে সদ্‌গুরু-প্রসাদে আরও যা অবগত হওয়া যায় তা হল ঃ

১ম আশীর্বাদ; ২য় কৃপা; ৩য় করুণা এবং ৪র্থ হল অনুগ্রহ বা অনুকম্পা।

গুরুর আশীর্বাদের অন্তর্ভুক্ত হল (১নং) অখণ্ড রূপের ঘর। (১নং) রূপের ঘর আবার (I) স্থূল (II) সূক্ষ্ম (III) সূক্ষ্মতর ও (IV) সূক্ষ্মতম ভেদে চতুর্বিধ। তার সঙ্গে নাম, ভাব ও বোধের রতিসন্ধিযোগ ও সমাস স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই যুক্ত।

তাঁর কৃপার অন্তর্ভুক্ত হল (২নং) অখণ্ড নামের ঘর। নামের ঘর আবার (I) স্থূল (II) সূক্ষ্ম (III) সূক্ষ্মতর ও (IV) সূক্ষ্মতম ভেদে চতুর্বিধ। তার সঙ্গে রূপ, ভাব ও বোধের রতিসন্ধিযোগ ও সমাস স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই যুক্ত।

তাঁর করুণার অন্তর্ভুক্ত হল (৩নং) অখণ্ড ভাবের ঘর। ভাবের ঘরও আবার (I) স্থূল (II) সূক্ষ্ম (III) সূক্ষ্মতর ও (IV) সূক্ষ্মতম ভেদে চতুর্বিধ। তার সঙ্গে রূপ, নাম ও বোধের রতিসন্ধিযোগ ও সমাস স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই যুক্ত।

তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পর্যায়ভুক্ত হল (৪নং) অখণ্ড বোধের ঘর। বোধের ঘরও আবার (I) স্থূল (II) সূক্ষ্ম (III) সূক্ষ্মতর ও (IV) সূক্ষ্মতম ভেদে চতুর্বিধ। তার সঙ্গে রূপ, নাম ও ভাবের রতিসন্ধিযোগ ও সমাস স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই যুক্ত।

(৪নং) বোধের ঘরের সূক্ষ্মতম স্তরই হল বোধের বোধ। তা-ই হল পরমেষ্ঠিগুরুর স্বরূপ। এই পরমেষ্ঠি-গুরুই পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ং। ভক্তের ভাষায় তাঁকেই বলা হয় পুরুষোত্তম ভগবান। এই পরমেষ্ঠি-গুরুই হলেন ব্রহ্মিষ্ঠ। এই ঘরের অন্য তিনটি স্তর ঊর্ধ্ব থেকে যথাক্রমে—বোধের ভাব, বোধের নাম ও বোধের রূপ। এ সব হল পরমেষ্ঠিগুরুর লীলাভূমি।

(৩নং) ভাবের ঘরের সূক্ষ্মতম স্তর হল ভাবের বোধ। তা-ই হল পরাপরমগুরুর স্বরূপ। এই পরাপরম গুরুই হলেন ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান। ভক্তের ভাষায় তাঁকে শিব বলা হয়। এই ঘরের অন্য তিনটি স্তর ঊর্ধ্ব থেকে যথাক্রমে—ভাবের ভাব, ভাবের নাম, ভাবের রূপ—এ সব হল পরাপরম শিবগুরুর লীলাভূমি।

(২নং) নামের ঘরের সূক্ষ্মতম স্তর হল নামের বোধ। তা-ই হল পরমগুরুরস্বরূপ। এই পরমগুরুই হলেন ব্রহ্মবিদ্‌বর। ভক্তের ভাষায় তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়। এই ঘরের অন্য তিনটি স্তর ঊর্ধ্ব থেকে যথাক্রমে—নামের ভাব, নামের নাম ও নামের রূপ—এ সব হল বিষ্ণুদেবের লীলাভূমি।

(১নং) রূপের ঘরের সূক্ষ্মতম স্তর হল রূপের বোধ। তা-ই হল মহাগুরুর স্বরূপ। এই মহাগুরুই হলেন ব্রহ্মবিদ্। ভক্তের ভাষায় তিনিই হলেন ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই ঘরের অন্য তিনটি স্তর ঊর্ধ্ব থেকে যথাক্রমে—রূপের ভাব, রূপের নাম ও রূপের রূপ—এ সব হল স্রষ্টা ব্রহ্মার লীলাভূমি।

(৪নং) বোধের ঘরের (III) সূক্ষ্মতর স্তর অর্থাৎ বোধের ভাব-এর মূর্তস্বরূপ হলেন ব্রহ্মর্ষি। (৩নং) ভাবের ঘরের (III) সূক্ষ্মতর স্তর অর্থাৎ ভাবের ভাব-এর মূর্তস্বরূপ হলেন রাজর্ষি। (২নং) নামের ঘরের (III) সূক্ষ্মতর স্তর অর্থাৎ নামের ভাব-এর মূর্তস্বরূপ হলেন দেবর্ষি। (১নং) রূপের ঘরের (III) সূক্ষ্মতর স্তর অর্থাৎ রূপের ভাব-এর মূর্তস্বরূপ হলেন মহর্ষি।

(৪নং) বোধের ঘরের (II) সূক্ষ্ম স্তর অর্থাৎ বোধের নাম-এর মূর্তস্বরূপ হলেন মুক্তস্বরূপ। (৩নং) ভাবের ঘরের (II) সূক্ষ্ম স্তর অর্থাৎ ভাবের নাম-এর মূর্তস্বরূপ হলেন নামসিদ্ধ পুরুষ। (২নং) নামের ঘরের (II) সূক্ষ্ম স্তর অর্থাৎ নাম-এর মূর্তস্বরূপ হলেন দেবদেবিগণ। (১নং) রূপের ঘরের (II) সূক্ষ্ম স্তর অর্থাৎ রূপের নাম-এর মূর্তরূপ হল ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং রূপের গুণ ও শক্তি।

(৪নং) বোধের ঘরের (I) স্থূল স্তর অর্থাৎ বোধের রূপ-এর মূর্তস্বরূপ হল জীবের বুদ্ধিবিজ্ঞান। (৩নং) ভাবের ঘরের (I) স্থূল স্তর অর্থাৎ ভাবের রূপ-এর মূর্তস্বরূপ হল জীবের মন। (২নং) নামের ঘরের (I) স্থূল স্তর অর্থাৎ নামের রূপ-এর মূর্তস্বরূপ হল জীবের কর্ম, ক্রিয়া ও গতি। (১নং) রূপের ঘরের (I) স্থূল স্তর অর্থাৎ রূপ-এর মূর্তস্বরূপ হল স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি।

ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম-গুরুর পরিচয়—মন্ত্রতত্ত্বের মাধ্যমে স্থান বিশেষে বলা হয়েছে

ঈশ্বরাত্মব্রহ্মগুরুর যথার্থ স্বরূপ স্বানুভূতির ভাষায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করতে গেলে সমগ্র অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা দরকার। গুরুতত্ত্বের প্রসঙ্গ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্বানুভূতির ভাষায় তা গুরুভক্তদের কাছে বিশদ্ ভাবে বর্ণনা করতে গেলে সমগ্র দেবদেবীতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুণ ও প্রকৃতি তত্ত্ব, এক কথায়, সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। তবে তা সর্বসাধারণের অধিগম্য হওয়া কঠিন। কেবলমাত্র যোগ্য অধিকারীর পক্ষেই হয়তো তা আদরে গৃহীত হতে পারে। তা-ও অন্তরের ব্যাকুলতা, সততা ও নিষ্ঠার উৎকর্ষের উপরে নির্ভর করে।

মন্ত্রতত্ত্বে[১]র অধ্যায়ে যে-ভাবে মন্ত্রের ক্রমকে বিজ্ঞানভিত্তিতে সুবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা বিশদ্ ভাবে অনুশীলন করলে সাধক ও পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে উপরোক্ত প্রসঙ্গের আলোচনা এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের তাৎপর্য আলোচনা সবই স্বানুভূতির আলোতে ব্যক্ত করা হয়েছে অধিকারীর মানের ক্রম ধরে। মন্ত্রগুলির তাৎপর্য ১নং থেকে ১৬নং পর্যন্ত যে-ভাবে পর্যায়ক্রমে সাজান হয়েছে তা-ও স্বানুভূতির দৃষ্টিতেই। এই মন্ত্রগুলি সবই স্বানুভবসিদ্ধ। যে-ভাবে হৃদয়ক্ষেত্রে ধ্যানের গভীরে সমাধির সর্বোত্তম অবস্থাতে ও সর্বোত্তম অনুভূতির স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ফুটে উঠেছে, সমাধিভঙ্গের পরে অর্থাৎ ব্যুত্থানের পবে সে-ভাবেই তা সূত্রাকারে, সঙ্গীতাকারে অভিব্যক্ত হয়েছে কখনও কখনও। সেই সমস্ত প্রসঙ্গ যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাধিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই হয় তত্ত্বানুভূতি ও তত্ত্বের বিজ্ঞান হয় স্বানুভবসিদ্ধ

তত্ত্বভূমিতে তত্ত্বানুভূতি ও তত্ত্বের বিজ্ঞান যে-ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয় তা কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধদের কাছেই সহজবোধ্য। সমাধিলব্ধ জ্ঞানেই হয় অনুভবসিদ্ধি। কেবলমাত্র বুদ্ধির বিচার, বিশ্লেষণ ও অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা ও ক্রিয়া-কলাপ সাধনের মাধ্যমে তা সম্যক্‌রূপে অধিগত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। বুদ্ধির উৎকর্ষ অনুশীলন দ্বারা হয় সত্য, কিন্তু তার দ্বারাও সমাধিলব্ধ জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেই স্তরের জ্ঞান ও অনুভূতির ধারক, বাহকও বুদ্ধি হতে পারে না। তা তর্কের বিষয় নয়—অনুভবসিদ্ধ বিষয়। বুদ্ধির জ্ঞাতাভাব রজোগুণাত্মক। রজোগুণী বুদ্ধি অংশদর্শী, কিন্তু সমদর্শী সে হতে পারে না। রজোগুণের লক্ষণই হল অশান্ত, অস্থির, চঞ্চল,

১। মন্ত্রতত্ত্ব প্রসঙ্গে ১নং থেকে ১৬নং মন্ত্রর বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে ভবিষ্যতে তাও গ্রন্থাকারে পাওয়া যাবে।

বিকার ও সক্রিয়ভাব। সমতা, একতা প্রভৃতি হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ। সত্ত্বগুণী বুদ্ধি নিরভিমান ও অকর্তা ভাবে প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে বুদ্ধির দ্রষ্টাবোধ জাগে এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিকাশে তার মধ্যে সাক্ষিবোধ জাগে। শুদ্ধসত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্যই হল বোধিস্বরূপের সঙ্গে অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির ঐক্য ও তাদাত্ম্যসিদ্ধি। তা সমাধির গভীরেই সাধিত হয়। সমাধির তাৎপর্যই হল মন ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব ও অভিমান নিরসন। তা সাধারণ বুদ্ধির অধিগম্য নয়। সাধারণ বুদ্ধি তমোরজোগুণাত্মক। তমোগুণের প্রভাব কাটে রজ ও সত্ত্ব গুণযোগে। রজোগুণের প্রভাব কাটে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে। সত্ত্বগুণের বিকাশে হয় শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের উদয়। সত্ত্বগুণীর শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ও জ্ঞান সাধনক্রমে বহুলাংশে দিব্য, মার্জিত ও উন্নত হলেও তা সম্পূর্ণ তমোরজোগুণের প্রভাবমুক্ত নয়। সেই জন্য তাবও বিকার হয়। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিকাশে ও প্রকাশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ও জ্ঞানের পূর্ণ শোধন হয় এবং তখন সর্ববিকার মুক্ত হয়। তার ফলে হৃদাকাশের বা হৃদয়স্থ চিৎতত্ত্বের—ঈশ্বরাত্মব্রহ্মের নিরন্তব স্ফূর্তি হয় অর্থাৎ অবাধিত প্রকাশ হয়। শুদ্ধসত্ত্বগুণের পূর্ণ প্রকাশের আগে সাধককে সাধনার বিজ্ঞান যত্নপূর্বক অনুশীলন করতে হয়। সেই কারণে অনুসরণকারীদের জন্য যথাযথ অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ সর্বক্ষেত্রেই স্বীকৃত।

অনুশীলনক্রমে ব্যতিক্রম দোষে ভাবের বিপর্যয় না-হওয়ার জন্য সাবধানতা

অনুশীলনক্রমে যা সাধিত হয় তা স্বভাবপ্রকৃতির মান ও ক্রম ধরেই হওয়া উচিত। নতুবা ব্যতিক্রম দোষে ভাবের বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাবের বিপর্যয় হলে বোধের ঘরে প্রবেশ করা যায় না। তার ফলে স্বভাবের বিকাব দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বোধের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই বিকার শোধন করা তখন খুব সহজসাধ্য হয় না। সেই জন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে মহাজনগণ অনুশীলনকারীদের জন্য সাবধানবাণী রেখেছেন।

এই সব বিবেচনা করেই গুরুমন্ত্রের তাৎপর্য স্বানুভূতির আলোতে ব্যক্ত করা হয়েছে। তার ফলে গুরুবাদ ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের যে ভয়, ভীতি ও ভুল ধারণা তা নিরসন হবে। পক্ষপাতদোষ ও মতবাদের গোঁড়ামির মূলেও তা সম্যক্ আলোকপাত করবে, যাতে গুরুমন্ত্রের তাৎপর্য গুরুমন্ত্র সাধনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে সবাই অনুভব করতে পারে।

সর্ববিধ বিকারমুক্ত হওয়ার জন্য, জীবনে যথার্থ স্থায়ী সুখ ও আনন্দ পাবার জন্য যদি কারও মনে ব্যাকুলতা বা তীব্র ইচ্ছা জেগে থাকে তাহলে সদ্‌গুরু লাভের সুযোগ সে পাবেই। সিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গে মন্ত্রতত্ত্বের প্রতিমন্ত্রের তাৎপর্য আলোচনাকালে যে সব কথা স্বানুভূতির দৃষ্টিতে বা আলোতে বলা হয়েছে তা জাতি, বর্ণ, আশ্রম, লিঙ্গ নির্বিশেষে এবং মতপথ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে তর্ক বা সমালোচনা যে আত্মবিরোধী, স্বভাববিরোধী এবং মুক্তিশান্তির অন্তরায় তাও যথার্থ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে স্থান বিশেষে।

গতানুগতিক অধ্যাত্মসাধনার প্রসঙ্গ এখানে তোলা হয়নি। কেবলমাত্র স্বানুভূতির অধ্যায়কে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে স্বানুভূতির বিজ্ঞানদৃষ্টিকে অবলম্বন করে।

একত্ব-এর বিজ্ঞানের মাধ্যমে হয় অদ্বয় পরমাত্মবোধের পরিচয়; অখণ্ড আপনবোধে স্বানুভূতিযোগেই তা সিদ্ধ

বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবনের চরম লক্ষ্য হল জীবনের মূল উৎস যা তার সঙ্গে সম্যক্‌রূপে পরিচিত হওয়া; এবং তা সম্ভব হয় বুদ্ধির পশ্চাতে যে পরম বোধসত্তা অর্থাৎ যে চিদানন্দঘন আত্মসত্তা আছে তাঁর সম্যক্ অনুসন্ধান দ্বারা তাঁর পরিচয় অবগত হলে। এই আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হওয়ার জন্য যা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় তা হল আত্মা-অনাত্মার বিবেক অনুশীলন বা অভ্যাস অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধান বা

স্বরূপানুসন্ধান, অনাত্মপ্রীতি ত্যাগ এবং আত্মপ্রীতির যোগ বা অনুরাগ; অর্থাৎ আত্মা অতিরিক্ত কল্পনা, ভাব তথা অনাত্মার প্রতি সম্যক্ বিরক্তি বা বিরাগপূর্বক তার বর্জন এবং নিত্য, পূর্ণ, দিব্য স্বস্বরূপের প্রতি অনুরাগ ও প্রেম। যে দিব্য, পূর্ণ, অমৃত আত্মাই স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রতি অনুরাগকে বা প্রেমকেই দিব্যপ্রেম বা ঈশ্বরপ্রেম বলে। দিব্য আত্মার প্রেম বা ঈশ্বরপ্রেম অর্থে সমগ্র অনাত্মপ্রীতির অভাবই বোঝায়। সুতরাং যে দিব্য পরম অদ্বয়সত্তা চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁর পরিচয় ও অনুভূতি যে অখণ্ড আপনবোধে সিদ্ধ হয় তা-ই যথার্থ আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রেম, সত্যদর্শন, সত্যানুভূতি বা স্বানুভূতি। একেই পূর্ণের বিজ্ঞান, সমত্বের বিজ্ঞান ও এক-এর বিজ্ঞান প্রভৃতি সংজ্ঞায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবই জীবভাবের অবসানের উদ্দেশ্যে।

সমগ্র অনুশাসন বিজ্ঞানের প্রয়োজন স্বাত্মসিদ্ধি তথা স্বানুভূতি লাভের পূর্ব পর্যন্তই

শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তি ও অখণ্ড প্রেমের উৎকর্ষ লাভের জন্যই সমগ্র অনুশাসন বিজ্ঞানের প্রয়োজন। উদ্দেশ্যসিদ্ধি অন্তে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্তি হলে অনুশাসনের আর প্রয়োজন থাকে না' তা আপনিই আত্মবোধসত্তায় বিলীন হয়ে যায়; থাকে শুধু শুদ্ধ বোধসত্তার স্ফূর্তি কেবল, যাকে স্বানুভূতি বলা হয়েছে।

জীবত্বের কারণ ও তার মুক্তির উপায়

কার্যের দ্বারা কার্য বাড়ে ও কার্য সিদ্ধ হয় কিন্তু কার্যকে অতিক্রম করা যায় না। কার্যের ফল কর্তাকে ভোগ করতে হয় যে-কারণে তা হল কর্মফলে আসক্তি ও কর্তৃত্বভাব। জীবের জীবত্ব এই কর্মফলে আসক্তি ও কর্তৃত্ব ভাবের সঙ্গে যুক্ত। এর কারণ হল ভোগেচ্ছা কাম, ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান। এই তিনের সংমিশ্রণে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার জীবভাব ধারণ হয়। এই জীবভাবের পরিণাম হল নিরন্তর বিকারশীল ও পরিণামশীল। তাকে ত্রিগুণাপ্রকৃতির কার্য-কারণ ও কারণ-কার্য নীতির অধীনে অনন্ত কাল চক্রাকারে ঘুরতে হয় এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির বিকারাদি ভোগ করতে হয়। এই হল জীবভাবের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এর থেকে মুক্ত হবার তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা জাগলে সদ্গুরুর কৃপালাভের সুযোগ হয় এবং মুক্তির মন্ত্র ও বিজ্ঞান লাভেরও সুযোগ পাওয়া যায়। তবে মুক্তিলাভের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতার তীব্রতার মান অনুসারে গুরুকৃপা লাভের সুযোগ আসে।

শরণাগত উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সদ্গুরুর সম্যক্ অনুভূতি সম্ভব

গুরুমন্ত্রের তাৎপর্য যথার্থ ভাবে ব্যক্ত করার সময় গুরুর স্বরূপ, তাঁর স্বভাব, কার্য ও মহিমা সবই স্বানুভূতির ভাষায় বলা হয়েছে। সে সব অবশ্য তাদের পক্ষেই ফলপ্রদ যারা সাদরে তা গ্রহণ ও বরণ করে আচরণ করবে।

উত্তম অধিকারী ভিন্ন মহাপুরুষের নিত্যসঙ্গ অসম্ভব

জগতে মনুষ্যদেহ লাভ, মুমুক্ষুতা ও মহাপুরুষের সংশ্রব এই তিনটিকে সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বলা হয়েছে। প্রথম দু'টি যদিও বা লভ্য কিন্তু তৃতীয়টি অত্যন্ত দুর্লভ। মহাপুরুষের কৃপা পাওয়া যায় কিন্তু নিরন্তর তাঁর সঙ্গ পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র উত্তম অধিকারীর পক্ষেই তা ঘটে থাকে। বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই জীব উত্তম অধিকারীতে পরিণত হয়। সবই নির্ভর করে অন্তরের ব্যাকুলতা, তীব্র ইচ্ছা, সততা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের উপরে।

সত্তা ও স্বভাব অনুরূপ শ্রদ্ধার তাৎপর্য

সত্তা ও স্বভাব অনুরূপ হয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। আবার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অনুরূপ হয় স্বভাব ও সত্তা। শ্রদ্ধাময় পুরুষই হল জীব ও মানুষ। তার যেমন শ্রদ্ধা তেমন স্বভাব এবং যেমন স্বভাব তেমন শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হল তার সত্তা অনুরূপ। তার সত্তা হল পরমাত্মসত্তার অভিন্ন অংশ। তা-ও অনুভূতিসাপেক্ষ বিষয়। সদ্‌গুরু কৃপা করে এই অনুভূতি জাগিয়ে দেন। তার প্রসঙ্গে আরও কিছু বলা দরকার।

ঈশ্বর-আত্মার জ্ঞান কেবল সদ্‌গুরুর জীবনমাধ্যমেই সিদ্ধ হয়

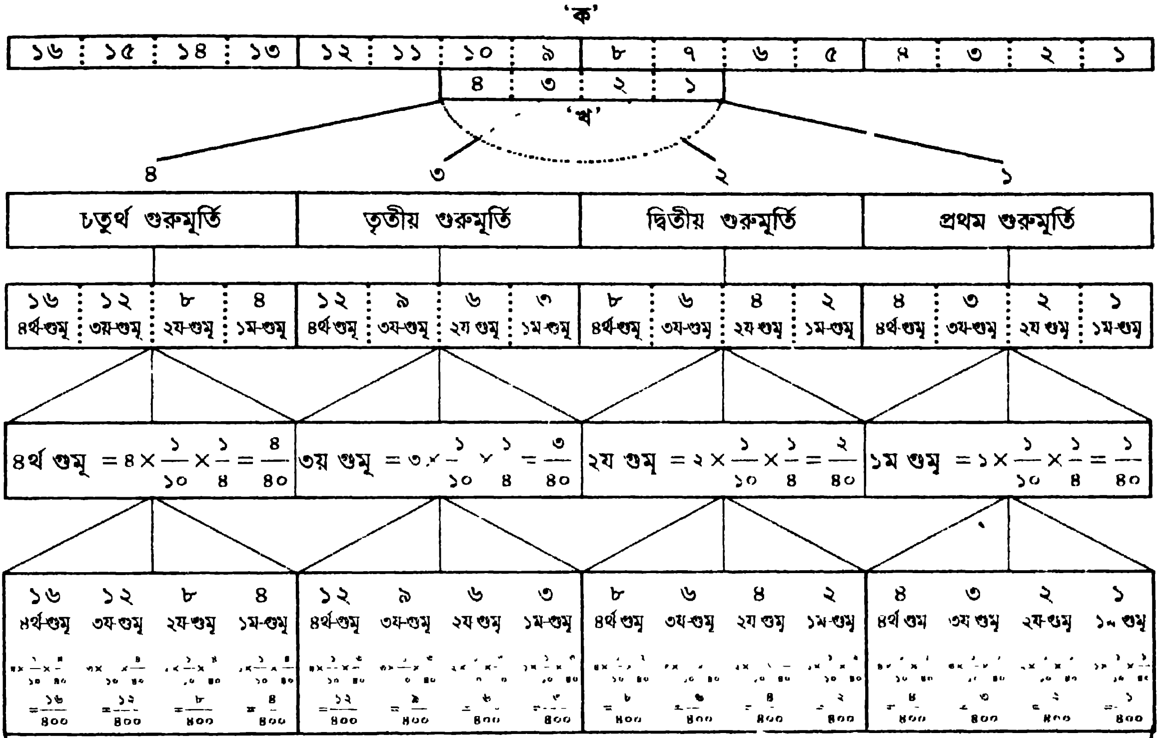
জীবনে সদ্‌গুরুলাভের যেমন একান্ত প্রয়োজন আছে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন হল সদ্‌গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ বা অনুভূতি। মনুষ্যদেহে গুরুকে ঈশ্বরাত্মজ্ঞানে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করা বা মানা ও জানা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সাধারণ জীবন অশুদ্ধ ভাব ও আবেগের অধীন। এই অশুদ্ধ ভাব ও আবেগ ত্রিগুণাপ্রকৃতির প্রভাবেই সঞ্জাত হয় ও তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোগেচ্ছা কামের তাড়নায় জীব প্রকৃতির অধীনে প্রকৃতির সেবায় বেশির ভাগ রত থাকে এবং তাতেই অধিক সময় কাটায়। প্রকৃতির বিপর্যয়ে স্বভাবের যে বিপর্যয় হয় তা জীব সহজে বুঝতে পারে না। তার কাম্য বস্তু লাভের প্রতি যে আগ্রহ, ব্যাকুলতা তাকেই সে কর্তব্য বলে মনে করে এবং এই কর্তব্য পালনের গুরুত্বের উপরেই তার দায়িত্ববোধ নিহিত। সেই জন্য কর্তব্যের প্রেরণা ও দায়িত্ববোধের যে তাড়না, এই উভয়ের দ্বারাই জীব বিভ্রান্ত হয়ে তার সত্য, মুক্ত, দিব্য, পূর্ণ ও অমৃতস্বরূপ আত্মবোধের স্মৃতি বিস্মৃত হয়। এই আত্মবিস্মৃতি তার বুদ্ধিদোষেই ঘটে থাকে। তার বুদ্ধির দোষ বা মল সবই অবিদ্যাপ্রসূত ত্রিগুণের প্রভাবজনিত ফল ও কার্য। বুদ্ধির অধীনে চলে জীব গুণের অধীনে, গুণের দাস হয়েই জীবনযাপন করে। সেই জন্য তাকে প্রকৃতির দাস বলা হয়। প্রকৃতি বিকারী ও পরিণামী বলে প্রকৃতিজাত সর্ব রূপ-নাম-ভাব, কার্য ও ফলাদি সবই বিকারী ও পরিণামী। তার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধি ও অহংকারও বিকারী ও পরিণামী, যাকে কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। এটি জীবভাব ও বুদ্ধির যুক্তি। এই যুক্তির কারণ হল তার স্বভাবজাত গুণ ও প্রকৃতির আনুগত্য।

আত্মবিস্মৃত জীব ভ্রান্তিবশত জীবনভর অনাত্মার সেবাই করে; মুক্তাত্মার মর্যাদা বোঝে না

আত্মবিস্মৃত জীব অনাত্মা প্রাকৃত সত্তাকেই ভ্রান্তিবশত আত্মা বা সত্য বলে মানে এবং তার প্রাপ্তি. লাভ ও ভোগের জন্য সতত যত্নবান হয়। সেই জন্য তার ভোগের জীবন, ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কিছু আর ভাবতে পারে না, ভাবার ইচ্ছাও হয় না এবং ভাবার সময়ও পায় না। এইরূপ আত্মবিস্মৃত ভোগী জীবন অনিত্য, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, বিনাশী ও বিকারধর্মী প্রকৃতিজাত নাম, রূপাদির সঙ্গে যুক্ত থেকে তার চিন্তায় চলেই অভ্যস্ত। তার ব্যতিক্রম কখনও কখনও হতে দেখা যায় কেবলমাত্র সাময়িক ভাবে যখন দুর্দশার মাত্রা তার অধিক হয়। তখন সে প্রকৃতিজাত ভোগ্য বস্তুর বিকার ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাময়িক ভাবে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে। তখন মুক্তির প্রয়োজন স্বল্প ভাবে চিন্তা ও ধারণা করলেও এর গুরুত্ব স্থায়ী হয় না। সেই জন্য অধিক দূর সে এ বিষয়ে আর অগ্রসরও হতে পারে না। এর কারণ তার অন্তরের ভোগেচ্ছা কামের সংস্কার। এই কামসংস্কার দেহধারণ ও কর্মপ্রেরণার মূলে সব সময়েই ইন্ধন যোগায়। এ-ই হল অবিদ্যামায়ার কাজ। জীব মায়াপাশে বদ্ধ বলে প্রকৃতিমায়ার দাস হয়েই চলে। প্রকৃতির অধীনে থেকে, প্রকৃতির রূপান্তর বা পরিবর্তনের গতির প্রতিকূলে সে বিব্রত, দুঃখিত ও বিভ্রান্ত হয়। তা থেকে সাময়িক মুক্তি বা রেহাইও পেতে চায় এবং সময় ও অবস্থা অনুরূপ ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে। সেই জন্য সে কখনও বা অপরের কথায় কিছু ধর্মচর্চারও প্রয়াস পায়। কিন্তু প্রকৃতির গতির অনুকূল হাওয়ার উদয়ে বা উপস্থিতিতে সে তার পূর্বসংস্কারবশত

চিত্র নং—৩

গুরুমূর্তির চতুর্বিধ অভিব্যক্তিব অনুচিত্র



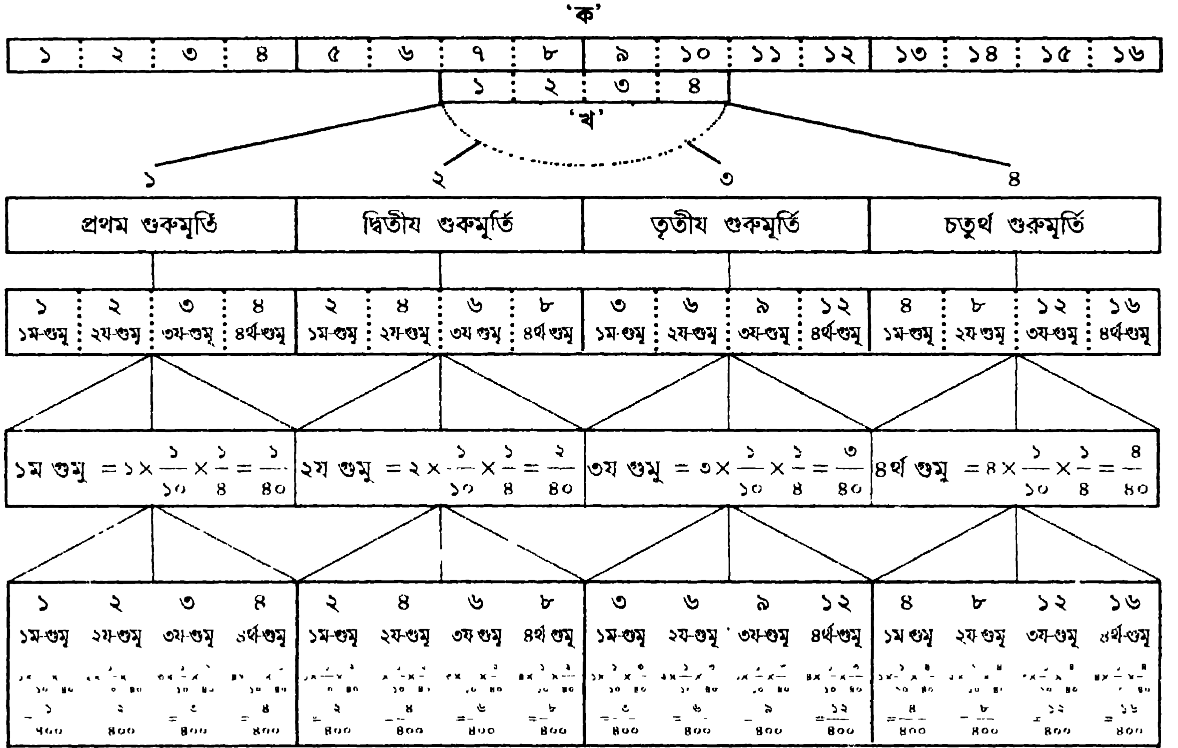
বিশ্বলীলায় পরমাত্মাদেবের চতুর্বিধ গুরুরূপে অভিব্যক্ত রূপের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ মাধ্যমে জীবজগতের দিব্য রূপায়ণের পূর্ণ দর্শন ও তার অনুভূতির ক্রমিক মানের পূর্ণাঙ্গ অনুচিত্র (নক্সা)

১। **প্রথম গুরুমূর্তি = ১ম-গুমূ** (প্রথম গুরুমূর্তি), ২। দ্বিতীয় গুরুমূর্তি = ২য়-গুমূ (দ্বিতীয় গুরুমূর্তি)

৩। **তৃতীয় গুরুমূর্তি = ৩য়-গুমূ** (তৃতীয় গুরুমূর্তি), ৪। চতুর্থ গুরুমূর্তি = ৪র্থ-গুমূ (চতুর্থ গুরুমূর্তি)

চিত্র নং—৪

গুরুমূর্তির চতুর্বিধ অভিব্যক্তির অনুচিত্র



বিশ্বলীলায় পরমাত্মাদেবের চতুর্বিধ গুরুরূপে অভিব্যক্ত রূপের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ মাধ্যমে জীবজগতের দিব্য রূপায়ণের পূর্ণ দর্শন ও তার অনুভূতির ক্রমিক মানের পূর্ণাঙ্গ অনুচিত্র (নক্সা)

১। প্রথম গুরুমূর্তি = ১ম-গুমু (প্রথম গুরুমূর্তি), ২। দ্বিতীয় গুরুমূর্তি = ২য়-গুমু (দ্বিতীয় গুরুমূর্তি)
৩। তৃতীয় গুরুমূর্তি = ৩য়-গুমু (তৃতীয় গুরুমূর্তি), ৪। চতুর্থ গুরুমূর্তি = ৪র্থ-গুমু (চতুর্থ গুরুমূর্তি)

গুণগত জাগতিক ব্যাপারেই লিপ্ত হয়ে পড়ে। এইরূপ প্রাকৃতিক প্রতিকূল ও অনুকূল এবং অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় তাকে পুনঃপুনঃ ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়। বহু জন্ম যায় এইরূপ স্বভাব ও প্রকৃতির উত্থান-পতনের ক্রমের মধ্য দিয়ে। এইরূপ অবস্থায় তার কখনও লৌকিক গুরু লাভ হলেও সদ্‌গুরু লাভ সম্ভব হয় না। কারণ তখন তার জীবনমুক্তি, দিব্যজীবন ও অমৃতস্বরূপ আপনার সত্য পরিচয় অবগত হওয়ার বা জানার তেমন তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা জাগে না।

মুক্তিলাভের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতার সংস্কারের মান অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়

মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা অন্তরে না-জাগলে গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ, সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ সম্ভব হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুমূর্তির সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁদের সঙ্গলাভও অন্তরেব উপযুক্ত চাহিদা ও তাগিদের ফলেই হয়ে থাকে। সর্বস্তরের গুরু তৈরি হয়েই আছে সৃষ্টির মধ্যে। এক অখণ্ড পরম সত্তা ও শক্তি যা পরমতত্ত্বের বিজ্ঞানমূর্তি অর্থাৎ পরমেষ্ঠিগুরুর-ই অন্তর্গত, তাঁর প্রকাশবিভূতি হল অন্যান্য গুরুমূর্তিসকল।

প্রকৃতিজাত কারণ-কার্য এবং কার্য-কারণ সবই এক পরম দিব্য সত্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত

সৃষ্টিব মধ্যে গুরুমূর্তির আবির্ভাব ও তার কার্যাবলী হল পরম দিব্য সত্য ও অমৃতের স্বতঃস্ফূর্ত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তা ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত যে কারণে, চিৎতত্ত্বের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তা-ও পূর্বে বলা হয়েছে। জীবনেব ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে যা-কিছু ঘটে তার কারণও তার মূলে নিহিত থাকে। কারণের অন্তর্গত কার্য এবং কার্যের অন্তর্গত কারণ সবই এক পরম দিব্য সত্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জীবজগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সবই বাহ্য জ্ঞান-অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-জ্ঞানের বিলাস। এ সবই সেই পরম দিব্য অখণ্ড এক বিজ্ঞানের লীলাবিলাস। সেই এক বিজ্ঞানেব অধিষ্ঠান হল পরমতত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বরাখ্যব্রহ্ম স্বয়ং।

সংসারীদের গুরুলাভের প্রসঙ্গ

গতানুগতিক সংসারজীবনের বৈশিষ্ট্যই হল তা গুণাধীন ও কালাধীন এবং ফলাসক্তি, কর্মাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমানপ্রধান। এ যে তার জীবনবন্ধনের কারণ তা সে জানে না এবং শুনলেও মানে না। কিন্তু অবস্থার চাপে ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে যখন তাকে সংসারে থেকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপযোগী যা-কিছু তার সংগ্রহের জন্য এবং অভাব, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় বারবার, তখনই তার প্রয়োজন হয় বৃহত্তর শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্য। তখন তার সকামজীবন মুক্তি কামনা করে। মিথ্যা, বিকার, মৃত্যু, অজ্ঞান, দুঃখ ও অশান্তির হাত থেকে সম্যক্‌রূপে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে একজন ত্রাতাকে খোঁজে; যোগ্য, শক্তিমান, সর্বতোভাবে সমর্থ ও নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে এমন একজনকে সে তখন চায়। সেই জন্য সে কামনা করে, প্রার্থনা করে ও ব্যাকুল ভাবে অন্বেষণ করে। তার ব্যাকুলতার মান অনুসারে তার গুরুলাভ হয়।

যোগ্যতার মান অনুসারে পর্যায়ক্রমে গুরুলাভের বিজ্ঞান

প্রথম পর্যায়ের গুরু তাকে দৈহিক ও জাগতিক ব্যাপারে উন্নতির পথ ও তার সাধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে নির্দেশ দেন এবং বস্তুজগতের নাম-রূপের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। কিন্তু বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি পারেন না। বাহ্য জগতের অর্থাৎ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারাদির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোটামুটি ধারণা তিনি করিয়ে দিতে পারেন কিন্তু তারও সম্যক্ পরিচয়,

যা স্থূলের কারণে নিহিত তা পরবর্তী স্তরেব গুরুর মাধ্যমেই জানা যায়। জাগতিক বিদ্যা এবং অর্থকরী বিদ্যালাভে সাহায্য করেন তিনি। এই প্রথম পর্যায়ের গুরুশক্তি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা হল মাতা-পিতা থেকে আরম্ভ করে জাগতিক শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তর পর্যন্ত।

প্রথম গুরুমূর্তি নামে গুরুবাদ ও গুরুতত্ত্বে যা-কিছু বলা হয়েছে তা এই প্রথম পর্যায়ের গুরুর প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। সংসারজীবনে জীবের সর্ববিধ প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাপারে প্রথম গুরুমূর্তি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তার অসমাপ্ত কাজ সিদ্ধ বা সমাপ্ত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর শক্তি ও কার্য যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা সম্যক্‌রূপে হল স্থূল জগতের অন্তর্গত; তার কারণ হল সূক্ষ্ম জগতের শক্তি ও সত্তা তথা দেবদেবীর পরিচয় ও তাঁদের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও অনুভূতি।

সংসারজীবনে জীবের অর্থাৎ মানুষের বৈষয়িক সুখ, ঐশ্বর্য ও উন্নতির ব্যাপারে এই সূক্ষ্ম স্তরের দেবদেবীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং তাঁদের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রথম গুরুমূর্তির অধীনে কর্মময় জীবনের সূত্রপাত এবং তার বিকাশ ও প্রকাশ ব্যাপক ভাবে সাধিত হয়; এবং তার পরিণতি লাভ হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে ধর্মচর্চার অনুশীলন দ্বারা। দ্বিতীয় গুরুমূর্তির প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হল ধর্মচর্চার মাধ্যমে কর্তব্যের উৎকর্ষসাধন এবং দেবদেবীর পূজা, আরাধনা, যাগ-যজ্ঞ ও নানাবিধ সৎ ক্রিয়া-কলাপাদির অনুষ্ঠান। এদের সমষ্টিকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হয়। এর দ্বারা ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সমাজজীবনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ, ঐক্য ও প্রীতিপূর্বক ভাবের সম্বন্ধ বর্ধিত হয়।

প্রথম পর্যায়ের গুরুর অধীনে কর্মবিদ্যা, দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে ধর্মবিদ্যা অনুশীলন

কর্ম দিয়ে যে জীবন আরম্ভ হয় তার উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয় ধর্মের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরে। কর্ম-বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে গুরুর প্রয়োজন হয় তাঁকে প্রথম গুরুমূর্তির অধীনে প্রথম পর্যায়ের গুরু বলা হয়েছে। এই গুরুর কাজ হল স্থূল নাম-রূপের সম্যক্ পরিচয় শিক্ষা দেওয়া এবং কর্মের নিপুণতা ও দক্ষতা যাতে সাধিত হয় তার জন্য সাহায্য করা। এই কর্ম হল সকাম কর্ম অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তিজনিত যে কর্ম তার সাধন। এই দিয়েই হয় সংসারজীবনের আরম্ভ এবং সংসারজীবনের সূচনা। এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য দরকার হয় ধর্মচর্চা। ধর্ম বলতে এখানে কর্তব্যনিষ্ঠার অধ্যায়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। তা হল জাগতিক উন্নতি ও সুখ লাভের নিমিত্ত সকল নীতিমূলক এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ চিন্তা ও কর্ম, যা পশুজীবন থেকে মানুষকে মনুষ্য স্তরের ভাববোধের যোগ্য অধিকারী করে দেয়। এই ধর্মচর্চার মাধ্যমেই মানুষ জীবনমানের উন্নত স্তরে উপনীত হয় তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মানের বিকাশ দ্বারা। তখন সে স্থূল জগতের অন্তর্নিহিত অধিক ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও বৃহত্তর জগতের পরিচয় জানতে পারে।

দেবদেবীর স্তরের তাৎপর্য

এই সূক্ষ্ম জগৎই হল দেবদেবীর স্তর। তাঁরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম শক্তি ও চেতনার অধিকারী। তাঁদের মাধ্যমেই প্রকৃতির কার্যাবলী জড় থেকে চৈতন্যমুখী হয়; অর্থাৎ জড়ের মধ্যে নিহিত চৈতন্যশক্তির উন্মেষ, প্রকাশ ও বিকাশ আরম্ভ হয়। যদিও জড় বলতে যা বোঝায় তা-ও চিৎশক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। চৈতন্যশূন্য কোনও জড় বস্তুর অস্তিত্ব নেই। জড় অর্থ হল যেখানে চৈতন্য নিষ্ক্রিয় ও সুপ্ত অবস্থায় আছে অথবা সক্রিয় হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সুতরাং ধর্মচর্চার মাধ্যমে জীবজগতের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয় যার অনুশীলন দ্বারা জীব পরস্পরের সঙ্গে আপনার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, জীবনযাত্রা, কর্ম ও তার উৎকর্ষ এবং ধর্ম

ও তার উৎকর্ষ বিষয়ে অধিক সচেতন হয় এবং যার গুরুত্ব উত্তরোত্তর সে অনুভব করে। এ-ই হল ধর্মবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। তা মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও জ্ঞান বিকাশের জন্য সম্যক্‌রূপে সাহায্য করে। সুতরাং দ্বিতীয় গুরুমূর্তির বৈশিষ্ট্য হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষসাধন নিমিত্ত এবং তার জীবনের মানকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম স্তরে উন্নত করার জন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য, শক্তি ও জ্ঞানের অনুসন্ধান বিজ্ঞানকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া। তা সাধিত হয় এবং উৎকর্ষ লাভ করে সূক্ষ্ম স্তরের জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্যক্ অনুশীলনের মাধ্যমে। এই স্তরের জ্ঞানবিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হলেন দ্বিতীয় গুরুমূর্তি স্বয়ং। তাঁর অধীনে হল দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যান্য স্তরের গুরুগণ।

তৃতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে ভাববিজ্ঞানের তথা কারণতত্ত্বের শিক্ষা মেলে

দ্বিতীয় গুরুমূর্তির অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত ও পূর্ণ করার জন্য দরকার হয় তৃতীয় গুরুমূর্তির। এই তৃতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে জীবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্থূল-সূক্ষ্ম স্তরের ঊর্ধ্বে যে কারণের স্তর আছে তার বিজ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ নাম-রূপের যে ব্যাপক স্তর, তার পশ্চাতে যে ভাবের অর্থাৎ কারণের বৃহত্তম স্তর নিহিত আছে তার বিজ্ঞান।

এই কারণের স্তর হল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক। তা বাইরে থেকে অবগত হওয়া যায় না। দ্বিতীয় স্তরের গুরুমূর্তির কাছ থেকে স্থূল ও সূক্ষ্মের বিজ্ঞান পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কারণ স্তরের বিজ্ঞান পাওয়া যায় না। কারণ স্তরের বিজ্ঞান তৃতীয় গুরুমূর্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। তৃতীয় স্তরের এই কারণের বিজ্ঞান বিশ্বাত্মক।

স্থূল-সূক্ষ্ম স্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ হয় সূক্ষ্মতর তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ কারণ স্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা। তৃতীয় গুরুমূর্তি হল কারণ স্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূর্তস্বরূপ। কারণের জ্ঞান-বিজ্ঞান অবগত হলেই স্থূল-সূক্ষ্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং মুক্তির বিজ্ঞান তৃতীয় স্তরের গুরুর অধীন। মুক্তিবিজ্ঞান লাভের যোগ্যতা বাড়ে দ্বিতীয় গুরুমূর্তির অধীনে শিক্ষা প্রাপ্তি দ্বারা। আবার দ্বিতীয় স্তরের গুরুর উপযোগী শিক্ষালাভের যোগ্যতা তৈরি হয় প্রথম স্তরের গুরুর মাধ্যমে শিক্ষালাভের উৎকর্ষ দ্বারা।

তৃতীয় গুরুমূর্তির অধীনে শিক্ষালাভ করার যোগ্যতা জীবের জ্ঞান লাভের মানের উৎকর্ষের উপরে নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ ভাবে জ্ঞাতব্য তা হল অন্তরে স্বভাবের পরিশোধন ও বিকাশের উৎকর্ষ সাধন। তা পর্যায়ক্রমে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার উত্থান-পতনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে যোগ্যতার মানকে অর্থাৎ শক্তি, জ্ঞান ও অনুভূতির মানকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উন্নত ও সত্য জ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

তৃতীয় গুরুর কৃপাশিসের ফলে সাধকের আত্মজ্ঞানলাভ এবং মুক্তিলাভ হয়

তৃতীয় গুরুর কৃপাশিসে ধন্য ও তাঁর অধীনে সাধনসিদ্ধ, শরণাগত ভক্ত-জিজ্ঞাসুই চরম ও পরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। অবশ্য তৃতীয় স্তরের পূর্ণতা লাভ ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত সাধকই আত্মবোধের অধিকারী হয়, তা সত্য। আত্মবোধের বিজ্ঞান দ্বারাই সে শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ ও মুক্ত হয়।

মুক্তির দ্বিবিধক্রম—ব্যষ্টি মুক্তি এবং সমষ্টি মুক্তি প্রসঙ্গে

মুক্তিলাভের পর চরমের বা পরমের সঙ্গে পরিপূর্ণ যুক্ত হয়ে একীভূত হয়ে যাবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন সব মুক্তপুরুষের হৃদয়ে জাগে না। গুরুকৃপায় যে মুক্তিলাভ হয় তারও ক্রম আছে। একটি হল ব্যষ্টি মুক্তি এবং অপরটি হল সমষ্টি মুক্তি বা বিশ্বাত্মক বোধে সুপ্রতিষ্ঠা। তারও ঊর্ধ্বে ভূমাবোধে প্রতিষ্ঠা হল সর্বোত্তম। তাকেই

বিশ্বাতীত বা সর্বাতীত বলা হয়। এই চতুর্থ স্তরের যে অনুভূতি ও তাতে প্রতিষ্ঠা—তা-ই হল যথার্থ স্বানুভূতি পদবাচ্য। মহামুক্তি, পরামুক্তি বা পরাশান্তি এর নামান্তর। তা চতুর্থ পর্যায়ের গুরুর কৃপাতেই সিদ্ধ হয় ও পরমেষ্ঠিগুরুর কৃপায় তার পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। বিশ্বাত্মক স্তর হল অদ্বৈত, কিন্তু বিশ্বাতীত স্তর হল নিত্যাদ্বৈত। তা দার্শনিকদের মতবাদ নয়, স্বানুভবসিদ্ধ সত্য ও তত্ত্বের নির্দেশ মাত্র। তা অন্যান্য গুরুদের অধিকারভুক্ত নয় কারণ তা তাঁদের অনুভবসিদ্ধ তত্ত্ব নয়। তাঁরা এর ব্যবহারে সিদ্ধ নয় বলে যদি তা প্রকাশ করেন তবে তাও কার্যকরী বা ফলপ্রদ হবে না। তা জেনেই তাঁরা এর প্রকাশে ও বিকাশে বিরত থাকেন। সেই জন্য তাঁদের মাধ্যমে নয়, কেবলমাত্র চতুর্থ গুরুমূর্তির মাধ্যমেই এই তত্ত্ব ঘোষিত হয়। চতুর্থ গুরুমূর্তির অধীনে অপর তিনজন গুরুর সক্রিয় রূপ ও পরিচয় হল— ৪নং বোধের ঘরের (IV) সূক্ষ্মতম স্বরূপের অভিব্যক্তি তথা পরমেষ্ঠিগুরুর বিজ্ঞানঘন রূপ। তাঁদের মাধ্যমে পরমেষ্ঠিগুরুর স্বরূপ মহিমাই অভিব্যক্ত ও ঘোষিত হয় সত্য, কিন্তু সে সবের পরাকাষ্ঠাই হল পরমেষ্ঠিগুরু স্বয়ং। এ হল স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞানের চরমতম ও পরমতম ঘোষণা। এর পরে আর কোনও অনুশাসনও নেই, ঘোষণাও নেই। অতি দুর্লভ এই পরমেষ্ঠিগুরুর বিজ্ঞান। এ অত্যুক্তি নয়—সর্বশাস্ত্রের শেষ কথা।

প্রজ্ঞানঘন বোধস্বরূপের বিজ্ঞানময়তার বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত উভয় স্তরই মন ও বুদ্ধির অতীত, গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত ও ভেদাতীত। বিশ্বাত্মক হল (৪নং) সমষ্টিবোধের সূক্ষ্মতর ভাবঘন অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন মূর্তি। বোধস্বরূপের বিজ্ঞানঘন অভিব্যক্তি হল ৪নং বোধের ঘরের (III) সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি। এই হল (৪নং) বোধের ঘরে অর্থাৎ প্রজ্ঞানেব ঘরে প্রজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞানঘন অভিব্যক্তি। তার অন্তর্গত হল বোধের ঘরের (II) সূক্ষ্ম নামের অভিব্যক্তি। এও বোধের বিজ্ঞানঘন দ্বিতীয় স্তর। তার অন্তর্গত হল বোধের ঘরের (I) স্থূল রূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ বোধের ঘরের বা প্রজ্ঞানের বিজ্ঞানঘন তৃতীয় স্তর। এ-ই হল বোধের স্থূল রূপের স্বরূপ।

বোধস্বরূপের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল প্রজ্ঞানঘন। এই প্রজ্ঞানঘন-র অন্তর্গত প্রজ্ঞানের ত্রিবিধ বিজ্ঞানরূপই হল (III) বোধের ভাব, (II) বোধের নাম এবং (I) বোধের রূপ।

সমষ্টি বিজ্ঞানঘন বা ভাবঘন রূপ হল (৩নং) ভাবের ঘরের পূর্ণাঙ্গ রূপ। তার অন্তর্ভুক্ত চতুর্বিধ বিজ্ঞানমূর্তি হল (IV) ভাবের বোধ, (III) ভাবের ভাব, (II) ভাবের নাম ও (I) ভাবের রূপ। ভাবের ঘর মানে বিজ্ঞানের ঘর। সেইরূপ (২নং) নামের ঘর হল জ্ঞানের (জ্ঞানাভাসের) ঘর। এর চতুর্বিধ অভিব্যক্তি যথাক্রমে— (IV) নামের বোধ, (III) নামের ভাব, (II) নামের নাম এবং (I) নামের রূপ। এই নাম বা জ্ঞান হল বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান (জ্ঞানাভাস)। এই জ্ঞান প্রজ্ঞানের নয়। সেই জন্য দেখা যায় এই জ্ঞানাভাস রজোগুণাত্মক ও ক্রিয়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত। (১নং) রূপের ঘর হল অজ্ঞানের ঘর। এর চতুর্বিধ অভিব্যক্তি যথাক্রমে— (IV) রূপের বোধ, (III) রূপের ভাব, (II) রূপের নাম ও (I) রূপের রূপ।

(৪নং) বোধের ঘর বা প্রজ্ঞানের ঘর গুণাতীত গুণ তথা শুদ্ধসত্ত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞানঘন হয়। বিজ্ঞানের ঘর স্বরূপত শুদ্ধসাত্ত্বিক হলেও সত্ত্বগুণের আধিক্যে তার বিজ্ঞানস্বরূপের অভিব্যক্তি ও বিস্তার হয় পর্যায়ক্রমে। তার ফলে তা থেকেই জ্ঞানের অধ্যায় শুরু হয়। সেই জন্য (২নং) জ্ঞানের (জ্ঞানাভাস) স্বরূপ স্বরূপত সত্ত্বপ্রধান হলেও তার ক্রম অভিব্যক্তি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে তা রজোগুণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে; সেই জন্য জ্ঞানের ঘরের বিজ্ঞান বা ব্যবহার সত্ত্বপ্রধান হলেও, তা রজোগুণাত্মক, যদিও তমোগুণ সেখানে অভিভূত অবস্থায় থাকে। (১নং) রূপের ঘরের যথার্থ স্বরূপ রজোপ্রধান সত্ত্বগুণের মিশ্রিত রূপ হলেও তার অভিব্যক্তি ও বিস্তারক্ষেত্রে তা তমোগুণযুক্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্য রজোগুণের ক্রিয়ায় স্থূলতা বা নিষ্ক্রিয়তা এসে পড়ে।

পরমাত্মশক্তির কার্যাদির ত্রিবিধ ধারা—কেন্দ্রে সত্ত্বপ্রধান, অন্তরে রজোপ্রধান ও বাইরে তমোপ্রধান

তিন গুণ হল পরমাত্মা পরমেশ্বরী শক্তির তিনটি ধারা। তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই ত্রিধারার স্থিতি-সাম্য অবস্থাকেই অব্যক্তপ্রকৃতি বলা হয়েছে। তাতে সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি সেখানে সুপ্ত বা লীন। কিন্তু শক্তির ত্রিধারার ব্যুত্থানে বা জাগরণে ত্রিধারার পরস্পর সংমিশ্রণে সৃষ্টির পুনঃ অভিব্যক্তি আরম্ভ হয় পূর্ব পূর্ব নমুনা অনুসারে। সেই জন্য সৃষ্টির ত্রিধারার মধ্যে ব্যবহারবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে আদি-মধ্য-অন্তে গুণের মানের তারতম্য ক্রমপর্যায়েই অভিব্যক্ত হয়। তার কেন্দ্রের ব্যবহার সত্ত্বপ্রধান, অন্তর বা মধ্যের ব্যবহার রজোপ্রধান এবং বাহ্যের ব্যবহার তমোপ্রধান। এ হল মোটামুটি ভাবে প্রকাশক্রমের বিজ্ঞানের সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। তা সম্যক্‌রূপে অবগত হবার জন্য যে বিজ্ঞান দরকার তা-ই ধারাবাহিক ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

গুরুমন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও কেবলমাত্র স্বানুভূতির মাধ্যমে পরমেষ্ঠিগুরুর অনুগ্রহ ব্যক্ত হয়

গুরুমন্ত্রের বিষয়বস্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সর্বসাধারণের বোধগম্য না-হলেও স্বানুভূতির দৃষ্টিতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে পরমেষ্ঠিগুরুর অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মহিমাকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করার জন্য। এই বিজ্ঞান কেবলমাত্র মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু, শরণাগত, সদ্‌গুরু আশ্রিত সাধকদের কাছেই অতীব আদরের বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তারা এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধির যোগ্যতা লাভের জন্য সম্যক্‌ ভাবে প্রস্তুত হতে পারবে এবং পরাসিদ্ধি লাভে সমর্থ হতে পারবে। কিন্তু সাধারণ অধিকারীর পক্ষে তা গ্রাহ্য হবে না। এর ব্যবহারদোষ হলে সম্যক্‌ ফল তো দেবেই না, অধিকন্তু বিকারজনিত ফল সৃষ্টি হবে। সেই জন্য অধিকারভেদের কথা অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্বিধ গুরুমূর্তির প্রত্যেকের স্বরূপের এবং স্বভাবের বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

৪র্থ গুরুমূর্তি বলতে যা বলা হয়েছে তা হল ১নং প্রজ্ঞানঘন গুরু, ২নং বিজ্ঞানঘন গুরু অর্থাৎ বিজ্ঞান গুরু, ৩নং জ্ঞানঘন গুরু অর্থাৎ জ্ঞান গুরু এবং ৪নং অজ্ঞান গুরু। এই চতুর্বিধ ক্রম কেবলমাত্র অধিকারী সাধকদের অনুভূতির উৎকর্ষের জন্য সম্যক্‌রূপে বোঝার এবং ব্যবহারেব সুবিধার জন্য উর্ধ্ব থেকে ক্রমান্বয়ে মানের পর্যায়গুলি ব্যক্ত করা হল। অনুভবসিদ্ধদের কাছে তা সহজবোধ্য। তাঁদের কাছে তা সাধ্য নয়, সিদ্ধ। কিন্তু সাধকের কাছে তা সাধ্য। যারা সংসারবদ্ধ জীব তাদের কাছে তা সাধনার বিজ্ঞানরূপে ফলপ্রদ।

সাধারণ মানুষ অজ্ঞানের রাজ্যেই বাস করে। স্থূল নাম-রূপের সঙ্গেই তাদের সর্বসম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই হল স্থূল। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের রাজ্যই হল স্থূলের রাজ্য। ইন্দ্রিয়ের বোধ হল সসীম। তা হল বোধের সর্বনিম্ন মান। রূপের অনুভূতিকে রূপের বোধ বলে। রূপের ঘরের যত রকম প্রকারভেদ আছে তা রূপের বোধের মাধ্যমেই অনুভূত হয়। এই রূপের বোধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অনুভূত হয় বলে ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞানই হল রূপের বোধের বিজ্ঞান। অনুভূতির তাৎপর্য ও সার্থকতা সিদ্ধির জন্য একে চতুর্বিধ ক্রমের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। রূপের ঘরের জিজ্ঞাসার উত্তর রূপের বোধের চতুর্বিধ বিজ্ঞানের মাধ্যমেই ক্রম অনুসারে যথাযথ লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য রূপের ঘরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূর্ত রূপকে অজ্ঞানগুরু বা রূপের স্তরের গুরু বলা হয়েছে। তিনি জীবনের জন্য প্রথম স্তরের গুরুমূর্তি। তাঁর অন্তর্গত হল রূপের ঘরের অপর তিন গুরু।

গুরু অর্থে জ্ঞানদাতাকেই নির্দেশ করে। যিনি যে পর্যায়ের বা যে স্তরের জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানের অধিকারী তিনি সেই পর্যায়ের গুরুরূপে গণ্য হন। সেই জন্য ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে জন্মের পর মানুষ তার চার পাশে যা-কিছুর সঙ্গে যুক্ত থেকে বর্ধিত হয় তার পরিচয়ই তার প্রথম অবগত হতে হয় বয়সের ক্রমের মান অনুসারে ও শিক্ষার সুবিধা অনুসারে। সমগ্র জীবনব্যাপী তার এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জীবনব্যাপী শিক্ষার বিষয়কে বহু মানের মাধ্যমে ও বহু প্রকার ক্রমের মাধ্যমে মানুষ গ্রহণ করে ও শিক্ষা করে নানা পর্যায়ের গুরুর সাহায্যে।

প্রথম পর্যায়ের গুরু অজ্ঞানগুরু, তাঁর অন্তর্গত স্থূল-সূক্ষ্মাদি অপর তিন গুরুর জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

স্থূল জগতে যা-কিছু শিক্ষা ও বিদ্যা লাভ হয় তা সবই ইন্দ্রিয় পর্যায়ের জ্ঞানের বিষয় বলে রূপের ঘরের গুরুর দ্বারাই তা সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানের রাজ্যই হল ইন্দ্রিয়ের রাজ্য। অজ্ঞান বলতে এখানে জ্ঞানশূন্যতাকে বলা হয়নি। জ্ঞানের অপূর্ণ অবস্থা, সীমিত অবস্থা ও অশুদ্ধ অবস্থা তথা সর্বাপেক্ষা নিম্ন মানের জ্ঞানকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই সত্য বিশেষ ভাবে মনে না-রাখতে পারলে উন্নত ও উর্ধ্ব স্তরের গুরুদের সঙ্গ ও তাঁদের কৃপালাভের সুযোগ পাওয়া যাবে না। তার ফলে গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের বিজ্ঞানসম্মত অনুভূতি কখনওই লাভ করা সম্ভব হবে না।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা জীবন যতদিন পরিচালিত হয়, ততদিনই তার অজ্ঞানগুরুর সাহায্য দরকার হয়। অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যে জ্ঞান তাই প্রাকৃত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। তার বহু মান, বহু ক্রম ও বহু অধ্যায়। সে সবেরই যথাযথ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ হয় অজ্ঞানগুরু তথা প্রাকৃত গুরু অথবা লৌকিক গুরুর শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূর্ত রূপই হল দ্বিতীয় গুরুমূর্তি ও তার অন্তর্গত স্থূল-সূক্ষ্মাদি তিন গুরুর বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পরে যে স্তর তা প্রাকৃত জ্ঞানের অন্তর্গত সূক্ষ্ম স্তরের জ্ঞান। এই হল অন্তরের জ্ঞান। রূপের অন্তর্নিহিত সত্য, তত্ত্ব ও রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করা ও জানার যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান তা-ই হল দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ অন্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান। এই জ্ঞানও সম্পূর্ণ বাহ্যনিরপেক্ষ নয়। এ হল প্রাণ ও মনের স্তরের জ্ঞান। অজ্ঞানের নিয়ন্তাই হল এই জ্ঞানের স্তর। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূর্ত রূপই হল দ্বিতীয় গুরুমূর্তি। তার অন্তর্গত অপর তিন গুরুমূর্তি হল জ্ঞানের যথাক্রমে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল মানের মূর্ত রূপ। তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি আছে।

জীবন যখন ইন্দ্রিয় স্তরের গভীরে অর্থাৎ স্থূল জগতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম জগতের বিষয় জানতে চায়, তখন তার জিজ্ঞাসার উত্তর প্রথম পর্যায়ের চতুর্বিধ গুরুর মাধ্যমে আর লাভ করা সম্ভব হয় না। কারণ সেই সকল গুরু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত নন। এই স্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিকারী হলেন দ্বিতীয় স্তরের গুরুগণ। প্রথম স্তরের গুরুদের মহাগুরু বলা হয়েছে, দ্বিতীয় স্তরের গুরুদের বলা হয় পরমগুরু। তাঁরা জীবনের ও প্রকৃতির অন্তর্গত সূক্ষ্ম স্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্যক্ অধিকারী বা মূর্তস্বরূপ। তাঁদের শিক্ষাধীনে জীব দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। জীবনের এক নূতন অধ্যায় তখন তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় অনুভূতির গভীরে। তা সূক্ষ্ম সাধনসাপেক্ষ। বিশেষ এক প্রকার কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিকাশ লাভ করে। এই স্তরের কর্মময় জীবনেই ধর্মভাব যুক্ত হয়। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে প্রথম হয় তার পরিচয়। তার ব্যবহারবিজ্ঞান লাভ করে সে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরমগুরুর কাছ থেকে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুমূর্তির চতুর্বিধ ক্রম অনুসারে ধর্মের ব্যবহারবিজ্ঞান জীব লাভ করে তার অন্তরের জিজ্ঞাসা, আকুতি, প্রয়োজন, ইচ্ছা ও অনুভূতির তীব্রতার মান অনুসারে।

ধর্ম কর্মের অনুশীলন দ্বারা জীবের অন্তরমন মার্জিত ও সংস্কৃত হয়। নানাবিধ সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অন্তরের সঞ্চিত সংস্কারাদি বা মলাদি পরিশোধিত হয়। এই মলরূপ সংস্কার হল অজ্ঞান স্তরের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির সঙ্গে যুক্ত থেকে তার ভোগজনিত সূক্ষ্ম চিন্তা ও কামনার সূক্ষ্ম ইচ্ছা ও কারণের সংস্কারাদি। দ্বিতীয় স্তরের পরমগুরুর কৃপাশিসে জীব এই মল সংস্কারাদি শোধনের সুযোগ পায় ধর্ম কর্মের বাহ্য অনুশীলন দ্বারা প্রথমে এবং যোগ্যতার মান অনুসারে ধর্ম কর্মের সূক্ষ্ম স্তরের সঙ্গে হয় তার ধীরে ধীরে পরিচয় অনুভূতির মাধ্যমে। এই স্তরের অনুভূতি বিকাশে সাহায্য করেন এই স্তরের গুরুগণ।

অজ্ঞানের স্তরে কাম ও কর্মের বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ

জীবনে কর্ম সাধিত হয় কামনার প্রভাবে। কামনা হল মনোজাত। মনেই কামনার বীজ নিহিত থাকে। সেই অর্থে কাম ও মনকে অভিন্ন বলা হয়। মনই চিন্তা, কাম, আশা, ইচ্ছা, লোভ, মোহ ও ভোগের একক রূপ। এই মন প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে যে মন দশবিধ বৃত্তির সমষ্টিমাত্র। এই দশবিধ বৃত্তির নাম-ই কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়, শঙ্কা), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী ও ধী। এই দশ বৃত্তির মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তা-ই হল মন। এই মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সক্রিয় হয় বা কাজ করে এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে তা ভোগ করে। ইন্দ্রিয়ের ভোগ বলতে গেলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদির সঙ্গে যে যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধ এবং তার ফলে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই বোঝায়। ইন্দ্রিয়ের ভোগ মানেই হল বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগ জনিত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। এর প্রতিক্রিয়াজনিত যে ফলভোগ তার বিকার জীবকে যখন অভিভূত করে, তখনই সে পায় দুঃখ ও কষ্ট। এও দেহেন্দ্রিয়ের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল অবস্থাই দুঃখের কারণ, আবার অনুকূল অবস্থা হল সাময়িক ইন্দ্রিয়বৃত্তি তথা ইন্দ্রিয়জ ভোগ সুখের কারণ। আপাতমনোরম ও পরিণামে দুঃখপ্রদ মনে হলেও কিন্তু জীব প্রথমে তা বোঝে না, জানে না ও মানেও না। কাজেই ইন্দ্রিয়জ ভোগ্য বস্তুর অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে পরম্পরাক্রমে যুক্ত থেকে জীব কখনও সাময়িক সুখ ভোগ করে, আবার কখনও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এই ভাবে চলে তার সংসারজীবন বা ভোগের জীবন।

বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ভোগাদির গভীরে অন্তরিন্দ্রিয়ের যে ভোগ আছে তার সন্ধান প্রথমে সে পায় না। জীবনের অভিজ্ঞতার মানের উৎকর্ষ সাধিত হলে জীবের অন্তরের সূক্ষ্ম পর্যায়ের জিজ্ঞাসা জাগে; অর্থাৎ সূক্ষ্ম পর্যায়ের অনুভূতি লাভের ইচ্ছা জাগে। তার জন্য হয় তার নূতন পর্যায়ের চিন্তা ও নূতন পর্যায়ের প্রচেষ্টা। সেই জন্য দরকার হয় সূক্ষ্ম স্তরের অনুভূতিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ গুরুর সাহায্য। তখনই দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর সঙ্গে হয় তার যোগাযোগ। তাঁর কাছে সে জানতে পারে নূতন এক জগতের প্রসঙ্গ, যা স্থূলকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অনুভূতিসাপেক্ষ।

জীবনসংগ্রামের আদিপর্ব ও মধ্যপর্ব

জীবনের যে প্রথম দু'টি স্তরের কথা উল্লেখ করা হল তার সম্বন্ধে পরিষ্কার করে আরও কিছু বলা দরকার। নতুবা তা সম্যক্ ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিতে সবার কাছে বোধগম্য হবে না। জীবনে প্রথম পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির বাহ্য রূপ-নামের সঙ্গে যুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির বাহ্য ব্যাপারাদি, যথা—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বৃক্ষলতা প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির সঙ্গে হয় তার প্রথম পরিচয়। ক্রমপর্যায়ে সে নদনদী, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল প্রভৃতির সঙ্গে হয় পরিচিত। এদের সঙ্গে মিশেই প্রাকৃত জীবন আরম্ভ হয় তার। তার আহার, বাসস্থান ও অসংস্কৃত প্রাকৃত জীবনের সর্ববিধ ব্যাপারে সে সমগ্র বাহ্য প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানতে বাধ্য হয় নানাবিধ প্রাকৃত দুর্ঘটনা ও দুর্যোগের প্রভাবের প্রতিকার না-করতে পেরে। ক্রমে প্রকৃতির বিপর্যয়গুলির ব্যাপারে সে অধিক সচেতন ও সাবধান হয়। কালের ব্যবধানের মধ্যে পুনঃপুনঃ সংঘটিত প্রাকৃতিক গতিবিধি ও ঘটনাগুলির সঙ্গে সে ক্রমশ নিজেকে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই বিপর্যয়াদি হল ঝড়-ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, মহামারী, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। এ ছাড়াও আছে জীবজগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গাদির সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম। স্থলে-জলে-আকাশে সর্বত্রই বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। সবই তার কাছে অজ্ঞাত। অজ্ঞানের তাড়নায় জীবনের সর্বনিম্ন মান থেকেই তার জীবনযাত্রা শুরু হয়। সর্বত্রই বিরুদ্ধ পরিবেশ, অবস্থা, ঘটনা প্রভৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় তাকে। জন্ম-

মৃত্যুর সঙ্গে এই ভাবেই চলে তার সংগ্রাম। প্রাকৃত নিয়মের অধীনে থেকে ক্রমেই তার অভিজ্ঞতার মান বাড়ে। সে প্রাকৃত শক্তির কাছে অনেক কিছু শিক্ষা পায়। প্রাকৃত নিয়মকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে প্রকৃতির কতগুলি নিয়মের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়। সে প্রকৃতির নানাবিধ নিয়মের সঙ্গে পুনঃপুনঃ সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়ে তার রহস্য কিছুটা অবগত হতে পারে। প্রকৃতির ষড়ঋতুর পরিবর্তনের রহস্যও কিছুটা সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে এবং সে-ভাবেই সে নিজেকে তৈরি করে নেয়। তার আহার ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে শেখে সে। প্রকৃতির শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে পূর্ব থেকে অধিক সচেষ্ট হয়। হিংস্র জানোয়ার ও বিপক্ষ শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে ক্রমশ উপায় ও ব্যবস্থা করতে শেখে। ধীরে ধীরে শীতের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য, হিংস্র জানোয়ার ও বিপক্ষ শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং আহার তৈরির ব্যাপারেও অগ্নির ব্যবহার সে শেখে। ক্রমশ দলবদ্ধ ভাবে বাস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সে-ভাবেই সে তৈরি হয়।

আহারের প্রয়োজনবোধই মানুষ প্রথম অনুভব করে জীবনে। তারপর নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে সে। তারপর বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয় তার। প্রয়োজনবোধেই ক্রমে ক্রমে এ সবের স্থায়ী ব্যবস্থার দিকে তার দৃষ্টি যায়। ধীরে ধীরে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ব্যাপারেও তার ভাবনা বাড়ে। সে সম্বন্ধেও তার জিজ্ঞাসা বেড়ে চলে। প্রয়োজন অনুরূপ হয় তার চেষ্টা এবং চেষ্টা অনুরূপ হয় তার ব্যবস্থা এবং তদনুসারে হয় তার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনসিদ্ধি। এই ভাবে প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির আপাতবিরুদ্ধ শক্তির প্রকাশাদির সঙ্গে এবং তার অন্তর্গত নিয়মাবলীর সঙ্গে ধীরে ধীরে হয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। প্রথমে প্রকৃতিকেই সে তার শিক্ষাগুরু মেনে নেয়। তার পরে নিজেদের মধ্যে যার কার্যশক্তি, চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা বেশি সে-ই হয় দলের নেতা, মোড়ল ও কর্তা। এই ভাবে শক্তি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মানের উৎকর্ষের ফলে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য ও গুরুত্ব বাড়ে।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে অভিজ্ঞতার মানের উৎকর্ষের প্রভাবে অনেকে প্রাধান্য পায় এবং অনেকেই তা দেখে প্রাধান্য পেতে চায়। এই ভাবে অনেকের প্রাধান্যই বেড়ে চলে। দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে যারা অপটু, ক্ষীণ ও দুর্বল তারা সকলে তাদের নির্দেশ মেনে চলেই অভ্যস্ত হয়। এই ভাবেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মান অনুসারে জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের ও জ্যেষ্ঠত্বের গুরুত্ব সবাই বুঝতে শেখে এবং তা মেনে চলতেও অভ্যস্ত হয়।

এই পর্যায়ে যারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে দলের অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তারা নিজেরাও সুযোগ ও সুবিধা অধিকমাত্রায় ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দলের লোকদের কাছে তারা হল গুণিন ও ওস্তাদ। এই গুণিন ও ওস্তাদ হল 'গুরু' শব্দের আদি রূপ। এর মার্জিত ও সংস্কৃত রূপই হল 'আচার্য' ও 'গুরু' শব্দ। এই মোড়ল, গুণিন ও ওস্তাদ শব্দ এখনও নিম্নপর্যায়ের অশিক্ষিত ও অনুন্নত জাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ওস্তাদেরই ক্রম উৎকর্ষের মূর্ত রূপই হল গুরুপদ। এই গুরুর প্রসঙ্গ ধরেই গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের বিজ্ঞানভূমিতে পৌঁছান যায়।

জীবনমানের উৎকর্ষ লাভ হয় যথার্থ শিক্ষা ও দীক্ষা পদ্ধতির ক্রম ধরে

অতীতে জীবনধারণের প্রথম পর্যায়ে আহার্য্য বস্তুর সংগ্রহ, নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা, প্রকৃতির বিরুদ্ধ অবস্থা, পরিবেশ ও বিপক্ষের তাড়ন-পীড়ন থেকে আত্মরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে জীব তথা মানুষকে যে-ভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে তা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয় বহু স্থানে, বহু ক্ষেত্রে মানবসমাজের বৃহত্তর এক সংখ্যাগোষ্ঠীর মধ্যে। এরা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অনুন্নত ও অশিক্ষিত, প্রাকৃত সংস্কারবদ্ধ এক বৃহত্তর অংশ। এদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সাধারণত প্রথম স্তরের গুরুদের দ্বারা শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে। দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্যায়ের গুরুর সঙ্গ, সান্নিধ্য ও সাহায্য এদের মধ্যে সবাই পায় না, কদাচিৎ কেউ কেউ পায় সত্য কিন্তু তারা

গুরুকৃপা পেলেও সংস্কারমুক্ত সহজে হতে পারে না। সংস্কারমুক্ত হওয়া অন্তরবোধের ক্রমবিকাশের পরিণতির ফলেই সম্ভব। তাও ক্রমপর্যায়ে শিক্ষার বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলেই হয়ে থাকে। প্রকৃতিতত্ত্ব ও প্রাকৃত বিদ্যা, যা প্রথম পর্যায়ের গুরুর মাধ্যমে শিক্ষা ও দীক্ষার ক্রম ধরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংসাধিত হয় ও সম্প্রসারিত হয়, তা সম্যক্‌রূপে অধিগত না-হলে অনুভূতির সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছান যায় না। অনুভূতির স্বরূপ জীবনতত্ত্ব ও জীবনসত্য, অনুভূতির ক্রমিক মানের উৎকর্ষের মাধ্যমেই সম্যক্‌রূপে অনুভবগ্রাহ্য ও অনুভবসিদ্ধ হয়। সেই জন্য জীবনমানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অনুভূতির ক্রমের উৎকর্ষ যোগ্য গুরুর মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লব্ধ হয় যথার্থ শিক্ষা ও দীক্ষা পদ্ধতির ক্রম ধরে। যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমেই তা সাধিত হয় ও বিকাশ লাভ করে।

জীবনে অন্তরবোধের বিকাশের ক্রম ধরে গুরুপরম্পরায় শিক্ষা ও দীক্ষার বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ

প্রথম গুরুমূর্তির তত্ত্বাবধানে যে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিদ্যা লাভ হয় তার পরিণতি পৌঁছে দেয় দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যার ঘরে। অর্থাৎ প্রথম গুরুমূর্তির অধীনে সর্ববিধ শিক্ষা ও দীক্ষার উৎকর্ষের মান পরিসমাপ্ত হলে প্রথম গুরুই শিক্ষার্থীর শিক্ষাসংক্রান্ত ভার সমর্পণ করেন পরবর্তী গুরুর হস্তে তথা দ্বিতীয় গুরুর হস্তে। অর্থাৎ অন্তরবোধের মান স্থূল পর্যায়ের জ্ঞান লাভের পরে সূক্ষ্ম পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা লাভ করে যখন, তখন সূক্ষ্ম পর্যায়ের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই অনুরূপ সে করে তার অনুশীলন এবং তৎপর্যায়ের গুরুর সঙ্গে হয় তার যোগাযোগ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরু তখন তার শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ভাবে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় গুরুমূর্তির তত্ত্বাবধানে জীবজগতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম স্তরের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও অনুশীলন। অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হওয়া, অদৃষ্টকে দর্শন করা, অশ্রুতকে শ্রবণ করা, অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হওয়ার তীব্র ইচ্ছা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় ক্রমপর্যায়ে। এ তার স্বভাবজাত ধর্ম। তাই দেখা যায় মানুষ যতখানি জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী হয় শিক্ষা, চেষ্টা ও সাধনভজনের মাধ্যমে, তার উৎকর্ষ লাভের জন্য সে সব সময়েই সচেষ্ট হয়। সেই জন্য অন্তরে আগ্রহ ও ব্যাকুলতার মানকে অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিকে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলে সে। তার এই জানবার ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে যতদিন পর্যন্ত না সে তার স্বস্বরূপে, স্বানুভূতির স্বরূপে পৌঁছায় ও প্রতিষ্ঠা পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে সম্যক্‌রূপে শিক্ষাদীক্ষার পরিসমাপ্তি হলে তৃতীয় গুরুমূর্তির প্রয়োজন হয় তার। তৃতীয় গুরুমূর্তির অন্তর্গত চতুর্বিধ গুরুর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে হয় তার মিলন এবং তাঁদের কৃপাশিস্‌ লাভান্তে তাঁদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে হয় তার সম্যক্‌ অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন। চিন্তা ও কর্মের মানেরও উৎকর্ষ সাধিত হয় অন্তরের অনুভূতির উৎকর্ষের মাধ্যমে। সবই চেষ্টা, অভ্যাস ও অনুশীলনক্রমেই ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।

জীবনবিজ্ঞানের বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ

জীবনে আহার, বাসস্থান, কর্মসংস্থান প্রভৃতির সুব্যবস্থা হবার পরেও মানুষের অন্তরের জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম ক্ষুধা—অজানাকে জানার, অদৃষ্টকে দেখার, অপ্রাপ্তকে পাবার নেশা যত বাড়ে, ততই তার স্থূল পর্যায়ের প্রয়োজনবোধ কমতে থাকে এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ের প্রয়োজনবোধ বাড়তে থাকে। অর্থাৎ স্থূল পর্যায়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, বিষয়াদির প্রতি তার আসক্তি ও আগ্রহ কমে সূক্ষ্ম পর্যায়ের তথা অন্তর ভাববোধের অনুভূতিসাপেক্ষ বিষয়াদির প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তার সন্ধানে ও অনুশীলনে রত হয় তখন। তার ফলেই চিন্তাজগতের বিকাশ হয় তার। সে বাহ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করে। তার ফলে বহুবিধ ব্যবহারিক বিদ্যার সন্ধান পায় সে এবং তার দ্বারা স্থূল বিষয়াদির প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাপারেও যেমন উন্নত হয়, অন্তরবোধের সূক্ষ্ম বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেও তেমন সে সমর্থ হয়। তার ফলে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কলা, নাটক, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ

করে। এরই নামান্তর হল সংস্কৃতি ও প্রগতি (cultural advancement)। [প্রথম পর্যায়ের জীবনের অভিজ্ঞতার মান সবই প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্গত based on material science and culture and their advancement and development। দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তি based on technological, industrial and cultural development and advancement। তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তি based on spiritual culture and its advancement and perfection এবং চতুর্থ পর্যায়ের জ্ঞান ও অনুভূতির ভিত্তি হল supra-culture based on the Science or Knowledge of Oneness.]।

জীবনে সুখ ও আনন্দ লাভের কতগুলি উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কার হয় এই ভাবে। কিন্তু স্থায়ী সুখ, আনন্দ ও শান্তির বিজ্ঞান লাভ করতে মানুষ পারেনি। প্রাকৃত বিজ্ঞান, জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে সে, শক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অনেক কিছু সে জানতে পেরেছে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও নিয়মাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সে, কিন্তু জীবনে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি এবং শোক-মোহের হাত থেকে পরিত্রাণের বিজ্ঞান পায়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুমূর্তির অধীনে অনুশীলনের ক্রম ধরে সে প্রাণবিদ্যা ও মনোবিদ্যার কিছু কিছু সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হয়েছে। দেববিজ্ঞান সম্বন্ধেও তার কিছু তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে, তথাপি জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ও জীবনের শোক, মোহ ও অশান্তির প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি সে। কাজেই নূতন পর্যায়ের জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে তার অন্তরে। এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যই হল মৃত্যুর কারণ, জন্মের কারণ, দুঃখের কারণ, বিকারের কারণ, বৈচিত্র্যের কারণ, ভেদের বা পার্থক্যের কারণ এবং অন্তরে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির কারণ অবগত হওয়া। এখানে এসেই সে সর্বকারণের মূল জানতে চায়, অবগত হতে চায় এবং সেই জন্য ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান করে সে। সর্ববিধ বিকার মুক্ত হবার জন্য তার এই ব্যাকুলতা। জীবনের সসীমতা, দেহাত্মবুদ্ধি, প্রকৃতির অধীনতা থেকে এবং সংসার থেকে সে মুক্ত হতে চায়। নানা পর্যায়ের দুঃখ, কষ্ট ও বিকারের দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে মুক্তিকামী মানুষ মুক্তির ইচ্ছা কামনা করে তখন।

প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানের পরিণাম

যে মানুষ এক সময় ভোগ সুখের কামনায় কর্ম ও ধর্মের আবিষ্কার করেছে, তার জন্য বহু জন্ম সাধন করেছে, সেই মানুষই সর্ববিধ কাম্য বস্তু লাভে সমর্থ হয়েও নিজেকে দুঃখী মনে করছে। তার অনুভূতির মান স্থূল-সূক্ষ্মকে অতিক্রম করে কারণতত্ত্বকে অবগত হতে চাইছে। সে মনে করছে কারণকে অবগত হতে পারলেই সর্ববিধ কার্যের বিকার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। এতদিন ছিল কাম্য বস্তু লাভের নিমিত্ত তার কার্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা। সেই পর্যায়ে বহু গবেষণার ফলে বহু কিছু নূতন ফলপ্রদ ও কার্যকরী পদ্ধতি আবিষ্কার করার পরেও তার স্থায়ী সুখ ও শান্তি না-হওয়াতে সে অধিক জটিল ও বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়ে পড়ে। তার স্বকৃত গবেষণা ও আবিষ্কারের ফল এবং অভিজ্ঞতাই তার দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি ও মৃত্যুর কারণ হয়। সে জানতে পারে জীবনের সমস্ত কিছুই যখন মৃত্যুর অধীন এবং মৃত্যুই সব কেড়ে নেয় সময় মতো, সে কারওর অনুরোধ ও প্রার্থনা শোনে না এবং তার নিয়ম অমোঘ, তখন সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে। তার এই অসহায়বোধের অন্যতম কারণ হল প্রাকৃতিক ধ্বংস, বিপর্যয় ও মৃত্যুভয়। এ সব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে যে গবেষণা করেছিল ও তার আবিষ্কারের ফলে গর্বিত হয়েছিল তা-ই তার সমষ্টি-বিনষ্টির কারণ হয়ে ওঠে। তা জেনেই সে হয় ভীত, ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত। সে সব থেকে পরিত্রাণের উপায় সে আর গতানুগতিক ভাব, জ্ঞান এবং জগৎব্যাপার ও জগৎসভ্যতার মধ্যে খুঁজে পায় না। তার ভোগ সুখের কারাগার জগৎসভ্যতা ও জগৎসংসার সবই হয় তখন তার কাছে সমস্যাসূচক।

জগৎসভ্যতার যত বিকাশ সর্বত্রই কেবল শক্তির প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের এবং অপরের উপরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। তার সমগ্র প্রাকৃত শক্তির সম্ভার, তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয় থেকে তাকে রক্ষা করতে

পারে না। জীবনসাধনায় এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও তাকে কত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। এর কারণ সবাই বোঝে না এবং বোঝালেও মানে না। মৃত্যুর অধীন জীবজগৎ। তা জগৎবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সর্বোত্তম জ্ঞান দ্বারাও অতিক্রম করা যায় না। বিকারের বিজ্ঞান দ্বারা বিকার বাড়ে, কিন্তু বিকারকে অতিক্রম করা যায় না। প্রাকৃত বিজ্ঞান হল ক্রিয়াশক্তির বিজ্ঞান। তা নিত্য বিকারী ও পরিণামী। এর অনুশীলন দ্বারা, গবেষণা ও চর্চা দ্বারা সাময়িক ভাবে কেউ এই শক্তির অধিকারী হতে পারলেও তা স্থায়ী ফলপ্রদ নয়। তার বিকার অবশ্যম্ভাবী এবং তার পতনও অবশ্যম্ভাবী। একে অবগত হতে অতীত কালের মানুষকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে। প্রাকৃত শক্তি ও তার বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে যে অতিপ্রাকৃত দিব্য, অখণ্ড, পূর্ণ শক্তি ও তার বিজ্ঞান নিত্যবর্তমান তার সন্ধান মানুষ পেয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের গুরুমূর্তির মাধ্যমে, তাঁর অশেষ করুণা ও অনুগ্রহের ফলরূপে। তৃতীয় গুরুমূর্তির করুণাঘন অবদানই হল মুক্তির বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং চতুর্থ গুরুমূর্তির অবদান হল পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্মের বিজ্ঞান ও তার অনুভূতি তথা স্বানুভূতির বিজ্ঞান তথা ভূমার বিজ্ঞান ও তার সিদ্ধি। এ-ই হল সর্বোত্তম জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বরূপ, পরমতত্ত্ব। এর যথার্থ অধিকারী অতীব দুর্লভ। সর্বযুগেই এইরূপ অধিকারীর সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। অবশ্য সত্য ও ত্রেতা যুগের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কারণ বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ কলি যুগের বুদ্ধি দ্বারা তা জানা ও মানা সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে প্রাকৃত বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েও এবং প্রাকৃত সম্পদের অনেকাংশ দখল করতে পারলেও জীবনের বিকার ও মৃত্যুর ভয় অতিক্রম করা যায় না। বহু অভিজ্ঞতা লাভের পর তাঁরা জানতে পারেন যে, কারণের বিজ্ঞানকে অবগত হতে না-পারলে কর্মফলের প্রভাব মুক্ত হওয়া যায় না। মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছাকেই মুমুক্ষুতা বলে। এইরূপ মুমুক্ষুই মুক্তিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুর অধীনে যতখানি বিদ্যালাভ করার সম্ভাবনা সে সবই শেষ করে তৎপরবর্তী স্তরের জ্ঞান লাভের অধিকারী হন তাঁরা। তখন তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ের গুরুমূর্তির অনুসন্ধান করেন অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতার মান অনুসারে। এই অবস্থায় তৃতীয় পর্যায়ের গুরুদের সঙ্গে হয় তাঁদের যথাক্রমে মিলন ও তাঁদের সঙ্গলাভ। তাঁদের কৃপায় মুক্তির বিজ্ঞান তাঁরা পান। ব্যাকুল ভাবে মুক্তিবিজ্ঞানের অনুশীলন ও সাধনে তাঁরা রত হন। বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতাই হয় তাঁদের একমাত্র সাধন অবলম্বন।

মুক্তিবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ

শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের উত্তম অধিকারী হলেন মুমুক্ষু সাধক। তিনি ধ্যানের বিজ্ঞান অবলম্বনে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। হৃদয়গুহায় সন্ধান করেন তিনি আপনস্বরূপকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে। বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃত বিজ্ঞানের মোহ-আসক্তি বর্জন করলে তবেই তিনি অন্তরে ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। ধ্যান ও জ্ঞানবিচারের জন্য পরাবৈরাগ্য ও বিবেকই হল একমাত্র উপায়। গুরুকৃপায় পরাবৈরাগ্য লাভের পর পরাভক্তি লাভের অধিকারী হন তিনি। উত্তম অধিকারীর পরাবৈরাগ্য, আত্ম-অনাত্মা প্রভৃতির বিবেকজ্ঞান ও পরাভক্তিই হল বিশেষ সাধন। এই তিনটির উৎকর্ষ লাভ হলেই তিনি অমৃতত্ব এবং মুক্তিশান্তি লাভের অধিকারী হন। এ সবই তৃতীয় পর্যায়ের গুরুশক্তি, গুরুকৃপা ও করুণার সম্যক্ ফল। গুরুকৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং আপনাকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করেন। অজ্ঞান, মোহ ও আসক্তি তাঁকে আর বাঁধতে পারে না। তিনি জরা, ব্যাধি ও বিকারের প্রভাব থেকে চিরতরে মুক্ত হন। তিনি মুক্তির আনন্দে আপন বোধসত্তায় নিত্য বিহার করেন। প্রকৃতি আর তাঁকে বাঁধতে পারে না, ভোলাতেও পারে না এবং তাঁকে নিয়ে আর খেলতেও পারে না।

তৃতীয় পর্যায়ের গুরুর অনুগ্রহ ও করুণালব্ধ মুক্তির বিজ্ঞান লাভে ধন্য হন মুমুক্ষু সাধক। তিনি জীবন্মুক্ত হয়ে অব্যক্তপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে মুক্ত গগনে চিরতরে মুক্ত হয়ে তাঁর মুক্তস্বরূপেই বিহার করেন। এই মুক্তি লাভ

হয় তাঁর সমাধি জ্ঞানের গভীরে। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে, সদ্‌গুরুর কৃপায় ঈশ্বরাত্মবোধের সাধনার উৎকর্ষক্রমে সমাধির প্রথম পর্যায়ে তাঁকে যথাক্রমে সবিকল্প, সবীজ ও সবিতর্ক সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। অনুশীলনক্রমে তা অতিক্রম করে আরও গভীরে নির্বীজ, নির্বিতর্ক সমাধির সঙ্গে হয় তাঁর পরিচয়। এ পর্যন্তই হল সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধির সীমা।

সমাধির বিজ্ঞান সবিকল্পের মাধ্যমে আরম্ভ হয়ে নির্বিকল্পে পরিসমাপ্তি লাভ করে

সবিকল্প সমাধির বৈশিষ্ট্য হল, এতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটী সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বিরাজ করে। সমাধিভঙ্গে তারা পূর্ববৎ সক্রিয় হয়। এই সবিকল্প সমাধির উত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, অর্থাৎ এর উৎকর্ষ লাভের জন্য সাধক বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। এই সমাধিতে আনন্দ আস্বাদন হয় এবং তা সাধকের কাছে অতীব সুখপ্রদ ও প্রীতিকর। সেই জন্য তা তার কাছে আকর্ষণের বিষয়। সবিকল্প সমাধিবান পুরুষ সমাধি লাভের আনন্দ আস্বাদন ভুলতে চায় না এবং হারাতেও চায় না, কারণ সমাধির আনন্দ বিষয় ভোগের আনন্দ অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও অভিনব। যদিও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী নয় এবং সর্বসংস্কার মুক্তও নয় সত্য, তবুও তা সাধকের কাছে অতীব প্রিয় ও মনোরম। এই আনন্দের ভোক্তা হিসাবে জীব বা সাধক নিজেকে উন্নত ও ভাগ্যবান মনে করে। এই আনন্দ স্থায়ী ও পূর্ণ হতে পারে কেবল স্বরূপানুভূতির মাধ্যমে। আপনস্বরূপই হল পূর্ণ চিদানন্দঘন অখণ্ড ভূমা। তাতে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীর অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থার অনুভূতির জন্য সাধককে সবিকল্প সমাধির ঊর্ধ্বে যেতেই হয়, নতুবা আত্মসিদ্ধি লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা সে সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারলে তদনুরূপ চেষ্টা করতে পারে।

সবিকল্প সমাধিও আত্মস্বরূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। তা আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব অবস্থা। এই অবস্থা থেকে আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। এ-ও কিন্তু সব সাধক জানে না এবং মানেও না। জানলে এবং মানলেও আবার অনেকে আনন্দ আস্বাদন ছাড়তে চায় না। সেই জন্য এর পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ সবিকল্পের ঊর্ধ্বে খুব কম সাধকই যেতে পারে। অবশ্য সবিকল্প সমাধি লাভও সবার পক্ষে সুসাধ্য নয়। এই সমাধি লাভ না-করেই লোকে বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিষয়ের আলোচনা করে নিজেকে তত্ত্ববেত্তা বলে মনে করে। বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে সকলকে যে শ্রুত জ্ঞান বা অধীত জ্ঞানকে তথ্য বলে, তত্ত্ব বলে না। তথ্যের শ্রবণ ও পাঠের দ্বারা তথ্য প্রসঙ্গে যে ধারণা হয় তা বৌদ্ধিক অর্থাৎ বুদ্ধির পর্যায়ের। তা স্ববোধ আত্মার পর্যায়ের বা ঈশ্বরীয় পর্যায়ের নয়।

ঈশ্বর-আত্মবোধ কেবলমাত্র নির্বিকল্প সমাধিসিদ্ধ পুরুষেরই হয়ে থাকে। সবিকল্প সমাধি সাধনের মাধ্যমে বুদ্ধির সংস্কার হয় ও সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বাড়ে প্রথমে। তার ফলে সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্যগুলি জীবনে প্রকাশ পায়। তখন ঈশ্বরাত্মবোধের সাধনার গভীরে প্রবেশ করার অধিকার লাভ হয়। তা শুদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির পক্ষেই সম্ভব। সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে তা কোনও মতেই সম্ভব নয়। কারণ সংসারী মানুষের রজ ও তমোগুণের প্রভাব অধিক থাকে বলে বুদ্ধি থাকে অসংযত ও অসংস্কৃত। বিষয়যুক্ত বুদ্ধি হল অশুদ্ধ বুদ্ধি। অশুদ্ধ বুদ্ধির সমাধি হয় না। শুদ্ধ, শান্ত, একাগ্র মন ও বুদ্ধির পক্ষেই সমাধির বিজ্ঞান সাধন সম্ভব হয় এবং তার সিদ্ধিলাভও সম্ভব হয়।

সবিকল্প সমাধির সিদ্ধিলাভের জন্য সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে অধিক যত্নবান হতে হয়। একান্ত স্থানে, নির্জনে সংসারের প্রভাবমুক্ত হয়ে সংযত ইন্দ্রিয়, মন দ্বারা সাত্ত্বিক আহার, চিন্তা ও সাত্ত্বিক জীবনযাপনের মাধ্যমে সাত্ত্বিক বুদ্ধিসম্পন্ন সাধককে খুব সাবধানে সমাধিবিজ্ঞান অভ্যাস করতে হয়। কেবলমাত্র স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা তা কখনওই সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর কৃপাশিস্ লাভের পর তাঁর নির্দেশ অনুসারে। গুরুকৃপা ছাড়া এবং গুরুর নির্দেশ ছাড়া সমাধির বিজ্ঞান অভ্যাস করা নিষিদ্ধ। শাস্ত্র ও মহাজনগণ সকলের জন্যই এ

বিষয়ে সাবধানবাণী রেখেছেন। সদ্‌গুরুর নির্দেশে যোগ্য অধিকারী সমাধিবিজ্ঞান সাধনে রত হলে তার সিদ্ধির ব্যাপারে সদ্‌গুরুর সজাগ দৃষ্টি থাকে। বিষয়ী লোক সদ্‌গুরুর সঙ্গ পেলেও সদ্‌গুরুর এইরূপ কৃপা ও করুণা লাভের সুযোগ পায় না। তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। তা অভিমানীদের অভিমানগত আলোচ্য বিষয় নয়।

সবিকল্প সমাধিবিজ্ঞান সাধনের পরিপক্ব অবস্থায় সাধক নিজেকে নির্বিকল্প সমাধি লাভের যোগ্য তৈরি করে নেয়। সবই গুরুকৃপায় সাধিত হয়—তা সে সর্বতোভাবে সকৃতজ্ঞচিত্তে সব সময়েই চিন্তা করে ও ভাবনা করে। বিষয়ী মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব থাকে। বিষয়চিন্তার প্রাধান্যের জন্য তারা সকৃতজ্ঞ হতে পারে না। বিষয়ী লোকের বিষয়চিন্তা ও অনাত্মচিন্তাই হয় অধিক, কিন্তু নির্বিষয় চিন্তা এবং আত্মধ্যান হয় না। সামান্য ঈশ্বরাত্মার জপ-ধ্যান দ্বারা অভিমানী চিত্ত নিজেকে অপরের চাইতে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তার পক্ষে সমাধির বিজ্ঞান সাধন সম্ভব নয়; সুতরাং সিদ্ধিলাভও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তারা সমাধিসিদ্ধ দিব্যমানবের মুখনিঃসৃত সদ্‌বাণী শুনে তা আলোচনা করতে পারে এবং অভিমানবশত নিজের বলে ভাবনা ও দাবি করতে পারে। তার দ্বারা আত্মপ্রসাদও লাভ করতে পারে কিন্তু তা তার স্বভাব শোধনের অন্তরায়ই হয় এবং অপরের পক্ষেও তা ভ্রান্তিপ্রদ হয়। তা মলিন বুদ্ধিরই পরিচায়ক মাত্র, শুদ্ধ বুদ্ধির পরিচয় নয়। শুদ্ধ বুদ্ধি স্বানুভবসিদ্ধ সদ্‌বাণীকে কখনও নিজের বলে দাবি করতে পারে না, তবে তা ব্যবহার করতে পারে গুরুর দান হিসাবে, গুরুর বাণী হিসাবে এবং গুরুর নামে। নতুবা অকৃতজ্ঞতা দোষে তার যে অপরাধ হয় তা কোনও মতেই ক্ষমার্হ নয়। এর দ্বারা গুরু প্রীত হন না। গুরু প্রীত হন সর্বসমর্পণের মাধ্যমে, আত্মদানের মাধ্যমে এবং তিনি অধিকতর প্রীত হন যখন তাঁর আশ্রিত কোনও সাধক গুরুর নামে, ভাবে ও বোধে তার জীবনকে রাঙিয়ে নেয়, ভাবিয়ে নেয় এবং মাতিয়ে নেয়। সে-ই ধন্য ও বরেণ্য, অন্যরা নয়।

গুরুকৃপায় সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপক্ব অবস্থা লাভ হয় চেষ্টাবান, ব্যাকুল ও সাত্ত্বিক শরণাগত ভক্ত ও জিজ্ঞাসু সাধকের। এই সমাধির সিদ্ধির জন্য যেমন আত্মচেষ্টা দরকার, তেমন গুরুকৃপাও দরকার। নতুবা সমাধির পরিপক্ব অবস্থা আসে না। সবিকল্প সমাধি সিদ্ধ হলেই সদ্‌গুরু তাকে আরও গভীরে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তখন সাধক নির্বিকল্প সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন আরম্ভ করে। এই সমাধিসিদ্ধি অতীব দুঃসাধ্য, কারণ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীর সম্পূর্ণ লয় সহজে হয় না। জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় ভাবের সঙ্গে একীভূত হতে হয় নিরন্তর ধ্যানের মাধ্যমে। জ্ঞাতার বা ধ্যাতার জ্ঞেয়-আকার বৃত্তি বা ধ্যেয়-আকার বৃত্তির প্রথম প্রথম সাময়িক ভাবে যে একাকার স্থিতি বা ঐক্য স্থিতি হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেবলমাত্র উত্তম অধিকারীর পক্ষে অনলস চেষ্টার মাধ্যমে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেই জন্য সাধককে পরাবৈরাগ্য ও পরাবিবেকের আশ্রয় নিতে হয় সব সময়।

বিবেক-বৈরাগ্যের উৎকর্ষের মাধ্যমেই সমাধির সিদ্ধি সম্ভব হয়

বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় অনাসক্তিযোগে। অনাসক্তি সিদ্ধ হয় নিস্পৃহতা ও নিষ্কামতার সর্বোত্তম অবস্থায়। নিষ্কাম-সিদ্ধ হলে সর্ববিষয়ে নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। নিষ্কামতা সিদ্ধ হয় নিঃসঙ্গতা থেকে। নিঃসঙ্গতাই হল অনাসক্তির পূর্ণ অবস্থা। পূর্ণ অনাসক্তি হল নির্মোহিত্বের বৈশিষ্ট্য। নির্মোহিত্বের ফলে চিত্তের নিশ্চলস্থিতি হয় অর্থাৎ চিত্ত 'অ-চিত্ত' হয় এবং 'বিচিন্ত্য' হয়। 'বিচিন্ত্য' মানে চিন্তাশূন্যতা। তা বিষয়বিস্মৃতি নয় বা উদাসীনতাও নয়। সজ্ঞানে নিরপেক্ষতাতেই নিশ্চলস্থিতি বোঝায়। তা অজ্ঞানস্থিতি নয়। অজ্ঞানস্থিতি হল গাঢ় নিদ্রা—ত্রিগুণাপ্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় স্থিতি। প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় স্থিতিকে লয় অবস্থা বলা হয়। এই লয় অবস্থায় স্থিতিকে 'লয় সমাধি' বলে। এ-ও অনেক সাধকের কাছে সাধ্য ও লক্ষ্য। এই সমাধিও সুখপ্রদ ও আনন্দপ্রদ

কিন্তু নিত্য বা স্থায়ী নয়। কারণ প্রকৃতির সাম্য অবস্থা অব্যক্তের স্থিতিকাল পর্যন্ত। লয় সমাধির সাধক অব্যক্তর সঙ্গেই মিশে তার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু তাঁর স্বরূপস্থিতি ও স্বরূপজ্ঞান হয় না। প্রকৃতির সাম্য অবস্থায় অর্থাৎ অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্ত অবস্থা আরম্ভ হলে অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রম আরম্ভ হলে লয় সমাধি ভঙ্গ হয় সাধকের। আবার তাঁকে প্রকৃতির অধীনে প্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা বিব্রত ও অশান্ত হতে হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘটে। সেই জন্য লয় সমাধি স্থায়ী ফলপ্রদ নয়।

কেবলমাত্র উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সমাধিসিদ্ধ হওয়া সম্ভব

সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে অধিগত হলে সমাধির পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য যে সাধকের অন্তরে আত্মানুভূতির তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা জাগে এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধিসিদ্ধির জন্য সদ্‌গুরুর সাহায্যে গভীর আত্মধ্যানে মগ্ন হতে চায়, তারাই উত্তম অধিকারী। এইরূপ যোগ্য অধিকারী সাধক সদ্‌গুরুর সাহায্যে সবিকল্প সমাধির সম্যক্ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভের পর নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন আরম্ভ করেন। সদ্‌গুরুর কৃপা, ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং স্বকীয় চেষ্টার উৎকর্ষে, সাধনার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণ অধিকার লাভ করেন। এই ভাবে সে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভে সমর্থ হয়। এই সমাধির সিদ্ধি হয় তার দীর্ঘকাল অভ্যাসের পর। এই হল প্রকৃতির শেষ অবস্থা। অর্থাৎ অব্যক্তে প্রতিষ্ঠা। এখান থেকেই শুরু হয় নির্বিকল্প সমাধি তথা আত্মস্বরূপে স্থিতির বিজ্ঞানসিদ্ধি।

এই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত সাধকের ধর্মমেঘ সমাধি হয়। এই সমাধি অতি দুর্লভ। সব সাধকের এই সমাধি হয় না।

ধর্মমেঘ সমাধির তাৎপর্য ও অহেতুক কৃপার বৈশিষ্ট্য

লোনা সমুদ্রের জল পান করা যায় না, কিন্তু তা সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে ও মেঘ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায় এবং যখন বৃষ্টিরূপে মাটিতে পতিত হয় সেই বৃষ্টির জল কিন্তু লোনা নয়, মধুর। সেইরূপ জগৎ জীবনের ব্যবহার সমবোধের নয়, স্থায়ী আনন্দপ্রদ ও সুখপ্রদও নয়। কিন্তু জ্ঞানময় তপস্যার মাধ্যমে অন্তরের তাপের প্রাধান্য হেতু মন সমগ্র চিন্তা ও ভাব শূন্য হয়ে ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়ে চিদাকাশে ভেসে বেড়ায়। সেখান থেকে যখন চিদানন্দে রূপায়িত হয়ে অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধ হয়ে তা নেমে আসে এবং বাইরে প্রকাশ পায় তখন তা চার পাশে সবার উপর আনন্দ বর্ষণ করে, সুখ বর্ষণ করে এবং শান্তি বর্ষণ করে। এই হল ধর্মমেঘ সমাধির বৈশিষ্ট্য। এইরূপ সমাধিলব্ধ পুরুষের সান্নিধ্যে যারা আসে সাধনা না-করেও তারা দিব্য আনন্দ লাভে ধন্য হয়। এইরূপ সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটে না। যারা এই সুযোগ পায় তারা এই দিব্য আনন্দ আস্বাদনের পর যদি ধর্মপথে না-চলে সংসারেই লিপ্ত থাকে, তবে তাদের বহু জন্ম সংসারপাকে লিপ্ত থাকতে হয়। সমাধিবান পুরুষের সমাধিতে স্থিত অবস্থায় তাঁর মাধ্যমে যে-সকল দিব্য ভাবানন্দের অভিব্যক্তি হয় তা দর্শনে যে দিব্য আনন্দ দর্শক পায় তা অহেতুক কৃপার বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ কৃপার ফল অতি দুর্লভ বলে শাস্ত্র উল্লেখ করেছে। মহাজনগণও তা ব্যক্ত করেছেন। এইরূপ কৃপালাভ করে যারা ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে চায় এবং অধ্যাত্মসাধনায় লিপ্ত হয় তারা সহজেই ইষ্টকৃপা লাভে সমর্থ হতে পারে। এই হল অহেতুক কৃপার ফলশ্রুতি। সাধন বিনা সিদ্ধি হয় না সত্য এবং ঈশ্বরাত্মাগুরুকৃপা ছাড়া আত্মসাধনও সম্ভব হয় না। আত্মসাধন মানেই মুক্তির সাধন। এর জন্য সদ্‌গুরুকৃপাই হল শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

অহেতুক কৃপা হল অভিনব ও দুর্লভ। এর সম্যক্ অধিকারী সহজেই সাধনসিদ্ধ বিজ্ঞান পায় এবং তার অনুশীলনে সহজেই সিদ্ধ হয় বলে তাকে কৃপাসিদ্ধ বলা হয়। অহেতুক কৃপার ফলাশ্রয়ে যে সাধন ও সিদ্ধি তা-ই হল কৃপাসিদ্ধি। স্বল্প আয়াসে হয় বলে তা অসাধারণ।

পরাভক্তির বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ

নির্বিকল্প সমাধির পরাকাষ্ঠাই হল আত্মস্বরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এখানেই সব শেষ নয়। এর পরের স্তর বিশেষ ভাগ্যবান ছাড়া সব সাধকের পক্ষে লভ্য নয়। পরাবৈরাগ্যের উৎকর্ষের ফলে পরাজ্ঞান লাভের যোগ্যতা হয়। এই পরাজ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান। তা নির্বিকল্প সমাধির গভীরে লব্ধ হয়। পরাবৈরাগ্য লাভের পরে যে পরাভক্তি লাভ হয় তা অতি দুর্লভ! একমাত্র চতুর্থ পর্যায়ের গুরুর অনুগ্রহ ও অনুকম্পাতেই শুধু এর প্রাপ্তি সম্ভব হয়। তা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিজ্ঞান নয়। কারণ এ হল অতি সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। পরাভক্তির বৈশিষ্ট্যই হল ভগবৎ দর্শন। আত্মার যে ভগবৎস্বরূপতা তা পরাভক্তির মাধ্যমেই কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধ হয়। বাক্যমনাতীত তো বটেই, তা ভাবাতীত ভাব কেবলমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের সর্বপর্যায়ের অভিজ্ঞতা সম্যক্ ভাবে অধিগত হয়।

স্বানুভূতির তাৎপর্য

জ্ঞানবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যার দ্বারা লাভ হয়, সেই তত্ত্ববিজ্ঞান সর্ব ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এবং মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সমরসে জারিত হয়ে স্বানুভূতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। তা প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে কেবল কথামাত্র বা শব্দমাত্র; দার্শনিকের কাছে কেবল তথ্যমাত্র এবং আত্মজ্ঞপুরুষের কাছে কেবল তত্ত্বস্বরূপ। কিন্তু পরাবিবেক, পরাভক্তি সমন্বিত অতি দুর্লভ দিব্যমানবের কাছে তা স্বানুভূতি নামে গ্রাহ্য।

স্বানুভূতি তথা আত্মানুভূতি হল নির্বিকল্প সমাধিবিজ্ঞানের সিদ্ধি। এই সমাধি হল চিৎতত্ত্ব বা চিৎসত্তায় সমভাবে স্থিতি। তা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা—সর্ববিধ দ্বৈত ভাব ও বিকার মুক্ত। সর্ববিধ প্রতিবন্ধকশূন্য এই আত্মবোধ হল পরম সত্যবোধ—একবোধের বা সমবোধের স্বরূপ। নির্বিকল্প সমাধির পরিপক্ব অবস্থায় অন্তঃকরণ বৃত্তি তথা চিত্ত বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। এখানেই হয় অহংকার নাশ ও চিত্ত নাশ। চিত্ত নাশ হলেই বুদ্ধিও নির্মূল হয়, থাকে শুধু বোধসত্তার তথা চিদানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

নির্বিকল্প সমাধিসিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বহুবিধ সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনুভূতির পরিচয়

নির্বিকল্প সমাধির আরম্ভ থেকে সিদ্ধি পর্যন্ত সাধককে বহুবিধ সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির ক্রমের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সেই সকল অনুভূতির বৈশিষ্ট্যকে সমাধির উৎকর্ষক্রমের মান হিসাবে অনুভবসিদ্ধগণ ব্যক্ত করেছেন। তা-ই হল নির্বিকল্প সমাধির অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান সমাধি, আনন্দ সমাধি, প্রেম সমাধি, প্রজ্ঞান সমাধি প্রভৃতি। দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধির ত্রিবিধ ক্রম ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধির ত্রিবিধ ক্রম সবিকল্প সমাধির অন্তর্ভুক্ত। তাদের পরাকাষ্ঠাই হল নির্বিকল্প সমাধির পর্যায়ভুক্ত সর্ববিধ সমাধি। এই সকল সমাধি ও তার অনুভূতি সব সাধকের সমান ভাবে হয় না। সমাধির বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। তবে এখানে নির্বিকল্প সমাধির সিদ্ধিলাভের যে সকল অন্তরায় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।

নির্বিকল্প সমাধির চতুর্বিধ অন্তরায়ের পরিচয়

নির্বিকল্প সমাধিবিজ্ঞানের সাধকের চতুর্বিধ প্রতিবন্ধক হল (১) লয়, (২) কষায়, (৩) বিক্ষেপ এবং (৪) আনন্দ আস্বাদন। এগুলি সবই সবিকল্প সমাধির অন্তর্ভুক্ত।

(১) 'লয়' হল তমোগুণাত্মক আলস্যজনিত শ্রান্তি ও ক্লান্তির ফল এবং নিদ্রা, জড়তা ও প্রকৃতির লয় অবস্থা। তা চিৎতত্ত্বে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠা নয়। এ হল প্রাকৃত অবস্থা, সুতরাং সমাধির অন্তরায়।

(২) 'কষায়' হল রজোগুণাত্মক সূক্ষ্ম সংস্কারের তথা বৃত্তিসমূহের এক বিশেষ সক্রিয় অবস্থা। এই অবস্থা পূর্ব পূর্ব সুখ-দুঃখের স্মৃতির উদয়ে চিত্তের একাগ্র স্থিতির প্রতিবন্ধক হয়। চিত্তকে যা-কিছু অভিভূত করে এবং চিৎস্বরূপে মিশে যেতে বাধা সৃষ্টি করে তা-ই হল কষায়।

(৩) 'বিক্ষেপ'—এও রজোগুণাত্মক বৃত্তিরই বিশেষ রূপ। যে চিত্ত বৃত্তি অশান্ত, অস্থির ও বিরুদ্ধভাবাত্মক তা সমাধি সাধনকালে চিত্তের বিকার সৃষ্টি করে। চিত্তের মধ্যে বিক্ষেপাত্মক বৃত্তিসকল সৃষ্টি করে তার স্থিতির অন্তরায় হয়। কষায় যেমন 'রজোপ্রধান তমোগুণের' এবং 'তমোপ্রধান রজোগুণের' সংস্কাররূপ বৃত্তিসমষ্টি, বিক্ষেপও সেরূপ 'রজোপ্রধান রজোগুণের' এবং 'রজোপ্রধান সত্ত্বগুণের' সংস্কাররূপ বৃত্তিসমষ্টির আংশিক উদয় বা সম্যক্ ভাবে উদয়। তা সমাধিস্থিতির বিশেষ অন্তরায়। যদিও এর উদয়কালে সাধক সহজে একে অতিক্রম করতে পারে না। পূর্ব পূর্ব অভ্যাসই এর জন্য দায়ী। আত্মবিচার দ্বারাই সাধককে তার এই অনাত্মারূপী বিক্ষেপকে অতিক্রম করতে হয়। তা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর করুণাবলে এবং স্বকীয় অনলস চেষ্টার মাধ্যমে অনাসক্তিযোগে।

(৪) 'আনন্দ-আস্বাদন' হল সত্ত্বগুণাত্মক সাত্ত্বিক ভাবের বৃত্তিসমষ্টির আংশিক ভাবে উদয় বা সম্যক্ ভাবে উদয়। আনন্দের বৃত্তিসকল জ্ঞানভিত্তিক এবং সাত্ত্বিক হলেও শুদ্ধসাত্ত্বিক নয়। সত্ত্বগুণের জ্ঞানাসক্তি ও সুখাসক্তি অপর দুই গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হলেও তারা সর্বশুদ্ধ নয়। তাদেরও বিকার হয়; অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ও উদয়-অস্ত হয়। কারণ এরা মিশ্রসত্ত্ব। নির্বিকল্প সমাধি হল গুণাতীত, নির্বিকল্প ও স্থিতি অবস্থা। এরই নামান্তর হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধি প্রকৃতির অব্যক্ত স্তরের মতো হলেও অব্যক্তের ঊর্ধ্বে নিত্য অদ্বয় অমৃত অব্যক্তে স্থিতি। প্রথম অব্যক্ত অবস্থা হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির সাম্য অবস্থা। এ হল ত্রিগুণের সর্ব ব্যক্ত অবস্থার স্থিতি অবস্থা, বিশ্রামের অবস্থা বা কারণ অবস্থা। এই কারণ ভঙ্গে আবার ত্রিগুণের বিকার, গতি ও অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। সেই জন্য তা নিত্য স্থায়ী পদ বা অবস্থা নয়। কিন্তু 'পরবর্তী অব্যক্ত' হল তুরীয় ও তুরীয়াতীত ভূমাস্বরূপ—পরমপদ অব্যয় অদ্বয় অচ্যুত প্রশান্ত অমৃত শাশ্বত নিত্য সনাতন অবস্থা। এই হল পরমতত্ত্বের স্বরূপস্থিতি।

ভূমাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়

ভূমাস্বরূপের বৈশিষ্ট্যই হল তা অন্যনিরপেক্ষ (অনন্য), সেই জন্য নির্বিকার নির্বিকল্প নির্বিশেষ নিরাময় নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। এ-ই হল কারণের কারণ, কারণাতীত কারণ এবং কারণশূন্য কারণ। এ-ই হল সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মুক্তিস্বরূপ ও শান্তিস্বরূপ ভূমাতত্ত্বের পরিচয়। একেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর বলা হয়। তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বসংবেদ্য সচ্চিদানন্দঘন স্বানুভবদেব স্বয়ং। এঁরই নামান্তর হল পুরুষোত্তম ভগবান।

চিৎস্বরূপের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

চিৎস্বরূপ নিত্যপূর্ণ নিত্যসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। সচ্চিদানন্দ হল এর ত্রিবিধ সংজ্ঞা বা নাম। এই চিৎ-এর স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞানের প্রতিফলনই হল চিত্ত। চিত্তের প্রকাশবিকাশই হল বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের জগৎ। সেই জন্য স্বানুভূতির বিজ্ঞান প্রসঙ্গে পূর্বেও বহু স্থানেই সবার অবগতির জন্য বলা হয়েছে 'চিদাকাশে চিত্তাকাশ ভাসে এবং চিত্তাকাশে ভৌতিক আকাশ ও পাঞ্চভৌতিক জীবজগৎ ভাসে'। সুতরাং চিৎসত্তার বক্ষে চিত্ত বা মানস অথবা বুদ্ধির বিলাস হয় জীবজগৎরূপে। এই চিত্তের বিলাসের সমষ্টি ভূতাকাশে বিরাজ করে। ভূতাকাশই হল দেশ। কাল হল ক্রিয়াশক্তি ও ক্রিয়ার আধার। দেশ-কাল, কার্য-কারণ ও কারণ-কার্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় জীবজগতের সব কিছু। সুতরাং 'চিত্তের মূলে জগৎ এবং জগতের মূলে চিত্ত।' আবার 'চিৎ-এর বক্ষে চিত্ত এবং চিত্তের বক্ষে চিৎ।' চিত্তের উদয়ে জগতের প্রকাশ, বিলাস, ব্যবহার ও অনুভূতি; আবার চিত্তের লয়ে জগৎ লয় এবং জগতের ব্যবহার ও তার বিজ্ঞানেরও লয়। চিত্তের উদয়-অস্তেই হয় জগতের উদয়-অস্ত এবং চিত্তনাশেই হয় জগতের নাশ। কিন্তু চিৎতত্ত্বের কোনও উদয়-অস্ত নেই, তার কোনও বিকারও

নেই। তা আকাশবৎ নির্মল নিশ্চল সর্বব্যাপী অখণ্ড অবিভক্ত অনন্ত নিত্য স্থায়ী নির্বিকার নির্বিকল্প নিষ্কল উজ্জ্বল স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ।

চিদাকাশের ঊর্ধ্বে হল পরাব্যোম বা মহাব্যোম। এই পরাব্যোমই হল তুরীয়াতীত সত্যের ভূমি। তা পূর্ণ চিদানন্দের স্বরূপ। তার কখনওই বিকার বা রূপান্তর হয় না। এরই বক্ষে চিদাকাশ এরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত। তা-ও সচ্চিদানন্দঘন। এই চিদাকাশের বক্ষে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের অন্তর্গতই হল চিত্তাকাশ এবং চিত্তাকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশবিকাশের অন্তর্গত হল ভূতাকাশ। এই ভূতাকাশের বক্ষে চিত্তাকাশের অভিব্যক্তিসকল সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে নানাবিধ বৈচিত্র্যের সম্ভারে পূর্ণ এই নাম-রূপের জগৎ।

চতুর্বিধ আকাশের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা 'নিত্যলীলা প্রসঙ্গে' ব্যক্ত করা হয়েছে সম্যক্‌রূপে। এখানে তার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হল।

স্বানুভূতির বিজ্ঞান ও তার তাৎপর্য

স্বানুভূতির বিজ্ঞান হল 'প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান' এবং 'বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান' উভয়েরই সম্যক্ অনুভূতির বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা। এরই নামান্তর হল তত্ত্বস্বরূপের বিজ্ঞান বা পূর্ণস্বরূপের বিজ্ঞান। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে এই বিজ্ঞান কী ভাবে সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত, প্রকাশ, সঞ্চার, বিকাশ ও স্বানুভবসিদ্ধ হয় তা-ই হল গুরুমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

জীবনের সর্বসাধনার পরিসমাপ্তি যেখানে হয় সেখান থেকে আরম্ভ হয় আত্মজ্ঞানের বিকাশ ও প্রকাশ। তার পরাকাষ্ঠাই হল 'স্বসংবেদ্য স্বানুভবতত্ত্ব'। যাঁরা এই তত্ত্বের পূর্ণ অধিকারী নন, অর্থাৎ এই তত্ত্বস্বরূপে যাঁদের জীবন বিগলিত হয়ে মিশে যায়নি, তাঁরা এই তত্ত্বের ব্যবহার কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা যখন ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁরা বুদ্ধিদোষে নিজেদের বিকার ও বন্ধনের কারণ নিজেরাই হন। স্বানুভবতত্ত্বের বিজ্ঞান পরমেষ্ঠিগুরুর স্বরূপ। সুতরাং এর অনুশীলনক্রম কথা শুনে হয় না। পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের সাধন ও অনুশীলন যথার্থ ভাবে পূর্ণ না-হলে ও সিদ্ধ না-হলে এই তত্ত্বের ব্যবহার কারওর পক্ষেই সঙ্গত নয়। কারণ চতুর্থ পর্যায়ের গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ না-হলে এর অধিকারী হওয়া যায় না। অধিকারী না-হয়ে তা ব্যবহার করলে ভাবের ঘরে চুরি হয়। স্বানুভবতত্ত্বের ব্যবহার যাঁরা করেন তাঁদের জীবনে দ্বৈতবোধের কোনও লক্ষণ বা প্রকাশ কখনওই থাকতে পারে না। যদবধি বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম ও কর্মফলের প্রাধান্য অন্তরে থাকে তদবধি অন্তর-মন অশুদ্ধ। ত্রিগুণের প্রভাব মুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত অন্তর শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধ অন্তরে গুরুকৃপায় সামান্যতম সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধনকালে গুরুবাক্যের অনুসরণ ও অনুশীলনে সর্বোত্তম স্তরের বাক্যের প্রয়োজন হয় না। যে সকল কথা কেবলমাত্র গুণের স্তরে, গুণের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে, প্রস্তুতির বিজ্ঞান হিসাবে তা-ই গ্রহণ করা উচিত।

গুরুতুষ্টিসাধন তপস্যারই পরিণাম

তপস্যা ও সাধন ব্যতিরেকে শুধু গুরুবাক্যের অন্তর্ভুক্ত চরমতম বাণী ও কথাগুলির অনুশীলন ও ব্যবহার কোনও মতেই কার্যকরী ও ফলপ্রদ হতে পারে না। তা অপরের এবং নিজের বিকার সৃষ্টির কারণ হয়। কারণ গুরু তুষ্ট না-হলে গুরুবাক্য শ্রোতার অন্তরে কার্যকরী ও ফলপ্রদ হয় না। অভিমানী চিত্ত বা মন স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার কাজে রত থাকে। গুরুতুষ্টির জন্য তার চেষ্টা হয় না। গুরুপ্রীতির জন্য যে সাধনা তা অভিমানী চিত্ত মুখে অপরের কাছে বলে কিন্তু তা নিজে সম্যক্‌রূপে মানেও না এবং সাধনও করে না।

গুরুপ্রীতি সাধনের মাধ্যমে আপনবোধের বিকাশ ও তার ফলে তপস্যার গতি সমাধিতে পরিণত হয়

গুরুভাব গুরুপ্রীতি সাধনের মাধ্যমেই স্ববোধ বা আপনবোধ রূপে ফুটে ওঠে। বিনা তপস্যায় সমাধি হয় না। বিনা সমাধিতে সিদ্ধিলাভও হয় না। যাদের পূর্ণাঙ্গ সমাধিসিদ্ধি হয়নি, তাদের তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুশীলন ও ব্যবহার চিন্তা, বাক্য ও কাজের মধ্যে ফুটে ওঠে না। সেই জন্য তাদের অন্তরে বিকার সৃষ্টি হয় ও ক্ষোভ

প্রকাশ হয়। তারা পরদোষ দেখে ও পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। তা-ই হল অন্তরের মল। তমোগুণ ও রজোগুণের প্রভাবেই তা ঘটে থাকে।

পরমেষ্ঠিগুরুর বিষয় শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে

পরমেষ্ঠিগুরুর বিষয় বিশুদ্ধ মনের অনুশীলনে সাহায্য করে, কিন্তু অশুদ্ধ মনের অনুশীলনে সাহায্য করে না। অশুদ্ধ মন তার অনুশীলন করলে অভিমান বাড়ে এবং অভিমান তার নষ্ট হয় না। তা-ই হল অনধিকার চর্চা। পরমেষ্ঠিগুরুর বাক্য কখনও লৌকিক ব্যবহারের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়, তা নিষিদ্ধ। যোগ্য অধিকারীর অন্তরে তা অনুশীলনের বিষয়। তা সাধকের কাছে কৃপাশ্রয়ী, সৎসঙ্গীদের কাছে এবং গুরুসঙ্গকারীদের কাছে অতি আদরের বিষয় ও গুপ্ত বিষয়। একে গোপনে রাখতে হয়। তা ব্যবহারের একমাত্র অধিকারী হন পরমেষ্ঠিগুরু স্বয়ং। কিন্তু তাঁর অনুগত, আশ্রিত, শরণাগত ও আর্ত জিজ্ঞাসুগণ নয়। ব্যবহারদোষে যে ত্রুটি তা অমার্জনীয়, তা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত সদ্‌গুরুর কৃপাকে, তাঁর বাণীকে সদ্‌গুরুবাণীরূপে পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ, বরণ, ধারণ ও পরিবেশন করা সম্ভব না-হয় ততদিন পর্যন্ত অন্তর অশুদ্ধ। গুরুবাণীকে গুরুর নামেই ব্যবহার করা হল সত্যের ব্যবহার। তা ব্যক্তিগত নামে ব্যবহার করলে যে ব্যবহারদোষ হয়, তা-ই হল মিথ্যাচার। তার ফল বিকারী ও দুঃখপ্রদ।

গুরুবাণী ব্যবহারের ত্রুটি প্রসঙ্গে বিধান ও নিষেধ

গুরুবাক্যের বৈশিষ্ট্য স্বানুভবসিদ্ধ বলে তা অনুগত ও শরণাগতগণ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। স্বানুভবসিদ্ধ গুরুবাণীকে অন্য শাস্ত্রবাক্য বা মহাজনবাক্যের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কারণ 'স্বানুভবসিদ্ধ গুরুবাণী' নিত্য, পূর্ণ ও শুদ্ধ সত্যের বাণী। তা অবিমিশ্র, বিকাররহিত। বিকারী মন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর ব্যবহার করলে তা বিকারগ্রস্ত হয়। অন্য সাধু-মহাত্মার কথার সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করলেও তা পরম অপরাধরূপে গণ্য হয়। এগুলি হল গুরুবাণী ব্যবহারের ত্রুটি প্রসঙ্গে বিধান ও নিষেধ। এই বিধি-নিষেধ অমান্যকারীদের মাধ্যমেই যুগে যুগে সত্যানুভূতির মানের বিকার হয়। বুদ্ধিদোষে ও ব্যবহারদোষে গুরুবাণীর শক্তি আবৃত হয়ে যায়। আচরণ শুদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত তা বলা, কওয়া ও লেখা অপরের পক্ষে কোনও মতেই সঙ্গত নয়। নিজের প্রস্তুতির জন্য যে-অংশ একান্ত দরকার তা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ চর্চা করা মানেই অনধিকার চর্চা। স্বানুভবসিদ্ধ গুরুবাণীর সব অংশ সবার জন্য নয়। তা ব্যবহারের অধিকারও সবার নেই। ব্যবহারদোষে গুরুবাণীর শক্তি আবৃত হয়ে যায় যখন, তখনই হয় সত্য ভাবাদর্শের বিকার ও পতন।

সত্যযুগ থেকে আরম্ভ করে কলিযুগ পর্যন্ত যে সত্য ভাবাদর্শের বিকার ও পতন ঘটে এসেছে তার মূলে আছে এই বিধি-নিষেধের অমান্যকরণ। তা ঘটে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, সুবিধা ও মানলাভের প্রচেষ্টার জন্য। তমোগুণ ও রজোগুণের প্রভাবে অভিমানী ও অহংকারী চিত্তের অনধিকার চর্চা ও সাময়িক আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেশের বিকারজনিত ব্যবহার হয়। যে গুরুবাণী চিরন্তন সত্য তার ব্যবহারে ত্রুটি যেন না-হয়, তার জন্যই সদ্‌গুরুগণ বিশেষ কতগুলি নিষেধবাণী বেঁধে দেন। সেই বাণীগুলি হল—গুরুবাক্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ও তার যথার্থ সদ্‌ব্যবহার মানার মাধ্যমে সাধন করা। তার দ্বারা কিন্তু ব্যক্তিগত সংসারজীবনে কোনও স্বার্থসিদ্ধি হবে না। স্বার্থসিদ্ধির কাজে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ। নিঃস্বার্থ অর্থাৎ স্বার্থশূন্য, অহংকার-অভিমানশূন্য হওয়ার জন্য এবং গুণের বিকার ও দোষ মুক্ত হবার জন্য সদ্‌গুরু যে স্বানুভবসিদ্ধ বাণী দান করেন তা সেই সদ্‌গুরুর নামেই ব্যবহার করা হল সত্যের বিধান। এই হল ঋষিবাক্য। স্বানুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরুগণই কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধ তত্ত্বের বিজ্ঞান পরিবেশন করেন। সিদ্ধ গুরুগণ কেবলমাত্র দীক্ষা দেন। তাঁরা তত্ত্বের বিজ্ঞান পরিবেশন করেন না। তত্ত্ববিজ্ঞানবেত্তা যেমন দুর্লভ, তত্ত্ববিজ্ঞানের পরিবেশনও ততোধিক দুর্লভ। তা-ও কেবলমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞানের অধিকারিগণই ব্যক্ত করেন। অপরের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

স্বানুভূতির বিজ্ঞান ও বাণী প্রসঙ্গে বিধি-নিষেধ

স্বানুভূতির বিজ্ঞান হল সদ্‌গুরুর বিজ্ঞান। স্বানুভূতির বাণী হল সদ্‌গুরুবাণী। সদ্‌গুরুর নামে সব সময়েই তা স্মরণ, মনন ও ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত নামে তা কখনওই ব্যবহার করা উচিত নয়। তা থেকে যে দোষ, ত্রুটি ও অপরাধ হয় তার জন্য সদ্‌গুরু কখনও দায়ী থাকেন না। সদ্‌গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সদ্‌গুরুবাণী অপরের জন্য ব্যবহার করার যোগ্যতা ও অধিকার জন্মে, নতুবা নয়। সদ্‌গুরুবাণীর ব্যবহার প্রসঙ্গে যে বিধি ও নিষেধের উল্লেখ করা হল তার প্রথম অংশ অর্থাৎ 'বিধি' অর্থ হল যা সচেতন ভাবে নিরলস চেষ্টার মাধ্যমে অভ্যাস করা বা পালন করা উচিত। এ হল ইতিবাচক। তা না-মানা ও না-পালন করাই হল দোষ, ত্রুটি ও অপরাধ এবং তা পালনের মাধ্যমে দোষ, ত্রুটি ও অপরাধ ঘোচে বা দূর হয়। এর অন্ত্যভাগ অর্থাৎ 'নিষেধ' অর্থে যে সকল চিন্তা, কর্ম ও অভ্যাস একান্ত ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে তা সচেতন ভাবে মানা ও অভ্যাস করাই হল কর্তব্য এবং সাধন। এর দ্বারা সঞ্চিত চিন্তা ও কর্মের দোষত্রুটি ও অপরাধের শোধন হয়। কিন্তু এই 'নিষেধ' অংশ না-মানা ও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তার ব্যতিক্রমী ব্যবহারের ফলে দোষত্রুটি ও অপরাধের মাত্রা শোধিত ও সংস্কৃত না-হয়ে তা বৃদ্ধি পায় এবং সঞ্চিত দোষত্রুটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা তীব্র ভাবে, গুরুতর ভাবে তমোরজোগুণের সংস্কারে পরিণত হয়। তা-ই বর্তমান জীবনে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ-কষ্টরূপে ভোগ করতে হয়। একেই বলে প্রারব্ধ ভোগ।

প্রাকৃত বিজ্ঞান কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে সাধিত হয় নিয়তির অধীনে

প্রারব্ধ ভোগকেই অনেকে কর্মফল ভোগ বলে। পূর্ব পূর্ব জীবনের স্বকৃত চিন্তা ও কর্মের ফল ও সংস্কার হল বর্তমান দেহধারণ ও বর্তমান জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ। পূর্ব পূর্ব জীবনের স্বকৃত চিন্তা ও কর্মের সংস্কারই হল জীবনের ভাগ্য ও নিয়তি। ভাগ্য ও নিয়তি হল বর্তমান জীবন, কর্ম ও ভোগের কারণ অবস্থা। এ সবই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সঞ্জাত। পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে, কারণ-কার্য এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে তা সক্রিয় হয় জীবনের মাধ্যমে। নিজের চিন্তা ও কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয় জীবনের মাধ্যমে। এ সবই প্রাকৃত বিজ্ঞানের প্রভাব। এর কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যই গুরুবাণী ও গুরুশক্তির সাহায্য দরকার হয়। মুক্তির বিজ্ঞান সদ্‌গুরুর অধিগত। সদ্‌গুরুই হলেন দিব্যমানব, মুক্ত আত্মা, অমৃতত্বের বেত্তা সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বানুভবদেব স্বয়ং।

সদ্‌গুরুর দিব্যজীবন ও দিব্য ধর্মকর্মের সম্যক্ পরিচয় তাঁর কৃপা ছাড়া অভিমানাত্মক বুদ্ধি দ্বারা কখনওই জানা যায় না। বুদ্ধিদোষে জীব আপন দিব্য-মুক্ত-শুদ্ধ আত্মস্বরূপকে ভুলে প্রকৃতির অধীন হয়ে প্রাকৃত জীবন ভোগ করে। সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরুর কৃপা পেলেও, সদ্‌গুরুকে সম্যক্‌রূপে মেনে তাঁকেই ইষ্টরূপে বরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না বলেই সে কল্পিত ইষ্টের ধারণা করে ও তার কৃপা লাভের চেষ্টা করে। সদ্‌গুরুর দেহান্তে সে তাঁকে মহৎ জ্ঞানে ও মহৎ ভাবেও প্রচার করে। তাঁর প্রকট অবস্থায় তাঁকে সে-ভাবে মানতে ও বরণ করতে পারে না। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞপুরুষের ক্ষেত্রেই এরূপ হতে দেখা গেছে ও দেখা যায়। সদ্‌গুরুর direct followers তাঁদের প্রকট অবস্থায় যত হয়, তাঁর posthumous followers-এর সংখ্যা সর্বকালেই সমধিক দেখা যায়। এর কারণ ত্রিগুণাপ্রকৃতির প্রভাব ও বুদ্ধিদোষ। সদ্‌গুরুকে মনুষ্যদেহধারী দেখে ও জেনে তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে মানা ও জানা প্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে খুবই কঠিন। তারা ঈশ্বরের বিগ্রহ, মূর্তি (image) তৈরি করে, পুজো করে, তাঁরই কাছে কৃপা প্রার্থনা করে। তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ যে সদ্‌গুরু তা তারা পূর্ণ মানতেও পারে না এবং জানতেও পারে না। তার ফলে আত্মবোধের স্মৃতি তাদের জাগে না। আপন অতিরিক্ত ইষ্ট ও আত্মার কল্পনা করে তাঁর দর্শন ও অনুভূতি পেতে চায় তারা। তীব্র মানসিক সংবেগের ফলে অন্তরে যে ভাবাবেগের ঘনীভূত রূপ অভিব্যক্ত হয় তা ইষ্টরূপে দর্শন করে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তা আত্মজ্ঞানের ও আত্মবোধের প্রতিফলন

মাত্র এবং সেই জন্য সুখানুভূতি হয় সত্য এবং আনন্দ আস্বাদনও হয়। তা সবিকল্প সমাধির এক বিশেষ উন্নত অবস্থার সিদ্ধি বটে, কিন্তু তা চরম ও পরম অবস্থা নয়। সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

দ্বৈতবোধ ও অদ্বৈতবোধের লক্ষ্য ও তাৎপর্য

আত্মবোধের সন্ধান মেলে নির্বিকল্প সমাধির পরিপক্ক অবস্থায়। ইষ্ট দর্শন ও ইষ্টানুভূতি দ্বৈত ভাবের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আত্মানুভূতি ও আত্মজ্ঞান হল অদ্বৈত ভাববোধের পর্যায়ভুক্ত। অদ্বৈতবোধ সিদ্ধি হল স্বানুভূতি। তা ভূমা বোধস্বরূপে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই বোধস্বরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি দ্বৈত ভাবের একান্ত অভাব। তা দ্বৈত ভাববাদিগণ মানেনও না এবং জানেনও না। তাঁদের কাছে আত্মজ্ঞান অপেক্ষা ইষ্টদর্শনের স্ফূর্তি ও আনন্দই শ্রেয়। তাঁরা অদ্বৈতবোধ অপেক্ষা দ্বৈত ভাববোধকেই গুরুত্ব দেন বেশি। তাঁরা তত্ত্বস্বরূপের অতিরিক্ত তাঁর প্রকাশবিভূতিকেই একমাত্র সত্যবোধে গুরুত্ব দেন। এই হল দ্বৈতবাদীদের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ। কিন্তু শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং স্বানুভবসিদ্ধদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে পরমতত্ত্বস্বরূপ ভূমাদেব স্বয়ং তা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। পরমতত্ত্বের পরিচয় দ্বৈত, কি অদ্বৈত তা দার্শনিকদের বিচারের বিষয় হতে পারে, কিন্তু স্বানুভবসিদ্ধদের কাছে তা অদ্বৈত-অমৃতবর্ষিণী সচ্চিদানন্দঘন স্বানুভবদেব স্বয়ং।

বর্তমান যুগে শরণাগত, আশ্রিত ভক্তদের ব্যবহারদোষের ত্রুটি সংশোধনের জন্য এই নির্দেশবাণী বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কারণ কলি যুগে সাধারণ মানুষের মন ও চিত্ত তমোরজোগুণপ্রধান বলে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা-ই তার সাধন। শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রসঙ্গ আলোচনা ও ব্যবহার তার পক্ষে অনধিকার চর্চা। সত্ত্বগুণের পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করাই কঠিনসাধ্য সংসারজীবনে। সংসারত্যাগীদের পক্ষেও তা সহজসাধ্য নয়। কারণ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন হলে যথার্থ অধ্যাত্মসাধনার প্রতি সুমতি হয়। সেই জন্য ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা ও আগ্রহ প্রয়োজন। সংসারজীবনের প্রভাব মুক্ত হবার তীব্র ব্যাকুলতা না-জন্মালে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন হয় না এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন না-হলে শুদ্ধসত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও ব্যবহারের যোগ্যতা হতেই পারে না। সেই জন্য শুদ্ধসত্ত্বগুণের ব্যবহার বিবেক-বৈরাগ্যবান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, সংসারীদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়, একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকারীর মানের উৎকর্ষ হিসাবে সাধনবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও সিদ্ধিলাভ হয়

সাধনার বিজ্ঞান যত উন্নত পর্যায়ের হয়, ততই তার তাৎপর্য ও ব্যবহারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়। নিম্নপর্যায়ের অধিকারীদের পক্ষে তা সুসাধ্য নয়, অতীব দুঃসাধ্য। অহংকার-অভিমানবশত কেউ যদি তার চর্চা করে ইচ্ছামতো, তবে তা স্বকৃত দোষের পর্যায়ে পড়ে। স্বকৃত দোষের খণ্ডন ও পরিশোধন নিজেকেই করতে হয়, অপরে করে দেয় না। জীবনে যত রকম বিকার, সন্তাপ, ক্রোধ, বিক্ষেপ হয় সবই স্বকৃত কর্ম ও চিন্তারই ফল তা সাধারণ মানুষ জানে না এবং বলে দিলেও মানে না, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজের দোষ না-দেখে অপরের দোষ দেখেই অভ্যস্ত এবং অপরের গুণ, যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা না-বলে নিজের গুণপনার কথা বলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অপরের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সে সহজে মানতে পারে না এবং মানতে চায়ও না। কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই তার প্রচেষ্টা চলে। সেই জন্য অপরের মর্যাদাহানি ও নিন্দা প্রচারের ব্যাপারে কখনও সে দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করে না। এই হল তমোরজোগুণের বৈশিষ্ট্য। সত্ত্বগুণের যেটুকু লক্ষণ থাকে তাও বিকৃত হয় তমোরজোগুণের প্রভাবে, যদি না সে নিজের চিন্তা, আচরণ ও কর্ম সম্বন্ধে অধিক সচেতন হয়।

গুরুমন্ত্রের সাধনকারীদের আপন আপন স্বভাব শোধনের ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়া উচিত। নতুবা গুরুমন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। স্বভাবের সর্বপ্রকার ভুল, ত্রুটি, বিকার ও দোষ শোধন করাই

হল অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বভাবের দোষত্রুটি সবই স্বকৃত চিন্তা ও কর্মের ফল। এ সবই তমোরজোগুণের বিশেষ লক্ষণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি তৈরি হয় সত্ত্বগুণের অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধন দ্বারা এবং তার সিদ্ধি আসে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশে ও শুদ্ধসত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি দ্বারা।

গুরুবাদের মর্মার্থ (তত্ত্বার্থ) স্ববোধে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। পরিশেষে কয়েকটি বিশেষ গুরুমন্ত্র ও তার মর্মার্থ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল আত্মতত্ত্ব তথা ব্রহ্মতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ অনুশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে।

চৈতন্যং সর্বগং সর্বং সর্বভূতগুহাস্থিতম্
সর্ব ভাবাতীতং য তস্মৈ শ্রীআত্মগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বব্যাপী চৈতন্যই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত, সর্ব ভাবাতীত সেই আত্মরূপী শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং সম্পদ্যতে তদা
য এব সর্বসম্প্রাপ্তিস্বরূপং তস্মৈ শ্রী আত্মগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর স্মরণমাত্রই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, যিনি সর্ব সম্প্রাপ্তিস্বরূপ সেই চিদাত্মা শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যত্সত্যেন জগত্ সত্যং যত্প্রকাশেন ভাতি তত্
যদানন্দেন নন্দন্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব, যাঁর প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত, যাঁর আনন্দে সবাই আনন্দিত সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

গুরু পিতা গুরু চ মে মাতা গুরুর্বন্ধু গুরু চ পরমদেবতা
সংসার প্রতিবোধং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ গুরু মোর পিতা, গুরু মোর মাতা, গুরু বন্ধু, গুরু পরম দেবতা। যিনি সংসারে প্রতিবোধ জাগিয়ে দেন সেই বোধস্বরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যস্য স্থিত্যা সত্যমিদং যদ্ভাতি ভানুরূপতঃ
প্রিয়ং পুত্রাদি যতপ্রীত্যা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর স্থিতিতে জগতের স্থিতি, সূর্যরূপে যিনি সব কিছু প্রকাশ করেন, যাঁর প্রীতিকারণ সবার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রীতিময় হয়, সেই সর্বানন্দ শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেন চেতয়তে হীদং চিত্তং চেতয়তে ন যম্
জাগ্রত্স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে চৈতন্যস্বরূপের জ্যোতিতে জগৎ চেতনরূপে প্রতিভাত হয়, যাঁকে চিত্ত প্রকাশ করতে পারে না, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অবস্থা যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব অবভাসক শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যস্য জ্ঞানাদিদং বিশ্বং ন দৃশ্যং ভিন্ন ভেদতঃ
সদেকরূপরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁর জ্ঞানে এই বিশ্ব ভিন্ন অথবা ভেদরূপ দেখায় না, একমাত্র সৎ-রূপই যাঁর রূপ, সেই সদ্রূপী শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অনন্যভাব ভাবায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে বলে আমি জানি না সে জানে, আর যে বলে আমি জানি, সে জানে না। যিনি অভেদ ভাবে পূর্ণ, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যস্য কারণরূপস্য কার্যরূপেন ভাতি যত্
কার্যকারণরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে কারণরূপ গুরু হতে কার্যরূপ জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, সেই কার্য-কারণরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার।

নানারূপমিদং সর্বং ন কেনাপ্যস্তি ভিন্নতা
কার্যকারণতা চৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশ্বে কোথাও কেহ ভিন্ন নয়, কেবল কার্য-কারণ-ভাবই আছে। এইরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার।

গুকারং চ গুণাতীতং রূকারং রূপবর্জিতম্
গুণাতীতস্বরূপং চ যো দদ্যাত্ স গুরুঃ স্মৃতঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ 'গু' শব্দে গুণাতীত, 'রূ' শব্দে রূপাতীতকে বোঝায়। যিনি গুণ-রূপের অতীত, নির্গুণ-নিরাকারস্বরূপকে প্রকাশ করেন, তিনি সদ্গুরু স্বয়ং।

শ্রীগুরোঃ পরমং রূপং বিবেকচক্ষুষোঽমৃতম্
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্যোদয়ং যথা।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীগুরুর পরম রূপ বিবেকরূপী চক্ষুর কাছে অমৃত সদৃশ। মন্দভাগী লোক সেই রূপ দেখতে পায় না, অন্ধ যেমন সূর্যোদয় দেখতে পায় না।

বিশুদ্ধ চিদেকরূপং বুদ্ধ্যাদি সাক্ষিভূতম্
সদসদবিলক্ষণং অহংপদ প্রত্যয় লক্ষিতার্থম্।।
প্রত্যক সদানন্দঘন পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন
তস্মৈ নিত্যমেক দেবদেবায় নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ বুদ্ধি আদির সাক্ষী বিশুদ্ধ চিদ্ একরূপ সদসদ্ বিলক্ষণ, 'আমি-আমার' এই পদের নিগূঢ় তত্ত্বার্থ, প্রত্যক সদানন্দঘন পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ নিত্য অদ্বয় পরমদেবতাকে নমস্কার।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ অখণ্ডমণ্ডলাকার বিশ্ব যাঁর দ্বারা ব্যাপ্ত সেই পরমপদকে যিনি প্রত্যক্ষ বোধগম্য করে দেন সেই গুরুকে নমস্কার।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীগুরু ব্রহ্মা শ্রীগুরু বিষ্ণু শ্রীগুরু মহেশ্বর শ্রীগুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্
নাদবিন্দুকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে চৈতন্যস্বরূপ শাশ্বত শান্ত, আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, নিরঞ্জন, নাদাতীত, বিন্দুর অতীত এবং কলাতীত অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অতীত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ
তত্ত্ব জ্ঞানাত্পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীগুরুর অধিক কোনও তত্ত্ব নেই, শ্রীগুরুর সেবা অপেক্ষা কোনও বড় তপস্যা নেই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও জ্ঞান নেই, সেই তত্ত্বস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

গুরুরেব জগত্সর্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাত্সম্পূজয়েদ গুরুম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীগুরুই স্বয়ং সমগ্র জগৎ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ। গুরুর অধিক কিছু নেই, তাই শ্রীগুরুই হলেন পরম আরাধ্য, পরম পূজ্য।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরু
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার নাথ সারা জগতের নাথ, আমার গুরু তিন জগতের গুরু, আমার আত্মা সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্মা। এই অনুভূতি প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

উপরোক্ত মন্ত্রটির বিপরীতক্রমে সাজালে তার যে মমার্থ তা দ্বারা সাধক সম্প্রদায়গত মতভেদের দোষ হতে সদাই মুক্ত থাকতে পারবেন। মন্ত্রটি হল—

শ্রীজগন্নাথো মন্নাথঃ শ্রীজগদ্গুরু মদ্গুরুঃ
সর্বভূতাত্মা মমাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আমার নাথ, ত্রিজগতের শ্রীগুরুই আমার গুরু, সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্মাই আমার আত্মা। এই অনুভূতির স্বরূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ গুরু আদি, গুরু অনাদি, গুরুই পরমদেবতা। গুরুব অধিক বা গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

শ্রীমত্পরব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমত্পরব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমত্পরব্রহ্ম গুরুং নমামি
শ্রীমত্পরব্রহ্ম গুরুং ভজামি।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে আমি স্মরণ করছি, শ্রীমৎ পরব্রহ্ম গুরুর কথা আমি বলছি, শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে প্রণাম করছি, শ্রীমৎ পরব্রহ্মগুরুকে আমি ভজন করছি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধিসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণারহিতং সদ্গুরু তং নমামি।।

বঙ্গানুবাদ ঃ ব্রহ্মানন্দরূপ পরমসুখদাতা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, আকাশের মত সমান, "তত্ত্বমসি" বাক্যের লক্ষ্য; এক নিত্য বিমল নিশ্চল, সর্ব প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী; ভাবাতীত, তিন গুণ রহিত, এইরূপ সদ্গুরুকে নমস্কার করি।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ নিত্য, শুদ্ধ, আভাসরহিত, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিত্যবোধস্বরূপ, চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

নিত্যং ব্রহ্ম নিরাকারং নির্গুণং বোধয়েত্ পরম্
সর্বব্রহ্ম নিরাভাসং দীপ দীপান্তর যথা।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন করে একটি প্রদীপ অপর একটি প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করে সেই ভাবে যিনি শরণাগত শিষ্যকে নিত্য, নিরাকার নির্গুণ, নিরাভাস পরব্রহ্মের বোধে প্রবুদ্ধ করেন, তিনিই স্বয়ং সদ্গুরু।

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ ব্রহ্ম হতে স্তম্ব পর্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম পরমাত্মারই স্বরূপ। এইরূপ জগৎময় শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদাগুরুম্
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভেদরহিত নিত্য পূর্ণ নিরাকার নির্গুণ আত্মাতে অবস্থিত শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি।

পরাৎপরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভম্।।
স্ফটিক প্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা
তথাত্মনি চিদাকারমানন্দং সোঽহমিত্যুতঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ পরাৎপর (শ্রেয়তমোত্তম), ধ্যানের লক্ষ্য, নিত্য আনন্দকারক, হৃদয়াকাশের মধ্যস্থিত স্ফটিকের মতো নির্মল, যেমন দর্পণে শুদ্ধ স্ফটিকের প্রতিমা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মাতে চিদাকার আনন্দ রূপ সেই আমি-ভাব প্রকট হয়।

অগোচরং তথাঽগম্যং নামরূপং বিবর্জিতম্
নিঃশব্দং তদ্বিজানিয়াত্ স্বভাবং ব্রহ্ম পরাৎপরম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ অগোচর, অগম্য, নামরূপরহিত, নিঃশব্দ যে স্বভাব তা-ই ব্রহ্ম—এইরূপ জানতে হবে।

একোদেব একোধর্ম একোনিষ্ঠা পরম তপঃ
গুরোঃ পরতরং নান্যন্নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ গুরুই এক দেবতা, গুরুই এক ধর্ম, এক নিষ্ঠা, এক শ্রেষ্ঠ তপ, গুরুর অধিক কিছু নেই, গুরুর অধিক কোনও তত্ত্বও নেই।

একোহিদেবঃ সর্বভূতেযু গূঢ় সর্বভূতরন্তরাত্মা
কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ কেবল সাক্ষিচেতা নির্গুণশ্চ।।
বাচো সাক্ষী বাচোবৃত্তেশ্চ সাক্ষী প্রাণো সাক্ষী প্রাণোবৃত্তেশ্চ সাক্ষী
বুদ্ধেসাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী চক্ষুশ্রোত্রাদি সর্বেন্দ্রিয়ানাঞ্চ সাক্ষী।।
সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা তস্মৈ পরাত্ম গুরবে নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বভূতের হৃদয়ে এক দেবতা, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, অন্তরে-বাইরে সর্বকর্মের অধ্যক্ষ সাক্ষী চৈতন্য নির্গুণ। বাক্যের সাক্ষী, বাক্যবৃত্তির সাক্ষী, প্রাণের সাক্ষী, প্রাণবৃত্তির সাক্ষী, বুদ্ধির সাক্ষী, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, চক্ষু ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাক্ষী, সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা পরব্রহ্ম গুরুকে আমার স্বাষ্টাঙ্গ নমস্কার।

উপরোক্ত গুরুমন্ত্রগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল সবার বুঝবার সুবিধার জন্য। মন্ত্রগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কেবল জ্ঞানমূর্তি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং। সর্ব অনুভূতির অধিষ্ঠান এবং সর্বভাবের সমাধান। পরমতত্ত্বস্বরূপের নামান্তর হল ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব এবং মাতৃতত্ত্ব। সমস্ত তত্ত্বানুভূতির কেন্দ্র হল হৃদয়। হৃদয়বোধে সর্ববোধ মিশে আপনবোধরূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের পূর্ণ রহস্য আপন আত্মবোধে সিদ্ধ হয়।

প্রথম অধ্যায়

গুরু হলেন জ্ঞানস্বরূপ

ভগবান প্রথমে প্রকাশিত হন গুরুরূপে। গুরুরূপে এসে তিনি বস্তু, গুণ, বিদ্যা ও শক্তির পরিচয় ও ব্যবহার বলে দেন। একটি নাম দিয়ে সচেতন করে তিনি সব কিছুর যথার্থ ব্যবহারটি ধরিয়ে দেন। যদি সব কিছুর পরিচয় না-দিয়ে শুধু নামটি মাত্র দিয়ে দিতেন তাহলে সাধনার রাজ্যে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হত। এ দিকে নাম ছাড়াও যায় না, আবার ব্যবহার না-জানার জন্য সেই বস্তুর যথার্থ পরিচয় এবং ফলাফলও পাওয়া যায় না।

গুরুর আসন এবং তাঁর পাশে উপবেশন

পরিচয় অর্থ হল পরবর্তী গতি কী হবে তা পূর্বে বলে দেওয়া। তাকেই বলে পরিচয়। ভক্তির পথে জীবনে উৎকর্ষ লাভের বিধান যিনি ধরিয়ে দেন তিনিই গুরু। গুরুর বা ইষ্টর আসন হল সমতা। জীবন শান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে শান্তিতে শেষ হয়। জীবনের গতিকে শান্ত না-করলে তাঁর আসনের পাশে বসা যায় না।

ভগবান বা গুরু হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং বুদ্ধির সাক্ষী, নিত্যপূর্ণ অখণ্ড ভূমা অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। ভূমা অখণ্ড বলে আনন্দ ও প্রেমময়। জ্ঞানস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর কোনও বিকল্প নেই, বিকারও নেই। সেই জন্য তা নির্বিকার নির্বিকল্প নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন। এই জ্ঞানস্বরূপের নামান্তরই হল সচ্চিদানন্দ (সত্য, জ্ঞান, আনন্দ)—অস্তি, ভাতি, প্রিয়ম। সগুণ-নির্গুণ উভয়ই তাঁর স্বভাব। অতএব তাঁর চিন্তা করা, তাঁর হয়ে কাজ করাই হল জ্ঞানের সেবা করা। ভক্তসেবক সেব্যকে গুরু-ইষ্টবোধে সেবা করে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে। সেবার ফলে গুরু-ইষ্ট প্রীত হলে সেবক তার ফল পায়। গুরুর বা ইষ্টর সঙ্গে প্রত্যেকের নিত্যসম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মোহ-আসক্তির দ্বারা তা আবৃত হয়ে যায়। সেবার দ্বারা সেই আবরণ সরে যায়। [৫।৬।৭৩]

সদ্‌গুরুর বিশেষত্ব

কিছুদিন আগে সরোজ করের বাড়িতে নানা রকম প্রসঙ্গ আলোচনাকালে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে গুরুদেবের বিশেষত্ব কী?

তার উত্তরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— কোন স্তরের গুরুর কথা বলছেন?

ভক্তটি অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

তখন বুঝিয়ে দেওয়া হল—এরও ভাগ আছে। রূপের গুরু, নামের গুরু, ভাবের গুরু ও বোধের গুরু।

রূপের বোধ দেন যে গুরু তিনি হলেন রূপের গুরু, নাম বা সংজ্ঞার বোধ দেন যে গুরু তিনি হলেন নামের গুরু, ভাবের মাধ্যমে যে গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁকে ভাবময় বা বিজ্ঞানময় গুরু বলা হয়। বোধের মাধ্যমে যে গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় তিনি হলেন প্রজ্ঞানঘন অখণ্ড ভূমাস্বরূপ। তিনি হলেন সর্বগুরুর গুরু। সকলের মধ্যে বোধস্বরূপে অর্থাৎ আত্মারূপে তিনিই আছেন অভেদে এবং অখণ্ড ভাবে।

সেই প্রকার সিদ্ধপুরুষ ও মহাপুরুষদের মধ্যেও সূক্ষ্ম স্তরভেদ আছে। শ্রবণ অনুরূপ বেশ কিছুদিন অনুশীলন করা হলে তাব ফল প্রকাশ পায়। সব সময়ে তিনি প্রকাশমান। নিবিষ্ট চিত্তে খেয়াল করলেই সকলে তা অনুভব করতে পারে।

আবার প্রশ্ন হল—আপনার গুরু কে? শাস্ত্র বলে যে গুরু বিনা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ হওয়া যায় না।

উত্তর হল—'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তো নয়। গুরু বলতে বিশেষ একটা জীবন ছাড়া আপনারা বৃহত্তর আর কিছু বুঝি ধরতে পারেন না? গুরু কী শুধু একজন ব্যক্তি? ব্যক্তিগুরুর কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) গুরু হলেন প্রথম, মা-বাবা। দ্বিতীয়, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজন। এ ছাড়া আশে-পাশে যত প্রকাশ আছে—পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, আকাশবাতাস, ধূলিকণা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব 'এর' গুরু। কারণ প্রত্যেকের কাছ থেকেই সবিশেষ বোধ পাওয়া গেছে। সর্বোপরি পরমাত্মা স্বয়ং 'এর' গুরু। তাঁরই সত্তা-শক্তি এই দেহরূপ ধারণ করে আপনাতে আপনি লীলায় রত।

বেদনা থেকে বেদ; বেদনার বা দুঃখের গুরুত্ব

দুঃখভাব হল বিশেষ একটা মনোবৃত্তি অর্থাৎ বোধের বৃত্তি। অভাব-অনটন, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি সবই বোধস্বরূপের বক্ষে বোধের বৃত্তি মাত্র। এগুলি বোধস্বরূপ আত্মার স্বপ্নবিলাস। বেদনা দিয়ে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) জীবন আরম্ভ হয়েছে। তারপর জেগেছে বেদন এবং তারপর অর্থাৎ সর্বশেষে স্বপ্রকাশ বেদস্বরূপ।

'এর' গুরু হল সমগ্র দুঃখের ঘনীভূত মূর্তি। 'এ' দুঃখের মধ্যে জাত, দুঃখের মধ্যে লালিতপালিত। দুঃখের বাইরে 'এ' যেতে চায় না।

চিদানন্দময়ী মা হলেন দুঃখের সর্বংসহা মূর্তি। কোনও দেবদেবী মায়ের বাইরে নেই। সেই জন্য সর্বেশ্বরবাদের (All Divine) কথা বলা হয়। All Divine-এর মধ্যে undivine কিছু নেই। [১০।৬।৭৩]

চিদানন্দময়ী মায়ের মহিমা হল তাঁর মাধুর্য রূপ

বাস্তবতার দিক থেকে বলা হয়—বাস্তব কী নিষ্ঠুর! বাস্তব জগৎ বড় কষ্টকর ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুকৃপা ও গুরুশক্তির সাহায্য ব্যতীত কষ্ট লাঘবের কোনও উপায় নেই। নিষ্ঠুরের মধ্যে মধুরতা কী ভাবে লুকিয়ে আছে কেবলমাত্র আত্মজ্ঞগুরুই তা ধরিয়ে দিতে পারেন। দুঃখময় ভীষণ নিষ্ঠুরতার যত রূপ আছে তার মধ্যেও মায়ের মাধুর্য রূপ দেখা যায়। তা কৃপা করে মা তাঁর প্রিয় ভক্তসন্তানকে দেখিয়ে দেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতরূপে, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানরূপে, দুঃখকষ্টের মধ্যে সচ্চিদানন্দময়ী মা কী ভাবে বিদ্যমান তা তিনি প্রকাশ করে দিলেই তাঁর মাধুর্যের মহিমা উপলব্ধি হয়।

সাধনা প্রত্যেকের মধ্যে হয়ে চলেছে। সাধনাশূন্য কেউ হতে পারে না। কারণ সব কিছুর মধ্যে মা বা গুরু-আত্মা বসে আছেন। [১৭।৬।৭৩]

শ্রবণের তাৎপর্য

'দীক্ষা কে কাকে দেয়? গুরু যদি সমবোধে এসে যান, তবে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন না। তিনি তখন সবার মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন। অখণ্ড ঈশ্বরীয় বোধে অনীশ্বরীয় বোধের অভাব থাকে। সেই জন্য কে কাকে দীক্ষা দেবে?

ঈশ্বরের বা গুরুর কৃপায় একমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই হয় বোধের সাধনা। সৎ শ্রবণ ব্যতীত শুদ্ধবোধের স্মৃতি তৈরি হয় না। শুদ্ধবোধের শ্রবণ মনের ভিতরে প্রবেশ করে বিবেকরূপে জেগে ওঠে।

শ্রবণের তাৎপর্য হল প্রতি শব্দের অর্থবোধ। শ্রব+ণ=শ্রবণ[১]। 'ণ' মানে অখণ্ড বোধসত্তা, যাকে সৎ চিৎ ও আনন্দ রূপে অভিহিত করা হয়। মূর্দ্ধণ—মূর্দ্ধা হল পরমাত্মগুরুর স্থান। অখণ্ড বোধসত্তার প্রকাশ নিরন্তর জীবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রতি জীবন তাঁর মধ্যে বুদ্‌বুদের মতো বাস করে। অখণ্ড বোধসত্তাই নিত্যগুরুরূপে বিদ্যমান। [১৯।৬।৭৩]

সদ্‌গুরুর কাজ

গুরুর কাজ হল অখণ্ডের স্মৃতি বা ধ্রুবাস্মৃতি বা আত্মস্মৃতিকে জাগ্রত করে দেওয়া। প্রত্যেকের বোধসত্তাকে স্ববোধ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হল সদ্‌গুরুর কাজ। একসময় অনেকে 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি এত তত্ত্বের কথা বলেন কিন্তু দীক্ষা দেন না কেন?

তার উত্তরে বলা হয়েছিল—কাকে দীক্ষা দেব? 'এর' কাছে বলেও যে, শোনেও সে। সব এক ভগবান। ভগবান ভগবানকে দীক্ষা দিতে পারেন না। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মধ্যে চলছে বোধের সঙ্গে বোধের খেলা। খেলা কোনও সময় ভাল জমে, কোনও সময় জমে না। তারপর খেলাতে হার-জিৎ আছে। তা বোধের নিজস্ব জিনিস। ব্যক্তিগত কারওর জিনিস নয়। সবারই আপন জিনিস। কিন্তু মন জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি দ্বারা বিব্রত হয়। বোধের কাছে জয়-পরাজয় লক্ষ্য নয়। সেই জন্য বোধস্বরূপ নিত্যনির্বিকার। খেলাতেই তাঁর আনন্দ। আনন্দ তাঁর স্বভাব। সেই জন্য সে 'নির্গুণগুণময়, নিত্যলীলাময়'।

এ সব শুনে অনেকে আবার বলেন—তাহলে যাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা কী ভুল করছেন?

তাদের বলা হয়—তাঁদের সম্বন্ধে কোনও কথা আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। তাঁরাও সত্যের বক্ষে সত্যের খেলা খেলছেন আরেক ভঙ্গিমায়। 'Everything is Divine', 'এর মুখ' (নিজেকে দেখিয়ে) থেকে যখন বেরিয়েছে, তখন undivine আর কী করে বলা যায়।

দীক্ষার প্রকারভেদ

ভগবান নিজেকে যখন নিজে ব্যক্ত করেন, প্রকাশ করেন তা-ই হল দীক্ষা। অর্থাৎ অন্তরে যখন অখণ্ড বোধের স্মৃতি জাগ্রত হয়, সমস্ত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের বৃত্তি কেন্দ্রাভিমুখী গতি নেয় বা বোধস্বরূপের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, বোধের কথা কয়, বোধের গান গায়, তাঁর মহিমাতে ডুবে থাকে তা-ই হল দীক্ষা। এক কথায়, আপনাকে খণ্ড সসীম সীমার মধ্যে না-রেখে অখণ্ড অসীমে ছড়িয়ে বা বিলিয়ে দেওয়া হল দীক্ষা। অখণ্ড একবোধে সব কিছু 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল দীক্ষার আসল অর্থ। অর্থাৎ আপনবোধে সব কিছুকে গ্রহণ করাই হল দীক্ষা। মন দিয়ে বোধের সেবা করার নাম দীক্ষা। তুমিবোধে আমির ব্যবহার করার নাম দীক্ষা। অথবা অখণ্ড আমিবোধে আমির ব্যবহার করার নাম দীক্ষা। অথবা আমির মধ্যে তুমি বা তোমার মধ্যে আমিকে মানা ও জানা হল পূর্ণ দীক্ষা[২]।

শিক্ষা ও দীক্ষার পার্থক্য

নিজের জন্য ভেদজ্ঞানে সব কিছু গ্রহণ করার নাম শিক্ষা। অর্থাৎ দ্বৈতবোধের প্রস্তুতি হল শিক্ষা। কিন্তু নিত্য অদ্বৈতের ব্যবহার হল দীক্ষা। শিক্ষা হল ডান পকেট থেকে নিয়ে বাঁ পকেটে রাখার মতো। আর দীক্ষার

১। শ্রবণ=শ্রব+ণ। 'শ্রব' মানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বা ধারা এবং 'ণ' মানে অখণ্ড বোধসত্তা।

২। দীক্ষা—দীক্ষা প্রসঙ্গের তাৎপর্যই হল ভগবৎসত্তায় প্রকাশের পূর্বাপর ধারা অনুযায়ী মানের তারতম্য প্রতীয়মান হয়। সেখানে দাতাও বোধ এবং গ্রহীতাও বোধ। দাতাবোধে দীক্ষা এবং গ্রহীতাবোধ হল শিক্ষা। আবার শিক্ষা পূর্ণ হলে হয় দীক্ষা। দীক্ষা প্রসঙ্গে স্বানুভবসিদ্ধ অভিনব বিজ্ঞানদৃষ্টি বিশ্লেষণ।

রূপ হল পকেট থেকে নিয়ে চানাচুর খাওয়ার মতো। এখানে বোধ বোধকে দান করে। বোধই বোধের থেকে বোধ নেয়। বোধের কাছে বোধের শিক্ষা ও দীক্ষা একার্থবোধক। কিন্তু মনের কাছে শিক্ষা ও দীক্ষা ভিন্ন অর্থে গ্রাহ্য। প্রথমোক্ত দীক্ষার স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

বৃহত্তর বোধ বা বৃত্তি যিনি দেন তাঁর নাম গুরু। গুরুর কাজ হল শুদ্ধবোধ দেওয়া। বৃহৎ-ই ক্ষুদ্রকে দেয়। যিনি অখণ্ডের স্মৃতি বা ধ্রুবাস্মৃতি বা আত্মস্মৃতিকে জাগ্রত করে দেন তিনিই সদ্‌গুরু। [১।৭।৭৩]

বাইরের গুরুর কাজ হল অন্তরের গুরুকে ধরিয়ে দেওয়া

লোকে বাইরের গুরু অর্থাৎ ব্যক্তিরূপ গুরুর কথাই বলে; কিন্তু তিনি যত বড়ই হোন না কেন, সকলের অন্তরে যিনি বসে আছেন তিনিই সবচেয়ে বড় সত্য। বাইরের গুরুর কোনও মূল্য নেই, যদি না তিনি অন্তরের গুরুকে ধরিয়ে দেন। অন্তরের গুরুকে যিনি ধরিয়ে দেন তিনিই প্রকৃত গুরুর কাজ করেন।

সত্তার দিক থেকে গুরু ও শিষ্য, সব সমান। যাঁরা বস্তুজগতে সমস্যার বা প্রকাশের অন্তর্গত বিষয়ের সন্ধান দেন তাঁরাও এক পর্যায়ের গুরু। প্রকৃত গুরুর কাজ হল সত্তার বা প্রকাশকের সন্ধান দেওয়া। তা না হলে আত্মগুরু হওয়া যায় না। সেই জন্য সদ্‌গুরুরা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রত্যেককে তার আসল ঘরে ফিরতে হবে। বাইরের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের মূলে আছে সেই পূর্ণস্বরূপ আত্মা। বাইরেব এই প্রকাশবৈচিত্র্য তাঁর অখণ্ড পূর্ণতার মহিমাকে ঘোষণা করে। কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে এগুলির কোনও মূল্য পাওয়া যায় না। কেন্দ্রসত্তাকে অবলম্বন করলে এগুলির প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

দেহেন্দ্রিয় মনের সংযমের অভাবে সৎসঙ্গের শ্রুত বস্তু অনেকের বদ্‌হজম হয়ে যায়। সেজন্য তা কার্যকরী হতে সময় লাগে। শ্রুত বস্তু অন্তরে স্থান পেলেও তা কার্যকরী হতে সময় লাগে এবং তা-ই প্রজ্ঞা ও বিবেক রূপে ফুটে ওঠে। এই হল অন্তর্গুরুর বিশেষ এক রূপ।

তিনি নেমে আসেন নামে। নাদের প্রকাশ বাক্‌। বাক্‌ খুবই সূক্ষ্ম বস্তু। বাকের মধ্য দিয়ে অন্তরে তিনি প্রবেশ করেন। একবার অন্তর থেকে বাইরে আবার বাইরে থেকে অন্তরে যায়। এই ভাবে অন্তর-বাহিরের যোগাযোগের রাস্তা পরিষ্কার হয়। গুরু বাকের মধ্য দিয়ে আসেন। বাকের আশ্রয় হল অব্যক্ত আকাশ। সুতরাং বাক্‌ হল অনন্ত সর্বব্যাপক।

মন্ত্রের একটা সূত্রও যদি মনে খেলে তার দ্বারাই অন্তরের শোধনক্রিয়া হয়। বাইরের রাস্তা পরিষ্কার হলে অনেক সময় প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ না-হলেও অপরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ হয় স্বপ্ন বা ধ্যানের মাধ্যমে। বাক্‌সংযম একান্ত প্রয়োজন। বাজে কথায় সত্যবাক্‌ মলিন বা আবৃত হয়। তার ফলে অন্তরের রাস্তা বন্ধ হয়। জিভে নাম রাখলে আপনিই বাক্‌সংযম হয়। জিভে এবং মনে নাম রাখতে হয়। প্রথম অবস্থায় মনে সর্বক্ষণ নাম রাখা যায় না। জিভের থেকে নাম মনে যায়, মন থেকে বোধে যায়। তখন মনও বোধে লয় হয়। প্রথম অবস্থায় জিহ্বায় নাম করার সময় জিহ্বা যেন তালুতে লাগে। তার ফলে একটা তাপ বা বিদ্যুৎ[১] সৃষ্টি হয়। তার প্রভাবে জড়তা কাটে। [৩।৭।৭৩]

১। বিদ্যুৎ—বিদ্যুতের ক্রিয়া। তার ফলে প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে মনের ক্রিয়াব যোগাযোগ হয়। মনের চিদাভাস জ্যোতির এক ঝলক প্রাণক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে যায়। বিদ্যুৎ শক্তির মধ্যে negative and positive power (ঋণাত্মক ও ধনাত্মক) উভয়ের সংযোগে হয় বিদ্যুতের প্রকাশ। মেঘলা আকাশে এই বিদ্যুতের ঝলক হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশ হয় যেমন।

'মেনে, মানিয়ে চলা'-র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সদ্‌গুরুগণ 'মানা'র উপরে বেশি গুরুত্ব দেন। সদ্‌গুরুদের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হয়। ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হলেও সদ্‌গুরুর কথা কোনও ব্যক্তির কথা নয়। ব্যক্তির কথায় এত শক্তি থাকতে পারে না। সৎ হল স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশকে প্রকাশিত হওয়ার জন্য তাঁরা আহ্বান করেন এবং প্রার্থনা জানান—'তোমার কথা তুমি বল। তোমাকে তুমি-ই জানতে পার। তুমি বেদময়পুরুষ, স্বয়ংবিধাতা।' এই ভাবে ত্বং-এর ধ্বনি বেজে ওঠে। ত্বং-এর মধ্যে অহং থাকে মহাশান্তিতে।

যাঁর বক্ষে সবই লীন হয় তিনি নিজে অদ্বয়-অব্যয়-অমৃতময়। তিনি যতখানি সত্য, দ্বন্দ্ববিরোধও ততখানি সত্য। অতএব জগৎকে যে পূর্ণ সত্য বলে মানে, সে ঈশ্বরকে স্ববোধে মানে, পৃথকবোধে সে মানে না। সেই জন্য সদ্‌গুরুরা সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয় অর্থাৎ জগতের সব কিছুকেই আপনবোধে মেনে মানিয়ে চলেন।

জগৎকে মানতে পারলে সমগ্র দুঃখের তত্ত্বকে জানা যায়। তাই এক সময় 'এর মধ্যে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) এই সাধনাই এসেছিল যে, 'এ' ঈশ্বরকে সমস্ত জগৎ থেকে বা দুঃখ থেকে পৃথক করে জানবে না। সমগ্র দুঃখই 'এর' গুরুমূর্তি। কেউ যদি 'আমিতত্ত্ব' বা 'তুমিতত্ত্ব'-র মধ্যে না-গিয়ে সমগ্র দুঃখকে ষোলো আনা মানতে পারে তবে সে অতি সহজেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী মা বা গুরু বা ঈশ্বর ছাড়া দুঃখকে কেউ আপনবোধে গ্রহণ করতে পারে না। চিদানন্দময়ী মা-ই জানেন দুঃখবেদনা। [৬।১০।৭৩]

গুরুর পরিচয়

নিজবোধরূপে যিনি প্রত্যেকের মধ্যে আছেন তিনিই মা বা গুরু। যারা গুরুভজন করে তাদের গুরুগীতা স্বাধ্যায় করা উচিত। গুরু বলতে কাকে বোঝায় অর্থাৎ গুরুর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অনেকেরই যথার্থ ধারণা নেই। 'গুরু' শব্দই হল একটি মন্ত্র, যেমন হরি, কালী, দুর্গা প্রভৃতি। গুরুকে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে বা মহাত্মা মহাপুরুষদের মধ্যে অথবা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে উপাসনা করা যায়। কারণ নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুই সর্বপ্রকাশের মধ্যে, কার্য-কারণের মধ্যে এবং সর্ব ফলাফলের গতির্ভর্তা, প্রভু, নিয়ন্তা এবং সাক্ষিপুরুষ।

ভগবানলাভের জন্য বেশি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। শুধু তাঁর নামটির প্রয়োজন হয়। শিশু বাবা, মা এই নাম দিয়েই বাবা-মাকে চেনে। বাবা-মা-র কত ঐশ্বর্য আছে তা হয়ত সে জানে না। যে শিষ্য গুরুকে এই ভাবে নিতে পারে সে গুরুর সঙ্গে সহজে মিশতে পারে।

গুরুকে দূরে সরিয়ে রেখে সহজ হওয়া যায় না। প্রকৃত শিষ্য গুরুকে নিবিড় করে পেতে চায়। গুরু হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ভগবতী মা বা সদ্‌গুরু তাঁর কোনও প্রকাশকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না কখনও। গুরুর বা মায়ের মধ্যে ভেদদৃষ্টি থাকতে পারে না। গুরু হলেন ভেদাতীত। গুরুতত্ত্ব হল—

'ওঁ গুরুতত্ত্ব নিত্য অদ্বৈত শাশ্বত অচ্যুত
জয় গুরু জয়
ওঁ গুরু দ্বন্দ্বাতীত ওঁ গুরু ভাবাতীত ওঁ গুরু ভেদাতীত
জয় গুরু জয়।'

এই হল গুরুতত্ত্ব, লোকে যাঁকে গুরু বলে অথবা গুরু বলতে যা বোঝায় সব তত্ত্বই এর মধ্যে আছে।
[২৩।১০।৭৩]

গুরু এক এবং সর্বব্যাপী

প্রত্যেকেরই আপন আপন গুরুপ্রদত্ত বীজ ও নামের উপরে আস্থা রাখা উচিত। এক পরমাত্মগুরুর কাছ থেকেই সকলে নাম পায়। তবে স্থূলরূপে ভিন্ন ভিন্ন গুরুর প্রয়োজন হয়। গঙ্গার পাড়ে কত ঘাট! সবগুলি ভিন্ন

ভিন্ন মনে হলেও সব এক গঙ্গারই ঘাট। সেইরূপ গুরু সর্বব্যাপী। পৃথিবীর সর্বস্থানে সর্ববস্তুই শ্রীগুরুপদ ভাবনা করে সব জিনিস ব্যবহার করলে গুরুবোধের সঙ্গে সহজেই অভেদে মিলন হয়।

প্রত্যেকের অন্তরে বসে তিনি সবাইকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিরন্তর আহ্বান করেন। অন্তরাত্মার ডাক শোনার জন্য যারা প্রস্তুত হয়, তারা তাঁর সঙ্গে পূর্ণ বোধে অভেদে মিশে যায়। সমুদ্র নদীকে নিরন্তর আহ্বান করে বলেই নদী সাগরের পানে ছুটে যায। সাগরের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা নদীর নেই। তাঁর আহ্বান শুনতে হলে মনকে বিষয়শূন্য করতে হয়। মনকে বিষয়শূন্য করার উপায় হল মনে গুরুপ্রদত্ত নাম যুক্ত রাখা। তার ফলে মন কামশূন্য হয়। কামের প্রকৃত অর্থ হল বৈচিত্র্য অথবা বিশ্বজগৎ। সুতরাং কামনাশূন্য মনের অর্থ হল জগৎশূন্য মন।

সদ্‌গুরু মাত্রেই সকলের মুক্তির অপেক্ষায় থাকেন। দেহরোগের চিকিৎসক যেমন ডাক্তার, ভবরোগের চিকিৎসকও সে রকম সদ্‌গুরু। অমৃতত্ব জেনে তাঁরা অভী হয়ে যান। তাঁরা জানেন জীব অমৃতের সন্তান। অমৃতলোকে মৃত্যু বা ভয় অমূলক ও ভ্রান্ত। নিত্য অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মা সদ্‌গুরুরূপে পরিচিত। কারও উপরে প্রভাব বিস্তার করা বা অতীতের সব কিছুকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা তাঁদের আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। সমুদ্র যেমন নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনায় অপেক্ষা করে থাকে এবং নদী এসে তার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইরূপ সদ্‌গুরুর মধ্যে শিষ্য এসে মিশে যায়। সদ্‌গুরুর স্বরূপ সমবোধে প্রতিষ্ঠিত। নিত্য অদ্বয়বোধে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই সদ্‌গুরু।

এক জন্মের সাধনায় কেউ মুক্ত হয় না। তবে সাধনভজন দ্বারা যতটা কাজ এগিয়ে রাখা যায় তাতেই লাভ। পরবর্তী জন্মে সেই কাজ শীঘ্র এবং সহজে পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত হয়। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জীবনের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার না-হলে গুরু বা চিতিমাতা অপেক্ষা করে থাকেন এবং পুনরায় সুযোগ দেন। গুরুর বা ভগবতী মায়ের কাজ হল লঘুকে বা সসীমকে গুরুতে বা ভূমাতে পরিণত করা। পরমাত্মাই স্বয়ং শিব, হরি, গুরু ও মা রূপে দিবানিশি সসীমকে অসীমে পরিণত করার সাধনায় রত আছেন।

সন্তানের পীড়াকালে পিতামাতা যেমন দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, শিব, হরি, গুরু বা মা-ও সেইরূপ তাঁর ভক্তশিষ্য বা সন্তানের মঙ্গলার্থে নিরন্তর অলক্ষ্যে থেকে তাদের কৃপা করেন। তাঁরা প্রত্যেকের অন্তরে বসে কী ভাবে কাজ করেন তা শুদ্ধবোধের স্তরে গেলে ধরা পড়ে। তাঁদের কাজ ধরবার জন্য চাই নিঃসংশয় চিত্ত। যার চিত্ত সংশয়শূন্য হয়েছে, সে অন্তরে বোধগুরুর সন্ধান পায়।

মা বা গুরু যে শিষ্যকে বা সন্তানকে শাসন করেন তার অর্থ আছে। সন্তানের বা শিষ্যের অজ্ঞাতসারে যে কুবৃত্তি বা অশুভ বৃত্তি তার মধ্যে প্রবেশ করে তা নাশ করাই হল তাঁদের উদ্দেশ্য। কল্যাণ চিন্তাভাবনার দ্বারা যে শাসন তা-ই হল মায়ের শাসন বা গুরুর শাসন। হিংসার বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে শাসন তার মধ্যে শয়তানের ভাব বেশি থাকে, তা হল মায়ার শাসন।

সাধনভজনের বিশেষ কোনও প্রক্রিয়া ও নির্দেশ এখানে তোমাদের না-দেওয়া হলেও আপন আপন গুরুনির্দিষ্ট সাধনপদ্ধতির সঙ্গে এখানকার সৎপ্রসঙ্গের বিষয়বস্তু যুক্ত করার নির্দেশ সবাইকে দেওয়া আছে। এই হল চিদাত্মাগুরুর বা মাতার সহজ সরল নির্দেশ সকলের প্রতি। এই নির্দেশ যথার্থ ভাবে অনুসরণ করলে তাঁর সর্বোত্তম কৃপা লাভের অধিকারী সকলেই হবে। অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা ও আস্পৃহা না-জাগলে সাধনপদ্ধতির কোনও নির্দেশ পেলেও জীবনের কোনও কাজেই লাগে না।

গুরুকৃপার অর্থ—শুদ্ধবোধের ধারা অনুসরণ করে বিকারমুক্ত হওয়া। কেন্দ্রসত্তার নিরন্তর বোধধারাকে শুদ্ধ মন যখন ধারণ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তখন অন্তর-বাহির সর্বস্তরে তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই

অবস্থায় ব্রহ্মচর্য রক্ষিত হয়। সে তখন অন্তরে-বাইরে একবোধেরই প্রকাশ দেখতে পায়। মৃত্যু এলেও তাকে গুরু বা ইষ্ট রূপে তখন সে বরণ করতে পারে। [৪।১১।৭৩]

শুদ্ধবোধে গড়া, শুদ্ধবোধে ভরা তত্ত্বের পরিচয়

একমাত্র গুরু ও ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ তাঁকে সমর্পণ করে তদ্‌বোধে ব্যবহার করলে আত্মশক্তি প্রীত হয়ে স্বয়ংপ্রকাশ হয়।

পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করলে তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তত্ত্ব হল অখণ্ড বোধরূপের বা চিৎস্বরূপের পরিচয় যা থেকে রূপ, নাম, ভাব, বোধের অনুভূতি এবং কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। বোধের দ্বারা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্বের অভাবে শুধু তথ্যপথ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হজমশক্তির অভাবে যেমন ভাল ভাল খাবার খেলেও পুষ্টি লাভ হয় না, সে রকম তত্ত্ববোধের অভাবে ভাল ভাল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েও অন্তরের পুষ্টি, তুষ্টি, স্থিতি অথবা মুক্তিশান্তি মেলে না। তত্ত্ববোধ কেবল গুরু ও ইষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমেই মেলে। শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে গুরুর বা ইষ্টের অনুগ্রহ বা কৃপা লাভ হয়। [১৩।১১।৭৩]

একতত্ত্বের প্রকাশক হলেন গুরু

গুরুগীতার প্রতি বর্ণ মন্ত্র। প্রতি বর্ণের মাধ্যমে চিৎস্বরূপ আত্মা বা গুরু নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। এই ভাবে গুরুর স্বরূপ গুরু নিজেই ব্যক্ত করেন। 'গুরু' শব্দেব অর্থ 'গু'-যুক্ত 'রু'। 'গু' মানে আঁধার, অজ্ঞান, মায়া। 'রু' মানে আলো, জ্ঞান, আত্মচৈতন্য বা চিৎস্বরূপ। 'গু' শব্দে অপূর্ণ দেহকে বা আধারকে বোঝায়। দেহকে প্রকাশ করে 'রু' অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আলো। আবার 'গু' মানে নানাত্ব-বহুত্ব এবং 'রু' মানে একত্ব। অর্থাৎ 'গুরু' হলেন একতত্ত্বের প্রকাশক। একতত্ত্বের মধ্যে তাঁর বাস। নানাত্ব-বহুত্বকে রুদ্ধ করে একতত্ত্বকে প্রকাশ করেন গুরু।

একতত্ত্ব হল জনক-জননী। সে-ই নানাত্ব-বহুত্বরূপ সন্তানকে পালন করে। আবার গুরু হলেন গুণাতীত রূপাতীত ও সম্বিৎস্বরূপ আত্মা। [১৮।১১।৭৩]

পুরুষকারের তাৎপর্য

যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি খুব দ্রুত ভাবে কাজ করে তাকে পুরুষকার বলে। লোকে সাধারণত নিজের চেষ্টা করাকেই পুরুষকার বলে জানে। কিন্তু কেউ নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারে না। সবই গুরুর বা ঈশ্বরের শক্তি। নিজের চেষ্টা করার শক্তি কোথা থেকে আসে এ সম্বন্ধে কেউ ভাবে না। এ যে গুরুশক্তি তা প্রথমে বোঝা যায় না। যে শক্তি কর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখে তার নাম গুরুশক্তি। তাঁর বলে মানার ফলে কর্মের শোধন হয়। কর্ম শোধন হলে, কর্মফলও শোধন হয়। কর্মফলের শোধন হলে কোনও বিকার থাকে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঈশ্বরীয় কৃপা কী ভাবে আসে? তার উত্তরে এ-ই বলা চলে যে, গুরুনির্দিষ্ট বিধান অনুসরণ করে অথবা কর্মবিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহারের ফলে ঈশ্বরের কৃপা আসে। কর্মের বিজ্ঞান জানা না-থাকলে এবং কর্মের যথার্থ ব্যবহার না-হলে ভগবৎকৃপা সকলে পায় না।

ব্যক্তিরূপে মূর্ত হলেও সদ্‌গুরু হলেন নৈর্ব্যক্তিক

দ্বৈতবোধের অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের সর্ববিধ সাধনা আত্মলীলার প্রস্তুতি অথবা নিত্যপূর্ণ স্ববোধ আত্মার লীলা-চাতুরী। রূপ-নাম-ভাব-বোধের মাধ্যমে আত্মা স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেন। এগুলি তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমার

অবলম্বন। আত্মগুরু মূর্ত হয়েও অমূর্ত, ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত এবং ব্যক্তি হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। গুরুকে বাইরে সাধারণ ব্যক্তির মতো দেখালেও তিনি সচ্চিদানন্দঘন। গুরু হলেন অখণ্ড, অব্যক্ত এবং সমগ্র সত্যের কেন্দ্রীভূত জ্ঞানস্বরূপ।

চলার সময় মানুষ মনে করে তার দেহটাই চলে। দেহেন্দ্রিয়-মনের পরিচালক বুদ্ধিকে দেহেন্দ্রিয়-মন জানে না। বুদ্ধির পরিচালক অন্তরাত্মাকে বুদ্ধি জানে না। অন্তরাত্মার পশ্চাতে আছেন সাক্ষিদ্রষ্টা পরমাত্মা। তাঁকে দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অবগত হতে পারে না। সেই জন্য গুরুর স্থূল রূপ থাকলেও গুরুকে স্থূলরূপে গ্রহণ না-করে বোধরূপে গ্রহণ করতে হয়। নতুবা প্রাকৃত বোধে দোষদৃষ্টি আসে। পৃথক পৃথক গুরুর মধ্যে ভাবলক্ষণের তারতম্য থাকলেও তারা সবাই এক অখণ্ড বোধস্বরূপ গুরুরই অভিব্যক্তি। সেই বোধেই তাঁদের মানতে হয়।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সদ্‌গুরু স্বয়ং। তাঁরা সকলে পরাৎপরমগুরুর প্রকারভেদ মাত্র। কাজেই গুরুকে শুদ্ধবোধরূপে বা কেবল জ্ঞানমূর্তিরূপে গ্রহণ করতে হয়। জ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও শুদ্ধ-বস্তু বলে সব কিছুকে শোধন করে। সেই জন্য জ্ঞানের অর্থাৎ শুদ্ধবোধের নামই গুরু। যিনি অজ্ঞান, অন্ধকার, অপূর্ণতা ও সসীমতাকে দূর করে এক সমান প্রেমস্বরূপ এবং শক্তি ও জ্ঞানঘন অমৃত সত্তাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, তিনি সদ্‌গুরু স্বয়ং।

বোধস্বরূপের সেবা হল সর্বোত্তম সাধনা। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাওয়া অনুরূপ পুষ্টি দিয়ে পরিণামে তিনি শুদ্ধবোধস্বরূপে মিলিয়ে নেন। শুদ্ধ চিৎকে সবার কাছে সহজ ভাবে ধরিয়ে দেবার জন্য 'মা' সম্বোধন করা হয়। মা হলেন অখণ্ড শুদ্ধ চিৎস্বরূপ। কাজেই যে সদ্‌গুরুর বা চিৎ-এর সাধনা করে সে-ই সর্বোত্তম সাধনা করে। তার মধ্যে বোধের স্ফুলিঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফুটে ওঠে। মা বা গুরু তাকে কখনও ছাড়েন না। শুদ্ধ-বোধের অনুভূতি তখন তার মধ্যে প্রকাশ পায়। অনুভূতি ব্যতীত সব ক্রিয়া অনুষ্ঠান অপূর্ণ।

ভগবান অণু হয়ে সবার মধ্যে মিশে আছেন। সেই জন্য ভগবানের নাম অণুদেব। তিনি একপক্ষে 'অণোরণীয়ান' আবার অপরপক্ষে 'মহতোমহীয়ান'। অর্থাৎ তিনি অণু থেকেও অণুতম এবং মহৎ ও বৃহৎ থেকেও বৃহত্তম। উভয়ই হল সচ্চিদানন্দ গুরু-আত্মা-ভগবানের পরিচয়।

শুদ্ধবোধরূপী গুরুর বা মায়ের মহিমা

চিদ্‌ঘনস্বরূপ গুরু বা মা প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থান করেন সুতরাং তিনিই সবচেয়ে নিকটতম। তাঁর দর্শন লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাইরের গুরুর সাহায্যে সর্বোত্তম অনুভূতি লাভ হয় না। গুরু বিনা জ্ঞান হয় না। গুরুই মনের অন্ধকার ও সংশয়কে দূর করতে পারেন। গুরু তাঁর বাণীর দ্বারা জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন; কিন্তু তাঁকে শুধু শব্দের মধ্যে রাখলেই হয় না। শব্দের মর্মবোধের মধ্যে তাঁকে ধরতে হয়।

প্রতি শব্দের দু'টি করে অর্থ পাওয়া যায়, একটি হল কেন্দ্রগত সত্তার ও আরেকটি হল তার শক্তির, ক্রিয়ার বা গতির। প্রত্যেক শব্দের আবার দু'টি করে গতি পাওয়া যায়। যেমন, 'আগুন' শব্দ বললে একটা লাল দাহ্যবস্তু এবং দহনক্রিয়া বোধ দুই-ই ফুটে ওঠে। অগ্নির ক্রিয়াশক্তি অগ্নির মধ্যে আছে। শব্দের ক্রিয়াশক্তিকে নাম দিয়ে ব্যবহার করা হয়; বোধের ক্রিয়াশক্তি ব্যবহার হয় শুদ্ধ ভাববোধে।

শব্দের ক্রিয়াশক্তিকে আবিষ্কার করাকেই মন্ত্রের জাগরণ বলে। শব্দের কেন্দ্র হল বোধ! মন্ত্রের বা বোধের সাহায্যে বোধকে জাগাতে হয়। সেই জন্য গুরু মন্ত্র দিয়ে বলে দেন—'মন্ত্রের মধ্যে আমি আছি, আমাকে ভাবনা কর'। কিন্তু যথার্থ ব্যবহারের অভাবে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের অনন্ত প্রভাব অনেকের পক্ষেই অনুভবগম্য হয় না। মন্ত্রের অর্থবোধ হল শব্দের বা পদের লক্ষ্যার্থবোধ।

যে কোনও মন্ত্রোচ্চারণের সময় ঈশ্বরীয় রূপ-নাম-ভাব-বোধের সমন্বয় না-থাকলে মন্ত্রের শক্তি কার্যকরী হয় না। গুরুমন্ত্র জপের সময় গুরুর অখণ্ড রূপ ভাবনা করতে হয়। অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যানক্রিয়াকে; উপাসক, উপাস্য ও উপাসনাকে; কর্তা, কর্ম ও করণকে; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানকে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনকে একবোধের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে হয়। এই ভাবে গুরু-ইষ্ট-আত্মার চিন্তার বা ধ্যানের দ্বারা গুরুশক্তি সক্রিয় হয়। একেই গুরু, ইষ্ট, আত্মার কৃপা ও করুণা বলা হয়। কাজেই রূপ, নাম, ভাব ও বোধ এই চতুর্বিধ অভিব্যক্তির যে কোনও একটিকে বাদ দিয়েও ব্রহ্ম-আত্মার সাধনা হয় না।

প্রতি শব্দের দু'টি রূপ, যথা—সত্তা ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি। আবার বাচ্যার্থ বা লৌকিক অর্থ এবং লক্ষ্যার্থ বা বোধার্থ—যা কেবল গুরুর কাছে পাওয়া যায়। যুগল ছাড়া এক-এর সাধনা পূর্ণ হয় না। শক্তি ছাড়া শুধু সত্তার চিন্তা করা চলে না। আবার সত্তাকে বাদ দিয়েও শুধু শক্তির সাধনা অসম্ভব। চৈতন্যময়ী মাকে সত্তা ও শক্তি উভয়ই বলা হয়। অন্তর ও বাহিরে সবই প্রকৃতি। পুরুষ হল একমাত্র কেন্দ্রসত্তা স্বয়ং। নিজেকে সত্তারূপে এবং যুগলরূপে চিন্তা করলে ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়।

শিবলিঙ্গ ও যোনিপীঠের তাৎপর্য

শিবলিঙ্গ ও যোনিপীঠের তাৎপর্য পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম না-হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয় না। একটি হল শুদ্ধবোধের ধারা এবং অপরটি হল তার ধারক ও বাহক। শেষোক্তটি হল যোনি বা মন বা প্রকৃতি। মন হল আধার বা যোনি এবং তার মন্ত্র হল 'ঐং'।

ঐং—ঐ হয় 'ও'-র সঙ্গে 'ই' যুক্ত হলে। আবার 'ও' হয় 'অ' এবং 'উ' যুক্ত হয়ে। প্রতি বর্ণের তিনটি করে অর্থ আছে। 'ঐং' শব্দের অর্থ জ্ঞান, গুরু ও সরস্বতী। মন্ত্র বা নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার কেন্দ্র বা উৎসের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়।

সর্বতোমুখী সদ্‌গুরু হলেন শাস্ত্রের ঘনীভূত মূর্তি

গুরু প্রতি বর্ণের ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যিনি মনের সপ্তস্তরের সঙ্গে পরিচিত ও যুক্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত গুরু। পুরুষ-প্রকৃতি, সত্তা-শক্তির পূর্ণ অনুভূতি যিনি লাভ করেছেন তিনিই সদ্‌গুরু।

প্রতি বর্ণের বোধকে ধরিয়ে দিতে পারেন এ রকম গুরু বড় দুর্লভ। এই জন্য বলা হয় সদ্‌গুরু লাভ করা বড় দুর্লভ। শুধু কল্পনা বা অনুমান দ্বারা জ্ঞানগুরুর সম্বন্ধে জানা যায় না। আপন অন্তরের সবগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তির বা প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে সদ্‌গুরু আখ্যা লাভ করা যায়। একমাত্র শুদ্ধবোধ দিয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয় হতে পারে।

শুদ্ধবোধরূপী মায়ের বা গুরুর পূজা বা উপাসনার বর্ণনা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করা আছে। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যয়ন দ্বারা তাঁর মহিমা অবগত হওয়া যায় না। সর্বতোমুখী শাস্ত্র পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্ম গুরুর মহিমাকে ব্যক্ত করলেও তাঁর মহিমা অনির্বচনীয়।

গুরুস্তবে গুরুকে বলা হয়েছে নিত্যানন্দ, লীলানন্দ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ; অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ হল সদ্‌গুরুর পরিচয়। চিৎ হল সর্ব অভিব্যক্তির মূল সত্তা। অতএব চিৎ-এর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে সবাই পরিচিত; কারণ মনের সঙ্গে সবার পরিচয় আছে। মনেই হয় তার সব অভিব্যক্তি। আনন্দ হল অব্যক্ত ও অমূর্ত। চৈতন্যময় পুরুষের সঙ্গে মিলনেই প্রকৃতির আনন্দ। সৎ হল সবার ঊর্ধ্বে কেন্দ্রসত্তা। চিৎ ও আনন্দ সৎ-কে আবৃত করে রেখেছে। সচ্চিদানন্দ সম অর্থবোধক, স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ।

অন্তঃকরণের কাজ হল চিৎ ও আনন্দকে নিয়ে। সেই জন্য অন্তঃকরণে প্রিয়-অপ্রিয়, জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ সৃষ্টি হয়। অন্তর কেন্দ্রকে বাইরে থেকে আবৃত করে রাখে বলে বাইরে থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেন্দ্রসত্তাকে ধরলে বাহির-অন্তর কোনওটাই আবৃত হয় না।

যথার্থ ভাবে সত্যোপলব্ধি করতে চাইলে সর্ববস্তুর কেন্দ্রসত্তাকে শুদ্ধবোধের বা শ্রীনামের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হয়। গুরু সব সময় বীজমন্ত্র দেন নাম যুক্ত করে। শ্রীনাম বা বীজমন্ত্র হল বোধের সূক্ষ্মতম বা অণুতম প্রকাশ।

আসল স্থিতি হল নিত্যবোধের স্থিতি, সমতা। সমত্ববোধের স্থিতি হল গুরুর চরণ। সর্ব অবস্থায় মনের স্থিতি, সমতা রক্ষা করাকেই গুরুর চরণবন্দনা বলে। এই হল নিত্যযুক্ত অবস্থার লক্ষণ। সেই পরমপদ যিনি লাভ করেছেন তিনি নিচু বংশজাত হলেও উদার, মহান এবং যথার্থ উপাস্য।

কেন্দ্রসত্তার পরিচয় পেলেই সদ্‌গুরুব সঙ্গে অভেদে মিলন হয়। সদ্‌গুরু নিত্য একবোধে, একভাবে, একনামে ও একরূপে থাকেন। তিনি পরাৎপরমগুরু, পুরুষোত্তম স্বয়ং, কেবল জ্ঞানমূর্তি। গুরু দ্বন্দ্বাতীত। দ্বন্দ্ব হয় দ্বৈতের মধ্যে। ত্রিগুণাপ্রকৃতি তার তিন গুণের মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও ভেদ সৃষ্টি হয়। অন্তরে তিনি চতুর্বর্গ। তাই বিষ্ণু অন্তর্দেবতা চতুর্ভুজ। তাঁর চার হাতের চারটি শক্তি হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অথবা কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি। এই চতুর্বর্গের মাধ্যমে তিনি সর্বস্তরকেই সমান ভাবে ব্যবহার করেন।

সদ্‌গুরু বলতে পরাৎপরমগুরুকেই বোঝায়। আপন আপন গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র বা নাম এবং গুরুকে অভেদে পরাৎপরমবোধে গ্রহণ ও মনন করলে প্রত্যেকে সংসারবন্ধন থেকে অচিরেই মুক্তিলাভ করতে পারে। একটা বৃক্ষকেও গুরু বা ইষ্ট বোধে উপাসনা করলে পরাসিদ্ধি লাভ করা যায়। পূর্ণতা নির্ভর করে গুরুবোধের উপরে, অবলম্বনের উপরে নয়।

মন্ত্রী এবং মন্ত্র, যন্ত্রী এবং যন্ত্র সদ্‌গুরু স্বয়ং। শুধু মন্ত্র নয়, যন্ত্রী ও মন্ত্রী বোধেও গুরুকে ভাবতে হয়। তাহলে অচিরেই মন্ত্রসিদ্ধির ফল পাওয়া যায়। সেই জন্য বলা হয় গুরুতন্ত্র সর্বতন্ত্রের সার। গুরুমন্ত্র সব মন্ত্রের সার। কারণ সদ্‌গুরু ব্যতীত কেউ মন্ত্রার্থবোধ দিতে পারে না। পরমেশ্বর স্বয়ং সদ্‌গুরুর মাধ্যমে মন্ত্রের বোধার্থ এবং সাধনার রহস্য ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করেন।

সদ্‌গুরুর কৃপালাভের উপায়

সদ্‌গুরুর প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা মনে রেখে চললে প্রত্যেকেই গুরুকৃপা লাভে সমর্থ হবে। গুরুকৃপা লাভ হলে বোঝা যায় যে কী ভাবে গুরু ব্রহ্মচর্য লাভ করতে সাহায্য করেন। গুরুকৃপা ব্যতীত শুধু আত্মচেষ্টার দ্বারা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের বিকার সহজে শোধন করা যায় না। যেমন একটা ভিজা কাঁথাকে আগুনে শুকাতে অনেক সময় লাগে; কিন্তু রোদের তাপে অল্প সময়ে তা শুকিয়ে যায়। সেইরূপ আত্মচেষ্টার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা বহু সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কিন্তু গুরুকৃপায় তা স্বল্পসময়ে সহজসাধ্য ও পূর্ণ ফলপ্রদ হয়।

'রোদ' হল এখানে গুরুকৃপা। তাঁর কৃপা পাওয়ার উপায় হল তাঁর আদেশ বা নির্দেশ যথাযথ পালন করা ও অনুসরণ করা। একসঙ্গে পুরোপুরি ভাবে তা কেউ না-পারলেও স্বল্পমাত্র সাধনের দ্বারাও মহৎ উপকার পাওয়া যায়। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন সহযোগে ইষ্টকে ডাকলে যথার্থ ফল পাওয়া যায়। গুরুর বা ইষ্টের উদ্দেশ্য হল এক-এতে অর্থাৎ অখণ্ড সমত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া।

পুরুষকারের তাৎপর্য

অধ্যাত্মপথের অগ্রগতির জন্য মনের দৃঢ়তা একান্ত দরকার হয়। 'হচ্ছে, হবে' বলে বলে অগ্রসর হওয়া যায় না। অধ্যাত্মবিজ্ঞান 'হচ্ছে, হবে'-র উপরে গুরুত্ব দেয় না। 'হতেই হবে', 'ফেলে রেখে দিলে চলবে না', 'কেন হবে না'? —এইরূপ দৃঢ়তা বা আবেগ বৃহত্তর বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে দিতে সাহায্য করে। তার ফলে পুরুষকার জেগে ওঠে।

পুরুষের চেতনাকে লাভ করার উপায় হল পুরুষকার। পুরুষ হল অখণ্ড বোধসত্তা। প্রকৃতি পরমপুরুষের সাহায্য নিয়ে চলে। আর মানুষ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের সাহায্য নিয়ে চলে। সে প্রকৃতির দ্বারা সত্তার বোধরূপ উপাদান পেয়ে পুষ্ট হয়।

প্রকৃতি নেয় গুরুর কাছ থেকে। গুরুই মাতা। ভজনকারীকে গুরু তার স্বরূপবোধে জাগিয়ে দেন। অনেকে বলে থাকেন—গুরুই সব করে দেবেন, আমাদের কিছু করণীয় নেই। তা ঠিক নয়। তাঁর কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হয়। আধার আমার—তিনি আধেয়। আমি প্রকাশ, তিনি প্রকাশক।

গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র বা সাধনবিজ্ঞান গ্রহণ ও ধারণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে তা আবার তাঁর সেবায় পূর্ণ ভাবে নিবেদন করতে হয়। এমনকী ধ্যানসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিশান্তিও তাঁকে সমর্পণ করতে হয়। তাহলে গুরুবোধের সঙ্গে অভেদে যুক্ত হয়ে মহামুক্তি লাভ করা যায়। তখন পরমাত্মগুরু স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই জন্য প্রথমে প্রস্তুতি এবং পরে স্থিতি। [২০।১১।৭৩]

গুরুগীতার মহিমা

গুরুগীতা সাহিত্য এবং দর্শনের দিক দিয়ে পড়তে খুব সুন্দর হলেও তার বোধার্থ খুব কঠিন। গুরুগীতার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ যোগসাধনার ব্যাপার। শুদ্ধবোধের নাম একরস। এর নাম গুরু। সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত উপদেশের, বাকের বা সৎপ্রসঙ্গর বিষয়কে অন্তরে ধ্যান বা মনন করলে তাঁর আশীর্বাদ ও কৃপার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। সহস্রার থেকে অন্তরে যে অখণ্ড বোধধারা প্রবাহিত হয় তা-ই চিদাত্মগুরুর চরণামৃত বা গঙ্গোদক বা বোধগঙ্গায় স্নান। এর রহস্য অনুভবসিদ্ধ, ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

গুরুর পাদুকা হচ্ছে সহস্রারে নিহিত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মূলদ্বয়। গুরুর অনুগ্রহ হল এই উভয়শক্তির সামঞ্জস্যবোধ।

গুরুর বাক্য ও আচরণের স্মৃতি যত বেশি মনে ফুটে ওঠে তত তাড়াতাড়ি অন্তরে তাঁর অভিব্যক্তি হয়। সৎপ্রসঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে তিনি প্রকাশ করার ব্যবস্থাই করেন। শ্রুত বিষয়বস্তু যথাযথ মনন করা হলে তাঁর কৃপা অবশ্যই পাওয়া যায়। সৎসঙ্গের বিষয়বস্তুর মননই হল গুরুর চরণসেবা করা। কারণ গুরু স্বয়ং কথার বা বাকের মধ্যে নিজে বিচরণ করেন। সৎসঙ্গের প্রতিটি কথাই হল গুরুর পদক্ষেপ।

অখণ্ড একবোধের মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে অখণ্ড বোধ আছে এই ভাবে তাঁকে ধরে চলা এবং মনন করা হল আসল দীক্ষা। এই বোধ নিয়ে সকলে যথেচ্ছা চলতে পারে। কোনও বন্ধন তাদের থাকে না।

বৃহতের কৃপা ব্যতীত কেবল আত্মচেষ্টায় আত্মসাধনা পূর্ণ হয় না। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সহজবোধ্য বা সহজলভ্য জ্ঞানের মতো অধ্যাত্মজ্ঞান শুধু শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে সহজলভ্য বা সহজবোধ্য নয়। তা গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধনসাপেক্ষ।

[শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভাবাবেশে মুদিত নয়নে বসে রইলেন অল্প সময়। তার পরেই তাঁর শ্রীমুখ হতে একটি ভজন উদ্গীত হল—]

প্রেমানন্দে ভজ মন শ্রীগুরুর চরণ
সচ্চিদানন্দঘন গুরু ঘনিষ্ঠ আপন।।
অমৃত অক্ষর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
সদ্‌গুরু স্বয়ং সদ্‌গুরু স্বয়ং।
পুরুষোত্তম গুরু ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর পরম
সদ্‌গুরু স্বয়ং শ্রীগুরু স্বয়ং।।
অরূপ স্বরূপ গুরু ভাবাতীত স্বভাবত
দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত শাশ্বত অচ্যুত
নিত্য অদ্বৈত গুরু বোধ নিরঞ্জন
সদ্‌গুরু বোধ নিরঞ্জন।।
দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন সবান্ধব পরিজন
অনন্ত বিশ্বভুবন শ্রীগুরুর লীলা প্রকরণ।।
দারা পুত্র পরিবার অহংকারের সংসার
আমার আমার অজ্ঞানী করে ব্যবহার
গুরু বিনে ত্রিভুবনে কেহ্ নয় আপনার
গুরুধ্যানে গুরুজ্ঞানে কাটে সংসারবন্ধন।।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু বন্ধু গুরু ভ্রাতা
গুরু শক্তি গুরু সত্তা গুরু ত্রাতা বিশ্ববিধাতা
গুরু সর্বনিয়ন্তা ভূমা বোধ সনাতন
নিষ্কল নির্মল শান্ত পূর্ণ নির্বিকার নিরঞ্জন।।
ধর্ম কর্মের সারমর্ম শ্রীগুরুর প্রসাদ কারণ
ধন জন যৌবন আত্মীয় পরিজন।
শ্রীগুরু পদে মন কর পূর্ণ সমর্পণ
গুরু যন্ত্র গুরু যন্ত্রী গুরু মন্ত্র গুরু মন্ত্রী
গুরু তন্ত্র স্বতন্ত্র গুরুবোধে করহ সাধন
গুরু নিষ্ঠা গুরু ভক্তি সংসারে দুর্লভ অতি
বলে সাধু গুরু মহাজন, বলে সাধু গুরু মহাজন।।
গুরুকৃপায় সর্বসিদ্ধি লভে গুরুভক্তজন
সর্বভূতে আত্মগুরু দরশন আত্মগুরু দরশন।
গুরু গতি গুরু স্থিতি গুরু প্রীতি সমদৃষ্টি
মুক্তি শান্তি স্বানুভূতি সদ্‌গুরু প্রাপ্তি অমৃত আস্বাদন
অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপে নিত্যবিচরণ
তত্ত্বজ্ঞপুরুষের পূর্ণলক্ষণ তত্ত্বজ্ঞপুরুষের পূর্ণলক্ষণ।।

এই গানের মধ্যেই সব দেওয়া আছে। এই গুরু বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সবারই উপাস্য। ইনি লোকাতীত আবার লোকগুরু। এই গুরু সকলেরই গুরু। তাঁর কৃপা ছাড়া সত্যের অনুভূতি লাভ করা যায় না।

[ঈষৎ ভাবস্থ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পরে দুলে দুলে খুব হাসছেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর, একটু পরে আবার বলতে শুরু করলেন—]

সচ্চিদানন্দসাগরেই ব্রহ্ম গড়াগড়ি যায়। অর্থাৎ স্বভাবে বোধ নিত্য লীলা করে। গুরুগতি হল পরমগতি। গুরুপ্রীতি, সমদৃষ্টি হওয়া চাই। তাকেই সর্বভূতে সমদরশন বা আত্মদর্শন বলে।

ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী সকলকেই গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। পরমব্রহ্মগুরু স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে অভিব্যক্ত হন। তিনি আবার সদ্‌গুরু স্বয়ং। সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে সর্ববাধাবিপত্তি অতিক্রম করা সম্ভব হয়। দেবতারা রুষ্ট হলে দেবতাদের হাত থেকে সদ্‌গুরু রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে দেবতারাও রক্ষা করতে পারেন না।

সব গুরু সচ্চিদানন্দঘন এক গুরুরই প্রতিনিধি। তিনি সর্ব মতপথ ও দলের উর্ধ্বে। গুরু ভাবাতীত আবার স্বভাবত সব সময় ভেদাতীত, শাশ্বত ও অচ্যুত। তিনি নিত্য অদ্বৈত, বোধ নিরঞ্জন। অর্থাৎ যিনি বোধ রঞ্জিত হন না। এই গুরুকেই রাম, কৃষ্ণ বা শিব জ্ঞানে যার যেমন ভাব সে-ভাবে সে ভজন করে। এ-ই হল সদ্‌গুরুর যথার্থ পরিচয়। এই যথার্থ পরিচয় শোনার পর আপন আপন গুরুকে অখণ্ড বোধে ভজনে দোষ-ত্রুটি ও অন্তরায়গুলি আর থাকে না।

পাথরকে বিষ্ণুবোধে নিলে বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, সুতরাং মানুষকে গুরুবোধে নিলে বোধ বা জ্ঞান আরও তাড়াতাড়ি হয়। গুরুকে দেবতাবোধে গ্রহণ করতে হয়। মনুষ্যবোধে দোষদৃষ্টি এসে যায়। গুরুর প্রতি দোষদৃষ্টি থাকলে গুরুকৃপা লাভ হয় না।

গুরু চিদানন্দঘন বোধময় মূর্তি। তিনি শুদ্ধবোধ দিয়ে কৃপা করেন। যে বস্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, যা চুরি করেও পাওয়া যায় না, সেই বস্তুই গুরু দেন। সর্বোত্তম বস্তু গুরু স্বয়ং। তাই গুরু নিজেকে ভক্তের মধ্যে বিলিয়ে দেন। গুরুর প্রতি অণুপরমাণু বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাকে গুরুবোধে নিলে পূর্ণতা আসে। যেমন একলব্য গুরুর কুশপুত্তলিকা সামনে রেখে ভক্তিভরে সাধন করে সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিল।

গুরুবোধে কোনও অবলম্বন গ্রহণ করলে গুরুবোধ আপনিই জাগে। গুরু হলেন বোধস্বরূপ। অবশ্য ব্যক্তিরূপেও গুরুকে প্রয়োজন হয়। তবে গুরু যদি মনে করেন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে শিষ্যের ভিতরে তিনি ফুটে উঠবেন তাহলে ব্যক্তিগুরুর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যেমন অনেক গাছের জন্য বেড়া দরকার হয় আবার অনেক গাছের জন্য দরকার হয় না।

আত্মগুরুর সাধনাতে বেড়ার প্রয়োজন হয় না। এই গুরু স্বয়ংপ্রমাণ, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংপূর্ণ এবং পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম গুরুর ভজন যেন সবাই করে। তাঁর ভজন করতে গেলে সর্ববস্তুকে সমবোধে গ্রহণ করতে হয়; কারণ সমত্বই গুরুর প্রিয় বস্তু এবং সমত্বজ্ঞানেই গুরুর সর্বোত্তম আরাধনা হয়।

একটু আগেই যে ভজনটি প্রকাশ হল তার বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে সদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি প্রীতি জাগ্রত হবে। গুরুস্তব ও গুরুবন্দনা যথার্থ ভাবে অনুধাবন করলে গুরুসঙ্গ লাভের ফল অচিরেই লাভ করা যাবে। কারণ অনুভূতি দিয়ে দৃঢ় হয় অনুভূতির প্রসারতা। সাধুসঙ্গের মাধ্যমে সাধুসঙ্গের প্রভাব বাড়াতে হয়। সৎসঙ্গ যতই হয়, ততই ভাল। তার বিকার হয় না। সৎসঙ্গ ছাড়া অন্য বস্তুর অধিক ব্যবহারে বিকার বাড়ে।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গুরুবোধ। এই জিনিসটিই 'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) দিয়ে যাবে। গুরুবোধ হল সে-ই বোধ যে বোধে দ্বৈতবোধ থাকে না বা নানাত্ব-বহুত্বের প্রভাব থাকে না। গুরু স্বয়ং অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে দেন। 'গু' মানে ভ্রান্তি, মায়া, অজ্ঞানতা। 'রু' হল তেজ, জ্যোতি, আলো ও সমবোধ। এই দুই ভাব মিলে হয় গুরু। তাই গুরু হলেন সত্তা-শক্তি ও পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম মূর্তি এবং তার উর্ধ্বেও তিনি-ই।

গুরুকৃপায় অন্তরে আত্মবোধের প্রকাশে ধ্রুবাস্মৃতি জাগে। তখন পৃথিবীতে ভয়ের কিছু থাকে না। তখন

মৃত্যুকে নিয়ে যাদুকরের খেলার মতো খেলা চলে। বোধের সামান্য একটি বৃত্তির বা বিকৃত আভাসের নাম মৃত্যু, জন্ম ও তদ্রূপ। ক্ষুদ্রতর বোধ বৃহত্তর বোধের উপরে আধিপত্য করতে পারে না। আগুন আগুনকে দাহ করতে পারে না। সেইরূপ মৃত্যুরূপ বোধ অমৃতময় বোধস্বরূপকে নাশ করতে পারে না। অমৃতের সন্তান অমৃতময় বোধস্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে ভয়ে মৃত্যুর অধীনে বাস করে। যে জ্ঞান নিয়ে মানুষ বড়াই করে তা যথার্থ জ্ঞান নয়। শুদ্ধবোধের প্রভাবে কোনও বন্ধন থাকে না।

মাতৃভক্ত সন্তান যেমন মায়ের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু আদায় করে নেয়, গুরুভক্তও সেইরূপ গুরুর কাছ থেকে সর্বোত্তম বস্তু বা বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্ব লাভ করতে পারে। শাস্ত্রের জ্ঞান গুরুকৃপায় লাভ হয়। মুখস্থ করা শাস্ত্র, ভেজা দেশলাইকাঠির মতো কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু শুকনো একটা কাঠিতেও অনেক কাজ হয়। সেইরূপ যথার্থ সাধুসঙ্গের সৎ স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ মহাবাক্য হল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

যেমন রক্ত চলাচলের মাধ্যমে সর্বাঙ্গের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে সেইরূপ সব মতপথের সঙ্গে 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) সমান সম্বন্ধ আছে স্বতঃস্ফূর্ত স্ববোধের মাধ্যমে। হৃদয়ে জাতি, বর্ণ ও লিঙ্গের ভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা স্বতন্ত্র। তাই গুরু স্বমহিমায় প্রকাশ হন। সে কথাই গানটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে— 'গুরুতন্ত্র স্বতন্ত্র গুরুবোধে করহ সাধন'। 'আমারবোধে' সাধনা হয় না। তারপর বলা হয়েছে 'গুরুমন্ত্রী'। অর্থাৎ তিনি না-চালালে কেউ চলতে পারে না।

যে কোনও মতপথের মাধ্যমেই হোক সকলকে সেখানে পৌঁছতেই হবে। 'এর' (নিজের দিকে দেখালেন) পরিচয় সেখানে গিয়ে আরেকবার পাবে। এই ভাবে দাড়ি দেখে চেনা যাবে না। বাইরের এই খোলসটার মধ্যে আসল বস্তু লুকানো আছে। তবে 'একে' ব্যবহার তিনি করেন। 'একে' ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে না। কেন না 'হরি' সবার বড় প্রিয়। 'হরি' যখন তাঁর মহিমায় সবাইকে অভিষিক্ত করতে চান তখন একটা বিশেষ দেহ বানিয়ে নেন। 'একে' তিনি অগ্রভাগে রাখেন না। যার যখন প্রয়োজন হবে, তখনই 'এর' সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিদানন্দময়ী মা বলতে দেবেন না। তবে বলা আছে সবার গুরুর সঙ্গেই 'এর' যোগ আছে। কারণ পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল সব গুরু। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয় শুদ্ধবোধ দিয়ে।

[২৫।১১।৭৩]

সর্বোত্তম অনুভূতি গুরুকৃপা সাপেক্ষ

সর্বোত্তম অনুভূতি লাভের জন্য সাধকের স্বকীয় চেষ্টার সঙ্গে সদ্গুরুর কৃপাশিস্ সর্বতোভাবে প্রয়োজন। সাধারণ গুরুদের কাছে সাধনার উপকরণ ছাড়া বেশি কিছু পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা যে ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান, তখন তিনিই সব করে দেবেন এবং কারও কিছু করতে হবে না। পরমসিদ্ধি লাভ করতে হলে বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং গুরু-ইষ্টের উপরে নির্ভরতা একান্ত প্রয়োজন। এই পঞ্চবিধ অনুশীলন অন্তরে গুরুশক্তির কৃপাতে জাগ্রত হয়ে পঞ্চবিধ অনুশীলনের মাধ্যমে সাধকের অন্তরে অভিব্যক্ত হয়। মাতা কুণ্ডলিনী শক্তির অভিব্যক্তির লক্ষণ যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তের অন্তরে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ পায়।

সাধনবিমুখ অলসদের ভ্রান্তধারণা শোধনের নিমিত্ত সদ্গুরু মহাত্মাগণ জীবনে আচরণের মাধ্যমে কতগুলি উদাহরণ রেখে যান। তাঁদের উদাহরণ অবলম্বন করে সাধককে সাধনা করতে হয়। কর্মের মাধ্যমে একটা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে আরেকটা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এই ভাবে বারবার ব্যবহার করে একটা ব্যবহারবিজ্ঞান তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা হয় যখন ব্যবহারের দোষ বা তারতম্য থাকে না। এই অবস্থায় বোধসত্তার পরিচয় মেলে। তার ফলে বুদ্ধি পরিপূর্ণ ভাবে পরিশোধিত হয়।

ব্যক্তিবোধ সসীম বলে গুরুকে ব্যক্তিবোধে না-নিয়ে কেবল জ্ঞানমূর্তিবোধে নিতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক বোধ অসীম। শালগ্রামশিলাকে পাথরবোধে পূজা করা হলে নারায়ণবোধ কখনওই জাগে না। সদ্‌গুরুকে অখণ্ড বোধে নিতে হয়।

সাধক যে কত রকম ব্যবহারবিজ্ঞানের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভ করে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়।

গুরুভজনে বলা হয়েছে যে গুরুবোধে গুরুর সাধন করতে হয়। যাদের অতীতের শুভ সংস্কার ও ভবিষ্যতের শুভ কারণ সঞ্চিত আছে তাদের দেখেই সদ্‌গুরুরা বুঝতে পারেন যে এর দ্বারা সাধনা সম্ভব। তাদের সাধনার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে জোর করেন; কিন্তু যাদের এই দু'টির অভাব থাকে বা প্রাধান্য কম থাকে তাদের শুধু নাম ও কর্মসাধনার জন্য উৎসাহ দেন। নাম হল বীজ বা কারণ। কারণ থেকেই শুভ সংস্কার বা কার্য তৈরি হয়। নামের কথা সবাইকেই বলা চলে, কারণ নাম হল মূল ভিত্তি। কিন্তু সাধনার ক্রম অতীতের সংস্কারভিত্তিক বলে সবার সমান হতে পারে না।

কান্নাকাটি বা জোরজবরদস্তি করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কিছু আদায় করা চলে না। সদ্‌গুরুরা জানেন কোন আধারে কীরূপ কাজ হয়। যেমন দেশের সরকার যখন কাউকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন তখন তার গুণ ও অভিজ্ঞতা দেখেই তা করেন। জোর করে তা কেউ আদায় করতে পারে না। যদি তার অন্যথা হয় তাহলে কর্মবিভ্রাট ও কর্মসংকট ঘটবেই। তার ফলে সমস্যার সমাধান না-হয়ে বেড়েই চলে। প্রকৃতিশক্তির মধ্যে এক একটি কাজ এক এক জনের উপরে ন্যস্ত করা আছে। সেইরূপ প্রত্যেকের জীবন এক ঈশ্বরের প্রকাশ হলেও সবার মধ্যে তিনি এক ভাবে না-খেলে পৃথক পৃথক ভঙ্গিমায় নিজেকে ব্যক্ত করেন।

পূর্ণানুভূতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বহুবার দেহ পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধকের সাধনা চলতে থাকে। এ সম্বন্ধে সদ্‌গুরু মাত্রই অবহিত থাকেন। সেই জন্য তাঁরা সকলকে সচেতন করে দেন যে লক্ষ্য স্থির রেখে বর্তমান জীবনে একনিষ্ঠ ভাবে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করা চাই। নতুবা জন্ম জন্মান্তরের দেহধারণের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

অখণ্ডকে মানলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেওয়া হয়। গুরুর গানে বলা হয়েছে 'মুক্তি-শান্তি-স্বানুভূতি/ সদ্‌গুরু প্রাপ্তি অমৃত আস্বাদন'। সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হল অখণ্ড বোধের সাথে মিলন। অর্থাৎ অন্তরে-বাইরে অখণ্ডই আছে—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তখন অনুভূত হয় সবই বোধের নাম, বোধের রূপ, বোধের ভাব এবং বোধের বোধ।

সৎসঙ্গের তাৎপর্য হল গুরু তাঁর স্বরূপকে প্রকাশ করে লঘুর অন্ধকার দূর করেন।

সাধনবিজ্ঞানের সঙ্গে যথার্থ পরিচিত না-হয়ে ব্রহ্মজ্ঞ বলে দাবি করলে তাদের ব্রহ্মবন্ধু বলা হয়। এ যুগে যারা সাধনা না-করে বই পড়ে গুরু সেজেছে তারা ব্রহ্মবন্ধুর পর্যায়ে পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কোনও সমস্যা থাকে না। কিন্তু এ যুগের সাজা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদের নানাবিধ সমস্যা থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের সমস্যা না-থাকার কারণ তাঁরা গুণাতীত, দ্বন্দ্বাতীত এবং ভাবাতীতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

এই সমস্ত বিষয় উন্নত পর্যায়ের লোকে গ্রহণ করতে পারে। যেমন পণ্ডিত ও জ্ঞানীর কৃতি সন্তানরাই জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের মর্ম বোঝে। [২৭।১১।৭৩]

সাধনসিদ্ধির রহস্য

গুরুপ্রদত্ত নামসাধনার মাধ্যমে অজপা-জপ আপনিই সাধিত হয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম করলে সহজে অজপা-সিদ্ধি লাভ হয়।

সদগুরুর সাহায্য ব্যতীত শুধু পুঁথি-পুস্তকের জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিনা সাধনায় দুর্বোধ্য কিন্তু একনিষ্ঠ ভক্তিসহকারে ঐকান্তিক সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং গুরুকৃপায় তা অনুভবগম্য হয়। [২।১২।৭৩]

একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের লক্ষণ

গুরুকৃপা বিনা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র। বই পড়ে নিজে নিজে অধ্যাত্মসাধনা করা যায় না।

আত্মগুরু-ইষ্ট-মা হলেন শুদ্ধবোধস্বরূপ। নাম হল তাঁর বিজ্ঞানরূপ। 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান হল আত্মগুরু-ইষ্টের বা মায়ের বিজ্ঞান।

মুক্তপুরুষ হতে চাইলে সর্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সদ্‌গুরুকে বসিয়ে পূজো করতে হয়। সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে জাগ্রত করে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে।

এবার তোমাদের একটি গল্প বলছি, গল্পটির মর্মার্থ অনুভব করতে চেষ্টা কর—এক ব্রাহ্মণীর এক পুত্র নিয়ে সংসার। ব্রাহ্মণী খুব সাধনভজন করেন। পুত্রটি বড় হওয়ার পর সে কাজকর্ম করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণী সাধনভজন করে খুব তপঃশক্তি লাভ করেছেন। তার পুত্র একদিন জঙ্গলে কাজ করতে করতে হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা যায়। এক ব্যাধ এই দৃশ্য দেখতে পায়। ব্যাধেরও সাধনশক্তি ছিল। ব্রাহ্মণী ও তার পুত্রের সঙ্গে সেই ব্যাধের পরিচয় ছিল। কাজেই সাপের এই কাজে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাপকে মারতে উদ্যত হল; কিন্তু সে নিজে সাপটিকে বধ করবে না বলে সাপটিকে ধরে নিয়ে গেল ব্রাহ্মণীর কাছে। সাপকে সে বলল— তোকে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে বধ করাব।

ব্যাধ ব্রাহ্মণীকে গিয়ে বলল—এ তোমার পুত্রহন্তা, ওকে তুমি বধ কর।

উত্তরে ব্রাহ্মণী বলল—একে মারলে তো আমার পুত্র আর ফিরে আসবে না।

ব্যাধ—অতশত বুঝি না, শত্রুকে নাশ করা তোমার কর্তব্য। সুতরাং ওকে তোমায় বধ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণী রাজি না-হওয়ায় সাপকে নাশ করার স্বপক্ষে ব্যাধ জ্ঞানের নানা রকম যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণীর যুক্তিকে খণ্ডন করতে লাগল। ব্যাধ যে-সকল যুক্তির অবতারণা করল তা অতি বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য না-থাকলে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তা অসম্ভব।

ব্যাধ বলল—সাপকে আমি ছাড়ব না। কেন তার শাস্তি হবে না আমি তা জানতে চাই।

সাপ বলল—তুমি মিছামিছি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। ছেলেটির মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। আমি কালের দ্বারা প্রেরিত। আমি আমার কাজ করেছি মাত্র। আমি কখনওই দোষী নই।

তাদের এই বাদানুবাদের সময় সেখানে এক মুনি এসে উপস্থিত হলেন। আদ্যোপান্ত সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন—এ বিষয়ে মীমাংসা করা খুব কঠিন। আমার দ্বারা হবে না। আমি কালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তখন সেখানে কাল এসে উপস্থিত। ব্যাধ বলল—তুমি যখন সাপকে নিয়োগ করেছ, পুত্রহত্যার অপরাধে আমি তোমাকেই বধ করব।

কাল বলল—আমি নির্দোষ। আমি আমার কাজ করেছি। কালের স্রোতে কর্মফল বাঁধা আছে। ছেলেটি তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে।

ব্যাধ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—তাহলে তুমিও তোমার কর্মফল ভোগ কর। আমি তোমাকে হত্যা করব।

কাল—এই কাজে আমার কোনও হাত নেই। যম আমাকে নিয়োগ করেছে। অতএব দোষ করলে যম করেছে।

ব্যাধ তখন কালকে ছেড়ে যমকে ডেকে পাঠাল। যম এসে কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে কী ভাবে কর্মফল আসে সেই কর্মতত্ত্ব বোঝাতে আরম্ভ করল।

ব্যাধ বলল—অতশত বুঝি না। ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্য কর্মতত্ত্ব বলছ। ধর্ম রক্ষা হবে কী করে?

যম কোনও মতে বিষয়টির মীমাংসা করতে না-পেরে ভাগ্য বা নিয়তির প্রাধান্য অনতিক্রম্য বলে ঘোষণা করল। সে নিয়তির দাস। নিয়তি কারও দাস নয়। নিয়তি অতীব দুর্বোধ্য। দৈব ও পুরুষকারের সংযোগে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে নিয়তি সব কিছু সম্পাদন করে। তপস্যার দ্বারা নিয়তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাধকে নিয়তির জন্য তপস্যা করতে বলে যম সমস্যাটির মীমাংসা করে দিল। তারপর সকলে আপন আপন গন্তব্যস্থলে চলে গেল। যাবার সময়ে প্রত্যেকে ব্যাধের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করে গেল।

ব্যাধ ভাবল—আমার দোষ তো কেউ ধরিয়ে দিতে পারল না। তার উত্তর পেল ব্রাহ্মণীর কাছে।

ব্রাহ্মণী বলল—বাবা! দৈবকে বিশ্বাস করে যে পুরুষকারকে বিশ্বাস করে অথবা দৈব ও পুরুষকারকে যে একবোধে ব্যবহার করে তার কর্মফল থাকে না।

এই গল্পের ইঙ্গিত হল যে—আসল বস্তু পেলে বিকার থাকে না। আগাগোড়া ব্যাধের যুক্তিগুলি অতি বিচক্ষণতা ও জ্ঞানপাণ্ডিত্য দ্বারা পূর্ণ হলেও ব্যাধের ভিতরে অনেক গলদ ছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণীর কাছে এসে তাকে হার মানতে হল। তাই দেখা গেল, যে ত্যাগ করতে পারে সে-ই জ্ঞান দিতে পারে। পূর্ণ জ্ঞানী হল সর্বত্যাগী। সেই জন্য প্রিয় পুত্রের বিয়োগেও ব্রাহ্মণী স্থির ও অটল ছিল। এই হল যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ।

ব্রাহ্মনী যথার্থ সদ্‌গুরু পদবাচ্য। সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণীর কথায় ব্যাধের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তার ফলে তার যথার্থ পুরুষকাবের সঙ্গে দৈবের অভেদ মিলন ঘটে। অর্থাৎ সামগ্রিক কার্য-কারণের অবসান হয়। দৈব ও পুরুষকারের অভেদ মিলনই হল আত্মজ্ঞানের লক্ষণ। সদ্‌গুরুই একমাত্র আত্মজ্ঞানের অধিকারী।

[৪।১২।৭৩]

অধ্যাত্মসাধনার সিদ্ধি ও পূর্ণতা সত্ত্বগুণ সাপেক্ষ

সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই আত্মশক্তির দ্বারা সাধনা সম্ভব। যারা তমোরজোগুণী তাদের গুরুর বা মাতৃকাশক্তির সাহায্য সর্বতোভাবে প্রয়োজন হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্য না-হলে তমোরজোগুণ দ্বারা অভিভূত সাধক সাধনার ফল ধরে রাখতে পারে না। রজোশক্তি তাকে বিকৃত এবং তমোশক্তি তাকে আবৃত করে দেয়। কেবল সত্ত্বগুণই সমানে রাখে। 'গুরু' মানে হল বোধসত্তা। শুদ্ধবোধের বিষয়বস্তু কেন্দ্রসত্তা থেকে আসে। শুদ্ধ বুদ্ধি-মন-প্রাণ দিয়ে তা বোঝা যায়। [১১।১২।৭৩]

সদ্‌গুরুর অশেষ করুণাই ভক্তসাধকের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন

সদ্‌গুরুকে কেবল জ্ঞানমূর্তি বলা হয় কারণ তিনি শুদ্ধবোধস্বরূপ। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর সঙ্গ ও কৃপা প্রয়োজন হয়। সদ্‌গুরুর কাছে বস্তুজগতের অভাবপূরণের কামনা নিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। জগতের অভাবপূরণের জন্য ঈশ্বর বহুবিধ ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন। আবার আত্মজ্ঞান জাগাবার জন্য সদ্‌গুরুরূপে তিনি নিজে নিজেকেই প্রকাশ করেন।

অন্তরাত্মাগুরুর সঙ্গে অভেদে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত বাইরের গুরুর কাজ চলতে থাকে। অন্তরে গুরুর সন্ধান পেলে বাইরের গুরুর প্রতি যেন অশ্রদ্ধা আসে না; বরং তখন সমস্ত কিছুর মধ্যে গুরুর কৃপা, করুণার আভাস পেয়ে বুঝতে পারা যায় যে গুরু কী ভাবে নিজেকে গোপন রেখে সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছেন। শিষ্য

তখন গুরুকে স্থূলে-সূক্ষ্মে-কারণে ও মহাকারণে সর্বত্র প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পায়। গুরু তখনই তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মাধ্যমে শিষ্যের মধ্যে আপনস্বরূপ ব্যক্ত করেন অর্থাৎ নিজের মধ্যে তাকে মিলিয়ে নেন। একেই সর্বোত্তম গতি, গুরুপ্রাপ্তি, স্বানুভূতি ও পরম শান্তি বলে নির্দেশ করা হয়।

শুদ্ধবোধেই হয় সমদৃষ্টি বা প্রেমপ্রীতি

সর্বেন্দ্রিয়ে গুরু, মায়ের বা শুদ্ধবোধের ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধবোধের ব্যবহারের ফলে অন্তরে-বাইরে সমজ্ঞান, সমদৃষ্টি এবং সর্বভূতে প্রেম ও প্রীতি সহজে লাভ করা যায়। বিষ্ণু অর্থে আপন আপন গুরু-ইষ্টকে বলা হয়েছে। [১৬।১২।৭৩]

স্ববোধের মাধ্যমে গুরুভাবনার অনন্ত মহিমা

গুরুর আসল সম্পদের মূল্য তিনটি জিনিসের উপরে নির্ভর করে। শুধু গ্রহণ করলেই হয় না, তা আবার ধারণ করতে হয়। আবার অনেকে ভাল করে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরিবেশন করতে পারে না।

এ সময় জনৈক ভক্তের প্রশ্ন হল ঃ গুরুকে দেবতার চাইতেও কেন বড় করা হয়েছে?

উত্তর হল ঃ দেবতারা যা দিতে পারেন না, গুরু তা-ই দিতে পারেন। গুরু হলেন সর্বদেবতার ঘনীভূত মূর্তি। গুরুস্তবে গুরুর পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সদ্‌গুরু হলেন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং তদূর্দ্ধে পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। শিব যদি অভিশাপ দেন, গুরু রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরুর অভিশাপ থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কেউই রক্ষা করতে পারেন না।

সদ্‌গুরু প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

আবার প্রশ্ন হল ঃ গুরুকে ধরতে হলে প্রথমে ব্যক্তির রূপকে ধরতে হবে তো?

উত্তর হল ঃ যে বোধের কথা সৎপ্রসঙ্গে শোন, সেই বোধ দিয়ে ব্যক্তিগুরুকে ধরতে হয়। এই জন্য গুরুগীতা পাঠের কথা বলা হয়। গুরুগীতা পাঠের অভ্যাস থাকলে গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। গুরুতত্ত্ব অবগত হলে সর্বতত্ত্বের পরিচয় জানা যায়। গুরুতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য গুরুস্তবটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ও তার ব্যবহারবিজ্ঞান যাঁর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় তাঁকে সদ্‌গুরু বলা হয়। জগতের সমস্ত কারণ-কার্যের রহস্য যিনি অবগত হন, তিনিই সদ্‌গুরু। সদসতের বিজ্ঞান যাঁর মধ্যে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মতম কারণ এবং মহাকারণের সব কিছুর সঙ্গে অভেদে সংযুক্ত তিনিই সদ্‌গুরুরূপে পরিচিত।

প্রশ্ন হল ঃ এইগুলির অধিকারী কে তা বোঝবার উপায় কী?

উত্তর হল ঃ কতগুলি বিশেষ আচরণ ও লক্ষণের দ্বারা তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নির্মম, নিত্যশুদ্ধ ও অখণ্ড সমবোধে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও প্রেমপ্রীতি তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি নিরহংকার, নিরভিমান এবং তিনি অকর্তাবোধে সর্বপ্রকাশের বোধকে ঈশ্বরের বোধরূপে সমভাবে অনুভব করেন এবং সমভাবে তাকে ব্যক্ত করেন। তিনি মতপথের ভেদদৃষ্টি, গোঁড়ামি এবং পক্ষপাতদোষ মুক্ত থাকেন। জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি পরিপূর্ণ উদাসীন এবং জগতের বৈচিত্র্য ও শাস্ত্রের যথার্থ রহস্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার এই তিনটি পর্যায় সম্বন্ধে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যথার্থ তত্ত্ব, সমগ্র মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ

মনের সপ্তভূমি সম্বন্ধে পূর্ণ উপলব্ধি তাঁর থাকে। অজ্ঞান-জ্ঞান, অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান, জ্ঞানমিশ্রিত বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞানের অখণ্ডানুভূতির যথার্থ ব্যবহার সদ্‌গুরুর মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরুকে ধ্যানের আগে প্রণাম করতে হয়? না, ধ্যানের শেষে প্রণাম করতে হয়?

উত্তর ঃ গুরুকে ধ্যানের আদি-মধ্যে-অন্তে প্রণাম করতে হয়।

আবার প্রশ্ন ঃ ধ্যানের মধ্যে প্রণাম হতে পারে না?

এবার উত্তর হল ঃ ধ্যানের মধ্যে যা-কিছু হচ্ছে সবটার মধ্যে গুরুকে মেনে এবং উত্থানের সময়েও গুরুকে মেনে প্রণাম জানাতে হয়। গুরুর মধ্যে সব দেবদেবী এবং মহাত্মা, মহাপুরুষদের এবং তাঁদের সকলের মধ্যে আপন গুরুর অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করতে হয়।

আবার প্রশ্ন ঃ দীক্ষা না-পেলেও তাঁকে গুরু ভাবা যায়?

উত্তর হল ঃ যাঁর সান্নিধ্যে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গুরুবোধের প্রকাশ হয় তাঁকেই গুরু বলে মানা যায়। পাঁচজন গুরু থাকলে একজন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অন্তরে আসেন এবং বাকি চারজন পাশে থাকেন। কেন্দ্রে সদ্‌গুরু থাকলে সব গুরুকে পাওয়া যায়। অন্যান্য গুরু, যথা—শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতি এক কেন্দ্রগুরুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

যখন সদ্‌গুরুর বাণী, আচরণের বিষয়বস্তু হয়ে আপন অন্তরে কাজ করতে থাকে তখনই বুঝতে হয় সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হয়েছে। একেই অন্তরে সদ্‌গুরুর জাগরণ বলা হয়। তাঁর বক্তব্যই হল কৃপা। তা নিরন্তর চিন্তা, ভাবনা ও ধ্যানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। অভ্যাসের বা চেষ্টার অভাব থাকলে তাঁর কৃপার প্রবাহ ব্যাহত হয়। যখনই কোনও সদ্‌বৃত্তি, সদ্‌গুণ বা ভাব ভিতরে ফুটে ওঠে তখনই তা সদ্‌গুরুর কৃপা বা আশীর্বাদ বলে মেনে নিতে হয়।

সদ্‌গুরু কেবল জ্ঞানমূর্তি। সদ্‌গুরুর প্রকাশ ছাড়া রূপ, নাম, ভাব, বোধের ধ্যানধারণা সম্ভবপর হয় না। এ-ই হল সদ্‌গুরুর আশীর্বাদ। তারপর আসে তাঁর কৃপা, করুণা ও অনুকম্পা। অনুকম্পা অর্থ যার মাধ্যমে সদ্‌গুরু স্বয়ং নিজেকে ভক্তহৃদয়ে পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করেন।

গুরুর আশীর্বাদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন হয়। তারপর আসে গুরুকৃপা। গুরুর নির্দেশ পালন করে যে ফল পাওয়া যায় তা-ই গুরুকৃপা। গুরু নির্দেশিত কর্মই একমাত্র কর্ম। সে কর্ম শুভাশুভের দ্বারা বিকৃত হয় না। গুরুবোধে কর্ম করলে সে কর্ম নির্বীজ হয়। সেই কর্মের ফল হল কৃপা। গুরু বোধস্বরূপ। তিনি বোধের দ্বারা মন-বুদ্ধির জট খুলে দেন।

কর্ম নির্বীজ হওয়ার পরে যে সিদ্ধি আসে, সেই সিদ্ধি সমর্পণ করার পর গুরু আবার যা দেন তার নাম করুণা। করুণালাভের পর গুরুর মধ্যে মিশে যাবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ জাগে। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব জাগে। তার ফলে চিৎসত্তার মধ্যে ভক্ত নিজেকে পূর্ণাহুতি দেয়। পরিণামে তার মধ্যে গুরুতত্ত্ব সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়।

গুরুতত্ত্ব লাভের পর বা গুরুসাধনের পর আর কোনও তত্ত্বের বা সাধনার প্রয়োজন থাকে না। গুরুতত্ত্ব সাধনা করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আপন আপন পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

গুরুগীতায় দেওয়া আছে—গুরুর চরণসেবা করতে হয়। গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করতে হয়, ইত্যাদি। কেবল ব্যবহারের মাধ্যমে বোধের উৎকর্ষের উপর এর মর্মার্থ অনুভূত হয়। গুরুচরণ রয়েছে সহস্রদলে। সহস্রদল থেকে বোধস্বরূপের দুই ধারা—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নেমে আসে। এই দুই ধারার মূলে মন নিবদ্ধ হলে গুরুর চরণামৃত পান করা যায়। তা এত জটিল ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব যে অসংযত ও অস্থির চঞ্চল চিত্ত

ব্যক্তিদের এই তত্ত্ব দেওয়া নিষেধ। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁর নির্দেশে চলে অন্তরে সত্ত্বগুণ ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ সত্যকে ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এই তত্ত্ব ধীরে ধীরে অবগত হওয়া যায়।

সদ্‌গুরুরা সংসারীদের কাছে রাখতে পারেন না, আবার সংসারীরাও সদ্‌গুরুদের সব সময় মনে রাখতে পারে না। সদ্‌গুরুরা জোর করে কাউকে সংসার থেকে সরিয়ে আনেন না। সংসার বাদ দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা অপূর্ণ থেকে যায়। আবার গুরুনির্দিষ্ট পথ যথাযথ ভাবে অনুসরণ না-করেও যথার্থ সংসারী হওয়া যায় না। সামান্য বৈরাগ্য এলেই সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়াকে কোনও সদ্‌গুরু সমর্থন করেন না। ত্যাগ-বৈরাগ্যকে অন্তরে পোষণ করলে সংসারের ভূত অন্তর থেকে পালিয়ে যায়। সংসার থেকে পালাবার প্রয়োজন হয় না। ভূতগুলি রূপান্তরিত হয়ে ভূতনাথের সঙ্গে মিশে যায়।

সত্যোপলব্ধির পর্যায়গুলি সম্বন্ধে শ্রবণের অভাব থাকলে শুদ্ধবোধের জাগরণ হয় না। সৎপ্রসঙ্গে শ্রবণ অনুরূপ আচরণ না-হলে বোধের বিকাশ হয় না। শ্রুত বস্তুর আচরণকালে দেহেন্দ্রিয়ের বিকার, রোগ-ব্যাধি, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অনেক সময় বেড়ে যায়। সদ্‌গুরু দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ সবগুলিকে ধারণযোগ্য করে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে সাজিয়ে তবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে দেন। দুঃখবেদনার মধ্যে গুরু স্বয়ং বসে শোধন করে দেন। তিনি না-থাকলে দুঃখানুভূতিও অসম্ভব। কারণ সদ্‌গুরু বোধস্বরূপ।

গুরু ব্যক্তিরূপে আর পাঁচজনের মতো হলেও তিনি নৈর্ব্যক্তিক। তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের অতীত। মহাশূন্য হল তাঁর সূক্ষ্মতম দেহ।

গুরু চতুর্বিধ, যথা—মহাগুরু, পরমগুরু, পরাপরমগুরু এবং পরাৎপরমগুরু বা পরমেষ্ঠিগুরু। নিত্য, অখণ্ড, এক গুরুর চতুর্বিধ প্রকাশ।

'মহাগুরু'-রূপে গুরু হলেন মাতাপিতা এবং জাগতিক শিক্ষাগুরু। তাঁরা বস্তুজগতেব পবিচয় এবং সংজ্ঞা ধরিয়ে দেন।

'পরমগুরু'-রূপে গুরু ঈশ্বরের নাম দিয়ে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনপদ্ধতি ধরিয়ে দেন।

'পরাপরমগুরু'-রূপে তিনি জীবনকে মুক্ত করে দেন বা সাধনায় সিদ্ধি এনে দেন।

'পরাৎপরমগুরু' হলেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। তাঁর মহিমার তুলনা নেই।

প্রশ্ন হল ঃ প্রথমজনকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজনকে একজনের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে কী?

উত্তর হল ঃ পরাৎপরম গুরু হলেন অপর তিন গুরুর সংমিশ্রণ। সে রকম পরাপরমগুরু হলেন বাকি দুই গুরুর মিশ্রণ, কিন্তু তাঁর মধ্যে সদ্‌গুরুর পূর্ণ স্বরূপ অব্যক্ত।

আবার প্রশ্ন ঃ সংসারী মানুষ যখন আধ্যাত্মিক পথে যেতে চায় তারা কী ভাবে সদ্‌গুরু লাভ করে?

উত্তর হল ঃ তাঁর প্রকাশের ক্রমধারা অনুযায়ী সদ্‌গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট সময় বাঁধা আছে। প্রথম গুরুর মাধ্যমে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় গুরুর মাধ্যমে তৃতীয় গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু চতুর্থ গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া খুব দুর্লভ। চতুর্থ গুরুর কাছ থেকে ভগবৎতত্ত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরুর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করিয়ে দেন। চতুর্থ গুরুর সাক্ষাৎ যে পায় তার মতো সৌভাগ্য দেবদেবীদেরও হয় না। সাধনভজন না-করেই সে নিত্যলীলার আস্বাদন পায়। কারণ সদ্‌গুরুর আচরণে যা পাওয়া যায়, সাধনভজন করেও তা পাওয়া যায় না।

সদ্‌গুরুর জীবদ্দশায় এই লীলার আস্বাদন বোঝা যায় না। যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেলে যান তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। সংসারে থাকলেও তাঁরা মুক্তপুরুষ। সাধারণ মানুষও যদি পরাৎপরমগুরুর সঙ্গ পায় তারাও মহাপুরুষে পরিণত হয়ে যায়। এর পিছনে যে বিজ্ঞান আছে তার রহস্য সাধারণ লোকে জানে না। কারণ সদ্‌গুরুর সঙ্গ

লাভের পূর্বে কতগুলি স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়—সদ্গুরু ব্যতীত তা আর কেউ জানে না। সেই জন্য দেখা যায় অশিক্ষিত হলেও তার মধ্যে যে বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পায় বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিতেরাও তার কোনও কুলকিনারা পায় না। যেমন লাটু মহারাজ—এক অশিক্ষিত বিহারী গ্রাম্য যুবক হয়েও সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। সদ্গুরু তাঁর মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর বাইরের চেহারার আমূল পরিবর্তনও হয়েছিল। সদ্গুরুর কাছে পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যার সমফল পাওয়া যায়। এমন অনেক গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁদের বর্ণপরিচয় না-থাকলেও বেদজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। যেমন—কবীর, দাদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ।

সদ্গুরু কারওর বাইরের বিদ্যা, শক্তি, অর্থ, নাম, যশ দেখেন না। গুরুর আসন অন্তরে। তবে অন্তরে যদি কামনাবাসনার জঙ্গল বা অজ্ঞানতা থাকে সে ক্ষেত্রে শোধন করে তাঁরা তৈরি করে নেন। এই সময় স্থৈর্য, ধৈর্য হারিয়ে গুরুর কাজে বাধা দিলে কাজে সময় লাগে।

গুরুকে বাদ দিয়ে ইষ্টের দর্শন হয় না। গুরুর দর্শন হলে গুরুর মধ্যে ইষ্টের দর্শন হয়। তাঁর মধ্যে নিজের স্থান কোথায় তা উপলব্ধি হয় সবার শেষে। অনুভূতির প্রথমে গুরুদর্শন হয়, তাঁর মধ্যে হয় ইষ্টমূর্তি দর্শন। গুরুর মধ্যে ইষ্টমূর্তি ফুটে ওঠে।

'দেব, দ্বিজে ও গুরুতে অভেদ যার দৃষ্টি
তারই হয় মুক্তি ও শান্তি।'

মন্ত্র হল দেবদেবী। সুতরাং গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, শক্তি এবং সাধক তত্ত্বত অখণ্ড ও অভেদ। এই সকল মূলত অভিন্ন একতত্ত্ব। গুরুবাক্য ও গুরু অভিন্ন। গুরুবাক্য ও ইষ্ট অভিন্ন। গুরুবাক্য, সাধক এবং ব্রহ্ম অভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ Medical science-এর মাধ্যমে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জানা থাকলে যোগ সাধনায় সুবিধা হয় কী?

উত্তর হল ঃ উভয় বিজ্ঞানের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য আত্মবিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয়ের ভিত্তি ও তার লক্ষণগত প্রকাশবিকাশের ধ্যানধারণা পৃথক পৃথক ভাবধারা অবলম্বনে গঠিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল দেহের বিকারের কারণ নির্ণয় করা ও তার শোধন করা অর্থাৎ সুস্থ জীবন ভোগ করা, নিরাময় জীবন ভোগ করা। যোগের বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। উভয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন, যদিও জীবনকে কেন্দ্র করেই তাদের পরীক্ষা, গবেষণা, সাধনা ও সিদ্ধি নিহিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ ধর্মবেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবেদ ও ধর্মবিজ্ঞান ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে এখানে একটু ইঙ্গিত দেওয়া হল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে অনেকবার বলতে হবে ও শুনতে হবে। এই প্রসঙ্গগুলি দ্বৈতবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অদ্বয়তত্ত্বের বিজ্ঞান অনুশীলনের পক্ষে তা অবান্তর। সংসারদৃষ্টিতে দ্বৈত বিজ্ঞান বা প্রাকৃত বিজ্ঞান স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ব বা ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞানে তা অনাত্মা পদবাচ্য বলে মিথ্যা ও অসত্য।

Medical science এবং spiritual science-এর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। Medical science-এর বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ; কারণ তা কেবল দেহযন্ত্র ও মনস্তত্ত্বের অংশ বিশেষের বিকার ও সাধ্যমত তার শোধন করাকে কেন্দ্র করেই এই বিজ্ঞান তৈরি। মনের চাইতে বড় radio এবং বোধের চাইতে বড় radar আর নেই। মনের সাহায্যে মনের গভীরতম প্রদেশে যাওয়া যায় আবার উপরে ভেসে ওঠা যায়। গুরুস্তবে এর ইঙ্গিতও আছে। সেখানে বলা হয়েছে—গুরুমন্ত্র, গুরুমন্ত্রী। গুরুকে মন্ত্র ও মন্ত্রী উভয় ভাবেই ভাবনা করতে বলা হয়। সেইরূপ গুরুতন্ত্র ও গুরুতন্ত্রী অভিন্ন। গুরুযন্ত্র, গুরুযন্ত্রী—এখানে সাধনা, সাধক, সাধ্য এবং সাধনার ফলের মধ্যে সমভাবে গুরুকে রাখা হয়েছে। সর্বসমর্পণের অর্থ এই ভাবে সিদ্ধ হয়। সদ্গুরুর মাধ্যমে মন্ত্রের সার অংশই পাওয়া যায়।

[১৮।১২।৭৩]

প্রকৃতির ষোড়শ বিকার আত্মবোধের অন্তরায়

প্রকৃতির ষোলোটি বিকার আছে, যথা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও মন। প্রকৃতির এই ষোলোটি বিকারের লয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আত্মবোধ হয় না। বিকারগুলি কার্য-কারণে লীন হয়। লীন হলেই অব্যক্ত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বিকারগুলির কারণ এবং চিৎশক্তি বা আত্মতত্ত্বের পরিচয় সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টায় বা দর্শনশাস্ত্রের তথ্য সংগ্রহ করে অবগত হওয়া যায় না।

নির্দেশ পালনের জন্য সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষগণ শিষ্যকে কখনও জোর করেন না। কারণ তাঁরা জানেন তিনি তো বি-জোড়ে নেই। বি-জোড়[১] থাকলে জোর করতে হয়। ক্রিয়াশক্তি জোর করে। জ্ঞানশক্তি লয় করে নেয়। [২৩।১২।৭৩]

চৈতন্যের প্রকাশক চৈতন্যই

নিজের মধ্যে গুরুকে বা চৈতন্যকে এবং চৈতন্যের মধ্যে বা গুরুর মধ্যে নিজেকে ভাবনা করতে করতে মাটির প্রতিমার মধ্যেও চৈতন্যের স্ফুরণ হয় এবং ইষ্টের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। [২৫।১২।৭৩]

১। বি-জোড়—শব্দটির তাৎপর্য হল বিজ্ঞান যেখানে যুক্ত আছে সেখানে প্রজ্ঞানকে থাকতেই হবে। প্রজ্ঞানের মধ্যে তিনি খেলেন। বিজ্ঞানশূন্য জ্ঞানও হয় না এবং জ্ঞানশূন্য অজ্ঞানও হয় না। 'বি' অর্থে বিশেষ্য বা বিষ্ণু ধরলে তিনি সব সময়েই বর্তমান। সুতরাং সব কিছুর সঙ্গেই তিনি যুক্ত। 'বিজোড়' অর্থে প্রজ্ঞানযুক্ত বিজ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান এবং বিষ্ণুর বক্ষে বিষ্ণুরই প্রকাশ, বিশেষ্যের বক্ষে বিশেষণ নিত্যযুক্ত। বিশেষণশূন্য বিষ্ণু এবং বিষ্ণুশূন্য বিশেষণ সম্ভব নয়। 'বিজোড়' অর্থে এখানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিৎতত্ত্বের পরিচয়

'চিদাত্মগুরু সবার মাঝে বোধস্বরূপে নিত্য বিরাজে
চিতিরূপে স্বয়ং সে যে মন-বুদ্ধির চিন্তায় ও কাজে
স্বভাব আনন্দে খেলে নিজে।।
সোঽহং বোধে হংসবীজে জ্ঞানী ভক্ত তাঁরে সদাই ভজে।
অজ্ঞানবোধে যারা আছে তারাও চলে স্ববোধের মাঝে।।
চৈতন্য ছাড়া কারও পরিচয় জীবনেতে সিদ্ধ কভু নাহি হয়
অজ্ঞানের বোধ জ্ঞানে বিরাজে জানে তাহা চৈতন্য নিজে
অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান সাজে সর্বভূতে আত্মগুরুই আছে।।'

গোলবারান্দায় নিজ আসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কণ্ঠ থেকে ভাবস্থ অবস্থায় উপরোক্ত গানটি সদ্য উদ্গীত হল। পূর্বে গানটি কখনও শোনা যায়নি। গানের শেষে গানটির তাৎপর্য বলতে গিয়ে তিনি বললেন— যত শব্দ, যত রূপ, যত ভাব, সবই সচ্চিদানন্দের পরিচয়। তাঁর পরিচয় জানা হলে জানার আর কিছু বাকি থাকে না। অতএব গুরুভজন করাই সব সাধনার সার। গুরুতত্ত্বের উপরে আর কোনও তত্ত্ব নেই। তা-ই হল পরমাত্মার পরিচয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সব তত্ত্ব এই গুরুবিষয়ক তত্ত্বের অন্তর্গত। পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বরের নামই সচ্চিদানন্দগুরু। তবে গুরুর স্তরভেদ আছে। মানুষ আপন গুরুর মাধ্যমে এক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

লঘুর পরিণাম প্রাপ্তি হয় গুরুতে। 'গুরু' শব্দের অর্থ বিরাট, অনন্ত, অসীম ও অখণ্ড। গুরুর সাহায্যে সসীমবোধ, অনন্ত অসীমবোধে পরিণত হয়। একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে পরিশেষে সসীম জীবনবোধ পূর্ণ বোধে মিশে যায়। বোধ ছাড়া কোনও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

গুরুভক্ত আপন গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ধ্যান করে। গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মিশে আছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল—যে বোধসমষ্টি দ্বারা যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও সংহার ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই বোধসমষ্টির নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই তিন বোধের সমষ্টি নিয়েই পরমাত্মা স্বয়ং। তাঁর নামই চিৎতত্ত্ব। চিৎতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব এবং মাতৃতত্ত্ব এক বোধার্থক। সাধনার প্রথম স্তরে তা বোধগম্য হয় না। শ্রবণের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের বোধ অন্তরে গেঁথে যায়। তখন সাধনা আপনা থেকেই হয়। যেমন কঠিন বা নীরস ইটপাথরে পতিত বট গাছের সূক্ষ্ম বীজ থেকে বিরাট আকারের বট গাছের জন্ম হয়, সে রকম তামসিক ও রাজসিক ভাবাপন্ন মলিন ও কঠিন হৃদয়ে গুরুপ্রদত্ত পরমাত্মতত্ত্বের বীজ ও বিষয় যথাকালে বোধিবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্য গুরু সবার অলক্ষ্যে বোধের বীজ ছড়িয়ে অন্তরালে সরে থাকেন। তিনি জানেন এই বীজ নিয়ে যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক, কালে এই বীজ ফলবন্ত বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। যথার্থ ভাবে সত্যের বিষয় শ্রবণ করা থাকলে মাভৈঃ বাণী অন্তরে নিত্য উদ্গীত হয়।

গুরুশক্তির মাধ্যমে গ্রন্থিভেদ সিদ্ধ হয়

স্থূল স্তর থেকে সূক্ষ্ম স্তরে যখন বোধের বিকাশ হতে থাকে সে সময় নানাবিধ বিকার যা রোগ, পীড়া

প্রভৃতি রূপে পরিচিত, তা অঙ্গাঙ্গি ভাবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রমপর্যায়ে ত্রিগুণের তিন গ্রন্থিভেদের সময় বোধের ত্রিবিধ বিকার দেহে নানা রকম ব্যাধি, পীড়া ও কষ্ট রূপে দেখা দেয়।

নাভিগ্রন্থি থেকে বোধ যখন হৃদয়গ্রন্থিতে ওঠে তখন তমোগুণের অন্তর্গত বোধের বিকার দেহে রোগ, ব্যাধি ও বেদন রূপে ফুটে ওঠে। হৃদয়গ্রন্থি ভেদের সময় রজোগুণের অন্তর্গত বোধের বিকার মানসিক দুঃখ-কষ্ট, ভাবনাচিন্তা ও অশান্তি রূপে দেখা দেয়। রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সময় নানা রকম রূপের দর্শন, বিভূতি প্রভৃতি আসে। এগুলিকে সত্ত্বগুণের বিকার বলে। এই তিন গ্রন্থিকে মতান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কেউ কেউ ব্রহ্মগ্রন্থিকে রাজসিক বন্ধন, বিষ্ণুগ্রন্থিকে সাত্ত্বিক বন্ধন এবং রুদ্রগ্রন্থিকে তামসিক বন্ধন বলেন। আবার কেউ কেউ ব্রহ্মগ্রন্থিকে সাত্ত্বিক বন্ধন, বিষ্ণুগ্রন্থিকে রাজসিক বন্ধন এবং রুদ্রগ্রন্থিকে তামসিক বন্ধন বলেন। আবার কোনও কোনও মতে ব্রহ্মগ্রন্থিকে তামসিক বন্ধন, বিষ্ণুগ্রন্থিকে সাত্ত্বিক বন্ধন এবং রুদ্রগ্রন্থিকে রাজসিক বন্ধন বলা হয়। মেঘের খেলার মতো সব স্তরের বিকারই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং কোনওটিকেই গুরুত্ব দিতে নেই।

সর্বস্তরের বিকার অতিক্রম করার জন্য গুরুশক্তি সাহায্য করে। সদ্‌গুরু অন্তরালে থেকে অন্তরের অন্তরায়গুলি দূর করে দেন। এ-ই তাঁর বিশেষত্ব। বাইরে থেকে তাঁর মহিমা বোঝার উপায় নেই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান বা বিজ্ঞান তাঁর প্রকাশমাত্র। তাঁর অজ্ঞাত কিছু নেই। সদসৎ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি দ্বৈত প্রতীতি তাঁর নেই কারণ সদ্‌গুরু নিত্য সমবোধে প্রতিষ্ঠিত।

আত্মগুরুর পরিচয় ও তাঁর মহিমা

আত্মাই হলেন গুরু; সুতরাং আত্মগুরুর উপরে অন্য আর কেউ নেই। আত্মগুরু প্রজ্ঞানস্বরূপ। তিনি স্বয়ংপূর্ণ, স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ। হৃদয়াকাশে তিনি নিত্যবর্তমান। তাঁর স্বরূপই চিদাকাশ। এই চিদাকাশ অখণ্ড ভূমা। সুতরাং চিদাকাশস্বরূপ আত্মগুরু স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর প্রকাশেব অন্তরায় হল অহংকার, অভিমান, কামনাবাসনা ও বিষয়াসক্তি। এগুলির দ্বারাই চিত্ত অশুদ্ধ হয়; তার ফলে আত্মগুরুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বিঘ্ন হয়। গুরুর আনুগত্য মেনে চললে চিত্তের এই সব মল অপসারিত হয়; অর্থাৎ অহংকার, অভিমান, কামনাবাসনা ও ভোগাসক্তির মল সরে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখনই আত্মগুরুর প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ হয়।

আত্মগুরুর প্রকাশেই আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়; সুতরাং গুরুভজন অর্থই আত্মোপাসনা বা আত্মানুসন্ধান। গুরুপ্রীতি অর্থ আত্মপ্রীতি। গুরুনিষ্ঠা অর্থ আত্মনিষ্ঠা। গুরুভজন অর্থ আত্মভজন। গুরুভক্তি ও গুরুজ্ঞানই হল আত্মভক্তি ও আত্মজ্ঞান। ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা অভিন্ন তত্ত্ব। এঁদের যে কোনও একটির দ্বারা অন্য দু'টিকে বোঝায়। তা গুরুকৃপায় ও আত্মকৃপায় সিদ্ধ হয়।

আত্মজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বর ও গুরুর সঙ্গ হয় এবং সমবোধে, একবোধে বা আপনবোধে প্রতিষ্ঠা হয়। এরই নাম পরাসিদ্ধি। শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ প্রেম আপনবোধেরই নামান্তর মাত্র। তত্ত্বসিদ্ধির অর্থ হল আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা। অখণ্ড সমবোধের বা আপনবোধের মাধ্যমে তা সিদ্ধ হয়। এর-ই নামান্তর হল স্বানুভূতি। গুরু-আত্মা-ঈশ্বরকে আত্মারাম, প্রাণারাম, স্বানুভবদেব বলে। স্বানুভবদেবের অনুভূতি হল স্বানুভূতি। এই প্রসঙ্গে যখন যা বলা হয়েছে তা স্বানুভূতির দৃষ্টিতেই বলা হয়েছে।

আত্মার বিজ্ঞান, গুরু, ইষ্ট ও ঈশ্বরাত্মার বিজ্ঞান বলতে স্বানুভূতির বিজ্ঞানকেই বলা হয়েছে। এ কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। স্বানুভূতির বিজ্ঞানকে আবার অদ্বয়বোধের বিজ্ঞান বলা হয়। একে অদ্বৈতের বিজ্ঞানও বলা হয়। স্বানুভবসিদ্ধ আত্মজ্ঞানই হল অদ্বৈত জ্ঞান। তা যুক্তিতর্ক দ্বারা সিদ্ধ নয়, কেবল অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ। অপরোক্ষানুভূতি হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

দ্বৈত জ্ঞান দ্বারা এই অদ্বৈত জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ধারণা করা যায় না। সেই জন্য আত্মজ্ঞান হল নিরপেক্ষ জ্ঞান। এই নিরপেক্ষ জ্ঞান সর্বতোভাবে দ্বৈত ভাববর্জিত সর্বভাববোধের একমাত্র নিত্য অধিষ্ঠান। তা বাক্যমনাতীত বলে নিত্যতুরীয় ও তুরীয়াতীত। সেই জন্যই আত্মজ্ঞগুরুর কৃপায় শরণাগত জিজ্ঞাসু ভক্ত স্বানুভূতির বিজ্ঞান লাভ করে স্বানুভবসিদ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে আর অন্য কোনও সিদ্ধান্ত ফলপ্রদ নয়।

সাধনার ক্ষেত্রে বৃহৎ ও মহতের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়। তাঁকে পাবার জন্য অন্তরে আবেগপূর্ণ যে আবেদন-নিবেদন তাকেই ব্যাকুলতা বলে। আবেদন জানাতে জানাতে অন্তঃসত্তার অভিব্যক্তি সহজ হয়। কারণ শিষ্যের আবেদন-নিবেদনের মধ্যে গুরু তাকে এমন ভাবে প্রস্তুত করে নেন যা সাধনভজনের মাধ্যমে হওয়া বহু আয়াসসাধ্য। সেই জন্য আধ্যাত্মিক পথে শরণাগতির ভাবকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাব বলে অনেকেই মনে করেন। শাস্ত্রজ্ঞান না-থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু ব্যাকুলতা ও শরণাগতির অভাবে আন্তরিক আত্মসমর্পণযোগ সিদ্ধ হয় না। প্রাণের টান বা অকৃত্রিম আবেদন থাকা প্রয়োজন। অন্তরপুরুষ সেই আবেদন সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকেন। ব্যাকুলতা অনুসারে সময় মতো তিনিই বাইরের গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

চিদাত্মগুরু অখণ্ড বোধস্বরূপ। সুতরাং চিদাত্মারূপী সদ্‌গুরুর মধ্যে সর্বস্তরের গুরুভাবই সংযুক্ত থাকে। বাইরের গুরু ও চিদাত্মগুরু একই। গুরুর বাইরের দেহ শুধু আবরণ বা উপাধিমাত্র। অখণ্ড গুরুমূর্তির পরিচয় হল চতুর্বর্গ রূপ-নাম-ভাব-বোধের সমাহার।

সাধনার ত্রুটিগুলি যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না-করে, সেই জন্য নিরন্তর সৎসঙ্গ শ্রবণের প্রয়োজন। ব্যক্তিরূপে সদ্‌গুরুর দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ। তিনি সবার সব জেনেও না-জানার ও না-বোঝার ভান করেন। জানি, পারি, বুঝি বললে তাঁকে শিষ্যদের দ্বারা উত্যক্ত ও পীড়িত হতে হয়; কারণ সাধারণ মানুষ অতশত বুঝতে চায় না। তাদের শুধু চাওয়া-পাওয়ার দিকেই লক্ষ্য। যোগ্যতার অভাব থাকা সত্ত্বেও ছোট শিশু যেমন মা-বাবার কাছে কোনও জিনিস পাবার জন্য আবদার করে বা কান্নাকাটি করে, সেইরূপ ভক্তশিষ্যও আপন গুরু-ইষ্টের কাছে অনেক সময় যোগ্যতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কাম্য বা লভ্য বস্তুর জন্য আবদার ও আবেদন নিবেদন করে।

রূপ ছাড়া যে গুরুকে ধরা যায় না, তা নয়। সাধারণের জন্য গুরুর স্থূল রূপের প্রয়োজন হয়। গুরুর স্থূল রূপকে ব্যবহার করার কতগুলি বোধ গুরু দিয়ে দেন। গুরু তাঁর স্বরূপকে ব্যবহার করার বিজ্ঞান দিয়ে যান। তাঁর সেই নির্দেশ অনুরূপ ব্যবহার করার ফলে তাদের মধ্যেও গুরুবোধ জেগে ওঠে।

এই জন্য বলা হয় যে গুরুর সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ হল পতির সঙ্গে সতীনারীর যে সম্বন্ধ সে রকম। সতীনারীর কাছে তার পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রশংসা ভাল লাগে না। সে রকম ভক্তও আপন গুরুকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। কারণ সে জানে যে গুরু সঙ্গে থাকলে অন্যান্য দেবদেবী রুষ্ট হলেও কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতারা রুষ্ট হলে আত্মগুরু রক্ষা করতে পারেন কিন্তু আত্মগুরু রুষ্ট হলে শিবাদি দেবতারাও রক্ষা করতে পারেন না।

একমাত্র সদ্‌গুরু ও মাতাপিতা সর্বান্তঃকরণে চান যে তাঁদের ভক্তশিষ্য ও সন্তান তাঁদের অপেক্ষাও অধিকতর উন্নত ও মহৎ হোক। সদ্‌গুরু চান অপর আরেকজনও সদ্‌গুরু হোক। সমপর্যায়ের একজন এলে আনন্দ হয়। কারণ সমবোধে আছে আনন্দ কিন্তু বিষমবোধে আছে দ্বন্দ্ব ও নিরানন্দ। অনেক বিচার করেই মা-বাবাকে গুরুর স্থান দেওয়া হয়েছে।

সকল গুরুই অখণ্ড এক গুরুর অন্তর্ভুক্ত

যিনি সৎ-অসৎ, পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবে অবহিত তিনিই সদ্‌গুরু। দ্বৈততত্ত্বের কোনও একটিমাত্র পৃথক সাধনা হয় না এবং তার পূর্ণতার পরিচয় লাভ করা যায় না। গুরুপ্রদত্ত পদ্ধতি

অনুযায়ী আপন আপন গুরুর নামকীর্তন করলে পরম গুরুরই ভজন ও নামকীর্তন করা হয় এবং আপন গুরুর মধ্যে পরম ইষ্টকেই পাওয়া যায়।

দীক্ষিতদের জন্য নির্দেশ হল—আপন সাধনপদ্ধতি ঠিক রেখে অর্থাৎ আপন সাধনপদ্ধতির অনুকূলে যা পাওয়া যায় তা গ্রহণ করে প্রতিকূলের থেকে সরে থাকতে হয়। আত্মগুরুর পরিচয় সব সময় এক। সকল গুরুই অখণ্ড এক পরমাত্মগুরুর অন্তর্ভুক্ত ও তাঁর প্রতিনিধি। অর্থাৎ অখণ্ড এক পরমাত্মগুরুই নিত্যবিদ্যমান। এক গুরুতত্ত্বের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটেছে তার মাধ্যমে প্রত্যেক গুরু আপন আপন সন্তানের জন্য তেজ, বীর্য, শক্তি ব্যবহার করেন। সদ্‌গুরুর কর্মপদ্ধতি সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। সাধারণ মানুষ না-বুঝে অনেক সময় এ কথা অনুমান করে। কিন্তু যারা অনুভব করে তারা প্রকৃত পরিচয় পায়। বোধের অনুভূতি বোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে। অনুমান হয় মনে; যদিও মন এক বোধস্বরূপের অন্তর্গত প্রকাশমাধ্যম মাত্র। কিন্তু তা শুদ্ধ হলে স্ববোধের সহায়ক, আবার অশুদ্ধ হলে অন্তরায় হয়। [৬।১।৭৪]

সদ্‌গুরুর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হলে সব দেবদেবীর কৃপা আপনা থেকেই মেলে। কারণ দেবদেবীরাও সদ্‌গুরুকে তুষ্ট করে চলে। সদ্‌গুরু হলেন জ্ঞানস্বরূপ। দেবদেবীরা তাঁর অন্তর্গত বোধের বৃত্তির সমষ্টি। [৮।১।৭৪]

সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য অপরিমেয়

সদ্‌গুরুর উপরে গুরুত্ব দেবার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কোনও বিদ্যাই গুরু ছাড়া লাভ করা যায় না। ধর্মতত্ত্বের যথার্থ ব্যবহারবিজ্ঞান যিনি পরিপূর্ণ ভাবে জানেন তিনিই সদ্‌গুরু।

সদ্‌গুরুগণ কর্মবিজ্ঞানের রহস্য সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকেন বলেই মুক্তিলাভের পর তাঁরা সতত কর্মে যুক্ত থাকেন। সর্বকর্ম করেও তাঁরা জানেন যে তাঁরা কিছুই করেন না। সাধারণ লোক কিছু না-করেও মনে করে যে তারা অনেক কিছু করে।

সদ্‌গুরুদের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অকর্তাবোধে স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম হতে থাকে। কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা তাঁরা কখনওই বিব্রতবোধ করেন না এবং কর্মের কোনও প্রতিক্রিয়াও তাঁদের থাকে না। এ-ই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

সদ্‌গুরুগণ সর্বদা সমত্বে থাকেন বলে মূলের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র কখনওই ছিন্ন হয় না। সত্যের মূল বা গোড়াকে ধরে থাকলে যে কোনও মহাপুরুষের সঙ্গ থেকেই আপন গুরুর যথার্থ ভাব ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করা সহজ হয়। মনকে মূলের সঙ্গে যুক্ত রাখলে বিশেষ কোনও বস্তু বা কর্ম দ্বারা মন বিব্রত বা বিভ্রান্ত হয় না। গুরুর ভাব এসে যেন ফিরে না-যায় তার জন্য মনের একটা দ্বার সর্বদাই যেন উন্মুক্ত থাকে। মন যে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তার প্রতিক্রিয়া সামলাবার ক্ষমতা গুরুশক্তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তির নেই। ব্যষ্টি জীবনের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অসিদ্ধ। গুরু-আত্মা-ব্রহ্মই হলেন জীবজগতের একমাত্র কর্তা, প্রভু ও মালিক।

সাত্ত্বিক অহংকারে সদ্‌গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্যযোগ হয়। সদ্‌গুরু সাত্ত্বিক অহংকারযুক্ত থেকে অপরকে শিক্ষা দেন। সদ্‌গুরু হলেন স্বয়ং অহংদেব। সদ্‌গুরু অহংকার ব্যবহার করেন ত্বংকারের মাধ্যমে।

সদ্‌গুরু হলেন শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-ভক্তি ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। তাঁর আচরণে অপরে যেন বিভ্রান্ত না-হয় সে বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকেন। তাঁদের আচরণ অতি বিনীত, নম্র ও মধুরভাবযুক্ত। কিন্তু সদ্‌গুরু রুষ্ট হলে তাঁর তেজকে সম্বরণ করা বা দমন করার শক্তি দেবতাদেরও নেই।

সদ্‌গুরুচরণ থেকে মন সরে গেলেই শান্ত বোধের অভাব হয় এবং অশান্ত বোধের প্রভাব বাড়ে। বৈচিত্র্যরূপে যা দেখা যায় তার মধ্যে গুরুর একটি অংশ কারণ এবং আরেকটি অংশ কার্যরূপে ক্রিয়া করে। বিশ্ব হল কার্য-কারণের যুগ্ম রূপ।

সদ্‌গুরুর সঙ্গে সব সময় বোধে যুক্ত থাকতে হয়। সদ্‌গুরুকে পৃথক করে দূরে সরিয়ে রাখলে ঐশ্বর্যের সাধনা হয়। ঐশ্বর্যের সাধনায় উদয়-অস্ত আছে, কিন্তু মাধুর্যের সাধনায় তা নেই।

'গুরু' শব্দের 'গু' মানে অন্ধকার, বৈচিত্র্য, নানাত্ব, মায়া, মিথ্যা এবং 'রু' মানে এগুলির বিপরীত অর্থাৎ তেজস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ, একত্ব, শান্ত, সমাহিত। দ্বিতীয় অর্থ, 'গু' মানে গুণাতীত, 'রু' মানে রূপাতীত। যিনি গুণকে প্রকাশ করে, গুণের মধ্যে থেকেও গুণাতীত এবং যিনি রূপের মধ্যে থেকেও রূপাতীত তিনিই হলেন সদ্‌গুরু। 'গু'-তে এবং 'রু'-তে সমভাবে সদ্‌গুরু প্রতিষ্ঠিত বলে গুরুর মহিমা সর্বোত্তম।

ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সমন্বয়ে হয় সদ্‌গুরুব পরিচয়। ক্রিয়া ছাড়া সদ্‌গুরুকে ধরা যায় না। আবার জ্ঞান ছাড়াও সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় না। এই উভয় ভাবের মিলনক্ষেত্র হল দ্বিদল পদ্ম বা আজ্ঞাচক্র। তাই সদ্‌গুরুর ধ্যান শুরু হয় আজ্ঞাচক্রে।

সদ্‌গুরুর কোনও জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নেই। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপের ঘনীভূত মূর্তি। স্বেচ্ছায় তিনি দেহ-পোশাক ধারণ করেন। দেহ-ইন্দ্রিয় ধারণ করেও তিনি দেহাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত। দেহেন্দ্রিয় ছাড়াও তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে কাজ করেন। সব ছেড়ে দিয়েও ত্যাগীরা অনেক সময় স্থির থাকতে পারেন না। অথচ সদ্‌গুরুগণ সর্বকর্ম করেও আত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভাবের সমন্বয় অবতারদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। [১৩।১।৭৪]

গুরুতত্ত্বই হল পরমতত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব

নিজের সঙ্গে নিজের যে সম্বন্ধ তাকেই বলা হয় বোধের সঙ্গে বোধের খেলা। নিজের একটা অংশ বিশ্বরূপ ধারণ করেছে এবং খেলার জন্য বিশ্ব নিজেকে সসীম দেহের মধ্যে আবদ্ধ করেছে। তাই আপন হৃদয়ে জীবাত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং মস্তকে পাওয়া যায় বৃহৎ অংশ পরমাত্মাকে। এই উভয়ের সংযুক্ত রূপ হল সত্যের পূর্ণ স্বরূপ। এই উভয় পদ হল গুরুপদ বা গুরুর স্বরূপ।

প্রত্যেকের বৃহত্তম ও পূর্ণতম অংশের নাম সদ্‌গুরু। সুতরাং তার নিজের বৃহত্তম অংশের পরিচয় লাভের জন্যই সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। তবে বৃহত্তম অংশ স্বয়ং কৃপা করলে অন্তরেই গুরুবোধের জাগরণ হয় এবং আত্মস্বরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন সর্বাত্মক ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাইরের গুরুর তাহলে প্রয়োজন কেন হয়, যখন গুরু প্রত্যেকের ভিতরেই আছেন। এর উত্তর হল—প্রত্যেকের হৃদয়ে যিনি আছেন তিনি সর্বব্যাপী। হৃদয়ের অর্থই হল সর্বব্যাপক সত্তা যিনি হৃত বস্তু বা 'ভুলে যাওয়া'-রূপ বিকারকে নিজেই স্বাভাবিক ভাবে শোধন করে দেন। কিন্তু সাধারণ জীবের এই আত্মগুরুর স্মৃতি অজ্ঞানবশত আবৃত থাকে বলে তার বাইরের অনুভবসিদ্ধ গুরুর দরকার হয়। তাঁর কাছে অন্তর ও বাইরের, নিকট ও দূরের কোনও ব্যবধান সত্য নয়। সর্বব্যাপী অখণ্ড এক বোধসত্তারূপ আত্মাই হলেন গুরু। তাঁকে 'কেবল জ্ঞানমূর্তি'-রূপে গুরুভজনে ভজনা করা হয়। এরূপ ভজন দ্বারা আত্মগুরুর স্ফূর্তি হয়; অর্থাৎ আত্মবোধের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মজ্ঞান লাভের এ-ই হল সর্বোত্তম বিজ্ঞান। গুরুর প্রকাশ অর্থাৎ আত্মার প্রকাশের বৈশিষ্ট্যই হল সমবোধ, একবোধ ও আপনবোধ। তা-ই হল শুদ্ধ, পূর্ণ, বোধসত্তারূপ আত্মার বৈশিষ্ট্য। আত্মার বৈশিষ্ট্যই গুরুর বৈশিষ্ট্য এবং গুরুর বৈশিষ্ট্যই হল আত্মার বৈশিষ্ট্য; কারণ গুরুই আত্মা এবং আত্মাই গুরু। এই কথা বা আত্মস্মৃতি স্বভাবের দোষে যখন ভুলে আবৃত হয় ও

বিস্মৃত হয় তখনই হয় আত্মার জীবভাব। আবার আত্মবোধের অনুসন্ধান তথা বোধস্বরূপ গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর ভজন দ্বারা অর্থাৎ তার সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা আত্মবোধের স্মৃতি জাগ্রত হয় ও আত্মবোধে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। গুরুনিষ্ঠা ও আত্মনিষ্ঠার এ-ই হল বৈশিষ্ট্য।

অন্তঃসত্তার আকর্ষণই গুরুর আকর্ষণ। অন্তঃসত্তাই বাইরে গুরুরূপে ফুটে ওঠে। অন্তরের প্রয়োজন অনুসারে অন্তঃসত্তা গুরুবরণ করে। প্রয়োজন না-থাকলে বাইরে গুরুবরণ করে না।

সদ্গুরুকে ব্যক্তি হিসাবে দেখলে প্রাকৃত দোষ আসে। যতদিন শিষ্যের স্বরূপের অনুভূতি না-হয় ততদিন তার আশ্রয়দাতা সদ্গুরুকে দেহধারণ করে আসতে হয় বারবার। সাধনার শেষে অন্তর শুদ্ধ হলে শিষ্য গুরুর বা ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধ খুঁজে পায়।

গুরুতত্ত্ব ও গুরুশক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অভিনব

যে শক্তি সর্বদা অখণ্ড বোধের সমতা ও তার গুরুত্ব রক্ষা করে তাকেই গুরুশক্তি বলে। গুরুশক্তি দেবশক্তি অপেক্ষাও বড়। গুরুতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। গুরুতত্ত্ব অতীব জটিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও নিরন্তর গুরুভজন করেই আপন আপন দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। দেবদেবীরা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা গুরুকে উপাসনা না-করে পারে না।

গুরুতত্ত্ব হল পরমাত্মতত্ত্ব যা সর্বতত্ত্বের সার। গুরুতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। গুরুকৃপা হল সর্বোত্তম কৃপা। গুরু হলেন মোক্ষস্বরূপ। তিনি সর্বাতীত হয়েও সর্বাত্মক। গুরু রুষ্ট হলে চারণ, গন্ধর্ব, মাতৃকাশক্তি, সিদ্ধপুরুষ, মুনি, ঋষি প্রভৃতি কারওর ক্ষমতা নেই তাঁকে তুষ্ট করার।

গুরুসেবা ও পূজার বিধান

আপন আপন গুরুকে শিব-বিষ্ণুবোধে যে ধ্যান করে, সে-ই প্রকৃত গুরুভক্ত। আপন আপন গুরুর মহিমা যে কীর্তন করে সে-ই সর্বোত্তম নাম করে।

গুরুপূজার বা মাতৃপূজার বা দেবপূজার বিধান হল দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ও তাদের ক্রিয়াকে বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে গুরুকে বা মাকে বা ইষ্টকে বসিয়ে গুরুভাব বা মাতৃভাব বা দেবভাব জাগ্রত করে নিতে হয়। তারপর বিশ্বদেহের মধ্যে নিজের দেহ এবং নিজের দেহের মধ্যে বিশ্বদেহ ভাবনার দ্বারা বিশ্বাত্মক আদিদেবের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য ধ্যান করা হয়। তার ফলে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে অভেদে মিলন হয়। এ-ই হল ব্যষ্টি আত্মার মুক্তির অন্যতম উপায় এবং সমষ্টি আত্মার সঙ্গে ব্যষ্টি আত্মার নিত্য, অভেদ ও অভিন্ন সম্বন্ধ স্ববোধে আবিষ্কার করা।

গুরুপূজার তাৎপর্য

তত্ত্বত গুরুই গুরুকে পূজা করেন—এই বোধে পূজা করতে হয়। তত্ত্বস্বরূপ গুরুকে নিজের থেকে পৃথক করে এবং নিজেকে গুরুর থেকে পৃথক করে রেখে গুরুপূজা সিদ্ধ হয় না।

সদ্গুরু শিষ্যকে পূর্ণ বোধে স্থিত করতে চান। গুরুকে পূর্ণ করে সব সমর্পণ করে দিলে গুরু তাকে পূর্ণতা দেন। গুরু পূর্ণতার প্রকাশক। কিন্তু কেউ নিজেকে পূর্ণের কাছে পূর্ণ করে সমর্পণ করে দিতে না-চাইলে বা নিজে পূর্ণ হতে না-চাইলে অন্তরে পূর্ণতা জাগে না। অর্থাৎ অন্তরে পূর্ণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ণের মধ্যে বাস করেও অজ্ঞানের প্রভাবে সসীমবোধের জন্য পূর্ণতার উপলব্ধি হয় না। পূর্ণ করে স্বভাবকে গুরুপদে সমর্পণ করে দিলে স্ববোধরূপী আত্মগুরু স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়ে পড়েন।

পরাৎপরমগুরুর স্বরূপের পরিচয়

পরমগুরুর সঙ্গে মিশে যাবার জন্য যা প্রয়োজন তা না-পেলে গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় না। পরমগুরুর পরিচয় হল তিনি ত্রিনেত্র বিহীন কিন্তু সর্বদিকেই তাঁর চক্ষু। শিবের ত্রিনয়ন; কিন্তু পরমশিবের সর্বত্র নয়ন। বিষ্ণুর চতুর্বাহু কিন্তু মহাবিষ্ণু বা পরমগুরু অ-চতুর্বাহু। অর্থাৎ সর্বতোবাহু, সর্বতোপাদ, সর্বতোঅক্ষিশিরমুখ। ব্রহ্মার চতুর্বদন আর আত্মগুরুর হল অ-চতুর্বদন অর্থাৎ সর্বতোমুখ, সর্বস্থানেই তাঁর সর্ব ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ চোখ দিয়ে তিনি দেখেন ও শোনেন এবং কান দিয়ে তিনি শোনেন ও দেখেন ইত্যাদি। এ-ই হল পরাৎপরমগুরুর স্বরূপের পরিচয়।

সর্বতত্ত্বের সার গুরুতত্ত্বের মর্মার্থ

'গু' এবং 'রু' এই দু'টি শব্দ দিয়ে সব শাস্ত্র, সব তত্ত্ব এবং সমস্ত জগৎ বিধৃত আছে। বেদ বা শ্রুতি প্রভৃতি সব শাস্ত্রের সার হল গুরুবোধ। গুরুতত্ত্ব সারতত্ত্ব, গুরুরূপ অখণ্ড ভূমারূপ, গুরুর বাক্য একমাত্র সার বাক্য, গুরুপদ হল একমাত্র সম্পদ।

গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয় এবং সব দেবতার পূজা হয় সে রকম গুরুমন্ত্রে গুরুর পূজা হয় এবং সব দেবতারও পূজা হয়। 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ হল জ্ঞানগঙ্গা বা বোধগঙ্গা। অন্তরে বোধের অভিব্যক্তি মাত্রই গুরুচরণ।

গুরুবন্দনার রহস্য

অন্তরে-বাইরে এই বোধরূপী বা চিদাত্মারূপী গুরু ছাড়া কেউ নেই। গুরুবন্দনার নিয়ম হল—গুরুকে পূজ্য-পূজকরূপে অন্তরের সব বোধের বৃত্তির মধ্যে ভাবনা করতে হয়। গুরু রূপে-নামে-ভাবে-বোধে, অন্তরে-বাইরে, পূর্বে-পশ্চিমে, অধঃ-উর্ধ্বে, সম্মুখে-পশ্চাতে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে-প্রাণে-মনে সর্বত্রই বিরাজিত। এই ভাবনা করলে অন্য কথা মনে আসে না। মন তলিয়ে যায়। অন্য কথা না-থাকলে জগৎও লয় হয়ে যায়।

কেবল গুরু বা আত্মা আছেন, জগৎ নেই—এই বোধ এলে তবেই তার গুরুকে পাওয়া এবং গুরুভজন সার্থক হয়।

শ্রীগুরুপদই পরমপদ। তাঁকে আজীবন স্মরণে রাখতে হয়। শুধু দুঃখকষ্টের দিনে নয়, চরম সুখে বা পরমানন্দের দিনেও সমভাবে তাঁকে স্মরণে রাখতে হয়, তাহলে সত্যসম্পদের সন্ধান মেলে। সব কিছুর মধ্যে তাঁকে মানলে ইন্দ্রিয়েব শোধন হয়।

পূর্ণতা না-আসার কারণ হল যাঁর সাধনা করা হয় তাঁকে বিষয়বস্তুর চেয়েও ছোট করে ধরা হয়। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বাপেক্ষা মহান, সর্বজ্ঞ তাঁকে সব কিছুর মধ্যে মানা হয় না। এই জন্য বলা হয় যে শাস্ত্রের প্রচলিত বচন 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ বা মমাত্মা সর্বভূতাত্মা' বলেও বৃহত্তর অর্থে বিপরীত ভাবে যুগোপযোগী করে বলা উচিত—'শ্রীজগন্নাথঃ মন্নাথো শ্রীজগদ্‌গুরু মদ্‌গুরুঃ বা সর্বভূতাত্মা মমাত্মা'। এই ভাবনা করলে মন্ত্রের মর্মার্থ ব্যাপক ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন বিভিন্ন গুরুর মধ্যে ভেদদৃষ্টি আর থাকে না। [২০।১।৭৪]

গুরুর সান্নিধ্যে থেকে ধ্যান করা বিধেয়

ধ্যান সর্বদা গুরুর নির্দেশে এবং গুরুর সান্নিধ্যে করতে হয়। গুরু কাছে থাকলে তিনি শিক্ষার্থীর সুবিধা-অসুবিধা বা প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। দূরে থাকলে তাঁর নির্দেশ শিষ্য সব সময় বুঝতে পারে

না। যদিও গুরু একজন বলেই স্বীকার করা হয়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিষ্যের মান ও চাহিদা অনুসারে সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ড ভূমা এক গুরুর বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক গুরুর কাজ এবং তাঁর অনুগামীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা থাকে। [২৯।১।৭৪]

আত্মদর্শনের বা গুরুদর্শনের তাৎপর্য

নিজের ভিতরে ইষ্টকে জানা ও দেখা হল আত্মদর্শন এবং গুরুর মধ্যে নিজেকে জানা ও দেখা হল গুরুদর্শন। নিজের ভিতরে নিজেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই দেহই সব নয়। সমস্ত পৃথিবীই হল আমার দেহ। তারপর পৃথিবীও লয় হয়ে যায় এবং তখন যিনি থাকেন তাঁর নামই পরমাত্মা। তিনিই জীবাত্মা সেজে খেলেন।

সদ্‌গুরু ও জ্ঞানী-গুণীর সাথে থাকলে তাঁদের প্রভাব, গুণের স্পন্দন অলক্ষ্যে অযাচিত ভাবে আপনিই জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে ফুটে ওঠে। তাঁদের কাছে চাইতে হয় না। যেমন আগুনের ধারে থাকলে আগুনের তাপ সহজেই পাওয়া যায়, চাইতে হয় না, সে রকম সৎ-এর কাছে থাকলেও সৎ-এর প্রভাব আপনিই আসে, চাইতে হয় না। [৩।২।৭৪]

দীক্ষার তাৎপর্য

দীক্ষা—যে একদিন সৎসঙ্গে আসার সুযোগ পেয়েছে, তারই দীক্ষা হয়ে গেছে; কারণ সৎ-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। সৎসঙ্গে আসার ইচ্ছা, তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা, সাধুদর্শনের ইচ্ছা—এ সবই প্রাথমিক দীক্ষার প্রস্তুতি ও লক্ষণ।

যেদিন ভগবান জীবন দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেদিনই তিনি সবাইকে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। প্রাণের গতির মধ্যে যে অজপা মন্ত্র চলছে, তা-ই দীক্ষা মন্ত্র। পাঁচ জায়গায় নাম শুনতে শুনতে ভিতরে তাঁর নাম হতে থাকে এবং নাম হতে হতে আসল নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তার মন। মনের কেন্দ্রের বোধস্বরূপের দিকে ধাবিত হওয়ার যে প্রবৃত্তি, তার নাম দীক্ষা। [৫।২।৭৪]

গুরুর মহিমা

কেন্দ্রবোধের বা সমত্ববোধের স্থিতি রক্ষাই হল ইষ্টপ্রীতির বা গুরুপ্রীতির তাৎপর্য। গুরুতুষ্টিতে বা আত্মতুষ্টিতে সবাই তুষ্ট হয়। কিন্তু অন্যে তুষ্ট হলে আত্মতুষ্টি হবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। গুরু বলতে কেন্দ্রবোধসত্তাকেই বলা হয়েছে।

গুরুকে মাধ্যম করেই ঈশ্বরীয় সত্তা বা অন্তঃসত্তার শিক্ষা-দীক্ষার যা-কিছু অভিব্যক্তি বা বিকাশ হয়। গুরুর তুষ্টিতেই পরমাত্মা তুষ্ট। গুরু-ইষ্টের মহিমা অনাদি, অনন্ত—কোথাও তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের সীমা দিয়ে গুরুর মহিমাকে খর্ব করা যায় না। কালও গুরুশূন্য বা সত্তাশূন্য নয়। কাল গুরুর বশে। মহাকাল হলেন গুরু স্বয়ং। মহাকাল ও পরম শিব অভেদ। গুরুকে তাই পরম শিবও বলা হয়। তাইতো ভক্ত-সাধকের গানে পাওয়া যায়—

'আমি গুরুর চরণ ধরে রেখেছি
কালাকালের কী আর ভয় রেখেছি?'

গুরুকে যে ধরে, কাল তাকে গ্রাস করতে পারে না; বরং কাল তার পায়ে লুটোপুটি খায়। মৃত্যুভয়ে সে তখন আর অভিভূত হয় না। মৃত্যুর প্রতি উদাসীন থাকা হল গুরুভাব এবং মৃত্যুভয়ে ভীতভাব হল লঘুভাব। অভী

না-হলে ভক্তি হয় না। ভয় দিয়ে ভক্তির সাধনা হয় না। শুদ্ধা ভক্তিতে ও শুদ্ধ জ্ঞানে ভয় বলে কোনও জিনিস থাকে না। সবার মধ্যে তিনিই আছেন, তিনিই সবার কেন্দ্রসত্তা—এই তত্ত্ব প্রকাশ করে সাধককে সাধনার প্রথমেই নির্ভয়তার আশ্বাস দেন সদ্‌গুরু। যারা গুরু-ইষ্টকে ভজনা করে না বা মানে না তাদেরই ভয় থাকে।

গুরু মহাত্মারা যে অবিমিশ্র শান্তির বাণী প্রচার করেন সেই বাণী শুধু মৌখিক নয়। নিজেরা উপলব্ধি ও আস্বাদন করেই তার বিজ্ঞানকে তাঁরা ব্যক্ত করেন। [৩।৩।৭৪]

মহাপ্রাণের পরিচয়

নাম হল প্রাণের দেহ। প্রাণ হল সর্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ বা গুরু স্বয়ং। গুরু নাম দেন স্বস্বরূপের পরিচয় দেবার জন্য এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য। রূপ থেকে হরি, গুরু বা মা সরে যেতে পারেন, কিন্তু নামের বা প্রাণের গতি বা সত্তা থেকে সরে যেতে পারেন না। কারণ সত্তাশূন্য কোনও প্রকাশ সম্ভব নয়।

যতক্ষণ মনের অধীনে ততক্ষণ গুরু-শিষ্যের ভেদভাব। বোধসত্তায় গেলে দেখা যায় যা-দিয়ে শিষ্য গড়া, তা-ই দিয়েই গুরু গড়া। গুরু-শিষ্যের মধ্যে অভেদভাব উপলব্ধি না-হলে শিষ্যসন্তানের বোধের উৎকর্ষের অভাব থাকে।

বোধই গুরু। গুরু প্রথমে শিষ্যকে তৈরি করে নিয়ে তাকে সর্বস্ব দিয়ে যান, এমনকী গুরুর আসনেও বসিয়ে দিয়ে যান; কারণ গুরুর আসন লাভের অধিকারী হন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। কেবলমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানে গুরু-শিষ্যের অভেদবোধ অনুভূত হয়। [১০।৩।৭৪]

গুরুভাব

নিজের ভিতরের পরিচয় জানলে গুরু-ইষ্টকে সর্বদা সর্বত্র দেখা যায়। কারণ তিনিই সব হয়ে আছেন। যাঁকে পাবার জন্য সাধনা করা হয়, তিনি সবার অন্তরে সবাইকে ধরে বসে আছেন।

গুরু হলেন সংকর্ষণ। ঈশ্বরের প্রথম ভাব হল গুরুভাব। গুরু ছাড়া কিছু প্রকাশ হতে পাবে না। সংকর্ষণ অর্থ যিনি সমানের প্রতি আকর্ষণ করেন; অথবা সমত্বের মধ্যে যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। বোধসত্তা সমানে প্রতিষ্ঠিত। বোধগুরু ও বাসুদেব অভেদ। গুরু-ইষ্টের রূপই জগৎরূপে প্রকাশমান—নিত্য এই ভাবনায় যুক্ত থাকলে গুরুতাদাত্ম্য অনতিবিলম্বেই হয়।

গুরু ছাড়া কোনও কিছুর সত্য ও দিব্য মহিমা ব্যক্ত কবা যায় না। ইষ্টের সঙ্গে মিলন হয় গুরুর মাধ্যমে। গুরু ও ইষ্ট অভেদ।

গুরুবরণের পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। নিজের আমিকে গুরুর চরণ বলে মানা হল অন্যতম বিশেষ পদ্ধতি। নিজেকে, গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রকে এবং গুরুকে অভেদ ভাবনা করলে অল্পকালের মধ্যেই সর্বোত্তম ফল গুরুতাদাত্ম্য লাভ হয়। [২৪।৩।৭৪]

দীক্ষার মাধ্যমে হয় গুরু-শিষ্যের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ

কথার মধ্যে দিয়ে ভগবান শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ করেন। তাই বলা হয় যে, কানমন্ত্রর বা দীক্ষার মাধ্যমে গুরুই শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। তারপর শিষ্যের মধ্যে সেই বীজের ক্রম অভিব্যক্তি হতে থাকে এবং অবশেষে পূর্ণস্বরূপের মধ্যে শিষ্য একীভূত হয়ে যায়। গুরুর স্পর্শ, দর্শন বা সঙ্গ মাধ্যমেও গুরুভাব শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর দেখা যায় একটা শক্তি সব সময় তাকে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করছে।

[২৫।৩।৭৪]

গুরু তুষ্ট হলেই সব দেবদেবী তুষ্ট হন

গুরু তুষ্ট হলে সাধনার সার বা ফল একসঙ্গে আসে। একেই বলে অহেতুকী কৃপা। গুরু তুষ্ট না-হলে সব সাধনা ব্যর্থ হয়। গুরু তুষ্ট হলেই চিন্ময়ী মা তুষ্ট হন অথবা চিন্ময়ী মা তুষ্ট হলেই গুরু তুষ্ট হন। উভয়ের মধ্যে সমান সম্বন্ধ বিরাজিত।

অখণ্ড সত্যকে যে বোধের বৃত্তি মানতে দেয় না তারই নাম মিথ্যা। বোধেরই একটি বৃত্তির নাম অমৃতত্ব। কাজেই শক্তি তুষ্ট হলেই গুরু তুষ্ট হন এবং গুরু তুষ্ট হলেই শক্তি তুষ্ট হন। কিন্তু চিন্ময়ী মাতা রুষ্ট হলে গুরু-ই রুষ্ট হন, তখন কেউ রক্ষা করতে পারে না।

সত্তার দিক থেকে পরম মাতা ও পরম পিতা অভেদ হলেও শক্তির দিক থেকে রূপ-নাম-ভাব পর্যন্ত শক্তির অন্তর্গত এবং বোধ হল সত্তা ও গুরুর অন্তর্গত। রূপ, নাম ও ভাব ছাড়া বোধের খেলা হয় না। আবার বোধ ছাড়া রূপ, নাম ও ভাবের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই গুরুকে তুষ্ট করলেই সব দেবদেবী তুষ্ট হন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে গুরু অবস্থান করেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে গুরুকে বসালেই সর্বদেহের অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সাধনা একসঙ্গে হয়ে যায়। মস্তকোপরি সহস্রারে গুরুর রূপ অব্যক্ত। এই কারণেই মাথায় আঘাত করতে নিষেধ করা হয়। [২।৪।৭৪]

অবতারগণ বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করেন না

কেবলমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপায় চৈতন্যের সপ্তস্তরের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। গুরু হলেন সর্বদেবদেবীর ঘনীভূত মূর্তি। সমস্ত দেবদেবী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও গুরুভজন করেন। এই কারণেই অবতার পুরুষদের জীবনে সর্বপ্রকার বিধি-নিয়মের সুসংবদ্ধ আচরণ দেখা যায়। মহাপুরুষগণ অনেক ক্ষেত্রে বিধি-নিয়মের আচরণ লঙ্ঘন করলেও অবতার পুরুষগণ সমাজকল্যাণ রক্ষার্থে, ধারা ঠিক রাখার জন্য বিধি-নিয়মের আচরণ কখনও লঙ্ঘন করেন না।

একবার এক মহাপুরুষের কাছে এক ভণ্ড গেরুয়াধারী সাধু এসে উপস্থিত হয়। তার বাইরের সাজপোশাক সাধুর মতোই ছিল। মহাপুরুষ তাকে দর্শন মাত্রই শ্রদ্ধাপূর্বক যথাবিধি প্রণাম করলেন। মহাপুরুষ এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সকলেই এই সাধুর ভণ্ডতার বিষয় জানতেন। সাধু বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর তারা মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই সাধু যে একজন ভণ্ডলোক এবং এর কুকীর্তির কথাও সবাই জানে। সব জেনে শুনেও আপনি তাকে প্রণাম করে এত সম্মান জানালেন কেন?

মহাপুরুষ তাদের অনুযোগ শুনে হেসে বললেন—যার জন্য প্রণাম করা হয়েছে সেখানে সব ঠিক আছে। গেরুয়াবেশ হল ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক। ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীককে আমি প্রণাম করেছি। কাজেই প্রণাম করা বৃথা যায়নি।

মহাপুরুষদের আচরণ সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। একজন শিষ্য বলল—সাধুর মহিমাও বুঝি না, ভণ্ডের মহিমাও বুঝি না।

মহাপুরুষ সস্নেহে তাকে বললেন—বুঝতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে একজন বোকা ভক্ত ছিল। সে লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। কিন্তু সে মহাপুরুষের সব আচরণ হুবহু অনুকরণ করার চেষ্টা করত। তিনি কখন কী করেন, কী ভাবে চলেন, কী বলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করত এবং আড়ালে গিয়ে তা অভ্যাস করত। অপর কেউ তার এই খবর জানত না। কেবল মহাপুরুষই তার এই খবর জানতেন।

একদিন মহাপুরুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী আমার গদিতে বসবি? মহাপুরুষের প্রতি কথায় শক্তি ঝরে। তিনি বুঝেছিলেন যে শয়নে স্বপনে গুরুর কথা ভাবতে ভাবতে বোকা শিষ্যের জীবন দিব্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। গুরুর কথা ভাবতে ভাবতে সে গুরুতাদাত্ম্য লাভ করেছে। যে ভাব ভিতরে প্রকাশিত হলে গুরুবোধে প্রতিষ্ঠা হয়, সেই ভাবে শিষ্যটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যে গুরুবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বয়ং গুরু ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারেনি। এই জন্য বলা হয় যে ভিতরের ভাব জানেন শুধু অন্তরদেবতা ও গুরু।

অতএব আচার-নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিধি-নিয়ম মেনে আচরণ করলে জীবনে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য তৈরি হয়। [৭ ।৪ ।৭৪]

দীক্ষার বিশেষত্ব

মহাপুরুষগণ ঋষিতত্ত্ব পরিবেশন করে সকলেরই কল্যাণ করেন। তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব দিয়ে সমভাবে সর্বরূপের পূজা করেন। তাঁরা শিষ্যকে দীক্ষা বা নাম কানে দিয়ে তাঁরই পূজা করেন—'তোমার নাম তুমি শোন, তোমার রূপ তুমি দেখ, তোমার কথা তুমি ভাব'—এই ভাবে। দীক্ষার সর্বোত্তম অর্থ হল তাঁর নাম তাঁকে শুনিয়ে তাঁরই পূজা করা। দীক্ষা দিয়ে কেউ কাউকে পৃথক ভাবে কৃপা করতে পারে না।

[১৪ ।৪ ।৭৪]

গুরুর মহিমা ও পরিচয়

গুরুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় যে গুরু হলেন তিনি-ই, যিনি নৌকার হাল ধরে থাকেন। নৌকার সারেঙ্গ, এরোপ্লেনের পাইলট যেমন সর্বদা সজাগ থেকে হাল ধরে থাকেন, সেই রকম গুরুও সারথিরূপে মহাসাথী হয়ে জীবনের সর্বাবস্থায় হাল ধরে থাকেন। গুরু নিজের জীবনে বহু কষ্ট করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা নিঃস্বার্থে মানবকল্যাণের জন্য দিয়ে যান। সাধারণ মানুষ সব কাজ বিনিময়ে বা প্রতিদানে করে। গুরু তাঁর কাজের বিনিময়ে কিছু চান না। তাঁবা মানুষকে শান্তি ও আনন্দের সন্ধান দেন। [২১ ।৪ ।৭৪]

প্রকৃত গুরুসেবা কী?

গুরুর স্বরূপ হল অখণ্ডমণ্ডলাকার। অখণ্ড বোধে সব মানা হলে গুরু প্রীত হন। কোনও এক ইন্দ্রিয়ের প্রীতিতে গুরু প্রীত হন না। গুরু অচ্যুতস্বরূপ। তিনি তুষ্ট হন সর্বাবস্থায় সমান থাকলে। সমত্বে থাকার নামই গুরুর চরণ সেবা করা। এই গুরু নিত্যকালের অখণ্ড পরাৎপরমগুরু।

সত্যের সার নিয়ে যে চলে তার কখনও সারের অভাব হয় না। এই সার দিয়েই গুরু সমতা রক্ষা করেন। হৃদয়কেন্দ্র হল আত্মগুরুর স্বরূপ। হৃদয়কে রক্ষা না-করলে দেহকে রক্ষা করা যায় না। দেহধারণ করলে জন্ম-মৃত্যুর বিকার থাকবেই। যিনি দেহকে রক্ষা করেন, তিনি বহুবার দেহকে বানাতে পারেন। হৃদয়যুক্ত না-হলে দেহ কর্ম করতে পারে না। যে বস্তু নিত্য, সেখানেই গুরু প্রতিষ্ঠিত থাকেন। [২৮ ।৪ ।৭৪]

সমানে থাকার উপায়

গুরুর মধ্যেও আবার তারতম্য বা স্তরভেদ আছে। যারা অসৎকে তাঁরই প্রকাশ বলে মেনে নিতে অক্ষম তাদের পক্ষে সমানে থাকা অসম্ভব। যেমন এক পায়ে বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না, সেইরূপ অসৎকে বাদ দিয়ে জীবনে সব কিছু মেলানো যায় না; ফলে সমস্যার সমাধান কোনও দিনই হয় না। সংসারে কখনও ভাল এবং

কখনও মন্দের প্রাধান্য থাকে; কিন্তু কোনওটিকেই অসত্য বলে প্রমাণ করা যায় না। লৌকিক দৃষ্টিতে সত্যের ব্যবহার অসৎ-এর মাধ্যমেই হয়। আবার বিপরীত ক্রমে অসৎ-এর ব্যবহার সদাশ্রয়েই সিদ্ধ হয়। তত্ত্বত সৎ ও অসৎ হল মনের ভ্রমমাত্র। এই উপলব্ধিতে সৎ ও অসৎ উভয়ের মূল্য সমান থাকে।

নির্বাসনা হলেই গুরুকৃপা বোঝা যায়

মনকে গুরু, ইষ্ট, মা বলা যায় তখনই, যখন মনের সব চাওয়ার অবসান হয়। মনের চাওয়া যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বাইরের গুরু তার না-চাওয়ারূপ বৃত্তি প্রকাশের অপেক্ষায় থাকেন। যখন চাওয়া বন্ধ হয়, তখনই তাঁর কাজ আরম্ভ হয়। না-চাওয়া দিয়ে চাওয়াকে পূরণ করেন। অর্থাৎ সূক্ষ্মের জ্ঞান দিয়ে স্থূলকে পূরণ করেন বা অজ্ঞানকে সরিয়ে নেন। আবার যখন অজ্ঞানকে দেন বা স্থূল বস্তুর অভাব পূরণ করেন তখন জ্ঞানকে সরিয়ে নেন।

সদ্‌গুরুগণ শিষ্যসাধকের কোনও চিন্তায় বা কর্মে বাধা প্রদান করেন না কারণ তাঁরা জানেন সময় হলে যাকে টানবার তিনি তাকে টেনে নেবেন। [১৯।৫।৭৪]

সাধনার উদ্দেশ্য

প্রত্যেকেই তার আপন আপন গুরু-ইষ্টের মধ্যে বাস করে। বাইরেও স্থূল দেহের প্রয়োজন হয়। বাইরে গুরুকে সেবা করার সুযোগ না-পেলে প্রতি ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরূপে গুরুর (চৈতন্যের) সেবা করতে হয়। তাহলেই ইন্দ্রিয়, মনের শোধন হয়। শুদ্ধ মনেই অখণ্ড আত্মবোধের অনুভূতি হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়, মনের শোধন ও সাধন হল সর্ববিধ অধ্যাত্মসাধনার উদ্দেশ্য। [২৬।৫।৭৪]

গুরুর কাজ

প্রজ্ঞাস্থিতি ও ব্রাহ্মীস্থিতি হল যথাক্রমে প্রাণের স্থিতি ও বুদ্ধির স্থিতি। প্রাণ মানেই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা মানেই প্রাণ। প্রাণ বলতে বোধকে নির্দেশ করা হয়। বোধ নিয়ে যায় বিশুদ্ধ জ্ঞানে। এ ভাবে যিনি বোধের স্তরগুলি খুলে দেন তিনিই গুরু।

সদ্‌গুরুর পরিচয়

অন্তরে-বাইরে অখণ্ড সত্যের পূর্ণ পরিচয় লাভ করে যিনি অপরকে তার সন্ধান বলে দেন তিনিই সদ্‌গুরু।

যিনি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ের বা স্বরূপের সন্ধান দিয়ে দেন তাঁর নামই সদ্‌গুরু। যিনি মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যান বা বিকার থেকে নির্বিকারে নিয়ে যান বা সসীম, ক্ষুদ্র আমিবোধ থেকে অখণ্ড, ভূমা, অসীম আমিবোধে যুক্ত করে দেন তাঁর নাম সদ্‌গুরু। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে, আত্মার বা ইষ্টর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে যুক্ত করে দেন তাঁর নাম সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু হলেন অজ্ঞান অন্ধকারে একমাত্র আলোর দিশারী। তাঁর আলো বিশুদ্ধ বোধের আলো, তা একমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করেই পাওয়া যায়।

গুরু-মহাত্মারা স্বেচ্ছায় যা প্রকাশ করে দেন তা-ই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃপা ও আশীর্বাদ। [২৮।৭।৭৪]

নিত্যসিদ্ধের বা নিত্যপূর্ণের লৌকিক গুরু লাগে না

গুরু ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতের এমনকী বস্তুজগতের কোনও বিদ্যাতেও পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। লৌকিক গুরু ছাড়া চলতে পারেন যাঁরা, সেই পর্যায়ভুক্ত মহামানবের সংখ্যা খুবই কম এবং সাধারণের নিকট তাঁরা খুবই অপরিচিত।

যাঁরা মহাকুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মহাশক্তির অধীনে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা নিত্যসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ বা নিত্যপূর্ণ। তাঁরা লৌকিক গুরু ছাড়া চলতে পারেন। তবে অনুপযুক্তের পক্ষে এই পর্যায়ের কথা শোনার বা জানার আশা করাই হল অনধিকার চর্চা। কারণ আশা থাকলেই ক্রিয়া থাকে এবং সাধারণ মানুষ আশাশূন্য হতে পারে না। ক্রিয়া থাকলে নিশ্চয় জ্ঞানের দরকার হয়, নতুবা কর্মের ফল আত্মসিদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেই জন্য জ্ঞানের বা গুরুর সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে যেতে হয়। [৪।৮।৭৪]

বোধস্বরূপের মহিমা

গুরুকে ব্যক্তিরূপে আবদ্ধ করতে নেই। সেই জন্য বলা হয় যে কেউ যেন 'এই শরীরকে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) গুরুত্ব না দেয়। একদিন এই শরীর ভোজবাজির মতো চলে যাবে; কিন্তু এখানকার বাণী, যা সত্যযুগ থেকে আরম্ভ করে সর্বযুগের তত্ত্বকে প্রকাশ করে দিয়ে যাচ্ছে, তা যুগ যুগান্তর থাকবে। রূপব্রহ্ম নাশ হয়, কিন্তু নাদব্রহ্ম নাশ হয় না। সর্বরূপ, সর্বনাম, সর্বভাব, যুক্ত করে হয় প্রত্যেকের গুরু-ইষ্টের পরিচয়। তাহলে প্রত্যেকের সাধনার ফল এক-এ গিয়ে দাঁড়ায়। একবোধের নাম ব্রহ্ম-আত্মা-গুরু। [১১।৮।৭৪]

আত্মগুরু আশ্রিত জীবকে সাক্ষিদ্রষ্টা শিব বানিয়ে দেন

বোধরূপী হরি বা মা বা গুরুই ছোট বড় সমস্ত জীবের মধ্যে বসে তার সর্বক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাই দীক্ষার সময় গুরু বলে দেন—'আজ থেকে তোর যা-কিছু আছে—দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি, সব কিছুর মালিক আমি। তোর মধ্যে বসে যা করবার আমিই করব, সব দায়িত্ব আমার। তুই শুধু সব সঁপে দিয়ে আনন্দে, মজায় থাক।' এতখানি আশ্বাস এবং অমৃতের সন্ধান দিয়ে তাঁরা প্রত্যেককে অমৃতের কোলে বসিয়ে দেন। তখন জীবের আমি কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা নয়—তখন সে হয়ে যায় শিবের আমি অর্থাৎ সাক্ষিদ্রষ্টা মাত্র। ভগবান নিজেই গুরু সাজেন, আবার নিজেই শিষ্যসন্তানরূপে আসেন। [২৫।৮।৭৪]

সচ্চিদানন্দবোধই হল যথার্থ গুরুর স্বরূপ

গুরু বলতে কিন্তু একটা বিশেষ দেহকেই নির্দেশ করে না। সেই জন্য বিশ্বমূর্তির মধ্যে গুরুকে মানার কথা বলা হয়। সমগ্র বিশ্বরূপ হল গুরুর রূপ। সমগ্র নামের রূপ ও ভাবের রূপ হল গুরুর রূপ। গুরু তুষ্ট না-হলে শিবের সঙ্গে মিলন হয় না। শিবের সঙ্গে মিলন না-হলে শক্তির সঙ্গে মিলন হয় না। শক্তির সঙ্গে মিলন না-হলে জ্ঞানের সঙ্গে মিলন হয় না এবং জ্ঞান-আনন্দের সঙ্গে মিলন না-হলে যথাক্রমে আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে মিলন হয় না। [২৭।৮।৭৪]

ধোপা ও ধাই-মার কাজের সাথে গুরুর কাজের তুলনা

মহতের মাধ্যমে মহতের মহিমায় ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। মহতের সংস্পর্শে মহতের প্রভাবে মানুষ মহৎ হয়। ঈশ্বরকে দেখতে চাইলে মহৎকে দেখতে হয়। সেই জন্য গুরুর মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরই গুরুরূপে আসেন। সেই জন্য সদ্গুরু ও ভগবান নিত্য এক ও অভিন্ন। এই বোধ গুরু জাগিয়ে দেন। বিড়াল যেমন তার ছানাকে লালনপালন করে চেটে চেটে তার চোখ ফুটিয়ে দেয়, সেই রকম গুরুও শিষ্যের মনের উপর পুনঃপুনঃ বোধের পরশ দিয়ে তার বোধনয়ন খুলে দেন। গুরু হলেন একাধারে ধোপা, নাপিত. ধাই-মা সব। গুরু ধোপার মতো মনের সব মলিনতা পরিষ্কার করে দেন। নাপিতের মতো শিষ্যকে সুন্দর করে গড়ে তোলেন; আর ধাই-মার মতো তার মলমূত্র সব পরিষ্কার করে দেন। 'না-মানা'-

রূপ বৃত্তির নাম মলমূত্র। গোবর বা 'গু' মল নয়, ঐ বৃত্তিটার নামই মল। এই জন্য দেখা যায় মহাপুরুষরা গায়ে বিষ্ঠা মাখলে তা চন্দনে পরিণত হয়। আর সাধারণ মানুষ পায়ে মল লাগলে গায়ে জল ঢালে। অর্থাৎ মল তার পায়ে নেই, গায়ে আছে।

নাম, বীজ, মন্ত্র ও গুরু এক অর্থবোধক

গুরুকে যদি কেউ ভালবাসে, সে যেন নামকে না-ছাড়ে। গুরুকে ভালবাসতেই হয়। কারণ তিনিই সব। যারা নাম পায়নি তারা যে কোনও একটি ঈশ্বরীয় নাম, যেমন 'ওঁ রাম' বা 'ওঁ হরি' জপ করতে পারে। এখানে বিশেষ নামের কথা কাউকে বলা হয় না।

মন্ত্রের সঙ্গে সুর বেঁধে দেওয়া আছে। যার যা নাম বা মন্ত্র তা আপনা থেকেই ওঠে। গুরু আছেন প্রত্যেকের আমির কেন্দ্রে। বাইরের সব গুরুই সেই এক গুরুর প্রতিচ্ছায়া। যারা 'সোঽহং' উচ্চারণ করে তারাও একটা নামই উচ্চারণ করে। 'আমিই সেই' বলে অহংকাব করে না। নামকে 'সোঽহং' নাম দিয়ে তাঁর চরণে নিবেদন করে।

স্বভাব (মন) দিয়ে স্ববোধের নিত্যসেবাই হল গুরুভজনের যথার্থ তাৎপর্য

মনকে বোধে দেওয়া হল গুরুকে ভজনা করা। মনকে যে বোধ দিয়ে শান্ত কবা হয সেই বোধের নাম গুরু। বোধরূপে বোধের মধ্যে যিনি বসে আছেন তিনি চিদাত্মগুরু। বোধই মনের ভুল শোধন করে দেয়। গুরু শোধন না-করে দিলে শোধন করা সম্ভব হয় না।

গুরুর নামই হল অমৃতবস্তু বা রক্ষাকবচ। সেই জন্য সদ্‌গুরু পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'তোমার আসল বস্তুর উপর খেয়াল রেখ'। নামের সাহায্যেই খেয়াল রাখতে হয়। খেয়াল না-হলে অনুভূতি হয় না।

[১।৯।৭৪]

দীক্ষিতদের প্রতি গুরুভজনের নির্দেশ

যারা দীক্ষিত তাদের বিশেষ করে বলছি যে গুরু, গুরুপ্রদত্ত বীজ বা মন্ত্র, ইষ্ট ও নিজেকে তোমরা অভেদ ও অখণ্ড বলে মেনে নিও। গুরুবোধে সব কিছুকে মেনে নেবার নাম সাধনা। নিজেকে গুরুর থেকে আলাদ' ভাবলে গুরু কষ্ট পান এবং তাঁর কৃপাও অন্তরে অনুভব করা যায় না। ফলে নিজেকেও কষ্ট পেতে হয়। [৩।৯।৭৪]

সচ্চিদানন্দস্বরূপের লীলাবিজ্ঞান

গুরু স্থূল রূপ ধারণ করে এসে মন্ত্র দিলেও আসল গুরু ও মন্ত্র আছে প্রত্যেকের ভিতরে। বৃহৎ মনরূপে সচ্চিদানন্দগুরু হলেন সবার সর্বসম্পত্তির মালিক। বৃহৎ অংশের সন্ধান ও পরিচয় গুরুর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু গুরুই দান করেন। দিব্যচক্ষুর নাম ব্রহ্মাণ বা আত্মন। রূপের কৃষ্ণ যেমন সত্য, তেমনি বোধের মধ্যে বোধস্বরূপ কৃষ্ণ আরও বড় সত্য—নিত্যসত্য। দিব্যচক্ষু খুলে দেওয়াকেই যোগের ভাষায় গ্রন্থিভেদ করা বলা হয়। যোগে চক্রের কথা পাওয়া যায়। গ্রন্থিভেদ ও চক্রভেদ একই কথা। নাদ, বিন্দু সম্বন্ধেও শাস্ত্রে অনেক কথা আছে।

গাড়ির চাকায় যেমন এক কেন্দ্রে থেকে পরিধি স্পোক্ বা অর্ যুক্ত থাকে, মানুষের দেহের মধ্যেও সেইরূপ তিনটি জিনিষ থাকে। চক্রের নাভি বা কেন্দ্রই হল বিন্দু, পরিধি হল নাদ এবং নাদ ও বিন্দুর সংযোগকারী হল অর্। অর্ অর্থ হল ভাব বা গুণ। অরের আরেক নাম কলা। এই তিনটিকে মিলিয়ে বলা হয় নাদ-বিন্দু-

কলা। এই কেন্দ্র বা বিন্দু ও নাদ বা পরিধি অর্থাৎ জ্ঞান ও তার প্রকাশক্রিয়াকে ধরে রেখেছে ইচ্ছা বা সংকল্পরূপ আশা, কামনা প্রভৃতি ভাব। স্থূল দেহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম দেহ আছে তার অন্তর্গত ছয়টি চক্রের ছয়টি বিন্দু ও ছয়টি কলা আছে। ছয় চক্রের সাহায্যেই ঈশ্বরের লীলামাধ্যম মানুষের দেহরথ চলে। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির দ্বারাই এই ছয়টি চক্র সক্রিয় হয় বা গতি নেয়।

বুদ্ধি বা জীব হল বিন্দু, মন হল নাদ এবং ইন্দ্রিয়প্রাণসমষ্টি হল অর্ বা কলা। মন, বুদ্ধি, অহংকারাদির একক নাম হল অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণের মাধ্যমেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরাত্মা তাঁর আপন দিব্যস্বরূপকে ও স্বভাবকে প্রকাশ করেন বা ব্যক্ত করেন। সেই জন্য অন্তঃকরণকে তাঁর প্রকাশমাধ্যম বলা হয়। এরই নামান্তর হল স্বভাব। স্ববোধাত্মা এই স্বভাবের মাধ্যমে লীলায়িত হন। স্বভাবের অভিব্যক্তি হল বাহ্য প্রকাশাদি। বৈচিত্র্যময় নাম-রূপাদি এর অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বিষয়ই চিদাভাসরূপ স্বভাবের বক্ষে স্বভাবেরই বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি স্বভাবের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

বহিঃপ্রকৃতির বৈচিত্র্যাদির কারণ ও নিয়ন্তা হল স্বভাব। আবার স্বভাবের সত্যকারণ ও নিয়ন্তা হন স্ববোধাত্মা। স্ববোধাত্মার দৃষ্টিতে সবই স্ববোধাত্মার পরিচয়। স্বভাবের দৃষ্টিতে সবই স্বভাবের পরিচয়। আবার প্রকৃতির দৃষ্টিতে সবই প্রকৃতির পরিচয়। প্রকৃতির পরিচয় বৈচিত্র্যময়। তার মধ্যে স্বভাবের ও স্ববোধের পরিচয় সম্যক্‌রূপে যুক্ত থাকলেও তা পূর্ণ ভাবে অবগত হওয়া যায় না স্বভাবের ও স্ববোধের নিরন্তর সাহায্য ছাড়া। স্বভাবের ব্যবহার দ্বৈত ভাবে হয়। এই দ্বৈত ভাবের প্রভাব জীবনকে তার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দিব্য অমৃতস্বরূপকে অবগত হতে দেয় না। স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই হল দ্বৈতপ্রীতি এবং অদ্বৈত থেকে বিমুখ থাকা। যতদিন এই দ্বৈতপ্রীতি থাকে ততদিন পর্যন্ত স্ববোধাত্মার অনুভূতি অর্থাৎ স্বানুভূতি হয় না। আবার স্ববোধাত্মার কৃপায় যখন স্ববোধের অনুভূতির প্রয়োজন ও তাগিদ আসে, স্বভাবের কেন্দ্র থেকে তখন স্বভাব স্ববোধপ্রীতির নিমিত্ত নিজেকে স্ববোধের কাছে surrender করে। তা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপার মাধ্যমে। স্বানুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরু ব্যতীত অপরের পক্ষে স্ববোধাত্মার অনুভূতির সর্ববিধ অন্তরায় দূর করে তা স্বতঃসিদ্ধ স্বানুভবসিদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় স্ববোধাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। স্ববোধাত্মার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় স্বানুভূতির মাধ্যমে। সর্বপ্রকার অনুভূতির অধিষ্ঠান যে স্ববোধাত্মা তা স্বভাব অবগত হয় স্ববোধাত্মার সঙ্গে মিশে একীভূত হলে। তখন দ্বৈতবোধের অবসান ঘটে এবং অদ্বৈতবোধের অবাধিত স্ফূর্তি প্রকাশ পায়। সর্বপ্রকার অধ্যাত্মসাধনা স্বভাবের মাধ্যমেই সাধিত হয়। স্বভাবের পরিশুদ্ধি হয় তখনই যখন স্ববোধাত্মার সঙ্গে মিশে যায়, তখন আর সাধনভজনের দরকার থাকে না।

স্বভাবের প্রাধান্যকালে জীবনসাধনার গতি ভাব থেকে ভাবান্তরে ও মত থেকে মতান্তরে পরিবর্তিত হয়। এর প্রভাব কখনও সাময়িক ভাবে, কখনও ব্যাপক ভাবে জীবনকে অভিভূত করে রাখে। কী কর্মক্ষেত্রে, কী ধর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই এর প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য কারও কারও মধ্যে ইন্দ্রিয়, প্রাণের প্রাধান্য অধিক দেখা যায়। এইরূপ ইন্দ্রিয়, প্রাণের প্রাধান্যকালে প্রাণের বহির্মুখী প্রবণতার লক্ষণগুলি কারও কারও মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেখা যায়, আবার কারও কারও মধ্যে প্রাণের অন্তর্মুখী গতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ ভাবে বহু জীবন তাদের ইন্দ্রিয়-প্রাণের নিয়ন্ত্রণাধীনেই চলে। অন্তরবোধের বিকাশের ফলেই হয় দিব্যজীবন লাভ।

আবার কারও কারও মধ্যে মানসিক ভাবপ্রবণতার প্রাধান্য নানা ভাবে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। তাদের প্রকৃতি, আচার, ব্যবহারের মধ্যে আবার তদ্রূপ লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যবিলাসী ভাবের ও অনুভাবের প্রবণতা কৃষ্টি ও প্রগতির নাম নিয়ে কিছুদিন মাতামাতি করে তারপর আপনা থেকেই স্তিমিত হয়ে যায়। তা স্থায়ী ও ফলপ্রদ হয় না। এ ভাবেই বহুজন্ম কেটে যায়। এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে।

আবার তীব্র অহংকারপ্রধান কর্তৃত্বাভিমানীদের একদল কিছুদিন স্বভাবের প্রাধান্যে মাতামাতি করে, তারপর অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনও জয় লাভ করে বা কখনও পরাজিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। এই ভাবের অধীনেও বহু জীবন অতিবাহিত হয়।

আবার বুদ্ধির সৌকর্যের বা উৎকর্ষের ফলে বুদ্ধির অধীনে সূক্ষ্ম তীব্র ভাবগুলি বুদ্ধিমানদের পরিচালিত করে যখন, তখন বিদ্যাভিমানের লক্ষণগুলি খুব ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পায়। সমাজসংস্কার ও মানবীয় সভ্যতার মানকে উন্নত করার ব্যাপারে এরা মেতে থাকে। অনেক কিছু এরা করে সমাজসংস্কারের নামে কিন্তু স্বভাবের দিব্যরূপায়ণ এদের ব্যাপক ভাবে হয় না। তবে এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে অধ্যাত্ম সাধনবিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা সদ্‌গুরুর কৃপায় মহৎ ও দিব্য ভাবের অধিকারী হতে দেখা যায়। সবই অন্তরের অর্থাৎ স্বভাবের বিকাশ অভিব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। স্বভাবের সর্ববিধ বিকাশক্রমের মধ্যে মনের সক্রিয় চেষ্টা সর্বত্রই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অন্তঃকরণের কাজ দেহের সর্বত্রই। সেই জন্য যখন যেখানে মন সক্রিয় হয় সেখানেই একটা বিন্দুর বা বোধের কেন্দ্র সূক্ষ্ম ভাবে থাকবেই। বিন্দু থাকলেই চাঁদের চার পাশের প্রভার মতো বিন্দুর চার পাশে নাদও ঘিরে থাকে। বিন্দুর মধ্যে যতখানি সক্রিয় অংশ থাকে ততখানিই হল চক্রের পরিধি।

দেহের ভিতরে শক্তির দিক থেকে ছয়টি চক্র বা বোধের ছয়টি স্তর আছে। কিন্তু বোধের দৃষ্টিতে ছয়টি চক্রের ছয়টি বিন্দু দৃষ্ট হলেও তার মূলে কিন্তু আছে বিশেষ একটি বিন্দু। ছয়টি বিন্দু হল তার প্রতিবিম্ব বা প্রকাশমাধ্যম। এগুলিকে উপকেন্দ্র বলা হয়। এগুলির মধ্য দিয়েই মূল বিন্দুর জ্যোতি বা বোধশক্তি সক্রিয় হয়। নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে ক্রিয়াশক্তি বা প্রাণশক্তি জীবনকে সক্রিয় রাখে মূল বিন্দুর প্রভার, জ্যোতির বা বোধশক্তির সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে।

মূল বিন্দুর কেন্দ্রই হল আত্মা। এক সূর্য যেমন সহস্র জগৎকে প্রকাশ করে সেইরূপ স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ বা বোধস্বরূপ এক আত্মা সমগ্র জীবনের অন্তর-বাহিরের সব কিছুকে প্রকাশ করে। কিন্তু গুরুশক্তি নানা প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেই সব কিছুকে পরিচালনা করে। এই সত্য কিন্তু জ্ঞানসিদ্ধি ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না।

শক্তির মধ্যে চারটি বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় এবং স্বরূপের দিক থেকেও চারটি বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়; যথা—শক্তির স্বরূপে শক্তি, জ্ঞানের স্বরূপে জ্ঞান, আনন্দের স্বরূপে আনন্দ এবং প্রেমের স্বরূপে প্রেমকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেমের একটি স্বরূপ বা নিষ্ক্রিয় অংশ এবং একটি বিজ্ঞান বা সক্রিয় অংশ আছে। প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকলেও স্বরূপ ও শক্তির দিক থেকে পরস্পরের মিলনের ফলের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়; যেমন জ্ঞানের শক্তি এবং শক্তির জ্ঞান এক নয়। সেইরূপ আনন্দের শক্তি ও শক্তির আনন্দ এক নয় এবং প্রেমের শক্তি ও শক্তির প্রেম এক নয়। ব্যষ্টি মনের সঙ্গে সমষ্টি বা বৃহৎ মনের সম্বন্ধ উল্লিখিত পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়।

সব স্তরের গুরু আছে। বিন্দুর কেন্দ্রই হল গুরু। কারণ বিন্দুর স্থান হল বৃহৎ মনে। সক্রিয় মনের ঊর্ধ্বে বৃহৎ মনেও একটি বিন্দু ও একটি পরিধি আছে। সেই কেন্দ্রসত্তার দ্বারা সবই বিধৃত। তাঁর নাম বোধস্বরূপ আত্মা, যা সবাইকে বোধ দান করে। [৩।৯।৭৪]

গুরুর অতুলনীয় মহিমা

গুরু একাধারে যেমন কঠোর ও দৃঢ় হন অপর দিকে তিনি তেমনই কোমল ও স্নেহঘন। এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তি তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বলেই তাঁর মহিমা অতুলনীয়। তিনি চার হাতে শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেম বিতরণ করেন। এই কারণেই মা, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি রূপের মধ্যে চার হাত দেখানো হয়।

হৃদয়ে অশুদ্ধ জিনিস বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। হৃদয়ের কাজই হল সকলকে গ্রহণ করে শুদ্ধ করা। সেই জন্য গুরু কাউকে বাদ দিতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই গুরু বলা হয়। প্রিয়তম বলে গুরু আপন। জ্ঞানঘন বলে গুরু অখণ্ড।

গুরুকরণ

গুরুর অনেক স্তর থাকলেও প্রত্যেকের গুরু প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। যেমন প্রত্যেকের পিতা (যে রকম স্বভাবেরই হোক) নিজের সন্তানের কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, আপন ও স্নেহঘন। প্রচলিত ধারায় যার গুরুকরণ হয়নি সে বাবা-মাকে গুরু বলে গ্রহণ করতে পারে। অথবা শ্রেষ্ঠ কোনও গুরুজন, যিনি তাকে ভালবাসেন, তাঁকেও গুরু বলে গ্রহণ করতে পারে। তা-ও যদি কারওর না-থাকে তবে ভগবানের যে কোনও একটি নামকে গুরুবোধে গ্রহণ করতে পারে। কারণ গুরুশূন্য কেউ হতে পারে না। গুরু প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে নিরন্তর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করে চলেছেন—হংসঃ সোঽহম্ বা ত্বমহম্ বা অহংত্বম্। ওঁ রামঃ, ও শিবঃ বা ওঁ মা—সব নামই এক অর্থবোধক। সব মন্ত্রের উদ্দেশ্য হল বোধের সঙ্গে মনের মিলন করা। নাম করতে করতে মন স্থির হয়ে বোধে যুক্ত হয়ে যায়।

গুরু সকলের আপন বস্তুকে নাম দিয়ে ধরিয়ে দেন। নাম ছাড়া কোনও কিছুর ব্যবহার বা নির্দেশ করা চলে না। তাই নাম দিয়ে হয় দীক্ষা। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন নামের দীক্ষা পেলেও এক পরমাত্মগুরুর সঙ্গেই সবাই যুক্ত। এই কথা স্মরণে থাকলে উত্তম ফলপ্রদ। [১৫।৯।৭৪]

গুরুর পরিচয়

গুরু দেহধারণ করে বাইরে থাকলেও গুরু কারওর বাইরে নন। প্রত্যেকের বৃহত্তর ও বৃহত্তম অংশের নাম গুরু। যাঁর অবলম্বন দরকার হয় না তার বাইরের গুরুরও দরকার হয় না। পূর্ণ অখণ্ড সত্যের নাম গুরু। সেই জন্য অন্তরে-বাইরে যে যাই অবলম্বন করুক তাঁকে অখণ্ড বোধে ধরতে হয়। [২২।৯।৭৪]

গুরুকৃপা লাভের উপায়

ভগবান যখন স্বয়ং নেমে আসেন তখনই যথার্থ সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অন্যান্য গুরুগণ হলেন সদ্‌গুরুর দ্বার। তাই গুরুকে 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' বলা হয়। তাঁর কৃপা ছাড়া সাধনভজনের কোনও ফল পাওয়া যায় না। আবার তাঁকে মানলে ফল কেউ আটকে রাখতে পারে না। যেমন ধনী দাদুর নাতি আপন অধিকারেই সব সম্পত্তির মালিক হয়। স্ববোধে সব মানা এমনই একটি বিজ্ঞান, যে সব সাধনার ফল তাকে হাতে তুলে দেয়। [২৮।৯।৭৪]

গুরু হলেন ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির ঘনীভূত মূর্তি। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞান উভয় বিদ্যাই জানেন। আত্মচেষ্টায় বিদ্যালাভ করা অতি দুরূহ। চিত্তশুদ্ধির জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। [৩০।৯।৭৪]

'মানা' ও 'জানা'-র পার্থক্য

যাঁর মধ্যে সদ্‌গুরুর লক্ষণ প্রকাশ পায় সে-ই অখণ্ড শান্তিতে বিরাজ করে। যে মানে সে-ই শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ববোধে সব মানা হল কেন্দ্রসত্তার বিজ্ঞান এবং জানা হল অন্তঃসত্তার বিজ্ঞান। সেই জন্য সদ্‌গুরুগণ মানার উপরে বেশি গুরুত্ব দেন। সদ্‌গুরুর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হয়। ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হলেও সদ্‌গুরুর কথা কোনও ব্যক্তির কথা নয়। ব্যক্তির কথায় এত শক্তি থাকতে পারে না। 'সৎ' হল

স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশকে প্রকাশিত হবার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়ে বলেন—'তোমার কথা তুমি বল, তুমিই শোন। তোমাকে তুমিই জানতে পার। তুমি বেদময় পুরুষ ও স্বয়ং বিজ্ঞাতা।' এই ভাবে ত্বং-এর ধ্বনি বেজে ওঠে। তখন ত্বং-এর মধ্যে অহং থাকে মহাশান্তিতে। [৬।১০।৭৪]

দীক্ষার প্রকারভেদ

ধ্যানসিদ্ধগণ অনেক সময় ধ্যানকারীদের ধ্যানের স্তর হিসাবে সাহায্য করেন। স্বয়ংসিদ্ধদের কোনও সাহায্যকারী থাকে না। আপন অন্তরের ভাবই তাঁদের একমাত্র সহায়ক। তাঁদের দীক্ষাও অন্তর থেকেই হয়।

স্বয়ংদীক্ষা তিন রকম ভাবে হতে পারে—(১) দীক্ষার সময় উপস্থিত হলে একটি ভাব উপলব্ধি হয়। তখন একটি যন্ত্র মাটির উপরে এঁকে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও পরে সেই ভাবকে গ্রহণ করা হয়। (২) দীক্ষার সময় আসন্ন হলে তিন দিন মৌন বা নীরবে থেকে নিজে নিস্পৃহ ও উদাসীন (relax করে) ভাবে থাকতে হয়। বিশেষ একটা সময়ে ঐ অবস্থায় একটা শব্দ ওঠে। তাই হয় তার বীজমন্ত্র। (৩) এই তৃতীয় পদ্ধতিতে সাধকের মধ্যে আপনা থেকেই প্রণব জপ হতে থাকে। অথবা সোঽহং মন্ত্র, অহং ব্রহ্মাস্মি, শিবোঽহং প্রভৃতি জপ হতে থাকে। প্রথমে সে এ বিষয়ে সচেতন না-থাকলেও পরে আপনা থেকেই সচেতন হয় এবং এক অকারণ অনাবিল আনন্দ অনুভব করে। তা আপনা থেকেই চলতে থাকে, কখনও এর অভাব হয় না। কথা দিয়ে এ সব বোঝানো যায় না। এগুলি যাঁদের হয় তারা কেউ এ সব প্রকাশ করেন না। সেই জন্য অন্য কেউ জানতেও পারে না। যাঁদের ভিতরে এই ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হয় তাঁরাই স্বয়ংসিদ্ধ। তাঁরা স্বতন্ত্রপুরুষ।

অনেকের বীজের দরকার হয় না, ভাবের দরকার হয়। সেই জন্য উত্তম দিব্য ভাবের স্ফূর্তি তাদের ভিতরে নিরন্তর হতে থাকে। আবার অনেকের বীজ, নাম বা ভাব কোনওটিরই প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রশান্ত চিত্ত ও সমবোধের ধারা আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। তাঁদের মধ্যে কোনও বৃত্তির বা ভাবের স্ফূর্তি ওঠে না। যদি বা কখনও ওঠে তবে তা সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়; তার কোনও প্রভাব থাকে না। তাঁদের চিত্ত যেন নির্মল, স্বচ্ছ, তরঙ্গ ও লহরীবিহীন হ্রদ বা প্রশান্ত মহাসাগর। এর কোনও তুলনা নেই এবং এর অধিকারীও খুব দুর্লভ। যাঁদের মধ্যে তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় তাঁরাই ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষ। শাস্ত্র এঁদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছে মাত্র, আর কোনও বিশেষ বর্ণনা এঁদের বিষয়ে দেওয়া যায় না। এঁদের বাহ্যিক আচরণ ও ব্যবহারও অনন্যসাধারণ। এঁদের চেনা যায় না। এঁদের মতো যাঁরা, তাঁরাই শুধু এঁদের বুঝতে পারেন, অন্যে পারে না।

স্বয়ংসিদ্ধ যুগে যুগে কদাচিৎ দুই-এক জন হয়। এঁদের আশ্রমও থাকে না, কোনও সম্প্রদায় বা সংঘও থাকে না।

অনেক প্রকার সিদ্ধই আছেন, যেমন—নামসিদ্ধপুরুষ, ভাবসিদ্ধপুরুষ, কর্মসিদ্ধ বা সিদ্ধকর্মী, ধ্যানসিদ্ধপুরুষ, যোগসিদ্ধপুরুষ বা সিদ্ধযোগী, জ্ঞানসিদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধ, প্রেমসিদ্ধ প্রভৃতি। এ ছাড়াও আরও আছে যেমন—সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, পূর্ণসিদ্ধ ও স্বয়ংসিদ্ধ। এঁদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ আছে। তা অনুভবসিদ্ধ ছাড়া অন্যের পক্ষে চেনা বা জানা কোনও মতেই সম্ভব নয়। পুঁথিপুস্তকের জ্ঞান দিয়ে এঁদের চেনা যায় না। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা কাউকে কৃপা করেন, সে তা জানলেও কিছু ব্যক্ত করতে পারে না। কৃপা যে পায় সে স্বাভাবিক ভাবেই ভক্ত হয়ে যায়। তার কাছে শুনে অন্যেও এ রকম কৃপাকারীকে দর্শন করতে যায়, তাঁর সঙ্গ করে, তাদের মনের মতো কথা দিয়ে লোকের কাছে তাঁদের প্রসঙ্গে বলে বেড়ায়।

সংসারীদের ধারণা

সংসারীদের প্রয়োজন অনেক রকম। যার যে রকম প্রয়োজন, সে সে রকম সমাধানই খোঁজে। অযাচিত ভাবে উচ্চকোটি মহাত্মাদের কাছে যদি কেউ কখনও কৃপা পায় সে ধন্য হয়। এরূপ কৃপাধন্য, স্নেহধন্য যারা হয়, তারাই কৃপাকারী মহাত্মা, মহাপুরুষদের কীর্তন করে বেড়ায়। এ ভাবেই পরমসিদ্ধ বা মহাসিদ্ধ মহাপুরুষগণের কিছু কিছু পরিচয় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর যাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানার উপায় থাকে না তাঁদের কথা অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

তবে সাধারণত এমন অনেককে নিয়েই অনেকে মাতামাতি করে যাদের কোনও প্রকার সিদ্ধিই হয়তো নেই। সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক বলে সে সব কথা থাক।

সাধারণ লোকের দীক্ষা প্রসঙ্গে

স্বয়ংসিদ্ধদের ব্যাপার আলাদা; কিন্তু সাধারণ লোকের দীক্ষার প্রয়োজন আছে। তারা গুরুর কাছ থেকে নাম, বীজ বা মন্ত্র পায় যোগ্যতার মান অনুসারে। সে ভাবেই তারা সাধনভজন করে। তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধনার অন্তে বা পরিণামে।

দীক্ষার মধ্যেও তিন রকম দীক্ষা আছে—(১) অতীত অতীত জন্মে সাধকের দীক্ষাকালে প্রাপ্ত নাম ও সাধনপদ্ধতির স্মৃতি জাগরিত করা। (২) পূর্বজন্মের দীক্ষার ধারা অবগত না-হয়ে গুরুমহারাজগণ কর্তৃক তাঁদের নিজ নিজ সাধনায় ব্যবহৃত বা প্রচলিত কোনও একটি নাম দিয়ে যে দীক্ষা দেওয়া হয়। (৩) এই তৃতীয় পদ্ধতিতে বেদান্তের চারটি ভাবনা (ক) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (খ) অয়মাত্মাব্রহ্ম (গ) তত্ত্বমসি (ঘ) অহংব্রহ্মাস্মি—এদের যে কোনও একটিকে অবলম্বনরূপে গুরু ধরিয়ে দেন। এর পরে আর কোনও মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মহাতন্ত্র মতে বা বেদান্ত মতে শিবোঽহম্, সোঽহম্, হংসঃ, অহংবিষ্ণু প্রভৃতি মন্ত্র উত্তম অধিকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পেয়ে থাকেন।[১]

অবতারপুরুষগণ দীক্ষা দেন না। দীক্ষা দেবার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি তিনিই নিযুক্ত করেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র Scientific হওয়া প্রয়োজন

দীক্ষার প্রসঙ্গমাত্রই এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে সাধারণের কাছে তা বোধগম্য হবার নয়। সেই জন্য সবার কাছে তা ব্যক্ত করা হয় না। এই বিদ্যা গুপ্তবিদ্যারূপেই প্রচলিত হয়ে আসছে। গুপ্তবিদ্যা কখনওই উন্নত scientific হয় না অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত নয়। তা অজ্ঞানের প্রভাবেই চলে। আবার scientific না-হলে তা শুভফলপ্রদ হয় না। তা যাঁরা জানেন না ও মানেন না তাঁরা বিশেষ উপকার নিজেরাও পান না এবং অন্যের উপকারও করতে পারেন না। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তা জানেন, মানেন ও ব্যবহার করেন তাঁরা নিজেরাও উপকৃত হন এবং অন্যের উপকার করতেও সমর্থ হন। বিজ্ঞানসম্মত কোনও সাধনপদ্ধতি যোগ্যতার মান বিচারপূর্বক অধিকারীজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকারী বিবেচনা না-করে, যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষাদীক্ষা না-হলে তা কখনওই বিজ্ঞানসম্মত হয় না এবং আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। তা বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। [৮।১০।৭৪]

১। তন্ত্রমতে দীক্ষা চতুর্বিধ। (১) সাম্ভবী (২) শক্তি বা বীজ (৩) নাম (৪) ভাব বা জ্ঞান। তা ছাড়াও তন্ত্র ও যোগের কুণ্ডলিনীমন্ত্র ও ক্রিয়াযোগের বিশেষ বীজ মন্ত্রাদি প্রাণায়াম সহকারে দীক্ষার রীতি আছে। এগুলি খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল।

শিক্ষা ও দীক্ষা আচরণের মাধ্যমে না-হলে ফলপ্রদ হয় না

গুরু কখনও পরস্পরের মধ্যে ছোট-বড় করে অসমান ও ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি করেন না। গুরু ও শিষ্যের উভয়ের প্রতি উভয়ের মর্যাদাবোধ না-থাকলে উভয়ের আচরণে পরস্পর বিরোধী ভাবই প্রকাশ পায়। অসমান ভাববোধের ব্যবহার চিত্তশুদ্ধি ও পূর্ণতার পরিপন্থী। সমবোধ হল পূর্ণতার লক্ষণ। পূর্ণ বোধের সাহায্যেই অশুদ্ধ ও অপূর্ণ ভাববোধের পরিশোধন হয়।

সদ্‌গুরু হলেন সমদর্শী। তিনি অখণ্ড সমবোধে বা আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত বলে তাঁর কাছে হেয়ও কেউ নেই এবং শ্রেয়ও কেউ নেই। কিন্তু স্বভাবের গুণগত তারতম্যের দৃষ্টিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁকে সমত্ববোধ থেকে একধাপ নিচে নেমে এসে শিক্ষা ও দীক্ষা দান করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে শিষ্যের স্বভাববোধের আচরণে সমবোধের, একবোধের বা আপনবোধের পরিপন্থী যে সকল ভাব, গুণের বিকার, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি দৃষ্ট হয় সে সকল সম্যক্‌রূপে অবগত করিয়ে তিনি তা পরিশোধন ও পূর্ণ ভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করেন।

সদ্‌গুরু স্বয়ং আচরণের মাধ্যমে শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অন্যান্য গুরুগণ শুধু উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েই ছেড়ে দেন। আচরণের মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষা দিতে বিশেষ দেখা যায় না। অনুভবসিদ্ধ না-হলে আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। শাস্ত্রজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক আচরণসিদ্ধ জীবন না-হলে কেবল উপদেশ ও আলোচনার মাধ্যমে 'সুধর্ম' তথা ঈশ্বরাত্মার অনুভূতির ও মুক্তির বিজ্ঞান যথার্থ ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আচরণশূন্য কেবল শাস্ত্রকথার উপদেশ ও নির্দেশ দ্বারা পূর্ণসিদ্ধি, মুক্তি ও সত্যানুভূতি লাভ হয় না। শাস্ত্রের জীবন্তবিগ্রহ যাঁরা, তাঁদের জীবনাদর্শ অবলম্বন করে, তাঁদের সঙ্গ করে তবেই সুধর্ম, মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয়। তা-ও আবার উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। যোগ্য গুরু ও যোগ্য শিষ্যের যোগাযোগ ও সম্বন্ধ সর্বকালেই সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

গুরু ও শিষ্য উভয়েরই স্বভাব ও যোগ্যতা প্রসঙ্গে

গুরুর স্বভাব ও যোগ্যতার মানের যেমন স্তরভেদ আছে শিষ্যেরও সেইরূপ স্তরভেদ আছে। উত্তম গুরুর কাছে সর্বপর্যায়ের, সর্বমানের শিষ্যই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সুযোগ পায়। সেই জন্যই সদ্‌গুরুর মহিমা সর্বত্রই সর্বোত্তমরূপে গীত হয়।

শিষ্যকে শিক্ষাদানকালে সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য

গুরু শিক্ষাদান কালে শিষ্যকে অন্তরে ইষ্টগুরু জ্ঞানেই গ্রহণ করেন এবং সেই বোধেই তার সঙ্গে ব্যবহার করেন। ইষ্টগুরু জ্ঞানে গ্রহণ না-করলে সমবোধের বা আপনবোধের অভাববশত ভেদজ্ঞানের প্রকাশ বা তারতম্য বেড়ে যায়। তার ফলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয় এবং অন্যের কাছেও তাদের বিসদৃশ আচরণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার প্রভাব অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এই সব কারণেই সাধারণ মানুষের সংশয়, শঙ্কা ও বিভ্রান্তি বেড়ে যায়। তারা প্রত্যক্ষ ভাবে এ সব বিষয়ের সমালোচনা করে অন্যের সঙ্গে। এ ভাবেই দোষদৃষ্টি ও অশান্তির বীজ ছড়ায়। আবার যেখানে ইষ্টগুরু জ্ঞানে, সমবোধে গুরু সব কিছু ব্যবহার করেন সেখানে তার শুভ প্রভাব সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় সে-ভাবে। তা সকলের পক্ষে শুভদায়ক, মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণকর।

দীক্ষার পরিণাম সমবোধ বা আপনবোধ

গুরু শিষ্যকে তৈরি করে শিষ্যের মধ্যে মিশে যান; অথবা গুরুবাক্, সত্যবাক্ ও আত্মবাকের সঙ্গে মনের কথা মিলিয়ে নিয়ে শিষ্য গুরুমনা ও আত্মমনা হয়ে যায়। এর নামই বোধের পূজা।

সর্বকর্মের ফল গুরুর নামে রাখলে নিজে মুক্ত থাকা যায়। শিবরূপী গুরুর বাণী হল—"তোর আমির মধ্যে আমি বসে আছি। তোর আমিকে দিয়ে সেই 'আমি'-কে মান্ ও জান্।" এ-ই হল আসল দীক্ষা। প্রত্যেকের আমির কেন্দ্রে যিনি আছেন, তিনিই হলেন গুরু বা ইষ্ট।

অমৃত রয়েছে সদ্গুরুর মধ্যে। মৃত্যু রয়েছে অমৃতের মধ্যে বা সদ্গুরুর মধ্যে। বোধস্বরূপ গুরু প্রীত হলেই অমৃতের আস্বাদন হয়। সমতা হল অমৃত এবং অসাম্য হল মৃত্যু। [১৩।১০।৭৪]

আত্মকৃপা না-হলে গুরুকৃপা লাভ হয় না

বর্তমান যুগ হল গুরুবাদের যুগ। সকলের ধারণা গুরুরা সব চাবি দিয়ে ঠিক করে দেবেন। নিজেদের কিছু করতে হবে না। এই হল বর্তমানে গুরুভক্তির লক্ষণ। আর গুরুরা সত্যই যদি কিছু করে দেন তাহলে গুরুর মেয়াদ যেখানে সত্তর বছর ছিল সেখানে তাঁর আয়ু শেষ হয়ে যায় চল্লিশ বছরেই। গুরুদের এই আত্মদান ধর্মপুস্তকের কোনও জায়গাতেই স্থান পায় না। গুরুর পক্ষ নিয়ে খুব কম লোকেই কথা বলে। শিষ্যরা নিজেদের অনুভূতির মান না-বাড়িয়ে অর্থাৎ শুদ্ধবোধের বা গুরুবোধের যথার্থ অনুশীলন না-করে গুরুর কাছ থেকে বিভূতি, শক্তি আদায় করে তাঁদের সমকক্ষ হতে চায়। যখন ব্যর্থ হয়, যখন আর সুবিধা আদায় করতে পারে না, সর্বব্যাপারেই অসমর্থ হয় তখন ঈশ্বরকে বা গুরুকে নিজেদেরই পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। এ-ই হল তাদের গুরুভক্তির নমুনা। কলি যুগে এই রকম লোকই বেশি। তারা ইষ্টগুরুর সত্যস্বরূপে উন্নীত হবার চেষ্টা না-করে ইষ্টগুরুর শক্তিকে জগদ্ব্যাপারের পর্যায়ভুক্ত করে চিন্তা করে ও ব্যবহার করতে চায়। যখন কিছু সুবিধা বা সুরাহা হয়, তখন একেবারে গদগদ ভাব। তারাই যেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত এ রকমই বলে বেড়ায়। আবার যখন প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ে খুবই নাজেহাল হয় তখন ইষ্টগুরুর প্রতি আর পূর্বের মতো তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে না। তখন তারা কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যে অসংযত ও আপত্তিজনক মন্তব্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না। এরা সবাই তমোরজোগুণের প্রভাবে চলে। এরা ভাবের ঘরে চুরি করে। গুরুসেবা না-করে, গুরুর দক্ষিণা না-দিয়ে কিছু গুরুবাণী সংগ্রহ করে। তারা গুরুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্বয়ং গুরু সেজে বসে।

বোধতত্ত্বের বিকাশই হল গুরু ও সাধুসঙ্গের পরিণাম

বোধ ছাড়া সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ বোঝা সম্ভবপর নয়। বোধকে বাদ দিয়ে মানুষ জীবন এক পা-ও চলতে পারে না। আর বোধের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না-করলে কয়েক জন্ম মহাপুরুষদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেও কোনও লাভ হয় না।

এ রকম একটি ঘটনা আছে—কয়েক জন্ম মহাপুরুষের সঙ্গে থেকেও কোনও একজন লোকের কোনও পরিবর্তন হল না। তখন তাকে এক মহাপুরুষের বংশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাতেও তার বোধের তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ জাগল না। মহাপুরুষের বংশে তার জন্ম হয়েছে এই গর্বেই সে জীবন কাটিয়ে দিল। নিজে কোনও চেষ্টাই করতে রাজি নয়। ভগবান দেখলেন একে এমন ভাবে বোধের রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে হবে যেন ঠিক কলুর বলদের মতো ঘুরতে হয়।

এ দিকে সেই ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে যা-কিছু ভোগের আয়োজন করে সব বিফল হয়ে যায়। এই দুর্ভোগ ও ব্যর্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক সাধুসন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হল কিন্তু তারা কেউ এর কারণ নির্ণয় করতে পারল না। তখন হতাশ হয়ে একজন মহাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করল। সে বলল—বাবা, তুমি যা করতে বলবে আমি তা-ই করতে রাজি আছি। আমাকে একটু রেহাই দাও। মহাত্মা বললেন—যা করতে বলব তা-ই করবে? আচ্ছা এক জন্ম তোমায় ময়লা মাথায় করে নিয়ে ফেলতে হবে। সে এই কথা শুনে

আঁতকে উঠল। সে বলল—সে কী! এটা ছাড়া কী আর কোনও উপায় নেই? মহাত্মা বললেন—বেশ ময়লা মাথায় করে নিতে হবে না। ময়লার গাড়ি টানতে হবে। সে তাতেও রাজি হল না। মহাত্মা চিন্তান্বিত হলেন। তিনি বললেন—তাহলে কী আর করবি বল, বলদ হয়ে একজন্ম জমি চাষ কর্। সে বলল—ওতে আরও কষ্ট। রোদে, জলে, ঝড়ে, খোলা মাঠে পড়ে থাকা, ও আমি পারব না।। মহাত্মা বললেন—তাহলে তুই মুটেগিরি কর্। তার সেই কাজেও আপত্তি। সে বলল—মুটেরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। বড় কষ্ট।

মহাত্মা দেখলেন এর ভিতরে জন্ম জন্মান্তরের ভোগের বীজ রয়েছে। তখন তিনি তাকে রাজবাড়িতে রাজপরিবারে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা খর্ব করে দিলেন। রাজবাড়িতে চার পাশে প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য এবং তারও মন ভর্তি সাধ। কিন্তু বিকল ইন্দ্রিয়ের জন্য সে ভোগ করতে পারছে না। ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে, ভিতরে ভোগ থাকা সত্ত্বেও ভোগে না-আসার কী যন্ত্রণা তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। রাজা সাধু গণৎকার ডাকিয়ে কারণ জানতে চাইলেন। এক সাধু, রাজাকে বললেন—এ তো তবু এখানে ভালভাবে আছে। এর অতীত জন্মের কর্মফলের তালিকা দেখলে ভয় করে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এগুলির খণ্ডন হওয়ার উপায় কী? সাধু বললেন—একমাত্র উপায় হল কর্ম করে কর্মফলের দুর্ভোগ খণ্ডন করা। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল—আর কোনও উপায় নেই? সাধু বললেন কর্ম না-করলে জ্ঞানবিচার করতে হবে। এই বলে জ্ঞানযোগের সাধনপদ্ধতি বলে দিলেন। জ্ঞানবিচারের পদ্ধতি শুনে সে বলল—এ তো দেখছি আরও কঠিন। তখন হতাশায়, ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সাধু বললেন—এ তোমার এক জন্মের কর্মফল নয়। জন্মের পর জন্ম কুকীর্তির ফলে এই দুর্ভোগ। তোমাকে অতটা পথ সবটা ফিরে গিয়ে সব খণ্ডন করতে হবে। তখন বিবর্তনবাদের তত্ত্ব, কী করে নিম্নজন্ম থেকে ধাপে ধাপে মনুষ্যজন্ম, তারপর তদূর্ধ্বে ওঠে বুঝিয়ে দিলেন। সে দুঃখবেদনায় কাঁদতে আরম্ভ করল। 'হা ভগবান', 'হা ভগবান' করে কাঁদতে লাগল আর তার একটা একটা করে ইন্দ্রিয় গলতে লাগল। এ রকম করে সব ইন্দ্রিয় গলে গেল, শুধু প্রাণটা তখনও রয়ে গেল।

এ দিকে পাহাড়ের এক গুম্ফাতে এক সাধকের সাধনার বলে সর্ব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগসম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। সেই ব্যক্তির ব্যাকুল আর্তনাদে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। তার প্রতি সমবেদনায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'আহা' ধ্বনি; যেই না বলা 'আহা', অমনি তাঁর মাথায় একটা পাথর এসে পড়ল। পাথরের আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে ক্ষত হল। তিনি বেশ বেদনা পেলেন। সেই ব্যক্তির অত জন্মের বেদনার কিঞ্চিৎ সেই সাধু গ্রহণ করে নিলেন।

এর রহস্য হল মানুষের দুঃখের বোঝা সাধুসন্ন্যাসীর বেশে ভগবানই গ্রহণ করে লাঘব করেন। মানুষের ধর্ম হল দুঃখকে সরিয়ে সুখকে গ্রহণ করা।

তার এ রকম 'হা ভগবান', 'হা ভগবান' কান্না শুনে আরও একজন সাধকের মন দ্রবীভূত হল। তিনিও তাকে সমবেদনা জানিয়ে তার হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে 'ভগবান একে কৃপা কর'। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায়ও একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল এবং মাথা ফেটে রক্তপাত হতে লাগল। তিনিও এই ভাবে তার দুঃখের বোঝা মাথায় পেতে নিলেন।

ভোগ ব্যতীত কর্মফল খণ্ডন হয় না

এই সকল কর্মরহস্য শুনলে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। তারা সাধুসন্ন্যাসীর দুঃখবেদনার রহস্য না-জেনে ভুল বিচার করে। বহু বছর আগে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়েছিল—

'মানুষ নেবার বেলায় বলে আপন
দেবার বেলায় করে ছল।
আর দেবতারা দেবার বেলায় বলে আপন
নেবার বেলায় করে ছল।'

কর্মফল থেকে কারও রেহাই নেই। এমনকী সাধুসন্ন্যাসীদেরও মুক্তি নেই। তাঁরা যেই সমবেদনা জানাল অমনি তাঁদেরও দুর্ভোগের বোঝা বইতে হল। ভগবান নিজেই দুঃখ, কষ্ট ভোগ করার জন্য এক দল সাধুসন্ন্যাসী বানিয়ে রাখেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনিই স্বয়ং তা ভোগ করেন। অথচ বর্তমান সমাজে সাধুসন্ন্যাসীরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও উৎপীড়িত। শুধু মৌখিক প্রশংসাই তাঁদের প্রাপ্য। তাও কিছু পাওয়ার বিনিময়ে দেওয়া হয়। তা জানেন বলেই সাধুসন্ন্যাসীরা প্রশংসা, নিন্দা, মান, অপমানকে শত হস্ত দূরে রাখেন। মহাপুরুষ, অবতার পুরুষদের বাণী ও আচরণ অনুসরণ করতে না-পেরে পরবর্তীযুগে সেগুলিকে লোকের কাছে বিকৃত করে বা আপন খুশি মতো ব্যাখ্যা করা হয়।

যে যে-রকম জীবন নিয়েই আসুক তা আগুন নিয়ে খেলা বই আর কিছু নয়। দু'দিক দিয়ে সে পোড়ে। আত্মজ্ঞান পেলে আত্মজ্ঞান দিয়ে বাকি সব পোড়ায়। আর না-পেলে স্থূল জগতের দুঃখকষ্টের জ্বালায় পুড়ে মরে। [২৭।১০।৭৪]

গুরুবাকের তাৎপর্য

গুরুর পাদবন্দনা প্রকৃত গুরুভজন নয়। ওতে ডেরা বাঁধা হয় বা মাটির প্রতিমার উপর প্রথম মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। গুরুবন্দনা ঠিক ঠিক মতো হলে সব সমাধান হয়ে যায়। এর অর্থ—গুরুভজনের যতগুলি ক্রম বা অঙ্গ আছে সে সব সুষ্ঠু ভাবে মেনে তা পালন করলে অন্তরের শোধন হয় এবং শুদ্ধ বোধের উদয় হয়।

গুরুবাকের রহস্য বুঝতে সময় লাগে। 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' মুখে বলা সোজা এবং কাগজে বৃত্ত আঁকতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু নিজেকে বৃত্তাকাববোধে রূপায়িত করতে সময় লাগে—

'আমিকে কেন্দ্র করে আমির চারিধারে
বৃত্তের আকারে ঘুরি আমি বারে বারে
দেশ হতে দেশান্তরে রূপ হতে রূপান্তরে
নাম হতে নামান্তরে ভাব হতে ভাবান্তরে
বোধ হতে বোধান্তরে.........।' [৩।১১।৭৪]

অতিসূক্ষ্ম ও শুদ্ধবোধের পরিচয় হয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে

মনকে কামনার রাজ্য থেকে সরিয়ে নেবার জন্য গুরুর সাহায্য দরকার হয়। সদ্গুরু বা নিত্যসারথির বক্ষ থেকে একচুলও কেউ সরতে পারে না— এই বিশ্বাস যার থাকে সে সহজেই সন্দেহমুক্ত হয়।

বোধ এত সূক্ষ্ম জিনিস যে তার প্রকাশ ছাড়া তাকে ধরা যায় না। একবার এক যোগী নিজের ভিতরে বোধকে দেখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দেখল যে ভিতরে নাড়ী-ভুঁড়ি ও মল আছে। মল কমাবার জন্য খাওয়া বন্ধ করল। ফলে তাঁর শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। সে গুরুর কাছে সাহায্য চাইল।

গুরু বললেন—ভিতরের নাড়ী-ভুঁড়ি ও মলই শুধু দেখতে পেলি, আর কিছু দেখলি না? যা দিয়ে অর্থাৎ যার সাহায্যে এগুলি দেখলি তাকে দেখ্।

যোগী—কী করে দেখব?

গুরু—যা-দিয়ে এ সব তুমি দেখছ তাকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগে নিজে থাক এবং আর এক ভাগকে দেখ।

যোগী সেই ভাবেও দেখতে চেষ্টা করল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। গুরু তাকে আবার চেষ্টা করতে বললেন।

যোগী এবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তারপর বলল—সব অন্ধকার দেখছি।

গুরু—যা-দিয়ে অন্ধকার দেখছ তাই একটা আলো। সেই আলোকে ভাগ কর।

এই ভাবে গুরু তার মনকে দ্বৈতবোধে নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখছ?

যোগী—নানা রকম জ্যোতি এবং আলো দেখছি।

গুরু—আবার চেষ্টা কর। এবার কী দেখছ?

যোগী—এই..... বলে আর বলতে পারল না।

গুরু—ঠিক আছে, চলতে থাকুক।

তারপর যোগী আর কোনও কথা বলতে পারল না।

যেখানে বলা-কওয়া বন্ধ হয়ে যায় সেখানেই হল পরমাত্মার আবাস।

এবার আর একটি গল্প শোন—কোনও এক মহাত্মা 'এক'-এ কী রকম প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকজন দুষ্টলোক ষড়যন্ত্র করে এক যুবতী নারীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। সাধনার অনেক উচ্চস্তর পর্যন্ত উঠলেও নারীর পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের নারীর প্রতি দুর্বলতা থাকে।

সাধক সেই নারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তোমার কী চাই? তিনি মাতৃবোধেই তাকে গ্রহণ করলেন।

মেয়েটি উত্তরে বলল—তোমার ওই সুন্দর দেহটিকেই আমার প্রয়োজন, আর কিছুই চাই না।

মহাত্মা বললেন—এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? আজ তোমার এই দেহটির প্রয়োজন হল? আর এই দেহটিকে নিয়েই বা তুমি কী করবে?

নারী—আমার ভোগে লাগবে তোমার এই দেহ।

মহাত্মা—একতরফা কী ভোগ হয়?

নারী—হ্যাঁ, হয়।

মহাত্মা—বেশ, তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমার কয়েকটি কাজ বাকি আছে, সেগুলি আমি সেরে নিই।

এই বলে তিনি আসনে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দেহ ছেড়ে তাঁর মন কোথায় চলে গেল! শুধু দেহ পড়ে রইল জড়বৎ।

সেই নারী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেহ স্পর্শ করে দেখে যে মহাত্মার দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার কামনায় উত্তপ্ত শরীর মহাত্মার হিমশীতল দেহের সংস্পর্শে আসা মাত্রই 'ছ্যাঁৎ' করে উঠল। সে ভাবল—মহাত্মা তো জীবিত নেই, তাহলে এঁকে নিয়ে এখন আমি কী করব?

এই সব ভেবে সে যখন ওখান থেকে চলে আসছিল এমন সময় দেখে একটি বিরাট সাপ ফণা তুলে ছোবল দেবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু সাপটি একটুও নড়ল না। যারা মেয়েটিকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল তারা সাপ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। সে তখন কী করবে

বুঝতে না-পেরে এই সংকটকালে মহাত্মার কাছেই ফিরে এল এবং তাঁর চরণে এসে কেঁদে বলল—বাবা, আমাকে বাঁচাও।

মহাত্মার সমাধি যখন ভঙ্গ হল তিনি দেখলেন যে মেয়েটি মাটিতে পড়ে আছে, আর সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মহাত্মা সাপকে দেখে বললেন—তুমি আবার এলে কেন?

সাপ বলল—আমার আসার কারণ ছিল।

মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে মহাত্মার কাছে তার জঘন্য কাজের জন্য ক্ষমা চাইল এবং বলল—আমার কী উপায় হবে? আমাকে উদ্ধার করে দিতে পারেন? আমার ভিতরটা পাপের ময়লায় ভর্তি।

মহাত্মা—হ্যাঁ পারি, সব ময়লা আগে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে জ্বালিয়ে দাও।

মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল—জ্বালিয়ে দিলে তো আমি মরে যাব। আমার দরকার নেই পরিষ্কার করার, আমি চলি।

মহাত্মা বললেন—যেখানে ফিরে যাচ্ছ সেখানে তারা আরও বড় আগুন জ্বালিয়েছে, তোমার সর্বনাশ করার জন্য। ওর চাইতে আরও বড় আগুন জ্বালালে ওই আগুন নিভে যাবে।

মেয়েটি কী করবে বুঝতে পারে না, আবার এখানকার নির্দেশও তার মনঃপূত হচ্ছে না।

মহাত্মা বললেন—আচ্ছা, তুমি যখন আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছ তখন তুমি আমার কন্যা হলে। এসেছিলে ভোগ করতে। তারপর 'বাবা' বলে ডেকেছ। সুতরাং তোমার ভার আমি নিলাম।

তারপর মহাত্মা মেয়েটিকে আদেশ করলেন—যাও, ঐ কুণ্ড থেকে স্নান করে এসে এখানে বস।

মেয়েটি তাঁর নির্দেশ মতো স্নান করে এসে যথাস্থানে বসল। তারপর তাকে তুলসীপাতা ও জল খেতে দিয়ে মহাত্মা বললেন—এই আসনে বসে আমি যা বলব তা-ই ভাবতে আরম্ভ কর। যতক্ষণ না তোমার সামনে খাবার রেখে দেওয়া হয় ততক্ষণ এই আসন ছেড়ে তুমি উঠতে পারবে না।

তিনি মেয়েটিকে একটি নাম দিলেন। নাম পেয়ে সে ভাবতে আরম্ভ করল। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেদিন সন্ধ্যা ও রাত্রি পার হয়ে গেল। পরদিন দুপুরে সে দেখল যে তার সামনে তিনটি ফল রাখা আছে, কিন্তু মহাত্মা সেখানে নেই। শুধু ধুনি জ্বলছে। সে আসন ছেড়ে উঠতে পারল না, সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে তার। সে একটি ফল খেয়ে নিল। আরেকটি ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়ল যে মহাত্মা তাকে ভাবনা করতে বলে গেছেন। সে আবার মহাত্মাব দেওয়া নাম ভাবনা করতে লাগল। এই ভাবে তিন দিন, তিন রাত্রি পার হয়ে গেল। দেহের সব অংশ তার অসার হয়ে গেছে, সে আর উঠতে পারছিল না।

তখন মেয়েটি তৃতীয় ফলটি খেল। তারপর সে দেখতে পেল যে মহাত্মা তাকে যে নামটি দিয়েছিলেন সেই নামটি চার দিক থেকে ভেসে আসছে এবং চতুর্দিক আলোর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে। এই ভাবে সাত দিন পার হয়ে গেল। সাত দিন পরে সে চোখ মেলে দেখল সামনে গুরু বসে আছেন। গুরু তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

গুরু তাকে বললেন—কী ভোগ করতে এসে কী ভোগ করছ?

মেয়েটি আর কথা বলতে পারে না, শুধু চোখ দিয়ে তার জল পড়তে থাকে।

সেই নারী যখন জীবনের চরম অধোগতিতে বা দুর্গতিতে পড়েছিল তখন ঐ ভাবে নাম না-দিলে মহাত্মা তাকে উদ্ধার করতে পারতেন না। এক ফোঁটা জল না-পেলে চাতক পাখির যেমন অবস্থা হয় সে রকম এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করার মতো ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা থাকলে তবেই নাম পেলে কাজ হয়।

[১০।১১।৭৪]

প্রজ্ঞারূপী আত্মগুরুর মহিমা

আত্মচৈতন্যই হল আত্মগুরু। তিনি-ই শিব এবং তিনি-ই আদিগুরু। আত্মগুরুর কৃপায় মন পায় জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমধন, তখন প্রেমানন্দে নাচে দিব্যজীবন। এই আত্মগুরু অন্তর থেকে নির্দেশ দেন—এ-ই। আর কিছু বলতে পারেন না। প্রজ্ঞারূপে এসে তিনি ধরিয়ে দেন।

বাইরের গুরু ছোট নন, কিন্তু ভিতরে যিনি আছেন তাঁর কৃপা ছাড়া বাইরের গুরুর মূল্যায়ন হয় না। গুরুর উপরে আছেন এক গুরু—আত্মগুরু। বাইরের গুরু হলেন তাঁরই একটা প্রকাশভঙ্গিমা। [১৯।১১।৭৪]

সদ্‌গুরুপ্রদত্ত সত্যের বিজ্ঞানই হল সত্যলাভের চাবি

সদ্‌গুরুদের কাছে যে চাবি পাওয়া যায় তা হল সত্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বা বিজ্ঞান। এর বেশি আর কিছু পাওয়া যায় না। যে সত্যের বিজ্ঞান বা পদ্ধতি পেয়েছে সে সদ্‌গুরুকেই পেয়েছে। এই কথা মনে থাকলে সদ্‌গুরুব অভাববোধ হয় না।

পড়াশুনা, জানা ও দেখার পরেও যা বাকি থাকে তা-ই সদ্‌গুরুদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রদত্ত বাণীর সঙ্গে জানা ও পঠিত বিষয়ের মিশ্রণ করতে নেই।

সদ্‌গুরুর বাণী ও আদর্শ যারা অবলম্বন করে তারা অতি সহজেই দুরূহ সাধনার পথকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু যারা নিজস্ব অসংযত ও অসংস্কৃত গুরুবিরোধী মতামত বা বিচারবুদ্ধি নিয়ে তাঁদের বক্তব্য বিষয় গ্রহণ করে তারা সত্যকে নাশ করে। তবে এই কথা স্বীকার্য যে মৌলিক অনুভূতির এত সূক্ষ্ম তত্ত্বকে বিনা সাধনায় গ্রহণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

আত্মচেষ্টায় এই সকল তত্ত্ব অর্জন করতে হলে বহু জন্ম কঠোর তপস্যা করতে হয়। কিন্তু সদ্‌গুরু কর্তৃক সৎসঙ্গে প্রদত্ত নির্দেশে অল্প কয়েক জন্মের মধ্যেই সাধনসিদ্ধি লাভ করা যায়। সুতরাং যারা পেয়েও তা গ্রহণ করে না তাদের বহু জন্ম আবার সাধনা করতে হয়। [২৪।১১।৭৪]

স্বানুভবসিদ্ধ আত্মগুরু ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব নেন

গুরু স্বয়ং বেদনাঘন। সমগ্র বেদনার সঙ্গে পরিচিত না-হলে তিনি শিষ্যদের এত বেদনার ভার বহন করতে পারতেন না। অবতারবোধে যখন তিনি নেমে আসেন তখন সমগ্র দুঃখকে বরণ করে নিতে আসেন।

পৃথিবীর দুঃখের বোঝা সদ্‌গুরু বা অবতারপুরুষ এসে না-নিয়ে গেলে মানুষের পক্ষে জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ ও বেদনাদায়ক হতো। তাঁরা কী ভাবে তা নিজেদের ভিতরে নিয়ে নেন সেই বিজ্ঞান সাধারণের কাছে অজ্ঞাত এবং তাঁরাও এর গূঢ় রহস্য প্রকাশ করেন না। শিষ্য যখন গুরু হয়ে যায়, তখনই সে জানতে পারে। সেই জন্য বলা হয় গুরুতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব অনুভবসিদ্ধ। শুধু পুঁথিপুস্তক নাড়াচাড়া করে এ সব জানা যায় না। [৩।১২।৭৪]

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

১। যে পদ্ধতির মাধ্যমে অন্তরাত্মার বিকাশ হয় তাকে শিক্ষা বলে।

২। বৈচিত্র্য, নানাত্ব-বহুত্ব ও দ্বৈতের মূলে যে 'নিত্যাদ্বৈত' বর্তমান, তা যার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, তাকে বলে শিক্ষা।

৩। আত্মজ্ঞানে বা দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতিই শিক্ষা।

৪। যে বিজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুর রহস্য অবগত হয়ে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা হয়, তাকে শিক্ষা বলে।

৫। অখণ্ড সত্যের পরিচয় যার মাধ্যমে জানা যায় তা-ই শিক্ষা।

৬। শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি যার মাধ্যমে হয়, তাকেই বলে শিক্ষা।

৭। ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা-ই শিক্ষা।

৮। যার দ্বারা দেহ-মন-প্রাণের অশুদ্ধ বিকার শোধিত হয় তাকেই বলে যথার্থ শিক্ষা।

৯। যার দ্বারা অজ্ঞান জ্ঞানে পরিণত হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় তা-ই শিক্ষা।

১০। যার দ্বারা বস্তুবিজ্ঞানের ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয় তা-ই যথার্থ শিক্ষা।

১১। শিক্ষা ও বিদ্যা সমার্থবোধক। বিদ্যা দ্বিবিধ, যথা—অপরা ও পরা।

অপরাবিদ্যার দ্বারা জাগতিক জ্ঞান লাভ হয়। একেই বলে লৌকিক জ্ঞান। পরাবিদ্যার দ্বারা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে। একে দিব্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। অদ্বয়তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য একের বিজ্ঞানকেই সর্বোত্তম শিক্ষা বা পরাবিদ্যা বলে।

১২। বিদ্যা বা শিক্ষার চারটি ক্রম হল চতুর্বিধ বিজ্ঞান। যথা—(ক) বহিঃসত্তায় অজ্ঞানের বিজ্ঞান যা বৈচিত্র্যপ্রধান। (খ) অন্তঃসত্তায় জ্ঞানের বিজ্ঞান, যা দ্বৈতপ্রধান। (গ) কেন্দ্রসত্তায় বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, যা অদ্বৈতপ্রধান। (ঘ) তুরীয় ও তুরীয়াতীতে প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান, যা নিত্যাদ্বৈতের বিজ্ঞান।

১৩। (ক) অজ্ঞানের বিজ্ঞান হল শক্তিপ্রধান। একে শক্তির বিজ্ঞান বলা হয়।

(খ) জ্ঞানের বিজ্ঞান হল জ্ঞানপ্রধান।

(গ) বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হল আনন্দপ্রধান। একে আনন্দের বিজ্ঞানও বলা হয়।

(ঘ) প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান হল প্রেমপ্রধান। একে প্রেমের বিজ্ঞান বলে।

১৪। (ক) অজ্ঞানের বিজ্ঞান হল দেহেন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান। তা ক্রিয়াপ্রধান ও স্থূল বস্তুসাপেক্ষ। একে ক্রিয়াশক্তির বা সন্ধিনীশক্তির বিজ্ঞানও বলা হয়।

(খ) জ্ঞানের বিজ্ঞান হল মন ও বুদ্ধির বিজ্ঞান। তা যুক্তি ও বিচার প্রধান। তা সূক্ষ্ম বস্তুসাপেক্ষ কিন্তু স্থূল বস্তুনিরপেক্ষ অর্থাৎ বহিঃসত্তানিরপেক্ষ। একে জ্ঞানশক্তির বা সম্বিৎশক্তির বিজ্ঞানও বলা হয়।

(গ) বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হল আত্মার বিজ্ঞান, তা আনন্দপ্রধান ও সূক্ষ্মতর বস্তুসাপেক্ষ কিন্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুনিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্তঃসত্তা ও বহিঃসত্তা নিরপেক্ষ, কেবল কেন্দ্রসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। একে হ্লাদিনীশক্তির বা আনন্দশক্তির বিজ্ঞানও বলা হয়।

(ঘ) প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান হল পরমাত্মার বিজ্ঞান। তা প্রেমপ্রধান ও সূক্ষ্মতম বস্তুসাপেক্ষ (অর্থাৎ স্বয়ংপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ) কিন্তু সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল বস্তুনিরপেক্ষ। অর্থাৎ কেন্দ্রসত্তা, অন্তঃসত্তা ও বহিঃসত্তা নিরপেক্ষ। একে প্রীতিশক্তির বা প্রেমশক্তির বিজ্ঞান বলা হয়।

ঋষিবাণীরূপে আত্মগুরুই সৃষ্টির সর্বস্তরে বর্তমান

ঋষিবাক্য যথা 'সর্বভূতে হরি আছে' বা 'তুমিই সেই'—তা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করা যায় না পূর্ব থেকে সাধনচতুষ্টয়ের যোগ্যতা ও অধিকার না-থাকলে। বিচারপূর্বক ও ভক্তিপূর্বক সাধনার পরে গুরুবাক্যের মহিমা ধরা পড়ে। তখন দেখা যায়—সাধক, সাধন, সিদ্ধি সবই আত্মগুরুই স্বয়ং। তিনিই অদ্বয় ব্রহ্ম-আত্মা সচ্চিদানন্দঘন।

কোনও এক মহাত্মা সোঽহংবাদের মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন সকলকে। তিনি একদিন তাঁর এক শিষ্যকে বললেন—আমি যে নিজেকে দীক্ষার মাধ্যমে তোদের বোধের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি তাকে কালি মাখিয়ে, অভুক্ত রেখে ফেলে রাখিস না। কী ভাবে রাখলে গুরুকে শ্রদ্ধাসহকারে রাখা যায় তার বিধানও তিনি শিষ্যকে বলে দিলেন—প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গে আমাকে স্মরণে রাখবি। নইলে আমি তুষ্ট হব না। আর আমি তুষ্ট না-হলে তোরও কিছু হবে না।

আত্মদীক্ষার শিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আসল দীক্ষা জন্মের সাথে সাথে সকলকে দেওয়াই আছে। তা ধরিয়ে দিতে সাধারণের জন্য বাহ্যিক দীক্ষার প্রয়োজন হয়। ভগবান সবার মধ্যে স্বয়ং অবস্থান করছেন। তা-ই বলা হয় নিজেকেই দিয়ে রেখেছেন। তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা দীক্ষার প্রয়োজন হয়। অনেকে স্বপ্নেও দীক্ষা পায়। মা-বাবাকে যদি কেউ ভগবান বলে মানতে পারে তবে তার লৌকিক দীক্ষার আর প্রয়োজন হয় না। নামকরণের সময় যে নাম দিয়ে রাখা হয় তাও দীক্ষা।

প্রকৃতির কাজের মাধ্যমে আত্মদীক্ষার শিক্ষা মেলে

প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে নিজেকে বহু ভাবে প্রকাশিত করে সকলের জন্য ভোগের উপকরণ সরবরাহ করে, কিন্তু বিনিময়ে সে কিছু আশাও করে না। সূর্য আলো না-দিলে, বাতাস বায়ুরূপে প্রবাহিত না-হলে মানুষ বাঁচতে পারত না। এই ভাবে আত্মদানের মাধ্যমে তারা আত্মদানের তাৎপর্যকেই প্রকাশ করছে এবং সকলকে শিক্ষা দিচ্ছে। ভগবৎ নামসাধনার মধ্যেও এই ভাব ও তাৎপর্য নিহিত আছে। সেগুলি না-বুঝতে পারলে নামের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, নাম হয় dead sound। [১৩।১।৭৫]

স্ববোধ-আত্মাই সদ্গুরু, চিতিমাতাস্বরূপ

নিজবোধরূপী গুরু বা মাতা সকলের মধ্যে বিচিত্ররূপে খেলে চলেছেন। কাজেই ঈশ্বরীয় তত্ত্ব জড়ত্বের বিষয় নয়। সবই চৈতন্যময়। সবই চৈতন্যের বিশেষ অবস্থা। চৈতন্য নিজেই জড় রূপ ধারণ করেছে। তা খুব গভীর অনুভূতির বিষয়। বাহ্যদৃষ্টিতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য গ্রাহ্য হলেও আত্মদৃষ্টিতে কোনও দ্বৈত-প্রতীতি সিদ্ধ নয়, তা জ্ঞান-অজ্ঞানরূপে চিৎশক্তিরই বিলাস। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্ম-আত্মাই আছেন এবং সর্বত্র তাঁর স্বভাবপ্রকৃতিরই খেলা চলছে। কেউ কাউকে দোষী করতে পারে না বা অপরকে ছোট করতে পারে না। দোষদৃষ্টি হল ভেদদৃষ্টি। তা অজ্ঞানের লক্ষণ। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে অজ্ঞানের নিরসন হয়। [১৯।১।৭৫]

কৃপালাভের তাৎপর্য

অনুভবসিদ্ধগণের বা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে সর্বোত্তম জ্ঞান-অনুভূতির সাহায্য পাওয়াই হল যথার্থ কৃপালাভের তাৎপর্য। এই কৃপা হল তাঁদের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। মহাজনদের মাধ্যমে ভগবান কৃপা করেন। সত্যানুভূতি যাঁদের হয়েছে তাঁদের মাধ্যমে সত্য ব্যক্ত হয়। সত্যানুভূতি হল শুদ্ধবোধের তত্ত্ব।

গুরুর অনুশাসনের অভিনব তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক অনুশাসনের মধ্যে গুরু ও ইষ্টে অভেদজ্ঞান এবং গুরুবাক্য ও মন্ত্রে অভেদজ্ঞান করা হল সর্বপ্রধান অনুশাসন। গুরুর নির্দেশ মানাই হল তার (শিষ্যের) আচরণ ও সাধন। সর্বভূতে সমদৃষ্টি হল গুরুপাদ দর্শন। গুরু হলেন যেন ডাক্তার, মন্ত্র হল ওষুধ। গুরুর নির্দেশ মানা হল পথ্য। সমবোধে, একবোধে বা আপনবোধে তার আচরণ হল শুশ্রূষা।

সত্যানুভূতির পথে গুরুবাণী মানার ফল

সত্যানুভূতির পথ খুব সূক্ষ্ম ও জটিল। সদ্‌গুরুর উপরে নির্ভর করলে তিনি হাত ধরে নিয়ে যান। গুরুবাক্য মেনে তাঁকে অনুসরণ করলে তাঁর কৃপা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়। বাইরের গুরুর উপরে নির্ভর করলেও আত্মগুরুর উপরে নির্ভর করতে হয় ষোলো আনার উপরে সতেরো আনা। আত্মগুরুকে পাওয়া যায় নিজের অন্তরে 'আমিবোধ'-এর কেন্দ্রে। এই 'আমিবোধ' আছে অহংকারের মূলে বা গভীরে।

গুরুবাক্ হল সত্য ও মন্ত্র। সত্যকে অবলম্বন করলে মিথ্যা থাকে না। গুরুর বাক্য থেকে মন যদি একটু সরে যায় তবেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য সর্ব অবস্থাতেই অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যেও খুব সচেতন হয়ে থাকতে হয়।

গুরু যে বোধের কথা বলে দেন সেই বোধ দিয়েই সব কিছু দেখতে হয়। বোধের কথায় থাকলে ও চললে জ্ঞাননয়ন খোলে। তাই বলা হয় 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' দিয়ে গুরু চক্ষুদান করেন।

অপরের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তার গুণগান করতে হয়। অপরের গুণগানে নিজেরই গুণ বৃদ্ধি পায়। অপরের নিন্দা করলে নিন্দার মাধ্যমে অপরের দোষ নিজের মধ্যে আসে। খেয়াল রাখতে হয় যে অপরের নিন্দা করলে নিজের গুরুকে বা আত্মাকেই নিন্দা করা হয়।

গুরুবাকের তাৎপর্য

বাক্ সম্বন্ধে সকলেরই সচেতন থাকা দরকার। বাক্ যেন নষ্ট বা কলুষিত না-হয়। বাক্ নষ্ট হয় দোষ-দৃষ্টির মাধ্যমে। বাক্ নষ্ট হলে তেজতত্ত্বে ভাটা পড়ে। সর্ববিদ্যারূপী জ্ঞানেশ্বরী মা সরস্বতীর আসন হল কণ্ঠে বা জিহ্বায়। সরস্বতী হলেন গুরুর মুখ। বাগ্‌দেবী জিহ্বায় প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য সৎ-এর সঙ্গে মন যুক্ত হলে মিথ্যার প্রভাব কেটে যায়। [২১।১।৭৫]

আত্মগুরুর বাণীতে আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়

আত্মগুরু বারবার শোনান যে আত্মাতিরিক্ত আর কেউ নেই। এই আলোর দিকে দৃষ্টিপাত না-করে চোখ বুজে থাকলে গুরুকৃপা পাওয়া যায় না। গুরুর কথা মেনে, জীবনে তা ব্যবহার করে, তার রসাস্বাদন করতে হয়। অখণ্ড বোধে তাঁকে ধরলে স্থিতিতে বা গতিতে, যেখানেই হোক না কেন, শান্তিতে থাকা যায়।

গুরু সকলকে অখণ্ড বোধের তত্ত্ব ধরিয়ে দিলেও দু'একজন শিষ্য ছাড়া অপর সকলে আসল বস্তু ধরতে

পারে না। আত্মবিজ্ঞানের প্রথম ধাপ ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে যায়। সমষ্টিচৈতন্য হল ব্যষ্টিচৈতন্যের ধারক, বাহক ও গুরু। সমষ্টিবোধে বিজ্ঞানময় গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রজ্ঞানের বিজ্ঞানে আপনিই যাওয়া যায় প্রজ্ঞানঘন গুরুর কৃপাশিসে।

প্রজ্ঞানঘন গুরু কাউকে বাদ দিতে পারেন না। যেমন, বশিষ্ঠদেব প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলে শ্রীরামচন্দ্রের অজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেননি। তাঁকে অজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে বললেন—'তুমিই সেই'। রামচন্দ্রও বশিষ্ঠদেবকে গুরু বলে বন্দনা করলেন। উভয়ে উভয়কে সমর্থন জানালেন বলেই উভয়ের মহত্ত্ব প্রকাশিত হল। গুরু ও শিষ্যর সমানভাব আসে সাধনার পরিণামে। প্রথমেই সমানভাব থাকে না। বশিষ্ঠদেব উপরে বসে ঢেলে দিলেন অর্থাৎ উচ্চতম অবস্থায় থেকে তত্ত্ব পরিবেশন করলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র নিম্নভূমি থেকে সেই তত্ত্ব শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করলেন। তারপর উভয়ে এক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—তুমি হলে সেই রাম যেখান থেকে আমি আমিতত্ত্ব পরিবেশন করছি। [২৬।১।৭৫]

চিদানন্দময়ী মা-ই হলেন গুরুশক্তি ও চিতিশক্তি

চিদানন্দময়ী মায়ের সত্য পরিচয় হল গুরুশক্তি, চিতিশক্তি বা বিবেক। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে তাঁকে মানা হলে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়।

জপ-ধ্যান, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি অধ্যাত্মসাধনার স্তরগুলি এমন ক্রম ধারায় বাঁধা আছে যে প্রয়োজন অনুসারে সেই আত্মগুরুর সঙ্গে ও নামের সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ হয়ে যায় এবং সেই গুরুও প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে দেন এবং ক্রম ধারায় তার মধ্যে চৈতন্যের বিস্তার হয়।

সদ্‌গুরুর শাসন কঠোর হলেও সিদ্ধিপ্রদ

মাঝে মাঝে সৎসঙ্গে সদ্‌গুরুর মুখে কড়া কথা শোনা যায়। কারণ তিনি কখনও স্থূল ভাবে মারেন না। ভাব দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবে এমন কৌশলে মারেন যে ভাবের চাপের প্রভাব দ্বারা সৎসঙ্গের ভাবনাকে কিছু দিন জাগিয়ে রাখেন। [২৮।১।৭৫]

আত্মলীলায় আত্মমহিমার অভিনবরূপ

মানুষ যাদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে তারা যে কত মহৎ তা চিদানন্দময়ী একদিন দেখালেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'মেথর' নামক কবিতার মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

'কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে।
তুমি আছ তাই আছে গৃহবাসে রুচি
নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।'

মানুষ নারায়ণ দেখতে চায়। যে নারায়ণ জমাদার বেশে প্রতিদিন মাথায় করে ময়লা নিয়ে ফেলে দেয়, সেই নারায়ণকে সকলে ঘৃণা করে! আমরা ময়লা তৈরি করি কিন্তু পরিষ্কার করতে পারি না। ময়লা পরিষ্কার করে যে সে জগৎকে মলশূন্য করে। পরিষ্কার করে যে দেয় সে-ই তো হল গুরু। তাই গুরুর আরেক রূপ হল দুঃখমূর্তি। এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মেথররা সব দেবদেবীর নামে তাদের নামকরণ করে। তা তাদের প্রচলিত রীতি। ময়লা পরিষ্কার করে বলে তারা অস্পৃশ্য নয়। কারণ কোনও কাজই হীন নয়। কর্মরূপেই পরমশক্তি ফুটে ওঠে পরমাত্মার বক্ষে। [২।২।৭৫]

অখণ্ড বিশুদ্ধ বোধসত্তারূপ 'আমি'-র মাহাত্ম্য

'আমি' হল সেই অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্তা যার মধ্যে প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান ওঠে ভাসে ও ডোবে। আমি আছে বলেই সব আছে—এই বোধ ভিতরে খেললে জাতি ধর্মভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি ভেদাভেদ সহজে দূর হয়ে যায় এবং তখন সহজেই শান্তি আসে। অসহায় হলে হয় অশান্তি। সমত্বের স্মৃতি দ্বারা সমান হয়, আসে শান্তি।

দুঃখকে যে গ্রাহ্য না-করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে সে হল প্রকৃত বীর। অখণ্ড দুঃখের ভাবনা করে বা নিজেকে সব দুঃখের সঙ্গে একীভূত করে অথবা দুঃখের স্বরূপকে ভাবনা করেও দুঃখকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সমগ্র দুঃখের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে দুঃখের বিপরীত ধর্ম সুখ আপনিই আসে। 'সব দুঃখের ঘনীভূত মূর্তি আমি' এই ভাবনা 'এর' মধ্যে (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) খেলেছে। তার ফলে দুঃখের রহস্য সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। [৪।২।৭৫]

গুরুপ্রসঙ্গে নিজের কথা

কথা প্রসঙ্গে নিজগুরু প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একসময় বললেন—প্রথম গুরু হল 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) বাবা-মা। তাঁরা সিদ্ধ কী অসিদ্ধ এ বিচার করা 'এর' সাজে না। আর লৌকিক গুরুর 'এর' প্রয়োজন নেই। কারণ জন্মগ্রহণ মাত্র 'এর' দেহ-মন-প্রাণ দেবতার কাজের জন্য সমর্পণ করা আছে।

[১১।২।৭৫]

নিজের বৃহত্তম অংশই গুরু বা মা

অদ্বয়বোধে গুরু, মা, ইষ্ট, সাধক, সাধন, সিদ্ধি একাকার হয়ে যায়। সেই বোধের অনুভূতির জন্য মনে রাখতে হবে যে মা ও গুরু একজনেরই দুই পরিচয়। নিজের বৃহত্তম অংশের নাম মা বা গুরু। কাজেই ক্ষুদ্র অংশ বৃহৎ অংশের সাহায্য সর্বদা চাইবে। Imperfect part perfect-কে এবং individual part Universal-কে চায়। এই কারণে বাস্তবজগতে দেখা যায় ছোট-বড় সকলেই তার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে বৃহৎ বস্তুকে চায়। যদিও অখণ্ড অদ্বয় আত্মার মধ্যে অংশ-অংশী ভেদভাবনা সম্ভব নয়। জগৎদৃষ্টিতে তা অজ্ঞানবশত ব্যবহৃত হয়।

সদ্‌গুরুর আচরণের অভিনবত্ব

সদ্‌গুরুগণ সাধনকারীর অক্ষমতার কথা জানতে পেরেই তাদের জন্য সাধনা সংক্ষেপ করে দিয়ে বলেন—'তুই এইটুকু কর্, বাকিটুকু আমি করে দেব।' তিনি শিষ্যের ভার নিলে শিষ্যের হয়ে কাজ করেন। কী ভাবে কাজ করেন তার কৌশল গুরু ব্যতীত আর কেউ জানে না। কেন্দ্রসত্তায় গুরুর অবারিত দ্বার; সেখান থেকে তিনি সব কিছু এনে দিতে পারেন।

শিষ্য গুরুর কাজ টের পায় না। সাধনা করতে করতে দেখা যায় যে তার দোষত্রুটি অনেক শোধন হয়ে গেছে। সে নিজে কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু তার মধ্যে অনুভূতি খেলতে থাকে। এই ভাবে ধাপে ধাপে বোধের পূর্ণ অভিব্যক্তি তার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখনই বলা হয় সহস্রদল[১] পদ্মের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। তার দর্শন ইত্যাদি না-হলেও সে সহস্রদলে যেতে পারে। সব কিছুর মধ্যে একবোধকে পাওয়ার নাম হল সহস্রদল খুলে যাওয়া।

১। সহস্রদল—সমবোধের বা একবোধের প্রকাশ ও বিকাশ।

পিতা-মাতা যেমন অবাধ্য সন্তানের সব দুরন্তপনা সহ্য করে নেন সেইরূপ সদ্‌গুরুও লঘুর ভাবকে নিজের মধ্যে absorb করে নেন। তখন ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি আবির্ভূত হয় এবং ব্যষ্টির ত্রুটি ইত্যাদি শোধন হয়ে যায়। এখানে আবির্ভাব অর্থে সত্যবোধের বিশেষ প্রকাশভঙ্গিমাকে বলা হল। [৪।৩।৭৫]

সৎ শিষ্যের সঙ্গে সদ্‌গুরুর অভিন্ন সম্বন্ধ

গুরু শব্দের তাৎপর্য অতীব গভীর। কুল[১] গুরু শব্দটি খুবই প্রচলিত। কুল শব্দ হতেই কৌল হয়েছে। কৌল হল তন্ত্র মতে শ্রেষ্ঠ গুরু এবং বেদান্ত মতে পরমহংস। গুরু বললে সব সময় বোধস্বরূপকে ধরে নিতে হয় এবং ব্যক্তিগুরুকে বোধস্বরূপের প্রতীক হিসাবে রাখতে হয়। কারণ গুরুর স্থূল রূপের মধ্যে গুরুকে পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। বোধের বোধে তাঁকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়।

গুরুবাকের মধ্যে বাস করাই হল সত্যে বাস করা। গুরু ভাবের বা বোধের সঙ্গে যখন শিষ্যের গুরুবোধের মিলন হয় তখনই তাকে বলে গুরুতাদাত্ম্য।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হল বাহ্যিক। মূলত উভয়ই এক তত্ত্বের অন্তর্গত বলে অভেদ। বিজ্ঞানাত্মার দিক থেকে গুরু ও শিষ্যে ভেদ থাকে। গুরু যখন শিষ্যকে গুরুরূপে অনুভব করেন তখন তাকে গুরুর আসনে বসিয়ে দেন।

একবার কাঠিয়াবাবা ও তাঁর গুরু একই স্থানে বসেছিলেন। যত লোক সাধু দর্শন করতে আসছে সকলেই কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করে তাঁর চরণে প্রণামী দিচ্ছে। তাঁর গুরু দেখলেন কাঠিয়াবাবা তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে; সুতবাং এখন আর দু'জনে এক জায়গায় এক সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

কাঠিয়াবাবাকে তিনি বললেন—তুমি থাক। আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব কারণ, দো শের এক জঙ্গলমে নহী রহ্ সকতা।

কাঠিয়াবাবা গুরুর বিচ্ছেদ সইতে না-পেরে, অত বড় যোগীপুরুষ হয়েও ছোট বালকের মতো গুরুর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বললেন—এতদিন আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করেছি এখন আমাকে ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ? কাঠিয়াবাবার এই দুর্বলতাকে কেউ কেউ মোহমায়া বলতে পারে, আবার কেউ কেউ বলতে পারে যে শিষ্যকে পূর্ণ করে দেবার পরেও শিষ্য গুরুকে ছেড়ে থাকতে পারছে না! এটা মোহ বা মায়া নয়। এটাই আসল জিনিস।

কাঠিয়াবাবা গুরুকে বললেন—তোমার জিনিস, তোমার তত্ত্ব তুমি আমাকে দিয়েছ। তোমাকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব? তুমি আমার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি কী করব? কাঠিয়াবাবা গুরুকে বোধরূপেই ধরেছিলেন।

গুরু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ম্যায় হর্‌বকত্ তেরে সাথ রহুঙ্গা। কাজেই সত্যস্বরূপকে পাওয়া যায় সর্বসাধনার শেষে আপনবোধের গভীরে—অদ্বয়বোধে বা অখণ্ড বোধে।

তত্ত্বানুভূতি হল সর্বভাববোধের অধিষ্ঠান ও সমাধান

তত্ত্ব পাবার পরই রূপের গুরুকে যথার্থ ভাবে পাওয়া যায়। কাজেই সচ্চিদানন্দময়ী মা 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) অনেক কিছু দেখালেন। তাঁকে বলা হল—'মা! তোকে পেলাম, কিন্তু সর্বসময়ের জন্য পেতে চাই।' চিতি মাতা তখন বোধে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'রূপের মধ্যেই বোধ সত্য। সর্বরূপ বোধস্বরূপেরই অভিব্যক্তি।' তাই তোমাদের সকলের মধ্যে বোধস্বরূপিণী মাকেই দেখতে পাই।

১। কুল—কু হল ব্রহ্ম, ল হল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানশক্তিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি হলেন কৌলগুরু।

শ্রীরামচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেও রূপের জন্য পাগল হয়ে 'হা সীতা, হা সীতা' করে কাঁদলেন। আত্মা সত্য বলেই আত্মীয় সত্য হয়। কোনওটাই কোনওটা থেকে ছোট নয়।

রূপের মূল্য কেউ দিতে চায় না। কিন্তু রূপের মর্যাদা সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখিয়ে দিলেন সবার শেষে। রূপ ছোট হতে পারে না। কারণ ভগবান তত্ত্বের থেকে নেমে এসেই রূপ ধারণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণও রূপের পূজা-আরাধনা করেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর সম্বন্ধে কথিত আছে যে মা সরস্বতী জানেন মধুসূদন সরস্বতীর খবর এবং মধুসূদন সরস্বতী জানেন মায়ের খবর। এহেন জ্ঞানীপুরুষ একতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শেষে তত্ত্বের উপরে প্রেমের স্থান রাখলেন। তিনি বালগোপালের বিগ্রহকে নিত্যসেবার উদ্দেশ্যে আপনবোধে গ্রহণ করে জ্ঞানের উপরে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কাজেই আপনবোধে সবকে গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞানী আপন আপন ভাব নিয়ে সংসারে চলতে পারেন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সংসার ত্যাগ করে যান তাঁরাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরে এসে জগতের যথার্থ ব্যবহার ও মূল্যবোধ শিখিয়ে দেন সবাইকে আচরণের মাধ্যমে।

জগতের কোনও কিছু ব্রহ্মশূন্য নয়। ব্রহ্মশূন্য কোনও বস্তু থাকলে তা ব্রহ্ম হতে বড় হয়ে যায়; কিন্তু তা কখনওই সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্ম অতিরিক্ত কিছু নেই এবং তা হতেও পারে না। এমনকী ব্রহ্মের সমানও কিছু নেই। একমাত্র ব্রহ্মই স্বয়ং স্বমহিমায় নিত্যপূর্ণ বর্তমান।

গুরু তত্ত্বজ্ঞান দেবার পরেও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি খুলে দেন। তিনি জানেন একতার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার প্রয়োজন। একতার মধ্যে বৈচিত্র্য না-থাকলে তা নীরস এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা না-থাকলে হয় chaos। একতার সঙ্গে যখন বৈচিত্র্য যুক্ত হয় তখন হয় সর্বসত্য। সত্য-শিব-সুন্দর হল সংসার[১]। সেই জন্য সংসারে বাস করাই হল সহস্রদলে বাস করা। এই সংসার হল সমসার। [৪।৩।৭৫]

দিব্যমানবদের অভিনব আচরণ ও অনুশাসন

যাঁরা বিকার শোধনের বিজ্ঞান অধিকারীভেদ বিবেচনা না-করে সকলকে সমান ভাবে ধরিয়ে দিয়ে যান, তাঁরা জগতে দিব্যমানব বলে পরিচিত। এক নিত্যবস্তুর মধ্যে বড়-ছোট বা অধিকারী-অনধিকারী এরূপ ভেদ করেন না তাঁরা।

গুরুপ্রদত্ত প্রজ্ঞার আলো নিয়ে জীবনে চলতে হয়। গুরুমুখে পুনঃপুনঃ সদালোচনা বা তত্ত্বালোচনা শুনেই পুরুষোত্তমের বিজ্ঞান পাওয়া যায়। তা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই। অনেকে পরমাত্মতত্ত্বকে গুহ্য রাখার নির্দেশ দেন; কিন্তু যার কাছ থেকে গোপন রাখা হয় বা যাকে বাদ দেবার কথা বলা হয় সে যে তার নিজেরই অংশ সেই দিকে তার খেয়াল থাকে না। তাই বলা হয়—

'বঞ্চিত করো না আপনারে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধরে
যদি সাধ থাকে অন্তরে পূর্ণতা আস্বাদনের তরে
সমভাবে সমবোধে গ্রহণ করো সবারে।'

সমতা রাখার জন্য সব কিছু গ্রহণ করতে হয়। সসীম ভাবেও এক প্রকার মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু তা হল অনন্ত অসীম ভাবের একটি বিশেষ ভাব বা অবস্থা। [৮।৬।৭৫]

১। সংসার—সম + সার। যেখানে সমত্বই হল সার, তা-ই হল সংসার। সমত্ব সার না-হলে তা সং-এ পর্যবসিত হয় অর্থাৎ মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়। সেই অর্থে সংসারকে মিথ্যা বলা হয়। ব্রহ্মদৃষ্টিতে কিন্তু সংসার হল সমসার।

Prophet ও Super Prophet প্রসঙ্গে

জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যাঁরা ধর্মপ্রচার করেন তাঁদের prophet বলে। দুই শ্রেণীর prophet আছেন, যেমন prophet ও Super prophet। Prophet হলেন তাঁরাই, যাঁরা দর্শন-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে দীর্ঘকাল সাধনভজন করে সিদ্ধি বা সমতা বা আনন্দ লাভ করেন অথবা বিকারমুক্ত হন। এঁদের বলা হয় saint, sage বা prophet। সংস্কৃত ভাষায় এঁদের বলা হয় মুক্তপুরুষ, নিত্যসিদ্ধ বা অনুভবসিদ্ধ প্রভৃতি।

Super prophet-দের মধ্যে আবার তিনটি ভাগ আছে, যথা—Super man, God man ও God incarnate। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাধকগণ সাধনা করে সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণ সাধনার ফল নিয়ে এসে অনুভব করেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ শাস্ত্রের মতপথের উপরে বেশি গুরুত্ব দেন না। সিদ্ধপুরুষগণ প্রচলিত মতপথের সত্যের ধারাকে গতানুগতিক ভাবে পরিবেশন করেন। আর তৃতীয় শ্রেণীর অবতার পুরুষগণ প্রচলিত মতপথের বাইরে নূতন কিছু পরিবেশন করে যান।

যখন প্রচলিত মতপথের দ্বারা পূর্ণ সত্যের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয় না বা যখন অত্যাচারে ধর্মপ্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তখনই super prophet-দেব আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁরা এসে সত্যের বা ধর্মের এমন একটা নূতন ভাবধারা বা চিন্তাধারার আলোকপাত করে যান, যার আলো প্রচলিত মতপথের সত্যকে আরও উজ্জ্বলতর করে তোলে। কোনও পথকে তাঁরা ভুল বলে দূরে ঠেলে দেন না। তাঁরা জানেন প্রত্যেক প্রকাশ এক কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বা প্রত্যেক মানুষ এক সত্যের উদাহরণ। এই বোধ মানুষের মধ্যে আবৃত হয়ে আছে। তাঁরা এসে তা ব্যাপক ভাবে ধরিয়ে দেন। তাঁরা ক্রিয়া-কলাপের উপর বেশি জোর দেন না। তাঁরা বলেন—তোমার নিজস্ব ভাব দিয়ে তোমার স্বরূপকে ধর। আত্মানুভূতি লাভের জন্য তাঁরা পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি সকলকে সমান সুযোগ দেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই মানুষ জীবনের মর্যাদাবোধ খুঁজে পায়।

Super prophet সমগ্র দিব্য ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি যখন আসেন তখন এমন রূপ ধরে আসেন যে ভগবান বলে সহজে কেউ তাঁকে চিনতে পারে না।

প্রণবমন্ত্র ও সদ্‌গুরুপ্রদত্ত দীক্ষামন্ত্রের তাৎপর্য

মনের ভাবনার বা বোধের ক্রিয়ামাত্র শব্দ সৃষ্টি হয় (স্ফুট বা অস্ফুট)। প্রণবের ঊর্ধ্বে কোনও ক্রিয়ার ব্যবহার নেই। সব শব্দ প্রণবে যুক্ত। প্রণব হল সকলের স্বরূপ এবং অন্তর্নিহিত শক্তি। তা সকলের সঙ্গে সমান ভাবে যুক্ত, কাজেই প্রণব হল প্রত্যেকের আপন বস্তু। যদি কেউ গুরুমন্ত্র না-পেয়ে থাকে তবে সে 'ওঁ' মন্ত্র অথবা তার সঙ্গে যে কোনও নাম যুক্ত করে জপ করলেই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সমান ফল লাভ করবে।

জীবন ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মন্ত্র দিয়ে রাখা হয়। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সত্তা হল গুরু। সেই স্মৃতি মানুষ ভুলে যায় বলে বাইরের সদ্‌গুরু মন্ত্র দিয়ে তা ধরিয়ে দেন।

লোকগুরু মন্ত্র দেয় কানে
আত্মগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

দীক্ষা সকলের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে থাকে। তবে কারও যদি লৌকিক দীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে আত্মারূপী গুরুই তার ব্যবস্থা করে দেন। অতএব লৌকিক গুরুর শিক্ষাদীক্ষা যদি কেউ না-পায় তবে তার অনুভূতি আটকায় না। তিনি-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি সকলকে 'সৎ' বলে গ্রহণ করতে পারেন। যাঁর মধ্যে 'ওঁ সৎ' এই এক নাম খেলে তাঁর চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ আর নেই। [১৫।৬।৭৫]

চতুর্যুগে দীক্ষার অনুশাসন পৃথক পৃথক

যুগে যুগে দীক্ষার স্তর বা ধারা পালটায়। সত্য যুগের দীক্ষার বিধান ছিল; জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় প্রথমেই ধরিয়ে দেওয়া হত "তত্ত্বমসি" বলে। তাকে বলা হতো যে সে নিজেই তার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। কিন্তু কলি যুগে এই বিধান অচল।

কলি যুগে সাধনার প্রধান বিশেষত্ব হল যে বৃহতের মাধ্যমে, মহতের মাধ্যমে, গুরুর মাধ্যমে অর্থাৎ গুরুশক্তির মাধ্যমে কিছু 'পাওয়া'। এখানে 'হওয়া নয়'। কিন্তু যেখানে মানুষের আসল পরিচয় ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে বলা হয় হওয়ার কথা। কী হবে? যা ছিলে তা-ই হবে। অর্থাৎ সেই স্বরূপের স্মৃতির সঙ্গে নিজের সত্তার একীভূত হয়ে যাওয়া। এই ক্ষেত্রে কোনও কিছু গোপন না-করে গুরু প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে দেন। [১৭।৬।৭৫]

বিশ্বাসের গুরুত্ব

গুরুই যে সব এই বিশ্বাস থাকা চাই। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই, তার কোনও গতি নেই। গুরু যিনিই হোন না কেন তাঁর মধ্যেই হরি, রাম, শিব, মহাপ্রভু প্রভৃতি সকলের দর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বাসই হল সকলের আসল পরিচয়। শব্দতে কিছু এসে যায় না। প্রাণকে যা স্পর্শ করে তা-ই গুরু বা মন্ত্র। গুরুর বাক্য ব্রহ্মবাক্‌রূপে ধরে নিতে হয়। সদ্‌গুরু মাত্রই সৎ-এ প্রতিষ্ঠিত।

ভজন ও একাগ্রতার বৈশিষ্ট্য

একের মধ্যে মন যুক্ত রেখে যা করা যায় তা-ই ভজন। জীবনের অগ্রভাগে এক-কে রেখে চলা হল একাগ্রতা[1]। সাধারণের জন্য একাগ্রতা লাভের সহজ উপায় হল—মনের সামনে এক নাম বা এক ভাব রেখে চলা। এই কারণেই প্রয়োজন হয় সুন্দর একটি চিন্তা বা শব্দ বা মন্ত্র। নিজের দেহ আবরণের জন্য যেমন জামা জুতার প্রয়োজন, মনের একাগ্রতা রক্ষার জন্যও সেইরূপ মহাত্মা, মহাপুরুষের ছবি রাখা প্রয়োজন। যে কোনও একজন মহাপুরুষের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা থাকলে সব মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা আপনিই জাগে।

বিশ্বাসের গুরুত্ব ও অভিনব মহিমা

একবার একজন বলেছিল—আমার গুরু তো মুসলমান, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার কী আল্লার দর্শন হবে? ব্রহ্মদর্শন কী হবে না?

তাকে তখন বলা হল—আল্লার দর্শন হলেই তো তুমি ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবে।

ভক্ত—আমার গুরু হিন্দু কী মুসলমান কিছুই বুঝি না। তাঁর মধ্যে এত প্রেম ও ভালবাসা দেখেছি যে তা দেখেই আমি তাঁকে গুরুবরণ করেছি। এখন আমার উপায় কী?

উত্তরে বলা হল— তোমার গতি সর্বোত্তম। এত যাঁর প্রেম ভালবাসা তাঁর আশ্রয়ে থেকে তোমার খারাপ হবে কেন?

ভক্ত—হরি ও আল্লার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই ঠিকই; তবুও মুসলমানের কাছে থেকে কী আমার হরির দর্শন হবে?

১। একাগ্রতা—জীবনে চলার পথে এক অখণ্ড ভূমা চৈতন্যময় সত্তাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বরকে অগ্রভাগে রেখে (লক্ষ্য করে) চলা।

উত্তর— তোমার গুরু মুসলমানই হোন বা আর যা-ই হোন না কেন, তাঁর মধ্যেই তুমি হরি, রাম, শিব, মহাপ্রভু প্রভৃতি সকলের দর্শন পাবে। গুরু তোমার কাছ থেকে এই বিশ্বাসটুকু চাইছেন। গুরুই যে সব এই বিশ্বাস থাকা চাই। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই, তার কোনও গতি নেই।

তোমরা সকলে সর্বদা স্মরণে রেখ যে, বিশ্বাসই হল প্রত্যেকের আসল পরিচয়। বোধ বা মন যে যা-ই বল সবই বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত বলে, আমি তাঁকে দেখিনি, শুধু বিশ্বাস করি। বিশ্বাস এসে গেলেই সাধনা শেষ। বিশ্বাসকে ঋষিযুগে শ্রদ্ধা বলা হয়েছে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে।

আসল কথা শব্দতে কিছু এসে যায় না। প্রাণকে যা স্পর্শ করে তা-ই গুরু বা মন্ত্র।

সেই ভক্ত বলেছিল—আমার গুরু হরি হরি, রাম রাম করেন আবার এদিকে আপনিও আল্লার মহিমা কীর্তন করেন এর রহস্য বা তাৎপর্য কিছু বুঝতে পারি না। আমার গুরু আপনার কথা শুনে আপনাকে ধরে থাকতে বলেছেন।

তাঁকে তখন বলা হল—যখন তিনি বলেছেন ধরে থাকতে, ধরে থাক। গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্রূপে ধরে নিও। সদ্‌গুরু মাত্রেই সৎ-এ প্রতিষ্ঠিত।

‘এ’ (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) ‘আল্লা আল্লা’ করে কেন তা মুখে বলে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। ভাল লাগে তাই করি। ‘ল্লা’ দিয়ে হ্লাদিনীশক্তিকে নির্দেশ করে। এজন্যই ‘প্রহ্লাদ’ নাম শুনতে ভাল লাগে। যদিও প্রহ্লাদের জীবন দুঃখে গড়া। কিন্তু তার জীবনে শুধু দুঃখই ছিল বললে ভুল হয়। তার জীবনে আনন্দরসও ছিল।

প্রহ্লাদ হল বিশ্বাসের একটি ঘনীভূত মূর্তি। কারও বিশ্বাস প্রহ্লাদের মতো দৃঢ় হলে সে বালকবৎ হয়ে যায়। বালকের মধ্যে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত খেলে। [২২।৬।৭৫]

দীক্ষা ও দুঃখ উভয়ের তাৎপর্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ

গুরুমন্ত্রকেই জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও লক্ষ্য করতে হয়। এটি হল পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, শান্তিমুক্তি সব। কাজেকর্মে, চলতে-ফিরতে নাম জপ করে যেতে হয়। তা ছাড়া মানুষের আর অবলম্বন কোথায়? দীক্ষা একবার হয়ে গেলে নতুন করে নতুন জীবন যাপন করতে হয়। পুরানো সব কিছু ফেলে দিয়ে শুধু তাঁর চিন্তায় ও নামে জীবন কাটাতে হবে।

ভগবানের পরিচয় পেতে হলে সর্ববেদনার মূলে যেতে হবে। যথার্থ সত্য সত্যের দ্বারাই আবৃত হয়ে যায়। একটি সত্য হল বেদনা এবং অপর একটি সত্য হল বেদ। অথবা বলা যায় একটি হল কষ্ট ও আরেকটি হল কেষ্ট। যিশুখ্রিষ্ট হলেন কষ্টের ঘনীভূত মূর্তি, তা কৃষ্ণেরই রূপ। যিশু ও কৃষ্ণ একজনই। শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণের যে তালিকা, সেই তালিকার মধ্যে যিশুর নামও আছে।

সাধারণ মানুষ দুঃখে বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে তার থেকে রেহাই পাবার জন্য অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান একাকী সব দুঃখ নীরবে সহ্য করেন। কারও ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে নিজের বোঝা লঘু করতে চান না। দুঃখের অখণ্ড মূর্তিকে বরণ করাই যে শান্তিমুক্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন ভগবানের স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হয়েও স্বেচ্ছায় তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে কষ্ট বরণ করলেন। [২৯।৬।৭৫]

গুরুকৃপা ও করুণার যথার্থ সদ্‌ব্যবহার

গুরুবন্দনা সম্যক্‌রূপে ফলপ্রদ হয় তখনই, যখন সর্ববস্তুকে গুরুবোধে গ্রহণ করা যায়। গুরুর দান বলতে তাঁর কৃপা ও করুণাকেই বোঝায়। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের দ্বারা তাকে বাড়াতে হয়; অর্থাৎ স্বভাববোধের সঙ্গে

যুক্ত করে, আপন করে নিতে হয়। তাহলে care-taker-রূপ গুরু প্রীত হন। গুরুর দেওয়া দানেতেই সবার দেহ তৈরি হয়। গুরুর কৃপাদৃষ্টি দেহ গড়া এবং দেহ রক্ষার কাজে সাহায্য করে। গুরুর দেওয়া দান যত্ন করে রাখলে তা দিয়ে নূতন একটি দেহমন্দির বানানো যায়। দুঃখকষ্টের মধ্যে গুরুকে স্মরণ করে তাঁকে কাণ্ডারিরূপে ধরে থাকাই হল গুরুনিষ্ঠার তাৎপর্য এবং তা-ই আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। সর্ব অবস্থায় গুরুকে আশ্রয় করে যে ঐকান্তিক ভাবে গুরুকে স্মরণে ধরে রাখে, গুরু তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন। আত্মজ্ঞগুরুর সঙ্গে সর্বস্তরের গুরুরই যোগাযোগ থাকে। গুরুবাদের বৈশিষ্ট্য হল, সর্বনিম্ন অর্থাৎ স্থূল দেহেন্দ্রিয় বিষয়ের স্তর থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ জ্ঞানের স্তর পর্যন্ত গুরু পরম্পরাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন গুরুর সাহায্যে পুষ্ট হয়ে জীবন নির্বাণ, মুক্তি ও শান্তি লাভ করে।

অধিকারীভেদে গুরুকৃপা কার্যকরী ও ফলপ্রদ হয়

গুরু যদি বলেন—আমিই তোমাকে সব করে দেব তাহলে গুরু-শিষ্য উভয়েই রসাতলে যায়। একমাত্র পরমাত্মগুরুই পারেন সব দায়িত্ব নিতে। পরমাত্মগুরু হলেন সব গুরুকে নিয়ে অর্থাৎ সর্বস্তরের গুরুর ঘনীভূত রূপ। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ পূর্ণ গুরু। তাঁর কাছেই সবচেয়ে বেশি ভরসা পাওয়া যায়। সেই জন্য তাঁর সঙ্গ, নির্দেশ ও অনুগ্রহই হল সর্বোত্তম ফলপ্রদ। গুরুর কৃপা লাভ করে তা কার্যকরী করার জন্য শিষ্যের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়। অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা গুরুর কৃপা ফলপ্রদ হয় না। 'গুরু ভরসা' কথার অর্থবোধ বা তার তাৎপর্য সাধারণ মানুষ বিকৃত ভাবে ব্যবহার করে। অনলস প্রচেষ্টার দ্বারা যারা নিরন্তর গুরুর কৃপাকে অবলম্বন করে স্বভাব ও স্ববোধের সাধনায় উত্তরোত্তর সচেতন ভাবে এগিয়ে চলে তারাই বোঝে 'গুরু ভরসা' শব্দের মর্মার্থ। আর যারা গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে গতানুগতিক নিয়মে স্বল্পমাত্রায় কোনও রকমে গুরুচিন্তা, নামজপ ও ধ্যানকার্য সম্পন্ন করে গতানুগতিক নিয়ম রক্ষা করে ও সংসারে গা ভাসিয়ে চলে, তারা মুখেই বলে 'গুরু ভরসা', কার্যত গুরুকৃপা ও অনুগ্রহলাভে তারা কৃতকার্য হয় না।

উত্তম অধিকারী শিষ্যের জন্য গুরু স্বয়ং পরিশ্রম করেন। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে তা আশা করা নিরর্থক।

সত্যনিষ্ঠা ও অনলস প্রচেষ্টাই সর্বসিদ্ধির কারণ

সৎপ্রসঙ্গের কথাগুলি শ্রবণ করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হয় এবং সেই বস্তুকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে হয়। কথাগুলির সারবস্তুকে ব্যবহার করলে সব গুরুর কৃপা পাওয়া যায়। নাম পেলেই শুধু হয় না। নামকে নিজের চেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ ধারণা না-করতে পারলে নাম করেও কোনও উপকার পাওয়া যায় না। নামের শক্তি অপরিসীম কিন্তু অসংযত মন তা বুঝতে পারে না। এই জন্য নামের কাছে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা জানাতে হয় যাতে নামকে ধরে সর্বদা সকল কাজ সচেতন ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

অন্তরদেবতার অনুভূতি অন্তর্বোধেই স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত হয়

আপন অন্তরদেবতার অস্তিত্ব, জাগরণ ও তাঁর প্রকাশবিকাশ হল অন্তরের অনুভূতির বিষয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া সত্ত্বেও সকলে সে বিষয়ে সচেতন থাকে না মনের বহির্মুখী প্রবণতার জন্য। আপন অন্তরের অনুভূতি ও চেতনা সম্বন্ধে সতত খেয়াল না-রাখলে বাইরের কারও সাহায্য দ্বারা অনুভূতির বিশেষ উন্নতি হয় না। মনের সঙ্গে অন্তরদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মন কামাহত হয়ে কাম্য বিষয়ের চিন্তা ও ধারণার বশে বহির্বিষয়ের পিছনে যখন ছোটে, তখন অন্তরদেবতার সঙ্গে তার অভিন্ন সম্বন্ধের ভাব বিস্মৃত হয়। সেই জন্য তার কামনাপূরণ প্রতিহত হলে, বাধাপ্রাপ্ত হলে সে বিক্ষুব্ধ হয়, বিকৃত হয় এবং অন্তরদেবতার অনুগ্রহ থেকে

বঞ্চিত হয়। এই ভাবেই জীব স্বরূপত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা হয়েও অবিদ্যাজাত কামনাবাসনার জালে জড়িত হয়ে আপন দিব্য অমৃত মুক্তস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে সীমিত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী জীবরূপে নিজেকে কল্পনা করে। এই ভাবে নিজের বুদ্ধিদোষে ভ্রান্তিবশত আত্মস্মৃতি ভুলে সে জীবদশা প্রাপ্ত হয় এবং তা-ই সত্য বলে মেনে চলে।

বোধের অধীন শিব, মনের অধীন জীব

জীবত্ব রক্ষার জন্য জীবকে নিজের সংকল্প ও মনের অধীনে চলতে হয়। মনের দাস হয়ে চলে জীব জীবদশা ভোগ করে। তখন গুরুর কাছে দীক্ষা পেলেও নিজ মনের সংকল্প ও তার প্রভাবকে অতিক্রম করে গুরুর নির্দেশ যথার্থ ভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। সেই জন্য জীব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আত্মদেবতার অনুগ্রহ অনুভব করতে পারে না। গুরুর কৃপা ও অনুগ্রহ অনুভূত হয় অন্তরে; কেবল কল্পনা দ্বারা মানস বৃত্তি বাড়ে বটে কিন্তু অনুভূতির মূলে সাড়া পাওয়া যায় না। [৬।৭।৭৫]

শিষ্যের তীর্থভ্রমণের কাহিনী

কোনও এক মহাত্মা বেশ কিছু ভক্ত শিষ্য নিয়ে পাহাড়ের উপরে এক আশ্রম তৈরি করে বাস করতেন। একদিন তাঁর এক শিষ্য মহাত্মাকে জানাল যে সে তীর্থদর্শনে যেতে চায়, কারণ সাধুদের সমস্ত তীর্থভ্রমণ করতে হয়। পরিব্রাজক না-হলে নাকি সাধু হওয়া যায় না। গুরুদেব তাকে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সে বদ্ধপরিকর যাবেই। তখন গুরুদেব আর কিছুই বললেন না। যাবার সময় শুধু শিষ্যকে বলে দিলেন—তুই যে তীর্থেই যাস এই বুড়ো বাবার জন্য সবচেয়ে 'বুরা' (খারাপ) জিনিসটি নিয়ে আসিস।

শিষ্য অনেক তীর্থ ঘুরে বেড়ালো। সব গুরুভাই ও আশ্রমবাসীদের জন্য কিছু কিছু জিনিস নিল, কিন্তু গুরুদেবের 'বুরা' জিনিস আর খুঁজে পায় না। সবচেয়ে খারাপ জিনিস কোনটা, লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা হাসে এবং তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলে ভাবে।

সব তীর্থ ঘুরে ঘুরে শিষ্যটি নিজ আশ্রমের উদ্দেশে ফিরে চলেছে। দু'দিন আর বাকি আছে আশ্রমে পৌঁছবার। গুরুদেবের জিনিস নিয়ে যেতে পারল না বলে তার খুব মন খারাপ। সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল—আমি এতই অধম যে গুরুদেব নিজমুখে চাইলেন একটি জিনিস অথচ আমি তা নিয়ে যেতে পারলাম না।

মলের আত্মকাহিনী

পরদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য করতে বসেছে, সেই সময়ে হঠাৎ তার মনে হল যে মলটাই সবচেয়ে খারাপ জিনিস। এই মলই গুরুদেবের জন্য নিয়ে যাব। এই ভেবে যে মুহূর্তে হাত দিয়ে মল তুলতে গেছে ঠিক তখনই সে শুনতে পেল মলের ভিতর থেকে কে যেন বলছে—সাবধান, আমার গায়ে হাত দিও না। তুমি আমাকে আজ খারাপ মনে করছ, কিন্তু কাল আমি তো ছিলাম সন্দেশ, রসগোল্লা, সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি। তুমি তো আমাকে খেয়েছিলে। আজ আমার এই রূপ তো তুমিই বানিয়েছ। তোমরা ভাল ভাল জিনিস খাও এবং মলরূপে সেগুলি বিকৃত করে নিকৃষ্ট ভেবে তা পরিত্যাগ কর। আমরা কিন্তু নিকৃষ্ট হই না। আমার উপরেই কতগুলি প্রাণীর জীবন নির্ভর করছে। তারা আমাকে গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করে। আমাকে আবার আরও নিকৃষ্ট মলরূপে পরিত্যাগ করবে। তাও আবার আরেক শ্রেণীর প্রাণী গ্রহণ করবে তাদের প্রাণ ধারণের জন্য। এই ভাবে আমার রূপান্তর হতে হতে আমি পঞ্চভূতের মধ্যে আবার মিশে যাই। এই পঞ্চভূতই আবার জীবের

খাদ্যরূপে পরিণত হয়। আমার নাশ নেই; কেবল প্রকাশের আকার-প্রকারের বিকার ও রূপান্তর হয়। আমি প্রাণশক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। আমার নাম অন্ন। আমাকে ছাড়া জীবজগতের চলে না। আমার উপরেই জীবজগৎ বেঁচে আছে।

মলের মুখে তার আত্মকথা শুনে সেই ব্রহ্মচারী অতি বিস্মিত হয়ে মল সংগ্রহ করা থেকে নিবৃত্ত হল। সে হাত মুখ ধুয়ে কর্মান্তরে চলে গেল। মলের কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনে সে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গুরুর জন্য কিছু না-নিয়েই সে আশ্রমে গেল; ভাবল আমি এতই অপদার্থ যে নিকৃষ্ট কোনও জিনিসই খুঁজে বার করতে পারলাম না।

গুরুপদে শিষ্যের পূর্ণ আত্মসমর্পণ

যাই হোক, অবশেষে সে আশ্রমে এসে পৌঁছল। আশ্রমে ফিরে সে তার গুরুভাইদের জন্য যা যা এনেছিল সবাইকে তা দিয়ে দিল। তারা সকলেই খুব খুশি ও প্রীত হলেন। দু'দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু সে গুরুর সঙ্গে আর দেখা করেনি। তৃতীয় দিন গুরু নিজেই তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—দেখ, তীর্থভ্রমণ করে এসে প্রথমে গুরুকে প্রণাম করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তুমি দু'দিন হল আশ্রমে এসেছ অথচ আমার সঙ্গে দেখাও করলে না। তোমার তীর্থভ্রমণে যাবার সুফল আর কিছু পেলে না। সুফল গুরুর কাছ থেকেই পেতে হয়। আগে তীর্থে যাবার কথা বলাতে তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম, তোমার তীর্থে যাবার সময় হয়নি বলে। তুমি আমার কথা না-শুনে জোর করে তীর্থে গেছ। তীর্থক্ষেত্রে যথার্থ নিয়ম পালন করতে হয় কী ভাবে তা-ও জেনে যাওনি। নিজের খেয়াল খুশিমতো বেড়িয়ে এসেছ। গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী না-চলে, গুরুসেবা ঠিকমতো না-করে খেয়াল খুশিমতো ধর্মচর্চা করলে সাধু হওয়া যায় না। মনে রেখ, গুরুসেবাই হল ধর্মসাধনার মুখ্য উপায়—তীর্থভ্রমণাদি ও আর সবই গৌণ। যাই হোক—তুমি তোমার এই গুরুবাবার জন্য কী এনেছ?

শিষ্য মাথা নত করে শুনছিল, আর তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তখন তার মানসপটে স্মরণ হচ্ছিল আর তা চিন্তা করে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছিল। নিজের অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞতার জন্য নিজেকে খুব নিকৃষ্ট ও অধম মনে হচ্ছিল। গুরুর কোনও কথার উত্তর না-দিয়ে চুপ করে ছিল বলে গুরু তাকে বললেন, আমার কথার তো কোনও উত্তর দিলে না। গুরু এই একই প্রশ্ন দু'তিনবার করাতে হঠাৎ শিষ্য বিলাপ করে গুরুর চরণ ধরে বলতে লাগল—হে কৃপানিধি গুরু! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান। আমি অজ্ঞান, মূর্খ, সর্বব্যাপাবে নিকৃষ্ট। আপনার আদেশনির্দেশ পালন করার যোগ্যতাও আমার নেই। অজ্ঞলোক যে-রকম ভুল করে, আমি তার চাইতেও বেশি ভুল করেছি প্রথম থেকে আপনার কথা না-শুনে। বহু তীর্থে ঘুরেছি কিন্তু আমি কোথাও সুখ বা শান্তি পাইনি। অনেক সাধু দর্শন করেছি কিন্তু তাদের কাছ থেকেও যথার্থ কৃপা আশীর্বাদ কী ভাবে লাভ করতে হয় তা-ও জানি না বলে তা সংগ্রহ করতে পারিনি। এই আশ্রমের গুরুভ্রাতাগণের জন্য অনেক কিছু আনবার কথা তারা বলেছিল ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ থেকে। তাও পুরোপুরি আনতে পারিনি। সামান্যই তাদের জন্য এনে দিয়েছি। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম এ সংসারে সকলেই গুণে, যোগ্যতায়, জ্ঞানে, সেবায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিশ্বাসে এবং আপনার নির্দেশ পালনে আমার থেকে সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। তাদের তুলনায় আমি সবচেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট। আমার মনে হয় আমার মতো অধম ও নিকৃষ্ট জগতে আর কেউ নেই। সর্ব নিকৃষ্ট ও অধম এই আমাকেই আপনার চরণে সঁপে দিচ্ছি। আপনি এখন আমাকে যা ভাল মনে করেন তা-ই করুন। আমার জীবনে ধিক্কার এসে গেছে। আমার আর বাঁচার ইচ্ছাও নেই—এই বলে সে বিলাপ করতে থাকে।

দয়ার্দ্রচিত্ত করুণাঘন হৃদয় যাঁর সেই গুরু তখন শিষ্যের এই আত্মনিবেদনে প্রীত হয়ে তাকে বুকে তুলে নিলেন এবং বললেন—আজ থেকে তুমি এই আশ্রমে আমার সেবা করার সুযোগ পেলে। তোমার অভিমান, অহংকার তোমাকে আর বিকৃত করতে পারবে না। এ ভাবেই যারা আত্মসমর্পণ করে তারা গুরুর আশ্রয় পায় এবং গুরুর শক্তির অধিকারী হতে পারে। তোমার প্রতি আমি খুব প্রীত হয়েছি। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি যে তোমার ভিতরের অন্তরচৈতন্য জেগে উঠুক। তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস পূর্ণ হোক। তুমিই আত্মবোধের যোগ্য অধিকারী হয়ে আশ্রমের সুনাম ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। এইবার তোমার তীর্থভ্রমণ সার্থক হয়েছে।

গুরুপদে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অহংকারের শোধন

গল্পটির মধ্যে আত্মসমর্পণের এক বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে গুরুকৃপা লাভের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গুরু এই জিনিসই চান প্রত্যেকের কাছে। শিষ্য নিজেকে পূর্ণ করে সমর্পণ করলেই গুরু নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে তার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন। 'আমি-আমারবোধ' হল অহংকার। অহংকার থেকে আসে নানাবিধ দোষ, যথা—শ্রেয়মণ্যতার বা হীনমণ্যতার ভাব। এই দুই ভাবেই মন বিকৃত হয়। অহংকারের মধ্যে দু'টি অংশ আছে—একটি হল অস্মিতা বা অহংতা অর্থাৎ 'আমি'-র প্রাধান্য, আরেকটি হল মমতা বা 'আমার' প্রাধান্য। এই দু'টিই বিকৃত হতে পারে বা ব্যাহত হতে পারে অপরের সঙ্গে আচরণের দ্বারা। নিজ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তিত্ববান লোকের সান্নিধ্যে নিজের মধ্যে হীনমণ্যতার ভাব, পরাভূত ভাব বা অযোগ্যতার ভাব প্রভৃতি মনকে ম্রিয়মানও করতে পারে; আবার বিক্ষুব্ধও করতে পারে। অপরপক্ষে নিজ অপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে এলে আপনা থেকেই প্রভুত্ব করার প্রবণতা নিজের মধ্যে জেগে ওঠে। তাব ফলে পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ, কথা কাটাকাটি এবং মনোমালিন্য ঘটার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তার ফলে মনের ভিতরে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব জেগে ওঠে অনেক সময় এবং পরদোষ, পরনিন্দা ছড়ায় এই ভাব থেকেই। এ সবেরই পরিণামে নিজের মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘার ভাব প্রকাশ পায়।

অহংকার থেকে আসে অপমান আবার অপমান থেকে আসে অভিমান। সমান না-হলে পূর্ণতা মেলে না এবং সবকে না-মানলে সমান হয় না। জানাজানি দিয়ে সমতার ভাব সব সময় রক্ষা করা যায় না। কিন্তু মানার দ্বারা সব সম্ভব।

মনের বৃত্তি ভাব অনুসারে সংকুচিত হয় ও সম্প্রসারিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংকুচিত হওয়ার বৃত্তি পরিমাণে থাকে বেশি। আত্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সাধকদের মধ্যে মানসিক ভাবের সম্প্রসারণ, আপনবোধের সম্যক্ বিস্তার ও বিকাশ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সুসাধিত হয়। তার ফলে মনের সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়, মন উদার ও মহান ভাবে সম্প্রসারিত হয়। আত্মবিচারের ফলে মন ক্রমশ তার স্বকীয়তা বিশুদ্ধ আত্মবোধের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যবহার করার সুযোগ, সুবিধা ও গুরুত্ব অনুভব করে। তখন মনের পূর্ব অভ্যাসগুলি বিদূরিত হয় বিচারের প্রভাবে। অর্থাৎ বিচারের উৎকর্ষ লাভের ফলে মনের বিকারজনিত অংশের ভাববৃত্তিগুলি হেয়জ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়। তা আর পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পায় না।

বিচারের মাধ্যমে হয় আত্মশুদ্ধি ও আত্মবোধের স্ফূর্তি

বিচারের প্রাধান্য বেড়ে গেলে মনের উৎকর্ষ যেমন বেড়ে যায়, অপকর্ষ ভাব তেমন আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে নির্বীজ হয়ে যায়। এ ভাবে যত বিচার বাড়ে তত বৈরাগ্যেরও বৃদ্ধি ঘটে। বিচারকে অনুসরণ করেই বৈরাগ্যের প্রাধান্য বাড়ে ও প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য জ্ঞানীদের কাছে আত্মবিচার হল আত্মানুসন্ধানের

সর্বোত্তম উপায়। আত্মবিচার আবার আত্মজিজ্ঞাসার ফলে তৈরি হয়। সুতরাং আত্মজিজ্ঞাসারই পরিণাম হল আত্মবিচার এবং আত্মবিচারের পরিণাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের ফলে হয় উপরতি অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়কে তাদের স্ব স্ব বিষয় থেকে সম্যক্‌রূপে এবং স্থায়ীরূপে নিবৃত্ত করা। উপরতি সিদ্ধ হলে মন শান্ত সমাহিত হয়ে যায় ও বৃত্তিশূন্য হয়; তার ফলে সমাধি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। সমাধির পরিণামে মনের সম্যক্ লয় বা নাশ হয়, নিরোধ হয় এবং আত্মবোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অবাধিতরূপে ফুটে ওঠে।

ব্রহ্ম-আত্মবোধে সিদ্ধি বিবেকবিচার সাপেক্ষ

আত্মবোধের সাধনার সঙ্গে ব্রহ্মবোধের সাধনা অভিন্ন ভাবেই যুক্ত। তবে বিবেকবিচার সম্যক্‌রূপে সাধন না-করে, প্রথম থেকে আত্মানুসন্ধানের বা ব্রহ্মবোধের অভ্যাস অশুদ্ধ চিত্তের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ অসংযত চিত্তের পক্ষে নিত্যপূর্ণ অখণ্ডের ভাবনা, ধ্যান, সম্যক্ মনন ও নিত্য অনুসরণ একান্ত ভাবেই অসম্ভব। নিত্য অভ্যাসকারীর পক্ষেই যা সতত ধ্যেয় বা অনুভবগম্য থাকে না তা অসংযত ইন্দ্রিয়, অশান্ত ও অসমাহিত চিত্তের পক্ষে অভ্যাসসাপেক্ষ মোটেই হতে পারে না। সেই জন্য বলা হয়—'আমি ব্রহ্ম' এই বোধ বেশিক্ষণ রাখা যায় না। যেমন—'সা রে গা মা' তে 'নি' পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়। কেউ যদি তাকে বলে তুমি নিজেকে ব্রহ্ম বলছ, তবে আমি কী? সে হয়ত বলবে, আমি জানি না। এ রকম অজ্ঞানতা থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

মানার বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সমানে থাকলে এ রকম গোলমাল হয় না। যা চোখের সামনে আসছে, যার সম্মুখীন হওয়া যায় সেই সব কিছুকেই মানার শিক্ষাও অভ্যাস করতে হবে। তাহলে ব্রহ্ম বা অব্রহ্ম বলে ভাববার আর অবকাশ থাকবে না; অর্থাৎ দ্বৈতবোধের প্রভাব মনকে আর বিকৃত করতে পারবে না। নিজের সবই যেমন নিজবোধ দিয়েই মানতে অভ্যস্ত সেইরূপ নিজবোধ দিয়েই অন্তরে-বাইরে আর সকলকে মানার অভ্যাসও শিখতে হয়। নিজেকে মেনে অপরকে না-মানলে হয় 'মন্দ'। এই মন দিয়ে সমানে আসা যায় না। গুরুবোধের আলোচনার মধ্যে আত্মবোধের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে। সেই জন্য আমিবোধের কথা সংক্ষেপে বলে আবার গুরুবোধের কথায় ফিরে এসে গুরুপ্রসঙ্গের আলোচনায় ফিরে আসছি। গুরু-শিষ্যের কথার শেষাংশে গুরু বলছেন—সর্বতীর্থ ঘুরে নিজের 'আমি'-র দিকে যখন শিষ্যের দৃষ্টি পড়ল তখনই গুরু বুঝতে পারলেন যে এবার তাঁর শিষ্য আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

গুরুচরণেই সর্বসিদ্ধি অধিষ্ঠিত

কী সুন্দর এই উপাখ্যানটি! সর্বতীর্থ ঘুরে শিষ্য দেখল যে পূর্ণতা কোথাও নেই। পূর্ণতা আছে শ্রীগুরুর চরণে। 'আমার-আমি'-কে শুধু গুরুই নিতে পারেন। দেবতারাও নিতে পারেন না। 'গুরু' কিন্তু একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। ইন্দ্রিয়ের বাইরে ও ভিতরে, অনুভূতির মধ্যে যা-কিছু উপস্থিত হয় সবই আত্মবোধরূপ গুরুরই স্পন্দিত রূপ বা লীলায়িত রূপ। তা সম্যক্‌রূপে মনে রেখে আত্মব্যবহার সাধন করতে পারলে গুরুর কৃপা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়।

আপনবোধের অভ্যাসের পরিণাম

সম্যক্‌রূপে একবোধের, সমবোধের বা আপনবোধের স্মৃতিকে মনে রাখা সম্ভব হয় পূর্ব পূর্ব অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়-মনের সংযম সাধিত হলে; চিত্ত প্রশান্ত হলে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে অন্তর্মুখী গতি নিলে; চিত্তের

দোষাদি ক্ষীণ ও শূন্য হলে; মন বিনীত, নম্র ও অনুগত হলে অর্থাৎ অন্তরের সমগ্র ভাব শুদ্ধ হলে। তখন আত্মসেবায় সতত যুক্ত থাকার সামর্থ্য লাভ হয়। অর্থাৎ সে আত্মবোধের সম্যক্ অধিকারী বা পূর্ণ অধিকারী হতে পারে। [২০।৭।৭৫]

শিক্ষা ও দীক্ষার অভিনব তাৎপর্য

জীবনের মাধ্যমে এক-এর পরিচয় পাওয়াই হল বিজ্ঞান এবং তা লাভ করা হল শিক্ষা। শিক্ষার পরে আবার তা দিয়ে দেওয়া হল দীক্ষা।

শিক্ষা ও দীক্ষা এক চৈতন্যেরই দ্বিবিধ ভঙ্গিমা মাত্র। সে নিজেই শিক্ষাদীক্ষারূপে নিজের মধ্যেই প্রবেশ করে। যে চৈতন্যকে অবলম্বন করে সব বিদ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় আত্মবিজ্ঞান। চৈতন্যের অংশকে অবলম্বন করে যা পাওয়া যায় তা হল বিদ্যা। বিজ্ঞান ও বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য হল—বিজ্ঞান সমগ্রতা বা মূলকে ধবে প্রকাশ পায় এবং বিদ্যা সমগ্রতার বিশেষকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। সেই জন্য বিদ্যা অনেক প্রকার, কিন্তু বিজ্ঞান মাত্র একটি। [৫।৮।৭৫]

সৎ ও অসৎ-এর অভিনব সংজ্ঞা এবং পার্থক্য

শিষ্যকে ধীরে ধীরে সহনশীল তৈরি করে ক্রমপর্যায়ে উচ্চতর অবস্থায় যিনি পৌঁছে দেন তিনিই হলেন যথার্থ গুরু। যার সদ্গুরু লাভ হয়েছে তাব দুই-তিন জন্ম চলে গেলেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। গুরু তাকে সৎসঙ্গ দিয়ে সৎপ্রসঙ্গে যুক্ত রেখে ঠিক ধরে রাখেন। আত্যন্তিক উন্নতির বা অগ্রগতির যা সহায়ক তা-ই সৎ। এর বিপরীত ভাব হল অসৎ। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণের সুসামঞ্জস্য যার দ্বারা হয় তা-ই সৎ এবং এর যে কোনও একটির পুষ্টির অভাব হল অসৎ। [১০।৮।৭৫]

অর্থের সঙ্গে বিষয় এবং গুরুবাণীর সঙ্গে পরমার্থের সম্বন্ধ

আধ্যাত্মিক পথের শিক্ষা ও নির্দেশ যোলো আনা মানতে হয়। মানা সম্ভবপর না-হলে তার ফলও পাওয়া যায় না। ফল না-পেলে তার জন্য অনুশাসক দায়ী হন না। কথায় কথায় অনেকে বলে গুরু শিষ্যের জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু দেখা যায় গুরু সকলের জন্য দায়ী হন না। তার কারণ অন্তরে অনুসন্ধান করতে হয়। বাজারে যেমন দামি বা সস্তা, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বহু রকম জিনিস থাকে, কিন্তু বহু মূল্যের জিনিস কিনতে গেলে বহু মূল্য না-দিলে পাওয়া যায় না; সেইরূপ ভগবৎ অনুভূতি যা অতীব মূল্যবান তাও যথোপযুক্ত মূল্য না-দিলে পাওয়া যায় না। কী দিয়ে তার মূল্য দিতে হয়, গুরু তা ধরিয়ে দেন। জাগতিক কোনও মূল্য দিয়ে তার মূল্যায়ণ করা যায় না।

তুলনা বা বিচার আসে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না-পারলে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতিলাভ করা সম্ভব হয় না। সদ্গুরু এ সকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেতন করে দেন; নতুবা গলদ থেকেই যায়।

মানুষের চাওয়া অনন্ত। আসল চাওয়া কোনটি তা নির্ণয় করতে করতেই জীবন কেটে যায়। সেই জন্য গুরু সচেতন করে দেন যে, কিছু চাইবার আগে নিজের চাওয়া ঠিক করে নাও।

নিয়ম হল, সংসারজালে জড়িয়ে পড়বার আগেই গুটিপোকার মতো গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে হয়। সেই জন্য যা প্রয়োজন তা গুরুর কাছেই পাওয়া যায়। গুরু এক বোধস্বরূপের পরিচয় দিয়ে যান শিষ্যকে এবং এই বোধস্বরূপকে অবলম্বন করেই তাকে জীবনপথে চলার নির্দেশ দিয়ে যান।

নির্দেশ দেওয়া হয় না বলে অনেকে অনুযোগ করে; অনেক জিনিস বলে দেওয়া সত্ত্বেও অনুশীলনের অভাবে তা কোনও উপকারে লাগে না। এই ব্যাপারে কাউকে জোর করা চলে না। একটা জীবন যদি ভগবানের জন্য উৎসর্গ করা না-হয় তাহলে তার পক্ষে কোনও অনুশাসনই মেনে চলা সম্ভবপর হয় না। জীবনে যার ব্রত থাকে—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', তাকে সমস্ত দেবদেবীর শক্তি, গুরুশক্তি ও আত্মশক্তি সাহায্য করে।

গুরুচরণে একান্ত শরণাগত ভক্তের পরিণাম

গুরুর যথার্থ চেলা হয় দু'একজন; কারণ পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে শরণাগত হতে সকলে পারে না। যখন শিষ্য একান্ত শরণাগত হয়ে গুরুর কাছে নিবেদন করে যে—'তুমি আমাকে তোমার মতো করে নাও'—তখনই গুরু তাকে শক্তি দিয়ে ভগবানের কাছে তুলে ধরেন। গুরু ভগবানের চরণে তাকে সঁপে দিয়ে বলেন—'তোমার পূজার আরেকটি নৈবেদ্য তৈরি হল, তুমি গ্রহণ কর।' গুরু নিজে দায়িত্ব নেন না। ভগবানও সঁপে দেন তাঁর উর্ধ্বস্তরের কাছে। তিনি আবার সঁপে দেন প্রকৃতির কাছে এবং প্রকৃতি সঁপে দেন পুরুষের কাছে। এই হল Supreme law of Divinity। [১৭।৮।৭৫]

আত্মগুরুর অনুগ্রহেই হয় আত্মগুরুর উপলব্ধি

গুরুমহারাজগণ যথার্থ সত্যের পরিচয় দিয়ে দেন সকলকে; কিন্তু তা গ্রহণের জন্য কাউকে জোর করেন না। নিজের ভিতর থেকে যে পদ্ধতি বেরিয়ে আসে তাই হয় অতি উত্তম। প্রত্যেককে একই ছাঁচে ঢালা যায় না। আধ্যাত্মিক পথে নিজস্ব রুচি, ভাব, পরিবেশ, পরিস্থিতি, যোগ্যতা প্রভৃতি অনুসারে প্রত্যেকের মধ্যে সাধনা ও তার সিদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা না-থাকলে সেই যোগ্যতা সুষ্ঠু ভাবে বিকাশ হতে পারে না। কারও প্রভাব কারও উপরে যেন না-পড়ে। কিন্তু কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়। প্রত্যেকের অন্তর আপন পদ্ধতি আপনিই ধরে নেয়। বলপূর্বক যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় সত্যোপলব্ধির পক্ষে তা সুন্দর ফল দেয় না। প্রত্যেকের আত্মা স্বাধীন, কারও সঙ্গে কারও বিচ্ছেদ বা দ্বন্দ্ব নেই। এক সত্যভূমিতে, এক সত্য-কারণে, এক সত্য দিয়ে সব জীবন গড়া।

আত্মগুরুর অনুগ্রহ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী

কোনও এক মহাত্মার কাছে এক সাধক এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সকলের সঙ্গে যেমন প্রেমভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেন তাঁর সঙ্গেও সে রকমই ব্যবহার করলেন।

সাধক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের জন্য আর কতকাল কাঁদব বলতে পারেন? যা হোক আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

মহাত্মা তাঁর কথা শুনে বললেন—তুমি তো ভাগ্যবান।

সাধক—এ সব কথা আমি শুনতে চাই না। এ রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। এ সব শুনে আমার কী লাভ হল?

মহাত্মা স্নেহব্যাকুল কণ্ঠে তাকে বললেন—তুমি তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছ, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। এই বলে তিনি আলিঙ্গন করতে গেলে সাধক ধরা দিলেন না, বললেন—এ সব জীবনে অনেক পেয়েছি; এবার কী করব তা বলুন, আমি আর পারছি না।

মহাত্মা—তুমি যাঁর জন্য কাঁদছ তিনি যে কত দীর্ঘকাল তোমার জন্য কেঁদেছেন। তাঁরই কান্নার ছিটেফোঁটা তোমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, আর তুমি বলছ যে তুমি কেঁদেছ?

বলতে বলতে মহাত্মা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর দু'নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে সাধকের ভাবান্তর হল।

সাধক বললেন—আজ আমার সব সাধ মিটে গেছে।

আসল কথা কী জান? ভগবানকে পূর্ণ রূপে সবাই চায় না। তিনি সকলের জন্য যুগ যুগান্তর ধরে কাঁদছেন, আর মানুষ একটু কেঁদেই অহংকার করে। মহাত্মার স্পর্শে সেই সাধকের জীবনে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল।

আত্মগুরুই স্বয়ং সাধ্য-সাধক-সাধন-সিদ্ধি পরম

গুরু যখন আত্মা স্বয়ং তখন তদতিরিক্ত কিছু বা কেউ অসিদ্ধ। তাই বলা হয় গুরু ছাড়া কিছু বা কেউ নেই; আবার এমন কেউ নেই যা গুরু ছাড়া বা গুরু অতিরিক্ত হয়। যাঁর দ্বারা প্রত্যেক জীবন বিধৃত ও পরিচালিত হয় তিনিই হলেন আত্মা এবং তিনিই হলেন গুরু। গুরুর এমনই মহিমা যে তিনি ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় রূপেই আছেন। রূপ-নাম-ভাব যা থেকে পাওয়া যায়, যাঁর মধ্যে সব অবস্থান করে, যাঁর কৃপায় পূর্ণতালাভের চেষ্টা জাগে এবং তার উপকরণ সংগৃহীত হয়, তিনিই হলেন নিত্যগুরু। যাঁর মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদন করা যায়, তিনিই হলেন আত্মগুরু। গুরু রূপময়, নামময় ও ভাবময় রূপে দর্শন দেন।

[২৪।৮।৭৫]

ভক্ত, ইষ্ট ও গুরুবাণীর পূর্ণরূপ হল স্বানুভূতি

সৎপ্রসঙ্গে সদ্‌গুরুদের মুখ থেকে যে সব কথা প্রকাশ পায় তার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যে প্রত্যেক শ্রোতার মধ্যে তার কাজ সংস্কাররূপে গাঁথা হয়ে থাকে, পরে তা-ই সক্রিয় হয়ে ফলবতী হয়। আবার কখনও কখনও শ্রবণমাত্র উত্তম অধিকারীর মধ্যে তা বিশেষ ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। মানুষ আপন ইষ্টকে, গুরুকে যতখানি আপন করে পেতে চায়, তিনি ততোধিক আপন করে তাঁকে পেতে চান যা বৃহত্তম সত্য এবং অনুভবসিদ্ধ। তাঁর সন্তান হল সবাই, কাজেই তিনি কেন পেতে চাইবেন না? কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কথা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অতি অল্প সময়ই আমাদের মনে পড়ে। চব্বিশঘণ্টা তাঁর কথা যার মনে পড়ে তার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে তাঁব কাজ অনুভূতিরূপে শুরু হয়ে যায়।

অনেকে বলে—গুরুই সব করে দেবেন; কিন্তু এ কথা বললে গুরু যা বলবেন তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। গুরু যদি নরকে যেতে বলেন তাহলে সেখানেও যেতে হবে।

জনৈক ভক্ত—সে কী, নরকে যাব?

ভক্তের এ কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরুর উপরে সম্পূর্ণ সমর্পণ হলে স্বর্গ-নরকের দ্বৈতপ্রভাব পীড়িত করে না। তার পূর্ব পর্যন্ত দ্বৈতপ্রভাব থাকে বলেই মনে এ রকম বিক্ষোভ ওঠে।

[৯।৯।৭৫]

হুংকার মন্ত্রের অভিনব তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

সচ্চিদানন্দময়ী মা ও গুরু একজনই। উভয় নামের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। জিজ্ঞাসুর 'হুঁশ'-কে পূর্ণ ভাবে যিনি জাগ্রত করে দেন তিনিই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু ছাড়া অন্য গুরু 'হুঁশ'-কে পূর্ণ ভাবে জাগাতেও পারেন না এবং মনের বিকার, অন্তঃকরণের বিকার ও অজ্ঞানমূলক সংশয়কে দূর করে দিতেও পারেন না। গুরুমন্ত্র হল হুং-মন্ত্র বা ব্রহ্মমন্ত্র। গুরু হুংকার দ্বারা সচেতন করে দেন এবং জিজ্ঞাসুর অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত

করে দেন; যেমন শব্দ করে বা ধমক দিয়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা হয়, অমনোযোগীর মনঃসংযোগ করা হয়। অন্য রকম উদাহরণ দিয়েও তা বলা চলে, যেমন শ্মশানে তান্ত্রিক গুরু হুংকার দিয়ে শিষ্য সাধককে তার সাধনার লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্য সাবধান ও সচেতন করে দেন। তন্ত্র মতে তারাবীজ বা শক্তিবীজ হল 'হুং'। কাজেই হুংকারের শক্তি অন্য শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে। গুরুবাক্য শ্রবণ কেবল সাধনা ও অভ্যাসের বিজ্ঞান; সুতরাং তা কেবল আলোচনার বিষয় নয়। বৈষ্ণবরাও নামের আসরে হুংকার দিয়ে নামকে ঠিক রাখেন। [১৬।৯।৭৫]

আত্মগুরু আত্মমায়ের আত্মদানই প্রেম

মায়ের প্রেম ও আত্মদান সত্যের জীবন্ত উপমা। পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবনও বিসর্জন দিতে পারেন। পিতা-মাতার পরে গুরুই একমাত্র শিষ্যের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। এই জন্যই ঋষিদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

'গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ
গুরুর্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম্।।'

উভয়ের লক্ষ্য এক। আপন সন্তানের কল্যাণচিন্তাই হল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আপনবোধকে তাঁরা ছড়িয়ে দেন বলেই বলতে পারেন—'সবাই আমার সন্তান'। এই বাণী হল গুরুবাণী, মাতৃবাণী। জগন্মাতাও সেই কথাই বলেন—'সবার পুষ্টি-তুষ্টি আমিই দিয়ে রেখেছি।' এই হল আত্মবাণী, হৃদয়বাণী।

মানুষের বড় সৌভাগ্য যে সে মনুষ্যজীবন পেয়েছে। মানুষের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাঁর অনন্ত মহিমা। মান ও হুঁশ্ মানুষকেই দেওয়া আছে। তার মধ্যেই প্রেম উছলে পড়ে। সব প্রাণীদের মধ্যেই মাতৃপ্রেম ও আত্মদানের মহিমা আছে। তেমনি আবার বিকল্প উদাহরণেরও অভাব নেই। কারণ পূর্ণতার মধ্যে সব রকমই থাকবে।

সচ্চিদানন্দময়ী মা ও গর্ভধারিণী মাতার অভিন্ন তত্ত্ব

চিদানন্দময়ী মা এক সাধককে এক রাত্রিতে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। সেই সাধক দর্শন লাভের পর গৃহত্যাগের সংকল্প করেন এবং নিজের গর্ভধারিণী জননীর কাছে তার সংকল্পের কথা বলে মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।

তাঁর মা বললেন—তুই আমার একমাত্র হৃদয়ের ধন। তোকে আশীর্বাদ না-করেও পারছি না, আবার আশীর্বাদ করতেও প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কী করব?

সাধক বললেন—তোমার আশীর্বাদ না-পেলে আমার যাওয়া হবে না। আর যদি আশীর্বাদ কর তবে কোনও বাধা আসবে না।

মা বললেন—আশীর্বাদ নিশ্চয়ই করব, কোনও বাধা দেব না; কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে হবে। সেই চরম বস্তু লাভ করার পর কী তোমার মায়ের কথা মনে থাকবে? এর উত্তরের জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম।

পুত্র—তা তো আমি জানি না।

মা তখন তাকে আরেকটু তৈরি হয়ে নিতে বললেন।

সেই পরম পিতাই প্রত্যেকের মা-বাবারূপে আসেন। আবার এই বাবা-মাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্তানকে সংসারে টেনে রাখেন বা আশীর্বাদ করেন। এই উভয় দৃষ্টান্তই দেখা যায়।

জীবভাব দিয়ে দিব্য ভাবের আস্বাদন পাওয়া যায় না। আবার পূর্ণ দিব্য ভাবে জীবভাবের অস্তিত্ব থাকে না। এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই মা তার সাধক সন্তানকে বলেছিলেন—বর্তমান অবস্থা থেকে যখন ঐ উচ্চতর অবস্থায় যাবি তখন এই বর্তমান বাস্তবতার মূল্য হারিয়ে ফেলবি তো? যদি হারিয়ে না-ফেলিস তাহলে আরও প্রস্তুত হয়ে নে।

সাধক সন্তানকে এ রকম বলার তাৎপর্য হল—মা রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সন্তানকে আশীর্বাদ করতেন—তোমার নূতন পথের যাত্রা জয়যুক্ত হোক। দিনের বেলায় খাবার দিয়ে বলতেন—তোর দেহ-প্রাণ-মন সুস্থ থাকুক।

মাকে এ রকম ভাবে আশীর্বাদ করতে দেখে সাধক একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তুমি দিনের বেলায় এক রকম বল এবং রাত্রিতে আরেক রকম আশীর্বাদ কর। এ দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক?

এর উত্তরে মা বলেছিলেন—রাত আর দিন যদি সমান না-হয়, তবে সিদ্ধিলাভ করবি কী করে?

পরে গুরুর কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করতে গিয়ে ঠিক এই মন্ত্রই সে পেল যে, দিন ও রাত্রিকে সমান করতে হবে। যে কোনও শাস্ত্র পড়েই সে দেখতে পায় যে মা তাকে একটা একটা করে সব কিছুই শিখিয়েছেন। তাই প্রতিটি পাঠের সময় তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায় এবং যখন যা অনুভূত হয় তার সঙ্গেও মায়ের কথা মিলে যায়।

অবশেষে শাস্ত্রের সব তত্ত্ব লাভ করে শিষ্য গুরুর আসনে বসবার যোগ্যতা লাভ করলেন। গুরুপ্রণাম করার পর শিষ্যের মুখ দিয়ে মাতৃস্তব বেরিয়ে এল।

গুরু বললেন—আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। গুরুদক্ষিণাও তুমি দিয়েছ এবং সব ঋণও তুমি শোধ করেছ।

গুরু তাকে সর্বান্তঃকরণে অমূল্য সম্পদের পূর্ণ অধিকারী করে দিলেন। তারপর বললেন তুমি শেষে যে স্তব পাঠ করলে তার নিশ্চয়ই কোনও তাৎপর্য আছে?

সাধক বললেন—হ্যাঁ, আছে। মাকে এই চরম অনুভূতির প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর আশীর্বাদেই তা প্রকাশিত হয়েছে যথাকালে।

গুরু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুই সত্যের সত্য উপলব্ধি করেছিস, আর আমি সত্যকে উপলব্ধি করেছি। মধুরের পরেও মধুর আছে।

এই সমস্যার উপলব্ধি হলে সত্য আরও মধুর হয়ে যায়। শিষ্যের এই চরম সত্যের উপলব্ধিতে গুরু যে কতখানি আনন্দ পেয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। সাধকের মা-ই তার মূলে। মাকে সে কথা দিয়ে গিয়েছিল সেই জন্য আবার সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এল। মাকে প্রণাম করার পরেই তার মুখ থেকে একটি স্তব প্রকাশ হল—

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেবঃ।।'

এই স্তবটি প্রকাশ করে মহাসাধক অনুভূতির গভীরে ক্ষণকালের জন্য ডুবে গেলেন। তারপর অনুভূতির জ্যোতিতে ঝলমল অন্তর তাঁর উজ্জ্বল মুখাবয়বে ফুটে উঠল অদ্বয় আত্মবোধের আরেকটি সূত্র—

'স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণু স্বয়ং ইন্দ্র স্বয়ং রুদ্র স্বয়ং বিশ্বমিদং স্বস্মাৎ ন অন্যকিঞ্চিৎ পরম।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেয়ে উঠলেন—'সর্বাত্মকোঽহম্, সর্বোঽহম্, সর্বশূন্যোঽহম্, সর্বাতীতোঽহম্।'

সেই ভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ, মৌন ও স্থির থেকে অখণ্ড ভূমা আমিবোধে প্রবোধিত চিত্ত তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—

'অখণ্ড ভূমা সর্বসম পরমতত্ত্ব স্বানুভবসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পরমেষ্ঠি গুরুরোহম্। অহং উর্ধ্বস্তাৎ অহং অধঃস্তাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরোস্তাৎ অহং বামোতঃ অহং দক্ষিণোতঃ অহং অন্তঃস্থ চ বহিঃস্থ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠামি নিত্যাদ্বৈত কেবলোহম্।'

পরমাত্মবোধের স্ফূর্তি তাঁর মধ্যে তখন স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হচ্ছে, তাই তিনি আবার ব্যক্ত করলেন— 'সর্বগত্বাৎ অনন্তশ্চ স্বৈব অহম্ অবস্থিতং মত্তঃ সর্বম্ অহমেব সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে অহমক্ষর নিত্য পরমাত্মআত্মসংস্থিতং ব্রহ্মাত্ম সঙ্গীতম্ অহমাদি চ মধ্য চ পরতঃপুমান।'

পরমদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠিত সর্ব শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বসংবেদ্য স্বানুভবসিদ্ধ মহাসাধক আত্মানন্দে বিভোর হয়ে আবার প্রকাশ করলেন—

> 'নিরুপমম্ অনাদিতত্ত্বম ত্বমহমিদমদঃ ইত্যাদি কল্পনা দূরম্।
> নিত্যানন্দ একরস সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্।।'
> 'অখণ্ড একরস বস্তু সচ্চিদানন্দ লক্ষণা
> বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপ্রভ দ্বৈতবর্জিতোঽহম্।।'

এই মহাসাধক পরমধন্য ও কৃতকৃত্য হয়ে পরম অদ্বৈত বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মবোধের মহিমা কীর্তন দ্বারা সদ্‌গুরুর দক্ষিণা প্রদান করছেন। এটাই হল পরমার্থ তত্ত্বসিদ্ধির ফলশ্রুতি। [২৮।৯।৭৫]

আত্মগুরুর মহিমা

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে সাধক নিজেই যেন সাধন-ভজন-ধ্যান প্রভৃতি করেন। বস্তুত সব কিছুর পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের মালিক একজনই আছেন। তাই বলা হয়, আত্মগুরুই সব সময় সবাইকে ধরে রেখেছেন। স্বভাবের মাধ্যমে স্ব-এর সঙ্গে অর্থাৎ স্বভাব আত্মার সঙ্গে যুক্ত রেখে তিনিই সকলকে পরিচালনা করেন। সেই জন্য সূত্রাত্মা কথাটি বলা হয়েছে।

এক মহাত্মা সাধকের স্বানুভূতি লাভের কাহিনী

এক মহাত্মা নিরন্তর গোবিন্দ সেবায় রত থাকতেন। একদিন তিনি গোবিন্দ সেবায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় এক পাগল এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল—কী করছ তুমি? বেলা হয়ে গেল, গোবিন্দকে ভোগ দাও।

মহাত্মা—গোবিন্দের ভোগের ব্যবস্থাই আমি করছি।

পাগল—যে গোবিন্দ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই গোবিন্দকে আগে ভোগ দাও, তারপর তোমার বিগ্রহের গোবিন্দকে দাও।

মহাত্মা তার কথা শুনে খুব মুশকিলে পড়লেন। অতিথি হলেন নারায়ণ; তাঁর কথাও ফেলতে পারেন না, আবার নিত্য অভ্যাসের সংস্কারকে বাদ দিয়ে পাগলকে ভোগ দিতেও পারছেন না। (সেই মহাত্মা এক সময় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে নিজমুখে বলেছিলেন যে জীবনে তিনি অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু এইরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন কোনও দিন তাঁকে হতে হয়নি)।

পাগল বারবার তাঁকে ভোগ দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে মহাত্মা ভাবলেন—সবই তো তিনি জানেন, কিন্তু লোকাচারও তো তাঁর মেনে চলতে হবে। পাগলের কথা তো শাস্ত্র মানবে না। তখন উভয়দিক বজায় রাখার জন্য তিনি ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। কিন্তু পাগল তা দেখে বলল—এ রকম ভাবে ভোগ নেব না, পুরোটাই দিতে হবে।

বিগ্রহকে ভোগ দেবার নিয়ম নেই বললেও মহাত্মা বা সাধুরা নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না, সাধারণ মানুষ হয়ত বা তা পারে। তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে গুরুকে স্মরণ করতে লাগলেন এবং বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন—তুমি বলে দাও, কী করলে তোমাব সেবা ঠিকমতো হবে এবং পাগলের কথাও রাখা হবে।

এই ভাবে প্রার্থনা করতে করতে যখন তিনি সমাধান খুঁজে পেলেন, তখন পাগল আর তাঁর সামনে নেই। তখন ছুটলেন তিনি পাগলের খোঁজে। সারাদিন ছোটাছুটির পরে তিনি দেখলেন এক ভাঙ্গা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে পাগলা আপন মনে বসে আছে। কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

মহাত্মা তারপর মন্দিরে গিয়ে আরতি দিতে শুরু করলেন। কিন্তু আরতিও ভালভাবে করতে পারছিলেন না। তাই পূজারতি শেষ করে আবার সেই পাগলার খোঁজে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখলেন যে পাগলা এক তেঁতুল গাছের উপরে বসে আছে। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন। তিনি বললেন—তুমি যা খেতে চাইবে তা-ই আমি খাওয়াব।

পাগলা বলল—যা চাইব তা তুমি খাওয়াতে পারবে না।

মহাত্মা আবার বললেন যে সে যা চাইবে তা-ই তিনি খাওয়াবেন। শেষ পর্যন্ত পাগলা তাঁকে অঙ্গীকার করিয়ে নিল একটি।

পরদিন পাগলা মন্দিরে গিয়ে মহাত্মাকে বলল—আমাকে মাছ খাওয়াও।

মহাত্মা কথা দিয়েছিলেন, সুতরাং মাছের ব্যবস্থা করলেন। তখন পাগলা আবার নূতন বায়না ধরল যে ঐ মাছ আগে গোবিন্দকে ভোগ দিতে হবে, তারপর সে খাবে।

গোবিন্দের মন্দিরে মাছ ভোগ দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বড় বড় পণ্ডিতরাও বেদবিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন না। সুতরাং মহাত্মা কী করবেন বুঝতে পারছেন না, তিনি কত অনুনয় করে চরণ ধরে সেধে তাকে খাওয়াবেন বলে নিয়ে এসেছেন! এখন কী উপায়? তিনি আবার শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হলেন। গুরু তাঁকে বলে দিলেন—পাগলাকে ও আমাকে নিয়ে একসঙ্গে গোবিন্দের কাছে ভোগ দে।

শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী মহাত্মা দরজা বন্ধ করে পাগলাকে ও গুরুকে গোবিন্দের সামনে নিয়ে এসে একসঙ্গে ভোগ নিবেদন করলেন।

মহাত্মার সেদিন সেই সময় অদ্ভুত দর্শন হল। তিনি দেখলেন গুরুই একবার পাগল হচ্ছেন, আরেকবার গোবিন্দ হচ্ছেন। এ রকম তিনজনের স্থানেই তিনজনকে দেখলেন। সব শেষে দেখলেন তিনটি মুখ আর নেই। ভোগ তাঁর নিজের মুখেই পড়ছে। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন—এটা কী স্বপ্ন? না, অনুভূতি? স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কারণ সবই তাঁর স্মৃতিতে আছে।

পরে মহাত্মা দেখলেন যে পাগলা মন্দিরের বারান্দায় বসে আছে। পাগলা মহাত্মাকে বলল—বিড়ি খাওয়াও। মহাত্মা তাঁকে বিড়ি এনে দিলেন। পাগলা এবার বলল—আমি শোব, বিছানা দে।

মহাত্মা তাঁর নিজের বিছানাটি তাঁকে দিলেন। পাগলা শুয়ে তার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে নোংরা করে রাখল। সেগুলিকে মহাত্মা আবার নিজেই পরিষ্কার করে রাখলেন।

একটু পরেই পাগলা আবার তাঁকে আদেশ করল—আমাকে জলখাবার খাওয়াও।

এদিকে মহাত্মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন; নিজের স্নানাহার বা বিশ্রামের পর্যন্ত সময় পাননি। মহাত্মা তখন তাঁকে বললেন—একটু আগে তো খেয়েছ, এক্ষুণি আবার জলখাবার লাগবে?

পাগলা কোনও কথাই শুনতে চায় না। বাধ্য হয়ে মহাত্মা জলখাবার তৈরি করে খেতে দিলেন। পাগল নিজে খেয়ে মহাত্মাকে এঁঠো খাবার তুলে দিয়ে বলল—নে, খা।

মহাত্মা কোনও দিন কারওর এঁঠো খাননি, গোবিন্দের ভোগ ছাড়া। তাই পাগলার এঁঠো খেতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল; তবুও খেতে হল।

পাগল তারপর চলে গেল। কিন্তু সে চলে যাওয়াতে মহাত্মার ভাল লাগল না। একদিন দু'দিন পর তাঁকে আবার তিনি ডেকে আনলেন। পাগলা এসে তাঁকে স্বপিণ্ড দেওয়ালো। তারপরেই সে চলে গেল।

মহাত্মা 'একে' (নিজেকে ইঙ্গিত করলেন) বলেছিলেন—সেই যে পাগলা চলে গেল আর কোনও দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু সে আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল!

সাধন, পূজা, শাস্ত্রপাঠে মহাত্মার জীবনে যা হয়নি, তা-ই হয়ে গেল তাঁর পাগলার সংস্পর্শে এসে। সাধননিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা ভেঙ্গে চুরমার করে পাগলা তাঁকে অবধূত বানিয়ে দিয়ে গেলেন।

অবধূত হল সেই অবস্থা যখন সব কিছুর সঙ্গে নিজের একাত্ম মিলন হয়। যথার্থ পাগল হয় তখন-ই যখন সব জিনিসের সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে অভিন্ন অনুভূত হয় বা একাত্ম অনুভূত হয়। এটাই হল সমত্বে-স্থিতি, ব্রাহ্মীস্থিতি, অদ্বয়তত্ত্বে, অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা—সচ্চিদানন্দস্বরূপে আপনবোধের পূর্ণ সমাধান ও স্থিতি। এ-ই হল স্বানুভূতি। [২২।১০।৭৫]

যোগ্য অধিকারীর স্বাত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান

পরমগুরুর আশ্রয়ে সবাই আছে। সমস্ত সাধনপদ্ধতির আদি-মধ্য-অন্তে তিনিই আছেন। এই কথাটিই গুরু ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে ধরিয়ে দেন এবং পুনঃপুনঃ আচরণ করে স্মৃতিতে জাগিয়ে দেন যে কারওর গুরু, আত্মা, ইষ্ট সসীম নয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই। তিনি অনন্তকালকে প্রসব করেন এবং অখণ্ড একদেশ ও এককাল তাঁর বক্ষেই খেলে এবং তিনি দেশ-কালের বক্ষে থেকেও দেশ-কালাতীত ভাবাতীত ভেদাতীত দ্বন্দ্বাতীত, 'আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম', পূর্ণতম 'নিত্যাদ্বৈত', সচ্চিদানন্দঘন। দেশ-কালের দ্বারা তিনি বিকৃত হন না। প্রত্যেকে নিত্য তাঁর বক্ষে আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে তিনিই আছেন।

প্রজ্ঞানময় গুরু বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ধরিয়ে দেন যে অন্তর্মন বা ঊর্ধ্বমন দিয়েই বহির্মনকে (নিম্নমনকে) শোধন করতে হয়। এর পদ্ধতি হল—বোধ যে নিজের ভিতরে খেলছে তা লক্ষ্য করে দেখা। অর্থাৎ চুপ করে বসে মনের খেলা দেখতে হয়। নিজেকে দেখার বিজ্ঞানই গুরু ধরিয়ে দেন। কারণ গুরু হলেন বোধস্বরূপ। গুরুর মহিমাই সব মতপথের সার কথা।

প্রত্যেকেই প্রত্যেক ভাবের সঙ্গে যুক্ত। যে ভাবেই পূর্ণকে ব্যবহার করা হোক তা একই থাকে। তত্ত্বত কেউই গুরুভ্রষ্ট হতে পারে না এবং গুরুও কাউকে ত্যাগ করতে পারেন না। তবে স্মৃতির মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য হয়। অদ্বয় আত্মগুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনা নেই; যদিও বহির্দৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছেদের ও ভেদের ধারণা অশুদ্ধ অসংযত অশান্ত অসমাহিত অবিবেকী অধীর চিত্তের কাছে অবিদ্যার প্রভাবে প্রতীয়মান হয়। ভেদজ্ঞান ও পার্থক্য হল ইন্দ্রিয়-মনের অবিদ্যাপ্রসূত গতানুগতিক কার্য। অবিদ্যা, অজ্ঞানের প্রভাবেই সকলে চলে অভ্যস্ত; কাজেই এ ব্যাপারে আর সচেতন হওয়ার গুরুত্ব কারও জাগে না। তবে, সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে যোগ্য অধিকারী গুরুনির্দিষ্ট সাধনপদ্ধতি সম্যক্‌রূপে অনুশীলনের দ্বারা শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ে অবিদ্যাজনিত সমস্ত মল বিদূরিত হয়ে ঊর্ধ্বমনের নির্মল প্রকাশ সিদ্ধ হয়। তার ফলে অন্তরাত্মা সাক্ষিচৈতন্য সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায়। [২৫।১০।৭৫]

স্বানুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরুর বাণীই হল উত্তম সৎসঙ্গ

সৎপ্রসঙ্গের তাৎপর্য অধিকারীভেদে চিত্তের শোধন অনুরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় সাধকের কাছে। এখানে তার মর্মার্থ

হল শুদ্ধ বোধ বা শক্তি বা জ্ঞান ইত্যাদি। অনুভবসিদ্ধ যাঁর মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয় তাঁকে বলা হয় সদ্‌গুরু বা অবতারপুরুষ বা মহাপুরুষ। তাঁরা সাধুসন্ন্যাসীর বেশধারী সাধারণ পর্যায়ের নন। [২৬।১০।৭৫]

আত্মসাধনার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

সাধনার সার বস্তুকে অবলম্বন করে সচেতন ভাবে চললে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ও গুরুত্ব কমে যায়। তা গতানুগতিক ভাবে পালিত না-হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। সর্বরকম ধর্মকর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল সচেতন ভাবে মনের গতানুগতিক ভাব, আদর্শ, চিন্তা ও কর্মধারাকে বিশেষ উন্নত শৃঙ্খলাপদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করে সুসম্পন্ন করা এবং তার ফলশ্রুতিরূপ অনুভূতিকে ভিত্তি করে একই সাধনপদ্ধতি পুনঃপুনঃ সচেতন ভাবে অভ্যাস করা। তার পরিবর্তে গতানুগতিক, অসার, অচেতন, অজ্ঞাত, মৃতপ্রায় কতগুলি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করে তার তাৎপর্য না-বুঝে যে ধর্মের অঙ্গগুলি সাধারণ মানুষ অনুশীলন করে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মরূপে এবং কখনও কখনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তার দ্বারা চিত্তের শোধন হয় না। অর্থাৎ মনে অবিদ্যার প্রভাবজনিত তমোরজোগুণের বিকারাদি যথাপূর্ব থেকে যায়। নূতন করে কোনও ভাববোধের প্রকাশবিকাশ বা অনুভূতি জাগে না। সেই জন্য এগুলি অভ্যাসের দ্বারা আত্মোন্নতির সম্ভাবনা কম। হয় এগুলিকে পরিহার করা উচিত, নতুবা অনুভবসিদ্ধের কাছ থেকে এগুলির বিজ্ঞানসম্মত সাধনপ্রক্রিয়া ও ব্যবহার সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে একাগ্র চিত্তে, আগ্রহ সহকারে, ভক্তিপূর্বক তা অনুশীলন করা উচিত। বিজ্ঞানসম্মত সাধনপ্রক্রিয়া ও ব্যবহারের মাধ্যমে তা অনুশীলন করা হলে অন্তরের শোধন এবং নিম্নমনের ঊর্ধ্বমনে রূপান্তর ও অন্তর্নিহিত দিব্য ভাববোধের প্রকাশ ও বিকাশ হওয়া সম্ভব।

অভ্যাসযোগ কথাটি সবাই বলে, কিন্তু অভ্যাসযোগের বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্যক্‌রূপে সবাই জানে না। তা অনুভবসিদ্ধ গুরুর নির্দেশে, তাঁর তত্ত্বাবধানে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করা চাই। তাহলে অভ্যাসজনিত পূর্বের দোষত্রুটি নূতন অভ্যাসের ফলে আপনিই অপসারিত হবে এবং নূতন অভ্যাসের গুণ, ভাব ও বোধরূপ অনুভূতির ফল সাধককে দ্রুত চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অন্তরে বোধের প্রভাব যত বেশি বাড়ে বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ সেই অনুযায়ী আপনিই কমে আসে। সেই রকম ধ্যান যখন আপনা থেকেই হয় তখন চেষ্টাপূর্বক ধ্যানাভ্যাস ছেড়ে দিতে হয়। যেমন কতকগুলি ঘড়ি আছে রোজ দম দিতে হয়, আর কতগুলি automatic, দম আর দিতে হয় না। পরিণামে ধ্যানের ব্যাপারেও গুরু automatic করে দেন। তার আগে পর্যন্ত প্রাণ-মন-বুদ্ধির সব বিভাগে গুরু বসে কাজ করেন এবং শিষ্যকে সচেতন করে দেন। নিজের প্রকাশকেই গুরু মূলে বা কেন্দ্রে পৌঁছে দেবেন, এতে গুরুই আনন্দ পান। তা গুরুরই দায়িত্ব। তবে একবার গুরুর উপরে দায়িত্বভার দিলে খুশিমতো জীবনে চলা যায়; যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গুরু এক এক জন সাধককে এক এক রকম ভাবে নির্দেশ দেন; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হল সাধকের অন্তরের দোষত্রুটি কমিয়ে যোগ্যতা বাড়ানো। সবার যোগ্যতা সমান থাকে না বলে যোগ্যতার মানের ভিত্তিতেই তিনি সাধনার নির্দেশ ও অনুশাসন পরস্পরকে দিয়ে থাকেন। একই রকম নির্দেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সেই জন্য পরস্পরের প্রতি গুরুর নির্দেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক স্তরের সাধক বা অনুশীলনকারীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে। তা অজ্ঞানের প্রভাবেই হয়ে থাকে। শরণাগতি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির জোরে যোগ্য অধিকারীদের মধ্যে এই অজ্ঞানের প্রভাব বেশি কার্যকরী হয় না। কারও কারও মধ্যে তার প্রভাব কমবেশি হতে দেখা যায়। সবই অজ্ঞানপ্রসূত পূর্বজন্মের সংস্কারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

জন্মগত সংস্কার অনুসারে গুরুকৃপা লাভ হয়

গুরুর কৃপা প্রথম থেকে কী ভাবে শরণাগত ভক্তের মধ্যে কার্যকরী হয় তা অনুশীলনকারীদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই প্রথমে বোঝা সম্ভবপর হয় না। যারা সুসংস্কার নিয়ে জাত হয় তারা কিছুটা বুঝতে পারে এবং তারা সেই অনুসারে চলবার চেষ্টা করে। আর যারা পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারে অবিদ্যার প্রভাবে চলে অভ্যস্ত তারা সব সময় অনুগত থাকতেও পারে না এবং গুরুর নির্দেশ মেনে সচেতন ভাবে চলতেও পারে না। তারাই গোলমাল সৃষ্টি করে। অবিদ্যার প্রভাবে তারা অযোগ্যতার ভিত্তিতেই চলে। অপরের দোষত্রুটি দেখে বেড়ায় ও নিজের প্রাধান্য বাড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু যোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করে না। এরাই পিছিয়ে পড়ে এবং গুরুনির্দেশ ঠিকমতো মানতে না-পারায় বেশিদূর আর এগোতে পারে না। সাধনসিদ্ধি, আত্মসিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি বহু জন্মের সাধনার ফলশ্রুতি। দু'এক জন্ম অভ্যাস বা সাধনা করে কতদূর আর সাধক এগোতে পারে?

আত্মসাধন, জীবনসাধন গুরু-ইষ্টের কৃপাসাপেক্ষ সত্য, কিন্তু ক্রমপর্যায়েই তার প্রকাশবিকাশ ফলবতী হয়। এটাই বিজ্ঞানদৃষ্টি। সর্বপ্রকার অধ্যাত্মসাধনাই ক্রমিক বিকাশের বিজ্ঞান। তবে শেষ জন্মে যে চরম উন্নতি বা পরিসমাপ্তি হয়, তা কেবল উত্তম অধিকারীদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সাধারণ অধিকারী তা আশা করতে পারে না।

গুরু কিন্তু সকলকেই অনুপ্রাণিত করে দেন এবং উত্তরোত্তর উৎসাহ বাড়িয়ে দেন। উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ সব অধিকারীরই সাধনক্রম আপন আপন অন্তরের সংস্কার ও যোগ্যতার মানের ভিত্তিকে অবলম্বন করেই সম্পন্ন হয় ও সাধিত হয়। এ বিষয়ে কারওর সঙ্গে কারওর তুলনা বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং যুক্তিসঙ্গতও নয়।

গুরুবিদ্যা তথা পরাবিদ্যার নির্দেশ ও অভ্যাসক্রম

গুরুবিদ্যা মহাবিদ্যা। সর্বোত্তম স্তরে তা-ই পরাবিদ্যা। মধ্যম স্তরে তা মন ও প্রাণ বিদ্যার যুগ্ম রূপ। প্রথম অবস্থায় গুরুবিদ্যা দেহ-প্রাণ-মনের শোধনবিদ্যা। সুতরাং সাধারণ স্তরের গুরু যে ভাবে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেন তা সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করে নিষ্ঠাসহকারে সাধন করলেই দেহ-প্রাণ-মনের বিকার কাটে, শোধন হয় ও মধ্যম স্তরের বিদ্যালাভের যোগ্যতা তৈরি হয়। প্রথম প্রথম মধ্যম স্তরের বিদ্যাকে গুরু প্রাণ ও মনের যুগ্মরূপ অনুশীলনের শিক্ষা দেন মন্ত্রজপ ও ধ্যানযোগের মাধ্যমে অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে। ক্রিয়াযোগের সাধনায় যোগ্যতা তৈরি হলে ধ্যান ও জপের মিশ্রিত সাধন অভ্যাস করতে দেন। তা পূর্ণাঙ্গ ভাবে সাধিত হলে অধিকারী বুঝে কাউকে প্রেম-ভক্তির নির্দেশ দেন, কাউকে রাজযোগ অর্থাৎ পূর্ণ ধ্যানযোগের নির্দেশ দেন, আবার কাউকে যোগ্যতা অনুসারে বিবেকবিচারপূর্বক জ্ঞানযোগের নির্দেশ দেন।

অভ্যাসকারীর সাধনক্রমের ফলশ্রুতি

সকলের প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি ও লক্ষ্য সচেতন ভাবেই থাকে এবং তিনি অনুশীলনকারীর ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটি যথাপূর্বক অবগত হয়ে তার শোধন করে দেন। দীর্ঘকাল সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে সাধনে রত থেকে অভ্যাসকারী আপন আপন অভীষ্টলাভে কৃতকৃত্য হয়। উত্তম অধিকারীর পূর্ণতাসিদ্ধি স্বল্পকালের মধ্যেই হয়ে থাকে। মধ্যম অধিকারীর কিছু বেশি সময় লাগে, সাধারণ অধিকারীর কম করেও তিন জন্ম লাগে। আর যারা অতি সাধারণ অধিকারী তাদের সম্বন্ধে কোনও সময়ের নির্দেশ নেই। কতগুলি জন্ম তাদের কমবেশি অভ্যাস করে যেতেই হবে। এই অভ্যাসের ফলে যোগ্যতার মানের উন্নতি হলে তারা ধীরে ধীরে মধ্যম স্তরের অধিকারীতে উন্নীত হবে এবং সেই অনুরূপ সাধনভজনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও প্রকাশ পাবে। গুরুকৃপা কিন্তু পূর্বাপর সমভাবেই সাথে সাথে চলতে থাকে।

উত্তম অধিকারীর সাধনসিদ্ধির ফলশ্রুতি

সাধনার উৎকর্ষ আত্মপ্রচেষ্টা অর্থাৎ স্বকীয় পুরুষকার, গুরু-ইষ্টের কৃপা ও আশীর্বাদ যোগেই সুসিদ্ধ হয়। মধ্যম স্তরের অধিকারীর যোগ্যতার মান সম্যক্‌রূপে উন্নত হলে উত্তম অধিকারীর স্তরে পৌঁছায়। তখন উত্তম অধিকারীর যোগ্যতা অনুসারে তার ভিতরে সাধনার বেগ তীব্রতর হয় এবং সাধককে সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। সাধনসিদ্ধ হয়ে সাধক সকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুকে স্তবস্তুতি দ্বারা ও সেবা দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রীতিবিধান করে। গুরু তার স্বভাব, আচরণ ও সাধনসিদ্ধিতে হৃষ্ট, প্রীত ও তুষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে তাঁর আসনে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যান। এই ভাবে সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যদের যোগ্যতার মানের বিকাশসাধন করে, তাকে পরম সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গুরুপদে, গুরুস্থানে বসিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি তার মধ্যে মিশে যান।

অযাচিত ভাবে মাতৃকরুণালাভের একটি ঘটনা

এই প্রসঙ্গে অতীতের একটি ঘটনা শোন—একবার এক গৃহীর সঙ্গে 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) আলাপ হয়েছিল। তার গুরুতর কয়েকটি দোষত্রুটি থাকার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে সে অপ্রিয় ছিল। একবার এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে এক মহাত্মার কাছে গেল। মহাত্মা তাকে তাঁর কাছে প্রায়ই আসবার জন্য বলে দিতেন।

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই মহাত্মা স্থানান্তরে চলে গেলেন। তার পরেই তার যোগাযোগ হল 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) সঙ্গে। তাকে দেখে খুব কৌতুক বোধ করলাম এই দেখে যে—মা নিজেকে কী ভাবে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। থেকে থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ছেন। মা যেন আরও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। তখন তাকে চা ও খাবার দেওয়া হল। সে তখন বলল—আপনার ঘরে এই পেয়ালা ছাড়া আর অন্য কোনও পেয়ালা নেই?

সে সংকোচ বোধ করছে দেখে তাকে বলা হল—তুমি খাও, ধুয়ে নিলেই চলবে।

লোকটি বলল—এ রকম ভাবে যত্ন করে কেউ কোনও দিন আমাকে খাওয়ায়নি। আজ আপনি দিলেন। আমার অনেক ব্যাধি আছে, জেনে শুনে আমি আপনার ক্ষতি করতে পারব না।

তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হল যে তোমার সে ভয় নেই, তোমার কোনও দোষ হবে না। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) দায়িত্ব আরেকজনের কাছে রইল।

খেয়ে-দেয়ে সে চলে গেল। তাকে বলা হল—আবার আসিস!

লোকটি বলল—আপনি আমার সম্বন্ধে জানেন না তাই আসতে বলছেন। এ হেন কুকাজ নেই যা আমি করিনি। সে সব শুনলে আপনি আর ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

তার মধ্যে সচ্চিদানন্দময়ী মা এমন এক দৃশ্য দেখালেন যে, বোঝা গেল মা 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) বিজ্ঞানসিদ্ধ করাবেন বলে তাকে এখানে এনেছেন।

মাকে বলা হল—জীবনরূপে তুমি যে কত অভিনয় কর! আজ 'এই জায়গায়' (নিজের দেহের দিকে দেখিয়ে) ঐ জীবনকে বসাতে পারতে। দু'টি পৃথক ভাবাপন্ন জীবনের মিলনের মাধ্যমে পরম এক তত্ত্বের নিগূঢ় অদ্বয় সত্যটি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বানুভবসিদ্ধ করাবে বলে তুমি এই ব্যবস্থা করেছ।

সে অনেক দিন পরে আবার এল; এসে বলল—একটা বিড়ি দিতে পারেন?

বললাম—এই জায়গায় তুই ঠকলি। এ সব তো আমার কাছে নেই। তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটি বলল—না থাক, খাব না। আপনার কাছে আমার ঋণ বাড়ছে।

এই প্রকৃতির লোকের মধ্যে সচেতনতা দেখে অবাক হলাম। তাকে বললাম— তোর কোনও ঋণ নেই। 'এ' (নিজেকে দেখিয়ে) তোর কাছে মহাঋণী।

এ কথা শুনে তড়িতাহতের মতো সে স্তব্ধ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল—আমি কী এমন করেছি যার জন্য আপনি ঋণী হলেন?

তাকে বলা হল—কয়েকদিন আসিস, তবে টের পাবি। তিন দিন পরে সে আবার এসে হাজির হল এবং আবার জানতে চাইল।

তাকে বললাম—তুই এখানে খা, থাক, পরে সব বলব। কিন্তু সে নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে খুব সচেতন। তাই বলল—আপনার বিছানায় আমি শোব না।

যাই হোক তাকে অনেক বুঝিয়ে রাখা হল। বলা হল তুই চিদানন্দময়ী মায়ের একটা উদাহরণ। তোর জীবনের যে উদাহরণ চিতিমাতা দেখালেন তা আমাকে মানতে হবে।

সে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমার মধ্যে আপনার চৈতন্যময়ী মা আছেন? আর আপনি ঋণ শোধ করবেন আমার মতো এক অপদার্থ হতভাগ্যকে মেনে?

তাকে বললাম—তুই জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিস। তোর এই অভিজ্ঞতারূপী মাকে মানা-ই হল 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করলেন) আনন্দ।

সে বলল—তাহলে আপনি 'আসল মা'-কে দেখেননি।

কোনও উত্তর বেরোল না। তাঁর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা হল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখন চিদানন্দময়ী মায়ের অহেতুক কৃপাকরুণার কথাই মনে পড়ছিল। মাগো, তুমি অযাচিত ভাবেই সব দিয়ে যাও; তবে সাধনা করে তোমাকে আর পেতে হবে কেন? এক-এর কাছে এক-কে তুমিই তো প্রকাশ করে দাও। তাই তো বলা হয় সংসারে যা-কিছু আছে সব ব্রহ্মজ্ঞগুরুরই পরিচয়। এই হল সত্যানুভূতি।

[২৯।১০।৭৫]

গুরুনিষ্ঠা প্রসঙ্গে নির্দেশ

এক আশ্রমবাসী সাধককে গুরুনিষ্ঠার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছিলেন—

শাস্ত্রের অনেক কথাই স্ববিরুদ্ধ মনে হয়। যেমন, একদিকে গুরুনিষ্ঠা ও ইষ্টনিষ্ঠার কথা বলা আছে, আবার আরেক দিকে বলা আছে মৌমাছি যেমন পুষ্পে পুষ্পে বসে মধু সংগ্রহ করে সে রকম যেখানেই সৎপ্রসঙ্গ হবে সেখানেই প্রাণভরে সৎপ্রসঙ্গ বা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে নাও।

গুরুর এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে এবং আশ্রমের গণ্ডির মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখাই কী গুরুনিষ্ঠার পরিচয়? সব প্রকাশ থেকেই সকলে পুষ্ট হয়। গুরুকে কেবল ঐ বিশেষ আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে ভুল হয়। পাঁচজনের কাছ থেকে তোমার প্রয়োজনীয় উপকরণ পাচ্ছ, কিন্তু সব কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিচ্ছ একজনের পায়ে। তা তো প্রকৃত গুরুনিষ্ঠা নয়।

সত্যস্বরূপকে দেখতে হয় গুরুবাক্, গুরুর নয়ন ও গুরুর নির্দেশ নিয়ে। গুরু ব্যতীত আসল বস্তু কেউ দিতে পারে না। গুরু হলেন ভগবানের প্রতিনিধি। ভগবানের প্রত্যক্ষ পরিচয় গুরুর মাধ্যমেই হয়।

গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য হল যেন পূজার মন্ত্র। গুরুবাক্য মেনে চললে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়।

[১৬।১১।৭৫]

সূক্ষ্ম দেহে সপ্ত জ্ঞানভূমিতে গুরুশক্তির অধিষ্ঠান

পঞ্চম ভূমি থেকে গুরুশক্তির প্রভাব ধরা পড়ে। আজ্ঞাদল হল গুরুর স্থল। এই স্তর থেকেই আরম্ভ হয় ঋষি স্তর। সেই জন্য মুখমণ্ডলের সপ্ত ভূমিকে সপ্ত ঋষির স্থানরূপে নির্দেশ করা হয়। মুনির স্তর হল কণ্ঠ থেকে আরম্ভ করে নাভি পর্যন্ত। নাভি হল তেজতত্ত্বের স্থান এবং ব্রহ্মার আসন হল নাভিতে। সৃষ্টির যা-কিছু ব্যাপার তা আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চলে, তার পরে আর চলে না। তখন ব্যষ্টি স্থূলভূত সমষ্টি স্থূলভূতে লীন হয়, আবার সমষ্টি স্থূলভূত সূক্ষ্মভূতে লীন হয়। সমষ্টি সূক্ষ্মভূতের একক মূর্তি হল মহতত্ত্ব। মহতত্ত্ব আবার অব্যক্ত-প্রকৃতিতে লীন হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি পরমতত্ত্বের সঙ্গে নিত্যযুক্ত।

সমষ্টিবুদ্ধি হল মহতত্ত্ব। ধী'কে আহ্বান করাই হল ধ্যান, জ্ঞান ও বিচার। তাঁকে আহ্বান করতে হয়। তিনি আমাদের ডেকে যাচ্ছেন। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আবার তিনিই টেনে নিচ্ছেন। গুরুশক্তির দ্বারা সে প্রভাবান্বিত হয়ে চলেছে। গুরু হলেন বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তাঁর ব্যষ্টিরূপও সত্য। সদ্‌গুরুগণই গুরুর মহিমা ধরিয়ে দেন। [২৫।১১।৭৫]

শাস্ত্রাদি চতুর্বিধ কৃপার মাধ্যমে সত্যপ্রতিষ্ঠা

পূর্ণতা লাভের জন্য শাস্ত্রকৃপা, আত্মকৃপা, গুরুকৃপা ও ঈশ্বরকৃপা এই চতুর্বিধ কৃপার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রকৃপার লক্ষণ হল শাস্ত্রের মর্মার্থলাভ বা অনুভূতির ও বোধের বিকাশ। আত্মকৃপা হল সমদৃষ্টি বা সমবোধ। গুরুকৃপা লাভের লক্ষণ হল প্রজ্ঞাস্থিতি এবং ঈশ্বরীয় কৃপালাভের লক্ষণ হল প্রেম-ভক্তি লাভ। এই চতুর্বিধ কৃপালাভ হলে সাধকের মধ্যে পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সত্যবোধের ধ্রুবাস্মৃতি তার স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অন্য ভাবে বলা চলে সত্যের মূলে তার সমগ্র সত্তা যুক্ত হয়ে মিশে যায়। একেই সত্যে প্রবেশ, সত্যদর্শন, সত্যপ্রতিষ্ঠা বলা হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত কৃপা লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়।

আত্মকৃপা লাভ হলে অন্যান্য কৃপা সহজলভ্য হয়

গুরুকৃপা ছাড়া শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা স্থায়ী হয় না। আবার গুরুকৃপা ছাড়া ঈশ্বরীয় কৃপাও মেলে না। ঈশ্বরই গুরুভাবে এসে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে প্রার্থীকে তৈরি করে নেন। আত্মকৃপা পূর্ণ ভাবে হলে অন্যান্য কৃপাগুলি সহজেই লভ্য হয়। তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। তবে এই আত্মকৃপা লাভের পশ্চাতে অনান্য কৃপা সংস্কারের ভিত্তিতে সঞ্চিত হয় পলে পলে। পরিশেষে আত্মকৃপার রূপ ধরে সে সব জীবনে উদয় হয়। তখন তার লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়। সেই লক্ষণগুলি সবই দিব্য অধ্যাত্ম ভাবের বিশেষ লক্ষণ। তা দেখে গুরু ও অন্যান্য মহাত্মাগণ প্রীত হন এবং বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ করেন। তা খুব ব্যাপক ভাবে দৃষ্ট না-হলেও এরূপ উদাহরণ বিরল নয়।

শুদ্ধ মনে বিবেকগুরুর উদয়ে হয় আত্মবোধ

ইদানীংকালে গুরুতত্ত্বের বিষয় অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য বলে মনে হয়; কারণ অনধিকারী সাজা গুরুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে তাদের আচারব্যবহারে গুরুতত্ত্বের বিকৃতরূপ ও অসত্যরূপ দেখে অনেকেরই মনে সংশয় ও অবিশ্বাস জাগছে। সেই জন্য গুরুতত্ত্ব জটিল বলে অনেকেই মন্তব্য করে। এ প্রসঙ্গে অনেক রকম মতবাদই শোনা যায়। কারও মতে শুদ্ধ মনই হল গুরু। আবার কারও মতে বিবেকই হল গুরু। বিবেকরূপী গুরুর পরিচয় পেলে শাস্ত্র বা অন্য গুরুর প্রাধান্য হ্রাস পায়। মনে যা ভেসে ওঠে তা-ই বিবেক নয়। 'যা সত্যকে প্রকাশ করে দেয়, যাকে দ্বিতীয় কোনও বস্তুর সাহায্যে প্রমাণ করতে হয় না তা-ই বিবেক'। 'যা

স্বয়ংসিদ্ধরূপে অন্তরে ফুটে ওঠে তাই প্রজ্ঞাবাণী'। প্রজ্ঞাবাণী শুনে চলা কঠিন। গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি অথবা সমস্ত জ্ঞানের ও আনন্দের কেন্দ্র। সেই গুরুর সাক্ষাৎ পেলে গুরুর দেহের প্রতি শিষ্যের আসক্তি কমে যায় এবং গুরুবোধের প্রতি অধিক গুরুত্ব জাগে। সেই শিষ্য তখন আপনস্বরূপের মধ্যে গুরুর স্বরূপকে খুঁজে পায়। এইরূপ শিষ্য অতি দুর্লভ।

আত্মগুরুর মাধ্যমে পরমাত্মার নিত্যলীলা প্রকাশ পায়

পরমাত্মার নিত্যলীলা আত্মগুরুর মাধ্যমে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়। তা জীবনের প্রতিটি আচরণে, কথায় ও ব্যবহারে যোগ্য অধিকারী ও উত্তম ভক্তের কাছে বিশেষ অনুগ্রহরূপে প্রথমে ধরা পড়ে এবং অভ্যাসের দ্বারা তা শুদ্ধবোধে হৃদয়ঙ্গম হয়। এইরূপ অনুভবকারী শিষ্য জানতে পারে যে পরমাত্মা সদ্‌গুরুর সাজে অভিব্যক্ত হলেও নিত্য এক হয়ে বিরাজ করছেন ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশরূপে। অবতাররূপে ঈশ্বর দেহধারণ করে না-এলে মানুষ কোনও দিনই নিত্যলীলার আস্বাদন করতে পারত না। নিত্যলীলার পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় আত্মজ্ঞগুরুর মধ্যেই।

গুরু ও ঈশ্বর এক। সদ্‌গুরুর মধ্যে সব দেবদেবী বাস করেন। তাই ভগবান বলেন—'নিত্যের মধ্যে একলা থাকবি? সদ্‌গুরু লাভ হলে সকলের মধ্যেই থাকতে পারবি।' সৎ সকলের মধ্যেই আছেন। সদ্‌গুরুর লৌকিক দেহকে মানুষ সব সময় বুঝে উঠতে পারে না।

হৃদয়েতে নামের স্ফূর্তি হলে ভাবস্ফূর্তি হয়

নাম দিয়ে রূপকে ব্যবহার করতে হয়। নাম যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তাহলে মধুরভাব আসে। এই ভাব গাঢ় হলে হয় ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ স্বভাবের স্ফূর্তি। তাই হল নিত্যের মধ্যে লীলা এবং লীলার মধ্যে নিত্যস্থিতি। অথবা বলা যায় বোধের মধ্যে মন এবং মনের মধ্যে বোধ। আমার মধ্যে গুরু আছেন এবং গুরুর মধ্যে আমি আছি। এই অভিন্ন বোধে ভয়, সংশয় ও ভেদজ্ঞান চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়। বোধসত্তাই স্বয়ং গুরু।

'আমি তাঁর মধ্যে এবং তিনি আমার মধ্যে' অথবা 'জীবের আমির মধ্যে শিবের আমি' এবং 'শিবের আমির মধ্যে জীবের আমি', এই অদ্বয়বোধের বৃত্তি চক্রাকারে খেললে গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হয়। তখনই হয় ''তত্ত্বমসি''-র মর্মার্থ সিদ্ধ। [৩০।১১।৭৫]

সদ্‌গুরু ও তাঁর বাণীই হল জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান

সমবেত ভাবে ভজনপূজনের ফলে যে ত্রুটি ধরা পড়ে তা শোধনের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা জাগে। জিজ্ঞাসা পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় গুরুর।

যিনি সঠিক উত্তর দিয়ে সব সংশয়ের সমাধান করে দিতে পারেন তিনি-ই সদ্‌গুরু। সেই আশ্চর্য-পুরুষের ধ্যান ও যুক্তি প্রমাণসিদ্ধ। তাঁর কথার উপরে আলাদা কোনও ধ্যান, যুক্তি ও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। নয়তো কোনও একটি শব্দার্থের জন্য তিনটিই প্রয়োজন। অর্থাৎ তিনটি একসঙ্গে না-হলে তার নিকট শব্দের অর্থবোধ জাগে না বলে তা-ই হল নির্বীজ শব্দ বা নির্বীজ মন্ত্র।

সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত বাক্য বীজমন্ত্র অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী ও কার্যকরী। সব মন্ত্রের সার নিহিত থাকে গুরুবাক্যে। কিন্তু গুরুবাক্য সব সময় সকলের মনঃপূত হয় না বা অভ্রান্ত সত্য বলে অনেকে মেনে নিতে পারে না।

যুগে যুগে অনুভূতির মানের তারতম্যের কারণ হল মন। গুরুবাক্য ত্যাগ করে অন্য বিষয়ের উপর মন অধিক গুরুত্ব দেয় এবং সেই বিষয়ের সার গ্রহণ করতে করতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। মানুষ জানে না যে সব শব্দের সার কার উপর নির্ভর করে। গুরুই সব শব্দের সারকে মন্ত্র বা বীজ অথবা তত্ত্ব দিয়ে ধরিয়ে দেন; কিন্তু মন তা চায় না। তাই নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে যাচাই করে ও বিচার করে।

সদ্‌গুরুর মুখে সত্যের কথা শুনে পুনরায় তার অর্থবোধ মনন করতে হয়। গুরুবাক্য হল ধ্যানসিদ্ধ এবং তার যুক্তিপ্রমাণ অকাট্য। গুরুতত্ত্ব গ্রহণ করার পদ্ধতি হল তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দকে ধারণ করে মনকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। তাঁর কথায় থাকাই হল 'ক'-এ থাকা এবং 'ক'-এ থাকলেই মন বোধের কেন্দ্রে প্রবেশ করে যায়। যেমন খাদ্যের সার অংশ দেহের মধ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং মন, প্রাণ ও বুদ্ধিতে প্রবেশ করে, তবেই তা পুষ্ট হয়। সেইরূপ মন যদি গুরুবাক্য থেকে সরে যায় তবে তার সারাংশ ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং তদনুরূপ ফলও পাওয়া যায় না। কারণ শব্দশাস্ত্র বিরাট। সব মতপথ সত্য হয় এক-এতে অর্থাৎ সমবোধে যুক্ত হলে। যেখানে দুই বা দ্বন্দ্ব থাকে সেখানে সত্য আবৃত থাকে।

সদ্‌গুরু, মহাপুরুষদের বাক্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনন করলে অতীতের ঘটনাবলী বা দৃশ্যাবলী বর্তমানে প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটে ওঠে। এজন্য শ্রুতবাক্যগুলির যথার্থ মনন হলে হয় ভগবৎলীলা আস্বাদন।

এই লীলার নিগূঢ়ার্থ হল—যে ভাবে সদ্‌গুরুকে দেখা হয় এবং তাঁর কথা শোনা হয়, তা যদি পুনরায় ব্যবহার করা যায় তা হলেই লীলা আস্বাদন করা হয়, নইলে শুধু অনুমানই সার হয়। যথার্থ ভাবে মনন ও ব্যবহার হলে মন সংকল্পমাত্র অতীতের ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন ও অনুভব করতে পারে। সকলের মধ্যেই এই শক্তি নিহিত আছে।

জ্ঞান হল নিত্য এক সৎ। যেখানে দুই সেখানে দ্বন্দ্ব ও বিকার, সংশয় ও সন্দেহ যেখানে সেখানে অজ্ঞানের প্রাধান্য। এক কথায় 'সৎ' হল 'ক'-এ থাকা। এ-ই হল সত্যের ভূমি বা গুরুর চরণ। অথবা সমত্ব হল গুরুর চরণ। আবার বিশুদ্ধ বোধ বা প্রজ্ঞানেই হল সমতা। যা গুরুর চরণ, তা-ই গুরুর মস্তক। গুরুর সব অঙ্গ এক উপাদানে গড়া।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ও তাঁর আত্মগুরু প্রসঙ্গে

সবাই 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) গুরুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। 'এ' সকলকেই গুরু বলে স্বীকার করে। কিন্তু সকলেই বিশেষ একজনের নাম শুনতে চায়। তখন তাদের বলা হয় 'এই দেহের' মা৩া-পিতা 'এর' গুরু, তোমাদের মাতা-পিতা 'এর' গুরু, সমগ্র বিশ্বজগৎ 'এর' গুরু। সকলের কাছেই 'এ' ঋণী। সবার কাছ থেকেই 'এ' জ্ঞান পেয়েছে। সুতরাং কাউকেই 'এ' অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই সবাইকে 'এ' গুরু বলে বরণ করে নিয়েছে। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সবই হল 'এর' গুরু স্বয়ং। এর পরেও যখন তারা জিজ্ঞাসা করে তখন বলা হয়— তোমার গুরুই 'এর' গুরু। তাতেও কেউ সন্তুষ্ট হয় না, দীক্ষাগুরুর কথা জানতে চায়। তখন বলা হয় তোমার গুরু এবং তাঁর গুরু এ ভাবে যতদুর যেতে পার তিনিই হলেন 'এর' গুরু। তিনিই হলেন আদিগুরু। সেই আদিগুরুই হলেন 'এর' দীক্ষাগুরু। তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা আরও বিশদ ভাবে জানতে চায়। তখন বলা ২য় দুঃখ-বেদনাই হল 'এর' গুরু। তার পরেও যাদের জিজ্ঞাসা থাকে তাদের বলা হয়—যাঁকে কেউ মাপতে পারে না, জ্ঞানের বিষয় করতে পারে না এবং যাঁকে বাদ দিয়ে কারওর অস্তিত্ব নেই সেই ভূমা চৈতন্যস্বরূপ হল 'এর' গুরু। এই চৈতন্যস্বরূপ হল আনন্দস্বরূপ। অখণ্ড ভূমানন্দ হল 'এর' গুরু।

আত্মগুরু প্রসঙ্গে সমগ্র ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়

অল্প সময় নীরবে বসে থেকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার বললেন—'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মা-মা করে ঠিকই; কিন্তু এই মা হলেন তিনিই যাঁকে মাপা যায় না এবং কোনও পার্থিব বা লৌকিক বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করা যায় না। তিনি স্বয়ংই স্বয়ং উপমা। তিনি অখণ্ড পূর্ণ বলে পূর্ণতার অভাব তাঁর কখনও হয় না। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ বলে তাঁর সাধনার প্রয়োজন হয় না; তবু তিনি সাধনা করেন। নিত্যবর্তমান বলে তাঁর অস্তিত্বের অভাব হয় না সত্য তবুও কিন্তু কল্পিত অভাবের সৃষ্টি হয়। নিত্যসমান বলে তাঁর কোনও বিকার বা ব্যতিক্রম হয় না; কিন্তু বাইরে ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টিতে বিকার বা ব্যতিক্রম দেখায়। স্বয়ংপ্রকাশ বলে তিনি আবরিত হন না, কিন্তু ব্যষ্টির দৃষ্টিতে যেন কল্পিত আবরণের ভান হয়। তিনি সব কিছু আপনবোধে গ্রহণ করেন বলে তাঁর দ্বন্দ্ব, সংশয় ও ভেদ নেই, কিন্তু দ্বন্দ্ব, সংশয় ও ভেদের ভান হয়। তিনি অণু থেকেও অণুতম বলে অণুর কাছেও ধরা দেন না আবার মহৎ থেকেও মহীয়ান বলে মহৎও তাঁর সন্ধান পায় না। তিনি নিজেই সত্তা ও শক্তি বলে সর্বত্রই সত্তাশক্তির অভিব্যক্তি। আবার তিনি তদূর্ধ্বেও। তিনি নিজেই পুরুষ ও প্রকৃতি বলে তাঁর ইচ্ছাপূরণের কোনও অভাব হয় না। তিনি স্বসংবেদ্য স্বানুভব বলে তিনি আপনাতে আপনি মগন। আস্বাদনের জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর কাছে তাঁর যেতে হয় না। নিজেই তিনি নিজের অধীন অর্থাৎ স্বতন্ত্র নিত্যযুক্ত ও চিরস্বাধীন বলে অপরের অধীনে তাঁর যেতে হয় না। তিনিই শুধু স্বতন্ত্র স্বাধীন, অপর কেউ স্বতন্ত্র স্বাধীন নয়। আর সকলেই হল পরতন্ত্র-পরাধীন অর্থাৎ তাঁর অধীন, তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তর্গত। তিনি আপনি যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী; আপনি তন্ত্র, আপনি তন্ত্রী; আপনি মন্ত্র, আপনি মন্ত্রী।

এই 'সৎ' সর্বপ্রকাশের অস্তিত্ব এবং শক্তি দান করেন। আপনবক্ষে সকলের স্থান সব সময় দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর নিজের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি দেবতাকে দেবতা বানান, গুরুকে গুরু, সাধুকে সাধু, অসৎকে লঘু বানান কিন্তু নিজে কিছু বনেন না। তিনি জ্ঞানস্বরূপ হয়েও আবার জেনে জানান সকলকে এবং সকলকে জানিয়ে জানেন নিজেই। আবার তিনি জানাজানির ঊর্ধ্বে স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়শূন্য তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই।

তিনি দেখে দেখান সকলকে এবং দেখিয়ে সকলকে দেখেন নিজেই। তিনি বলে বলান সকলকে এবং বলিয়ে সকলকে বলেন নিজেই। তিনি শুনে শোনান সকলকে এবং শুনিয়ে সকলকে শোনেন নিজেই। তিনি মেনে মানান সকলকে এবং মানিয়ে সকলকে মানেন নিজেই। এই হল তাঁর লীলামহিমার অভিনব তাৎপর্য। অর্থাৎ কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা সেজে সকলের মধ্যে একমাত্র তিনিই লীলা করেন। তাই দেখা যায়, তিনি সকলকে দেখান, শোনান এবং আস্বাদন করান কিন্তু তিনি নিজে কিছু দেখেন না, শোনেন না বা আস্বাদন করেন না। কারণ তিনি স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যনির্বিকার অদ্বয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দপুরুষ। আরেকদিকে তিনি নিজেই জানেন, শোনেন, দেখেন ও আস্বাদন করেন, কারণ তাঁর মাঝে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই **সবার অন্তরাত্মা, অন্তঃকরণ, অন্তঃসত্তা ও বহিঃসত্তা এবং বহিরিন্দ্রিয়াদি ও তার বিষয়সমূহ। বহির্দৃষ্টিতে ভ্রান্তিবশত সব কিছুই পৃথক পৃথক দেখায়। অন্তর্দৃষ্টিতে দ্বৈতবোধে সব ব্যবহৃত হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞানে সব অখণ্ড একরূপে অনুভূত হয়।**

নিত্যস্বরূপে তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ শান্ত নিষ্ক্রিয় নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন অচ্যুত সনাতন একমেবাদ্বিতীয়ম্। জানা, বলা, শোনা, দেখা প্রভৃতি কল্পনার বিলাস তাতে নেই। সুতরাং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, দ্রষ্টা-দৃষ্টি-দর্শন প্রভৃতি ভাব তাতে নেই। তিনি কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ নাম-রূপশূন্য। তিনি ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) নিজেই নিজের গুরু এবং নিজেই নিজের চেলা। আবার 'এ' কারওর গুরুও নয় চেলাও নয়।"

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন—"গুরুবোধ আরম্ভ হয় অতীন্দ্রিয়ের রাজ্য থেকে। ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হল লঘুর রাজ্য। জীবের আমি, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনের যে অখণ্ড ঘর সে-ই হল গুরু। সকলকে নিয়েই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

দেহের এক এক অঙ্গের এক একজন বিশেষজ্ঞ আছে। দেহের এক অঙ্গের বিজ্ঞানচর্চা করলে সেই অঙ্গের বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দেহ-বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এমন একজন বিশেষজ্ঞ আছেন বা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাঁর কাছে বা যেখানে গেলে সব বিদ্যা পাওয়া যায়। এই হল গুরুবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা বা বিদ্যার বিদ্যা। তাকেই বলা হয় প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান বা Science of Supreme Knowledge সেখানে যা বিষয়, তাই বিষয়ী। অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী পৃথক নয়।

নিজের মধ্যে সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের লীলা অভিনয়

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নিজের সম্বন্ধে সেদিন বললেন—"তাঁর (সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের) একটা প্রতিজ্ঞা ছিল যে 'এ দেহের' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মধ্যে তিনি সব কিছু উজাড় করে ঢেলে দেবেন। অতি দুর্বোধ্য ও গোপন তত্ত্ব প্রত্যেককে সমান ভাবে দিয়ে যাবেন। জিজ্ঞাসা করতে পার— কেন? এর উত্তরে বলা যায়—এ-ই তাঁর খেয়াল। ছোট শিশু যেমন এক সময় তার অতি প্রিয় খেলনার ভাণ্ডার বা তহবিল কাউকে ধরতে দেয় না, আবার এক সময় তা সবাইকে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয় বা সব ছড়িয়ে ফেলে দেয় তেমনি অতি গভীর যে সব তত্ত্বের বিষয় 'এর' মধ্য দিয়ে আসছে, তার প্রতি 'এর' কোনও মমত্ব নেই, সংরক্ষণের কোনও তাগিদও 'এর' মধ্যে ওঠে না। যখন সময় হবে টুকুস্ করে 'এ' চলে যাবে। 'এর' পাবার বা হারাবার কিছু নেই। এক সময় আমিতত্ত্ব দিয়েছে, কিন্তু চাবি দিয়ে রেখেছে। সত্যযুগে তা পূর্ণ করে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যখন অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে সত্যযুগের (সত্যানুভূতির) বিকাশপ্রকাশ হবে তখন সকলেই সেই আমিতত্ত্বের চাবিকাঠি পাবে। এখন অতি উচ্চকোটি মহাত্মার মধ্যে আমিতত্ত্বের ভাব জাগ্রত হলেও তা প্রয়োগ করা বা ব্যবহার করার সুযোগ তাঁরা পাবেন না। সকলকেই তুমিতত্ত্বের ব্যবহার নিয়েই থাকতে হবে এ যুগে।

বর্তমানের জন্য নির্দেশ হল 'তোমার ও তুমি' দিয়ে 'আমার ও আমি'-কে ব্যবহার করলে গুরুবোধ জাগবে। গুরু হলেন সেই 'এক আমি' যেখানে আদি-মধ্য-অন্তে আনন্দ আছে এবং আনন্দই যেখানে কারণ-কার্য-ক্রিয়া-সাধন-করণ।

আনন্দ প্রতিষ্ঠিত সমান জ্ঞানের উপরে। অসমান জ্ঞানে আনন্দ নেই। আনন্দের ভিতরে 'এর' (নিজের দিকে দেখালেন) বাস। যেখানে আনন্দ পরিপূর্ণ সেখানে এমন এক জায়গায় 'এ' আছে যার সন্ধান সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন বিদ্যাভিমানী অহংকারী কেউ পাবে না।

ত্রিশূলের ফলার শেষ প্রান্তে একটা বিন্দু থাকে সেই বিন্দুতে দ্বিতীয় কোনও বিন্দুর স্থান নেই। চৈতন্যময়ী মায়ের বক্ষে ঐ রকম একটা স্থান আছে। চিদানন্দময়ী মায়ের ইচ্ছা ও কৃপা ব্যতীত তার ধারে কাছে যাবার উপায় অন্য কারওর নেই। সেখানেই নিত্য এক-এর বাস; সেই নিত্য এক-এর গভীরে 'এর' বাস। কাজেই 'এর' সাধনভজনের আর প্রয়োজন হয়নি।

'এ' যেমন ছিল, তেমন-ই আছে এবং তেমন-ই থাকবে। 'এ' সচ্চিদানন্দ আকাশে শুধু বিহার করে বেড়ায়। জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তির সাধনা, জীবনসমস্যা প্রভৃতি শুধু ক্ষণিকের স্বপ্ন ও খেলা মাত্র 'এর' কাছে। সত্য সত্যই সে সবের কোনও গুরুত্ব নেই 'এর' কাছে। সবই এক মজার খেলা, নিজবোধে নিজের মধ্যে

অবিরাম ধারায় ব্যক্ত হয়ে চলেছে। তারও গভীরে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই আর বলা যায় না। 'এর' মুখে তোমরা যা শুনেছ সবই নিজবক্ষে নিজবোধলীলার যথার্থ ইঙ্গিত মাত্র।

ভূমাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও মাতৃতত্ত্ব অভিন্ন

'অখণ্ড ভূমা আমি'-র মধ্যে 'এর' (তোমাদের বাবাঠাকুরের) আমি সমবোধে যেমন মিশে আছে, 'এর' আমির মধ্যেও সেই ভূমা পূর্ণের আমি স্বয়ং আপনাকে আপনি প্রকাশ করছেন আপনবোধে, আপন তত্ত্বরসে পূর্ণতার দ্বারা। সেই জন্য 'এর' আমি হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-মা-গুরু। 'এর' আমিই যে সেই পরমতত্ত্ব ও পরমসত্য তা 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) বোধের ও ভাবের প্রকাশে নিরন্তর অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। তার লক্ষণাদি সমাধি, মুদ্রা, ভাষণ, গান ও অপরের সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে কত ভাবেই না সবার কাছে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে! এ সব দেখে এবং শুনে যারা এর সত্য মর্ম বুঝেছেন যথার্থ ভাবে তারা ভাগ্যবান; আর যারা আংশিক বুঝেছে তারাও কৃপা পেয়েছে। যারা বোঝেনি তাদের মধ্যেও তার বীজ সঞ্চারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের মধ্যেও তার প্রকাশবিকাশ হবার সম্ভাবনা আছে এবং হবেও।

ভূমাতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও মাতৃতত্ত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তির সত্যতার অন্যথা বা ব্যতিক্রম হয় না। তবে অন্তর্বৃত্তির গুণের, মানের, যোগ্যতার অপেক্ষায় তা থাকে। স্বভাবশক্তির শোধন না-হলে তার প্রকাশ ও বিকাশ হয় না। যারা স্বভাবের শুদ্ধি লাভে সমর্থ হয়েছে অথবা স্বভাবশুদ্ধির সংস্কার নিয়েই জন্মেছে তারা বুঝেছে 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ও মর্ম; বুঝেছে যে 'এর' সব কিছুই পরম দিব্য এবং কালাতীত সত্য যা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র, মুক্ত ও মৌলিকতাপূর্ণ। তা-ই 'এর' সত্য পরিচয়। সর্বকালীন সত্যের সঙ্গে 'এর' নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। 'এর' আমিকে বাদ দিয়ে কোনও আমি পূর্ণ সত্য নয়। এই হল সর্বশাস্ত্রের ও সর্ব অনুভূতির সার কথা। তা মনে রেখ সবাই। 'আমি'-ই 'আমি'-র গুরু এবং 'আমি'-ই 'আমি'-র সত্তা ও আত্মা। এই আত্মা অখণ্ড ভূমা, সুতরাং সবার-ই আত্মা। আমিতত্ত্বের গানে যেমন বলা আছে—'অখণ্ড আমি সাগরে অসংখ্য আমি ওঠে ভাসে ডোবে' সেইরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে সচ্চিদানন্দের অনন্ত বৃত্তি ওঠে, ভাসে, ডোবে। সচ্চিদানন্দসাগরে সবই যেমন সচ্চিদানন্দ সেইরূপ আমিসাগরে সবই আমির পরিচয়। গুরুসাগরে সবই গুরুর পরিচয়।

অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-গুরু-মা-আমি সবই এক অর্থবোধক। সেই জন্য সমত্বের বিজ্ঞান বা এক-এর বিজ্ঞান দ্বারাই তা নিত্যসিদ্ধ হয়। এক-এর বিজ্ঞান আমিবোধে আমি আমির জন্য করে পরিবেশন, আমিই করে তা গ্রহণ, ধারণ, অনুভব ও আস্বাদন। গুরুর আমি গুরুভাব ও গুরুবোধের এই ফলশ্রুতি প্রকাশ করছেন।

স্বানুভূতির ভাষায় ধ্যানসিদ্ধি প্রসঙ্গে

শ্রুত বিষয় মনে গাঁথা হলে এবং তদনুরূপ ব্যবহার হলে ধ্যানসিদ্ধি আপনিই হয়। ধ্যানে হয় বোধের সঙ্গে বোধের মিলন। অন্য বিষয় ছেড়ে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি মন দেওয়াই হল আসল ত্যাগ। গুরুবাক্ যদি মনে থাকে মরণকালে অজপা জপ না-হলেও ক্ষতি নেই। যথার্থ জ্ঞানী যদি রাম নাম না-করে, মরণকালে তার জ্ঞান নষ্ট হয় না। জ্ঞানীর জ্ঞান কখনও আবৃত হয় না। ফলে দেহনাশের পরে অজ্ঞান তাঁকে নাশ করতে পারে না।

গুরুবাণীর মধ্যে মন যদি গেঁথে যায় তবে আর পৃথক সাধনার প্রয়োজন হয় না। গুরু নামই তার লীলাস্মৃতি জাগিয়ে দেয়। লীলার স্মরণ হল সর্বোত্তম সাধনা। গুরুর ঘটনাবলী বা দৃশ্যাবলী ও নানাবিধ উপকরণ প্রভৃতি

বাদ দিলে নামের অভিব্যক্তি হতে পারে না, যেমন বীজ হলেই গাছ হয় না। তার জন্য চাই সার, জমি, জল প্রভৃতি। সৎসঙ্গে যা শোনা হয় বা দেখা হয় তা-ই তাঁর লীলা; অথবা স্ববোধের ঘরে বাস করাই হল রাসলীলা[১]।

বাইরে থেকে সংগ্রহ করে যা দেখা হয় তা ইন্দ্রিয়ের দর্শন; আর অন্তরে মন ডুবে গেলে অতীন্দ্রিয়ের দর্শন আরম্ভ হয়। বিশুদ্ধ বোধের সঙ্গে নিজবোধের মিলনই হল রসাস্বাদন বা ব্রহ্মানুভূতি[২]। অতীন্দ্রিয়বোধের অনুভূতি দিয়ে বোধের তনু[৩] হয়।

সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য গুরুর কথার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও উপায় নেই। [২।১২।৭৫]

গুরু ভাববোধে গুরুভজন সিদ্ধ হয় অন্যথায় নয়

গুরুভজনে যদি গুরুভাবের বা গুরুবোধের অভাব থাকে তবে আর গুরুভজন হয় না। ভাবশূন্য সাধনা হল অভাবের সাধনা। ভাব হল বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে দেহ পর্যন্ত একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা। ইন্দ্রিয়-মনের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা তা-ই হল অধ্যাত্মসাধনা। বিশেষ কোনও অংশ ধরে যে চেষ্টা তা প্রবৃত্তি বা কর্ম। তা যজ্ঞ নয়।

লৌকিক দীক্ষা ও আন্তর দীক্ষার প্রসঙ্গ

দীক্ষা সকলের হয়েই আছে। কেননা আভ্যন্তরীণ দীক্ষা পরমাত্মা স্বয়ং দিয়ে রেখেছেন। লৌকিক দীক্ষারও প্রয়োজন আছে। তবে বিশেষ অধিকারী পুরুষের লৌকিক দীক্ষা ছাড়াও আন্তরদীক্ষা হতে পারে। আন্তরদীক্ষার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিগূঢ়। 'গুরু' শব্দ উচ্চারণেই গুরুভাব জাগে। 'গুরু' নামই একটি মন্ত্র। 'ওঁ ব্রহ্ম' উচ্চারণ করলে ব্রহ্মভাব প্রকাশ পায়। 'সোঽহং' বা 'আমি' সব শব্দই মন্ত্র। 'আমি' শব্দ মন্ত্র নয় বলা যায় না। 'আমি' উচ্চারণে কারও যদি চৈতন্যের সঙ্গে মিলন হয় তা কেন মন্ত্র হবে না? যার অর্থবোধ অখণ্ড বোধে হয় তা বিনা দ্বিধায় মন্ত্র বলে মেনে নেওয়া যায়; কারণ তা অখণ্ড বোধাকারা বৃত্তি নিয়ে আসে। সেই জন্য যে কোনও শব্দই মন্ত্র।

অভ্যাসই সর্বসাধনসিদ্ধির মৌলিক বিজ্ঞান

অনেকের 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণে নিষেধ থাকে। যেমন—বাল্মীকিকে 'ওঁ' মন্ত্র দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণে যখন Ring তৈরি হয় তখন আপনা থেকেই অভ্যাসের গুণে অন্তর থেকে 'ওঁ' উদ্গীত হয়ে পড়ে। তা অনুভূতির বিষয়, তর্কের বিষয় নয়। অভ্যাসের গুণেই অধিকার জন্মে, অধিকার বাড়লেই যোগ্যতা বাড়ে, যোগ্যতা বাড়লেই কৃপা ও অনুগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায়। অনুগ্রহ লাভ হলেই সিদ্ধিলাভের অন্তরায় আর থাকে না। তখন সিদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অনুভবসিদ্ধদের কাছে সিদ্ধির বিজ্ঞান এই ভাবেই ফলবতী হয়। তা তর্ক ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, কারণ সর্বসংশয় অর্থাৎ দ্বৈত ভাবের বীজ নাশ হলেই সিদ্ধি ও মুক্তি অবাধিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

'মরা' শব্দ, যাকে লোকে হেয় জ্ঞান করে, ব্রহ্মা ও নারদ সেই শব্দকেই মন্ত্র হিসাবে বাল্মীকিকে দিলেন। যে কোনও শব্দ যদি অখণ্ড ভাব নিয়ে ধরা যায় তা অখণ্ডতেই পৌঁছে দেয়। নাদব্রহ্মের বিশেষত্ব হল শব্দের শক্তি শব্দের সত্তায় মিলিয়ে দেয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

মনই সাধক, বোধস্বরূপ গুরুই সিদ্ধি

মনই গুরুকে বরণ করে। মন বোধের অংশমাত্র প্রকাশ করে। তখন গুরুবরণ করার প্রয়োজন হয়। গুরু হলেন নিত্যপূর্ণ সত্য একভাব বা সমভাব। একলব্যকে দ্রোণাচার্য দীক্ষা দেন নি। গুরুভাবকে অবলম্বন করে নিয়ে সে সিদ্ধিলাভ করেছিল। গুরু বলতে গেলে তত্ত্বত কেবল অখণ্ড জ্ঞানমূর্তিকেই ইঙ্গিত করা হয়। গুরুগীতায় আছে—

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্
স্থাবরং জঙ্গমশ্চৈব প্রণমামি জগৎময়ম্।

বন্দেহহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদ্গুরুম্
নিত্যপূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।

চৈতন্যং সর্বগং সর্বং সর্বভূত গুহাস্থিতম্
সর্ব ভাবাতীতং যৎ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্
বিন্দুনাদকলাতীততস্মৈ শ্রীগুববে নমঃ।

নাদ-বিন্দু-কলা অর্থে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ-কেন্দ্র, প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে নির্দেশ করা হয়—তা উত্তমরূপে বুঝতে হবে।

নিত্যং ব্রহ্ম নিরাকারং নির্গুণং বোধয়েত পরম
সর্বব্রহ্ম নিরাভাসং দীপোঽদীপান্তরং যথা।

পরাৎপরং ধ্যেয়ং নিত্যং আনন্দকারকম্
হৃদয়াকাশ মধ্যস্থং শুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভম্।

স্ফটিক প্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা
তদাচিদাকারং সোঽহমত্যুতঃ।

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপম্
নিজবোধযুক্তং যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যম্।

শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং স্মরাম্যহম্
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং ভজাম্যহম্
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং নমাম্যহম্
শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুং বদাম্যহম্
ওঁ গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু জয়।

গুরুতত্ত্ব ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্ব সবই অদ্বয়বোধে সিদ্ধ

এই গুরুমন্ত্রের তাৎপর্য ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। পরমতত্ত্বের অভ্যাসের ও অনুশীলনের সুবিধার জন্য শুধু দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অধিকারী ভেদে অনুমিত হয়, কিন্তু তত্ত্বত কোনও ভেদ বা পার্থক্য সিদ্ধ নয়। এ সবই অদ্বয়তত্ত্বের সাধনবিজ্ঞান। এর আদি-মধ্য-অন্তে অদ্বৈতের ভাববোধ পরমতা আপনতা স্বয়ংতার মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। এই হল স্বানুভবসিদ্ধ সাধনবিজ্ঞান।

নিত্যশুদ্ধ বিশুদ্ধ বোধ ছাড়া সত্যের পরিচয় কখনওই সম্ভব নয়। সেখানে আভাস নেই। বুদ্ধি হল আভাসচৈতন্য। গুরু হলেন বোধস্বরূপ। এই গুরুকেই বন্দনা করতে বলা হয়েছে। জড়শক্তি বা জড়কে ধরে এই গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ বোধকে বিশুদ্ধ ভাব ও নাম দিয়ে ধরতে হয়। ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর হল বিশুদ্ধ বোধের বাচক বা নির্দেশক। [৭।১২।৭৫]

শাশ্বত নিত্য অদ্বয় উপাদান হল আপন পরিচয়

একটিমাত্র নিত্য উপাদান আছে। তার কথা ভুলে গেলে কোনও মতপথ দিয়েই আর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। উপাদানের স্মৃতি জাগলে দেখা যায় যে নিজের পূর্ণতা নিজের কাছেই আছে। বাইরে পূর্ণতা খুঁজলে তা কোনও দিনই পাওয়া যায় না। যেমন নিজের কণ্ঠে হার থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্তিবশত সেই হার সারা বাড়ি খুঁজে বেড়ালেও কোনও দিন পাওয়া যায় না।

আত্মগুরুই অহংকারের সাক্ষী

প্রত্যেকের অন্তরে অহংকারের মূলে যিনি 'আমি'-রূপে আছেন তিনিই হলেন আত্মা। যিনি আত্মা, তিনিই গুরু। তা ভুলে গেলে অহংকারের দ্বারা ভেদজ্ঞানে চলতে হয়। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার কৃপায় গুরুর মহিমা শুনে যোগ্য অধিকারীর ভেদজ্ঞানের অবসান হয়। তখন আপনার মধ্যেই আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

গুরুবাক্-ই হল আত্মগুরুর পরিচয়

কাজেই গুরুবাকের মধ্যেই মেলে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। গুরুবাক্-ই একমাত্র সত্য। তা ছাড়া সাধনা করে সত্যকে চয়ন করা কঠিন। মহাবাক্য বিচার করে গ্রহণ করলে শ্রবণ মাত্রই সত্য অনুভূত হয়। নতুবা কোনও দিনই সত্য অনুভূত হবে না। শ্রবণ বিনা সাধনা করলে সাধককে আবার গুরুর কাছে এসেই সমর্থন নিতে হয়। গুরু অধিকারী জিজ্ঞাসুকে ধরিয়ে দেন প্রত্যক্ষ ভাবে সৎ-এর স্বরূপ এবং অসৎ-এর স্বরূপ।

চিদানন্দ আত্মা হল নিত্যাদ্বৈতের পরিচয়

গুরু ধরিয়ে দেন প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ হল আনন্দস্বরূপ। সেখানে কোনও বস্তুর মিশ্রণ নেই। মিশ্রণ বা বৈচিত্র্যকে যা-দিয়ে জানা যায় তাকে জানার চেষ্টা করতে হয়। তাহলে 'এক-এর মধ্যে এক'-কে অথবা 'One without a second'-কে জানা যায় বা 'নিত্যাদ্বৈত'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। [১৪।১২।৭৫]

সদ্‌গুরুর বাক্যে ব্যবহার-অনুরূপ ফললাভ

সদ্‌গুরুবাক্য গ্রহণ করার উপরে তার ফল নির্ভর করে। অংশমাত্র গ্রহণ করলে বা সিকিমাত্র গ্রহণ করলে এক এক রকম ফল পাওয়া যায় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রহণ করলে পূর্ণাঙ্গ ফল পাওয়া যায়। [২১।১২।৭৫]

স্বানুভূতির ভাষায় স্বভাবের অভিনব তাৎপর্য

দেহবোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ স্বপ্নের রাজ্যেই থাকতে হয়। এক সময় অতীতের এক বিরাট অধ্যায় দেখা হয়েছে 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন)। যত দুঃখ-বেদনার মূর্তি ছিল তা-ই দেখা হয়েছে। মানুষ সাধারণত সুখের রূপই দেখতে চায়। সে সকল দুঃখবেদনার কথা বলতে আরম্ভ করলে গোলবারান্দা (যেখানে বসে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সৎপ্রসঙ্গ করতেন) ফাঁকা হয়ে যাবে। খারাপটা কেউ নিতে চায় না।

'এর' (নিজের দিকে দেখালেন) বেদনা দেখে দেবদেবীরাও কাছে আসতে পারেনি। 'একে' ছেড়ে চলে গেছে। সকলে 'একে' betray করেছে, কিন্তু 'এ' কাউকে betray করেনি। 'এর' কাছে যা আসে ভাল-মন্দ, রোগ-শোক কাউকে 'এ' জোর করে তাড়ায় না। 'এ' কাউকে জোড়হাত করে তোয়াজও করে না। 'এর' আসক্তিভাব বা বিরক্তিভাব কোনওটাই নেই। 'এ' ভগবানের কাছ থেকে সিদ্ধি, মুক্তি বা শান্তি কিছুই চায় না। 'এ' ভগবানও হতে চায় না, শয়তানও হতে চায় না। ভগবান এসে যখন কিছু দিতে চেয়েছেন তখন বলা হয়েছে তাঁকে—'এর' নিজস্ব যখন কিছু নেই তখন 'এ' কিছু নিয়ে কী করবে? রাখবে কোথায়?

শয়তান এলে বলা হয়েছে—দেখ তুমি 'এর' শত্রুও নও, মিত্রও নও। 'এ'-ও তোমার শত্রু বা মিত্র নয়। তোমাকে 'এর' দেবার কিছু নেই, তোমার কাছ থেকে 'এর' নেবারও কিছু নেই। তবে তোমার যদি 'এর' কাছ থেকে নেবার কিছু থাকে নিতে পার। 'এর' ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভোগ-ত্যাগ, বন্ধন-মুক্তি, সাধন-সিদ্ধি, মনুষ্যত্ব-ঈশ্বরত্ব কোনওটারই প্রয়োজন নেই।

'এ' থাকে মহাশূন্যে। কোনও দেবদেবী 'এর' সন্ধান পায় না। Super Divine plane-এ কাউকে পৌঁছে দেওয়া যায় না বা সেখানে যাবার passport-ও দেওয়া যায় না এবং টিকিট কেটেও দেওয়া যায় না। Individuality যখন প্রত্যেকেরই আছে এবং Divine plane পর্যন্ত তা থাকে, তখন নিজেকেই সেখানে যাবার চেষ্টা করতে হয়। এ বিষয়ে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

'এ' (নিজেকে দেখালেন) কোনও দিন সাধন করতে পারেনি। কারণ 'এ' কখনও কঠোর নিয়মকানুন মেনে শরীরকে কষ্ট দিতে পারেনি। আবার অতিরিক্ত তোয়াজ করে শরীরকে খাতিরও করতে পারেনি। সাধন পথের কোনও পদ্ধতি বা অনুশাসন মেনে চলা 'এর' পক্ষে কোনও দিনই সম্ভবপর হয়নি। সেই জন্য 'এ'-ও তোমাদের কোনও নির্দেশ দিতে পারে না। 'এ' কারও গুরুও নয়, কারও শিষ্যও নয়। অনেক গুরু-শিষ্য আছে এবং Divine plane পর্যন্ত গুরু-শিষ্য থাকে। তবে Super Divine plane-এ এ সব কিছু নেই। সেখানে সব থেকেও কিছু নেই। এই অবস্থার কথা কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

মনকে তোয়াজ করে ক্ষণিকের সুখ আরাম ভোগ করা যায়। আবার অত্যধিক অনুশাসন করে মনকে ফিরিয়ে আনতে হয়। তখনই spiritual fold আরম্ভ হয়। সেই পথ এত সূক্ষ্ম যে দুই ভাব পাশাপাশি নিয়ে সেখানে চলা যায় না।

কঠোর অনুশাসন হল নিজের ভিতরে কোথায় ত্রুটি লুকিয়ে আছে তা চব্বিশঘণ্টার প্রতিমুহূর্তে অনুসন্ধান করা। বাইরে দোষত্রুটি খুঁজতে গেলে নিজেকে কোনও দিনই শোধন করা যায় না। নিজের জীবনে অনন্ত অতীত জীবনের কোনও ত্রুটি লুকিয়ে আছে কী না তা অনুসন্ধান করে দেখতে হয়। দুঃখ ভোগ করার সময় যেমন নিজেকেই ভোগ করতে হয় অপরে করে না তেমন দুঃখ সৃষ্টি করার সময়েও নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ থাকতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের সুখ ও দুঃখ সৃষ্টি করে।

'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) সাধনভজনের দরকার নেই। তা যদি কেউ অধঃপতনের লক্ষণ বলে মনে করে তবে তাকে বলা চলে—'এর' উত্থানও নেই, পতনও নেই। 'এর' সাধু-অসাধু হওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই। অসাধু হলে আবার সাধনা করে সাধু হতে হবে।

'এর' ইতিহাস শুনছ, 'এর' ভিতরে কী হাঁস খেলে শোন, হংস তো বটেই। ঈশ্বরের কথা অনেক শুনেছ। যা-কিছু কর তার ফল দু'রকম ভাবে আসতে পারে। কিছু পাবার আশা করে কর্ম করলে এক রকম ফল আসে এবং পাবার আশা না-রেখে কর্ম করলে আরেক রকম ফল আসে।

পাবার আশা নিয়ে যে কর্ম তার ফল অনেক উঁচুতে তুলে দিয়ে আবার ফেলে দিতে পারে। বিনা আশায় যে কর্ম তার ফল কোথাও তুলবেও না এবং ফেলবেও না। প্রথমোক্ত কর্মে ভয় থাকে। দ্বিতীয় কর্মে নির্ভয়ে থাকা যায়। বলতে পার যে—বিনা আশায় কর্ম বা সাধনা হওয়া কী সম্ভব? অথবা কর্মফলে অধিকার না-রেখে গোলামের মতো করা যায় কী?

উত্তরে বলা চলে যে, কর্মফলের আশা রেখে যে কর্ম করা হয় সেই কর্মই গোলামের মতো বেঁধে রাখে। আশা না-থাকলে কী দিয়ে বাঁধবে? কর্ম করলেই একটা ফল আসে, তা ভালই হোক বা মন্দই হোক। ভাল ফলই সবাই ভোগ করতে চায়। খারাপটা কেউ নিতে চায় না। ফলে খারাপ ফল জমতে থাকে। এই ভাবে জমতে জমতে একদিন তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করতে হয়। কাজেই দেখা যায় যে মানুষ নিজেই ভাল-মন্দ ফল সৃষ্টি করে, তা জমায় এবং তা ভোগ করে। তাই স্রষ্টা ব্রহ্মাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে তিনি বসে আছেন 'এরই' মনের মধ্যে। বিষ্ণুকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল তিনি লুকিয়ে আছেন 'এর' প্রাণের মধ্যে। আর রুদ্রকে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম তিনি আমার-ই প্রাণের মধ্যে বসে হাসছেন!

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের খেলা 'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) বসে বসে দেখে। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—তোমাদের সঙ্গে 'এর' পিরীতি নেই। তোমরা তোমাদের রাজত্ব নিয়ে থাক। তোমাদের রাজত্ব বিরাট। 'এ' তোমাদের রাজত্বের এক অংশও চায় না। 'এ' সৃষ্টি করতে চায় না। সৃষ্টি করলেই আবার তাদের পালন করতে হবে এবং তা ধ্বংসও করতে হবে। 'এ', 'পি, পু, ফি, শু'-দের দলেই থাকতে রাজি আছে।

জীবনের সর্বপর্যায়ে চিদানন্দময়ী মা-ই খেলছেন

'এর' মধ্যে সবাই খেলে যাচ্ছে। হৃদয় শ্মশান করে নিয়ে প্রাণের আনন্দে চিদানন্দময়ী মাতা খেলে চলেছেন।

যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাকে কখনও ছোট জ্ঞান করতে নেই বা অবহেলা করতে নেই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জীবন, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে সরষের দানার মতো দেখা যায়, তারাও ক্ষুদ্র নয়। ঐ এক একটা ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যেও লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। নিজেকে ঐ কতটুকু ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সংকুচিত করে রেখেছে! কে তা নাশ করবে? একটা নাশ করলে সঙ্গে সঙ্গে এক লক্ষ প্রাণের সৃষ্টি হয়। তাই লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেও ব্রহ্মা কুল পাচ্ছেন না। বিষ্ণু পালন করে দিশা পাচ্ছেন না। আর মহেশ্বর ধ্বংস করে করে শেষ করতে পারছেন না।

তাই তোমাদের বন্ধন-মুক্তির কথা শুনে 'এর' হাসি পায়। শাস্ত্রে লেখা আছে—মুক্ত হতে হবে, তাই সকলে মুক্তির পিছনে ছোটে। অথচ জানে না শাস্ত্রে অনুভূতির কয় ফোঁটা লেখা থাকে?

কিছু শব্দের নিগূঢ়ার্থ

'কিছু জানি না' এই ভাবটির মতো পরম জানা আর নেই। এই ভাবটি নিয়ে যাঁরা চলেন জগতে তাঁদের কোনও কিছু দিয়েই বাঁধা যায় না। সাধারণত মানুষ সাধনা করে কিছু পাবার আশায়। 'এ' কিন্তু 'কিছু' পেতে চায় না। কারণ কিছু[১] দিয়ে 'কিছু'[২] লাভ হয় না। কিছু পেলে তা টিকের আগুনের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

১। কিছু—অংশমাত্র। ২। কিছু—পূর্ণতা।

হতাশ যেন কেউ না হয়; কারণ আশাকে হত করা যায় না। তাহলে ব্রহ্মাই মরে যাবেন। আশা হল ব্রহ্মার শক্তি। আশা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন। আবার ধ্বংস করেন সৃষ্টির আশা দিয়ে। আপন অন্তরে বসে বসে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের খেলা দেখতে হয়। এই তিন স্তরের ঊর্ধ্বে আছে তুরীয় স্তর, যেখান থেকে ঐ তিন স্তরকে দেখা শোনা যায়।

মহাশূন্যের তাৎপর্য

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে কোন জায়গায় খুঁজবে? অর্থাৎ সব জায়গাতেই তাঁরা আছেন। 'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) নিজেকে মহাশূন্য বলে পরিচয় দেয় তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মহাশূন্য বলার কারণ 'এ' একাই আছে, দ্বিতীয় কেউ থাকলে শূন্য আর থাকে না।

অদ্বয় আত্মবোধে অনাত্মবোধের কার্য অসিদ্ধ

দেবতারাও 'এর' সন্ধান পায় না—এর অর্থ, যেখানে সে একা তাকে আবার কে দেবে? দেওয়ার প্রশ্ন না-থাকলে দেবতাও নেই।

'এর' সাধনা নেই। তার তাৎপর্য হল যে সে নিজের মধ্যে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। সে কার জন্য কী সাধনা করবে? প্রাপ্তব্য কিছু থাকলে তবেই সাধনা করে। 'এর' প্রাপ্তব্য কিছু নেই। যার বিকার নেই, পরিবর্তন নেই তার আবার শোধনের কী প্রয়োজন? বিকৃত হলে তবেই শোধনের প্রশ্ন ওঠে।

বেদনার দর্শন নিত্যাদ্বৈতের রহস্য

'এর' গুরুও নেই, শিষ্যও নেই। কারণ 'এর' চাইতে বড় কেউ নেই এবং 'এর' চেয়ে ক্ষুদ্রও কেউ নেই। 'এ' অণু হতে অণুতম। এই অবস্থাগুলি হল 'নিত্যাদ্বৈত'-এর কয়েকটি লক্ষণ। 'নিত্যাদ্বৈত' পোশাকী দর্শন[১] নয়, বেদনার দর্শন[২]। বেদের সার হল এই দর্শন। বেদনা না-হলে বেদ হয় না, সার হওয়া তো দূরের কথা। এখানে 'না' হল জ্ঞানের একমাত্র বস্তু। 'না'-কে বেদ অর্থাৎ জান। [২৩।১২।৭৫]

ভাবনার তাৎপর্য

ইষ্টনামে বা গুরুনামে কোনও ভেদ নেই। সব নাম সেই নিত্য অদ্বয় অখণ্ড এক নামেরই প্রতিধ্বনি, সব রূপ নিত্য অদ্বয় অখণ্ড এক রূপের প্রতিফলন, সব ভাব নিত্য অদ্বয় অব্যয় অখণ্ড এক ভাবেরই প্রতিভাস। এই ভাবনাই হল যথার্থ ভাবনা, আর সব ভাবনা হল ভাব-—না; অর্থাৎ যথার্থ ভাবনার যোগ্য নয়।

যে ভাবনা মনকে সমানে নিয়ে যায়, একবোধের, সমবোধের বা অখণ্ড বোধের পরিচয় দেয় তা-ই হল গুরুভাবনা। সমান হল গুরুর চরণ। চরণ ছাড়া সমান থাকে না। সেই জন্য দু'টি চরণ দিয়ে সমতাকে নির্দেশ করা হয়। দুই যেখানে সমান তা-ই ইষ্টের চরণ এবং সেখানেই একের অবস্থান। সমানের উপাসনা ছাড়া জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত হওয়া যায় না। তাঁদের পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক।

১। পোশাকীদর্শন—Philosophy, জ্ঞানের বস্তু অথবা বস্তুব জ্ঞান।

২। বেদনার দর্শন—Realization, জ্ঞানের জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞান অথবা স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি। বেদ+না; 'না'কে জান, অজ্ঞানকে জান, এই নির্দেশই 'বেদনা'র মধ্যে নিহিত আছে।

অদ্বৈত ভাববোধে সংসারজীবনে চলার বিজ্ঞান

সংসারের ক্ষণিক আরাম আনন্দ উপভোগের দিকে লক্ষ্য না-রেখে বিকারবিহীন শাশ্বত চরমতম দিব্যানন্দ লাভ করার জন্য সাধকের দৃঢ় সংকল্প রেখে চলা উচিত। চিত্তের এই দৃঢ় ও অটুট সংকল্প থাকলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধনায় সফলতা লাভ করা যায়। তখন সে যেখানেই থাক অদ্বৈতের বাণী বহন করে নিয়ে যায়। তখন তাকে ডেকে আর শিষ্য করতে হয় না। নিজে তৈরি হলে শিষ্য আপনা থেকেই আসে; মৌচাকে মধু জমলে যেমন মৌমাছিদের আর ডেকে আনতে হয় না, আপনা থেকেই এসে যায়। অন্তরে-বাইরে সব মধু হলে জীবন স্বাভাবিক ভাবেই মধুময় হয়ে যায়।

সদ্‌গুরুর মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে না

গুরু যদি মনে করে—আমি শিষ্যকে কৃপা করছি, তাহলে তা অজ্ঞানতার লক্ষণ। ব্রহ্মের মধ্যে বিরাট ও ক্ষুদ্র ভাবনা নেই। 'আমি আমার মধ্যে আছি' তা অপেক্ষা 'আমি জগতের মধ্যে আছি' তা আরও ব্যাপক। বিশ্বের সবাইকে নিয়ে হয় ব্যষ্টির পূর্ণতা। একক ভাবে কেউ পূর্ণ হতে পারে না। [২৮।১২।৭৫]

চতুর্থ অধ্যায়

সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত বাণীর হুবহু আচরণ ও ফল

সব মেশিনের নাট বল্টু এক রকম হলেও যে কোনও নাট বল্টু যে কোনও মেশিনে লাগানো যায় না। কোনটার সঙ্গে কোনটা লাগবে তা নম্বর দেখে লাগাতে হয়। সেইরূপ সত্য যুগে যুগে এক হলেও যুগোপযোগী সত্যের ব্যবহার না-হলে সংশয়ের বা প্রশ্নের অবসান হয় না। যখন সব প্রশ্নের আদি-মধ্য-অন্তে এবং সব কার্য, কারণ ও তার ফলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় তখনই হয় সৎ বস্তুর পরিচয় লাভ এবং তখনই সব প্রশ্নের সমাধান হয়।

সৎ বস্তু অর্থাৎ সত্য লাভের জন্য কারও কাছে ধার করতে হয় না বা হাত পাততে হয় না। নিজের ভিতরের নাট বল্টুগুলি সাজিয়ে নিলে সহজেই হৃদয়দুয়ার খুলে যায়। সেই জন্য গুরুপ্রদত্ত মহাবাক্যরূপী নাট বল্টুগুলি মননের দ্বারা ভিতরে সাজিয়ে নিতে হয়। কত নম্বরের নাট বল্টু নিজের হৃদয়দুয়ারের তালায় লাগাতে হবে নিজেকেই তা খুঁজে নিতে হয়। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম ও বাণী ছাড়া আর কিছু দিয়েই তা খোলা যায় না। এই জন্য তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী হুবহু স্মৃতিতে ধরে রাখতে হয়। সৎসঙ্গে শ্রবণের ফল না-পাওয়ার একমাত্র কারণ হল তাঁদের কথার সঙ্গে অন্য কথার সংমিশ্রণ হয়। এর জন্য সদ্‌গুরু, মহাত্মাগণ দায়ী হন না। নিজেকেই দায়ী করতে হয়।

নিজে আচরণ না-করে উপদেশ দিলে তা ফলপ্রদ হয় না

এক মহাত্মা 'একে' (নিজেকে দেখিয়ে) একবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই রকম প্রক্রিয়া করলে এই রকম ফল পাওয়া যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—আপনি সেগুলি করেছেন কী? তিনি বললেন—না, আমি আরেক জন মহাত্মার কাছে শুনেছি। তাঁকে তখন বলা হল—আপনার কথা মানবো কেন? আপনি নিজে যদি করতেন তাহলে মানতাম।

তিনি অবাক হয়ে বললেন—বড় বড় সাধু মহাত্মারা বলে গেছেন আর আপনি মানবেন না? সব কথাই আচরণ করে বলা যায় না।

তখন বলা হল—আচরণ না-করে বললে সেই কথা কোনও কাজে লাগে না। যে মহাত্মা যেটুকু আচরণ করেন তিনি সেটুকু বলবেন। ধর্মের কথাগুলো এজন্যই অকেজো হয়ে যায়। যেমন রান্নার বই মুখস্থ করে যে রান্না করে তার রান্না অখাদ্য হয়। ডাক্তারিবিদ্যা না-জেনেও যেমন লোকে অন্যের উপরে ডাক্তারি ফলায়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেই রকম আচরণ না-করে লোকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দেয়।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) বিশেষ নির্দেশ কাউকে দিতে পারে না। কারণ 'অখণ্ড বোধে মানা' ছাড়া অর্থাৎ 'মেনে, মানিয়ে চলা'[১] ছাড়া 'এ' কোনও সাধন বা আচরণ অভ্যাস করেনি। 'এর' দ্বারা কোনও

১। মেনে মানিয়ে চলা—মাতৃবোধে, মহেশবোধে, মাধববোধে বা মহৎবোধে সব গ্রহণ করে অখণ্ড বোধে সচেতন ভাবে মেনে মানিয়ে চলা।

ক্রিয়াপ্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আচরণ না-করে সে বিষয়ে 'এ' কী করে উপদেশ দেবে? তবে 'অখণ্ড বোধে মানা'-র ব্যাপারে যদি কেউ কোনও পরামর্শ বা নির্দেশ চায় তবে সে বিষয়ে 'এ' বলতে পারে। জিজ্ঞাসা করতে পার 'মানা'-র কী সেই একই ফল পাওয়া যায়? তার উত্তরে শুধু এটুকুই বলা চলে যে 'মানা'-র ফলে যা হয়েছে তা তোমাদের সামনেই বসে আছে। যদি 'এর' হয়েছে স্বীকার কর তবে হয়েছে; আর স্বীকার না-করলে হয়নি।

বলতে পার 'অখণ্ড বোধে সব কিছু মানলে' কী সকলেরই হবে? তার উত্তরেও বলতে হয় যে, বিজ্ঞান যদি কিছু থাকে তাহলে একজনের হলে সকলেরই হবে। কোনও পদ্ধতি অনুসরণ করে একজনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হলে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকলেরই হতে বাধ্য। তবে সকলেরই যে একই সময় লাগবে তা নয়। অন্তরের ভাব ও জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার অনুসারে ব্যাকুলতার মানের তারতম্য হয়। ব্যাকুলতা অনুসারে সাধনার পূর্ণতা ও সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি অনুসারে অনুভূতি হয়। এ-ই হল formula বা বিধান। যেমন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একজন পথ করে গেলে তার পিছু পিছু অনেক লোকই সেই পথ ধরে যেতে পারে। এ ছাড়া জীবনব্যাপী জপধ্যান করেও ফল পাওয়া যায় না। [৪।১।৭৬]

গুরুর পরিচয়

শান্ত, সমান মন[১]-ই হল গুরু। অশান্ত, অসমান মন গুরু নয়। সমান মনের নামই অন্তর্গুরু; অর্থাৎ সমান মনই অন্তরে গুরুর কাজ করে। তা-ই হল বিবেক। সে-ই গুরুর কাজ করে।

কালশক্তি কাউকে খাতির করে না। তার উদ্দেশ্য সকলকে পরমপুরুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সে কারও কাছে ঘুষ খায় না, কারও ধার ধারে না। একেই মহাকালী শক্তি বলা হয়। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের স্মৃতি ভুলে গেলে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে এই কালীশক্তি স্বয়ং সন্তানকে তা স্মরণ করিয়ে দেন বা স্বয়ং মা নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দেন। তবে মা এও বলে দেন যে—এ-ই শেষ নয়। তা চলার পথে একটা স্টেশন মাত্র, আসল ঘরের চাবি এটি নয়। সেখানে গুরু হাতে ধরে নিয়ে যান। গুরু হলেন সচ্চিদানন্দময়ী মায়েরই একটি বিশেষ রূপ। গুরুকে মা-ই চালান অথবা গুরুরূপে মা নিজেই চলেন। উভয়ই সত্য। সত্তা স্বরূপত অর্থাৎ চরমে ও পরমে অকর্তা, সাক্ষী, পূর্ণ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। পরমব্রহ্মই সদ্গুরু। স্বস্বরূপে তিনি পূর্ণ বিশ্রামে থাকেন। সেখানে শক্তি অব্যক্ত। এ-ই হল স্বরূপের পরিচয়। [৬।১।৭৬]

সদ্গুরুর কথাই হল অপরোক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি

জ্ঞানযোগের পথ বড় কঠিন। শাস্ত্র পড়ে পরোক্ষ জ্ঞান হলেও অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যথার্থ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান ও জ্ঞানস্বরূপ এক অর্থবোধক। তা-ই ঈশ্বর।

গুরুমুখে যেমন শোনা হয়, তেমনই ব্যবহার করতে হয়। তাঁর মুখনিঃসৃত সত্য ব্যবহারকালে একটু ভুলভ্রান্তি হলে গুরুবাক্য অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হল পাঁচটা কথা শুনলে তার থেকে কমিয়ে তিনটা বলে অথবা বাড়িয়ে সাতটা বলে। তার ফলে যথার্থ সত্যের ব্যবহার হয় না। ব্যবহার ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নিজের কাছেই ধরা পড়ে। ব্যবহারবিজ্ঞান ও তার মাপকাঠি গুরুই দিয়ে দেন এবং বলে দেন 'নিজের অগ্রগতি নিজেই মেপে নাও, তার জন্য বই পড়তে হবে না।'

শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আধ্যাত্মিক পথে সাধারণ একটি অঙ্গ হলেও এ যুগের মানুষের পক্ষে ঠিক পদ্ধতিতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যা পড়ে তার অর্থবোধ হয় না বা তদনুরূপ

১। সমান মন—অচঞ্চল বা সমাহিত মন, গুরুপদে সমর্পিত মন বা সমবোধে প্রতিষ্ঠিত মন।

অনুভূতি খেলে না। শাস্ত্র মুখস্থ করে সারবস্তু অনুভব করা যায় না। সারবস্তু গুরুই দেন। গুরু যদি যথাযথ ভাবে, to the point দিয়ে দেন তবেই ধরা যায়।

গুরুপ্রদত্ত বাকের মধ্যে মনকে প্রবিষ্ট করানোই হল ধ্যানজপের উদ্দেশ্য। গুরু কেবল বাইরে থাকেন না। অন্তরেও গুরুকে ধরতে হয়। গুরু হলেন নিজেরই বৃহত্তম বোধের অংশ। অন্তরের সাক্ষিবোধরূপী গুরুকে ধরবার জন্য বাইরের অনুভবসিদ্ধ গুরুর সাহায্য নিতে হয়। গুরুর নির্দেশ যথাবৎ পালন করা হলে অন্তরের গুরুকে আবিষ্কারের কৌশল স্থূল গুরুই (ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত শিক্ষাগুরু) বলে দেন। গুরুকে ব্যক্তিরূপে ধরলে ভুল হয়। সেই জন্য গুরুই বলে দেন যে, অবলম্বন হিসাবে ব্যক্তিকে গুরুরূপে ধরলেও সকলের উদ্দেশ্য যেন থাকে বোধের দিকে। ব্যক্তিগুরু পরিপূর্ণ ভাবে ভিতরে থাকতে পারে না।

সাধারণত লোকে ব্যক্তিগুরুকে প্রাধান্য দেয়, বোধের গুরুকে প্রাধান্য দেয় না। তার ফলে বোধের পরিচয় পায় না। এর কারণ বাহ্যিক স্থান, কাল, পাত্রের আড়ম্বর এত বেশি যে সে সব ছেড়ে মানুষের মন সহজে অন্তর্মুখী হতে চায় না এবং থাকতেও চায় না। বাইরের সাজা গুরুগণও বাহ্য জগতের জাঁকজমক সুযোগসুবিধা হারাতে চান না। এই কারণে মতবাদই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক জ্ঞানের তত্ত্ব বলতে পারেন কিন্তু অনুভূতি লাভের জন্য তাঁদেরও গুরুর সন্ধান করতে হয়। যে কোনও অনুভবসিদ্ধ গুরুই ধরিয়ে দিতে পারেন যে Realization কখনই external বা exoteric নয়; ওটা esoteric (mysterious, গুপ্ত, গূঢ়)। সেখানে শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। শব্দ হল অনেক নিচু স্তরের ব্যাপার। যেখানে শব্দ লয় হয়ে যায় সেখানে পাওয়া যায় শান্তি। [১১।১।৭৬]

গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা

সদ্‌গুরুই ধরিয়ে দেন যে, আমার বলে যা ব্যবহার করা হয় তার কোনওটিই আমার নয়। সবই গুরুর বা ভগবানের কাছে পাওয়া যায়। 'আমার' শব্দটি ব্যবহার না-করে 'তোমার' শব্দটি ব্যবহার করলে জীবনে উজান গতি বা উল্টো গতি আসে। আধ্যাত্মিক পথের গতি হল বাইরের থেকে কেন্দ্রের দিকে। বিকারের বিপরীতে হয় নির্বিকার। বহুর বিপরীতে হয় এক, মৃত্যুর বিপরীতে হয় অমৃত।

যে কোনও একটি পথ বা সূত্র ধরে চলার নাম পদ্ধতি। ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলে পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আগে একজন পথ তৈরি করে গেলে সেই পথ ধরে আরও অনেকে যেতে পারে। সেইরূপ সংসার-অরণ্যে কেবল সদ্‌গুরুই পথ দেখাতে পারেন, আর কেউ পারে না। গুরু হলেন তিনি-ই, যিনি আগে গিয়ে পথ করে রাখেন। তাঁর পিছনে পিছনে যারা যায় তারা হল শিষ্য। বোধের পিছনে পিছনে মন চললে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় এবং মনকে বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

গুরুমহাত্মাগণ গল্প, উপদেশ ও উপমার মাধ্যমে মনকে অন্তর্বোধের দিকে ঘুরিয়ে দেন। অভ্যাসবশত মন বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বারবার শান্তির ঘরের বা আপনঘরের সন্ধান পেলেও বারবার বহির্জগতেই তাকে ফিরে আসতে হয়।

কোনও এক পরিব্রাজক সাধক দীর্ঘদিন তীর্থ, মঠ, মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে তিনি বিশ্রামের জন্য একটু বসে পড়েন। ভগবানকে উদ্দেশ করে সেই সাধক বললেন—হে ভগবান! তুমি তো কল্পতরু, ইচ্ছা করলে সবই করতে পার। আমার এই ক্ষুধার সময় খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পার?

যেমনি ভাবা তেমনি সম্মুখে খাদ্য এসে গেল। একটা অভাবপূরণ হলেই আরেকটি অভাব জাগে। তারপর তিনি বললেন—আমার পথযাত্রার শ্রান্তিক্লান্তি দূর করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ, মন জুড়িয়ে গেল। তারপর

আবার বললেন—আমার এই পায়ের ব্যথাটা সারিয়ে দাও। অমনি এক সুন্দরী নারী এসে তার পা টিপতে লাগল। এ সব অদ্ভুত ঘটনা দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন—এগুলি কী সত্য, না কোনও ডাইনীর ভেল্কিবাজি? ভাবলেন, এ যদি রাক্ষসী হয়ে আমাকে খেয়ে ফেলে! ভাবামাত্র সেই নারী রাক্ষসী মূর্তি ধারণ করে সাধককে খেয়ে ফেলল।

এই গল্পটি শুনে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—সাধকের এ রকম দুর্গতি হল কেন? নিজের সিদ্ধিই তার নিজের নাশের কারণ হল। সাধনপথে ভুল করে ফেলে বলেই ভয় আসে। সকলেই জানে যে সকলকে মরতে হবে, তবুও মৃত্যুভয় যায় না। ভয় ও সংশয় দূর হয় তখনই যখন গুরুর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর বা আশ্রয় করে। তা ছাড়া নিজের চেষ্টায় ভয় দূর হয় না। দড়িকে ভ্রমবশত সাপ বলে ভয় পায় এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। দড়ির সত্যজ্ঞানের অভাবেই এ রকম ভ্রান্তি বা ভান হয়। সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মকেই ভ্রমবশত জগৎরূপে মনে হয়।

এক জ্ঞানী সাধক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—অপরকে কত জ্ঞান দিচ্ছি সব মায়া মিথ্যা বলে, কিন্তু নিজেই একদিন দড়িকে সাপ মনে করে ভয় পেয়ে গেলাম। এমন কী ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পায়ের একটা আঙ্গুলও হারালাম। এখন দেখছি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা মুখে বললেও আসলে ব্রহ্মজ্ঞান তো হয়নি।

তাঁর কথা শুনে বলা হল—তার কারণ গুরুকে অবলম্বন করে তাঁর উপরে নির্ভর কবে তো আপনি কিছু করেননি।

জ্ঞানী ভদ্রলোক—গুরুকরণের কোনও প্রয়োজন আছে কী?

বলা হল—বড় বড় মহাত্মারা বা অবতার পুরুষগণও গুরুকে অবলম্বন করেন।

ভদ্রলোক—বৃদ্ধ বয়সে কী দীক্ষা নিতে হবে?

উত্তরে বলা হল—বৃদ্ধ আপনি হননি। বৃদ্ধ হবেন সেদিন যেদিন দেখবেন আপনি নিজে ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

দীর্ঘকাল পরে সেই ভদ্রলোক একদিন এসে বললেন—অনেক সাধুসঙ্গ করলাম। তাঁরা অনেকেই অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু দেখলাম আপনার কথাই ঠিক। কার কাছ থেকে দীক্ষা নেব বলুন তো?

বলা হল—যাঁকে আপনার ভাল লাগে তাঁর কাছ থেকেই নিন।

ভদ্রলোক— দেখে শুনে নিতে হবে তো?

বলা হল—আপনার প্রয়োজন মতো পাবেন।

নামকে গুরুরূপে ধরতে হয়। গুরুর দেহ সব সময় পাওয়া যায় না। গুরু সত্যস্বরূপ চিদাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়েই আছেন। তিনি সর্ব বস্তু ও ব্যক্তির অন্তর ও বাহির জুড়েই চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন। তাঁর কাছ থেকেই সব সাহায্য পাওয়া যায়। [১৮।১।৭৬]

সৎসঙ্গের প্রভাব

সদ্‌গুরু ও মহাপুরুষদের সঙ্গ করতে হয়। তাঁদের আচরণ ও বাণী অবলম্বন করে জীবনে চলতে হয়। তাঁদের নির্দেশ পালন করে চিত্ত শোধন করতে হয়। চিত্তের শোধন হলে পরবর্তী স্তরগুলি আপনিই প্রকাশ পায়। চিত্তের শোধন না-হওয়া পর্যন্ত চিত্ত অন্তরে-বাহিরে বিভক্ত হয়ে থাকে। ছড়ানো মনোবৃত্তিকে একত্র করে গুটিয়ে আনা খুব কঠিন। একত্র করে আনার পর প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয়। তার আগে পর্যন্ত চলে মনের প্রস্তুতি। যত মনোবৃত্তি, তত সৃষ্টি।

ব্যষ্টি মন চায় সমষ্টিকে নিজের অধীনে রেখে চলতে। সমষ্টি রূপ-নাম-ভাব-বোধ হল আত্মগুরুর বাহ্য রূপ। গুরুর বাহ্য রূপকে বোধের দৃষ্টিতে মানার অন্তরায় হল নিজের অহংকার ও অভিমান। সৎসঙ্গের

প্রভাবে অহংকার কিছুটা দূর হয়। সৎ হল নিত্য, পূর্ণ ও এক। নিত্য এক-এর সঙ্গ করলে বহুর ছায়া আর থাকে না। তার আগে বহু জন্ম ছায়ার সঙ্গে থাকতে হয়। জন্ম-মৃত্যু বহুর খেলা। মনকে বিশুদ্ধ বোধের কেন্দ্রে নিয়ে গেলে বহু থাকে না। এই একবোধের নাম ও স্বরূপই হল গুরু। এর নামান্তর হল কূটস্থ সাক্ষী-আত্মা-ব্রহ্ম। গুরু ভাবে জন্ম-মৃত্যু নেই। [২০।১।৭৬]

মায়ের পরিচয় হল গুরুশক্তি বা চিতিশক্তি। প্রতি শ্বাসে তাঁকে মানা হলে বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং বিশ্ব তখন আপনার মাঝে এসে যায়। যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে সব এক। পোশাক পরিবর্তন করলেও তার কিছু এসে যায় না। মহাজনেরা এই তত্ত্ব অনুভব করেছেন। তাঁদের অনুভূতি পেতে হলে তাঁদের কথা ও নির্দেশ মানার অভ্যাস করতে হয়। মানলে তা বিজ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। [২৭।১।৭৬]

গুরুর শিক্ষা

গুরুই শিষ্যকে অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য বারবার নির্দেশ দেন। শিষ্যকে বলেন—নিজেকে দেখ। অন্তরের গভীরে যাও, আরও গভীরে। রূপের গভীরে আছে নাম, নামের গভীরে ভাব, ভাবেরও গভীরে আছে বোধস্বরূপ স্বয়ং। আপন আপন গুরুর নাম নিয়ে একের পর এক স্তর ডুব দিয়ে একেবারে গভীরে চলে যাও। যদি কেউ মন্ত্র না-পেয়ে থাকো, শুধু 'তুমি' বলে ডুব দাও। হলদে রংকে হলদে রং বলার মধ্যে কী মন্ত্র চৈতন্য খেলে গো? মাকে যে 'মা' বল শৈশব থেকে কে তা শিখিয়ে দেয়? 'এ' (নিজেকে দেখিয়ে) কোনও দলে থাকে না, থাকে শুধু সহস্রদলে বা একদলে। 'এর' কাছে 'সহস্র'[১] অর্থ হল—'সহরূপ অস্র' বা 'সহরূপ অস্রের' মধ্যে থাকা। তাই তো বলা হয়—'যে সয়, সে-ই রয়'। যে সয় না তার নাশ হয়। সহ্য হল ধ্যান। যা-কিছু আসুক স্থির হয়ে দেখতে হয়। অন্তরে স্থির না-হলে নামজপ বা ধ্যান হয় না। কিছুক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকার উদ্দেশ্য হল নিজেকে relax করে নিজেকে দেখা। বাইরে নূতন করে কিছু জানার নেই। প্রতিমুহূর্তে সে নিত্য নূতন রূপ পাল্টে চলেছে; কারণ তার রাগ-রাগিনীর সুর মূর্ছনার শেষ নেই।

শাস্ত্রের গলদগুলি বলে দিয়ে না-গেলে মানুষকে চিরকাল ভুলের মধ্যেই ঘুরে মরতে হয়। সদ্গুরু মহাপুরুষগণ শাস্ত্রের অর্থ বলে দিয়ে যান। নইলে অনর্থের মধ্যেই মানুষকে থাকতে হয়। অনর্থ নিবৃত্তি তার আর হয় না। [৩।২।৭৬]

সদ্গুরুর পরিচয় ও মহিমা

সৎপ্রসঙ্গের বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণে যখন তদনুরূপ অনুভূতি হয়, তখনই শ্রবণের ফল পরিপূর্ণতা লাভ করে। তখন শ্রবণের সঙ্গে যে বোধ খেলে, মননের সঙ্গেও সেই একই বোধ খেলে। শ্রবণকালে সত্যের ধারার মধ্যে অন্য বস্তুর মিশ্রণ হতে পারে না। সেই জন্য মননের মধ্যে আকাশসামান্য থেকে পৃথিবীসামান্য পর্যন্ত সর্বভূতের সামান্য অংশের প্রভাব থাকে। সত্য শ্রবণের মধ্যে শুদ্ধ শব্দতত্ত্বের বা শব্দতত্ত্বের প্রকাশক বা শব্দ-তন্মাত্র অবস্থান করে।

সত্যবাক্ হল বৃহৎপতি বা বৃহস্পতি। তাই গুরু হলেন বৃহস্পতি অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্রের প্রকাশক। যে শব্দ দিয়ে পরাকে ইঙ্গিত করা হয় তাই পরাবাক্। পরনাদ হল প্রণব বা সব দেবশক্তির সার। সত্যবাকের বা

১। সহস্র—সহ + অস্র। অর্থাৎ সহরূপ অস্র বা সহ্যরূপ অস্র। সহস্রদলে থাকা হল সহরূপ অস্র বা সহ্যরূপ অস্রের মধ্যে থাকা কারণ 'যে সয়, সে-ই রয়'।

গুরুবাকের মধ্যে সব দেবদেবীর শক্তি নিহিত আছে। গুরুবাক্য যে মানে সে সর্বসাধনার ফল পায়। গুরুর মধ্যে সব দেবদেবী মিশে আছেন। কারণ দেবদেবিগণ চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। গুরু হলেন সব বিজ্ঞানের ঘনীভূত রূপ। তিনি সর্বসংশয় মুক্ত ও বিশুদ্ধ বোধে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সকলকে অভয় প্রদান করেন। তিনি সত্য প্রকাশের অন্তরায়গুলি সরিয়ে বন্ধনের বা বিকারের কারণগুলি নাশ করে দেন; এক কথায় বলা যায়— সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান।

প্রত্যেকের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ আছে কিন্তু স্বভাবদোষে তা আবৃত থাকাতে অনুভূত হয় না। 'গুরু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' দিয়ে আপনবোধ জাগিয়ে দেন। 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' হল সেই বোধ যে বোধের দ্বারা নিজের সত্যস্বরূপ বোধের জাগরণ হয়। সেই বোধের কথা গুরু নানা ভাবে শুনিয়ে দিয়ে যান। সেই জন্য সহজ করে বলেন—আমাকে একটু মনে রাখিস।

ঋষি যুগে শ্রবণের মাধ্যমে শুদ্ধবোধ লাভ হত। গুরু হলেন বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। তিনি কেবল জ্ঞানমূর্তি। গুরু কৃপা করে না দিলে বিশুদ্ধ বোধ কেউ পেতে পারে না। অভিজ্ঞতার জন্য অভিজ্ঞ লোকের কাছেই যেতে হয়। ক্রিয়া-কলাপ ছাড়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তার পরেও অনেক বাকি থাকে। ঋষিযুগ থেকে সিদ্ধপুরুষ ও মুক্তপুরুষগণ বিনা শর্তে শ্রদ্ধা সহকারে এই বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ ভাবে সকলকে ধরিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে আলো দেবার মতো গুরু ব্যবহারপদ্ধতির মাধ্যমে সকলকে বোধরূপী আলো দিয়ে যান। এই ভাবেই অস্তিসত্তা বা নিত্যসৎ-এর পরিচয় শিষ্যের পাওয়া সম্ভব হয়। সেখানে অনুমানের কোনও সুযোগ নেই। গুরু শিষ্যকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এই ভাবে একের পর এক স্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে সব শেষে অবলম্বনশূন্য নিত্য, পূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ বোধস্বরূপে পৌঁছে দেন। তখন গুরু শিষ্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—দেখ, জগৎ তোর ছায়া মাত্র। তোর দাস। জগৎ তোর মধ্যে এক কোণায় পড়ে আছে। তোর নিজের সৃষ্টিকে তুই নিজে ভয় করবি। নিজেই তুই জগতের স্রষ্টারও স্রষ্টা। স্রষ্টা বাস করেন তোর অনুভূতির মধ্যে। যেখানে অনুভূতি নেই, সেখানে সৃষ্টিও নেই। গাঢ় নিদ্রার সময়ও অনুভূতি খেলে। সেখানে সাক্ষিরূপে অনুভূতি আছে। সাক্ষী অনুভূতি থেকেই সুখনিদ্রার স্মৃতি আসে।

সদ্‌গুরু জগতে কোনও দিন বিলীন হন না। একজন অনুভবসিদ্ধও যদি থাকেন তবে তাঁর দেওয়া আলোতে সব আলোকিত হয়ে যায়। তাঁদের চিন্তার প্রবাহ নানাত্ব-বহুত্বের প্রভাব সরিয়ে দেয়। চতুষ্পাদ সত্যের একপাদের অংশমাত্র কলিতে প্রকাশিত হয়ে আছে, বাকি অংশ আবৃত। এই অবস্থায় গুরুশক্তি ব্যতীত অহংকার-অভিমান দিয়ে সত্যের পথে এগোনো খুবই শক্ত। চলার পথে যা প্রয়োজন তা শুধু নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করা যায় না। বৃহৎ-এর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন হয়। যেমন জ্ঞানবানের কাছে জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং শক্তিমানের কাছে শক্তি লাভ হয়, সেই রকম অধ্যাত্মপথে চলতে গেলেও গুরুর বা মহতের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

জ্ঞান দুই প্রকার। যে চৈতন্য বহু ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় তা একটি জ্ঞান এবং যে চৈতন্য একবোধের সঙ্গে যুক্ত তা হল ঈশ্বরীয় জ্ঞান। সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ ঈশ্বরীয় চৈতন্য প্রকাশে সাহায্য করেন। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরীয় চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলে আছে বলেই, তাঁরা বারবার ঈশ্বর-আত্মার কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেন।

বস্তুর উপরে নির্ভরশীল হওয়াতেই মানুষ এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। বস্তুর মূল্য দিতে গিয়ে জীবন শেষ হয়ে যায় তবুও বস্তুর প্রভাব কাটাতে পারে না। গুরুকৃপায় শুদ্ধবোধের সঙ্গে পরিচিত হলে বস্তুর প্রয়োজন ও প্রভাব উভয়ই কমে যায়।

আধ্যাত্মিক সাধনায় পুঁথিগত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কেবল নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। গুরুবাক্য নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ ও পালন করলে অন্তরে অবিরাম জ্ঞানের উদয় হয়।

রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াই হল যথার্থ মুক্তি। পালিয়ে গিয়ে মুক্তিলাভ হয় না। যে বোধের কাছে তমোরজোগুণের বোধ অভিভূত হয় তার নাম সমানবোধ। সমানবোধের নামই হল গুরুবোধ। **বিশুদ্ধ বোধই গুরুবোধ। এই গুরুবোধ** দ্বারাই অন্ধকার বা নানাত্ব-বহুত্ব দূর হয়। [১৫।২।৭৬]

সদ্‌গুরুর কৃপাই তাঁর শ্রেষ্ঠ মহিমা

যতক্ষণ সকলকে অখণ্ড আপনবোধে বা অদ্বয়বোধে মানা না-হয়, ততক্ষণ নিজেকেও পূর্ণরূপে জানা ও মানা সম্ভবপর হয় না। নিজের আসল স্বরূপ জাগ্রত করতে হলে সবাইকে আপনবোধে মানতে হয়। প্রত্যেকের নিজের ভিতরে আপনস্বরূপ হল আত্মা। আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ভেদ নেই এবং থাকতেও পারে না।

গুরু আত্মা ঈশ্বর তিন মিলে একধর
গুরুবাক্য সার করে অধ্যাত্মসাধন কর।—সদ্‌বাণী

'এখান থেকে'[১] (নিজ বক্ষের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) যা বলা হয় তা যদি কেউ না-মানে তবে তার অধ্যাত্মসাধনা হয় না। 'বলা বাক্'-এর মধ্য দিয়ে বল (শক্তি) দেওয়া হয়। বল ছাড়া সাধক চলবে কী করে? গুরু বল দেন বাকের মাধ্যমে। তাই গুরুবাক্ হল মন্ত্র। গুরুগীতা সকলেই মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু আচরণ করতে পারে না।

বাক্ হল শক্তি। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সত্তা থেকেই ওঠে। সৎ-চিৎ-আনন্দশক্তির ব্যবহার হল সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী।

বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বর্ণ হল শ্বেতবর্ণ। প্রতিবোধের বৃত্তি নাদিত বা উদ্গীত হয় যাঁর দ্বারা সেই হল সরস্বতী। নাদ উদ্গীত হয় কণ্ঠ থেকে। সেই জন্য সরস্বতী হলেন বাক্ বা কণ্ঠের দেবী। জিহ্বার দেবীও সরস্বতী। জিহ্বার দেবতা বৃহস্পতি। গুরুবাক্ হল সরস্বতী ও বৃহস্পতির যুগ্ম রূপ।

শ্রবণ অনুরূপ মনন করতে হয়। ওষুধের মধ্যে অন্য বস্তুর মিশ্রণ হলে যেমন ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়, সেইরূপ শ্রুত কথার সঙ্গে অন্য কথার মিশ্রণ হলে গুরুবাক্ বিফলে যায়।

সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী হল সত্যবাণী। গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী ব্যতীত অন্য কোনও বাণী চৈতন্য জাগরণে সাহায্য করে না। গুরু হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ঘনীভূত রূপ। যে চৈতন্য স্থূল-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর স্তরের সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাকে বন্ধ করে একতান গতিতে প্রবাহিত হয় তা-ই হল গুরু, অথবা অজ্ঞান অন্ধকার রুদ্ধ করে দেয় যে বোধের স্বরূপ তা-ই গুরু। এই গুরু[২] শব্দের মধ্যেই তা নিহিত আছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানেই অজ্ঞান দূর হয়। তাই গুরু হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সর্বস্তরের বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁব পরিচয় থাকে। অর্থাৎ কী ভাবে বোধস্বরূপ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে বা রূপ-নাম-ভাব ধারণ করে, সে সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক ভাবে তিনি অবহিত থাকেন।

ঈশ্বর স্বয়ং যখন কৃপা করতে চান, এবং যে আধারের মাধ্যমে তা করেন তিনিই সদ্‌গুরু। ঈশ্বরের করুণা যখন ঘনীভূত হয় এবং তা যে রূপের মধ্যে প্রকটিত হয় সেই রূপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জীবকে নানাত্ব-বহুত্ব

১। এখান থেকে—কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর অনেকবারই বলেছেন—"এখানে যা-কিছু তোমরা শুনছ সে-সব সচ্চিদানন্দময়ী মা বা আত্মগুরু বলেন। 'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) কিছু বলে না। 'এ' থাকে সবারই পিছনে। 'একে' কেউ কোনও দিন খুঁজে পাবে না।"

২। গুরু—'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, অজ্ঞান, নানাত্ব-বৈচিত্র্যময় এই সংসার। 'রু' শব্দ হল রোধক ও প্রতিবন্ধক—বিশুদ্ধ বোধ। জ্ঞান হল অজ্ঞানের বাধক। জ্ঞানস্বরূপ হল আত্মগুরু ব্রহ্ম। আত্মগুরু হল গুণাতীত রূপাতীত বোধস্বরূপ। এ-ই হল 'গুরু' শব্দের তাৎপর্য বা মর্মার্থ।

থেকে একত্বে, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য থেকে অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে, 'আমারবোধ' থেকে 'আমিবোধে', ক্ষরভূত থেকে অক্ষরভূতে নিয়ে যান। স্ববোধে, স্বভাবে এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করেন।

যারা তাঁর কৃপা, করুণা পেতে চায় তাদের চারটি জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়—A^4 বা to adopt, to adjust, to accommodate and to accept the Absolute. Adoption হয় বাইরে, adjustment হয় অন্তরে, accommodation হয় কেন্দ্রে এবং acceptance হয় স্ববোধ আত্মাতে। কেন্দ্র দ্বারা বাহির ও অন্তর পরিচালিত হয়। সেখানেই হয় assimilation, consummation and unification. এখানে সব কিছুই উদ্গীত নাদ। তবে বিশেষ বিশেষ নাদ যুগের প্রয়োজনে প্রভাব বিস্তার করে এবং বাকিগুলি আবৃত হয়ে যায়।

গুরুবাণী শুনে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল শেষ কথা। শ্রবণ যেরূপ হয়েছে সেরূপ মনন করতে হয়। ভুলে গেলে চলবে না। ভুল করে মানুষ ভগবানের কাছে ক্ষমা চায়, কিন্তু তিনি ক্ষমা করবেন কেন?

'আমারবোধ'-এর বৃত্তি ছড়ানো হয়েছে, তার ফল ভোগ করতেই হবে। মানুষ সাধুসন্তদের একটু উপঢৌকন দিয়ে বা একটা প্রণাম করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়, অর্থাৎ সামান্য ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চায়। যারা ঐরকম প্রণাম নেয় ও ঘুষ খায় তারা সাধুই নয়। বিরুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ যাদের রুদ্ধ হয়েছে তারাই সাধু হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।

'আমি কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা'—এই বোধ রুদ্ধ না-হলে বিরুদ্ধ অবস্থা বারবার আসে। কাজেই বিরুদ্ধ অবস্থাগুলিকে মেনে নিলে তা ভিতরে ঢুকে যায়; তাড়িয়ে দিয়ে বা প্রতিবাদ করে জয়লাভ করা যায় না। এ অবস্থায় প্রতিবাদ[১] নয় সমবাদ। 'প্রতি' বাদ দিলে কী করে হবে? 'বাদ' শব্দের অর্থ এখানে বিয়োগ করা নয়। 'বাদ' শব্দের অর্থ হল তত্ত্ব; যেমন—ঈশ্বরীয়বাদ, জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি।

সাধু সব দুঃখের বোঝা বহন করে
ভোগী সুখের পিছন ছোটে জীবন ভরে।—

মানুষ সাধুসন্তের পিছনে ছোটে দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য। তাঁরা সাধ্যমত তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের চেষ্টাও করেন। কিন্তু বিনিময়ে তাঁদের দেয় একটা কাপড় বা একটা মিষ্টি। সকলে তাঁদের ফাঁকি দিয়ে কৃপা নিয়ে যায়, যেমন গরুকে এক আঁটি খড় খাইয়ে তার থেকে সারবস্তু দোহন করে নেয়। গুরুকে একটা প্রণাম করেই মানুষ তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু ভগবানরূপী গুরুকে কিছু দিয়েই তুষ্ট করা যায় না।

তিনি চান ষোলো আনা মন। অর্থাৎ ষোলো আনা 'মানা' হলেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায়। ঘুষ দিয়ে ভগবানের রাজ্যে কাজ চলে না। ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে জানাজানি ফেলে দিতে হয়; এমনকী দেহবোধও ছেড়ে দিতে হয়। কেননা 'আনন্দধাম' তাঁর নাম। সেখানে প্রবেশ করতে হলে 'আমার' বলে যা-কিছু আছে, সে সব বাইরে রেখে যেতে হয়। সেখানে শূন্যহৃদয়[২] ছাড়া আর কারও স্থান নেই। মহাশূন্যে কেবল শূন্যই বাস করে। শূন্য হল শ্মশান। 'মানা' ঠিক না-হলে হৃদয় শ্মশান হয় না। একটু বেদনা হলেই যদি অসুবিধা হয় তবে মানা হয় না। একঘণ্টাও 'মানা'-র অভ্যাস করতে কেউ রাজি নয় সেখানে ষোলো আনা ফল কী করে পাওয়া যাবে?

মহাপুরুষগণের বাণীর অনুভূতি পেতে হলে অপর আরেকজন মহাত্মার মাধ্যমে তা পেতে হয়। সন্তানের মুখে বাবার মহিমা কীর্তন হলে তা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। কিন্তু অন্য লোক তা করলে সে সম্ভাবনা

১। প্রতিবাদ—প্রতি + বাদ। বাদ অর্থে তত্ত্বকে বলা হয়েছে এখানে; বাদ অর্থ বিয়োগ নয়।

২। শূন্যহৃদয়—শূন্য হল শ্মশান। শ্মশানে সব (শব) পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সে রকম অন্তরের সমস্ত বৃত্তি নাশ হয়ে গেলে হৃদয়ও শ্মশান হয়ে যায় অর্থাৎ শূন্যহৃদয় হয়।

আর থাকে না। সেরূপ দল, মতপথের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত মহাত্মাদের মহিমা কীর্তনেও পক্ষপাত দোষ থাকে। এই কারণেই দল গঠনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়। দলে থাকতে হলে আপন 'সহস্রদলে' অর্থাৎ সমবোধে বা একবোধে থাকাই উত্তম। জগৎ দল ছাড়া বা প্রচার ছাড়া হয় না; কিন্তু সত্য কচুরিপানার মতো দলে দলে কখনও হয় না। [১৭।২।৭৬]

অদ্বয়তত্ত্বের দ্বিবিধ বিজ্ঞানের পরিচয়

যে সকল সিদ্ধপুরুষগণ বা মহাপুরুষগণ প্রচারে নামেন তাঁরা বিশেষ ভাবে সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার বিজ্ঞান বা পদ্ধতি যে-ভাবে অনুভব করেন তার একটা নক্সা বানিয়ে নেন এবং সেই নক্সাকে অবলম্বন করেই প্রচার করেন। যদিও শাস্ত্রে নক্সার নানাবিধ নমুনা দেওয়া আছে, তবুও তাঁরা আপন আপন অনুভূতি অনুরূপ ব্যক্ত করেন।

এই অনুভূতি নিজের কেন্দ্রসত্তাকে অবলম্বন করে যে-ভাবে পাওয়া যায় তার একটি বিজ্ঞান আছে এবং বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বকে মাধ্যম করে যে অনুভূতি লাভ হয় তারও একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আছে। অন্তর ও বাহিরকে কেন্দ্র করে দু'টি বিজ্ঞান পাওয়া যায়, যথা—নিজের মধ্যে নিজের ও জগতের পরিচয় লাভ করা এবং জগতের মাধ্যমে নিজের ও জগতের পরিচয় লাভ করা।

জগতের মাধ্যমে জগতের ও নিজের পরিচয় লাভ করাই হল ঈশ্বরীয় বিজ্ঞান; এ হল ব্রহ্মবিদ্যা। এবং নিজের মধ্যে নিজের ও জগতের পরিচয় লাভ করা হল আত্মবিজ্ঞান বা জ্ঞানের বিজ্ঞান। এই উভয় বিজ্ঞানই কেবল আত্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। এই উভয় বিজ্ঞান কেবল অদ্বয়তত্ত্বেরই বিজ্ঞান। এদেব মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য নেই। সদ্‌গুরু হলেন উভয় বিজ্ঞানের ঘনীভূত রূপ, অদ্বৈতের মূর্তি। এই গুরুকে ধরে নিয়ে উভয় বিজ্ঞানের একক রূপ—অদ্বৈতের বিজ্ঞান পাওয়া যায়, যা বেদান্তশাস্ত্রেব প্রতিপাদ্য বিষয়। সদ্‌গুরুর সঙ্গ করে এই অদ্বৈতের বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের তাৎপর্য

স্বস্বরূপের বিজ্ঞান হল প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম-আত্মবিজ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপকে মন কখনও মনের বিষয় করতে পারে না। সুতরাং সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া সাধক ধ্যানে ভূমা আত্মার পরিচয় পূর্ণ ভাবে পেতে পারে না। শাস্ত্রে অবশ্য ধ্যানে আত্মদর্শনের কথা লেখা আছে। কিন্তু সাধকের অনুভূতিতে এক সময় ধরা পড়ে যে মন যেখানে প্রজ্ঞানাত্মার অভিব্যক্তি বা অংশমাত্র, সেখানে মন কখনও আত্মাকে বিষয় করে তাঁর স্বরূপ জানতে পারে না। মন তাঁকে জানতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে যায়। মন হল কার্য এবং আত্মা হল মহাকারণ। সেই মহাকারণরূপ আত্মা থেকে নেমে এসে মন-রূপ কার্য আবার মহাকারণে মিশে যায়। তাকেই বলা হয় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন।

গুরুবাক্‌ই হল মন্ত্র। সব শব্দই মন্ত্র তথাপি গুরুবাক্‌ই বেশি কার্যকরী। ধ্যানের মধ্যেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। ধ্যান হল মনের নিজস্ব জিনিস। ঊর্ধ্বমনের চেষ্টা করে ধ্যান করতে হয় না, আপনা থেকেই হয় এবং তার সাহায্যে নিম্নপ্রকৃতির সব কার্য সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নমনের কার্য প্রয়াসসাপেক্ষ এবং তা সর্বদাই দ্বৈত ভাববোধের অধীন। দ্বৈতবোধে অদ্বৈতের সমাধান হয় না। নিম্নমনের কারণ থাকে পশ্চাতে এবং কার্য থাকে সামনে। নিম্নমনের ধারণা হল ধ্যান বা সাধনা তা কর্তৃত্ববোধে হয়; তার ফলে তার অহংকার বাড়ে।

কামাহত নিম্নমনের বিকার বেশি থাকে বলে সাধনার বা ধ্যানের সময় তার মন বিক্ষিপ্ত হয় বেশি এবং গুরুবাক্যে সংশয় ও সন্দেহ আসে। ঊর্ধ্বমন গুরুবাণীকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নিয়ে তাতে আপনাকে

সমর্পণ করে দেয় অথবা তদ্‌বোধে আপনাকে মানার অভ্যাস করে। তার ফলে মন দ্বৈতভাব মুক্ত হয়ে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুচিতার যথার্থ অর্থ

লোকে সাধারণত গোময়, গঙ্গাজল, তুলসীপাতার ব্যবহারকেই শুচিতার লক্ষণ বলে মনে করে; কিন্তু আসল শুচিতা হল শুদ্ধবোধে। তা সিদ্ধ হয় ইন্দ্রিয়সংযমে। জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু কিছু নেই। অজ্ঞানে অশুদ্ধি[১], জ্ঞানে হয় শুদ্ধি[২]। গুরু যে-ভাবে ইন্দ্রিয়সংযম করতে বলেন সেই ভাবে করা হলেই আসে শুচিতা। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকলেও গুরুর বিধান মেনে চললে হুঁশের সঙ্গে তা ব্যবহার করা যায়। তাহলে শুচিতার অভাব হয় না।

সদ্‌গুরুবাণী মানলেই দিব্যজীবনের অধিকারী হওয়া যায়

বিশুদ্ধ একবোধের ঘনীভূত মূর্তি হলেন সদ্‌গুরু বা অবতার পুরুষ। তাঁদের কাছেই কেবল মানুষ শুদ্ধ-বোধের ব্যবহার পেতে পারে। তাঁরাই সকলকে ধরিয়ে দেন যে, নিত্য নির্বিকার অমৃতত্বের পরিচয়, ভূমা অখণ্ড বোধস্বরূপের পরিচয় বা আত্মবোধের পরিচয় লাভ করা, সবই এক অর্থবোধক এবং এ-ই হল সকলের সত্য পরিচয়।

সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত বাক্য হল বেদবাক্য। একেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করে চলতে হয়। সদ্‌গুরুগণ সত্যকে চয়ন করে আধারের প্রকৃতি অনুযায়ী যাকে যতটুকু দিয়ে যান তা-ই হল তার সাধ্য। 'বহু সাধা'[৩] হলে হয় ইন্দ্রিয়ের সাধনা। সাধারণ জীবনে হয় বহুকে সাধা। আর 'একেকে সাধা'[৪] হল দিব্যজীবনের বৈশিষ্ট্য।

গুরুনির্দিষ্ট পথে যে চলে সে-ই হয় দিব্যজীবনের অধিকারী। কাজেই আপন আপন গুরুর নির্দেশ যথাযথ পালন হয় কিনা সেদিকে সচেতন থাকা সকলেরই কর্তব্য। সচেতনতা হল সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। সচেতনতা না-বাড়লে চৈতন্যের সঙ্গে যে সকলেই নিত্যযুক্ত তা অনুভব করা যায় না।

সদ্‌গুরুর কাজ

সদ্‌গুরু শিষ্যের সংশয় ও সন্দেহ দূর করেন, তাকে নানা ভাবে অদ্বয়বোধে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তাকে বলেন—তুমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ। কে তোমাকে বাঁধবে? নিজের আসল স্বরূপ ভুলে গিয়ে তুমি নিজেকে কেন বদ্ধ ভাবছ?

গুরুপ্রদত্ত নাম ও বীজ ছাড়া আর কারও প্রতি আসক্তি বা ভালবাসা থাকা উচিত নয়, এমনকী নিজের দেহের প্রতিও নয়। দেহ তো বিনাশী যে কোনও সময় দেহের নাশ হতে পারে। দেহের মধ্যে দেহীরূপে যিনি আছেন এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে 'আমি-আমি' বোধে ফুটে ওঠেন সেই 'অখণ্ড ভূমা আমিবোধ'-ই হল সকলের যথার্থ স্বরূপ। এই 'ভূমা আমি' হল শুদ্ধবোধস্বরূপ। এ ছাড়া আর সব কিছুই প্রতিভাস। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'আমি-আমি' প্রত্যয়রূপে যা ফুটে ওঠে তা হল খণ্ড আমি বা কাঁচা-আমি বা অহংকারের আমি। তা দেহাত্মবোধযুক্ত 'আমি'—অখণ্ড ভূমা আমির প্রতিভাস মাত্র। তা বিকারী ও ক্ষণস্থায়ী।

১। অশুদ্ধি—মন ও বুদ্ধির কার্য।

২। শুদ্ধি—বোধের অনুভূতি।

৩। বহু সাধা—খণ্ড বোধের সাধনা।

৪। একেকে সাধা—অখণ্ড বোধের সাধনা।

সদ্‌গুরু তাই শিষ্যকে হুঁশিয়ার করে দেন—অংশ নিয়ে অনেক দিন কাটিয়েছ এবার বাইরে থেকে স্বঘরে ফিরে এস। হৃদয়বাণী শুনিয়ে দিয়ে গুরু হৃদয়ে বা কেন্দ্রে সকলকে আকর্ষণ করেন এবং অহং প্রত্যয়ের লক্ষিতার্থকে ধরিয়ে দেন। স্বরূপের স্মৃতি বা ধ্রুবাস্মৃতি, যা মানুষ ভুলে গেছে তা জাগিয়ে দেওয়াই হল সদ্‌গুরুর কাজ। এই সদ্‌গুরুর সাহায্যেই মানুষ বহির্জগতের আকর্ষণ ত্যাগ করে কেন্দ্রাভিমুখী গতি নেয় এবং পরিশেষে পূর্ণ অদ্বয় স্বস্বরূপের পরিচয় পেয়ে অমৃতত্ব ও শান্তি, মুক্তি আস্বাদনের অধিকারী হয়।

সৎসঙ্গের ফল কী ভাবে কার্যকরী হয়

সৎসঙ্গে ধ্যানে বসে গুরুপ্রদত্ত বাণীগুলি স্মরণ করতে হয়। গুরুব সব নির্দেশ পালনে অক্ষম হলে তাঁকেই বিনম্র ভাবে জানাতে হয়—আমি কিছুই তো পারছি না। তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। সৎসঙ্গের সময় অন্য চিন্তা মাথায় ঘুরলে সৎসঙ্গের ফল নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য সৎসঙ্গে প্রবেশ করার নিয়ম হল নানাবিধ সমস্যা ইত্যাদি দরজার বাইরে রেখে প্রবেশ করা এবং মনে এই বিশ্বাস রাখতে হয় যে গুরু আমার অন্তরের সব কিছুই দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

সৎসঙ্গের বৈশিষ্ট্য

সকলে স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের আত্মগুরু সৎসঙ্গের আসরে উপস্থিত থাকেন, কারণ সকলের হৃদয়কেন্দ্রে বাসুদেব নিত্যবর্তমান। আত্মগুরু সর্বদাই সকলের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকেন। গুরু ছাড়াও অনেক মহাত্মা, মহাপুরুষ সেখানে উপস্থিত থাকেন। এত মহাত্মা মহাপুরুষদের কৃপা পাওয়ার সুযোগ যেখানে আছে, সেখানে ফাঁকি দিলে নিজেকেই কষ্ট পেতে হয়। ভাবতে হয় যে, এত মহাত্মা যখন আমার মঙ্গল কল্যাণের জন্য উপস্থিত রয়েছেন তখন আমার কিছু করণীয় নেই। অন্তরে শুধু গুরুনাম বা গুরুমূর্তি রেখে আর সব চিন্তা শিথিল করে দিয়ে বিশ্রামের ভাব নিয়ে সৎসঙ্গে বসতে হয়।

সমবোধের বক্ষে বা আত্মস্বরূপের বক্ষে নিজেকে একটু সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল এখানকার (গোলাবারান্দায় উপবিষ্ট সৎসঙ্গীদের ইঙ্গিত করে) ধ্যানের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তোমরা যে যা খুশি সাধনা কর 'এ' (নিজেকে দেখিয়ে) সেখানে হস্তক্ষেপ করবে না। সদ্‌গুরুদের কৃপার কথা বিকৃত করার ক্ষমতা বা সাধ্য 'এর' নেই। তাঁরা যে সব সময় দেখছেন তা একবার বোধের নয়ন মেলে স্ববোধে দেখতে হয়। যেখানে তোমাদের আপনজন উপস্থিত থাকেন সেখানে একটু নিশ্চিন্তে বসে থাকা। নিজেকে ছেড়ে দিলে তাঁর কৃপা একটু একটু করে অনুভব করা যায়। এ ছাড়া অন্য ভাবে অনুভব করা অসম্ভব।

সদ্‌গুরুই হলেন সকলের আশ্রয়

প্রতিটি কথাই মানুষের মনে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সৎসঙ্গেও ভগবৎপ্রসঙ্গ মানুষের মনে দিব্যপ্রভাব বিস্তার করে। সদ্‌গুরু হলেন সকলের একমাত্র আশ্রয়। সদ্‌গুরু ছাড়া লঘুকে কে আশ্রয় দেবে? সদ্‌গুরু হলেন বিরাট আশ্রয়ী, যাঁর আশ্রয়ে সকলে থাকতে পারে।

সৎ-এর আশ্রয়ে সৎ বাক্‌ অনুযায়ী সচেতন হয়ে চলাই হল পূজা অথবা সৎ বাক্‌ মনন করাই হল পূজা। সৎ বাক্‌ দিয়ে হয় সত্যের পূজা। সেইরূপ গুরুবাক্‌ দিয়ে হয় গুরুপূজা। মহাপুরুষদের বাণী মনে রেখে চলাই হল তাঁদের সঙ্গে থাকা। সদ্‌গুরুর নাম শোনামাত্রই অনুভূতি হয়। শান্তির প্রয়োজন থাকলে যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে নেই। কার কী হবে বা না হবে এ সব গুরুই চিন্তা করবেন। কারণ মানুষের ক্ষমতা অতি সীমিত। এই সীমিত শক্তি নিয়ে অহংকার দ্বারা নিম্নমন নিজে সব করতে গেলে ঊর্ধ্বমন কিছু করে না, চুপ করে বসে থাকে।

ভগবানকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলে দৃঢ় ভাবে এই বিশ্বাসটিও অন্তরে গেঁথে নিতে হবে যে সর্বত্র তিনিই আছেন। কাজেই দুনিয়ায় কারও দোষ দেখা চলে না। কিন্তু তথাপি মন দোষ-গুণ নিয়ে থাকতেই ভালবাসে। বিশুদ্ধ বোধের চর্চা হলে এ সকল প্রশ্নর বা সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যায়। ভাল-মন্দ বিচার করতে গিয়ে যে গুরুকেই আঘাত দেওয়া হয় মন তা খেয়াল রাখতে পারে না। কারণ সদ্গুরু হলেন সর্বব্যাপী। যেখানেই পা ফেলা যায় সেখানেই দেখা যায় বোধস্বরূপ গুরুই বসে আছেন। অতএব কারও দোষ ধরা যায় না। কারও দোষ ধরতে গেলে গুরুরই দোষ ধরা হয়। কাউকে আঘাত করলে গুরুকেই আঘাত করা হয়।

[২৪।২।৭৬]

গুরুর মহানুভবতার পরিচয়

বিশুদ্ধবোধে বিকার নেই। সদ্গুরু তাই দীক্ষা দেবার সময় শিষ্যকে সচেতন করে দেন—'তোর সব বৃত্তির মধ্যে আমিই আছি। তোর মধ্যে আমি নিজেকেই রাখলাম, ভুলে গিয়ে নষ্ট করিস না।' সদ্গুরু নির্বিকার স্বরূপ। বিকার হওয়ার অর্থ হল গুরুকে ভুলে যাওয়া অথবা গুরুকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং অহংকার, অভিমানের ব্যবহার করা।

সদ্গুরুর এই মহানুভবতা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকে একটি সুন্দর শিক্ষার পরিচয় বহন করে। তিনি কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে শিষ্যকে স্বরূপের স্মৃতি জাগরণে সহায়তা করেন! প্রকৃতির মতো কঠোর শাসন তিনি করেন না। তিনি জানেন যে প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করবে। গুরুর কাজ হল সমতা বা একতা বজায় রাখা। বিষমতার মধ্যে গেলে সদ্গুরুর সাহায্য পাওয়া যায় না। সদ্গুরুকে না-মানা হলে তিনি কিছু করে দেন না।

সদ্গুরু ও শিষ্য হল যথাক্রমে বিশুদ্ধবোধ ও মনের প্রতীক। এ খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে মন বোধস্বরূপের অংশ হওয়া সত্ত্বেও মনই যত রকম অদ্ভুত[১] ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধবোধে কিন্তু অদ্ভুত কিছু থাকে না। সেখানে সব 'ব্রহ্মভূতে'[২] পরিণত হয়ে যায়। পূর্ণ সত্যের অধিকারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে ভ্রান্তির পর ভ্রান্তি তৈরি হয়। মনের থেকে জগৎবোধ বা বিষয়বোধ সরিয়ে বিষ্ণুবোধ আনার জন্য ভগবানের নাম স্মরণ মনন করতে বলা হয়।

মানুষ সাধনার পথে সর্বদাই অন্তরায় দেখে। কিন্তু অন্তরায়গুলি যে আত্মার আহ্বান 'অন্তরে আয়' তা ধরতে পারে না। সেই অন্তরের আহ্বান শুনতে পায় না বলে সে গুরুকেই দায়ী করে যে—গুরুই সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। সর্বদা সর্বত্র সদ্গুরুকে রাখলে সব অন্তরায় আপনা থেকেই অপসারিত হয়।

সদ্গুরু বোধস্বরূপের কথা বারবার শুনিয়ে শিষ্যের মনকে রাঙিয়ে দেন। কিন্তু মন যদি গুরুবাণী ভুলে গিয়ে আর পাঁচ জায়গায় ছুটে যায় তাহলে বহুবোধের বৃত্তি দ্বারা শুদ্ধবোধ আবৃত হয়ে যায়। সদ্গুরু যদি কড়া হন এবং একটু কঠোরতা অবলম্বন করেন শিষ্য অসন্তুষ্ট হয়। তবু ধীরে ধীরে তার সহনশীলতা তৈরি করে ঠিক পথে তাকে পরিচালিত করেন। প্রয়োজন হলে শিষ্যেব জন্য পাঁচবারও দেহ ধারণ করেন, তথাপি হাল ছাড়েন না।

সদ্গুরুদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে যা-ই বলুক না কেন, শুদ্ধবোধের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের নেই।

১। অদ্ভুত—বিকৃত ও কল্পনাপ্রসূত।

২। ব্রহ্মভূত—বিশুদ্ধবোধ বা জ্ঞানসত্তা।

গুরুবাণী স্মরণ করে চলা হল গুরুর সঙ্গ করা

সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নির্দেশ ও বাণী স্মরণে রাখতে হয়। প্রতিটি কর্মে, জীবনের প্রতিটি আচরণে, চলনে-বলনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর নির্দেশ অনুসারেই চলতে হয়। সর্বদা গুরুবাক্ স্মরণ করা হল গুরুর সঙ্গ করা। সদ্‌গুরু আমাকে সর্বদাই বক্ষে ধারণ করে আছেন—এই ভাবনাতে পতনের আর ভয় থাকে না। এজন্য শ্বাসে শ্বাসে নাম অভ্যাসের প্রয়োজন।

বোধস্বরূপের প্রতিটি বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে নাম দিয়ে ব্যবহার করতে হয়। নাম হল বোধের প্রতীক, বাচক এবং বোধস্বরূপ স্বয়ং। কেননা নিজেকে বাদ দিয়ে নাম উচ্চারণ করা যায় না। গুরু, মন্ত্র, নামকারী ও সাধনার মধ্যে ভেদ করাই হল ভ্রান্তি। চার বর্গকে এক করে না-নিয়ে এলে সাধনা পূর্ণ হয় না ও সাধনাও হয় না।

গুরুর সঙ্গে নিজের পৃথক ভাবনাই হল পাপ

পাপ বলে যদি কিছু থাকে তা হল গুরুকে নিজের থেকে এবং নিজেকে আত্মগুরুর থেকে পৃথক ভাবনা করা। তা-ই বিকার সৃষ্টি করে। নিজের থেকে আত্মগুরুকে পৃথক না-ভাবলে পাপ হয় না; এবং তখনই সচেতন হওয়া যায়। সচেতন হলে গুরুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ করা হয়। অভেদ ভাবনা না-হলে অভেদ অনুভূতি বা অভেদ দর্শন হয় না। সদ্‌গুরু সব কিছুর মধ্যেই আছেন। তা না-হলে সদ্‌গুরু অখণ্ড হন না। তবে প্রথম অধিকারীর জন্য হরির বা গুরুর একটা বিশেষ রূপ রাখতে হয়। বাল্যশিক্ষা নিয়ে জীবন কাটালে বোধের বিকাশ হয় না। সমগ্র সত্তা হল সদ্‌গুরুর স্বরূপ। সদ্‌গুরুর কাছেই সব চাবিকাঠি থাকে। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে খুলে না-দিলে নিজের চেষ্টায় খোলা খুব কঠিন।

আপন গুরুপ্রদত্ত নাম হল সম্পদ। কেউই ভিখারী নয়। আসল বস্তু আছে সকলের ভিতরে।

[২৯।২।৭৬]

চিত্তশুদ্ধি হলে হয় ঈশ্বরদর্শন

আনন্দ অহেতুক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পায়। অথবা বলা চলে আনন্দ হল আপনস্বরূপের মধ্যে আপনারই সৃষ্ট বস্তু। তাই আনন্দ স্বয়ংপ্রকাশ। সদ্‌গুরুর মুখে আপন নিত্যস্বরূপের পরিচয় শ্রবণ করে তা মনন করলেই প্রকৃত দর্শনের পর্যায় আরম্ভ হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ হল নিজ পরিচয়। মনের দিক থেকে ঠিক থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে মনে হয় পৃথক।

ঈশ্বরদর্শন বা গুরুদর্শন হয় চিত্ত শুদ্ধ হলে। তার আগে চিত্তবৃত্তির শোধন হতে থাকে। সদ্‌গুরু বা আত্মা প্রত্যেকের সত্তার মধ্যে নিত্যবর্তমান। তাঁদের স্মরণ-মনন করাই হল ধ্যানের তাৎপর্য। নিজেকে নিজবোধরূপে দেখা বা অনুভব করা হল ধ্যানের উদ্দেশ্য।

সদ্‌গুরুকে ভজন করতে বলা হয় অর্থাৎ বোধস্বরূপের ভজন করার কথাই বারবার বলা হয়। বোধের স্থানে ব্যক্তির প্রাধান্য এসে গেলে সসীমেই থাকতে হয়, সসীম ছেড়ে আর অসীমে যাওয়া যায় না। বোধ দিয়ে বোধের ব্যবহার হলে বিকার আর থাকে না। [২।৩।৭৬]

কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়—দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

ভগবৎ নামকীর্তনে বা গুণকীর্তনে দোষ অপসারিত হয়ে গুণের বিকাশ হয়। তাঁর নামে কেউ জয়ধ্বনি দিলে তার নিজেরই জয় হয়, তাঁর গুণ গাইলে নিজেরই গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর ভাবনায় নিজেরই ভাব বৃদ্ধি পায়। ভাবুক ভক্ত তাই বলে—

'মন দিবানিশি ভাব তাঁকে
যে জন অবিরাম ভাবে তোমারে।'

বাড়িঘরে যারা বয়সে বা গুণে ছোট, যেমন ছেলে, মেয়ে, পরিচারক, পরিচারিকা প্রভৃতি তাদের মধ্যেও নারায়ণ আছেন একথা সহজে সকলে মানতে পারে না। এজন্য বলা হয় যে, ছেলে মেয়েদের ভগবান বলে শ্রদ্ধা জানাতে না-পারলেও গোপালবোধে বা লক্ষ্মী-সরস্বতীবোধে গ্রহণ করতে হয়। তাহলেও মনুষ্যভাবে থেকে সাত্ত্বিকভাব বজায় থাকে। বাড়ির পরিচারকদের ভগবৎবোধে মানুষ গ্রহণ করতে পারে না অথচ সে নিজেও গোলামের গোলাম দাসানুদাস। তাই মীরাবাঈ গেয়েছিলেন—

"ম্যায় নে চাকর রাখ জী।"

ভক্তির সাধনা যে করে না, সে ভাবতে পারে যে আমি চাকর হব কেন? আমি প্রভু হব; কিন্তু প্রভু হওয়া এত সোজা নয়। যাঁরা গুরু বা প্রভু হয়েছেন তাঁরাই বলেন যে সুদীর্ঘকাল গুরুসেবা করার পর প্রয়োজন মতো যথোপযুক্ত সময়ে তাঁদের আপন আপন গুরুই তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং গুরুরূপে তাঁদের প্রকাশ করেছেন। তা না-হলে তাঁরা গুরু হবেন কী করে?

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি তোমাদের—একবার এক ভক্ত সংসার ত্যাগ করেছে সন্ন্যাসী হবে এই আশায়। ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে সন্ন্যাসী হবার জন্য সে আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে এক আশ্রমে যাবার পর আশ্রমের মহান্তের সঙ্গে দেখা করল। আশ্রমবাসী হতে হলে প্রথমে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই মহান্ত তাকে গোয়ালঘর পরিষ্কার করার কাজ দিলেন। কিন্তু সে বড় ঘরের ছেলে, সুখী মানুষ সুতরাং গোবব কুঁড়িয়ে ঘুঁটে প্রভৃতি দিতে তার সংকোচ হল। সে ঐ আশ্রম ছেড়ে অন্য এক আশ্রমে চলে গেল।

সেখানে তাকে ঘর ঝাঁড়ু দেবার কাজ দেওয়া হল। সে কয়েকদিন সেখানে ঘর ঝাঁড়ু দিল। কিন্তু বাড়িতে সে কোনও দিন ঝাঁড়ু হাতে নেয়নি তাই পরিচিত লোকের সামনে ঝাঁড়ু দিতে খুব লজ্জাবোধ করত। কয়েকদিন পরে সে সেই আশ্রম ছেড়ে চলে গেল।

পরে ঘুরতে ঘুরতে সে আরেক আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় চাইল। সেখানে মহান্ত তাকে আশ্রমের সাধুদের এঁঠো বাসন মাজার কাজ দিলেন। এই কাজও তার পক্ষে করা সম্ভব হল না। তাই সেখান থেকেও ব্রহ্মচারী সরে পড়ল। এ ভাবে প্রায় সাত-আটটি আশ্রমে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কোথাও তার মন বসল না। আবার এদিকে সংসারে ফিরে যেতেও পারছে না। কারণ সাধু হওয়ার সখ তার তখনও যায় নি। সে ভেবেছিল সাধুদের আশ্রমে গিয়ে সেখানে থাকতে চাইলে তাকে গেরুয়া দিয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দেবে আর সে আরাম করে বসে থাকবে। অনেক আশ্রম ঘুরে ঘুরে তার এই ধারণা পালটে গেল।

অবশেষে কয়েকদিন পরে বাধ্য হয়ে আরেক আশ্রমে উপস্থিত হল। এই আশ্রমে এসে মহান্তের সঙ্গে দেখা করে সে প্রথমেই জানিয়ে দিল আশ্রমের কাজকর্ম তার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ সে এ সকল কাজ করতে অভ্যস্ত নয় এবং কোনও রকম কাজ সে জানেও না।

সেখানকার মহান্ত শুনে চিন্তায় পড়লেন। বললেন—তাইতো, তুমি কিছু জানো না— তোমাকে কী কাজ দেওয়া যায় তাহলে? অনেক ভেবেচিন্তে তিনি বললেন—এক কাজ কর, মন্দিরে কোনও পাখার ব্যবস্থা নেই, মন্দিরের বিগ্রহ শিবজীকে প্রতিদিন দুপুরে ও রাত্রিতে হাওয়া করবে।

সে ভাবল—পাথরের শিবকে আবার হাওয়া করার প্রয়োজন হয় নাকি? কিন্তু দেখল যে মহান্তের কাছে শিব আর পাথর নয়। সবাই যখন রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ে মহান্ত তখন জেগে বসে বসে শিবজীকে হাওয়া করেন। তিনি জানেন যে ভগবানকে সেবা করার জন্য তিনি ঘর ছেড়েছেন। এই সেবা করার মাধ্যমেই এমন কিছু তিনি পেয়েছিলেন যার জন্য ক্রমে ক্রমে মহান্তর পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দুপুরে ও রাত্রিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সব সাধুদের ঘরে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতেন। কাউকে গরমে কষ্ট পেতে দেখলে তাকে

একটু হাওয়া করে দিতেন। কেউ বা প্রদীপ জ্বেলে পড়তে পড়তে আলো না-নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আলোটি নিভিয়ে দিতেন।

এই গুরু বা মহান্ত ছিলেন যেন চৌকিদার। রাত্রিতে না-ঘুমিয়ে সকলের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। আশ্রমের কোথায় কী হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন। তাই বলা হয় গুরু হলেন যেন নাপিত ও ধোপা। সব দিকে উপযুক্ত করে দিয়ে যথার্থ সাধু হওয়ার জন্য অন্তরের সমস্ত মলিনতা তিনি ধৌত করে দেন। তাই তিনি অবধূত।

এ দিকে সেই ব্রহ্মচারীর অবস্থাও খুব সঙ্গিন। এতদিন বাড়িঘরে শুধু আরাম করে এসেছে, অথচ এখানে এসে এত কষ্ট। তার উপর আবার আশ্রমে ভাল ভাল খাবারও জোটে না। একদিন রাত্রিতে মন্দিরে শিবজীকে হাওয়া করতে করতে নিজের খুব গরম লাগল। মন্দিরের ভিতরে সে ঘেমে অস্থির হয়ে গেল। তাই দরজার বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসে সে দাঁড়াল। বাইরে বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। সেখানে বসে আরাম করতে করতে এক ফাঁকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মন্দিরের দরজা খোলাই পড়ে রইল।

এ দিকে মহান্ত ঘুরতে ঘুরতে তাকে ঐ ভাবে দেখে কিছু না-বলে মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে শিবজীকে হাওয়া করতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ব্রহ্মচারীর ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে মন্দিরে ঢুকতে গেল কিন্তু দেখতে পেল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন সে ভাবল—দরজা কে বন্ধ করবে? নিশ্চয়ই শিব আমার উপরে রাগ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার খুব ভয় হল এই ভেবে যে, গুরুদেব যদি এই কথা জানতে পারেন তাহলে তিনি তো খুব রেগে যাবেন। ভোরবেলা মঙ্গলারতির আগে গুরু দরজা খুলে দিলেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুর কাছে গিয়ে সেই ব্রহ্মচারী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদেব ভাবলেন এই কাজ তার মনঃপূত হয়নি বোধহয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল? তোমাকে তাহলে অন্য একটা কাজ দেব?

ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মচারী বলল—শিব বোধহয় আপনাকে সব বলে দিয়েছেন?

গুরুদেব—হ্যাঁ বলে দিয়েছেন।

ব্রহ্মচারী—গুরুদেব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কোনও কাজেই অভ্যস্ত নই, আমি কী করে করব?

গুরুদেব—তাতে কী হয়েছে? আমিও খুব ছোটবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমারও কোনও কাজের অভ্যাস ছিল না। প্রথমে আমার কী কাজ করতে হয়েছে জান? মঙ্গলারতি শুরু হবার আগেই গোয়ালঘর পরিষ্কার করে, গোবর কুড়িয়ে সব জড় করে রাখতে হতো। এই কাজ আমার সাত বছর করতে হয়েছে।

তারপর আমাকে দেওয়া হয়েছে ঘর ঝাঁড়ু দেবার কাজ। সেই কাজ করেছি প্রায় চার বছর। তারপর আমাকে করতে হয়েছে বাসন মাজার কাজ। সাধুদের সব ব্যবহৃত বাসন আমাকে মাজতে হয়েছে পাঁচ বছর। মন্দিরের কাজ করেছি তিন বছর। গুরুর পদসেবা করেছি আট বছর। আর গুরুর সঙ্গে ঘুরেছি এগার বছর।

তারপর গুরু একদিন বললেন—তুই এখান থেকে চলে যা। শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। বললাম—এত বছর এখানে থাকার পর কী অপরাধে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

কিন্তু গুরু কোনও কথা বললেন না। সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গুরু আরও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে মারতে আসেন। তখন নিজের প্রতি ধিক্কার এল এই ভেবে যে আমার এই দেহ গুরুসেবার উপযুক্ত নয়। ভাবলাম, এই দেহ রেখে আর লাভ নেই বরং নাশ করে দেওয়াই ভাল। এই ভেবে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে

আত্মহত্যা করতে গেলাম। এমন সময় গুরু এসে আমাকে ধরে ফেললেন। তাঁকে বললাম— তোমার কাজে তো এই দেহটা আর লাগবে না, তাই শেষ করে দিচ্ছি।

গুরু বললেন—কে বলেছে কাজে লাগবে না? আরও বেশি কাজ আমার জন্য তোমাকে করতে হবে। এতদিন তুমি আমাকে দেহের বাইরে থেকে সেবা করেছ, এবার অন্তরে রেখে করতে হবে। আমার সব তোমাকে দিলাম—দেখো কিছু যেন নষ্ট না-হয়।

তারপর গুরু নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিলেন যে এই সময় গুরুর ভজন, পরমগুরুর ভজন, পরাপরমগুরুর ভজন করবে। তারপর এই দেহ ছেড়ে যখন চলে যাব তখন কয়েকজন মহাত্মা ও গৃহীভক্ত আসবেন তাঁদের কাজ তাঁদের ঠিকমতো করতে দেবে।

ব্রহ্মচারী তাঁর গুরুর কাহিনী শুনে ভাবল—তাহলে তো প্রথমে যে আশ্রমে মহান্ত আমাকে ঘুঁটে দিতে বলেছিলেন ও গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে বলেছিলেন সেখান থেকে চলে না-এলে এতদিনে আমার অনেক উন্নতি হয়ে যেত। এতগুলি বছর ঘুরে বেড়িয়ে আমি বৃথা সময় নষ্ট করেছি। তখন তার মনে খুব অনুশোচনা জাগল।

কাজেই দেখা যায় যে কর্মের মাধ্যমে চিত্ত শোধনের একান্ত দরকার। বাইরে থেকে মন গুটিয়ে আনলে মনের একাগ্রতা বাড়ে। তাই সেবা, ভজন, কর্তব্য, কর্ম প্রভৃতি শেষ না-করে সংসার ত্যাগ করলে অন্ধকারে ঘুরে মরতে হয়।

মানুষ সাধারণত নিজের ত্রুটিগুলি শোধন না-করে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। অপর একজনকে বড় দেখলেই ঈর্ষা করে; কিন্তু অতীত ইতিহাস জানার চেষ্টা করে না। বৈরাগ্য না-হলে সংসার ত্যাগ করে চলে এসে শুধু ভাল খাবার ও ভাল থাকার সন্ধানই করতে হয়। কে কী বলে বা না-বলে এ সব দিকে দৃষ্টি থাকলে বা এ সব গ্রাহ্য করলে সংসার ত্যাগ করা প্রহসন মাত্র। চিত্ত মলিন হয় নানা কারণে। গুরুকৃপায় তা আবার শুদ্ধ হয়।

গুক সর্বত্র বিদ্যমান—এই সত্য যিনি ধরিয়ে দেন তিনিই হলেন যথার্থ সদ্‌গুরু। তিনি বিশ্বাতীত, গুণাতীত। তিনি অমূর্ত হয়েও মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেন। তিনি যেখানেই থাকুন স্মরণমাত্র তাঁর স্পর্শ মেলে।

কয়েকমুহূর্ত চোখ বুজে নীরবে বসে থেকে ভাবাবেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গান গাইলেন—

ওঁ সচ্চিদানন্দসাগর ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
অন্তর্যামী নারায়ণ বাসুদেব নারায়ণ
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
বিশ্ব-আত্মা বিশ্বপ্রাণ সর্ব জীবনের অধিষ্ঠান
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
বিজ্ঞান আত্মা অমৃত অক্ষর ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
শিবদুর্গা শিবরাম আত্মারাম প্রাণারাম
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
লক্ষ্মী বিষ্ণু সীতারাম রাধাকৃষ্ণ রাধাশ্যাম
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।

প্রজ্ঞান আত্মা পরাৎপর সত্য জ্ঞান সুন্দর
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
ইষ্ট গুরু ভগবান নিত্য স্বয়ং বর্তমান
গুরু নিত্যবর্তমান গুরু নিত্যবর্তমান।। [৯।৩।৭৬]

সদ্‌গুরু বা ব্রহ্মগুরুর পরিচয়

যথার্থ গুরু কে? জনৈক ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন, এক কথায় সদ্‌গুরুর পরিচয় সম্বন্ধে বলা যায়—জড়বোধ থেকে আরম্ভ করে চৈতন্যের বোধ পর্যন্ত যত বৃত্তি আছে সে সব বৃত্তির ঘনীভূত যে মূর্তি তা-ই হল আসল সদ্‌গুরু মূর্তি। গুরুবোধ হল সেই বোধ যেখানে সব বোধ মিশে থাকে, যেখানে কোনও মিশ্রণ নেই এবং যা সব কিছুকে জ্যোতিষ্মান করে পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে দিতে পারে।

আপন ইষ্টগুরু আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ বিদ্যমান। তিনি সব সময় সর্বদাই সচেতন যে, সকলে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। দেশ-কাল-পাত্রের বাধা অতি তুচ্ছ। নামই হল তাঁর দেহ। 'গুরু' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়; কারণ জীবের অন্তরাত্মা হল অখণ্ড, অমৃত, অক্ষর। আত্মগুরু খণ্ড নয়। বাইরে গুরুর একটা বিশেষ রূপের প্রয়োজন হয় সেই বোধ অনুভব করার জন্য। রূপ-নাম-ভাব ছাড়া বোধের ব্যবহার বা অনুভূতি হয় না। শিব রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি সব নাম একই বোধের দ্যোতক বা বাচক।

কথা কয়টি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গান গাইলেন—

প্রণাম অভিষেক মোর সত্তার আমি প্রজ্ঞান
নাম প্রাণ মোর স্বভাববিজ্ঞান।
হৃদাকাশ প্রেমঘন আনন্দনিধান অধিযজ্ঞ কেন্দ্রসত্তা সর্ব অধিষ্ঠান।।
অন্তর মাতা (ক্ষেত্র) ঈশ্বর আত্মা জীব অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান
সচ্চিদানন্দগুরু অখণ্ড মহাপ্রাণ।
নির্গুণ সগুণ স্বভাব সমান বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্‌ সর্বজ্ঞ মহান।।
বহিরঙ্গ ক্ষরভূত আবরণ অজ্ঞান
কার্যকারণ কর্তৃত্ব অহংকার অভিমান
বিকারধর্মী প্রকাশ সব তাঁর উপাদান অনিত্যের গর্ভে প্রাণ মোর নিত্যবিদ্যমান।।
নামের বিজ্ঞান মনে করে অনুধ্যান
অন্তরে পায় জীব অমৃতের (স্বরূপের) সন্ধান।
শুদ্ধ জ্ঞান ভাব যে তাঁর স্বভাব প্রধান নামের জ্ঞানে তাঁর স্বরূপে অবস্থান।।

গানটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এ-ই হল ব্রহ্মগুরুর পরিচয়।

এবার আরেকটি গান ধরলেন—

ওঁ গুরু ব্রহ্ম নারায়ণ গুরু আত্মা নারায়ণ
গুরু সত্য নারায়ণ গুরু ইষ্ট ভগবান।।
গুরু ব্রহ্ম গুরু আত্মা গুরু অক্ষর ঈশ্বর ভূমা
গুরু স্ববোধ নিরঞ্জন গুরু ইষ্ট ভগবান।।
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ
নিত্যবর্তমান স্বয়ং গুরু ইষ্ট ভগবান।।

গুরু স্বয়ং সত্তা-শক্তি গুরু স্বয়ং পুরুষ-প্রকৃতি
যুগলতত্ত্ব গুরু স্বয়ং গুরু ইষ্ট ভগবান।।
গুরু সত্য জ্ঞান অনন্ত নিত্য শাশ্বত অমৃতত্ব
গুরু নির্গুণ সগুণ সমান গুরু ইষ্ট ভগবান।
গুরু সচ্চিদানন্দ স্বয়ং নিত্য পূর্ণ স্বরূপ আপন
অখণ্ড প্রজ্ঞানঘন গুরু ইষ্ট ভগবান।।

গানটি শেষ হলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলতে শুরু করলেন—'ভগ' মানে প্রাণ। এই প্রাণ ঐশ্বর্যরূপে ছড়িয়ে পড়ে। 'বান' মানে প্রাণের কেন্দ্র। প্রতি প্রাণের কেন্দ্রে রয়েছেন যিনি, তিনিই ভগবান।

গুরু হলেন তিনি-ই, যিনি ভগবানকে ছাড়া আর কিছু চান না। সব কিছুর মধ্যে থেকে তিনিই সব কিছু ধরে বসে আছেন। সদ্‌গুরু নিত্যবর্তমান। 'সৎ' মানে সর্ব প্রকাশমান। সব প্রকাশ করে যে সে-ই হল আপনবোধ। 'আমি-র আমি'-কে যে ভজন করে সে-ই হল চতুর। তার মতো চতুর দুনিয়াতে আর কেউ নেই। 'আমি-র আমি', হল আত্মারাম পুরুষোত্তম ভগবান। তিনিই হলেন স্বানুভবদেব। ভক্ত প্রভুকে গান শোনায়—

আপনি গাও প্রভু আপনার মহিমার গান
আপন আনন্দে হয়ে মগন আপনি কর শ্রবণ।।

সবই তাঁর ভজন। শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ও আত্মগুরুর মাধ্যমে সব ভজন ভজনেশ্বরের কাছেই পৌঁছায়।

সদ্‌গুরু শিষ্যকে অনেক সময় বলে দেন—স্মরণ মাত্র তুমি সব সময় আমাকে পাবে। এ কথার তাৎপর্য হল এই যে সদ্‌গুরু চান না শিষ্য চিরকাল তাঁর এই দেহরূপ ছায়ার পিছনে ঘুরুক। বোধস্বরূপ অর্থাৎ সদ্‌গুরু বোধ দিয়ে দীক্ষা দেন। গুরু ও ইষ্ট হলেন যেন হাতের এপিঠ ও ওপিঠ।

সকলের ইষ্ট হলেন তিনিই—যিনি সকলের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে বিরাজমান। সদ্‌গুরু নাম দিয়ে যে দীক্ষা দেন তার দ্বারা ঐ বোধকেই প্রকাশ করে দেন। এই কথা মনে থাকলে গুরুকে দেখা, জানা বা অনুভব করার জন্য যে-সকল চেষ্টা করা হয় বা বিভিন্ন স্থানে ছোটাছুটি করে বেড়ানো হয়, তা আপনা থেকেই কমে যায়। [১৪।৩।৭৬]

বোধস্বরূপ সদ্‌গুরু ভজনের ফলশ্রুতি

সদ্‌গুরু সর্বব্যাপী। তিনি সর্বচরাচর জুড়ে আছেন। সেই জন্য গুরুভজন দিয়ে ঈশ্বরের ভজন করলে ভজনের তাৎপর্য ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। গুরুর পরিবর্তে হরি বা রাম বা জ্ঞানস্বরূপকে অবলম্বন করেও ভজন করা যায়। সবগুলি ভজন একই প্রকার ফলপ্রদ। বোধস্বরূপের বা জ্ঞানস্বরূপের ভজন হলে হয় বোধের সংসার। অথবা বোধ দিয়ে সব কিছুর ব্যবহার হলে হয় 'বোধের সংসার'[১], অন্য কিছু যুক্ত করলে হয় অজ্ঞানের সংসার। [২১।৩।৭৬]

বিবেকবিচারের বৈশিষ্ট্য

দীক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ না-হলে শুধু বিবেকবিচারের মাধ্যমেও অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় এবং সুস্থ দেহ-প্রাণ-মনের অধিকারী হওয়া যায়। আপন অন্তরমনের যে নির্দেশ তা-ই গুরুবাণী বা প্রজ্ঞাবাণী। এই নির্দেশ মন সব সময় ধরতে পারে না বলে মনের বিকল্প ব্যবস্থা এসে পড়ে এবং সংশয় থাকে বলে ভুলের সৃষ্টি হয়। [২৩।৩।৭৬]

১। বোধের সংসার—অখণ্ড সমবোধে যেখানে সব কিছুর ব্যবহার হয় অর্থাৎ সমত্বই যেখানে সারবস্তু।

গল্পের মাধ্যমে গুরুকৃপার তাৎপর্য

অনেক দিন আগে এক ভদ্রলোক কথায় কথায় বলেছিলেন— অনেক মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি, অনেক আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সব জায়গায় ঘুরে ফিরে মনে হয়েছে যে শুধু মহাপুরুষদের কাছে গেলেই হয় না বা তাঁদের সঙ্গ করলেই হয় না। আমাদেরও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় যোগ্যতা না-থাকলেও আমরা আশা করি অনেক, আর তা না-পেলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি।

আসল মহাপুরুষদের কাছে যারা যায় তাদের অবস্থা হল ঠিক ছাগলছানার মতো। ছাগলের চারটে ছানা হয় কিন্তু দু'টি বাঁট থাকে। বড় দু'টি ছানা দু'টি বাঁট দখল করে থাকে; আর ছোট ছানা দু'টি লাফালাফি করে। কিছুতেই তাদের সরিয়ে দুধ খেতে পারে না। আমরা হলাম তা-ই। একজন দু'জন বাঁট দু'টি দখল করে বসে আছে।

তাকে তখন বলা হয়েছিল, সমস্ত নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্টকে দেখাই হল ঈশ্বরদর্শন। সেই জন্য 'বেদনা'[১] হল 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) কাছে বেদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি খুলে গেলে প্রতিবন্ধক বলে আর কিছু থাকে না।

ভদ্রলোকের উপমাটি খুব হাল্কা হলেও কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেদনা থেকে পালিয়ে যাওয়াও যায় না এবং make up-ও দেওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হল—মহাপুরুষই বা কে, আর ছাগলছানাই বা কে? এবং যে লাফায় সে-ই বা কে? ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হল—তুমি কোনও দলে পড়ো?

সে বলল—লাফালাফির দলে।

তাকে তখন বলা হল— তোমার প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে তোমার নিজের বক্তব্যই তো মেলে না। লাফাল যে সে তো নিজে লাফায়। তাহলে তোমার যোগ্যতা নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে বাঁট দু'টো দখল করতে হবে। বলতে পার যে বাঁট দু'টি তো দখল হয়েই আছে। তবুও ছোটাছুটি না-করে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। একদিন তুমিও পারবে, তখন আর কেউ হয়তো পারবে না।

অহংকার-অভিমানে গুরুর কৃপালাভ হয় না

গোলবারান্দায় উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা, এবার তোমরা বল যে বাঁট দু'টো কী, আর ছাগলছানাই বা কী? সকলেই চুপ করে বসে আছে, কেউ কোনও উত্তর দিল না। সকলকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরই বললেন, ভগবান তোমাদের মধ্যে ঢুকতে চাইলে তোমরা কী সহজে ঢুকতে দেবে? এই জন্য গুরুকে বা ভগবানকে কৌশলে ঢুকতে হয়। কারণ ভগবান রাজবেশে এলে মানুষ ভয় পায়, ভিখারীর বেশে এলে তাড়িয়ে দেয় আর গুরুবেশে এলে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়ে দেয়।

সেই জন্য আসল গুরু ঢুকে যায় শব্দব্রহ্মের মধ্য দিয়ে। যতক্ষণ অহংকার অভিমান থাকে ততক্ষণ সে মনে করে আমি যোগ্য বা উপযুক্ত। সুতরাং আমার প্রাপ্য আমি পাব না কেন? অহংকার, অভিমান সরে গেলে তার অনুভব হয় যে যোগ্যতাও আমার নয় এবং অযোগ্যতাও আমার নয়। তখন তার কাছে বাঁট দু'টো

১। বেদনা—বেদনা শব্দের মর্মার্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেন— বেদনা হল, বেদন + আ। বেদন মানে অনুভূতি, বোধ বা জ্ঞান এবং 'আ' হল আরম্ভ, আগত, আবির্ভাব, উদয়, প্রকাশ, আশা, আর্তি, আবেগ ও আনন্দ। বেদন আনন্দযুক্ত হলে পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও আনন্দের যুগল মিলনের ফলে প্রেমের অভিষেক হয়। প্রথমে বেদনা, মধ্যে বেদন এবং অন্তে বেদস্বরূপ। এই তিনের রহস্য 'বেদনা' শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।' অন্তে বেদস্বরূপ আত্মাই শুধু স্ফুরিত হয়।

ready হয়ে থাকে। যতক্ষণ যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মধ্যে লড়াই চলতে থাকে ততক্ষণ অহংকার, অভিমান পূর্ণমাত্রায় থাকে।

বাঁট দু'টি হল ভগবানের দু'টি চরণ। রাতুলচরণ পাবার আশায় ভক্ত ভজনপূজন করে। ভক্ত ভজন করে পায় গুরুর দু'টি চরণ। দু'টো বাঁটের মধ্যে যেমন একই দুধ পাওয়া যায়, সে রকম গুরুর দু'টি চরণে একই সমরস অর্থাৎ স্ববোধানন্দ আছে।

বাবার দেওয়া সম্পত্তি সন্তান পায় কিন্তু ব্যবহার না-জানা থাকলে পেয়েও নষ্ট করে ফেলে, কোনও লাভ হয় না। একই ভাবে গুরুর চরণ পেলেই বা কী? গুরুকৃপা বলতে কী বোঝায় এবং ক'জনই বা তা পায়? বলতে পার—সবাই পায়। কিন্তু দেখা যায় কেউ অনেক বড় হয়ে যায়, আবার অনেকে যেমন ছিল তেমনই থাকে। প্রশ্ন উঠবে—গুরু কী তাহলে পক্ষপাতিত্ব করেন? না, তা নয়।

আসল কথা, গুরুবাক্য শ্রবণ করে মনে রেখে তা আচরণ করতে হয়। তত্ত্বের দৃষ্টিতে মনন ও আচরণ হল গুরুর দু'টি চরণ। বিজ্ঞানের বা আচরণের অভাবে জ্ঞান বা মনন কাজে লাগে না। গুরুর বাক্য মনে না-থাকলে ব্যবহার হয় না। আবার আচরণ না-করে শুধু মনে রাখলেও কোনও লাভ হয় না।

গুরুবাক্যকে স্মরণে রেখে শ্রবণ অনুযায়ী তা আচরণ করাই হল গুরুকৃপা। অর্থাৎ যা করে পেতে হয় তাই কৃপা। যে-ভাবে গুরু নির্দেশ দেন সে-ভাবে পালন করতে হয়। তাঁর দেওয়া বোধ নিজের মধ্যে সে-ভাবে খেললেই কৃপালাভ হয়। এ-ই হল কৃপা শব্দের যথার্থ তাৎপর্য। অনুভূতিতে যতক্ষণ না-খেলে ততক্ষণ বোঝাও যায় না বা বলাও যায় না। [৬।৪।৭৬]

গুরুবন্দনার বিশেষ নির্দেশ

গুরুবন্দনা করা খুব কঠিন। সব কিছুকে গুরুবোধে ধরতে হয়; কারণ, গুরু আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। কিন্তু প্রতিপদে গুরুকে আঘাত করে তাঁকে কী ভাবে ধরবে? গুরু বোধস্বরূপ। বোধস্বরূপকে না-দেখলে গুরুকে দেখা যায় না। ব্যক্তি গুরুকে প্রীত করলেই সমষ্টি গুরু প্রীত হয় না এবং গুরুর প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি আরোপ করলে গুরুপূজা হয় না। কিন্তু বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে গুরুর স্থূল রূপকেই দেখা যায়। শক্তি[১] set না-হলে বিকারগুলি থেকেই যায়। শক্তির বিকার দূর হলে ভোগ চলে যায় এবং ভক্তি আসে।

[১১।৪।৭৬]

গুরুসঙ্গ ও গুরুকৃপার তাৎপর্য

যে বোধ অসৎ থেকে সৎ-এ, লঘু থেকে গুরুতে এবং সীমা থেকে অসীমে নিয়ে যায় তা-ই হল গুরুবোধ। যা অসীম থেকে বিভক্ত করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিয়ে আসে তা লঘুবোধ। লঘুবোধে হয় অশুদ্ধ ভক্তি। অশুদ্ধ ভাবকে শুদ্ধ করার উপায় যে-ভাবে পাওয়া যায় তাই গুরুকৃপা। যে ভাব ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে টেনে কেন্দ্রগত এক-এর দিকে নিয়ে যায়, তা-ই গুরুভাব।

সদ্‌গুরুসেবা হল কেন্দ্রবোধের সেবা এবং লঘুর সেবা হল মনের পরিধির সেবা। 'আমার ঠাকুর' বললে ইন্দ্রিয়ের সেবা করে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়। 'ঠাকুরের আমি' বললে অখণ্ডের বোধ আসে। কোনও অভাব থাকে না।

১। শক্তি অর্থে এখানে ভাববৃত্তি ও প্রাণের গতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষয়-আসক্তির জন্য এই গতি বহির্মুখী ও চঞ্চল থাকে। তাই হল অশুদ্ধি ও অজ্ঞানপ্রসূত অযোগ্যতা। আবার উভয় বৃত্তিকে গুরুর নির্দেশে অন্তর্মুখী করলে তা সংযত হয়, শান্ত হয় ও সমাহিত হয়। তাহলেই এ বৃত্তি দু'টি শুদ্ধ ও সত্যবোধের যোগ্য হয়।

সৎসঙ্গের বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে না-শুনলে সদ্‌গুরুর কৃপা পাওয়া যায় না। সদ্‌গুরুর বিধি-নিষেধগুলি পালন না-করলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কিছু করতে পারেন না। গুরুশক্তির উপরে আর কোনও শক্তি নেই আবার গুরু ভাববোধের উপরেও আর কোনও শ্রেয় ভাববোধ নেই। গুরুর এক অংশে বিরাজ করেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। গুরুভজনে অতি নিকৃষ্টকেও গুরুবোধে মানতে হয়। তা না-হলে গুরুভজনের ফলস্বরূপ গুরুবোধের প্রকাশ হয় না।

অসৎকে ত্যাগ করে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার-ই হয়েছে যথার্থ সন্ন্যাস। কথার অর্থবোধ খেললেই পাওয়া যায় গুরুকৃপা। তখন অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হয়। অর্থাৎ যে কথার দ্বারা অজ্ঞানীর জ্ঞান হয় তাই গুরুকৃপা।

[১৩।৪।৭৬]

সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের আলোর ফল পূর্ণতা লাভ

All acceptance-এর ফল পেতে হলে সদ্‌গুরুর দেওয়া torchlight[১]-টি ব্যবহার করতে হয় এবং torch জ্বালানো ও নিভানোর ব্যবহারপদ্ধতিরও শিক্ষা থাকা চাই। সদ্‌গুরু torchlight দিয়ে দেন এবং বলে দেন কী ভাবে ব্যবহার করলে অন্ধকারের মধ্যে চলা যায়। ভক্ত বা আশ্রিত সন্তান কোনও একটির ব্যবহার ভুল করলে আলো পাবে না।

Torchlight হল সদ্‌গুরু স্বয়ং। তাঁকে ব্যবহার করতে গেলে কোথাও না কোথাও ভুল হবেই। হয়তো torch-এব ব্যাটারী খুলে রাখা হয়েছে, তা আর ভরা হয়নি। তখন আরেকজন দক্ষ লোকের কাছে গিয়ে ঠিক করে আনতে হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এ রকম ভুল করলে অন্য গুরুর কাছে যেতে হয়।

জীবনে torch-এর উপমা প্রয়োগ করলে দেহ হয় case, প্রাণ হয় battery, মন হয় সুইচ, বুদ্ধি হয় bulb। এর কোনও একটির ব্যবহারদোষে পূর্ণতা লাভ হয় না। এই জন্য শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বারবার বলা হয়। 'All Divine for All Time, as It Is'-এর জন্য যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন তা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ব্যবহার করা যায় না। এর সঙ্গে নিত্যকালের সম্বন্ধ সদ্‌গুরুগণই ধরিয়ে দেন। সেই জন্য কালের এবং কালীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

মহাকাল ও মহাকালী দেবদেবীর পর্যায়ে পড়েন না। তাঁরা অনেক উর্ধ্বে! মহাদেব হলেন মহাকাল বা ব্রহ্ম স্বয়ং। ব্রহ্মশক্তি বা মহাকালী কালের বক্ষে অনাদিকাল থেকে নৃত্য করে চলেছেন। কালীশক্তির সাহায্য ছাড়া জীবনে একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলার উপায় নেই। [১৮।৫।৭৬]

দিব্যমানবের মহিমা

জগতে যখন একজন সদ্‌গুরুর উদয় হয়, তখন জগৎ ধন্য হয়। তখন সত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। সৎ স্বয়ং গুরু। ব্যক্তিত্ব হল তাঁর মাধ্যম। তাঁরা Divine person। আকার তাঁদের মানুষের মতন। তা না-হলে মানুষ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। যেমন হাতি ও মাহুত উভয়ে নারায়ণ হলেও মাহুত নারায়ণের কথাই আগে শুনতে হয় বা মানতে হয়। ভগবান মানুষের কাছে মানুষের বেশে আবির্ভূত হয়ে দিব্যভাব জাগিয়ে দেন। এঁরা হলেন অতিমানব বা Superman বা Divinized soul। এঁদের বিশেষত্ব হল এঁদের জীবন ঈশ্বরীয় ভাববোধে প্রতিষ্ঠিত এবং তদ্‌বোধে পরিচালিত।

১। Torchlight—সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের আলো

স্বানুভূতির তাৎপর্য

'স্বানুভূতি'-তে হয় আমির বোধ বা আত্মার বোধ। এই 'নৈর্ব্যক্তিক আমি' হল নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। ব্যক্তির আমি হল বিকারী ও বদ্ধ। ব্যক্তির আমিকে বা সসীম আমিকে শুদ্ধ করে বৃহৎ বা ভূমা নৈর্ব্যক্তিক আমির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল সাধনার উদ্দেশ্য। সৎ-এর কথা দিয়ে সাধনা শুরু হয়। সৎ-এর ভাব দিয়ে ভাবনা করে সৎ-এর বোধ দিয়ে সৎ-এর সঙ্গে মিশে যেতে হয়। সৎ-এর কথা হল গুরুবাক্ বা মহাবাক্য। তা অনুসরণ করলে সৎ-এর ভাব আপনিই আসে।

সদ্গুরুর মহিমা

পৃথিবীতে সদ্গুরুগণ নিরন্তর সকলকে আহ্বান করেন—'বিশ্বের আস্বাদন তো করেছিস অনেক কাল, এবার বিশ্বের অন্তরে যে অমৃতসুধা আছে তা পান কর।' যতদিন মহাপুরুষগণ থাকেন ততদিন তাঁদের আহ্বানও থাকে। তাঁদের কাছেই অমৃতের সন্ধান বা স্বঘরে ফিরবার চাবি পাওয়া যায়। তাঁরাও তাঁদের গুরুর কাছ থেকে অমৃতের সন্ধান পেয়ে তা আস্বাদন করেছেন। তাঁরা আবার পরবর্তীদের দিয়ে যান। এ ভাবেই গুরু পরম্পরায় ঋষিযুগ থেকে শুরু করে আজও এই অমৃতসুধা পরিবেশিত হয়ে চলেছে মহামানবদের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

সংসারে কেবল দুঃখই আছে—এ কথা মানা যায় না। দুঃখ ভগবানের জন্যই রেখে দিও। দুঃখে যখন মানুষ তাঁকে ডাকে, তখন তিনি এসে দুঃখের ভার লাঘব করেন। মানুষ দুঃখের বোঝা বইতে পারে না। দুঃখে ম্রিয়মান না-হয়ে এবং অভিভূত না-হয়ে জীবনে চলার কৌশলটি সদ্গুরুগণই শিখিয়ে দিয়ে যান। সদ্গুরুর সঙ্গ যে পায় সে ভাগ্যবান। সৎ-এর আহ্বান যেখান থেকেই আসুক না কেন শুদ্ধ চিত্তের সাধক সেখানেই ছুটে যান।

সত্যের আহ্বান শুনে সৎ-এর সন্ধানে মানুষ ছুটে যায় সাধুসন্তের পিছনে। তারা প্রাণের টানেই যায়। উভয় পক্ষেরই আকর্ষণ থাকে। যে আকর্ষণ করে এবং যাকে আকর্ষণ করা হয় উভয়ের মধ্যে এক পরমতত্ত্ব নিহিত আছে।

গুরুবোধের অনুশীলন বা সাধনা হল আত্মা, ব্রহ্ম, ইষ্ট গুরুর সাধনা। এই সবগুলো শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা। মন দিয়ে তাঁর সেবা করাই হল সাধনা ও সংসার পথের নির্দেশ। তাহলেই একটিমাত্র স্তরে সাধক বাস করতে পারে। কারণ চৈতন্য সর্বকালে, সর্বভাবে সমভাবে বিদ্যমান। সেই জন্য তাঁকে অখণ্ড ভূমা সমরসসার বস্তু, সচ্চিদানন্দলক্ষণা বলা হয়। কাজেই গুরুসত্তায় সত্তাবান হয়ে সেই সাধক সর্বত্র বিরাজ করে। এই বিষয়ে সচেতন হলে হারিয়ে যাওয়া আপনার বিরাট স্বরূপ পুনরায় অনুভূত হয়। নিজেকে খুঁজে পাওয়া এবং গুরুকে খুঁজে পাওয়া এক অর্থবোধক। ব্যষ্টি তখন সমষ্টিকে খুঁজে পায় বলে ব্যষ্টিভাব আর থাকে না।

সদ্গুরু হলেন সত্যস্বরূপ। গুরুবাক্ই কেবল গুরুভাব জাগ্রত করতে পারে। তার নাম মহামন্ত্র। তা প্রাণের সনাতন ধর্ম। হৃদয়ে এই নাম নিরন্তর ধ্বনিত হয়। সদ্গুরুগণ এই নামের সঙ্গে যুক্ত থেকে আধার বুঝে নামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দিয়ে দেন। তারপর নামের মূল বীজমন্ত্র দেন। তার আগে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে অন্য মন্ত্র দিয়ে সাজিয়ে নেন। তারপর 'অজপা-জপ' আপনি-ই চলে। তখন যে অপার আনন্দ পাওয়া যায় তা অতুলনীয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।

বিস্মৃত আত্মস্মৃতিকে জাগিয়ে দেবার জন্যই সদ্গুরুর প্রয়োজন। [২৩।৫।৭৬]

আধ্যাত্মিক বিবাহ কাকে বলে? এবং তাঁর তাৎপর্য

নিজেকে বাদ দিয়ে সব নয় এবং সকলকে বাদ দিয়েও নিজে নয়। নিজেকে দেখতে হয় ও জানতে হয় সর্ববস্তুর মধ্যে এবং সর্ববস্তুকে দেখতে হয় ও জানতে হয় নিজের মধ্যে। অখণ্ডকে সবার মাঝে এবং সবাইকে

অখণ্ডের মাঝে দেখার নামই হল স্বানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি[১]। অখণ্ড থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না; বাদ দিতে গেলে আত্মানুভূতি আর হয় না। অথচ মন পুরোটা নিতেও চায় না, তার ফলে শান্তিও পায় না।

এই প্রসঙ্গে তোমরা একটি গল্প শোন—কোনও এক পাহাড়ে এক নির্জন স্থানে এক সাধু থাকতেন। তাঁর কাছে একবার এক গৃহী গিয়ে উপস্থিত হল। সে সেখানে কিছুদিন থেকে সাধুর খুব সেবা করল। তারপর সংসারে ফিরে আসবার সময় সে সাধুকে প্রণাম করতে গেল। সাধু তাকে আশীর্বাদ করলেন।

গৃহী তাঁকে বলল—বাবা, আমার তো কেউ নেই, বিয়ে-থাও করিনি; এবার ভাবছি ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। এ বিষয়ে তুমি আমায় আশীর্বাদ কর।

সাধু তার কথা শুনে একটু হেসে বললেন—বিয়ে করবি? বেশ, বলেই তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন—একটা কথা মনে রাখিস। বিয়ে করবি তাকেই যার কোনও দেহ নেই। গৃহী ভাল করে কথাটির তাৎপর্য না-বুঝেই দেশে ফিরে এল। সম্বন্ধ খোঁজাখুঁজি হতে থাকে, কিন্তু সে যখনই মেয়ে দেখতে পায় তখনই তার মনে পড়ে সাধুর কথা।

সে ভাবে—এর তো দেহ আছে, একে তো বিয়ে করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সে দেখল যে তার বিয়ে করা আর সম্ভব হচ্ছে না। সে খুব বিব্রত বোধ করে, তার ফলে সে শান্তিও পায় না।

তখন সে সেই সাধুর কাছে গেল এবং বলল—বাবা, তুমি যে-রকম বলেছিলে আমি তো সে-রকম পাত্রী কাউকে খুঁজে পেলাম না।

সাধু বললেন—পেলি না? ঠিক আছে, তুই বসে বসে এই নাম জপ কর। এই কথা বলে তাকে জপে বসিয়ে দিলেন এবং কতক্ষণ জপ করতে হবে তাও বলে দিলেন। তারপর বললেন—জপ শেষ করে যাকে দেখবি তাকেই বিয়ে করবি।

জপ করতে করতে গৃহীর এক জ্যোতির্ময়ী নারীর দর্শন হল। তখন সে ভাবল এর স্থূল মূর্তি কোথায় পাব? এর কাছ থেকে কথাও ভেসে আসছে অথচ একে তো ধরতে পারছি না।

গৃহী মহাত্মার কাছে গিয়ে সব কথা বলতেই তিনি বললেন—ধরতে পারছিস না? এর সঙ্গেই তোর আসল বিয়ে হবে।

গৃহী—এর সঙ্গে বিয়ে কে দেবে?

সাধু বললেন—আমি দেব। তোকে এমন বিয়ে দেব যা কোনও দিন কেউ কাউকে দেয়নি। তিনি বিয়ের সব আয়োজন করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম তিনি যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞে তিনি শিষ্যের জীবন আহুতি দিলেন প্রথমে। তারপর বললেন—সংসারে বিবাহের অর্থ কী? নূতন সৃষ্টি করা তো? নূতন সৃষ্টির মন্ত্র তোকে আমি শিখিয়ে দেব। এই মন্ত্রের শক্তি তোর মধ্যে কাজ করে নূতন সৃষ্টি করবে। ভার্যা মনোরমা দৈহিক সুখের জন্য নয়, দেহাতীত সুখের জন্য।

এই শক্তি আর কিছুই নয়, এ হল সাধুর আত্মশক্তি। সাধু বললেন—তোকে আমার শক্তি বহন করার জন্য দিলাম। যেমন সৃষ্টি করতে চাইবি, তেমনই সৃষ্টি করে দেবে। কিন্তু স্থূলের দৃষ্টি দিস্ না। 'অধ্যাত্ম বিবাহ' কাকে বলে তিনি দেখিয়ে দিলেন। সব দেবদেবী, সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষগণকে এই বিয়েতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি এমন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন যা পৃথিবীর বুকে সচরাচর কেউ দেখেনি। সকলের কাছে তিনি হাত জোড় করে বললেন—তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর যেন আমার মানসপুত্র মানস

১। ঈশ্বরানুভূতি—শাস্ত্র একেই বলেছে আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন এবং সর্বভূতে আত্মার দর্শন। তা অদ্বৈতবোধের জ্ঞাপক।

সরোবরে হংসবলাকার মতো বিশ্রাম করে। তার মধ্যে নিরন্তর যেন হংসধ্বনি বেরিয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলতে থাকেন—গুরুশক্তিকে বহন করার জন্য উপযুক্ত শিষ্যই দরকার। গুরুশক্তি বহন করা যায় তখনই, যখন অন্তরে 'হংসঃ সোঽহম্' ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হতে থাকে। গুরুশক্তি বহন করে চললেই সংসার সমসারে[১] পরিণত হয়। সেই শক্তি বহন করতে না-পারলে মানস সরোবরে বিরাজ করা যায় না বা হংসদেব হয়ে সোঽহং মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুক্তির আস্বাদন করা চলে না।

শয়নে-স্বপনে ও প্রতি শ্বাসে শ্বাসে যখন হংসধ্বনি বেজে ওঠে তখনই সে মানস সরোবরে পরমহংসরূপে বিরাজ করে। হংসের রূপটি হল শুভ্র শ্বেতবর্ণ। প্রজ্ঞান হল তার মস্তক। জ্ঞান ও ভক্তি হল তার দুটি ডানা। প্রেম তার হৃদয়। অনাসক্তি হল তার পুচ্ছ। বিবেক-বৈরাগ্য হল তার চরণ। চৈতন্য হল তার পালক। শান্তি হল তার প্রাণ। আনন্দ হল তার মন। সমতা হল তার ধর্ম। প্রকাশ হল তার কর্ম। নিত্যবর্তমানতা হল তার ছন্দ। এই হল মোটামুটি পরমহংসের পরিচয়।

এই পরিচয় প্রত্যেকের মধ্যে আবৃত হয়ে আছে। তা জাগ্রত হওয়ার জন্য প্রাণ কখনও কখনও উঁকিঝুঁকি মারে কিন্তু ইন্দ্রিয় তাকে দাবিয়ে রাখে। তার প্রমাণ হল পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার বা ভেদদৃষ্টি বা স্বতন্ত্রতা। সেই জন্য ব্রহ্মগুরু সকলকে বিয়ে দেন না। যাকে দেন তাকে পরমহংস তৈরি করে দেন। সে অন্য মানস সরোবরে বিরাজ করে।

এই পরমহংসের বিষয় প্রত্যেকেই তোমরা একটু চিন্তা করে দেখবে। তবে দেখবে, শেষ পর্যন্ত যেন পাতিহাঁসে কেউ পরিণত না-হয়। মনে রাখবে, প্রত্যেকেই তোমরা আপন আপন গুরুর মধ্যেই আছ। প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে ও বৃত্তিতে তিনি বসে আছেন। শরণাগতি নিয়ে যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার মধ্যেই তিনি প্রকাশিত হন। তবে এক সময় আপনিই তিনি প্রকাশিত হবেন শরণাগতি যার মধ্যে পূর্ণ হবে।

গুরু মানে স্থূল দেহ নয়। শুধু দেহ দিয়ে তাঁকে ধরলে সীমাবদ্ধ করা হয়। গুরুস্তবে বলা হয়েছে—

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্ত ব্যোমাতীত নিরঞ্জনং
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

'নাদ' মানে দিব্যশব্দ বা শব্দসমষ্টির মূল, যেখানে মন পৌঁছায় না। 'বিন্দু' মানে জীবাত্মা বা বিজ্ঞান। মন সেখানেও পৌঁছায় না। 'কলা' মানে ইন্দ্রিয়। তাও সেখানে পৌঁছায় না। সে-ই হল আসল গুরু।

গুরুর পরিচয় শোন—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্।।

১। সমসার—সংসার যখন সমবোধের হয় তখন সংসারে 'সং' অর্থাৎ মিথ্যা বলে কিছু থাকে না। সমভাব বা সমবোধই হয় তখন সার বস্তু। এই হল অদ্বৈতবোধের স্থিতি, দর্শন ও অনুভূতি।

বন্দেহহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদ্‌গুরুং
নিত্যপূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্
পরাৎপরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্।।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভম্
স্ফটিক প্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা
তথা আত্মনি চিদাকারে সোঽহমত্যুতম্।।
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং
নিজবোধযুক্তম্ যোগীন্দ্রমীড্যম্ ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌পরমব্রহ্মগুরুং ভজাম্যহম্।।
অজরোঽহমরোঽহং নিত্যনিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ান।।
স্বয়ং জ্যোতি নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বতমচ্যুতম্
অজর অমর অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মাত্মস্বরূপকম্
অনঙ্গ অসঙ্গ অখণ্ড অভঙ্গ
ধ্রুব আনন্দৈকরসং নিত্যাদ্বৈতম্
অনন্তং স্বয়ংপ্রভ স্বানুভব স্বরূপং কেবলম্।।
সচ্চিদানন্দ গুরু ওঁ
সচ্চিদানন্দ পরমাত্ম গুরুওঁ
ওঁ গুরু ওঁ গুরু ওঁ গুরু ওঁ
জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু জয়
ওঁ শিব পরম শিব ওঁ
ওঁ রাম আনন্দ রাম ওঁ
ওঁ কৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণ ওঁ
হরিওঁ হরওঁ সচ্চিদানন্দ গুরুওঁ।।

গুরু কার মধ্যে আছে জান? এই সবটার মধ্যেই। কী স্থূলে কী সূক্ষ্মে তাঁকেই ধরতে হবে। শোন—গুরুপ্রসঙ্গ তো কত বলা হল। চারদিকে তো শুধু তাঁরই মুখ। একদিন ভিতর থেকে কীরকম বেরিয়ে এল জান?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে একটি গান উদ্গীত হল—

পরমাত্মা মোর শিরে
পরমেশ্বর মোর হৃদয়পুরে।
কণ্ঠে মোর জগৎপাতা
বদনে মোর বিশ্ববিধাতা।
হস্তে মোর বিজ্ঞানাত্মা
সর্বদেহে মোর পরমব্রহ্মস্বয়ং
অখণ্ড ভূমা পূর্ণসত্তা।।

মুহূর্ত কয়েক নীরবে চোখ বুজে বসে থেকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলতে শুরু করেন—

এই ভাব কী দিয়ে লুকাব? কোথায় সেই দেহ? সেই জন্য বলা হয় 'এখানে' (নিজেকে দেখিয়ে) কিছু নেই। সেই বিশুদ্ধ বোধস্বরূপের দেহকে পাবে কে? কোথায়? পাবে ভক্ত গুরুবাক্যে। গুরু বাক্যের মধ্য দিয়ে সব বিধান দিয়ে যাচ্ছেন। 'মান তো হবে অমর, আর না-মান তো কর সমর'। সংগ্রাম কর আর তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ কুড়াও। কিন্তু অত সোজা নয়। আশীর্বাদ একদিক দিয়ে আসে, আরেক দিক দিয়ে চলে যায়। গুরু চার স্তরে আছেন। ব্রহ্মাকে গুরুরূপে কয়জনই বা পায়। বহু তপস্যার পর নারদের কৃপায় ব্রহ্মাকে গুরুরূপে রত্নাকর পেয়েছিল। ব্রহ্মাকে গুরুরূপে পেতে কত তপস্যা করতে হয়। তারপর বিষ্ণুকে গুরুরূপে পেতে আরও তপস্যার প্রয়োজন। তারপর মহেশ্বরকে গুরুরূপে পাওয়ার সুযোগ হয়। এখানেও শেষ নয়; তার পরেও আছে পরমব্রহ্মরূপী গুরু।

ভক্তের প্রশ্ন—গুরুকে কেন তাহলে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বলা হয়?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উত্তর দিলেন—অসাক্ষাৎ হবে কেন? তুমিও তো পরমব্রহ্মের মধ্যেই আছ। তাঁর মধ্যে পৃথক করলে তাঁকে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকেই তোমরা আপন আপন গুরুর মধ্যেই আছ। তোমাদের মধ্যেই আবার সেই গুরু স্বয়ং আছেন। সমবোধের অভাবে, আত্মজ্ঞানের অভাবে তোমরা তাঁকে ভুলে আছ। ভজনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ, মনন ও ধ্যান করলে প্রত্যক্ষ আপনবোধে পাবে পূর্ণ করে। [২৫।৫।৭৬]

গুরুই ধরে আছেন সবার হাল। ভিতরে বসে অন্তরগুরু সব সময় দেখছেন। নিজের বক্ষে গুরু, ইষ্টকে বা আত্মাকে মনে রাখাই হল সাধনা। [৬।৬।৭৬]

প্রাণ ও মনের সাধনা

সাধনভজনের দ্বারা গুরুকৃপায় জীব তমোরজোগুণ অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বা সমষ্টি অজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশ লাভ করে। সাধারণ মানুষ যখন গাঢ় নিদ্রায় লীন হয় তখন তার কার্যও সেখানে লীন হয়। আনন্দময় কোষের আনন্দ সে কণামাত্র পায়। গুরুকৃপায় সত্ত্বগুণের বিকাশ হলে সে আনন্দময় কোষে প্রবেশের অধিকারী হয় এবং সমাধি লাভ করে।

প্রাণ ও মনের সাধনা পৃথক পৃথক। প্রাণ হল শ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত। মন প্রাণের দিকে খেয়াল না-রেখে চলতে পারে, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে মন আর চলতে পারে না। মনকে অবলম্বন করে যে সাধনা হয় তাতে যোগীরা মনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে বা মনঃসংযম করে। এতে সমস্ত চিন্তার বৃত্তিকে একটিমাত্র বৃত্তিতে নিয়ে আসা হয়। আবার প্রাণায়াম করে প্রাণ সংযমের দ্বারা স্থিতি লাভ করে।

প্রাণের বিজ্ঞানের আরেকটি পদ্ধতি হল শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করে মনকে স্থির করা। প্রাণের চঞ্চলতার সঙ্গে মনের চঞ্চলতা বাড়ে। বিপরীত ক্রমে মনের চঞ্চলতার সঙ্গে প্রাণের চঞ্চলতা বাড়ে। যদিও মন ও প্রাণের দুই পদ্ধতিকে অনেক ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিল থাকে না। সেই জন্য দেখা যায় যে দেহ স্থির থাকলেও মন চঞ্চল হয়। সাধারণত মনকে বা প্রাণকে স্থির করার জন্য গুরু মহাত্মারা একটা নাম দিয়ে দেন এবং তা যে-ভাবে উচ্চারণ করতে হয় সে-ভাবে অভ্যাস করলে মন স্থির হয়। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম যুক্ত করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মনকে স্থির করতে হয়। মন ও প্রাণের গতি ভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে মূলত সম্বন্ধ আছে বলে যে কোনও একটি স্থির হলে অপরটি স্থির হয়।

স্থিতি সমতার মধ্যে না-যাওয়া পর্যন্ত যুগল থাকেই। পরাস্থিতিতে না-গেলে মন স্থির হয় না। স্থিতি ও গতি উভয় দিকেই মন যুক্ত আছে। কোনও জায়গায় স্থিতি অংশ প্রধান এবং কোনও জায়গায় গতি অংশ প্রধান। তারও ঊর্ধ্বে আছে পরমশান্তি।

প্রাণ ধরে যারা সাধনা করে তাদের অনেক জিনিস সহজ হয়। প্রত্যেকের দেহে দু'টি ভাগ আছে। সেই জন্য বলা হয় অর্দ্ধনারীশ্বর। এক ভাগের নাম ইড়া, আরেক ভাগের নাম পিঙ্গলা। তার মাঝখান দিয়ে গেছে সুষুম্না নাড়ী। ইড়া হল পুরুষ বা জ্ঞানশক্তি এবং পিঙ্গলা হল স্ত্রী বা ক্রিয়াশক্তি। অথবা ইড়া হল solar current এবং পিঙ্গলা হল lunar current এবং সুষুম্না is central channel।

যোগবিজ্ঞান লাভের অধিকারী সকলে হয় না

যোগের বিজ্ঞান সহজে পাওয়া যায় না। শ্বাসের গতি ধরে সহজে এই পদ্ধতি আসে। সেই বিজ্ঞান সকলকে না-দেবার পক্ষে যুক্তি আছে। একজন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে—সম্পূর্ণ বিজ্ঞান দিতে হলে প্রস্তুতি দবকার, তা খুব কম লোকেরই আছে। প্রস্তুতির আগে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান দিলে তা বৃথা হয়।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান গ্রহণের অধিকারীর লক্ষণ কী?

তিনি বললেন, তাঁর গুরুর কাছে যখন তিনি যোগ শিখতে গিয়েছিলেন তখন গুরু অধিকারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বলেছিলেন—ব্যষ্টি প্রাণ ও সমষ্টি প্রাণ এবং তাদের যে উৎস, এই তিনের পরিচয় নেবার জন্য যে জীবনকে পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পারে, সেই হল যোগ্য। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না-রেখে সমগ্র বিজ্ঞানের জন্য যার তীব্র ব্যাকুলতা জাগে সে-ই যোগ্য অধিকারী।

গুরু তাকে নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন গুরু বললেন—তোমার ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্তরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে; সমষ্টির অতীতের পরিচয় তোমাকে দিয়ে যেতে পারলাম না; কিন্তু আমি আবার আসব তোমার কাছে। গুরু তাকে আরও বলে দিলেন যে কোন স্থানে, কী বেশে আবার সে গুরুর দেখা পাবে।

পঁচিশ বছর পরে সে আবার গুরুর দেখা পেল একটি বালকের বেশে। কিন্তু প্রথমে এইরূপ একটি কচি মনকে কিছুতেই তিনি গুরু বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু বালকের এক একটি কথায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন। তথাপি convention তাঁকে কিছুতেই মানতে দিচ্ছিল না।

অবশেষে তিনি বালককে একদিন বললেন—তুমি যে আমার গুরু সে কথা তোমার মনে থাকলেও আমার স্মৃতিতে নেই।

বালকরূপী গুরু বললেন—ঠিক আছে, তুমি আরও কয়েকদিন অপেক্ষা কর। তারপর এক সময় তুমি এমন একটা বিপদে পড়বে যে আমি ছাড়া তোমাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। তখনই তোমার বিশ্বাস আসবে।

কিছুদিন পরে বালকরূপী গুরুর কথাই ঠিক হল। শ্বাসে শ্বাসে যে বিজ্ঞান তিনি অনুসরণ করছিলেন তা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল এবং সেই বালকগুরুর সাহায্যেই তিনি এই বিপদ অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন।

জাগতিক দিক থেকে কোনও কিছু প্রাপ্তির পরে তার মূল্য দিতে হয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মূল্য দিতে হয় প্রাপ্তির পূর্বে।

সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি অন্তরে অণু হয়ে আসে আবার মহানে চলে যায়। এই ভাবনা করতে করতে দু'টো এক হয়ে যায়। নিজেকে গুরুর মধ্যে ভাবনা করতে হয় এবং নিজের মধ্যে গুরুকে ভাবনা করতে হলে তাঁর রূপ আগে মানসপটে এঁকে নিতে হয়।

নামে মন দেওয়াতেই হয় দীক্ষা। সব নামে একই সদ্‌গুরুমহারাজ আছেন। গুরু পাদপদ্মে মন ও প্রাণ এক হয়। এই হল ব্যষ্টি ও সমষ্টির মিলনভূমি।

গুরুর স্বরূপ

গুরুকে সাকারের মধ্যে ধরলে সগুণ-সাকারই মনে হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা হয়। কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অবস্থান করেন ভেদাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায়। তিনি যে দেহের মধ্যে কী ভাবে আছেন তা কল্পনা করা যায় না। সমবোধের মধ্যে মিশে আছেন তিনি। তাঁকে কখনও কল্পনা বা অনুমান করা যায় না। ধ্যানের গুরুমূর্তি হলেন নির্গুণ ও নিরাকার।

গুরুমূর্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা ভাবে বলা আছে সত্য, কিন্তু সে সব পাঠ করে সব হৃদয়ঙ্গম হয় না। গুরুর বিভিন্ন স্তর আছে, সেই জন্য মনে নানা রকম প্রশ্ন ওঠে। গুরুকে কী ভাবে ধরতে হয় তা অনেকেরই জানা নেই।

প্রথমে গুরু যা-বলেন তা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনতে হয়। পরে সেই শ্রুত বস্তুকে অবলম্বন করে অন্ধ বিশ্বাসে চলতে হয়। নতুবা কোনও কাজ হয় না। একেই বলে গুরুনিষ্ঠা। নিষ্ঠা সরে গেলে স্থিতির অভাবে অনুভূতির প্রকাশ ব্যাপক ভাবে হয় না। সমাধিতে গাঢ় ঘুমের অবস্থা অতিক্রম করে গেলে, তবেই বোঝা যায় আত্মবোধরূপী গুরুর মহিমা।

নির্বিকল্প সমাধি হয় অদ্বয়ভূমিতে, যেখানে বিষয় ও বিষয়ী মিলে এক হয়ে যায়। তা গাঢ় ঘুমেও হয়; কিন্তু গাঢ় ঘুম ও সমাধি এক নয়। ঘুমের মধ্যে মনের কোনও বৃত্তি থাকে না; কিন্তু সমাধিতে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বা আত্মাকারা বৃত্তি (awareness) নিরন্তর থাকে।

নির্বিকল্প সমাধির মধ্যেও অনেক স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ আছে। সেখানে রসাস্বাদন থাকে না। আনন্দস্বরূপে স্বরূপত সাধক যখন পৌঁছায় তখনই হয় সদ্‌গুরুর সঙ্গে মহামিলন।

[৮।৬।৭৬]

সদ্‌গুরুর দেহ হল transcendental

ঈশ্বর হলেন গুরু। ঈশ্বর কী? তিনি হলেন জ্যোতির্ঘন মূর্তি; মনুষ্যদেহকে অবলম্বন করে তিনি নেমে আসেন। মানুষ তার পরম সত্যস্বরূপকে মানুষ হিসাবেই চায়। মনুষ্যরূপ ছাড়া অন্য কোনও রূপকে সে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। ঈশ্বরের জ্যোতির রূপ অনেকে নিতে পারেন না। ঐ অবস্থায় জীবের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় কার্যকরী হতে পারে না। ঐ light নিয়ে আসার মতো আধার খুব কম। ঈশ্বরের ইচ্ছা-ই কেবল সেখান থেকে নিম্নভূমিতে নেমে আসে, মনুষ্যরূপ ধারণ করে এবং অনেকদিন থাকে। তাঁকেই অবতার বলা হয়। অবতারদের দেহ পাঞ্চভৌতিক জাত দেখালেও তা ভাগবতীতনু[১]। উত্তম প্রেমিক ভক্ত ছাড়া এ দেহের মর্ম অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁদের দেহ অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাগ আছে। শক্তিস্বরূপ দিয়ে গড়া তাঁদের দেহ। তা স্থূল শক্তির প্রভাবে পরিচালিত হয়। তাই বলা হয সদ্‌গুরুর দেহ থেকেও নেই এবং না-থেকেও আছে।

'থেকেও নেই' বলার কারণ হল তাঁদের দেহ সাধারণ মানুষের মতো নয়। 'না থেকেও আছে' বলার অর্থ হল transcendental ভাববোধে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তাঁরা সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক ভাববোধে চলেন ও আচরণ করেন। তাঁদের দেহ সাধারণ মানুষের মতো দেখালেও সাধারণ মানুষের মতো constitution নয়। দেহে বাস করেও দেহাতীত বোধে তাঁরা চলতে পারেন। পঞ্চভূতের তৈরি দেহ হলে পঞ্চভূতের আহার দরকার হতো। পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যবহার হলেও পঞ্চভূতের অধীন নয় তা। সেই জন্য সাধক যেখানেই স্মরণ করে সেখানেই তাঁদের দর্শন পায়। পাঞ্চভৌতিক দেহ হলে তা সম্ভবপর হতো না। [১৩।৬।৭৬]

১। ভাগবতীতনু—সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ দিব্য চিদভাবঘন তনু।

কৃষ্ণের বাঁশীর ডাকের তাৎপর্য

আকাশতত্ত্বের ঊর্ধ্বে যাঁর মন নিত্য প্রবিষ্ট তাঁর সমাধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না। তাঁকে শান্তির জন্য কোনও কিছুর উপরে নির্ভর করতে হয় না। সেই শান্তি প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরে নিহিত থাকা সত্ত্বেও সাধনসিদ্ধির অভাবে ইচ্ছামাত্র তথায় কেউ যেতে পারে না। ধ্যানের মধ্যে সেই স্তরের একটুমাত্র স্পর্শও যদি কেউ পেয়ে আসে তবে তার মধ্যে এমন এক আনন্দের অনুভূতি হয় যা কোনও মতেই আর ভোলা যায় না। এই স্মৃতি বারবার তাকে অন্তরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ-ই হল কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক বা অন্তরের ডাক। এ-ই হল গুরুর টান, যে টানে সসীম থেকে অসীমে, রূপ ছেড়ে অরূপে মন চলে যায় এবং জগৎ ভুল হয়ে যায়। [১৫।৬।৭৬]

জীবনের লক্ষ্য

প্রত্যেকের আমিবোধের গভীরে যে শুদ্ধ মুক্ত আমি আছে, সেই আত্মগুরুকে অনুভব করাই হল জীবনের লক্ষ্য। নিজের ভিতরে বসে কে দেখে, কে শোনে, তা আবিষ্কার করাই হল আত্মোপলব্ধি[১]।

সৎসঙ্গে শ্রুত বা গুরুপ্রদত্ত ভাবগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার সঙ্গে ভাব হয়। তার সঙ্গে ভাব হলে নয়নজলে বুক ভেসে যায়, হৃদয়ের ভার লাঘব হয়। [২০।৬।৭৬]

গুরুই স্বয়ং ভাজক, ভাজ্য, ভাগফল এবং ভাগশেষ

মন তৃপ্ত হয় কেন্দ্রে গিয়ে। সেখানে দুই থাকে না, সব একাকার। এই একাকার অবস্থা বাইরে কোথাও নেই, নিজের ভিতরেই আছে। সেই জন্য দীক্ষা দেবার সময় সর্বপ্রকার নির্দেশ দিয়ে পরে গুরু ইঙ্গিত দেন যে পূর্ণতা রয়েছে তোমার ভিতরে। তোমারই প্রতিফলন হল এই বহির্জগৎ।

একটু পরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মুদিত নয়নে গান গাইলেন—

গুরু এবার কৃপা করে এক-এর নামতা শেখাও মোরে
শেখাও মোরে তোমার নামতা আগে পরে শুদ্ধ করে।।
শেখাও মোরে সাংখ্যতত্ত্ব তোমার নিত্যবোধে যুক্ত করে।
অহংকার অভিমানের বিয়োগ হয় কেমন করে।।
কেমন করে পূর্ণবোধে থাকবো আমি গুণের ঘরে
গুণাতীত তুরীয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হবে মোর কেমন করে।।
ভাগফল শূন্য হয় গুরু কোন বোধে থাকলে পরে
মুক্তিশান্তি পাবার তরে আছি তোমা পরে নির্ভর করে।।
সগুণের খেলা খেলেও গুরু কেমনে থাকো তুমি নির্বিকারে
নির্গুণে সগুণে কেমন করে থাক তুমি চিরতরে।।

গানটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার বললেন— অখণ্ডের প্রতি টান এলে অহংকার-অভিমান আপনিই বিয়োগ হয়। নিত্যবস্তুর কথা মনে থাকলে হয় যোগ। এক-কে এক দিয়ে ভাগ করলে কী শূন্য হয় না? এ-ই হল গুরুর নামতা।

১। আত্মোপলব্ধি—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

গুরু হলেন ভাজক, ভাগফল, ভাজ্য—এবার তোমরা মেলাও। তাহলে তোমরা কী গুরু ছাড়া? অথবা গুরু কী তোমাদের ছাড়া?

সৎসঙ্গের সমস্ত বিষয়বস্তু হল গুরুমূর্তি। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুকে স্মরণ করার কথাই তাই বারবার বলা হয়। চারিদিকে যা-কিছু দেখা যায় সব কিছু বোধস্বরূপেরই প্রকাশ। সুখ দুঃখ আনন্দ প্রভৃতি সব বোধেরই বৃত্তি মাত্র। বোধের সমস্ত বৃত্তিকে একত্র করলে হয় বোধমূর্তি। তাই গুরুর মধ্যে সকলকেই থাকতে হয়। বোধের তত্ত্ব অনুভব করার পূর্ব পর্যন্ত শ্রুত কথা বা পঠিত বিদ্যা কাজে লাগানো যায় না। বোধমুখী করে নেবার জন্য যে প্রচেষ্টা তার নাম হল অধ্যাত্মসাধনা, ঈশ্বরসাধনা বা ব্রহ্মসাধনা[১]।

অরূপের রূপই হল আসল রূপ। গুরু তাই শিষ্যকে সচেতন করে দেন—'তুই আমার ছায়া ধরে আছিস। ছায়া ছেড়ে এবার তুই আমার কায়াকে ধর। কায়াকে ধরলে আমাকে তুই পূর্ণ করে পাবি।'

সাধনভজনের সময় কতগুলি বৃত্তি ওঠে। এগুলি পরিষ্কার করে না-দিলে সাধনা হয় না। পরিষ্কার যিনি করে দেন তিনি-ই হলেন সদ্‌গুরু। তাই সদ্‌গুরু কোনও ব্যক্তি নয়; বোধস্বরূপ হলেন গুরু। তাই বৃত্তির মধ্যে না-থেকে সত্তাকে দিয়ে সাধনা আরম্ভ করতে হয়।

ভিতরের রহস্য যিনি উদ্‌ঘাটন করে দেন, তিনি হলেন সদ্‌গুরু। আরেকদল গুরু আছেন যাঁরা দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে দিনে কয়েকবার নাম করতে বলেন। কিন্তু কী করে যে কী হবে তা বলে দেন না।

মনকে যদি কোথাও যুক্ত রাখা যায়, তবে ছোটাছুটি থেকে মন রেহাই পায়। সেই জন্য মনকে শ্রীগুরুর চরণে দিতে বলা হয়। যেখানে মন দেওয়া হয় সেই বস্তু মনকে দখল করে নেয়। অখণ্ড বোধের মধ্যে মন চলে গেলে মন আর সরে আসতে পারে না। তখন মন হয়ে যায় অ-মন। মনের মননবৃত্তি লয় হয়ে যায়। সমস্ত দেবদেবী ও সদ্‌গুরুগণ এখানে যুক্ত আছেন। [৪।৭।৭৬]

চৈতন্যের জাগরণের জন্য আঘাতের প্রয়োজন

ভগবানকে নিজের মধ্যে কী করে পাওয়া যায় তার উপায় গুরুই বলে দেন। প্রথম প্রথম মানুষ ঈশ্বরকে বা আত্মাকে বিষয়-আশয়ের মধ্যে খোঁজে। তারপর আপন অন্তরে চিন্তা, ক্রিয়া-কলাপ, ধ্যান-ধারণার মধ্যে খোঁজে। সেখানেও প্রতিহত হয়ে সে ফিরে আসে। সবশেষে নিজের কেন্দ্রবোধে নিজেকে সে পূর্ণ কবে পায়। তখনই সে পূর্ণ শান্তিলাভ করে।

আঘাত না-পেলে মানুষ কেন্দ্রাভিমুখী হয় না। অভিজ্ঞতার জন্য আঘাতের দরকার হয়। এজন্যই দুঃখ-কষ্টের একান্ত প্রয়োজন। বেদনা ব্যতীত চেতনা জাগে না। মানুষ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে চায়। যতই সে দুঃখ কষ্ট এড়িয়ে যেতে চায় ততই সে বেশি করে দুঃখ কষ্ট পায়। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে শান্তি তার নিজের ভিতরেই আছে।

অধ্যাত্মবস্তুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। সৎসঙ্গ বা সদ্‌গুরুর মুখে যা শোনা যায় তা থেকে আপন আপন প্রয়োজন অনুসারে নিজের উপযোগী অংশ বেছে নিতে হয়।

গুরুই আমাকে সব কিছু করে দেবেন, আমি কিছু করব না, এই মনোবৃত্তি থেকেই ধর্মজগতের এই দুর্দশা। [২৫।৭।৭৬]

১। ব্রহ্মসাধনা—অভিনব সংজ্ঞা।

গুরুতত্ত্বই হল সর্বতত্ত্বের সার

গুরুভাব অনুমান করা খুব কঠিন। এক একজন সাধক এক এক ভাবের পর্যায়ে সিদ্ধিলাভ করে। সিদ্ধপুরুষের মধ্যেও অনেক প্রকার ভেদ আছে। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ উভয়ে এক নয়। এ ছাড়া শক্তির সাধনায় সিদ্ধি, জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধি, যোগের সাধনায় সিদ্ধি প্রভৃতিও সব এক পর্যায়ভুক্ত নয় এবং প্রত্যেকের লক্ষণও এক নয়।

এক ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দীর্ঘকাল থাকার পর stagnant হয়ে বসে থাকে। পরে অন্য ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে অনেক উন্নতি করতে পারে। উন্নতি হলে সে মনে করে যে তার এই উন্নতি পূর্ব ভাবের দ্বারাই হয়েছে। পুরানো ভাবের ধারণা নিয়ে চলে বলে নূতন ভাবের ধারা ব্যাহত হয় অকৃতজ্ঞতার জন্য।

অভাববোধে সাধনা করতে করতে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা বোধ পাশাপাশি জেগে ওঠে। অকৃতজ্ঞতাবোধে তার নিচে আসতে হয়। এগুলি খুব গোপন তত্ত্ব বলে গুরুরা প্রকাশ করেন না।

পরমগুরু একজনই, এটা ঠিক। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ যে পায়, সে কে? কাজেই তা গভীর তত্ত্বের ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করাতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন—শ্রুত বস্তু অন্তরে রেখে যেখানে, যে-ভাবে যা ঘটছে সে-ভাবেই তা মেনে নেওয়া হল কৃতজ্ঞতা[১]। অর্থাৎ বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বোধ দিয়ে বোধকে গ্রহণ করা হল কৃতজ্ঞতা[২]। আমি ও গুরু যে এক—এই বোধ হলে হয় কৃতজ্ঞতা[৩] বোধ। অথবা যে বোধে কোনও ভাগ (division) নেই সেই বোধের অনুভূতি হল কৃতজ্ঞতা[৪]।

সদ্‌গুরুর স্বরূপ নির্দেশনা

গুরু বলতে গেলে বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম ও কর্মফলের ভাববোধকে বোঝায় না এবং প্রকৃতিকে বা শাস্ত্রকে বা অন্তরের বৃত্তিকেও গুরু বলে নেওয়া হয় না। প্রত্যেকটি ভাবে সে পৃথক। গুরু বলা হচ্ছে অথচ পৃথকও বলছি—এর সমাধান কী করে হয়?

জনৈক ভক্ত—অতশত বুঝি না কিছুই।

ভক্তের এই উক্তিটি শুনে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলতে শুরু করেন—একেবারে কিছু বুঝি না যখন তখনই অখণ্ডের দিকে যাত্রা আরম্ভ হয়। কিন্তু মুশকিল হল কিছু জেনে ফেলি বলে। 'কিছু' দিয়ে অখণ্ডকে ধরা যায় না। 'কিছু' সব সময়েই খণ্ড। খণ্ড দিয়ে অখণ্ডের ফল আশা করা যায় না।

'কিছু' হল খণ্ড ও অস্থায়ী এবং অখণ্ড হল স্থায়ী। অল্পে সুখ নেই, তবুও অল্পই মানুষের প্রিয়। অখণ্ড ভূমাতে আছে নিত্য স্থায়ী পরম সুখ। এই ভূমাকে কিন্তু স্বল্প বৃত্তি দিয়ে ধরে রাখা যায় না। মানুষের সব ব্যাপারে কিছুরই প্রাধান্য, অখণ্ডের নয়। অখণ্ড ভূমার ব্যবহারে কিছুর প্রশ্নই ওঠে না। সচ্চিদানন্দময়ী মাকে খণ্ড করা যায় না। আত্মগুরুর উপরে নির্ভর করলে খণ্ডের উপরে নির্ভর করা চলে না।

গুরুতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং হরি বা রাম তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত সহজ। গুরুতত্ত্ব হল সর্বতত্ত্বের সার। মুখে তো 'গুরু, গুরু' বলা হয় কিন্তু সত্যি সত্যি গুরুকে মানা সম্ভব হয় কী? আত্মগুরুকে নিরন্তর আপনবোধে মানা হলে সাধনার প্রয়োজন হয় না। আত্মগুরু হল সচ্চিদানন্দঘন। চিদানন্দের essence-কে মানলে সাধনার আর দরকার হয় না।

১। কৃতজ্ঞতা—অভিনব সংজ্ঞা।
২। কৃতজ্ঞতা—অভিনব সংজ্ঞা।
৩। কৃতজ্ঞতা—অভিনব সংজ্ঞা।
৪। কৃতজ্ঞতা—অভিনব সংজ্ঞা।

আত্মগুরু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অতীত। সেই গুরুকে কী দিয়ে ধরবে? শুনতে শুনতে চিত্ত যখন উন্মুখ হয়, সত্যশ্রবণের প্রতি রতি ও মতি হয় বা মন আকৃষ্ট হয় অথবা নিষ্ঠা জাগে, তখন গুরুভাবের তরঙ্গ চিত্তে প্রবেশ করে। সেই তরঙ্গে অন্তরবৃত্তি প্লাবিত হয়। শ্রুত বস্তু তখন চিত্তে গাঁথা হয়ে যায়। শ্রুত বিষয় চিত্তে গাঁথা হলে বা গুরুবাক্য অন্তরে গাঁথা হলে, সত্য গাঁথা হয়ে যায় এবং মিথ্যা সরে যায়। তাই প্রতি পদের মর্মার্থ শ্রবণ করতে হয়।

শ্রবণমাত্র যখন সেই বোধ জেগে ওঠে তখনই যথার্থ ground তৈরি হয়। এ ছাড়া সকাম সাধনভজন দ্বারা বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সকাম সাধনার ফল বিকৃত হবেই। কিন্তু সদ্‌গুরুর মুখে সত্যবাক্য শ্রবণমাত্র যে বোধ জাগে তা বিকৃত হয় না। সদ্‌গুরুর বাক্য হল নিত্যবস্তু। তা যখন যেখানে পরিবেশিত হয় তা সাধনসাপেক্ষ নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। সাধনসাপেক্ষ বস্তু কিছুকাল পরে আবৃত হয়ে যায়। ক্রিয়াসিদ্ধি বা ধ্যানসিদ্ধির সাধনা চিরস্থায়ী নয়। ধ্যানসিদ্ধির পর যদি গুরুর শ্রুতিবাণী বা সদ্‌বাণী প্রবিষ্ট হয় তা স্থায়ী ফলদায়ক হয়। কিন্তু ধ্যানসিদ্ধিতে ধ্যানভঙ্গের পর আর সেই অবস্থা থাকে না, তার ফলে বাইরে খাপ খাওয়াতে পারা যায় না। কিন্তু অনুভবসিদ্ধগণ সর্ব অবস্থায় একই রকম থাকতে পারেন। [২৭।৭।৭৬]

দীক্ষার স্তরভেদ

গুরুভাবকে রক্ষা করাই হল গুরুনিষ্ঠা[১]। সাধারণ অধিকারীর নিষ্ঠার লক্ষণ হল যে সে স্থূলের মধ্যে গুরুপ্রভাব রেখে ব্যবহার করে। ফলে স্থূল বিষয়ের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। মধ্যম অধিকারী অন্তরের ভাবকে গুরুভাবে ব্যবহার করে আর উত্তম অধিকারী গুরুভাবকে রাখে কেন্দ্রবোধে। তার কাছে গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। বাইরে তাঁর স্থূলদেহ হল ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বা কৃপা দ্বারা তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। তার ফলে ভক্তজনের দেহ-মন শান্ত, সমাহিত, সংযত ও মার্জিত হয়। তাদের সহজ সরল ও বিনীত ভাবও প্রকাশ পায়। এগুলি হয় গুরুভাবের প্রভাবে। তাদের তখন বিনয় সরলতা থাকে কিন্তু বাচালতা বা প্রগল্‌ভতা থাকে না। দ্বেষ-হিংসাভাব তাদের থাকে না, কিন্তু প্রসন্নতা ও আনন্দভাব থাকে।

নাম, বীজ ও বীজমন্ত্র—এই তিন পর্যায়ের দীক্ষা প্রচলিত আছে। এর পরে আরেক পর্যায়ের দীক্ষা আছে—অমৃত স্তরের দীক্ষা। এই দীক্ষা হয় অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। সেখানে স্থূল কোনও ব্যাপার নেই। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব লীন না-হলে এই স্তরের দীক্ষা পাওয়া যায় না। নিরবয়ব হতে হবে। সেখানে থাকে শুধু তত্ত্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত সূক্ষ্ম বস্তুকে ধারণ করার যোগ্যতা লাভ না-করে ততক্ষণ সম্যক্‌ ভাবে ভজনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধ্যানের যোগ্যতা অর্জন করতে সকলে না-পারলেও ভজনের যোগ্যতা অর্জন সকলেই করে নিতে পারে।

গুরুভাবে অখণ্ড সত্যকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন গুরুভাব দিয়ে করেন। তাঁর স্বরূপের অভিব্যক্তি বা বিকাশ হয় গুরুরূপে। গুরু ও ইষ্ট অভেদ। মন্ত্র এবং সাধন, সিদ্ধি ও সাধ্য অভেদ। সাধক ও সাধ্যের অভেদ ভাবনা ধাপে ধাপে আসে। সবশেষে দেখা যায় যে নিজের মধ্যেই সব আছে।

[১।৮।৭৬]

আত্মগুরুর তাৎপর্য

গুরু হলেন আত্মস্বরূপ। কারণ আত্মাই আত্মবোধকে জাগ্রত করে দেয়। আত্মাই হল প্রত্যেকের আপন ও প্রিয়তম। নিজের মধ্যে আত্মরূপী গুরুর সন্ধান পেলে গুরুর সঙ্গেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তার

১। গুরুনিষ্ঠা—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

মধ্যে দূরত্ব, সময় ও কারণের বিভেদ বা পার্থক্য আর থাকে না। গুরুরূপে সে নিজেকে নিজেই দেয়। নিজের কাছে নিজেই হল পরমপ্রেমাস্পদ প্রিয়তমোত্তম। নিজ আত্মাই হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ। আত্মবোধই হল প্রেমের লক্ষণ ও ব্যবহার। সমত্ববোধের বা আপনবোধের মাধ্যমেই তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। অন্য বোধ দিয়ে আত্মপ্রেম সিদ্ধ হয় না। আপনবোধ ব্যতীত অন্য বোধে অর্থাৎ ভেদ বোধে কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না বা বিনা শর্তে কেউ কিছু দিতে পারে না। বোধের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করা আছে। এগুলি সব মানসসৃষ্টি ও কল্পিত মানস বৃত্তি বা রচনা। গুরুবোধ হল বিশুদ্ধ। আপনার অন্তরে যখন বিশুদ্ধ বোধ প্রকাশ হতে থাকে তখন মনের পর্দা সরে যায়। কাজেই গুরুভজন করা অর্থ আত্মভজন করা। [৮।৮।৭৬]

অখণ্ড ভাববোধে সব কিছু মানার তাৎপর্য

সৎসঙ্গের সময় গোলবারান্দায় উপবিষ্ট একজন ভক্ত যিনি দীর্ঘকাল পেটের রোগে ভুগে বহু চিকিৎসা করেও কোনও ফল না-পাওয়াতে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়াতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কীগো, বাবা! পেটের জন্য এখন কী চিকিৎসা হচ্ছে? ভক্ত উত্তর দিলেন—কিছু করার নেই, গুরুর উপরে সব ছেড়ে দিয়েছি। তার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলতে শুরু করলেন—সে কী কথা? এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কাজ না-হলে কবিরাজি বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও তো আছে। গুরুর উপরে ছেড়ে দিয়েছ, ঠিকই করেছ। কিন্তু স্থূল দেহের ব্যাপারে স্থূল বিষয় দিয়েই গুরুকে ব্যবস্থা করতে হয়। গুরুর মহিমা অনন্ত এবং তাঁর ইচ্ছাও বোঝার উপায় নেই। তাঁর মহিমা জানাও যায় না। ডাক্তার, ওযুধ, পথ্য, সেবা, শুশ্রূষা প্রভৃতির মধ্যে আত্মগুরুর অস্তিত্বই নিহিত আছে। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় করে নিষ্ঠাসহকারে গুরু ভাববোধে স্মরণ-মনন দ্বারা এগুলি ব্যবহার করতে হয়। তাহলেই গুরুর কৃপা ও অনুগ্রহের ফল কার্যকরী হয়, নতুবা নয়। জীবনব্যবহারের সর্ববিধ উপকরণাদি স্থূলদৃষ্টিতে আত্মগুরুরই এক মূর্তি। দেহক্ষেত্রও গুরুর আধার। এই জন্যই বলা হয় গুরুভজন হল সব ভজনের সার।

ঠিকমতো গুরুভজন হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তার সমগ্র সত্তা দিব্য ভাবে পরিণত হয়। সদ্‌গুরু মাত্রই দিব্যজীবনের অধিকারী। গুরুভজন হল অখণ্ড ভজন অর্থাৎ অখণ্ড ভূমার ভজন, যদিও তা ব্যষ্টির মাধ্যমে করা হয়। অখণ্ড গুরুবোধে না-মেনে সাধ্যমত গুরুভজন করলেও ত্রুটি থেকে যায়।

গুরুভজনের মধ্যে সর্বসমর্পণের ভাবটি মুখ্য থাকা চাই। পরিপূর্ণ ভাবে All acceptance চাই। অদ্বয়তত্ত্বের ভজন হল গুরুভজন[১]।

অখণ্ডের বিজ্ঞান হল 'অখণ্ড ভাবে মানা'। মানা ব্যতীত কেবল বুদ্ধির জানাজানি দিয়ে অখণ্ডের বিজ্ঞান কার্যকরী হতে পারে না। আত্মগুরুর স্বরূপ যখন অখণ্ডমণ্ডলাকার তখন এমন কোনও বস্তু নেই যা গুরুর বাইরে আছে। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বরতত্ত্বই গুরুতত্ত্ব। অর্থাৎ পরম অদ্বয়তত্ত্বই হল স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মতত্ত্ব বা স্বয়ংতত্ত্ব। পরম মানে Absolute। অখণ্ড বলেই গুরু সবকে embrace করে আছেন। গুরুতত্ত্ব অনুভূত হলেই বোঝা যাবে যে গুরু আমাদের ধরে আছেন, না আমরা গুরুকে ধরে আছি। আসলে গুরুই আমাদের ধরে আছেন। গুরু হলেন Absolute Existence, Absolute Consciousness, Absolute Knowledge and Bliss।

১। গুরুভজন—অভিনব সংজ্ঞা।

গুরুতে ঈশ্বরবোধে হয় গুরুতত্ত্বের সাধন ও সিদ্ধি

গুরুভজনে গুরুবোধে গুরুকে ভজন করতে হয়। গুরুতত্ত্বের বিষয় কঠিন। কেননা তার মধ্যে দেবদেবী তত্ত্ব, ঈশ্বরীয় তত্ত্ব প্রভৃতি সবই পূর্ণ মাত্রায় আছে। এক কথায় Divine Head হলেন গুরু।

গুরু, আত্মা ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ ভেদ কাল্পনিক। সুতরাং তা সত্য নয়। এঁরা বস্তুত অভেদ, তা সত্য। এর অতিরিক্ত অন্য সব বস্তু মিথ্যা। গুরু, আত্মা, ঈশ্বর অতিরিক্ত কোনও বস্তু নেই বা থাকতে পারেও না। এই principle-কেই ভূমারূপে এবং গুরুরূপে বন্দনা করা হয়েছে। গুরু হলেন আনন্দস্বরূপ।

গুরুতত্ত্ব গূঢ় (secret) এবং একান্ত আপন বলেই তাঁকে ভজন করা হয়। প্রত্যেকের আপন বন্ধু হল আত্মা স্বয়ং তিনিই গুরু। আত্মগুরুই একান্ত আপন এবং তাঁকেই ভজন করতে হয়।

জানা নয় মানাই হল গুরুতত্ত্বের সাধনা ও ব্যবহার

ভজন যখন করা হয়, তা দ্বৈতবোধেই করা হয়। পরমের মধ্যে ভজন করা যায় না। সেখানে ভজন হয়। যেখানে করার প্রশ্ন, সেখানে আছে জানা। আর যেখানে হওয়ার প্রশ্ন সেখানে আছে মানা। জানা এবং মানার মধ্যে পার্থক্য আছে। জানাতে কিছু না কিছু assertion থাকেই। মানা হল All acceptance।

নিজের দেহ-মন-প্রাণ যে গুরুকে সঁপে দেয় সে যত বড় মূর্খই হোক না কেন, সে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। গুরুসেবার ফলে শিষ্যের মধ্যে চরমতম বোধ খেলে এবং সে যন্ত্র হয়ে যায়। কারণ গুরু স্বয়ং সেই যন্ত্র ব্যবহার করেন; তখন তা আর খণ্ড থাকে না, অখণ্ড হয়ে যায়।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি কারও সন্দেহ এসে থাকে তাহলে সে যেন অন্তত তিন রাত্রি বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত 'গুরু ওঁ' মন্ত্র জপ করে। তাহলে তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গুরুতত্ত্বের পরে আর কোনও তত্ত্ব নেই। গুরুতত্ত্বের সাধন বা ব্যবহারবিজ্ঞান হল মানা—জানা নয়। কিন্তু মানতে সবাই চায় না। সকলেই জানতে চায়। যেহেতু অখণ্ডের মধ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই, গুরু পৃথক করে কার জন্য ইচ্ছা করবেন? দ্বৈতের বা খণ্ডের মধ্যে হয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা। তা হল মানসবৃত্তির কল্পনামাত্র।

গুরুকে আপন বলে মান। আপনভাব দিয়ে হয় তাঁর সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ বা ভাব। আর জানতে গেলে দ্বৈতপ্রভাব বাড়ে এবং আসে ভেদভাব। ব্রহ্মজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ গুরু অজ্ঞানী শিষ্যকে আপনবোধে নিলে সে আর অজ্ঞানী থাকে না। জ্ঞান দিয়ে আপন করা যায় না; কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে আপন করা যায়। আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বিজ্ঞানটিই দেন।

আত্মবোধে আত্মপ্রেমে হয় সদ্‌গুরুর পূজা

গুরু শিষ্যকে বলেন—আমাকে জ্ঞান-অজ্ঞান সব দিয়ে দে। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানকে দিতে দ্বিধা করে। মানুষের প্রকৃতি হল জ্ঞান-অজ্ঞানমিশ্রিত অথবা অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান। এই অজ্ঞানের প্রভাবই হল অবিদ্যার প্রভাব। তা-ই স্বস্বরূপকে আবৃত করে রাখে এবং জ্ঞানকে বিকৃত করে প্রচার করে। ব্রহ্মজ্ঞগুরু বিজ্ঞানের প্রভাবে শরণাগত জিজ্ঞাসু শিষ্যের অবিদ্যা অজ্ঞানটি নাশ করে দেন। তখন তার মধ্যে জ্ঞানস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয়। গুরুর কাজ হল মায়ের মতো। মা যেমন অলক্ষ্যে সন্তানকে প্রেম ও ভালবাসায় ভরিয়ে রাখেন, সেইরূপ গুরুও অলক্ষ্যে শিষ্যকে প্রেম ও ভালবাসায় ভরিয়ে দেন।

সহজতম পথ হল প্রেম, ভালবাসা। ব্রহ্মজ্ঞগুরু কাউকে ফেলতে পারেন না। গুরু অখণ্ড। গুরুর করুণাঘন প্রেমঘন মূর্তি সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

তোমাদের গুরু ভালবেসে তোমাদের জন্য সৎসঙ্গের এই আয়োজন (ফার্ন রোডের বাড়ির গোলবারান্দায়)

করেছেন। আর এত হিসাবের দরকার নেই। নিমন্ত্রণবাড়িতে খেতে এসেছ, খেয়ে যাও পেট ভরে। কোথা থেকে কে সব জোগাড় করেছে জানবার প্রয়োজন নেই। [১০।৮।৭৬]

মুক্তির জন্য চতুর্বিধ কৃপার প্রয়োজন হয়

সদ্‌গুরু চৌকিদারের মতো মানুষকে সাবধান করে দেন। কিন্তু তা মানুষ আবার ভুলে যায়। দেহ বিকারধর্মী কিন্তু আত্মার বিকার নেই। সেই জন্য গুরু বারবার আত্মার কথা স্মরণ করতে বলেন এবং তার জন্য যা প্রয়োজন তা বলে দেন।

চার প্রকার কৃপা হলে মুক্তির দ্বার খোলে। এই কৃপা হল—(১) গুরুকৃপা (২) আত্মকৃপা বা নিজচেষ্টা (৩) শাস্ত্র কৃপা (৪) ব্রহ্মকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপা। এইরূপ চার ভাগে ভাগ করার কারণ হল জীবনরূপ ধারণ করে যখন আত্মা খেলে তখন চার পর্যায়ে তাঁকে খেলতে হয়। সদ্‌গুরুর সাহায্যে চার স্তরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং তার ধ্রুবাস্মৃতি জাগে।

অনেক সময় দেখা যায় যে গুরু মন্ত্র দিয়ে যান কিন্তু সেই দেহে তিনি আর শিষ্যকে দেখাই দিলেন না। তারপর শিষ্য বহুতীর্থ ঘুরে ঘুরে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ক্রিয়া-কলাপ করে। এই ভাবে চতুর্বিধ সিদ্ধির যে কোনও একটিকে সে লাভ করে এবং নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করার পর তা গুরুকে সমর্পণ করে দিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধি সমর্পণের পরে সদ্‌গুরু তার ইষ্টকে ধরিয়ে দেন। সদ্‌গুরু তখন ইষ্টের মধ্যে মিলিয়ে যান। শিষ্য তখন গুরুর স্থানে ইষ্টকে দেখে। গুরুর মুখ আর তার চিত্রপটে ভাসে না। এই যে গুরু ও ইষ্টের মধ্যে তারতম্য তা হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন।

গুরু, ইষ্ট ও সাধক এক বোধস্বরূপেরই ত্রিবিধ বৃত্তি

গুরু ও ইষ্ট যে অভেদ তা বোধের ঘরে গিয়ে অনুভূত হয়। সেখানে রূপ থাকে না। সেখানে যাবার আগে গুরু ও ইষ্টের ভেদ চিন্তা থাকে। ইষ্টের চিন্তা করতে করতে দেখা যায় গুরু ইষ্টের মধ্যে লীন হয়ে যান। ইষ্ট নিয়ে পৌঁছে দেন পরম বোধস্বরূপের ঘরে। গুরু বলতে ধরা হয় বিদ্যাশক্তিকে—যে শক্তি অবিদ্যার হাত থেকে নিয়ে গিয়ে বোধের ঘরে পৌঁছিয়ে বোধে লীন হয়ে যায়। শুদ্ধবোধের ব্যবহারের সর্বোত্তম রূপ হল বিদ্যাশক্তি। গুরু ও ইষ্টের অভিন্নতা অনেক পরে পরিষ্কার অনুভূত হয়।

যখন ইষ্টের মধ্যে নিজেকে এক করে খুঁজে পাওয়া যায় তখনই অনুভূত হয় যে গুরু, ইষ্ট ও সাধক এক-বোধেরই তিনটি বৃত্তি। গুরু, ইষ্ট ও সাধক এক তত্ত্বেরই ত্রিমূর্তি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে খেলে বেড়ায়।

আত্মা বলতে প্রত্যেকের অন্তরে যে আত্মা আছে তাঁকেই বুঝায়। সেই আত্মগুরু বাইরে আরেক আত্মাকে গুরুরূপে বরণ করে। আর ইষ্ট হল যিনি আত্মা, অন্তরাত্মা ও গুরু আত্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। অর্থাৎ ইষ্ট হল গুরু-আত্মা ও সাধক-আত্মার সংমিশ্রিত ফল।

ইষ্টবোধের রূপ ও গুরুবোধের মধ্যে সাধকের সাধকবোধ মিলে গেলে ত্রিমূর্তি এক হয়ে যায়। গুরু, আত্মা ও ইষ্টের মধ্যে তিনটি বিভাগ দেখা গেলেও তা এক-এরই তিন বিভাগ; এক-এ তিন, তিনে এক—এটাই formula। যাঁর মধ্যে তা বিরাজ করে যে, সেই all pervading aspect হল দক্ষিণামূর্তি—তাঁকেই নমস্কার জানান হয়।

প্রথমে 'ব্রহ্মাগুরু'-র সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হলে পরবর্তী স্তরে 'বিষ্ণুগুরু'-র সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তারপর 'মহেশ্বরগুরু' এবং সর্বশেষে আসেন 'ব্রহ্মগুরু'। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপের সঙ্গে পরিচয়লাভের পূর্ব পর্যন্ত 'ব্রহ্মগুরু'-র সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধের ঘনীভূত মূর্তি হলেন ব্রহ্মগুরু।

চার স্তরের অনুভূতি লাভ হলে গুরুতাদাত্ম্য বা গুরুর সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শুধু সৎ বা শুধু চিৎ বা শুধু আনন্দ নয়—এই তিনটি পর্যায় বা ত্রিমূর্তিকে (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) সমান ভাবে নিতে হয়। বোধস্বরূপের মধ্যে সব স্তরের জিনিসই গাঁথা আছে। সেই জন্য রূপের কথাও ভোলা যায় না। আবার রূপ থাকলে নামও থাকবে এবং ভাবও থাকবে।

ব্যবহারে ভুল হওয়া দোষণীয় নয়। তা শোধনের জন্যই গুরু ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে দেহ-মন-প্রাণকে চালিত করেন গুরুবোধের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিত হবার জন্য।

ইষ্টচিন্তা হল আত্মচিন্তা। গুরু হল আত্মা। আত্মাকে One, as a whole ভেবে নেওয়া কঠিন। সাধারণত প্রথমে ভাগ ভাগ করে নেওয়া হয়। সেই জন্য পূজা, পাঠ ইত্যাদি করা হয়। এগুলি আধ্যাত্মিক পথের অ, আ, ক, খ মাত্র। অর্থাৎ এখান থেকেই আধ্যাত্মিক পথে চলা শুরু হয়। কিন্তু তাও অখণ্ডেরই অংশ।

রাত্রিতে পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদাররা পাহারা দিয়ে গৃহস্থকে সাবধান করে দেয় যেমন, গুরুর কাজও হল সেই রকম সজাগ থেকে সাবধান করা, check দেওয়া, নূতন অভিব্যক্তি প্রকাশ করা এবং তা ব্যবহারের ফলে যে ত্রুটি হয় তা অপসারিত করে নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধির জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা।

যখন গুরুকে ব্যক্তিরূপে ধরা হয় তখন গুরুর প্রতি ব্যষ্টিভাব থাকে। যখন ব্যষ্টিভাব লীন হয় তখন গুরু অখণ্ড বোধাত্মারূপে আসেন। তখনই গুরুর 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' রূপের দর্শন হয়। বোধরূপী গুরুকে না-পাওয়া পর্যন্ত গুরুর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরভাব রাখতে হয়। কারণ ব্রহ্মাভাব হল Creative nature in integral sense। বিষ্ণুভাব হল Preservative nature in integral sense এবং মহেশ্বরভাব হল Transformative nature in integral sense। ধ্বংস হল গুরুরই একটি রূপ। ধ্বংস খারাপ নয়। যা বিনাশ করলে একের স্বরূপ ফুটে ওঠে তা-ই গুরু করেন, বিভিন্ন agent-এর মাধ্যমে।

আত্মা, গুরু ও ইষ্ট—এক বোধেরই তিন মূর্তি। আত্মা হল নিজের আমি। গুরু হলেন বৃহৎ আমি। ইষ্টের আমি হল যিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আমির মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। গুরুর পরবর্তী স্বরূপ হল ইষ্ট; তিনিই আবার ঈশ্বর।

গুরুর সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যেমন অধীত বিদ্যা কারও জোর করে স্মরণ করতে হয় না আপনিই এসে যায়, সেইরূপ গুরুর সঙ্গেও জোর করে সম্বন্ধ রাখতে হয় না। তা সহজ ভাবে আপনিই প্রকাশিত হয়।

গুরুকে অর্পণ করে বিষ্ণু প্রীত্যর্থে কর্ম করতে হয়। এই ভাবে দীর্ঘকাল কর্ম করতে করতে অসৎ কর্ম আর হয় না, তখন সৎ কর্ম আপনা থেকেই হয়। গুরুভজন দ্বারা সত্ত্বগুণ তৈরি হয়। সত্ত্বগুণ বাড়লে তেজতত্ত্ব বা তাপ বাড়ে। তাপ বাড়লে আলোর বা বোধের জ্যোতি বাড়ে। [১৫।৮।৭৬]

আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দীক্ষা যিনি দেন তাঁর শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন আছে। সেখানে শিক্ষা না-পেলে, যিনি শিক্ষা দেন তাঁর কাছ থেকেই নিতে হয় দীক্ষা। শেষোক্ত জনের কাছে দীক্ষার পদ্ধতি অন্য রকম হয়ে যায়। যেমন স্কুলে অনেক ছাত্র হয়ে গেলে মাস্টারমশাইরা সব ছাত্রের প্রতি সমান মন দিতে পারেন না বা বেশি সংখ্যক সন্তান হয়ে গেলে মা-বাবা সবার প্রতি সমান যত্ন নিতে পারেন না। সেইরূপ গুরুরও বহু শিষ্য হয়ে গেলে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে পারেন না। কাজেই এ যুগের সিদ্ধি সত্য যুগের মতো নয়। সত্য যুগে দায়িত্ব ছিল গুরুর উপরে। এ যুগের দায়িত্ব শিষ্যের। সেই জন্য অনুভূতির বিষয় দিয়ে দিলে যত তাড়াতাড়ি শিষ্যের উপলব্ধি হয়, জপধ্যান করে তা উপলব্ধি করার সাধ্য সকলের থাকে না।

মন্ত্র দু'রকম ভাবে দেওয়া হয়—প্রাণে ও কানে। এখানে (গোলবারান্দায়) কাঁথা সেলাই করার মতো একটা একটা করে শব্দ দিয়ে প্রাণে গেঁথে দিচ্ছেন সচ্চিদানন্দময়ী মা। আরেক রকম ভাবে শব্দ বা মন্ত্র কানে দেওয়া হয়। সেই শব্দ বা মন্ত্র থেকে গাছ, ফুল, ফল কী হবে বা হবে না তা জানা থাকলে সুবিধা হয়।

[২৪।৮।৭৬]

শুদ্ধ চিত্তে সম্বিৎগুরুর পরিচয়

গুরুবাক্য বা শাস্ত্রার্থ অনুধাবন, মন্ত্রার্থ ভাবনা বা সৎসঙ্গে শ্রুত বিষয়ের ভাবনা সবগুলি এক অর্থবোধক। শ্রুত বিষয়ের ভাবনাতে মন তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় এবং অখণ্ডবোধাকারা বৃত্তি তৈরি হয়। তাকেই আত্মাকারা বৃত্তি বলে। সেখানে বিশুদ্ধ বোধের একটিমাত্র স্ফুরণ থাকে। তার ফলে মনের অনন্ত বৃত্তি আপনা থেকেই কমে যায়। বৃত্তিশূন্য মনে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় হয়। তা আট ভাগে বিভক্ত হয়ে অষ্টসিদ্ধিরূপে প্রকাশ পায়। অখণ্ড একাকারা বৃত্তি হলে সম্বিৎ-এর পরিচয় পাওয়া যায়। মন শুদ্ধ না-হলে বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। মন শান্ত হলেই শুদ্ধ চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধ চিত্ত হলেই বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশমান হয়।

[২৩।১১।৭৬]

অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুকে নিত্য স্মরণের নির্দেশ

গুরুর রূপ, নাম, ভাব বা বোধকে ব্যবহার করতে হলে অখণ্ড আকাশবৎ ধরে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ব্যবহারে ত্রুটি হবে না। গুরু একজনই—যিনি নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ড আকাশবৎ থাকেন। সর্বকালে সর্বতোভাবে গুরুভাবে মন যুক্ত থাকলে গুরুর যথার্থ রূপ হৃদয়ে অনুভূতিরূপে সদাই প্রকাশ পায়। এ ভাবে ভজন করলে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবযুক্ত হয় এবং ঈশ্বরের পরে পরমেশ্বরেব ভাব সহজে প্রকাশ পায়। [৩০।১১।৭৬]

বেদজ্ঞপুরুষ কী ভাবে অনুশাসন করেন

এক জিজ্ঞাসু ভক্ত একবার তার বেদজ্ঞ গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একের পর এক নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলার পরে শিষ্য এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছল যে সে বাধ্য হয়ে গুরুকে বলল—গুরুদেব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কিন্তু আর গ্রহণ করতে পারছি না; আমাকে এবার ছেড়ে দিতে হবে।

গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্য চলে গেল।

কিছুদিন পরে তার মনে আবার প্রশ্ন উদয় হওয়াতে সে আবার জিজ্ঞাসু হয়ে গুরুর কাছে ফিরে এসে বলল—আমার এখান থেকে চলে যাওয়া ভুল হয়েছে। সব প্রশ্ন একবারে নিরসন করে গেলেই ভাল হতো।

গুরুদেব বললেন—বল, তোমার কী প্রশ্ন আছে।

শিষ্য তখন আবার এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগল। তারপর সে বলল—দেখলাম যে নিজের স্বরূপ না-জেনেই এতদিন সংসার করে এসেছি। স্বরূপ জেনে দেখছি যে সংসারে কোনও জিনিসের সঙ্গেই বিরোধ নেই। আমি, তুমি বা সকলেই সেখানে প্রকাশ মাত্র।

গুরুদেব—এখন তুমি পূর্ণ হয়েছ। আগে তাহলে সংসারভ্রান্তি কার ছিল, বলতো।

শিষ্য—কারও ছিল না।

গুরু—একটু আগে যে তোমার প্রশ্ন ছিল।

শিষ্য—কিছুক্ষণ আগে যে বলেছিলাম তার তো কোনও প্রমাণ নেই। আপনার কাছে এসে আমার বোধ পরিষ্কার হয়েছে। যেমন আলো নিয়ে এলে আর অন্ধকার থাকে না।

গুরু—ঠিক আছে, এই বোধ নিয়েই তুমি জীবনে চল।

গুরুর কথা মতো সেখানেই সে বসে পড়ল। সম্বিৎ-এর সঙ্গে পরিচয় হলে দেশ-কাল থাকে না। তিনশ' বছর পরে ধ্যানভঙ্গ হলে তার মনে হল—এই সেদিন মাত্র যেন গুরুদেব চলে গেলেন। তখন সে যে গাছের নিচে গুরুদেবের আসন ছিল সেখানে গেল। আশ্রমের এক বৃদ্ধ সাধু তাকে দেখে বললেন—আর কেন যাও? আবার গিয়ে বস সেখানে।

শিষ্য—আমার গুরুকে প্রয়োজন।

বৃদ্ধ সাধু—গুরু তো তোমার মধ্যেই আছেন।

গুরুকে স্মরণ করা মাত্র শিষ্য গুরুর দর্শন পেল। গুরু আবির্ভূত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেন গুরুকে দেখতে চেয়েছিলে? আরও পরিষ্কার করে দেখতে হলে একেবারে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ভ্রান্তি চলে গেলেও অনন্ত কাল ও ক্ষণ থাকে। তোমার কাছে দৃশ্য ও দর্শন পৃথক হল কেন?

শিষ্য—আপনিই তা বলে দিন। আমি প্রবুদ্ধ হয়েও আবৃত হয়ে আছি কেন?

গুরু—বিশুদ্ধ চৈতন্যে মন নেই। সেখানে কার্য-কারণ নেই। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। নিত্য প্রকাশ হয়ে চলেছেন। প্রকাশের কোনও হেতু নেই। দৃশ্য-দর্শন-দ্রষ্টারূপে তিনি নিজেই আছেন। আর একদিকে চৈতন্যেরও ত্রিবিধ ভেদ নেই। অনন্তকাল ও ক্ষণকালের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। কিন্তু এক স্থানে ভেদ আছে। বহুরূপ হল চৈতন্যের নিজেরই। সোনা দিয়ে গহনা হয় কিন্তু অলঙ্কারভাবযুক্ত সোনা ও অলঙ্কারভাবশূন্য সোনা উভয়ের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য কী করে বোঝাবে?

গুরু তখন মাটি নিয়ে এলেন। তালগোল পাকিয়ে সেই মাটি দিয়ে তিনি একটি মূর্তি গড়লেন, তারপর আবার সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—মূর্তিটি কোথায় গেল?

শিষ্য—আমার মধ্যে আছে।

গুরু তখন মাটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন; বললেন—এবার তুমি বানাও।

শিষ্য—আপনার কৃপা দরকার।

গুরু—তুমি নিজে, মাটি ও কৃপা এই তিনের পৃথক জ্ঞান করছ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চৈতন্যের দর্শন হয় অংশমাত্র। মন দ্বারা আরও একটু বেশি হয় এবং চিৎ অর্থাৎ অখণ্ড আপনবোধ দিয়ে ব্যবহার হলে বোধাত্মার অনুভূতি পূর্ণ ভাবে হয়।

ভ্রান্তি বা কল্পনা যা আছে তা শোধন করতে হয় ভ্রান্তির অধিষ্ঠান আত্মবোধের দ্বারা। কল্পনা শোধন হলে কেবল আত্মবোধের স্ফূর্তি হয়, তখন মাটি বলে পৃথক কিছু থাকতে পারে না। চরম জ্ঞানীদের কাছে চিৎ ছাড়া কিছু নেই, গুরু, শিষ্য বা জগৎ বলে কিছু নেই।

বিগ্রহকে বা দেবদেবীকে, মহাপুরুষদের ছবিকে তোমরা জড়বোধে নিও না। বিগ্রহ হল তাঁর অনন্ত মহিমার একটি উদাহরণ। বিগ্রহকে যে ভক্ত সাজায়, খাওয়ায় এসব তার কল্পনা নয়। কল্পনা বললে সাধারণ মানুষের কথা বলাও কল্পনার পর্যায়েই পড়ে। ভক্তের কল্পনা বড় মধুর।

ভ্রান্তির মধ্যে, দুঃখকষ্টের মধ্যে চৈতন্যকে দেখতে হয়। চৈতন্যই হল চৈতন্যের পরিচয়। শুধু ব্যবহারের তারতম্য হয়। অন্নকে জড় বলে গ্রহণ করতে নেই। প্রাণরূপে গ্রহণ করলে আবার প্রাণের অনুভূতি লাভ হয়। জড়ভাব সরাবার জন্য আকাশ ভাবনা করতে হয়। চৈতন্য আকাশের মতো স্বচ্ছ। ভিতরে এবং বাইরে আছে এক আকাশ। এই চৈতন্য হল প্রিয় হতে প্রিয়তম এবং শ্রেয় হতে শ্রেয়তম। [২৬।১২।৭৬]

পঞ্চম অধ্যায়

গুরুই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ

ওঁ নম গুরু ইষ্ট ঠাকুর ভগবান
জয় জয় গুরু ইষ্ট ঠাকুর ভগবান।।
ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর স্ববোধ অধিষ্ঠান
সচ্চিদানন্দঘন সর্বসমাধান।।
ব্রহ্মারাম ইষ্ট আত্মারাম শিবরাম ইষ্ট বিষ্ণুরাম
হংসরাম ইষ্ট পাণারাম সত্যরাম ইষ্ট অখণ্ড প্রজ্ঞান।।
পরম সুখ শান্তি মুক্তি নির্বাণ
অদ্বয় অব্যয় অচ্যুত অমৃতনিধান
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বানুভব বিজ্ঞান
জীবনদেবতা প্রভু নিত্যবর্তমান।।

সৎসঙ্গের প্রারম্ভেই উপরোক্ত গুরুভজনটি উদ্গীত হল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে। ভজনটি শেষ হবাব পরে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—মানুষ সুখ, শান্তি, মুক্তি, নির্বাণ ও আনন্দলাভের জন্য যে চেষ্টা, কর্ম, চিন্তা প্রভৃতি করে তার জন্য সাধনভজন, ধ্যান, বিচার প্রভৃতি নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। জীবনে চলার পথে একটা আদর্শ দরকার হয়। সেই আদর্শকে মানুষ গুরু, ইষ্ট, ঠাকুর বলে ভজনা করে। এই তিনটি শব্দ মূলত এক অর্থবোধক। যিনি গুরু, তিনি-ই ঈশ্বর এবং তিনি-ই ঠাকুর।

'ঠাকুর' মানে যে অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ নিত্যবর্তমান, সেই সত্যকে বা অনুভূতিকে আচরণের মাধ্যমে সব সময়ের জন্য যিনি প্রকাশ করেন।

ইষ্ট মানে হল কল্যাণকর। যা কল্যাণকর ও মঙ্গলময় তা-ই অখণ্ড ও অনন্ত। তাই স্থায়ী ও নিত্য। অস্থায়ী হল অনিত্য। পরম সুখ, শান্তি, মুক্তি ও নির্বাণকেই গুরু, ইষ্ট ও ঠাকুর রূপে ভজনা করা হয়। একে ধরার জন্য ব্যক্তিকে মাধ্যম করা হয়। উদ্দেশ্য হল অখণ্ডস্বরূপকে ধরা।

যত জীবন আছে তত ইষ্টদেবতা আছে। অর্থাৎ দেবতার সংখ্যাও অনেক। কারণ জীবনরূপে ভগবান স্বয়ং। কোনও জীবনই ছোট বা বড় নয়। মনের কাছে এসে ছোট বা বড় হয়ে যায়। 'ইষ্ট' অর্থে প্রাণস্বরূপকেও বোঝায়। প্রত্যেকের প্রাণই হল প্রত্যেকের ইষ্ট। ঠাকুর হল শুদ্ধ ভাব ও বোধস্বরূপ। ঠাকুরবোধে বা ইষ্টবোধে জীবনে চললে অর্থাৎ 'আমার মধ্যে ঠাকুর এবং ঠাকুরের মধ্যে আমি' এই বোধে চললে ভাবশুদ্ধি হয়। শক্তি হল প্রাণ। নিজের ভিতরে যে প্রাণ জড়ীভূত, সসীম বা বিকৃত হয়ে থাকে তা যে-বোধ দিয়ে রূপান্তরিত হয় তার নাম ঠাকুর।

গুরুভজন সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে—গুরুসেবা হল শ্রেষ্ঠ পূজা। গুরু হল আত্মপ্রাণ। গানে তাই বলা হয়েছে—

— হংসরাম ইষ্ট প্রাণারাম
সত্যরাম ইষ্ট অখণ্ড প্রজ্ঞান।

অখণ্ড প্রজ্ঞান হল একমাত্র সত্য বস্তু। তা-ই হল বিশুদ্ধ জ্ঞান। গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি, যদিও জীবনের মাধ্যমে তাঁর ব্যবহার হয়। সব কিছুর মধ্যে গুরুকে অখণ্ডবোধে অভেদে মানা হলে প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

রূপ-নাম-ভাব-বোধ, এই চার স্তরের অনুভূতিকে চতুর্বিধ গুরুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার মধ্যে চতুর্থ গুরুর কৃপা পাওয়াই হল বোধস্বরূপের কৃপা পাওয়া। চতুর্থ গুরু প্রজ্ঞানের বা বোধস্বরূপের সন্ধান দেন। ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বললেও গুরু ব্যক্তিস্বরূপে সীমাবদ্ধ নন। তিনি ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে।

স্থূলের জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তা অন্তরে থাকে প্রাণরূপে এবং কেন্দ্রে থাকে মন-বুদ্ধিরূপে। বিজ্ঞানময় গুরু হল বিশুদ্ধ ভাবঘন, মনোময় গুরু হল নাম এবং প্রাণময় গুরু হল দেহ বা রূপ।

অধ্যাত্মসাধনার গতি অবলম্বনে ক্রমশ বাইরে থেকে অন্তরে এবং অন্তর থেকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়। এই ভাবে হয় অগ্রগতি বা জীবনের পরিণতি বা পূর্ণতা প্রাপ্তি। শিশু যেমন ক্রম ধরে যৌবন ও বার্ধক্যে পৌঁছায় সে রকম অনুভূতির পর্যায় স্থূল থেকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মে যায়। সেই জন্য গুরুকে প্রথমে স্থূলরূপে অর্থাৎ প্রাণময় ধরলেও দ্বিতীয় স্তরে মনোময় গুরু, তৃতীয় স্তরে বিজ্ঞানময় গুরু এবং চতুর্থ স্তরে বোধময় গুরুর পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্তরে গুরু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন গুরুভাব দিয়ে, কেননা তিনি তো বোধময়। গুরু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন কোনও বিকল্প ভাবনা দিয়ে নয়, সহজ ভাবেই দেন। শ্রুত কথাগুলি মনে রেখে চলাই হল বিচার করা। বিচারশীল না-হলে মন মলিন ও বিকৃত থাকে। সেই মন সাধন করতে গেলে তামসিকতার প্রভাবে জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা ও নিদ্রার মধ্যে তলিয়ে যায়। বোধস্বরূপে সে যেতে পারে না। [২।১।৭৭]

বিনা শ্রবণে আধ্যাত্মিক সাধন ফলপ্রদ হয় না

অনুভূতির রাজ্যে প্রথম কথা হল যে সাধনা ছাড়া কেউ কোনও দিন অনুভূতি লাভ করতে পারে না। যারা সাধনা করে তাদের কাছেই সাধারণ বিজ্ঞান পাওয়া যায়। সেই অনুভূতিস্বরূপকেই গুরু বলা হয়। যাঁরা শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই বোধের বিজ্ঞানের রহস্য খুলে দিতে পারেন।

শ্রবণ না-করে অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চা করা যায় কিনা শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিগুরু বশিষ্ঠদেব তাঁকে যে গল্পটি বলেছিলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সেই গল্পটি এখানে উল্লেখ করলেন—তিনজন কাঠুরে ছিল বড় গরীব। অতি কষ্টে দিনযাপন করে শেষে এক সময় তাদের এমন অবস্থা হল যে অন্ন আর জোটে না। না-খেতে পেয়ে মরার মতো অবস্থা। তখন তারা পরামর্শ করে রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। একজন পেটের দায়ে অন্য বৃত্তি নিল। আরেকজন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানে গিয়ে দেখে অনেক কাঠ। কাঠ কাটবে ভাবল কিন্তু কুড়ুল নেই—সুতরাং সেও পয়সা রোজগারের জন্য অন্য বৃত্তি নিল। তারপর সেই কাজেই সে বাঁধা পড়ে গেল। কুড়ুল কিনবার কথা ভুলে গিয়ে দিব্যি সে ঘরসংসার পেতে বসল।

তৃতীয়জন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছের নিচে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ল। সেখানে সে এক মহাত্মার দর্শন পেল। তাঁর কাছে গিয়ে বলল—আজ আমার কিছু খাওয়া হয়নি, পেটের জ্বালায় মরছি, একটু খাবার জোগাড় করা যায় কী করে? মহাত্মা একথা শুনে তাকে কিছু খাবার খেতে দিলেন। সে বলল—আজ তো দিলেন, কাল কী হবে? মহাত্মা তাকে বললেন—আচ্ছা, কাল তুমি এস। আসবার সময় কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনো।

পরদিন কাঠুরে শুকনো ডালপালা নিয়ে এসে হাজির। মহাত্মা তাকে খেতে দিলেন। এ ভাবে পর পর কয়েকদিন সে সাধুর দেওয়া খাবার খেয়ে প্রাণ বাঁচাল। তারপর কাঠুরে একদিন বলল—আপনি এ ভাবে ক'দিন আমাকে খেতে দেবেন? আমার জীবন চলবে কী করে?

মহাত্মা তখন তাকে একটি কুড়ুল দিয়ে বললেন—সামনের ঐ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এসে এখানে কিছু রাখ এবং বাকিটা নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে দেখবে সেখানে আমার মতো আরও একজন বসে আছেন, তাঁকে দিয়ে এস, তিনি তোমাকে কিছু দেবেন।

কাঠুরে কাঠ নিয়ে পাহাড়ের আরও উপরে উঠে গিয়ে একজন মহাত্মার দর্শন পেল। তাঁকে কাঠ দিতেই তিনি কাঠুরেকে দু'টি পয়সা দিলেন। কাঠুরে নেমে এসে প্রথম মহাত্মাকে বলল—বাবা, এর চেয়ে আরেকটু বেশি রোজগার হয় না?

সাধু বললেন—ওখান থেকে আরও একটু উপরে উঠে যাও, সেখানে আমার মতো আরেকজনকে পাবে, তাঁকেও কাঠ দিয়ে এস। কাঠুরে সে-ভাবে কাঠ দেওয়াতে তৃতীয় মহাত্মা তাকে আটটি পয়সা দিলেন। পরদিন প্রথম মহাত্মা তাকে আরও উপরে এগিয়ে যেতে বললেন। এই ভাবে পর পর তিনি দশটি জায়গার সন্ধান দিলেন এবং কাঠুরেও বেশ পয়সা রোজগার করতে লাগল।

গুরু বশিষ্ঠদেব তখন রামচন্দ্রকে বললেন—দেখ, তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ও উত্তরের দ্বারা কত ধন উপার্জন করল।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—অপর দু'জন পেল না কেন?

বশিষ্ঠদেব—তাদের তো জিজ্ঞাসা জাগে নি।

রামচন্দ্র—আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

বশিষ্ঠদেব তখন আরেকটি ঘটনা বললেন—একজন গৃহী সংসারে স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার না-পেয়ে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কী করে তার দিন চলবে? ভাবল—সাধু হয়ে যাব। তখন সে সাধুর সাজ পোশাক পরে নিল। কিন্তু শাস্ত্র পড়েনি, কাজেই কোনও কথা আর বলতে পাবে না। তাই এক মহাত্মার কাছে সে শাস্ত্র পড়তে গেল। তিনি শাস্ত্র পড়ালেন কিন্তু লোকটি কিছুই বোঝে না।

মহাত্মা তাকে বললেন—তুমি বুঝতে চাও তো কিছুদিন এখানে থাক। লোকটি তাঁর আশ্রমে থাকতে লাগল এবং মহাত্মার কথাগুলি মুখস্থ করতে লাগল। নির্জনে গিয়ে সে জোরে জোরে উচ্চারণ করে মহাত্মাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করত।

যেখানে সে এই অভ্যাস করত সেখানে এক গাছে এক শাপভ্রষ্ট পাখি থাকত। তাকে যিনি শাপগ্রস্ত করেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা পরপর যদি সে শুনবার সুযোগ পায় তাহলে তার মুক্তি হয়ে যাবে।

পাখি পর পর কয়েকদিন তার কাছে শুনল—সবই ব্রহ্ম, সবই চৈতন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে কয়েকদিন পরেই সে শাপমুক্ত হয়ে গেল।

বশিষ্ঠদেব তখন রামচন্দ্রকে বললেন—শ্রবণ ও শাস্ত্রপাঠের কী ফল, দেখ। রামচন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুবরণ না-করলে কী জীবন্মুক্ত হয় না?

উত্তরে তিনি বললেন—জীবন্মুক্ত হওয়া মানেই গুরু হয়ে যাওয়া। গুরুর সান্নিধ্য ব্যতীত গুরু হওয়া যায় না। [৯।১।৭৭]

যথার্থ ভজনের তাৎপর্য

গুরু হলেন চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যের স্মরণ করাই হল গুরুভজন করা। অথচ গুরুভজন করতে গিয়ে মানুষ নিজ অতিরিক্ত অন্য কিছু ভজন করে। কিন্তু গুরুই হলেন নিজস্বরূপের অভিব্যক্তি। তা-ই হল সব সাধনার মূল রহস্য। শিক্ষা ও ব্যবহারের সময় এর পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ শিক্ষা অনুরূপ ব্যবহার হয় না। [১১।১।৭৭]

যিনি আত্মবোধে বাস করেন তাঁকেই গুরু বলা হয়। গুরু হওয়ার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকলে যে-কেউ গুরু হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। [৬।২।৭৭]

সদ্‌গুরুগণ সমগ্র রূপকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করেন। সব কিছুকে একবোধে গ্রহণ না-করলে বা জীবভাব দূর না-হলে জীবন্মুক্তি লাভ হয় না। [৬।৩।৭৭]

প্রত্যেকের আত্মগুরু তার সম্মুখে, পিছনে, অধঃ, উর্ধ্বে সমান ভাবেই আছেন। [১৩।৩।৭৭]

বিকার শোধনের জন্য সংযমের প্রয়োজন

সংযম ছাড়া বিকারকে শোধন করা যায় না। চিন্তার সংযম খুব কঠিন। বড় বড় সাধকের মনেও সংস্কারবশত এমন এমন চিন্তা এসে যায় হঠাৎ, যা সে কোনও মতেই রোধ করতে পারে না, কারণ তার গোড়া থাকে অনেক গভীরে। অতীত অতীত জন্মের প্রভাবে চিন্তা ওঠে। এগুলি গুরুশক্তি ও নিজের অনলস চেষ্টা ছাড়া রোধ করা যায় না। কেউ যদি মনে করে তার গুরুই সব করে দেবেন তবে তার আর কোনও দিনই সংযম অভ্যাস হয় না। নিজের দোষত্রুটি শোধনের জন্য গুরুর আদেশ মেনে নিজের চেষ্টায় চলতে হয়।

গুরু প্রত্যেকের ভিতরে ও বাইরে আছেন ঠিকই কিন্তু উভয় গুরুর মিলন হয় চিত্তশুদ্ধি হলে। গুরু যতখানি ব্যক্ত ঠিক ততখানি অব্যক্ত। ভিতরে বোধের স্থিতি হলে ধরা পড়ে যে এই গুরু হলেন—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।" কেবল জ্ঞানমূর্তি গুরুর সঙ্গে নিজবোধস্বরূপের ঐক্য অনুভূত হলে দেখা যায় যে তিনি নিজের আত্মবিলাসে যা-কিছু প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে তিনি নিজেই আছেন। এইরূপ বোধের বোধে যে চলে তার কোনও অসুবিধা হয় না। রাম, গুরু, শিব যে নামে বা ভাবেই ভজন করা হোক অখণ্ড বোধকে বাদ দিয়ে গুরুভজন হয় না।

একই চৈতন্যস্বরূপ আপন আত্মবিলাসে আপনাকে প্রকাশ করে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শুদ্ধ চৈতন্যকে শুদ্ধ চৈতন্য দিয়ে ভজন করতে হয়। গুরুমূর্তিকে গুরুভাব দিয়ে ভজন করতে হয়। তা না-হলে মনুষ্যবুদ্ধিতে দোষত্রুটি দর্শন করা হয়। তার ফলে গুরুর কোনও ক্ষতি হয় না, কেবল নিজেদের মনই ক্ষতবিক্ষত হয়।

মনের ভাল লাগা বা না-লাগা নিয়ে চললে বিকারের মধ্যেই থাকতে হয়। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধককে বহু জপধ্যান ও কান্নাকাটি করতে হয়। কান্নাকাটি বা অনুশোচনা না-থাকলে শুধু জপধ্যানে অহংকার বাড়ে। অখণ্ড ভাবের ভজনাতে বৈচিত্র্যের প্রতি আসক্তি ছুটে যায়, ভোগবৃত্তি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। [২০।৩।৭৭]

সদ্‌গুরুর কর্মপদ্ধতি

এ জীবনই যেন শেষ জীবন হয়, এইরূপ মনোভাব নিয়ে সব সংস্কারকে নির্মূল করার জন্য জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখের ধারণাকে নির্মম ভাবে পরিহার করতে হয়। এইরূপ দৃঢ়চেতা জীবকে ঈশ্বর সাহায্য করেন। যার ইচ্ছা নিরন্তর পুরুষকারের মাধ্যমে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে তাকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর তার কাছে প্রথমে গুরুরূপে আসেন এবং মহারত্নরূপ পরমসিদ্ধি লাভের জন্য অন্তরে ডুবুরির মতো ডুবে থাকার জন্য প্রেরণা দেন। তিনি প্রেরণার মাধ্যমেই পুরুষকারকে জাগিয়ে দেন। এই পুরুষকার দিয়েই হয় স্বরূপের অনুসন্ধান ও স্বভাবের বিশ্লেষণ।

একটা দেহ নষ্ট হলেও গুরু তাকে আবার তুলে নিয়ে আসেন। শিষ্যকে স্বরূপবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তবে গুরুর ছুটি। সদ্‌গুরুর পর্যায়ে যাঁরা ওঠেন তাঁদের বিশ্রাম নেই। তাঁর আশ্রিত যারা হয় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের পরমসিদ্ধির জন্য তিনি সচেতন থাকেন। দরকার হলে তাদের পূর্ণ সিদ্ধির জন্য তিনি বারবার লৌকিক দেহধারণ করেও আসেন।

স্বানুভূতির ভাষায় গুরু[১] মানে—সর্বোত্তম পুরুষকার। সেই পুরুষকারের দ্বারা ব্রহ্মবোধ আপনা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়। যিনি প্রবুদ্ধ করে দেন, সেই সর্বোত্তম বোধই হল সদ্‌গুরুর মূর্তি। অন্তরে অস্ফুট চৈতন্যকে জাগিয়ে দেওয়া হল প্রবুদ্ধ করা, কুণ্ডলিনী শক্তি বা তীব্র পুরুষকারকে জাগিয়ে দেওয়া। সেখানে বিশ্রামের বা অবকাশের একান্ত অভাব থাকে। সাধনা করতে করতে শ্রান্তিক্লান্তি দূর করার জন্য শিষ্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে; কিন্তু নিরন্তর গুরুর সাবধানবাণী তাকে সচেতন করে দেয় যে—বিশ্রাম অনেক করা হয়েছে এবার সব পরিহার করতে হবে।

শিষ্যকে উপযুক্ত করে তৈরি করার জন্য গুরু শিষ্যকে শাসন, তাড়ন, পীড়ন, ভর্ৎসনা, উপেক্ষা, অবহেলা, কর্তব্য ও সেবায় ত্রুটিদর্শন, কঠোর আজ্ঞা বা নির্দেশ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু বর্তমান যুগে অভিমান সকলের এত প্রবল থাকে যে গুরুর মুখে সামান্য দু'টি কড়া কথা শুনলেই সাত দিন আর গুরুর সান্নিধ্যে যায় না।

শিষ্যকে শাস্তি দিয়ে গুরু নিজেও শাস্তি গ্রহণ করেন। শিষ্যকে প্রহার করে গুরু হয়তো নিজেও তিন দিন অভুক্ত থাকেন। বাইরে থেকে সদ্‌গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁরা বাইরে যতখানি কঠোর, অন্তরে তদপেক্ষা অধিক কোমল ও প্রেমঘন। বাইরে প্রেম দেখানো হল আসক্তি। আশ্রিতকে সমবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার জন্য গুরু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শিষ্য হয়তো কোনও সময় জপধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন গুরু বাকি জপটুকু পূরণ করে দেন। গুরু কী করে এ সব করেন তা গুরুই জানেন, আর কেউ জানে না। কখনও হয়তো তিনি সমাধিতে ডুবে গেলেন এবং শিষ্যের সব সংস্কার জেনে নিয়ে, কোন ভাবনা দিয়ে তার কী কাজ হবে তা দেখে সেই ভাবনা তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কাজ করেন। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গুরু স্বয়ং শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাক্‌শক্তি মন্ত্ররূপ ধারণ করে শ্রুতির মাধ্যমে কাজ করে। শ্রুত বস্তু যখন অন্তরে জাগ্রত হয়, তখনই গুরুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

মন্ত্র মানেই দেবতা। দেবতা-ই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর বাক্ হল মন্ত্র। সেই বাকের শক্তি প্রথমে বোঝা যায় না। পরে বোঝা যায় যে কী ভাবে গভীরে প্রবেশ করে তা শুদ্ধ ভাবরূপ ধারণ করে ও স্মৃতির মধ্যে ফুটে ওঠে। চৈতন্যের দ্বারাই চৈতন্যের জাগরণ হয়। চৈতন্যের ব্যবহারিক রূপ হল বাক্। সত্যবাকেই কাজ হয়। সর্ববাক্‌ই সত্যের প্রতিধ্বনি। কিন্তু সত্যের সঙ্গে যদি সমভাবে চিন্তার দ্বারা বুদ্ধিকে যুক্ত না-রাখা যায় তবে বাক্ মলিন হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণ বাক্ সত্যের অংশ হলেও বহু ভাবের সঙ্গে তা মিশ্রিত হয় বলে শুদ্ধ নয়। যারা সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের বাকে সত্যের আলো থাকে।

গুরুর অনুগ্রহ বা কৃপা জীবনে বড় অদ্ভুত ভাবে আসে। 'সর্বোত্তম কৃপা বা অনুগ্রহ'[২] হল সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও তীব্র পুরুষকারের উন্মেষ হওয়া।

পাড়াগাঁয়ে অঘ্রাণ মাসের প্রচণ্ড শীতে মানুষ যখন আরাম করে লেপের নিচে ঘুমিয়ে থাকত তখন একশ্রেণীর বৈষ্ণব সাধক ইষ্টের নামগান করে টহল দিয়ে যেত—'রাই জাগো, রাই জাগো' এবং অনুরূপ

১। গুরু—এখানে গুরু অর্থে সর্বোত্তম পুরুষকারকে নির্দেশ করা হয়েছে। সর্বোত্তম পুরুষকারের প্রকাশ স্বভাব বিশ্লেষণকারী ও স্বস্বরূপ অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম যোগ্য অধিকারীদের নির্দেশ করে।

২। সর্বোত্তম কৃপা বা অনুগ্রহ—এর লক্ষ্যার্থে বলা হয়েছে সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, সংবেগ ও তীব্র পুরুষকারের বা আত্মচেষ্টার উন্মেষণ। এর সম্যক উদয়েই হয় স্বস্বরূপের স্মৃতির জাগরণ ও আত্মবোধের অবাধিত প্রকাশ। তার ফলে হয় ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি—স্বানুভূতির প্রতিষ্ঠা।

আরও অনেক রকম ভজন। তারা কিন্তু সুপ্ত গৃহস্থদের ভগবানের নাম ভজন ও জপধ্যান করার জন্য জাগিয়ে দিত। তারাও এ ভাবে গুরুর কাজ করত। এটিও ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কেবল সাধকরাই জানে টহল গানের তাৎপর্য। এই সকল ভজনের মাধ্যমে গৃহস্থদের কল্যাণার্থে তাদের আরাম ভেঙে দেবার জন্য, স্বরূপবোধকে জাগিয়ে দেবার জন্য, পুরুষকারকে জাগিয়ে তোলার জন্য বা ইষ্টচিন্তার জন্য সকলকে জাগিয়ে দিয়ে সাহায্য করত। [১০।৪।৭৭]

মনকে অন্তর্মুখী করার প্রয়োজনীয়তা

গুরুর কাছ থেকে সাধন নির্দেশ নিয়ে এসে অভ্যাস করতে হয়। খাওয়াদাওয়া, কর্ম ও সঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। পূর্বে যে-সকল অভ্যাসে মন যুক্ত ছিল সেই অবস্থা থেকে মনকে গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখী করতে হয়। অন্তর্মুখী মন নিষ্কর্মা হয় না; বরং সেই মন দিয়ে আরও বেশি লোকের জন্য অধিক কাজ করা যায়। সর্বতোভাবে সচেতন হয়ে নিজেকে serve করা মানে Universe-কে serve করা। কারণ মা বা গুরু বলতে নিজেরই বৃহত্তম অংশকে বোঝায়। এই বৃহত্তম অংশকে ভুলে ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সকলে মেতে থাকে। বৃহত্তম অংশকে ভুলে থাকার জন্য পরে আঘাত পেতে হয়। এই ভ্রান্তি দূর করাই হল সাধনা।

গুরুকে যে ভজে না, সে পশুতুল্য। দেহকে ছেড়ে দেহীকে যে পূজা করে, দেহীর যে সেবা করে সে-ই যথার্থ মানুষ। তারই মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়েছে। দেহীর পরিচয় যে জানে সে-ই দেবতা। দেহী হল চিদানন্দময়ী মা বা গুরু স্বয়ং। জন্ম জন্মান্তর থেকে যিনি প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগান দিয়ে আসছেন তাঁকে স্মরণ করে তাঁর ঋণ শোধ করতে হয়। তাঁকে স্মরণ করলে অকৃতজ্ঞতারূপ বিকার দূর হয়ে যায়। কৃতজ্ঞ হলে পূর্ণস্বরূপ প্রকাশ পায়। [১২।৪।৭৭]

মানুষ নিজে পূজা বা জপধ্যান করতে পারে না। সকলের মধ্যে বসে গুরুই জপ করেন। গুরু হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাই তাঁদের হাতে জপের মালা আছে। শ্যামা মায়ের হাতেও একটি অক্ষর মালা থাকে। সকলের মধ্যে বসে গুরু বা মা-ই সব কিছু করেন। কাজেই মাকে বা গুরুকে অবহেলা করে অহংকারের প্রভাবে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। মাকে আপন ভাবলেই সব কিছু সহজ হয়ে যায়। সেই জন্য 'আমি তোমার' এ কথা না-বলে 'তোমার আমি' এ কথা বলা ভাল। মাকে সম্মুখে রাখলে মা সন্তানকে আগ্‌লে রাখেন। [১৭।৪।৭৭]

গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে গোলবারান্দায় নির্দিষ্ট আসনে বসবার পরেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে ভক্তদের উদ্দেশে বলতে আরম্ভ করলেন—

এক বাড়িতে একজন খুব অসুখে ভুগছিল। তার জন্য হরিবৈদ্যকে ডাকা হল। তিনি এসে রোগীর জন্য ওষুধের সঙ্গে নানা রকম পথ্য ও খাবারের বিধান দিলেন। রোগী সে সব শুনে বলল—তোমার এত বিধি-নিষেধ মেনে এত পথ্য খেতে পারব না। হরিবৈদ্য বললেন—তাহলে আমি আর কী করব? এবার আমি যাই। রোগীও বলল—হ্যাঁ, যাও।

তারপর এ রকম আরও কয়েকজন বৈদ্য ডাকা হল; কিন্তু তাঁদের নির্দেশও সে শুনতে রাজি হল না। তখন তাঁরা বললেন—তাহলে তোমার রোগও আমরা সারাতে পারব না। চিত্তশুদ্ধির প্রসঙ্গেই এই ঘটনাটি বলা হল।

বৈদ্যের নির্দেশিত ওষুধ ও পথ্য খেয়ে যেমন রোগ নিরাময় করতে হয়, সেরূপ চিত্তশুদ্ধির অন্তরায়গুলিকে গুরুমহারাজের নির্দেশ অনুসরণ করে অপসারিত করতে হয়।

শম-দমের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়। এ যুগে সকলের পক্ষে শম-দম করা সম্ভবপর নয়। এ সব খুবই কঠিন। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পাঁচটির মধ্যে আরও অনেক বিভাগ আছে। যেমন, যম[১] নিয়ম[২] মিলে দশটি পৃথক পৃথক অভ্যাস আছে। সেইরূপ আসনে[৩]র মধ্যে চুরাশি লক্ষ আসন আছে এবং প্রাণায়াম[৪]ও আছে বিরাশী প্রকার। তারপর আছে প্রত্যাহার। তাও অতীব কঠিন। তারও পরে আছে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পাঁচটি হল বহিরঙ্গ এবং বাকি তিনটি হল অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ সাধনগুলি সম্যক্‌রূপে সাধিত হলে অন্তরঙ্গ সাধনগুলির অভ্যাস সম্ভব হয়। সর্বশেষ সাধন হল ধ্যানপক্ক সমাধি। সমাধির পরিপক্ক অবস্থায় হয় আত্মসিদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভ ও মুক্তি। বহিরঙ্গ সাধন সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করা বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, অন্তরঙ্গ সাধন তো দূরের কথা আর সমাধিসিদ্ধি তো বলাই বাহুল্য। এই কারণেই এই যুগের সাধনা শুধু কৃপাসাপেক্ষ।

ইষ্ট বা গুরুর রূপ মহাত্মা মহাপুরুষদের মাধ্যমে যে-ভাবে অভিব্যক্ত হয় সেই ভাবকে সে-ভাবে গ্রহণ করার জন্য যা প্রয়োজন তা পালন করাই হল কৃপালাভের একমাত্র উপায়। কারণ নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছাশক্তি যে-ভাবে ক্রিয়া করে তার চাইতে আরও বৃহত্তর শক্তিকে কাজ করতে দিতে হয়। বৃহত্তর শক্তিকে না-মানলে তা সম্ভবপর হয় না। [১৯।৪।৭৭]

গুরুভজনের প্রথম নির্দেশ

যাঁর ভাবের মধ্যে ভোগের গন্ধ বা স্বার্থের গন্ধ থাকে না তাঁর মধ্যে ঈশ্বর গুরুরূপ ধরে আসেন। গুরু ও ঈশ্বর অভেদ। নররূপে ভগবানের যে অভিব্যক্তি তা-ই গুরু। গুরুভজনের প্রথম নির্দেশ হল—সবই গুরুমূর্তি—এই বোধে ভজন করতে হবে। [২৪।৪।৭৭]

সদ্‌গুরুর মহিমার বিশেষ তাৎপর্য

গুরু মানে নিজের পরিপূর্ণ সত্তা বা 'আমির আমি' অর্থাৎ অখণ্ড ভুমা পূর্ণের আমি। সে অণু থেকে অণুতম, আবার বৃহৎ থেকেও বৃহত্তম। প্রতি আমির মধ্যে সেই ব্রহ্মের বীজ পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বসে আছে। সে তার আপন পূর্ণস্বরূপকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছে। শিবই জীব সাজেন আপন অণুতম বিভূতির অভিব্যক্তির জন্য। কেউই সমষ্টি সত্তার বাইরে নয় এবং সমষ্টি সত্তাও কারও বাইরে নয়। এজন্য গুরু, ঈশ্বর ও ঠাকুরকে সম অর্থবোধক বলা হয়েছে।

বৃহৎ-এর পরিচয় পেতে হলে বৃহৎ-এর কতগুলি কথা শুনতে হয়। মহৎকে বা গুরু-আত্মাকে অবলম্বন করে যা শোনা হয় তা-ই মহৎ-এর প্রসঙ্গ বা গুরু-আত্মার প্রসঙ্গ।

সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণের এমনই মহিমা যে ছোট বালক যেমন রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যায়, সৎপ্রসঙ্গ শুনতে শুনতেও সেইরূপ মন,প্রাণ আপনিই স্থির ও নিবিষ্ট হয়ে যায়। যেখানে সৎপ্রসঙ্গ ও আত্মপ্রসঙ্গ হয় সেখানে বিদেহী আত্মারা তো আসেনই, এমনকী দেবলোক থেকে দেবদেবীরা পর্যন্ত নেমে আসেন এবং

১। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচটি।

২। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। যম ও নিয়মাদির অভ্যাসে চিত্ত-মন শোধিত হয়। শুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়।

৩। আসন—সুখাসন, পদ্মাসন, বজ্রাসন প্রভৃতি।

৪। প্রাণায়াম— রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি তিন প্রকার প্রাণের সংযম দ্বারাই সর্ববিধ প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হয়।

সৎসঙ্গীদের মধ্যে উন্নত সংস্কারের কেউ কেউ তাদের দর্শনও পান। সদ্‌গুরু মহারাজগণও তাঁদের এক অংশ দিয়ে তা আস্বাদন করেন।

প্রত্যেকেই তোমরা মনে রাখবে যে সবার গুরুই সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকেন এবং সব গুরু এক গুরুরই প্রতিমূর্তি। কত বড় আনন্দের কথা যে চতুর্বিধ গুরু সব সময় প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত আছেন, বিযুক্ত কেউই নয়। এই ভাবনাতে জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের উদয় হয়। 'আমি গুরুর মধ্যে' এবং 'গুরু আমার মধ্যে' আছেন—এ-ই হল গুরু মহিমার চরমতম ঘোষণা।

অখণ্ডবোধে গুরুভজনের তাৎপর্য

খণ্ড ভাবে গুরুকে ধরতে নেই। অখণ্ড এক-এর অন্তরে এক-কে ধরে ভজন করতে হয়। আপন গুরুকে ভেবে ভেবেই গুরুভাবের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। আমার মধ্যে গুরু এবং গুরুর মধ্যে আমি, আবার গুরুর মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে গুরু—এই ভাবে সমবোধের পুনঃপুনঃ সচেতন অনুশীলন দ্বারা চিত্তের স্থিতি ও শোধন হয়; তার ফলে সমবোধেরও স্থিতি হয় এবং খণ্ডভাব ও দ্বৈতভাব আর থাকে না। সমবোধের স্থিতিতে আত্মবোধের স্ফূর্তি জাগে। আত্মবোধের স্ফূর্তিতেই গুরুর অশেষ কৃপা অনুভূত হয়। গুরুর অশেষ কৃপা ও আত্মানুভূতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই কথাটিকে ঘুরিয়েও বলা চলে। এইজন্য নমস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 'এর মধ্যে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) উদ্গীত হয়েছিল—'নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং নমো মহ্যং নমোস্তুভ্যং/তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ'।

নিত্যবর্তমানবোধে সব মানার মাধ্যমে আত্মবোধ সিদ্ধ হয়

স্বাত্মবোধের স্বতঃস্ফূর্ত ধারক, বাহক ও পরিবেশক হওয়া চাই। কাজেই আপন আপন গুরুকে তৃপ্ত করার সহজতম বিধান হল সর্ব রূপ-নাম-ভাব তা যা-ই হোক না কেন তা-ই আমার আদর্শ। পরমেষ্ঠিগুরু[১] ও আমি অভেদ। অতীত অতীত জন্মের গুরু সেই এক অখণ্ড গুরুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কখনও কারও কারও মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। তা হল ভিন্ন ভিন্ন দেহে সাধনার যে উৎকর্ষ তারই তরঙ্গ বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানের দেহ অনন্ত দেহের সঙ্গে ও অনন্ত গুরুর সঙ্গে যুক্ত আছে। মনে রেখ যে নিত্যবর্তমান বোধই হল নিজবোধরূপ আত্মগুরুর প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই বোধে হয় সর্বসিদ্ধির পূর্ণতা। কেবল মানার মাধ্যমেই তা সহজসাধ্য ও সিদ্ধ হয়। [১।৫।৭৭]

ভগবানের কাজ গুরুর মাধ্যমে সিদ্ধ হয়

পরমশিব, পরব্রহ্ম ও পরমেষ্ঠিগুরু একই। এই শিবস্বরূপ হল প্রত্যেকের নিত্যস্বরূপ। নিত্য হলেই তা অখণ্ড ও সৎ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়। নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ—এই তিনটি শব্দ দ্বারা যাঁকে বোঝায় তিনিই হলেন পরমেষ্ঠিগুরু, পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বর। তিনিই কিন্তু তাঁর অনন্ত শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে লীলা করেন। সব দেবদেবী তাঁরই প্রকাশ। তাদের অন্তর্গত অনেক অনেক বিভাগ আছে। আবার তাদের অন্তর্গত আছে জ্ঞান। মানুষ গুরুকৃপায় প্রতি স্তরের পরিচয় অবগত হয়। ভগবান গুরুর মাধ্যম ছাড়া কাজ করতে পারেন না। আগে গুরু সেজে নিজে নেমে আসেন, তারপর সেই মাধ্যমকে অবলম্বন করে তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ হয়।

১। পরমেষ্ঠিগুরু—গুরুর বিভিন্ন স্তর আছে, যথা—গুরু, মহাগুরু, পবমগুরু, পরাৎপরমগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু। পরমেষ্ঠিগুরু হলেন সর্বোত্তম গুরু। পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ও পরমেষ্ঠিগুরু এক অর্থবোধক ও এক পর্যায়ভুক্ত।

গুরুগত চিত্ত, ঈশ্বরগত চিত্ত, জ্ঞানের সাধক, যোগী প্রভৃতি সকলেরই লক্ষ্য এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ নিজের পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। [৩।৫।৭৭]

অখণ্ড আমির স্বরূপ

কেন্দ্রসত্তা হল ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, গুরু। কেন্দ্রের সমর্থন ব্যতীত অন্তঃসত্তা কাজ করতে পারেন না। তিনি (কেন্দ্রসত্তা) এত উদার ও মহান যে সব বৃত্তিকেই তিনি সমর্থন করেন, নইলে নিম্নস্তরের জীবন টিঁকতে পারত না। সবই যখন তিনি নিজেই, তখন সমর্থন না-করারও কোনও কারণ নেই। বৈচিত্র্য তাঁর বিলাস। স্বেচ্ছায় তিনি নানা রূপ ধারণ করেন। এই ভাবনাতে পৃথক ভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। 'সবই আমি'—এই পরম সত্য গুরুমুখে শুনে তা ব্যবহারে রাখতে পারলেও সব শোধন হয়ে যায়। কিন্তু কাঁচা-আমি যতক্ষণ, ততক্ষণ তা বলা যায় না।

'অখণ্ড আমি' সম্বন্ধে অনুভবসিদ্ধগণ বলেন—'আমি' বৈচিত্র্যের কারণ ও কার্য, দ্বৈতের কারণ ও কার্য, একত্বের সব কারণ ও কার্য এবং তুরীয় ও তুরীয়াতীতের স্বরূপ। প্রথম থাকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি' তারপর 'আমার মধ্যে তুমি', তারপর 'তুমির মধ্যে আমি'। তখন 'আমি' ছাড়া বা 'আমি' অতিরিক্ত পৃথক আর কিছুই থাকে না।

যখন 'ইন্দ্রিয়প্রধান যুগ' হয় তখন 'অখণ্ড আমি'-র ব্যবহার নিষেধ করা আছে। যখন 'মনপ্রধান যুগ' আসে তখন 'তুমির মধ্যে আমি' ও 'আমির মধ্যে তুমি' অনুভূত হয়। যখন বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় বা বুদ্ধি শোধন হয় তখন তার মধ্যে আনন্দধারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তখন দেখা যায় এই আমি কোনও ব্যষ্টি নয়, কোনও বৃত্তি নয়, কোনও গুণ নয়, এই আমি হল বোধময় সত্তাস্বরূপ। [৮।৫।৭৭]

গুরুর হাতেই শিষ্যের যোগ্যতার মাপকাঠি ধরা থাকে

ঋষি যুগে ঋষিগণ গুরুবাক্য বিশ্বাস করে ও তদনুরূপ সাধনা করে আত্মসিদ্ধি ও মুক্তি লাভে ধন্য ও কৃতকৃত্য হতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষ বিনা সাধনায় সিদ্ধি ও পূর্ণতার ফল পেতে চায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে সাধনসিদ্ধির পরে প্রয়োজন অনুসারে গুরু শিষ্যকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করতে পারেন, কারণ সিদ্ধির ব্যবহারে যাতে কোনও রকম দোষত্রুটি না-থাকে।

অনেক সময় শিষ্যের চরম যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য তার সিদ্ধিলাভের পরেও গুরু শিষ্যের সিদ্ধির ঘরে চাবি আটকে দেন এবং যথাকালে বিশেষ পরীক্ষার পরে তা খুলে দেন। তখন শিষ্যের সম্মুখে আর কোনও অন্তরায় থাকে না; সহজ ভাবেই সে তার সিদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। যে গুরু এই রকম ভাবে শিষ্যকে তৈরি করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। অনধিকারীর হাতে বড় অধিকার ছেড়ে দিতে নেই; অযোগ্যের হাতে দুর্লভ বস্তু পড়লে অপব্যবহারের ফলে তা সাধারণত বিকৃত ও বিনষ্ট হয়। যোগ্যতা ও অধিকার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন; অধ্যাত্মক্ষেত্রে তা বলাই বাহুল্য। [২৬।৬।৭৭]

মায়াযোগে কূটস্থচৈতন্যই ঈশ্বর ও জীব রূপে প্রকাশ পায় এবং ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন

শুদ্ধ আত্মার জন্য কোনও সাধনভজনের দরকার হয় না। এই শুদ্ধ আত্মাই হল জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী সাক্ষী কূটস্থচৈতন্য। কূটস্থ-আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বিশুদ্ধ এক চৈতন্যই সাক্ষী আত্মস্বরূপের অন্তরে অনুভূত হয় এবং ব্রহ্ম ও জগৎ রূপে বাইরে অনুভূত হয়।

জীব হল বুদ্ধিতে প্রতিফলিত কূটস্থচৈতন্যের পরিচয়। সেই জন্য জীবকে চিদাভাস বলা হয়। জীবের অধিষ্ঠান হল কূটস্থচৈতন্য অন্তর্যামী সাক্ষী-আত্মা। মায়াযোগে এই কূটস্থচৈতন্যই ঈশ্বর ও জীব রূপে প্রকাশ

পায় এবং এই মায়াযোগে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত হন। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ হল কূটস্থচৈতন্যের বক্ষে মায়ার সৃষ্টি। জীব হল চিদাভাস, সে মায়াধীন। মায়ারচিত তিন দেহ, পঞ্চকোষ ও তিন অবস্থার দ্বারা সে অবিচ্ছিন্ন ও সীমিত। এ-ই তার জীবনবন্ধন।

অবিদ্যামায়ার প্রভাবমুক্ত হবার উপায়

অবিদ্যামায়ার প্রভাবমুক্ত হবার উপায় আছে। স্বরূপত জীব কূটস্থচৈতন্য—শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত; কিন্তু বুদ্ধির উপাধিযোগে তার জীবত্ব প্রাপ্তি। শুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যামায়ার প্রভাব তিরোহিত হয়। তখন বুদ্ধির মল সরে যায়। বুদ্ধি নির্মল হয়। পরম বোধস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হয় শুদ্ধ বুদ্ধিতে। বুদ্ধির মলাবরণ এই অবিদ্যার প্রভাবকে অপসারিত করার জন্য বিবেক-বৈরাগ্যের সাধনভজনের প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধিরূপী জীব সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে তৎকৃপায় জীবন্মুক্তির বিজ্ঞান ও সাধন পায়। সেই সাধন নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করাকেই ভজন[১] বলে। এই ভজন নিষ্ঠা দ্বারা সে অবিদ্যা-অজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হয়ে শুদ্ধবোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করে স্বস্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তি হল এরই ফলশ্রুতি।

জীবত্বের অবসানের জন্য এবং মুক্তস্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুর নির্দেশ অনুসারে সাধনভজন জীবের পক্ষে একান্ত ভাবে অপরিহার্য। কিন্তু সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে ও পক্ষপাতদোষে সাধনভজন ফলপ্রদ হয় না। ভজনকারীদের আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ, আত্মা-অনাত্মা বিচার, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হয়।

বিনা অভ্যাসে অন্তরের মল বিনষ্ট হয় না। দোষত্রুটি শোধিত ও মার্জিত হয় না। মলিন চিত্তে, অসমাহিত মনে, সহজে বিবেকবিচার আসে না। সেই জন্য কিছু সৎ কর্ম সাধনের প্রয়োজন হয়। সৎ কর্মের সাধন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের জড়তা কাটে, তমোগুণের প্রভাব কাটে, রজোগুণের প্রভাব বাড়ে; তার ফলে জীবন উদ্যম-উৎসাহের অধিকারী হয়। এই ভাবেই সৎ কর্মের পরিণামে জীবনে সদ্‌গুণের প্রকাশবিকাশ সাধিত হয়। সৎসঙ্গের সাহায্যে তা স্বভাবে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়। ভজন, সাধন তাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। তাদের কাছে সৎপ্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রিয় বলে তারা সাধুসঙ্গ করে এবং সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করে ও নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করে।

আত্মবিচারে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে আত্মানুশীলনের বিজ্ঞান অধিক প্রিয়। জ্ঞানবাদীর কাছে আত্মানুশীলন শ্রেয়, যোগীর কাছে যোগধ্যান এবং ভক্তের কাছে ভক্তির অনুশীলন অধিক প্রিয়।

অনুভূতি সর্বক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। অনুভূতি ছাড়া কোনও সাধনভজনই কার্যকরী হয় না। অনুভূতি হল চৈতন্যের প্রকাশ। এই চৈতন্যই হল আবার ঈশ্বরাত্মা-ব্রহ্মের স্বরূপ। জীব হল চিদাভাস—বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিফলন। চৈতন্যের অনুশীলন ও ব্যবহার দ্বারাই চৈতন্যের প্রকাশবিকাশ বাড়ে। বিশুদ্ধ চৈতন্যই যখন জীবনের মূল উপাদান, সর্বভাববোধের অধিষ্ঠান এবং মুক্তিশান্তি ও অমৃতত্বের পূর্ণস্বরূপ তখন এই চৈতন্যস্বরূপই হল জীবনের পরম ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আদর্শ, লক্ষ্য এবং সর্বোত্তম পরিণাম প্রাপ্তিই হল এই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ বা একাত্মানুভূতি। নিরুপাধিক বা সোপাধিক উভয় ভাবেই এটি অনুভূত হয়।

১। ভজন—গুরুনির্দিষ্ট আদেশ ও বাণী এবং ক্রিয়া-কলাপ আচার-ব্যবহার, এক কথায় সমগ্র জীবনসাধনাকে জ্ঞানবিচার, ধ্যান-ধারণা ও সেবা প্রভৃতি সহযোগে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে অভ্যাস করাই হল যথার্থ গুরুভজন।

অবিদ্যামায়ার প্রভাবেই চৈতন্যস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রতীয়মান হয়

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে চৈতন্যের প্রথম স্তর ইন্দ্রিয়ের প্রভাবাধীন। দ্বিতীয় স্তর মনের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত। তৃতীয় স্তর মহাশূন্য স্বতঃস্ফূর্ত। চতুর্থ স্তরে প্রকাশ পায় তার পূর্ণস্বরূপ।

পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ চারটি স্তরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তত্ত্বত চৈতন্যস্বরূপে কোনও স্তর নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে চৈতন্য হল অখণ্ড শুদ্ধ পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ; তা ভেদশূন্য স্বতঃস্ফূর্ত সমরসসার বলে তা স্বরূপত অখণ্ড ভূমা নিত্যপূর্ণ। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বুদ্ধিদোষে জীবের কাছে তার প্রকাশের স্তরভেদ প্রতীয়মান হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। তা ভ্রান্তিমূলক। তবে চৈতন্যস্বরূপে অর্থাৎ স্ববোধস্বরূপে (নিত্য এক চিৎতত্ত্বে বা একেতে) প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পরমসিদ্ধিলাভ হয় না। পরমসিদ্ধি লাভের পরে অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও দেহপাত পর্যন্ত ভজনকে অনেকেই সঙ্গী রাখেন, ভজন পরিহার করেন না। পরমসিদ্ধিলাভ করার পরেও ভজনকে অনেক সময় রাখতে হয়; যেমন গুরু হয়ে গেলেও গুরুভজন করতে হয়। চতুর্বিধ স্তর অতিক্রম করার পরে পরাপরমগুরু ও পরাৎপরমগুরুর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম স্তরে গুরুভজনের জন্য ইন্দ্রিয়ের উপকরণাদির প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় স্তরে মনের বা সূক্ষ্মভাবের প্রয়োজন হয়। তা প্রথম স্তর অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হয়। তারপর আরও গভীরে মনের অতীত বা শূন্য স্তরে হিরণ্যগর্ভ ও তার কার্য বিস্তৃত। তা বাইরে থেকে অবগত হওয়া যায় না বলে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। তারও উপরে হল ঈশ্বরের স্থান। এই ঈশ্বরই হলেন সমগ্র প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি সমষ্টি জীব অর্থাৎ সমগ্র সূক্ষ্মদেহের সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ; আবার তিনিই সমগ্র জীবের স্থূল দেহ ও বিশ্বজগৎ বিরাটরূপে প্রতিভাত।

পরমতত্ত্বেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয়

এক ঈশ্বরই নির্গুণস্বরূপে পরাচিৎ বা বিশুদ্ধ চিৎ; সগুণস্বরূপে চিদাভাস ও চিৎ-এর সংযুক্তরূপ; জীবরূপে তিনি চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধি এবং জগৎরূপে তিনি চিদাভাসের প্রকাশ অচিৎরূপ।

অচিৎপ্রকাশ হল তমোপ্রধান। আবরণশক্তি দ্বারা চিৎ সেখানে আবৃত। জীবরূপ হল রজোপ্রধান; চিদাভাসের সঙ্গে বিক্ষেপশক্তির বৈশিষ্ট্যই সেখানে প্রধান। ঈশ্বর হলেন সত্ত্বগুণপ্রধান অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত চৈতন্য। সমষ্টি সত্ত্বগুণ হল চিদাভাস। সমষ্টি রজোগুণ হল জীব এবং সমষ্টি তমোগুণ হল জগৎ।

তিন গুণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্য

এই ত্রিগুণের খেলায় তিন গুণ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই প্রকাশ পায়। পৃথক ভাবে প্রকাশ পেতে পারে না; তবে বিশেষ কোনও গুণের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে কার্যকরী হতে পারে। এই তিন গুণের সম্যক্ একক রূপই হল প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান। এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়, সেই জন্য এর স্বরূপ অনির্বচনীয়; কিন্তু এর কার্য ভ্রান্তিমূলক ও জ্ঞানবিরোধী। জ্ঞানসত্তার বক্ষেই এই মায়া বা ত্রিগুণাপ্রকৃতির খেলা বা লীলা হয়ে থাকে।

বেদান্তের দৃষ্টিতে জ্ঞান-অজ্ঞান, বিদ্যা-অবিদ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ

অজ্ঞানের কার্য জ্ঞানকে আবৃত করে সাধিত হয়। জ্ঞানের অধিষ্ঠান ছাড়া অজ্ঞানের এই জগৎলীলা সম্ভব নয়। জ্ঞানেরই নামান্তর হল বিদ্যা। প্রকৃতির নাম হল অবিদ্যা। অবিদ্যার উদয়ে বিদ্যা আবৃত থাকে আবার বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা লয় হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অবিদ্যার কার্য। বিদ্যার উদয়ে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে অবিদ্যার কার্য বাধিত হয়। অবিদ্যার কার্য ও পরিণামই হল ঈশ্বর, জীব ও জগৎ।

অজ্ঞানে হয় জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, জীবনবন্ধন। জ্ঞানে হয় মুক্তি। জীবের জীবত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও জগতের জগদ্‌ভাব অবিদ্যার কার্য বলে এ সবই বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের বক্ষে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মার বক্ষে আরোপিত মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, জগৎ এ সবই উপাধি, মল ও বিশেষণ। ভ্রান্তিবশত অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপের বক্ষে উপাধিযোগে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ প্রতিভাত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেকবিচারপূর্বক এই উপাধির বাধ বা নিবৃত্তি হলে শুধু বিশুদ্ধ চিৎ-ই স্বয়ংপ্রকাশ থাকে। তা-ই হল বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদান্ত জীব ও ব্রহ্মের অদ্বয়স্বরূপকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও স্বানুভূতি দ্বারা নির্দেশ করেছে। সেখানে অদ্বৈতবাদই শেষ কথা নয়। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' —এই ঘোষণা প্রমাণ করেও বেদান্ত 'অজাতবাদ'-এর কথা নির্দেশ করেছে সর্বোত্তম অদ্বৈতবাদীদের জন্য।

'দ্বৈতবাদ'-এ জীবজগৎ সত্য এবং তা ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা অনুভবগ্রাহ্য ও স্বীকৃত। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'-এ জগৎ হল ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শরীর বা ব্যবহারিক রূপ। তা হল নির্গুণস্বরূপের সগুণপ্রকৃতির সঙ্গে বিলাস। 'অদ্বৈতবোধ'-এ জগৎ মিথ্যা কিন্তু ব্রহ্ম সত্য। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন 'একজীববাদ'-এর কথা অর্থাৎ এক ব্রহ্মই নির্গুন-সগুণভেদে জীবজগৎরূপে প্রতিভাত হন। 'অজাতবাদ'-এ জগৎ সৃষ্টিই হয়নি। জগৎ কল্পনা বা শব্দমাত্র। তাতে ব্রহ্ম অতিরিক্ত মায়াও স্বীকৃত নয়। ব্রহ্মের বক্ষে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও বস্তু থাকা সম্ভবও নয়। এ-ই হল 'বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ' বা 'নিত্য অদ্বৈতবাদ'। এর অধিকারী অত্যন্ত বিরল, কিন্তু অসম্ভব নয়। [১০।৭।৭৭]

বিভিন্ন স্তরের গুরুর পরিচয়

আপনস্বরূপ অনুভূতির পূর্ব পর্যন্ত যত প্রকার অধ্যাত্ম ভাববোধের development-ই হোক না কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না, অর্থাৎ অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। এই অদ্বয়স্বরূপই হল অমৃত, মুক্তি ও শান্তির স্বরূপ। তা-ই হল সদ্‌গুরু-আত্মা-ঈশ্বর-ব্রহ্মের পরিচয়। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের তিন প্রধান দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আত্মগুরুই স্বয়ং। এই তিন প্রধান দেবতার উপরে আছেন পরমব্রহ্ম গুরু।

রুদ্র গুরুকে ধারণা করা যায় না। 'গুরু ব্রহ্মা'—সৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ না-থাকলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না, এই জন্য গুরু ব্রহ্মা দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। তারপর বিষ্ণু ও রুদ্র। রুদ্রের স্তর হল গাঢ় নিদ্রা এবং সমাধির বিশেষ অবস্থা, বিষ্ণুর স্তর হল ধ্যান ও স্বপ্নের স্তর এবং ব্রহ্মার স্তর হল জাগ্রৎ স্তর অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি বা পরাগ দর্শন। ধ্যান ও স্বপ্ন হল অন্তরদর্শন বা প্রত্যক্‌দর্শন। সুষুপ্তির স্তর হল কারণ দেহ—মূল অজ্ঞানের স্তর। তা সমাধির মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়। তখন সাধকের সমাধি সিদ্ধ হয় এবং চতুর্থ গুরু অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয়। এরই নামান্তর হল তুরীয় ও তুরীয়াতীত।

এই চতুর্থ স্তরের গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে, সেখানে সর্বপ্রকার শব্দ লীন হয়ে যায়। শব্দের অতীতকে শব্দের লক্ষ্যার্থের সাহায্যে বুঝতে হয়। স্থূল শব্দ ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে শেষে সূক্ষ্মতম স্তর অনাহত নাদে মিশে যায়। ভজনকালে কতগুলি জিনিস খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমে মনে হয় ভজন আসছে কণ্ঠ[১] থেকে, কিন্তু তারও পশ্চাতে রয়েছে তার উৎস বা কারণ। এও শেষ কথা নয়। এই উৎস বা কারণের পশ্চাতে আছে আদি কারণ। এ ভাবে সন্ধান করা হলে মূল শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি আছে সত্তার বক্ষে। মূল শক্তির পরিচয় জানা হলে সত্তার পরিচয়ও জানা যায়। তবে এ সবই গুহ্য সাধনার বিষয়,

১। কণ্ঠ—সমগ্র নাম ও শব্দের কেন্দ্র হল বাক্‌। বাক্‌ হল স্থূল। তার সূক্ষ্ম রূপ হল বৈখরী। তা অপেক্ষা সূক্ষ্ম হল মধ্যমা। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম পশ্যন্তি। সর্বোপরি সূক্ষ্মতম হল পরাবাক্‌ বা ঈশ্বর।

অনুমানের বিষয় নয়। শক্তির স্তর বিশেষের পরিচয় বাহ্য রূপ থেকে আরম্ভ করে হৃদয়কেন্দ্র বোধসত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিশেষ লক্ষণ ও অনুভূতি আছে। তা নিষ্ঠা সহকারে অনলস সাধনার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। নতুবা তার প্রসঙ্গ শুনে বিশেষ ভাবে তার পরিচয় জানা সম্ভব নয়।

প্রত্যেকের অন্তঃসত্তাই গুরুসত্তা; তার মাধ্যমেই ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম স্বানুভবগম্য হন

ঈশ্বরাত্মা-ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে ধরে রাখার জন্য নির্দেশ হল যে প্রত্যেকের অন্তঃসত্তাই হল গুরুসত্তা। 'সেই আমি'[১] হল 'এই আমি'[২]। অথবা বলা যায় 'সেই আমি'-র বিশেষণ হল 'এই আমি'। বিশেষণ নাশ হয় ভজনে। তখন সব চৈতন্য একাকার হয়ে যায়। ভজনেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে গুরুই সব জুড়ে বসে আছেন। যত বেশি ভজনে যুক্ত থাকা যায়, তত বেশি নিদিধ্যাসন হয়। ভজনই হল গুরুমূর্তি[৩]। অন্তর যখন শান্ত শূন্য হয়ে যায়, ঐ ভূমিতেই গুরু অভিব্যক্ত হন। চৈতন্যরূপী গুরুই হলেন প্রত্যেকের আসল পরিচয়, আত্মা। এ ধারণা যতদিন পরিষ্কার না-হয়, ততদিন নির্দেশ মেনে চলতে হয়। [১৭।৭।৭৭]

ধ্যান সম্বন্ধে নির্দেশ

ধ্যানে বসবার পরে যখন একটা নিঃশব্দ ভাব ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে, মনের ছুটোছুটি কমে যায়, নিজের থেকে কোনও চিন্তাই ওঠে না, সেই অবস্থা হল গুরুর প্রত্যক্ষ ভাব। তা লক্ষ্য করতে করতে পরের স্তরে যাওয়া যায় এবং সেখানে মহাসুখে বিশ্রাম করা যায়। এ কিন্তু নিদ্রা নয়; বরং একে যোগনিদ্রা বলা চলে। যোগনিদ্রা হল চৈতন্যের বক্ষে মনের বিশ্রাম এবং ঘুম হল অজ্ঞানের বক্ষে মনের বিশ্রাম।

গুরুভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখলে মন আপনা থেকেই উদাসীনবৎ হয়ে আসে। একাগ্র মনই উদাসীনবৎ।

মন গুরুকৃপায় দেবভাব বা সাত্ত্বিকভাব প্রধান হয়; ফলে আত্মবিদ্যার প্রতি একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এর লক্ষণ হল ভজন, জপ-তপ-ধ্যান, আত্মবিচার, দেবপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ভাল লাগা। তখন অন্য প্রসঙ্গ ভাল লাগে না।

সচ্চিদানন্দস্বরূপের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্যভাব হল গুরুপ্রাপ্তির লক্ষণ। গুরুতত্ত্বে ও অমৃতত্বে পার্থক্য নেই। কোনও যুগে আত্মার স্থানে গুরু ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব অখণ্ড ভূমা পরম অদ্বয়তত্ত্বেরই নামান্তর মাত্র। গুরুনাম দিয়ে ব্যবহারের একটা সুবিধা হল যে সর্বসম্প্রদায়ের পক্ষেই তা সমভাবে গ্রাহ্য হয়। তথাপি আত্মা ও গুরুভাব সব সময় সকলের পক্ষে ধরা সহজ নয়, তার জন্য অভ্যাসের দরকার হয়। অনেকের আবার গুরুভাব ভাল লাগে না, কিন্তু গুরুর সাহায্য দরকার হয়। সূক্ষ্মতম ভাববোধে গুরু সর্বব্যাপী। সেই জন্য বলা হয় ব্রাহ্মণরূপে অর্থাৎ বৃহৎরূপে গুরু সর্বস্থানেই ছড়িয়ে আছেন। গুরু ব্যক্তিরূপে থেকেও নৈর্ব্যক্তিক। গুরু-আত্মা-ঈশ্বর এই তিনকে একত্র করে ভাবনা করাই হল 'গুরুভজন[৪] করা। গুরু নিজেকে কত রূপে, কত ভাবে প্রকাশ করেও আপনাতে আপনি নিত্যস্থিত।

সংসারী ও সন্ন্যাসী সকলের জন্যই গুরুর প্রয়োজন। সম্যক্‌রূপে আত্মিক উন্নতির জন্য সকলেরই অন্তরমন গুরুভাবে রাঙিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি জীবনের মধ্যে এক আত্মাই বিদ্যমান। জীবভাব হল তার আভাসচৈতন্য। এর উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু আত্মা নিত্যবর্তমান। [২।৮।৭৭]

১। সেই আমি—ভূমা আমি বা ব্রহ্ম।

২। এই আমি—কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য বা আত্মা।

৩। গুরুমূর্তি—অভিনব সংজ্ঞা।

৪। গুরুভজন—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

নিষ্ঠা সহকারে সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবার তাৎপর্য

গুরুসেবা বড় দুর্লভ, কারণ গুরুর যথার্থ স্বরূপ তৃতীয় স্তরে না-আসা পর্যন্ত ধারণা করা যায় না। এই জন্য সাধুসঙ্গের প্রয়োজন এত বেশি। গুরুর ছবির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও উপকার পাওয়া যায়। প্রাণ ভরে দেখতে দেখতে গুরুর রূপ জীবন্ত হয়ে ওঠে তার কাছে। তাঁকে জীবন্ত ভাবনা করতে করতে খুব তাড়াতাড়ি তার ভক্তিভাবে প্রতিষ্ঠালাভ হয়। ভাবনাতে ভক্তিভাব দৃঢ় হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি সেই ভাব নিয়ে কেউ চলতে পারে তাহলে তার উপকারিতা সাধক নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে। গুরু তখন হয় অর্চি অবতার বা অর্চা অবতার। যে দেবতাকে অর্চনা করা হয় সেই দেবতা হল অর্চি অবতার। ভগবানের বিগ্রহেও গুরুদর্শন হয়।

দেবদেবী সম্বন্ধে ধারণা সদ্‌গুরু মহারাজগণই দিয়ে যান। তা না-হলে এদের সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয় না। সাধারণের দৃষ্টিতে এ সব শুধু কল্পনা বলে মনে হয়। গুরু শিষ্যকে পুনঃপুনঃ শুনিয়ে শুনিয়ে শ্রবণের বিজ্ঞান দ্বারাই তার চিত্তের বিকাশ ও অনুভূতিতে সাহায্য করেন। তার বোধসত্তার অনুভূতির ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরের মধ্যেও বোধসত্তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

বেদান্তর অদ্বৈতসিদ্ধি

আত্মা ও অনাত্মা এই দুইয়ের সংযোগেই জীবজগৎ। আত্মা হল দ্রষ্টা সাক্ষী এবং জগৎ হল দৃশ্য। এইরূপ অন্তরাত্মা সাক্ষী এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি হল দৃশ্য। অবিদ্যা-অজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিদোষে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে মিথ্যা অধ্যাস হয়; অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে মিথ্যাদি তাদাত্ম্যযোগ হয়। তার ফলে একের গুণ ও ধর্ম অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বা আরোপিত হয়। এই গুণ ও ধর্মকে উপাধি বলা হয়। এই উপাধির অপর নাম হল নাম-রূপ। এই নাম-রূপ হল মিথ্যা-মায়া বা অনাত্মা। আত্মা হল কেবল জ্ঞানস্বরূপ। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে প্রতি বস্তুরই পাঁচটি অংশ আছে, তা হল সৎ-চিৎ-আনন্দ বা অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম এবং নাম ও রূপ। প্রথম তিনটি হল ব্রহ্ম-আত্মার পরিচয় এবং শেষের অংশের নাম ও রূপ হল অবিদ্যা ও মায়া। বিচারপূর্বক নাম-রূপকে বাদ দিয়ে সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করে তাঁকে নিজের স্বরূপ বলে জানাই হল আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে এই বিচার সিদ্ধ হয়। তখন নাম-রূপের জগৎ মিথ্যা, বুদ্ধি থেকে দেহ পর্যন্ত সব মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার করে সচ্চিদানন্দবোধের আস্বাদন সম্ভব হয়। এ-ই হল বিচারসিদ্ধির ফল। এই হল বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধি।

সদ্‌গুরুকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে তাঁর মধ্যে ভাবনার ফল

একান্ত অনুগত ভক্ত গুরুর নির্দেশেই চলে এবং গুরু ভাবেই সব কিছু দেখে। নিজের খুশি মতো চললে যথার্থ ফললাভ করা যায় না। ব্যষ্টিভাব থেকে সমষ্টিভাবে রূপান্তর গুরুর কৃপাতেই হয় সত্য; কিন্তু তা সাধকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও চেষ্টাসাপেক্ষ। যিনি শিবস্বরূপ, অখণ্ড ভূমাস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করা ব্যষ্টি জীবের পক্ষে প্রথমে সহজে সম্ভবপর হয় না। গুরুকে দেখে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাব হয়। সবগুলি ভাবই গুরুর মধ্যে আছে। সদ্‌গুরু ও পরমাত্মা অভিন্ন বলে গুরু হলেন সর্বব্যাপী। গুরুর দেহ হল সর্বভাবের কেন্দ্র। এই ভাবনা দ্বারা আমি (ব্যষ্টি) সমষ্টির মধ্যে এবং সমষ্টি ব্যষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টির সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করে।

গুরুনিষ্ঠ ভক্তের গুরুভজনের ফলশ্রুতি

গুরুর প্রতি মনোযোগ দেওয়াকেই যোগের ভাষায় বলে একাগ্রতা। ভক্তের ভাষায় বলে গুরুনিষ্ঠা। এইরূপ ভক্ত যখন যা-কিছু করে সবই গুরুকে সমর্পণ করে দেয়। নিয়ত তাঁর চিন্তার ফলে এমন হয় যে গুরুর কৃপায় গুরুর স্থূল দেহের দর্শনও সে অনেক সময় পায়। 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরু ঘনিষ্ঠ আপন' অর্থাৎ তিনি ইষ্টঘন আমার আপনসত্তা। তিনি শরণাগত ভক্তকে আত্মময় ও বিজ্ঞানময় করে দেবার জন্য স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে আসেন। তিনি সূক্ষ্ম ভাবরূপে বা জ্যোতির্ময়রূপে কেন্দ্রে নিয়ে যান। মনকে অন্তরে প্রবেশে বাধা দেয় ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার থেকে মনকে যে সরিয়ে আনতে পারে সে-ই হল বীর বা সংযমী।

যে বাহির ছেড়ে কেন্দ্রে যেতে চায়, গুরু তাকে শক্তি দেন। গুরুমুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও তাঁর মহিমা পুনঃ-পুনঃ শ্রবণ করতে করতে অন্তরে ধীরে ধীরে গুরুভাব জাগ্রত হয় এবং তা-ই পরবর্তী কালে বিরাট মহীরুহতে পরিণত হয়।

কলি যুগে গুরুভজনের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়; কারণ মানুষের কাছে দেবদেবিগণ এখন বহুদূরে। এখন আর তাঁরা রূপ পরিগ্রহ করে আসেন না এবং এলেও তাঁদের গ্রহণ করার মতো শক্তি খুব কম লোকেরই আছে। সকলে ভয় পায়। কিন্তু গুরুর কাছে যেতে ভয় পায় না। জীবনের কাছে জীবন হল সহজ। গুরুর আবির্ভাব, তিরোভাব হয় ভাবের দিক থেকে।

সদ্‌গুরু রূপ পরিগ্রহ করে প্রয়োজন মতো শিষ্যকে দর্শন দেন। কারণ গুরু হলেন সর্বভাব ও সর্বতত্ত্বের ঘনীভূত মূর্তি, এক সত্য। এই সত্যের পরিচয় যিনি পেয়েছেন তিনি হলেন 'শ্রুতি শিরোমণি'[১]। তাঁর পদাম্বুজে সর্বস্তর আছে; অর্থাৎ বোধস্বরূপ গুরুর পদমূলে সর্বতত্ত্ব আছে। গুরু হলেন প্রেমঘন, আনন্দঘন ও চৈতন্যঘন। এক কথায়, সচ্চিদানন্দঘন। সব দিকেই তাঁর গতি, সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি। সর্বত্র চৈতন্য দর্শন হলে ব্যষ্টি ভাব হতে সমষ্টি ভাবে যাওয়া যায়। সেখান থেকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-তুরীয় অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব হয়।

আত্মদানের মাধ্যমে হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা

ঋষি যুগের এক উপাখ্যানে আছে যে একজন ঋষিপুত্র গুরুর আশ্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করে আরেকজন ঋষির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—আমাদের বংশের ধারা অনুযায়ী আমি আপনাকে গুরুরূপে বরণ করলাম। আপনি আমাকে জ্ঞান দান করে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করুন।

ঋষি বললেন—আমি জানি তুমি কোনও ঋষির পুত্র। তুমি অজ্ঞান দূর করবার জন্য আমার কাছে এসেছ, কিন্তু তুমি কী যথার্থ বিধি-নিয়ম অনুযায়ী চলতে পারবে?

শিক্ষার্থী—সে দায়িত্ব আপনার। এখানে আসবার সময় মা আমাকে বলেছেন—যাঁর কাছে তুমি নিজেকে সঁপে দেবে তখন তুমি তাঁর সম্পত্তি হয়ে যাবে, আমার সম্পত্তি আর নও।

শিক্ষার্থীর কথা শুনে এবং তার মুখেই তার মায়ের নির্দেশবাণী জেনে ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মা যথার্থ ঋষিপত্নীই বটে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বিশেষ কিছু না-বলে শুধু বললেন—আচ্ছা, আমি দেখব। এই বলে তিনি তাকে আশ্রমে থাকতে বললেন।

প্রথম প্রথম ঋষি তার সম্বন্ধে খুব উদাসীন হয়ে রইলেন। তারপর তার ধৈর্য্য পরীক্ষা করার জন্য বিরক্তিকর সব কাজের ভার দিলেন। আশ্রম মানেই বৃহৎ সংসার। জীবনকে তৈরি করার জন্য যা প্রয়োজন সেই সব

১। শ্রুতি শিরোমণি—শ্রুতি অর্থে বেদান্ত বা উপনিষদ বিদ্যাকে বলা হয়। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি। জীব-জগৎ-ব্রহ্ম অদ্বয়ব্রহ্মেরই বিবর্ত। এ যিনি সম্যকরূপে জানেন তিনি অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকেই শ্রুতি শিরোমণি বলা চলে।

কিছুরই ব্যবস্থা রাখতে হয়। সারাদিন খেটে খেটে সে আর সময় পায় না। অন্যান্য সতীর্থরা তাকে বলে, তুই অত খাটিস কেন? আমরা তো কাজে ফাঁকি দেই। তোর জন্য আজকাল আমাদেরও খাটতে হচ্ছে।

ঋষিগুরু একদিন তাকে বললেন—আমি তোমাকে জ্ঞান দিতে পারব না। তুমি অন্য কারও কাছে যাও।

শিক্ষার্থী ঋষিপুত্র—মা বলে দিয়েছেন—নিজেকে দেওয়া হয় একবারই, আর দেওয়া যায় না।

তার কথা শুনে ঋষিগুরু অবাক হয়ে গেলেন। এবার তিনি তার জন্য অন্য ব্যবস্থা করলেন। তাকে বললেন—তোমাকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি আপনজনের মতোই তাঁর কাছে থাকতে পারবে।

শিষ্য এ কথা শুনে কোনও উত্তর না-দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

গুরু আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কই, কিছু বললে না?

শিষ্য—আপনি যে-ভাবে তৈরি করবেন সে-ভাবেই হবে। আপনি যদি আমাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন তাহলেও আমি মেনে নেব।

ঋষি তখন তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর গুরুভাইয়ের কাছে। গুরুভাইকে তিনি বললেন—তোমার কাছে একে রেখে গেলাম, কয়েকদিনের জন্য। ফিরে যাবার সময় আমি আবার একে নিয়ে যাব। তুমি তোমার খুশি মতো একে চালিয়ে নিও।

গুরুভাই তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং নিজের খুশি মতো তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। যে কাজই তাকে করতে বলা হয় সে কাজই সে নির্বিচারে করে দেয়। তার এই রকম কাজ দেখে গুরুভাই অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন আমার গুরুভাই একে কী সুন্দর শিক্ষাই যে দিয়েছে!

শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের ফলে গুরুর মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গুরুভাই তাকে বললেন—তোমাকে পেয়ে আমরাও ধন্য হলাম।

[শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে সকলকে সচেতন করার জন্য বললেন—দেখ, শিষ্য যদি অনুগত হয়, তাহলে গুরুর মহিমাও বাড়ে।]

এই সময় ঋষিগুরু ফিরে এসে গুরুভাইয়ের মুখে সব শুনলেন এবং ভাবলেন—এ সব তো শিক্ষার্থীর মায়ের শিক্ষা, আমি তো কিছুই করিনি।

অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তর্গত কতগুলি শিক্ষা আছে, তার পরীক্ষার নয় প্রকার পদ্ধতি আছে, যথা—শাসন, তাড়ন, পীড়ন, ভর্ৎসনা, উপেক্ষা, অবহেলা, কর্তব্য ও সেবায় ত্রুটিদর্শন, কঠোর আজ্ঞা ও নির্দেশ প্রভৃতি। ছয়টি পরীক্ষা নেবার পর গুরুদেব ভাবলেন—কেন মিছামিছি এর পরীক্ষা নিচ্ছি? এর তো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

এদিকে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুরুভাইরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল গোপনে। তারা তাকে শাসিয়ে গেল—তুই যদি বেশি রকম বাড়াবাড়ি করিস তবে তোকে গলা টিপে মেরেই ফেলব।

গুরুদেব একদিন তার শিক্ষার্থী এই শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আমার আসনে (গদিতে) যদি তোমাকে বসিয়ে দেই তবে তুমি কী ভাবে চলবে?

শিক্ষার্থী—আপনি যাবেন কোথায়?

গুরুদেব—আমি যদি দেহ রক্ষা করি?

শিক্ষার্থী—এই দেহ তো আপনারই দেহ। আপনি কোথায় চলে যাবেন? এই দেহেই তো তখন থাকবেন।

গুরুদেব—আমার শিক্ষা এই পর্যন্তই শেষ। এর পরে যদি আরও উচ্চতর শিক্ষা কোথাও পাও তবে তা গ্রহণ করো।

শিক্ষার্থী—আমার জানার দরকার নেই।

গুরুদেব তখন খুব প্রীত হয়ে বললেন—তুমি নিজেকে দিলে আমাকে এখন আমি তোমার হয়ে গেলাম।

এই ভাবেই শিষ্য নিজেকে দেয় গুরুর কাছে, আবার গুরুও নিজেকে দিয়ে দেন শিষ্যের কাছে। অথবা জীবাত্মা পরমাত্মাকে সঁপে দেয় এবং পরমাত্মা জীবাত্মাকে সঁপে দেন অর্থাৎ জীবাত্মার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েন। আত্মদানের মাধ্যমেই হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই বলা হয়—'যে করে প্রাণ দান/সেই হয় প্রাণবান।'

যত মহাত্মা মহাপুরুষ আছেন তাঁদের সকলের জীবনেই দেখা যায় যে তাঁরা আপন আপন গুরুর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েই গুরুতাদাত্ম্য লাভ করেছেন।

গুরুনাম, নামকারী, গুরু ও নামের যে শক্তি সে সব এক তত্ত্বেরই চারটি ভাগ। সবগুলি যখন মিলে যায় তখন হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধ্রুবাস্মৃতি। নিজের ভিতরে তাঁর প্রকাশ নিত্য হয়ে চলেছে। তা লক্ষ্য করতে করতে 'গুরুর আমি' ও 'আমির গুরু' এক হয়ে যায়—

তোমাতে আমাতে যে মিলন
চলিছে যুগযুগান্ত ধরে
কভু আমি চাই তোমারে কভু তুমি চাও মোরে
তোমায় আমায় মিলে একাকার
সেই সচ্চিদানন্দসাগর নিত্যনির্বিকার।

ভগবানকে জীবন্তরূপে মানাই হল জীবের যথার্থ ধর্ম

এক ভণ্ড সাধু এক দরিদ্র গৃহস্থ বাড়িতে মাধুকরী করতে গেছে। গৃহস্থ সাধুকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, ভগবানের কবে দয়া হবে? কী করে তাঁকে পাওয়া যায়?

সাধু—ডাকার মতো ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

গৃহস্থ—কী ভাবে তা সম্ভব?

সাধু—তাঁকে আপন ভাবতে হয়। তোমার আপন কে আছে?

গৃহস্থ— কেউ নেই আমার। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটি ভেড়া।

সাধু— তাতেই হবে। এই ভেড়াকেই আপন ভাব। ভাববে এই ভেড়াই হল নারায়ণ। তাহলেই চলবে। এই নির্দেশ দিয়ে সাধু চলে গেল।

এদিকে সেই গৃহস্থ সাধুর কথামতো ভেড়াকে নারায়ণ ভেবে খাওয়ায়, আদরযত্ন করে। সারাক্ষণ নারায়ণের কথা ভাবতে ভাবতে তার মধ্যে নারায়ণ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন পরে সেই ভণ্ড সাধু বহু জায়গায় ঘুরে ফিরে আবার সেই গ্রামে এসে উপস্থিত হল। তার খুব কৌতূহল হল যে যাকে আন্দাজেই এক উপদেশ দিয়ে মাধুকরী গ্রহণ করে সে একদিন চলে গিয়েছিল সেই গৃহস্থটি কেমন আছে। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞাসা করল—এই বাড়িতে যে থাকত সে কোথায় গেল বলতে পার?

গ্রামবাসী বলল—সে তো পাগল হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে সাধুটি ভয় পেয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গৃহস্থ তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল এবং তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল। সাধুকে বলল—গুরুদেব আপনি আমাকে দর্শন না-দিয়েই চলে যাচ্ছিলেন কোন অপরাধে? আপনাকে আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দিতেই হবে এবং নারায়ণ দর্শনও করে যেতে হবে।

সাধু—তোমার নারায়ণ কী রকম? আমাকে দেখাতে পার?

গৃহস্থ—হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব। এ কথা বলেই সে ভেড়াটা সামনে নিয়ে এল এবং বলল আপনিই তো একে নারায়ণ জ্ঞানে আপনবোধে সেবা করতে বলেছিলেন। এই ভাবে সেবা করলেই নাকি ভগবৎদর্শন হবে। আপনার কথা মেনে ও সে-ভাবে চলেই আমার এর মধ্যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন হয়েছে। ইনিই আমার অন্নসংস্থান করেন।

সাধু—কই, ভগবানের সেই রূপ আমাকে দেখাও।

গৃহস্থ তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলতে লাগল—প্রভু, তুমি এঁকে দেখা দাও।

কিন্তু ভগবান বললেন—এর চিত্ত তো শুদ্ধ হয়নি। ও আমার দর্শন কী করে পাবে?

গৃহস্থ— সে সব আমি বুঝি না। আমি কী শেষ পর্যন্ত গুরুর কাছে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হব?

তখন ভগবান ভক্তের কাতর প্রার্থনায় প্রকাশ হয়ে পড়লেন সেই ভেড়ার মধ্যে। সাধু দেখতে পেল—ভেড়া নাচছে এবং তালে তালে সুন্দর নূপুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এ সব দেখে শুনে সাধু গৃহস্থের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল—আজ থেকে তুমি আমার গুরু; আমি তোমার গুরু নই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরু যা-দেন তা যথার্থ ভাবে পালিত হলে শিষ্যের অপ্রাপ্য আর কিছু থাকে না। ভগবানকে জীবন্তরূপে মানাই হল জীবের যথার্থ ধর্ম[১]। তা কাল্পনিক নয়। যিনি সকলের প্রাণের প্রাণ তাঁকে নির্জনে আপন করে প্রাণ পেতে চায়। এই ব্যাকুলতার পরিণামেই অন্তরের অন্তরতম প্রীতমের সঙ্গে যে সকলের নিত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তা আবিষ্কৃত হয়। 'সেই আমি'-র স্বরূপ আবিষ্কৃত হলে দেখা যায় 'সেই আমি'-র[২] কৃপায় 'এই আমি'[৩] চলে এবং 'এই আমি'-র মাধ্যমে 'আমারবোধ'[৪] খেলে।

[১৪।৮।৭৭]

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন সদ্‌গুরু হওয়া সম্ভব হয় না

এক সাধক বেশ কিছুদিন সাধনভজন করে অপর একজন মহাত্মার কাছে যায়। মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কী চাও?

উত্তরে সাধকটি বলে—আমার অন্তরে যদি কোনও অজ্ঞাত দোষত্রুটি বা সুপ্ত অসৎভাব কিছু থাকে তা জাগিয়ে দিয়ে আপনি তা শোধনের ব্যবস্থা করে দিন।

মহাত্মা বললেন—অতি উত্তম কথা এ ব্যাপারে কোনও অসুবিধায় পড়লে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য পাবে। এই বলে তিনি স্থানান্তরে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে সাধকটি খুবই বিপদে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে মহাত্মার কাছে যে আশ্বাসবাণী পেয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এদিকে নিজের গুরুর কথাও স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর রূপ মানসপটে আসে না, কখনও যদি বা আসে আবার তা কয়েক মুহূর্ত পরেই সরে যায়। তা সত্ত্বেও সে গুরুর ধ্যান করতে চেষ্টা করত। হঠাৎ একদিন মানসপটে তার গুরুর ধ্যান করার সময় গুরুর স্থানে সেই মহাত্মার মুখ ভেসে উঠল। ইতিমধ্যে সেই মহাত্মাও দেহরক্ষা করেছেন। দেহরক্ষা করা সত্ত্বেও সেই মহাত্মা দেখা দিতে পারলেন কারণ সৎভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একীভূত হতে পারেন। মানসপটে সেই মহাত্মার মুখ

১। যথার্থ ধর্ম—অভিনব সংজ্ঞা।

২। সেই আমি—ব্রহ্ম, আত্মা বা ভূমা আমি।

৩। এই আমি—জীবের আমি বা কাঁচা-আমি।

৪। আমার বোধ—সংসার বোধ।

দেখে সাধকের পূর্বের কথা স্মরণ হয় যে বিপদে পড়লে তিনি তাকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন এক সময়ে।

সাধকের শরীরে তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের গুরুকে ডাকা সত্ত্বেও গুরু আর আসেন না। তখন অভিমান ভরে সে বলল—গুরু, তোমাকে ডেকে যদি বিপদের সময় না-পাই তাহলে কী লাভ? তারপর মহাত্মার উদ্দেশ্যে সে বলতে থাকে—তুমি কথা দিয়েছিলে বিপদে পড়ে ডাকলে তুমি আমাকে এসে সাহায্য করবে, কিন্তু এখনও তো তুমি এলে না। তুমি এলে তো আমি আর এত কষ্ট পেতাম না।

সেই মুহূর্তে সে মহাত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—বেদনারূপে এসে আমি একসঙ্গে তোর সব গলদ নিয়ে যাচ্ছি। তুই আমার উপরে ভরসা রাখতে পারলি না?

বেদনার মাধ্যমে এসে সেই মহাত্মা যে তার কত জন্মের মলাবরণ নিয়ে গেলেন তা সে জানতেও পারল না। যাই হোক, মহাত্মার সাহায্যে উত্তরোত্তর তার সাধনায় উন্নতি হতে লাগল, দিব্যভাবের প্রকাশ হতে লাগল; কিন্তু সে নিজের গুরুর সন্ধান আর পেল না।

গুরুর দর্শন না-পেয়ে সে খুব অস্থির হয়ে পড়ল। শুধু ভাবে—গুরুর দর্শন পাচ্ছি না কেন? অন্যান্য কয়েকজন সাধককে জিজ্ঞাসা করেও তার সদুত্তর সে পেল না।

একদিন সারারাত সে গুরুর ধ্যান করতে লাগল। ধ্যানে ইষ্টের রূপ আসে কিন্তু গুরুর রূপ আর আসে না। পরদিন রাত্রিতেও সারারাত গুরুর ধ্যান করল। তার পরদিন উপবাস করে কাটাল। চতুর্থ দিন সে গুরুর কথা শুনতে পেল—তুই সাধনভজন না-করে ফাঁকি দিয়ে তোর গলদগুলি একজন মহাত্মাকে চাপিয়ে দিলি, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলি না? সে এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে। সে তোর মল নিয়ে মরলোক ছেড়ে চলে গেল, সেই জন্য আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়। যতদিন পর্যন্ত তোর এই গলদগুলি তাঁর মধ্য থেকে নির্মূল না-হয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে থাকব এবং যতটা সম্ভব তাঁকে সাহায্য করব। তার পরে আমি আসব।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে সাধকের সঙ্গে সেই মহাত্মার এক গুরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সাধক নিজের কৃতকর্মের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুতপ্ত হয়। গুরুভাই তাকে বললেন—তুমি এত ভাবছ কেন? গুরুকে সব জানিয়ে রেখেছ তবে আর ভাবনা কী?

সাধক তবুও সান্ত্বনা পায় না। গুরুভাই বললেন—মহাত্মাদের মহিমা আমরা বুঝব না। আরও কিছু প্রকাশ করবেন বলেই হয়তো তোমার গুরু সরে গেছেন। রাগ করে তিনি নিশ্চয়ই চলে যাননি।

কিন্তু সাধকের মন আর কিছুতেই শান্ত হয় না। দীর্ঘকাল পরে গুরুর সঙ্গে তার দেখা হল। মিলন হতেই গুরুর পা জড়িয়ে ধরল। অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে সে বলতে লাগল—তোমার মহিমা আমি বুঝতে পারি না। এত অধম জেনেও তুমি আমাকে কৃপা করছ? ভুলত্রুটির জন্য আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

গুরু তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—দাঁড়া, তোকে শাস্তি দেব। আমার গুরুভার যখন তোর উপরে চাপিয়ে দেব তখনই তোর শাস্তি হবে। এই বলে গুরু আবার স্থানান্তরে চলে গেলেন। সাধক সাহস করে গুরুকে আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না যে কী ভাবে তার শাস্তি হবে।

বেশ কিছুদিন পর গুরু তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। শিষ্য সাধক গুরুর কাছে আসতেই গুরু তাকে বললেন—মুক্তি লাভের জন্য, আনন্দ আস্বাদনের জন্য যা চেয়েছিলি সব তোর ভিতরেই রয়েছে। এখন থেকে তোর কাছে যারা আসবে, দুঃখ-কষ্টের কথা জানাবে তাদের ভার তোকে নিতে হবে। আমি যেমন তোর ভার নিয়েছিলাম সে রকম তোকেও তাদের ভার নিতে হবে।'

শিষ্য— আমি কী করে তা পারব?

গুরু—হ্যাঁ, ঠিক পারবি।

যথাসময়ে গুরু দেহত্যাগ করলেন। শিষ্য মুক্তপুরুষ হলেও তাঁর খুব কষ্ট হল। গুরুর আদেশ অনুসারে তাঁকে গুরুর আসনে বসতে হল। তারপর সে বুঝতে পারল যে গুরুর ভার নেওয়া কত কঠিন। শিষ্যদের ভালবাসতে গেলে দেখা যায় যে তাদের ভাব চলে আসে দেহেন্দ্রিয়-প্রাণে। তখন সে ভাবতে থাকে যে—গুরু তুমি আমাদের জন্য কত কষ্ট যে করেছ, আর আমরা শুধু মজা লুটেছি। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখন সে বুঝতে পারল যে সত্যিকারের সদ্‌গুরু হওয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কখনও সম্ভবপর হয় না।

গল্পটি শেষ করে তার তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন, গুরুমহারাজগণ যতদিন দেহে থাকেন ততদিনই শিষ্যদের তৈরি করেন। যতদিন তাঁরা দেহে থাকেন ততদিন শিষ্যরা তাঁদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁদের দেহরক্ষার পরেই তাঁদের মহিমা বোঝা যায়।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগতে, সূক্ষ্ম মানসজগতে ও কারণের জগতে শিষ্যদের যেন কোনও অন্তরায় না-থাকে এ বিষয়ে গুরু সর্বদাই খুব সচেতন থাকেন। সদ্‌গুরু হলেন তিনিই, যিনি তিন কালে ও তিন গুণে সমান ভাবে থাকেন। সদ্‌গুরুর কাজ হল শিষ্যসন্তানদের সৎ-এ রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করা। তাঁদের কাজ স্থূল দৃষ্টিতে কিছু বুঝতে পারা যায় না। গুরুদায়িত্ব পাবার পরে গুরুর মহিমা উপলব্ধি করার সুযোগ মেলে। পিতা-মাতা যেমন করে শিশুকে আগলে রেখে যত্ন করেন, গুরুও ঠিক সে রকম ভাবে শিষ্যদের উপযুক্ত করে তৈরি করেন। শিষ্যের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে গুরু এক মুহূর্তের জন্যও শিষ্যের আড়াল হন না। শিষ্য-সন্তানকে তৈরি করার জন্য তিনি নানা ভাবে আয়োজন করে রেখেছেন। গুরুকে কেন্দ্র করে মনের যত বেশি ভাবনা চিন্তা হবে, তত বেশি গুরুভাব অন্তরে প্রবেশ করবে। গুরুভাবের প্রভাবে অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তখন নিজের অণু-পরমাণুর মধ্যে এমন একটা জায়গাও খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে গুরু নেই। গুরুর মধ্যে সমস্ত দেবদেবী, সিদ্ধ, মহাত্মা, মহাপুরুষগণ বাস করেন। গুরু কৃপা করে, করুণা করে শিষ্যদের কল্যাণের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করে আসেন। [১৬।৮।৭৭]

আত্মস্বরূপের কথা গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের অতিরিক্ত কিছু নয়

ভগবান যেখানে আত্মস্বরূপের কথা বিশেষ ভাবে বলেন তাও গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদের অতিরিক্ত কিছু নয়। সেখানে 'গুরু' শব্দের উল্লেখ না-থাকলেও নিজের স্বরূপকে যখন বহুভাবে ব্যক্ত করে আবার বহুভাবকে একত্র করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে চান তখন ভগবানের সেই বিরাট ভাব গুরুভাবের মধ্যেই পড়ে। সেখানে তিনি ভাবের বিন্যাস করেন। ঈশ্বর যখন সজ্ঞানে জীবভাব নিয়ে খেলা করেন তখন আরম্ভ হয় স্বভাবের শিক্ষা। স্বভাবের শিক্ষার জন্য তিনি যে আয়োজন করেন বা তুষ্টি-পুষ্টির জন্য যা দরকার তার জন্য ভগবান যে-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন তা-ই আত্মবিদ্যা, গুরুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

গুরুশক্তির নামান্তর মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী

সরস্বতী হল গুরুশক্তিরই নামান্তর ও বিশেষ রূপ। শব্দের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপ হল সরস্বতীর পরিচয়। অন্তরে যখন সরস্বতীর পূর্ণ প্রকাশ হয় তখন পরবর্তী স্তরের বা মহালক্ষ্মী ও মহাকালীর স্তরে যাবার যোগ্যতা হয়। তিন রূপে যখন তিনি নিজেকে পূর্ণ ভাবে যুক্ত করে নেন তখন আত্মগুরুর স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। শব্দব্রহ্ম বলতে যা বোঝায় তা-ই হল সরস্বতী। শব্দের আদি রূপ ও ভাবঘন রূপ হল সরস্বতী। তার মধ্য ও সক্রিয় রূপ হল বিন্দু ও নাদ। রূপের পরিচয় দেয় বিন্দু এবং বিন্দুর পরিচয় দেয় নাদ।

সরস্বতী হল বেদের চার ভাগের প্রথম ভাগের প্রতিমূর্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের প্রতিমূর্তি হল যথাক্রমে মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। সেই জন্য মহাকালী জ্ঞানকাণ্ডের পর্যায়ে পড়েন এবং কর্মকাণ্ডে পড়েন সরস্বতী। লক্ষ্মী হল প্রাণের পরিচয়।

তপস্বী ও সংসারী উভয়েরই সরস্বতীকে প্রয়োজন। বস্তুবিদ্যা বা প্রকৃতিবিদ্যা এবং অতিপ্রাকৃত ব্রহ্মবিদ্যা এই উভয় বিদ্যাই সরস্বতীর অধীনে। স্থূল ও সূক্ষ্ম থেকে কারণে নিয়ে যান সরস্বতী। তাই সরস্বতী হলেন গুরু স্বয়ং। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়রূপেই সরস্বতী বিরাজিতা। প্রত্যেকের ভিতরে সম্বিৎরূপে যে অনুভূতির ক্রিয়া তা-ই সরস্বতীর নির্দেশক। কাজেই গুরুবন্দনা মানে সরস্বতীবন্দনা।

শব্দ ব্যতীত বন্দনা হয় না। শব্দব্রহ্ম হল সরস্বতী। 'স্বর' মানে বাক্ বা ধ্বনি। তা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যা যখন ভিতরে জাগে, অবিদ্যা আপনিই সরে যায়। সরস্বতীর বিকাশের অর্থ অন্তরে অধ্যাত্মবিকাশ। অথবা অধ্যাত্মবিদ্যা হল সরস্বতী। সরস্বতীর বিকাশ ছাড়া অনুভূতি হয় না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মহালক্ষ্মীর কাজ হল শ্রুত বিষয় ও চিন্তিত বিষয়কে প্রাণের পোষণ দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষা করা। তার পরের স্তরে আছে মহাকালী। সরস্বতী মহালক্ষ্মীতে এবং পরে মহাকালীতে প্রবেশ করলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং বা কেবল অনুভবস্বরূপ প্রকাশ পায়। তাঁর ছিন্নমস্তার রূপ বড় অদ্ভুত। তাঁর প্রসঙ্গে বলা, শোনা, ভাবা ও অনুভব করা বিশেষ ভাবে যোগ্য অধিকারীব পক্ষেই সম্ভব, অপরের পক্ষে নয় কারণ তা পরমতত্ত্বেরই বিজ্ঞান বিশেষ।

যেখানে মহাকালী আবির্ভূত হন সেখানে শুধুই Oneness—সেই জন্য তা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সব তিনি সংহার করে নেন। স্থূল, সূক্ষ্ম সব লয় হয়ে যায়। বড় বড় সাধকরাও সেই অবস্থায় ভয় পেয়ে যান। একমাত্র গুরুশক্তির প্রভাবেই সেখানে স্থির থাকা সম্ভবপর হয়। গুরুশক্তি steady করে রাখে। 'এই জীবনটা' (নিজের দিকে নির্দেশ করে) তো তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন (demonstration)।

সরস্বতী একটু দূরে সরে গেলে আসে ভ্রান্তি বা অবিদ্যার প্রভাব। প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্রুবাস্মৃতি হল সরস্বতীর মূর্তি। আবার গুরুরূপে ও মাতৃরূপেও সরস্বতীকে বন্দনা করা হয়। বিশেষ কোনও স্থানে সরস্বতী ও গণেশকে এবং সরস্বতী ও শিবকে অদ্বয়বোধে বা অভিন্ন একবোধে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জন্য সরস্বতীকে কোনও স্থানে ব্রহ্মার শক্তি, কোনও স্থানে বিষ্ণুর শক্তি, আবার কোনও স্থানে শিবের শক্তিরূপেও দৃষ্ট হয়। কোনওটিই ভুল নয়। যখন যেখানে যে-ভাবে ঋষিগণ অনুভব করেছেন সে-ভাবেই ব্যক্ত করে গেছেন। স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংপূর্ণ তত্ত্বস্বরূপ যে বস্তু, তিনি যখন যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপই ধারণ করেন।

সরস্বতীর কৃপা না-হলে মানুষের বিদ্যার উৎকর্য, সৌন্দর্যের উৎকর্য বা চারুকলার বিকাশ কোনও কিছুই হয় না। এগুলি ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়। ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা উদ্ভাসিত হওয়ার আগে কত যে তার (শিল্পকলার) বিকাশ হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই জন্য এক এক যুগে এক এক প্রকার বিদ্যার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন। সূক্ষ্ম অনুভূতি না-জাগলে কারও পরিপূর্ণতা আসে না। সেই জন্য মহাত্মাগণ সব ভাব জাগিয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে দেন।

ভারতের নাম ভারতী তথা সরস্বতীর নাম অনুসারে হয়েছে, এ রকম একটা মতবাদ আছে। সেই মতবাদ অনুসারে ভারতের নামকরণ করা আছে সরস্বতী। 'ভা' মানে পূর্ণ জ্ঞান। 'ভা'-তে রত অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানে রত যে দেশ সেই দেশের অধিবাসীই হল ঋষি। ঋষিগণ জ্ঞানের তপস্যাতেই রত থাকতেন বলে ভাতিময় জ্ঞানে রত দেশকেই ভারত বলা হয়েছে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই হল পরমজ্ঞান ও পরমতত্ত্ব। বিদ্যা ও জ্ঞানের অধীশ্বরী হলেন সরস্বতী। ঋষিগণ সেই বিদ্যা ও জ্ঞানের তপস্যা ও সাধনা করতে গিয়ে সরস্বতীর সাধনাই করেছিলেন সরস্বতী নদীর তীরে, এবং সরস্বতীর কৃপা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁরা বিদ্যা ও

জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর মহিমা কীর্তনই করে গিয়েছেন নানাবিধ স্তব-স্তুতি ও গাঁথার মাধ্যমে। সেই জন্য সরস্বতীর আরেক নাম দেবী ভগবতী ভারতী।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্ঞান বা বিদ্যা অভ্যাসের প্রয়োজন আছে

জ্ঞান বা বিদ্যাভ্যাসের প্রারম্ভে যেমন বিশেষ প্রস্তুতি দরকার, সে রকম সাধনার মধ্যে ও অন্তে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্যক্‌রূপে থাকা প্রয়োজন। নতুবা সাধনা ও জ্ঞান বা বিদ্যার অনুশীলন সুসিদ্ধ হয় না এবং যথার্থ ফলপ্রদও হয় না। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীর উল্লেখ করে যা বলা হয় তা সবই সত্যজ্ঞান অনুভূতিরই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য তা যথার্থ ভাবে বুঝতে না-পারলে ও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না-হলে অনুভূতির বা জ্ঞানের বিপর্যয়, ভ্রান্তি ও ব্যতিক্রম হয়। তা-ই ভেদজ্ঞান ও অজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়।

সব জ্ঞানই এক জ্ঞানতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্ফূর্তি মাত্র। তা সম্যক্‌রূপে অনুভূত যাতে হয় তার জন্য ঋষিগণ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে তার যথার্থ প্রবর্তন করে গিয়েছেন। জ্ঞানের চর্চা, বিদ্যার চর্চা ও শিক্ষা যত্নপূর্বক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হওয়া দরকার। নতুবা অনুভূতির মানের উৎকর্য যথার্থ ভাবে হয় না এবং হতেও পারে না। বিদ্যাচর্চা বা অনুশীলনের মধ্যে ফাঁকি ও ত্রুটি থাকলে অনুভূতির ক্রমের মধ্যেও ভুল, বিপর্যয় ও ব্যতিক্রম থেকে যায়। তা জ্ঞানবিরোধী অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপে জীবনে প্রকাশ পায়। অবিদ্যার সঙ্গে বিদ্যার যে বিরোধ, অজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যে বিরোধ তা বিদ্যা ও জ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার দ্বারাই সংশোধিত হয়ে পরিশেষে তার নিরসন ঘটে।

জীবনের বিকারাদি, ভেদদৃষ্টি বা পার্থক্যবোধের কারণ ও তার সমাধান

ভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি হয় অনুভূতির বিকারের ফলে। বিকার হয় প্রকাশধারার মধ্যে অংশত বাধা সৃষ্টি হলে। বাধা সৃষ্টি হয় মনের একাগ্রতার অভাবে। মনের একাগ্রতা বিকৃত বা ব্যাহত হয় অথবা তার অভাব হয় বিপরীত ভাবে বা অন্য ভাবের সংযোগে বা প্রভাবে। একেই ভাবান্তর বলা হয়। এই ভাবান্তরই হল অবিদ্যা-অজ্ঞানের লক্ষণ। অবিদ্যার দু'টি শক্তি—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। প্রথমটির দ্বারা সত্যবোধের যথার্থ রূপটি ঢেকে দ্বিতীয়টির মাধ্যমে তাকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করে। সেই জন্য সত্যানুভূতির ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আত্মজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার এই দ্বৈত ও ভ্রান্তিমূলক কার্যাদি সবই বিদূরিত হয়। একজাতীয় ভাবধারার মধ্যে অন্য ভাবের প্রকাশ ও মিশ্রণ হলে ভাবের বিপর্যয় হয়। ভাবের সমষ্টি যে মন তাতে নিরন্তর ভাবের বিপর্যয় হতেই থাকে। ভাবের অভাব বেশিক্ষণ দৃষ্ট হয় না। মনের সমতাও সাধারণত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তা স্থায়ী করতে গেলে দীর্ঘকাল জ্ঞানবিচার অভ্যাসের প্রয়োজন হয়।

যে মন দিয়ে জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন সাধিত হয় তা স্থির, শান্ত ও দৃঢ় না-হলে এবং তার স্বকীয় ভাবধারা অস্থির চঞ্চল হলে সেই মন জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলনযোগ্য হয় না। সেই জন্য বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানচর্চা বা শিক্ষার প্রারম্ভে মনের প্রস্তুতি অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে তার স্থিতি ও যথার্থ নির্দেশ অনুসারে তার ব্যবহার হল শিক্ষার প্রথম ধাপ। ঋষিগণ শিক্ষার এই প্রথম ধাপ সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুত্বও ব্যক্ত করে গিয়েছেন। এই প্রথম ধাপের শিক্ষায় মন তৈরি হলে তবে পরবর্তী শিক্ষার ধাপ ও ক্রমগুলি যথার্থ ভাবে অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। এ ভাবে শিক্ষার ধাপ ও ক্রমগুলি অতিক্রম করে তার পরম লক্ষ্যে পৌঁছে সে কৃতকৃত্য ও ধন্য হয়। বিদ্যা ও জ্ঞানের শক্তি শিক্ষার্থীকে তার পরম লক্ষ্যে টেনে নেয়। শিক্ষার্থীর অন্তরের ভাব ও সংস্কারকে শোধন করার পরে নূতন করে তার রূপায়ণ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠা যার দৃঢ়, তার কাছে জ্ঞানশক্তি সতেজ ও সক্রিয় হবেই। অর্থাৎ সে গুরুশক্তি ও সরস্বতীর কৃপালাভে ধন্য হবেই। এ-ই হল জ্ঞান বা বিদ্যা সাধনার ফলশ্রুতি।

সরস্বতীর কৃপালাভের যৌগিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অতীতে ঋষিদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যার্থীগণ সরস্বতীর কৃপা লাভ করে বেদবেদান্তের অনুভূতি লাভ করেছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরেই ছিল তাঁদের আবাস ও আশ্রম। তাঁরা সরস্বতী নদীকেও মাতৃরূপে বন্দনা করেছিলেন, কারণ তার অন্যান্য অবদান তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সেই সরস্বতী নদী কালের কবলে অদৃশ্য হলেও জীবের সূক্ষ্ম দেহে তার অবস্থান নিত্যবর্তমান। জীবদেহে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীপথ আছে যার মধ্যে প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রবাহিত হয়ে জীবদেহকে সক্রিয় রাখে, এদের মধ্যে তিনটি নাড়ীপথ প্রধান। তা হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এদের নামান্তর হল গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। প্রথমটি হল জ্ঞান নাড়ী বা সূর্য নাড়ী, দ্বিতীয়টি হল প্রাণ নাড়ী বা চন্দ্র নাড়ী এবং তৃতীয়টি উভয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাড়ী পথ। এরই নামান্তর সরস্বতী। বিদ্যুৎসম জ্যোতি হল এর লক্ষণ। মূলাধার থেকে সহস্রারকেন্দ্র পর্যন্ত এই নাড়ী সুবিস্তৃত। এর নিম্নদ্বার মূলাধারকেন্দ্রে এবং ঊর্ধ্বদ্বার হল সহস্রারে। নিম্নদ্বারটি সাধারণ জীবের মধ্যে বন্ধ থাকে। গুরুশক্তির কৃপায় যোগ্য অধিকারী যে সাধনবিজ্ঞান পায়, তার সম্যক অনুশীলন দ্বারা এবং গুরুকৃপায় সুষুম্নাদ্বার খুলে যায়। তখন মূলাধারস্থ আত্মশক্তি যা সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে মূলাধারচক্রে নিদ্রিত থাকে তা জাগ্রত হয়ে এই সুষুম্না পথে ঊর্ধ্ব দিকে সহস্রারপানে ধাবিত হয়—যেমন খরস্রোতা নদী সমুদ্রাভিমুখে তীব্র গতিতে ধাবিত হয়। কিন্তু পথে পর পর আরও পাঁচটি চক্রে বা কেন্দ্রে সে বাধা পায়। সেগুলি ভেদ করে সহস্রারে উঠে গেলেই সহস্রারে অবস্থিত পরমাত্মশক্তির সঙ্গে এই জীবশক্তির মহামিলন হয়। তারপর হয় আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দের অনুভূতি।

এই অনুভূতি যখন প্রথম হয় তখন তা-ই সমাধিরূপে প্রকাশ পায়। এই সমাধি ঘন ঘন হলে আত্মজ্ঞান দৃঢ় হয়। আত্মানুভূতি সিদ্ধ হবার আগে এই জীবশক্তি কুণ্ডলিনী পুনঃপুনঃ জাগ্রত হয়ে সহস্রারের দিকে ধাবিত হয়। কখনও বা মাঝপথে বিশ্রাম করে নিচে নেমে আসে। আবার কখনও বা সহস্রারে উঠে যায়। তাব নামা ওঠা বা মাঝখানে কোনও চক্রে থামা ও বিশ্রাম করা এ সবের বিশেষ লক্ষণ ও অনুভূতি আছে।

কুণ্ডলিনীশক্তি আত্মযোগের বিজ্ঞান

এই কুণ্ডলিনীশক্তির নামান্তর হল সাবিত্রী ও সরস্বতী। এই সরস্বতী জীবের জ্ঞানদাত্রী ও মুক্তিদাত্রী। তা যখন যে চক্রে ওঠে ও অবস্থান করে তখন সেই চক্রের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তি ও চেতনাকে জাগ্রত করে তার অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। যে অবস্থায় তা ঘটে তারও বিশেষ লক্ষণ কখনও কখনও জীবদেহে বাহ্যত প্রকাশ পায়। যৌগিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুই হল এই কুণ্ডলিনীরূপিনী সুপ্ত সরস্বতীকে জীবনে জাগ্রত করে তার সাহায্যে অধ্যাত্মবিদ্যার পূর্ণ অধিকারী হওয়া; অর্থাৎ জীবনবিজ্ঞানের অনুভূতি সম্যক্‌রূপে লাভ করে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভ করা। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান এই সরস্বতীর কৃপাতেই জীব পেয়ে থাকে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের লক্ষণই হল জীবন্মুক্তি, পরাশান্তি।

জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগীর জীবনসাধনা ও তাদের চরমসিদ্ধি সবই এই সরস্বতীর কৃপার ফলে লব্ধ হয়। তবে সাধনকালে সাধনার ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান ও ক্রম অনুসারে তার তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত হয় ও বর্ণিত হয়। সবই অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানের বিষয়। সেই জন্য যৌগিক দৃষ্টিতে জীবদেহে এই সুষুম্না নাড়ীর তাৎপর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সে-ভাবে এর অনুভূতির বিজ্ঞানকে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করেন।

এই সরস্বতীর অবস্থান শুধু গুরু জানেন এবং গুরুই বলে দেন যে সেই সরস্বতী নদীতে কী করে যেতে হয় অথবা কী আছে সেখানে এবং তা কী করে লাভ হয় অথবা লাভ করার পরে কী হয়। অর্থাৎ গুরুই অন্তরে-বাইরে সরস্বতীর পরিচয় ধরিয়ে দেন।

জীবনের যথার্থ ব্যবহার গুরুকৃপা ছাড়া জানা যায় না। সরস্বতীর কৃপা ছাড়া কোনও কিছুর পরিচয় জানা যায় না বা জানা সম্ভবপর হয় না। যে চৈতন্য প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের মূলে থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে, সে যদি আবৃত হয়ে যায় তবে ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়শোধনের জন্য চৈতন্যের সাহায্য নিতে হয়।

বিদ্যাশক্তি সরস্বতীর পূর্ণ অভিব্যক্তি সচ্চিদানন্দ

ঈশ্বরের বিজ্ঞানময়রূপ হল মহাসরস্বতী। প্রত্যেকের হৃদয় থেকে ঈশ্বর নিজেকে সম্বিৎরূপে প্রকাশ করেন। তারপর তার আনন্দের আয়োজন করেন বৈচিত্র্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। সৎ-এর দিক থেকে সবাই সমান। চিৎ-এর দিক থেকে তারতম্য থাকে। চিৎ পূর্ণ হলে হয় আনন্দ। সেই জন্যই ভাব অনুভূতির শোধনের প্রয়োজন। শোধনের অর্থ চৈতন্যের সম্যক অভিব্যক্তি, বিকাশ ও প্রাধান্য।

জ্ঞান অপেক্ষা শুদ্ধ বস্তু ও পবিত্র বস্তু আর নেই। জ্ঞানের বিকাশে ও উৎকর্যলাভে ভেদদৃষ্টি বা দোষদৃষ্টি অপসারিত হয় ও পূর্ণতা প্রকাশ পায়। এই হল সম্বিৎমাতা বা গুরুশক্তি। শক্তি সমানে এলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বভাব তখন স্ববোধে পরিণত হয়। বিজ্ঞানময় অভিব্যক্তি হল ব্রহ্মের স্বভাবরূপ অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসাত্ত্বিক অনুভূতি হল বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম। যতক্ষণ জ্ঞানের ব্যবহার চলতে থাকে ততক্ষণই সে বিজ্ঞানময় গুরু। ব্যবহার স্থিতি লাভ করলে প্রজ্ঞানময় হয়ে যায়। নিজের ব্যক্ত রূপ অব্যক্ত বা স্ববোধস্বরূপে পরিণত হয়। তা-ই হল অনবদ্য নিরঞ্জন অর্থাৎ যেখানে রঞ্জিত হওয়ার কারণ থাকে না। এই জন্যই ঋষিদের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাণী উদ্গীত হয়েছে—

অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাহমৃতং গময় আবিরাবির্মএধি।

পরমেষ্ঠিগুরুর ব্যবহারবিজ্ঞান

ঋষিবাণীর মধ্যে তিন স্তরের বিজ্ঞান দেওয়া আছে—স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, তম-রজ-সত্ত্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান, ঋক্-যজু-সাম, কলি-দ্বাপর-ত্রেতা। তিন স্তরকে অতিক্রম করে, চতুর্থ স্তর অর্থাৎ তুরীয় স্তর নিত্যবর্তমান সত্যকে প্রকাশ করছে। তার মধ্যে তিন স্তরই অভিব্যক্ত হয়েছে। স্থূল গুরু, সূক্ষ্ম গুরু, কারণ গুরু, তার পরে আসে পরমেষ্ঠিগুরু। পূর্ব পূর্ব স্তরের দৃষ্টিতে চতুর্থ বা তুরীয় স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্বিৎস্বরূপ অবিভক্ত অবিকারী অপরিণামী নিরন্তর সমরসসার স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত অখণ্ড ভূমা।

এই পরমেষ্ঠিগুরুর লক্ষণ হল যে তিনি হলেন ধ্রুবাস্মৃতির অধিকারী। সেই স্মৃতি কখনও বিচ্যুত হয় না। তাঁর অন্তরে সম্বিৎস্বরূপ মা-ই স্বয়ং প্রকাশিত হন। সেই জন্য তিনি সর্ববিধ অজ্ঞানের বিকার থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য অদ্বয় অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ভগবান হলেন যেন চাষী। মানবরূপ জমি চাষ করে তিনি নবান্ন ঘরে তোলেন। নবান্ন হল তাঁর সব চেয়ে আনন্দের বস্তু। সাধকের কাছে সিদ্ধি হল আনন্দের বস্তু। ভগবানের আনন্দই হল সত্য; কারণ তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁর আর চাওয়া-পাওয়া নেই। জীবের চাওয়া-পাওয়া আছে। সাধকের চাওয়া-পাওয়া আছে; কিন্তু অনুভবসিদ্ধের আর চাওয়া-পাওয়া থাকে না। তিনি চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে পরমতত্ত্বরূপে 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' এই বোধে স্থিত।

এই জন্য দেখা যায় অনুভবসিদ্ধগণ পরস্পরের মধ্য অধিকারীর ভাব সঞ্চার করেন। তা ছাড়াও অন্য সময়ে তাঁরা যে ভাববিনিময় করেন তা সবার জন্য। বিদ্যাকে তাঁরা সর্বোত্তম মর্যাদা দেন অবিদ্যাকে অতিক্রম

করার জন্য। তারপর বিদ্যা ও অবিদ্যা মিলে যায়। বিদ্যার কাজ হল অন্তর ও বাহিরকে সমান করে কেন্দ্রে একেবারে তুরীয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ স্বরূপ অভিব্যক্তির পূর্ব পর্যন্ত সব সাধনা, অনুভূতি হল বিদ্যার অধীন। ব্রহ্ম যখন নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন, তখন নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। গুরু দু'টি বস্তু প্রকাশ করেন। একটি হল স্বভাব এবং অপরটি হল স্বরূপ (স্ববোধ)।

সিদ্ধপুরুষদের গুরুদক্ষিণা দানের তাৎপর্য

গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। তাই সিদ্ধিলাভের পরেও সাধক গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে গুরুদক্ষিণা দেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি প্রার্থনা ও গুরুস্তব ও স্তুতির মাধ্যমে—'তুমি মহান্ অনন্ত অসীম। আমি ভাল বা মন্দ যা-ই হই না কেন তোমার কৃপাতেই আমি আজ এই অবস্থা লাভ করেছি।' গুরুর কাজ হল—আপনবোধে বা সমবোধে সবকে মানা। কী ভাবে যে সবকে মানা সম্ভবপর হয় তা তাঁদের আচরণ না-দেখলে বোঝা যায় না। মহাত্মা-মহাপুরুষদের জীবনে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

সত্যাদর্শকে পালন করাই হল মহাত্মাদের বৈশিষ্ট্য

একবার এক মহাত্মার কাছে গেরুয়া পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে চিনতেন একজন ভণ্ড সাধু বলে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। সুতরাং সাধুবেশী সেই ভণ্ডকে উপস্থিত হতে দেখে তাঁরা বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। মহাত্মাজী কিন্তু তাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের আসন ত্যাগ করে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। তারপর বিশেষ কোনও বাক্যালাপ না-করে শান্তভাবেই বসে থাকেন। পরে সেই ভণ্ড সাধুটি বিদায় নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় মহাত্মাজী তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং রীতি অনুসারে তাকে ফলদান করেন ও প্রণামী দেন।

সাধুটি চলে যাবার পরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন এই ভণ্ড সাধুর পরিচয় মহাত্মাকে জানান এবং মহাত্মাজী কেন তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং কেন ফল ও প্রণামী দিলেন তা জিজ্ঞাসা করাতে মহাত্মাজী হেসে বলেছিলেন যে তিনি কোনও ভুল করেন নি। সন্ন্যাসীর কাছে গেরুয়ার মর্যাদা হল সত্য, ত্যাগ ও আদর্শের মর্যাদা ও বৈরাগ্যের মর্যাদা। সুতরাং বৈরাগ্যের আশ্রয় নিয়ে ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া ধারণ করে কেউ ভণ্ড সাধু হলেও তিনি গেরুয়াকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং যেহেতু গেরুয়ার আশ্রয় নিয়ে সাধু সেজে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়েছে সেহেতু সাধুর ব্যবহারই তিনি দেখিয়েছেন। অসাধুর ব্যবহার তিনি দেখাননি। সাধু তো আর অসাধুর মতো ব্যবহার করতে পারেন না। অসাধুর মতো ব্যবহার যদি সাধু করেন তাহলে আর সাধুর সাধুতা রক্ষা হয় না। এই অসাধু সাধুর বেশ ধারণ ও সাধুসঙ্গ করার ফলে তার সাধু হবার পথ বা রাস্তা খোলা রইল। সাধুর কৃপায় সে যথার্থ সাধু হতে যেন পারে।

সাধুর ব্যবহার সাধু বোঝে, অসাধু বোঝে না সত্য, তাই অসাধুর চিত্তে সাধুর ব্যবহার সম্বন্ধে নানা বিকল্প চিন্তার উদয় হয়। যাই হোক এই ঘটনা থেকে তোমাদেরও অনেক কিছু শিখবার আছে। সাধু হতে গেলে একতরফা বিচার করে সাধু হওয়া যায় না। অন্তরে শ্রদ্ধা ও তার সম্যক্ ব্যবহার দীর্ঘকাল অভ্যাসের মাধ্যমে অনুশীলন করলে তবে তা স্বাভাবিক হয়। আত্মা তো সর্বত্র সকলের ভিতরেই আছেন। সাধু সেই আত্মাকেই শ্রদ্ধা জানান আত্মবোধে। আর অসাধুর অন্তরে শ্রদ্ধার অভাবে সাধু-অসাধু দ্বৈত ভাবের দ্বন্দ্বে নিজের চিত্তের মল বাড়ায়। অশুদ্ধ মনের সাধু-অসাধু বিচার দ্বারা সাধু চেনাও যায় না, সাধুর সেবাও করা যায় না। কেবল অসাধু ভাবের প্রভাবে জীবন চলতে থাকে। এই কথা কয়টি বলে মহাত্মাজী হেসে চুপ করে গেলেন। এই

প্রসঙ্গে আর কোনও কথা বলেন নি। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ঘটনা ও মহাত্মাজীর কথার এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

গুণকীর্তনের মাধ্যমে গুণময়ী মা অভিব্যক্ত হন

গুরুর ব্যবহার্য বস্তু দর্শনে কল্যাণ হয় ও গুরুভাব জাগে। সাধু-সন্তের গুণকীর্তন যত করা যায় ততই ভাল। তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দা যত বড় সত্যই হোক বা মুখরোচক হোক তা কখনও করা উচিত নয়। তাঁদের কোনও সমালোচনাই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে কল্যাণকর নয়। গুণকীর্তনের মাধ্যমে গুণময়ী মা অভিব্যক্ত হন। সেই জন্য ভাগবতে তাঁর গুণমাহাত্ম্য কীর্তন সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ আছে। অপরের দোষদর্শন খুব যুক্তিপূর্ণ হলেও তা মন থেকে সরিয়ে দিতে হয়। কারণ অন্তর্বিকাশের জন্য যা সাহায্য করে তা হল সত্যদৃষ্টি ও সমদৃষ্টি। শয়নে স্বপনে মহতের কথা ভাবতে ভাবতে অবচেতন মন থেকে চেতন মন জাগ্রত হয়। এই চেতন মনই আত্মজিজ্ঞাসু, আত্মান্বেষণকারী, সত্যান্বেষী, মুমুক্ষু এবং যথার্থ ঈশ্বরাভিলাষী হয়ে পরিণামে পরমসিদ্ধিলাভে অর্থাৎ নিজের দিব্য মুক্ত অমৃতস্বরূপ উপলব্ধি করে শান্তি ও আনন্দে বিচরণ করে।

[২১।৮।৭৭]

আত্মগুরুই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু

এক রাজা ছিলেন এক বড় ঋষির শিষ্য। রাজা অনেক বিবাহ করেছিলেন এবং তার মধ্যে অধিকাংশই গত হয়েছিলেন। বহু স্ত্রী থাকা সে যুগে সম্মানজনক ছিল। সেই জন্য রাজা পুনঃপুনঃ অনেক বিবাহ করেছিলেন।

সে যুগে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। জীবনধারণের কোনও সমস্যা ছিল না, সর্বোপরি পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক ছিল। কাজেই রাজাদের হাজার পত্নীও থাকত।

সেই রাজার মন্ত্রী একদিন রাজাকে সংবাদ দিল—মহারাজ, এক দেশের খবর পেয়েছি, সেখান থেকে আপনি অনেক পত্নী আনতে পারবেন কারণ সেখানে অনেক বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। রাজা মন্ত্রীর কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু এ কথা শুনে গুরুদেব রাজাকে বললেন—মহারাজ, আর কত বিবাহ করবেন? এবার বন্ধ করুন এ সব।

রাজা—আপনি এ সবের মর্যাদা কী করে বুঝবেন? আপনি তো কৌপীন পরে ঘুরে বেড়ান। একদিন আমার জায়গায় বসে রাজত্ব চালান দেখি, তাহলে পাগল হয়ে যাবেন।

গুরুদেব—হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন; কিন্তু আপনাকে তো এগিয়ে যেতে হবে, এক অবস্থার মধ্যে তো বসে থাকতে পারবেন না। তখন অন্য চিন্তা আসবে। আমি অনেক রাজার খবরই জানি যারা আমার নির্দেশেই ওঠে বসে এবং তাদের যে পরিণামে কী অবস্থা হয়েছে সে সংবাদও আমি জানি।

রাজা—(মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) গুরুদেব কী আমাকে সন্ন্যাসী বানাতে চান?

মন্ত্রী—হয়তো তা-ই তাঁর ইচ্ছা।

রাজা—আমি সন্ন্যাসী হলে, তুমি কী করবে?

মন্ত্রী—আমিও সন্ন্যাসী হব।

এদের কথাবার্তা জানতে পেরে গুরুদেব বললেন—তোমাদের এখন আমি সন্ন্যাসী বানাব না। সেই অবস্থায় আসতে তোমাদের আরও কয়েক জন্ম লাগবে। রাজা, তুমি এখন বুদ্ধির জোরে রাজ্য চালাচ্ছ, কিন্তু মনে রেখ, আমার বুদ্ধি তোমার থেকে অনেক বেশি। আমি তোমার মতো এই অবস্থা অতীতে পার হয়ে এসেছি।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—গুরুদেবকে পরীক্ষা করতে হবে। গুরুদেবের সেবার জন্য তিনি এমন লোক রাখলেন যারা আধ্যাত্মিকতার মর্ম বোঝে না এবং তাদের গুরুত্বও দেয় না। তারা বাস্তব বুদ্ধিতে গুরুদেবের উপরে অত্যাচার করতে লাগল; এমন কী বিষ পর্যন্ত খাওয়াল।

গুরুদেব সবই বুঝতে পেরে বললেন—তোমরা আমাকে যে জিনিষ খাওয়ালে তা খেলে তোমরা কী বাঁচবে? আর আমি যদি না-মরে বেঁচে যাই তখন এই দুষ্কর্মের ফল তোমাদেরই তো ভোগ করতে হবে। তোমরা তো কেউ রেহাই পাবে না।

গুরুদেব তখন মন্ত্রশক্তি দ্বারা বিষকে অমৃতে পরিণত করে দিলেন। সেই অমৃতের গন্ধে চারদিক ভরে গেল। তখন দেহরক্ষীরা ভয় পেয়ে রাজাকে গিয়ে বলল—আর আমরা গুরুদেবকে পরীক্ষা করতে পারব না। যা করবার আপনি করুন।

রাজা গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি আবার তাকে বোঝালেন—মহারাজ আপনি এ সব ছেড়ে দিন। আপনি তো এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর আমি আপনার পিতামহকে পর্যন্ত দেখেছি। অথচ আমার দেহ এখনও বৃদ্ধের মতো জরাজীর্ণ হয়নি।

রাজা আবার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মন্ত্রীকে বললেন—আমি যদি গুরুর আদেশ পালন না-করি তবে তিনি হয়ত রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। তখন আমার উপায় কী হবে? আবার রাজ্যে থাকলেও হয়ত আদেশ দেবেন যে রানীদের মুখ দেখতে পারবে না। এই রকম ব্যবস্থা মেনে চলা আমার পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হবে?

মন্ত্রী—গুরুদেবের সাহায্য আমাদের একান্ত দরকার। তিনি এখানে চারপুরুষকে দেখেছেন। দেখি, তিনি কী বিধান দেন।

মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা গুরুদেবের কাছে গেলেন। গুরুদেব রাজাকে বললেন—মহারাজ, আমি আপনাকে মহারানীদের ত্যাগ করতে আদেশ দেব না। তবে এখন থেকে তাদের ভোগ্য বলে গ্রহণ না-করে মাতা বলে গ্রহণ করবেন।

গুরুদেবের কথা শুনে রাজা সারারাত ভাবলেন—এ কী করে সম্ভব? রাজার চোখে ঘুম নেই দেখে রানীরা এসে খোঁজ করতে লাগলেন, রাজার কী হয়েছে?

সকালে উঠে রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী ভাবে রাণীদের মাতৃবোধে গ্রহণ করা সম্ভব? তখন গুরুদেব রাজাকে সাত দিন ধরে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব বললেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন—প্রতিদিন প্রতি রানীর দুয়ারে মাধুকরী ভিক্ষা করে আনবে। তারপর সেই ভোগের প্রসাদ আমি যে-ভাবে তোমাকে দেব সে-ভাবেই তুমি গ্রহণ করবে এবং রানীদেরও দেবে।

এই ভাবে গুরুর নির্দেশ মেনে চলার ফলে রাজার মনের পরিবর্তন হল। তখন তাঁর মধ্যে দিব্য ভাবের প্রকাশ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই ভাবে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সাধনা করে রাজা অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করে গিয়েছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

এই গুরু হলেন তিনি, যিনি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যান। অজ্ঞান হল জ্ঞানের বিকল্প বা বিপর্যয়; জ্ঞানের অপূর্ণতা বা স্বল্প জ্ঞান বা খণ্ড জ্ঞান, বিকৃত জ্ঞান, জ্ঞানের আভাস বা ইঙ্গিত; অন্যথা জ্ঞান, আবৃত জ্ঞান, বিকল্প জ্ঞান এবং জ্ঞান অতিরিক্ত যে সব ভাবনা বা কল্পনা। তা ছাড়াও জ্ঞানের প্রস্তুতি বা আয়োজন। এ সবই অজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। সোজা কথায়, জ্ঞানের বক্ষে জ্ঞান অতিরিক্ত কল্পনা, ভাবনা মাত্রই হল অজ্ঞান। সুতরাং দ্বৈত ভাবই হল অজ্ঞান। অনাত্মভাবই হল অজ্ঞান। আপন বিপরীত যা তাও অজ্ঞান। অখণ্ড সমতা

বিরোধী ও জ্ঞান বিরোধী যা-কিছু সবই অজ্ঞান। যা জানি তা আদৌ জানা নয়। জৈবিক চাহিদা মেটাতে কত লক্ষ কোটি জনম নিতে হয় তা জানেন সদাত্মগুরু। আপন ঘরে ফিরবার টিকিট হল ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা কী করে জাগ্রত হয় তাও আত্মগুরুর কৃপাতেই হয়ে থাকে। [১১।৯।৭৭]

সত্য, মন্ত্র ও গুরুবাকের তত্ত্বার্থ বিশ্লেষণ

সত্য হল শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা। মন্ত্র হল সত্য জীবনশাস্ত্রের ব্যবহার বিজ্ঞান, শাস্ত্রের সার হল গুরুবাক্। কারণ শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গুরু তা প্রকাশ করেন। অন্তরচেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে মন্ত্র। নিজের ভ্রান্তি দূর করার জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় তা-ই মন্ত্র। যিনি সেই ভ্রান্তিকে বা বিকারকে শোধন করে দেন তিনিই গুরু।

মনের ধর্ম দ্বৈত বলেই সংশয়াত্মক। বোধের ধর্ম অনন্ত, অখণ্ড, অদ্বৈত, স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য শুদ্ধ একরস—নিত্য সমান বলে সংশয়শূন্য, প্রজ্ঞানঘন ও সর্ব অধিষ্ঠান, সর্বসমাধান। সংশয়কে যে শব্দ দ্বারা নাশ করা হয় তা-ই মন্ত্র[১]। মন্ত্রের কাজ হল মনের বিকারকে শোধন করা। মনকে যে ত্রাণ করে তা-ই মন্ত্র[২]। শব্দায়িত মনকে নিঃশব্দায়িত করে দেয় যে, গতিকে স্থিতিতে এনে দেয় যে, অশান্তকে শান্ত করে দেয় যে, সেই মহামন্ত্র[৩] গুরুর মাধ্যমে পেলে ফলবতী হয়। ধীরে ধীরে তার প্রভাব দ্বারা অন্তরের শোধন হয়।

গুরু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, প্রদীপের জন্য তেল, পলতে সবই দেন; কিন্তু 'প্রদীপ ফুটো'[৪] হলে সব চেষ্টাই বৃথা।

জীবের উৎকর্ষ লাভ হয় যা-দিয়ে তা গুরু না-দিলে অনুমান করা সম্ভবপর হয় না। গুরু প্রীত হন যা দ্বারা তা হল light[৫]. Light গ্রহণ না-করলে গ্রহীতা উপকার পায় না।

বর্তমান যুগের মানুষের সাধ্য খুব কম সাধনভজন করার। অতীতে গুরুগৃহেই একশত বৎসর থেকে সকলের সাধনা করতে হতো। তবু কলি যুগের মানুষের প্রতি পরমাত্মার এত করুণা যে তিনি সকলকে এমন এক বিধান দিয়েছেন যাতে কলি যুগ থেকে একেবারে সত্য যুগে যেতে পারে। এই বিধান হল সর্বান্তঃকরণে সচেতন হয়ে সদা সর্ব অবস্থায় গুরুবাক্য মেনে চলা। বিদ্যা শিখতে গেলে গুরুর সাহায্য দরকার হয়, কিন্তু অখণ্ড বোধে মানার ব্যাপারে মানুষ যাচাই করতে চায়। যার সাহায্যে যাচাই করতে চায় তাকে মানা না-হলে মনের সন্তার পাবে কোথায়? চৈতন্য মানেই হল গুরু। [১৩।৯।৭৭]

অনাত্মচিন্তা ভ্রান্তিমূলক, আত্মচিন্তা তার নাশক

ইষ্টচিন্তার মধ্যে অন্য চিন্তা হল ভ্রান্তি। জগৎকে ঈশ্বররূপে না-ভেবে পৃথক করে ভাবলে তারপর তা শোধন করা কঠিন হয়। নিজের ভিতরে যে বৃত্তি উঠছে তার মূলে গুরুকে না-ধরলে বা না-চিন্তা করলে তা প্রশমিত হয় না, শোধন হয় না বা তার দিব্য রূপান্তর হয় না।

১। মন্ত্র—অভিনব সংজ্ঞা।

২। মন্ত্র—অভিনব সংজ্ঞা।

৩। মহামন্ত্র—স্বানুভূতিব দৃষ্টিতে।

৪। প্রদীপ ফুটো অর্থে এখানে আত্মদ্বেষী ভাবকে বলা হয়েছে। এর কারণ হল অবিদ্যাজাত অভিমান। অভিমানের কারণ হল আত্মবিস্মৃতি; তার কারণ আত্মাতিবিক্ত ভাব ও কল্পনা এবং তা পূরণের জন্য তীব্র কামনা ও ইচ্ছা, তা পূরণের জন্য চেষ্টা। চেষ্টাকে ফলবতী করার জন্য দেহধারণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহাব। তার ফলে কর্ম সাধন ও কর্মের ফলভোগ। এই ভাবে নিষ্ক্রিয় আত্মার জীবদশা ও ভোগদশা প্রাপ্তি হয়।

৫। Light—পরাচিৎ বা শুদ্ধ জ্ঞান।

জগৎ বলে যা দেখা হয় তা ভ্রান্তি। ভ্রান্তি দূর হয় গুরুবাক্য আচরণ, শিক্ষা ও ভজনের দ্বারা। গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী সচেতন ভাবে অভ্যাস করাই হল ভজন। যিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আপনবোধে বা স্ববোধে অনুভব করে সকলকে একত্বের বোধে যেতে সাহায্য করেন, তিনিই হলেন গুরু। সেই জন্য সবার গুরু সব সময় সকলের সাথে সাথেই আছেন। চৈতন্যশূন্য কেউ হতে পারে না। গুরুদৃষ্টির অর্থ সর্বত্র চৈতন্যের দৃষ্টি। এ-ই হল গুরুদর্শন। যাঁর মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে যিনি আছেন তাঁকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তিনি তো প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছেন। কর্ম ও কর্মফল গুরুর বা ইষ্টের নামে সমর্পিত হলে কর্মফল আর স্পর্শ করে না।

সকলের গুরুর মধ্যে যে নিত্য এক গুরুই বর্তমান তার তাৎপর্য সুন্দর একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ব্যক্ত করলেন—

একবার একজন মহাত্মা এক বিরাট গাছের নিচে তাঁর আসন পেতে বসেছিলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকবার পর দেখলেন যে সেখানে অনেক বিদেহী আত্মা বা ব্রহ্মদৈত্যেরা আসে। তারা তাকে রাত্রির সাধনাতে বাধা দিত। তারা মহাপুরুষকে বলত—আমাদের ভজন শোনাও। তিনি যখন ভজন করতেন তখন তাঁরা সব এলোমেলো করে দিত। কিন্তু তাতেও তিনি ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি একদিন বললেন—বাবা, তোমরাই দয়া করে ভজন কর। আমি তো ভাল জানি না। আমি যদি কিছু ভুল করি, তাহলে তোমাদের গুরু আমার উপরে রাগ করবেন।

এক ব্রহ্মদৈত্য জিজ্ঞাসা করল—আমাদের গুরু রাগ করবেন কেন?

মহাত্মা বললেন—তোমাদের গুরু আমারও গুরু। এ কথা শুনে ব্রহ্মদৈত্যরা খুব তুষ্ট হল, তার ফলে মহাত্মাকে তারা আর কেউ বিরক্ত করত না। [১৮।৯।৭৭]

আত্মা অতিরিক্ত সবই অবিদ্যা-অজ্ঞান

স্বানুভূতিকেই ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি বলা হয়; কারণ আত্মা স্বরূপত এক, কিন্তু বাহ্যত বহু দেখায় মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আপন আপন অজ্ঞানবশত বুদ্ধিদোষে। মন ও ইন্দ্রিয়যোগে যা ভাবা যায় তার মধ্যে একটা কল্পনা, অভাব ও ভেদ থেকে যায়। তাকে মন কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না; সেই জন্য বুদ্ধির যুক্তি ও বিচারের দরকার হয়। তা ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে সাহায্য করে বটে কিন্তু তা আত্মবোধের প্রতিবন্ধক হয়। এই বুদ্ধির শোধন না-করতে পারলে বুদ্ধির ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় না। বুদ্ধির শোধন হয় আত্মবোধের বিচার দ্বারা এবং গুরুর কৃপা ও আশীর্বাদ দ্বারা। পরম বোধস্বরূপ আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির অভিন্নতা প্রাপ্তি হয় নিরন্তর আত্মধ্যানের দ্বারা। আত্মধ্যান সিদ্ধ হয় সমাধির মাধ্যমে। সমাধি সিদ্ধ হয় আত্মবোধে সম্যকরূপে স্থিতি দ্বারা। আত্মবোধে দ্বৈতবোধ থাকে না, সুতরাং বুদ্ধির পৃথক অস্তিত্বও থাকে না। সেই জন্য বুদ্ধি এক জায়গায় গিয়ে আটকে যায়. সেখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারে না। সংশয় হল মনের ধর্ম এবং ভেদ বা পার্থক্য হল বুদ্ধির ধর্ম। উভয়ই অবিদ্যা ও অজ্ঞানজাত।

স্বানুভূতির যুক্তি হল গুরুশক্তি, তার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য

স্বানুভূতিরও একটা যুক্তি আছে। সেই যুক্তি কিন্তু সংশয় দেখে না, তাতে ভেদ বা পার্থক্য থাকে না। সুতরাং তা সংশয়ও তৈরি করে না বা আবর্তের মধ্যেও ঘুরপাক খায় না। সেই যুক্তিকেই গুরুবাদে গুরুশক্তি বলা হয়। গুরু যে আলো দিয়ে যান, সেই আলো নিজের ভিতরে সম্যক্ সাধনবলে প্রজ্বলিত হলে সমগ্রতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বানুভূতির কোনও অবলম্বন দরকার হয় না; কারণ সে স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃসিদ্ধ ও

স্বয়ংপ্রমাণ। সেই জন্য সাধকের যখন গুরুনিষ্ঠা জাগে ও গুরুভাবে প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব থাকলেও আত্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় থাকে না। গুরুনিষ্ঠা[১] অর্থে গুরুপ্রদত্ত সেই বোধের আলোকেই বোঝায়, যাকে গুরুশক্তি বা প্রজ্ঞাজ্যোতি বলা হয়। গুরুসেবার দ্বারাই সেই আলোর বা গুরুর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

দ্বৈতবোধের দর্শন[২] অনুভূতি লাভে সাহায্য করে কিন্তু স্বানুভূতি লাভের জন্য এই দর্শন সাহায্য করতে পারে না। শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে সত্যের আভাস মেলে। যুক্তি বা বিচার করে বা নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে সত্যের প্রমাণ মেলে না। শ্রুতি, যুক্তি, গুরু উক্তি ও ব্যক্তিগত অনুভূতি এই চারটি একত্র হলে হয় স্বানুভূতি[৩]। স্বানুভূতি হল সর্ব অনুভূতির সার। এ হল আপনবোধরূপ বা নিজবোধরূপ সত্তাস্ফূর্তি। সুতরাং তা স্বয়ংপূর্ণ। এতে কখনও কোনও অনুভূতির অভাব হয় না। এই নিত্য পরম এক-এর মহিমা ধরিয়ে দেবার জন্য গুরু নিরন্তর কৃপা-করুণা বিতরণ করছেন। গুরুকৃপাধন্য না-হলে এই স্বানুভূতি লাভ হয় না।

গুরুবাদের অভিনব মহিমা

সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে যে গুরুবাদের সন্ধান পাওয়া যায় তার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই একবাদের মধ্যেই সব মতবাদের synthesis আছে। এ ছাড়া আর সব মতবাদেই দেখা যায় কোনও না কোনও জায়গায় এসে একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সনাতন হিন্দুধর্মের এই একবাদের বা গুরুবাদের মধ্যে মুক্তার কণ্ঠহারের মতো সব মতপথ একত্র গ্রথিত হয়ে আছে। অর্থাৎ সর্বযুগের সব সত্য, শিক্ষা, অনুভূতি ও মহিমাকে গুরুবাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। তা মানা সাধনার পর্যায়ে পড়ে। গুরুতত্ত্বের দিকে মন যতই এগিয়ে যায় ততই দেখা যায় গুরু সেই বস্তু নিয়েই অপেক্ষা করে বসে আছেন যার অভাব সকলের মধ্যেই আছে।

এই প্রসঙ্গে বেদের এক ঋষি সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন—'সত্য হল সেই বস্তু যার মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ-ঘটনা, অতিপ্রাকৃত, ব্যষ্টি-সমষ্টি সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির পূর্ণ স্থান রয়েছে।' এই কথাটির তাৎপর্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পৃথিবীর কোনও ঘটনাকে বা চিন্তাকেই বাদ দেননি তিনি।

তাঁরই কৃপা ও করুণা বশত ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হয়েছে। তাঁদেরই গুরুরূপে বন্দনা করা হয়েছে। সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর ভাবধারাকে গুরুবাদের মধ্যে সকলে পূজা করে। উপাস্য দেবতারূপে যাঁকেই যে পূজা করুক প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড সত্যকেই সেই দেবতার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। রাম, কৃষ্ণ, হরি, শিব যে কোনও নামেই ডাকা হোক, সব নাম এক গুরুরই নাম। এই দৃষ্টিতে দেখলে সকলেই এক গুরুর গোষ্ঠীভূত হয়ে যায়, সে যে কোনও সম্প্রদায়েরই হোক না কেন। তার ফলে Universal brotherhood আপনিই এসে যায়। এক সূর্যের সঙ্গে সকলের সমান সম্বন্ধ আছে বলে সবাই যেমন সমান আলো পায়, সেইরূপ এক পরমাত্মগুরুর কাছ থেকেই সকলের প্রতি সমান আনন্দ, প্রেম ছড়িয়ে পড়ে।

যে প্রকাশ অখণ্ডের বক্ষ থেকে বা আদি প্রকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে আপন বক্ষে ধারণ করে তার পুষ্টি ও তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করে গুরু তাকে অখণ্ড এক প্রজ্ঞাজ্যোতিতে পরিণত করে দেন।

১। গুরুনিষ্ঠা—গুরুপ্রদত্ত বোধের আলোকে অনুসরণ করে চলা।

২। দর্শন—দর্শন শব্দের গতানুগতিক অর্থে অর্থাৎ দ্বৈতবোধে পাওয়া যায়—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ। কিন্তু অদ্বৈতবোধে এর অর্থ হল অপরোক্ষানুভূতি, ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি অথবা স্বানুভূতি।

৩। স্বানুভূতি—অদ্বয় দৃষ্টিতে।

আত্মগুরুশূন্য কেউ কখনও হতে পারে না। তাঁর স্মৃতি ভুলে জীবভাবে চলে সকলে। গুরুকৃপা ছাড়া কোনও বোধ মুহূর্তের জন্যও খেলতে পারে না। গুরু হলেন অখণ্ড পূর্ণ কেবল জ্ঞানঘন মূর্তি। ব্রহ্মানন্দ হল গুরুর স্বরূপ।

সচ্চিদানন্দস্বরূপের বিশেষ লক্ষণাদি

ব্যষ্টিমনের দিক থেকে যা-কিছু দেখা শোনা বা জানা যায়, এক কথায় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও সম্বিৎ এই চারটির দ্বারা যা প্রকাশিত হয় তা-ই হল সচ্চিদানন্দস্বরূপের বিশেষ লক্ষণ। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি বা অভিব্যক্তি হল কর্ম। তা ইন্দ্রিয়-মনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত হয়। ভাতি[1] হল চিতি, যা বুদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং ভাতি ও চিতির যুগল মূর্তি হল আনন্দরতি।

চতুর্বিধ গুরুর প্রকাশভঙ্গিমার লক্ষণ

গুরু চার পর্যায়েই বর্তমান। রূপের গুরু নামের গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। নামের গুরু ভাবের গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন এবং ভাবের গুরু বোধের গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। ভাবের উপরে গেলে হয় সমাধি। গুরুর মধ্যে বাস করা হল সমাধি। অথবা বোধের মধ্যে ডুবে যাওয়া হল সমাধি। হৃদয়ের গভীরে গুরু তাঁর আপন অস্তিত্ব রেখে দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় বহু, মন দিয়ে দেখা যায় দ্বৈত রূপ এবং অন্তরে দেখা যায় একাকার। সবগুলি মিলে হয় গুরুর রূপ। ব্যষ্টি তাঁর প্রকাশ। সমগ্রতার দিক থেকে ব্যষ্টি তাঁর সম্পত্তি। কিন্তু ব্যষ্টি সমষ্টিকে সম্পত্তি বানাতে পারে না। [২০।৯।৭৭]

ভজন সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ

ভজনের প্রথম অংশ থাকে Personal God-কে কেন্দ্র করে। তারপর হয় Impersonal God-কে কেন্দ্র করে এবং সব শেষে হয় Impersonal Personal-কে কেন্দ্র করে। 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মধ্যে যত ভজনই প্রকাশ হয়েছে সব ভজনেই অখণ্ড ভূমাকেই নির্দেশ করা আছে। 'এর কাছে' গুরুভজন, আত্মভজনের অর্থ হল অখণ্ডের ভজন। গুরুকে ব্যষ্টিরূপে পাওয়া যায় বলে তিনি ঠাকুর। ব্রহ্মকে গুরুর মাধ্যমে ছাড়া পাওয়া যায় না।

গুরুভজনের বৈশিষ্ট্য হল প্রতিপদে, প্রতিবোধে এক-এর দর্শন, এক-এর মনন, চিন্তন ও এক-এর অনুভূতি লাভ করা। নিজেকে পৃথক করে নিয়ে গুরুভজন হয় ঠিকই, কিন্তু তা ব্যাপক হতে পারে না। গুরুর মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে গুরু এই বোধে হয় গুরুভজন। গুরু যে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মাস্বরূপ—তা মেনে নেওয়া সহজ নয়। অথচ তা-ই সবচেয়ে বড় সত্য। স্বয়ংপূর্ণ, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ যিনি অর্থাৎ যিনি নিত্য অদ্বয়স্বরূপ তাঁর বক্ষেই এই বৈচিত্র্যময় লীলাখেলা হয়ে চলেছে নিত্যকাল তা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছু নেই । শুধু তা-ই নয় নিত্য অদ্বৈত হয়েও বহুরূপে স্বয়ং তিনিই লীলাখেলায় মেতে আছেন। তিনি এক হয়েও বহু সাজেন এবং বহু সেজেও নিত্য একই আছেন। নিজে মুক্ত হয়েও নিজেকে বদ্ধ ভাবেন, আবার বদ্ধ ভেবেও তত্ত্বত মুক্ত থাকেন।

এইরূপ এক তত্ত্বকে আর কী করেই বা ব্যক্ত করা যায়? তা ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত। কারণ 'এটা বুঝি'—এ কথাও বলা যায় না; আবার 'কিছু বুঝি না' —এ কথাও বলা চলে না। এর রহস্য হল যে, সকলের হৃদয়কেন্দ্রে যিনি বাস করেন, তিনিই সব প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশধারার মধ্যে

১। ভাতি—চিদাভাস, অন্তরের ভাববোধ।

কখনও শান্ত, কখনও অশান্তভাব থাকে। তিনি কিন্তু শান্ত-অশান্তের উর্ধ্বে। আবার তাঁর মধ্যেই সব এবং সবার মধ্যেই তিনি। আবার সর্বাতীত তিনি স্বয়ং। তাঁকে নির্ণয় করা বড় কঠিন।

আত্মার আমির পরিচয় প্রত্যেকের আমির মধ্যে নিহিত আছে

প্রত্যেকের মধ্যে যে প্রত্যেকের সত্তা তাঁকে মাপতে বা জানতে পারা যায় না—তিনি স্বসংবেদ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংপূর্ণ। পূর্ণ থেকেই তিনি নিজেকে অপূর্ণের মধ্যে প্রকাশ করেন। যতক্ষণ ভাবের মধ্যে অথবা জ্ঞান ভাবের বা ভক্তি ভাবের বা কর্ম ভাবের মধ্যে এই প্রকাশকে রাখেন অর্থাৎ নিজেই থাকেন ততক্ষণ তাঁর এই এক সগুণের পরিচয়ই (জীবজগৎ) চলতে থাকে। যতদিন নিজের ভাবকে নিজে গুটিয়ে না-নেন নির্গুণস্বরূপে, ততদিন নিজের স্বরূপ বা স্বভাব আবৃত থাকে। পরে এক সময় নিজের কাছে নিজের ভাবকে প্রকাশ করে ধরা দেন। কী ভাবে দেন—তা-ই হল বেদের সার কথা। সেখানেই পাওয়া যায় আমির পরিচয়—কে আমি? কার আমি? কোথায় এলাম, কেন বা এলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। তখনই সব প্রশ্নের সমাধান মিলে যায়—শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের মাধ্যমে উদ্গীত একটি সঙ্গীতে—

ঈশ্বর আত্মা ব্রাহ্মীস্থিতি সত্তাস্ফূর্তি প্রজ্ঞাজ্যোতি
আত্মরতি ধ্রুবাস্মৃতি ভূমামৃত মুক্তি ও শান্তি।।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মশক্তি জ্ঞানানন্দ প্রেম প্রীতি।
ব্রহ্মশক্তি পরাপ্রকৃতি অনন্ত তার প্রকাশবিভূতি।।
ব্যষ্টি সমষ্টি বিশ্বমূর্তি বিশ্বাতীত বিশ্বপতি।
অস্তি ভাতি প্রেমপ্রীতি স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি।।

গানটি সমাপ্ত হলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার বলে চলেছেন—

এই ব্রাহ্মীস্থিতির কথাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উল্লেখ করে গেছেন বিশেষ ভাবে। ভগবান নিজেই যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমন আবার নিজেই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুরূপে বিরাজ করছেন। তিনিই কিন্তু সবার অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দঘন। সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত সকল জীবকে প্রজ্ঞাস্থিতির বিজ্ঞান দিলেন শ্রুতি, স্মৃতি ও শ্রীগীতার মাধ্যমে। আত্মগুরু তাঁর জীবনের মাধ্যমে যোগ্য অধিকারীর জন্য যা ব্যক্ত করেন তা-ই হল আত্মগীতা[১]। সত্যের স্বরূপ বা নিজবোধস্বরূপ যে আত্মা তা স্বসংবেদ্য অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। সুতরাং তিনি স্বসংবেদ্য।

আপনাতে আপনি করেন যখন রমণ
তখনই অনুভূতি হয় পরমব্রহ্মসনাতন।

কাজেই জীবনের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, ভয়, গুরু-ইষ্টের নামে সব সঁপে দিতে হয়। দুঃখ, কষ্ট, ভয় হল ভ্রান্তি। প্রত্যেকেব বক্ষেই নিত্য বাস করছেন স্বসংবেদ্য পুরুষ। অতএব ব্যষ্টি সমষ্টিকে ছাড়া এবং সমষ্টিও ব্যষ্টিকে ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও নেই।

প্রত্যেকের হৃদয়ে যে বোধস্বরূপ আত্মা, তাঁর প্রতিফলন আমিরূপে প্রকাশ পায়। যখন গুরুবাণীর সঙ্গে আমি যোগ হয় তখন 'স্বসংবেদ্য আত্মরতি ধ্রুবাস্মৃতি' আপনিই প্রকাশ পায়। তখন 'আমি' আর দেহের বা মনের দাস নয়, সচ্চিদানন্দগুরুর দাস। 'দাস' মানে ভৃত্য নয়। ভগবান ভক্তকে সর্বাপেক্ষা মহানরূপে প্রতিপন্ন করেন। ভক্ত হওয়া কঠিন। যে আধারের মধ্যে ভগবান যখন সর্বভাবকে প্রকাশ করে নিজেকে আড়ালে

১। আত্মগীতা—ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মগুরুর মহিমা কীর্তন। অদ্বয় তত্ত্বভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা নির্গুণ ও সগুণ, অদ্বৈত ও দ্বৈত, নিত্য ও লীলা উভয় দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়। আবার এই উভয়ের উর্ধ্বেও যা নির্দেশ করে তা হল পরমার্থ গীতা।

রাখেন তখন সেই আধারকে মহান করেন। ভক্ত[১] হওয়া মানে ভগবানের সঙ্গে এক হওয়া। এই ভক্ত[২] 'ভোগে পোক্ত' নয়। তিনি হলেন ভোগাতীত, অনাসক্ত, স্বসংবেদ্য নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ।

গুরুস্মরণের তাৎপর্য হল যে গুরু বা শুদ্ধবোধের মধ্যে আর কিছু প্রবেশ করতে পারে না। সংসারে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হল সচ্চিদানন্দগুরুর শরণ নেওয়া। তাহলে জগৎ আর জগৎ থাকে না। জগৎ তখন ব্রহ্ম হয়ে যায়, অথবা ব্রহ্মই জগৎ হয়ে যায়। গুরুভক্ত চিত্তে জগৎ হয় ঈশ্বরময় বা আত্মাময়। কিন্তু অজ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্ম জগৎ-ই থাকে। তা কল্পনা নয়। তা হল যথার্থ সত্য।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এবার এক গুরু এবং তার এক শিষ্যের ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি গল্প বললেন—

এক গরীব শিষ্য একদিন তার গুরুকে বলল—গুরুদেব, আপনি সবার বাড়িতে গেলেন কিন্তু আমার বাড়িতে তো একদিনও এলেন না। যদি কৃপা করে আমার বাড়িতে একদিন আসেন তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাব।

গুরুদেব বললেন—আচ্ছা আমি যাব তোমার বাড়িতে তবে অন্যান্য শিষ্যদের বাড়ি ঘুরে, সব শেষে।

গুরুদেব সকলের বাড়ি ঘুরে ঘুরে সবশেষে তাঁর গরীব শিষ্যটির বাড়িতে এলেন অনেক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে, যে-সব তিনি অন্যান্য শিষ্যদের বাড়িতে ভেট হিসাবে পেয়েছিলেন। এ সব বোঝা বইবার জন্য শিষ্যরা যে গাধাটি দিয়েছিল সেটিকেও তিনি তাঁর এই শিষ্যের ভাঙ্গা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। গুরুদেব এসেই শিষ্যকে বললেন—তুই যা হোক কিছু ব্যবস্থা কর আমি পুকুর থেকে স্নান সেরে আসছি।

গুরুদেব স্নান করতে গেলে সেই গরীব শিষ্যটি গুরুদেবের পোঁটলা-পুঁটলি খুলে চাল ডাল আটা সুজি ঘি প্রভৃতি বার করে পরম যত্নসহকারে গুরুদেবের জন্য রান্না করল। গুরুদেব স্নান সেরে এসে তার রান্নার আয়োজন দেখে খুব খুশি হলেন। শিষ্যকে খুব আশীর্বাদ করলেন, বললেন—এত অল্প সময়ের মধ্যে তুই এত আয়োজন কি ভাবে করলি?

শিষ্য হাত জোড় করে বিনীত ভাবে বলল—আমি আর কী করেছি? সবই তো আপনার।

খাবার সময়েও গুরুদেব বারবার তার রান্নার প্রশংসা করলেন এবং বললেন এত রকম রান্না এত অল্প সময়ে তুই কী সুন্দর ভাবেই না করেছিস। খেয়ে খুব তৃপ্ত হলেন। শিষ্যের খুব প্রসংশা করলেন। শিষ্যও বার-বার বলছে—আমি গরীব, আমি কী করে আপনার সেবা করব। এ সবই তো আপনার। আমার বলতে তো কিছুই নেই। এমন কী এই দেহটাও পর্যন্ত আপনার।

শিষ্যের এই বিনয়নম্র ব্যবহারে গুরু খুব প্রীত হলেন। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর যাবার সময়ে পোঁটলা-পুঁটলি গোছাতে গিয়ে দেখতে পান তার জিনিসপত্র কে যেন সব খালি করে নিয়েছে। গুরু এবার বুঝতে পারলেন যে কে সব নিয়ে গেছে। শিষ্যের উপর খুব রেগে গেলেন। শিষ্যকে খুব কঠোর ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন। শিষ্য কেবলই বলতে লাগল--আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি যে আমার কিছুই নেই, যা-দিয়ে সেবা করেছি সে সবই আপনার। এমনকী এই দেহটাও আমার নয়।

কিন্তু গুরু শিষ্যের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। বকাবকি করে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। শিষ্যও কাঁদতে কাঁদতে তার পিছন পিছন গিয়ে বাড়ি পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিল। গুরুদেব তখনও তাকে কিছু বললেন না। গুরুদেবের মুখ থেকে এস বা যাও এ রকম কোনও কথা শুনতে না-পেয়ে শিষ্য সারারাত গুরুদেবের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

১। ভক্ত—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

২। ভক্ত—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

পরদিন গুরুদেবের কানে এ খবর পৌঁছালে তিনি তাকে ডেকে পাঠলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন—তুই দাঁড়িয়েছিলি কেন সারারাত বাড়ির দরজার সামনে?

শিষ্য বলল—আপনি তো আমাকে কিছু বলেননি তাই আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

গুরু তার কথা শুনে বেদনা অনুভব করলেন। নিজের গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন—তাঁর এত সহ্যশক্তি ছিল, আর আমি সামান্য কারণে এত রাগ করলাম! সন্তানের দোষ তো প্রথম প্রথম থাকেই কিন্তু তারপর সব ঠিক হয়ে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

তাঁর জিনিস দিয়েই তাঁর পূজা করতে হয়। বাহ্যিক পূজা না-করতে পারলেও অন্তরে তাঁর চিন্তা করতে হয়। রান্না করার সময়, ঘর ঝাঁড়ু দেবার সময় ভাবতে হয় গুরু তোমার জন্যই এই সকল আয়োজন। আসনে বসে পূজা করার সময় না-পেলেও এরূপ ভাবনাতে ধ্যানের ফল পাওয়া যায়। সময় না-পেলে পায়খানায় বসে ভাবলেও কাজ হয়। শ্রীনাম যখন যেখানে জাগে, জানবে সেই স্থান পবিত্র হয়ে গেছে। অফিসে, বাড়িতে, রাস্তাঘাটে চলার পথে কাজে-কর্মে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে সর্বত্র গুরুর রূপই ভেসে ওঠে। স্মরণ ও ধ্যানে একই ফল পাওয়া যায়। মনে রাখতে হয়, এ জীবনে যার যা-কিছু সব তাঁরই জন্য।

আহার সম্বন্ধে বাড়িঘরে নিয়ম বেঁধে দেওয়া খুবই কঠিন। তথাপি সাধারণ ভাবে বলা চলে যে আহারের পূর্বে অন্নদাতা প্রাণারামকে স্মরণ করে আহার গ্রহণ করতে হয়। বলতে হয় তুমি অন্নদাতা, তুমি অন্নস্বরূপ এবং তুমি আবার গ্রহীতা। এই তিন ভাবের অন্বয় এক ভাববোধে খাবার আগে তুমি আমার মধ্যে বসে গ্রহণ কর এবং আনন্দরূপে তুমিই উদ্ভাসিত হও, এই বলে আহার গ্রহণ করতে হয়। তাহলেই আহারশুদ্ধি হয়। আহার শুদ্ধ হলে ধ্রুবাস্মৃতি জেগে ওঠে। তাঁর নামে কর্তৃত্ব ও ফল সমর্পণ করে কর্ম করলে হয় যজ্ঞ। কাজেই সব নিবেদিত কর্মই হল যজ্ঞ। তাহলেই গুরুকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করার অসুবিধা থাকে না।

গুরু দেশ-কাল-পাত্র ও কার্য-কারণের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না। ভাবতে হয় গুরু আমার অন্তরে-বাইরে সর্বদা বিরাজিত। সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুর অভিব্যক্তি হল আমার এই জীবন এবং আমার পূর্ণ রূপ হল তাঁর জীবন। তা সবার ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। [১৩।১১।৭৭]

Spiritual fire-এর তাৎপর্য

গুরু যে বীজমন্ত্র দেন তা-ই spiritual fire। যদিও নিজ বুদ্ধিদোষে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রভাবে spiritual fire আবৃত হয়ে যায়, তথাপি একেবারে নষ্ট হয় না, কারণ তা অব্যয় বীজ। আবার যথা সময়ে তা সক্রিয় হয়ে ফলপ্রদ হয়।

শুদ্ধ আধারের মাধ্যমে তত্ত্বস্বরূপের ক্রম অভিব্যক্তি

ভগবানকে অনুভব করতে চাইলে একটা লক্ষ্যকে বা আদর্শকে গ্রহণ করতে হয়। গুরুদের বা দেবতাদের মাধ্যমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু (তত্ত্ব) পর্যায়ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। সেই জন্য তাঁদের অনেক জিনিস অতিপ্রাকৃত মনে হয় সাধারণের কাছে। মহান আধারের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে নতুবা তাঁর ধারণা করা যায় না। গরুর বাঁটে দুধ থাকে, যথাবিধি নিয়মে দুধ দোহন করে মাখন তুলতে হয়; সেইরূপ গুরুমন্ত্র ও তাঁর নির্দেশ যথাবিধি পালন ও অনুশীলন করে প্রথমে স্বভাবের শোধন অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি হয় তারপর শুদ্ধ স্বভাবের মধ্যে তপস্যা ও সমাধির মাধ্যমে আত্মানুসন্ধান বা স্বরূপানুসন্ধান সুসিদ্ধ হয়। এটাই হল স্বভাববক্ষে স্ববোধরূপী আত্মমন্থন। আত্মজ্ঞান হল নবনীত সুধা।

সাধককে আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ

অপরকে আঘাত দিয়ে নিজের প্রাধান্য বাড়ালে গুরুকে আঘাত দেওয়া হয়। সদ্‌গুরুগণ সেই জন্য বলেন—

'সবারে তুষ্ট করিতে পারিবে যখন
তখন তুষ্ট হবে ইষ্ট আপন।'

তোমরা সবাই মনে রাখবে যে তোমাদের কোনও ব্যবহারে বা কথায় যেন কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ না-পায়। পরস্পরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যেন কখনও কোনও প্রকার অসংলগ্ন কথা না বেরোয়। এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা দরকার। আচরণে ও ব্যবহারে সচেতন থাকলে গুরুর অস্তিত্ব বাকের সময়, কর্মের সময় অনুভব করা যায়। গুরু মানে শুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ সমবোধ বা আপনবোধ।

সংযমী হওয়ার অর্থ—মনকে গতানুগতিক ধারার বা ইন্দ্রিয়ের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একবোধে বা সমবোধে সদা যুক্ত রাখা। মনের বহির্মুখী গতি বন্ধ করে মনকে ভজনে বা সৎপ্রসঙ্গের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা বা যথাসাধ্য মনন করা। অথবা জীবনের প্রতি কর্ম, চিন্তা ও আচরণকে বোধরূপী গুরুর ক্রিয়া বা চিতি মাতার ক্রিয়া বলে 'মেনে, মানিয়ে চলা'।

এই বিজ্ঞানটা 'এই আধার'-এর (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করার ইচ্ছা তাঁর হয়েছে, তাই তিনি বারবার প্রকাশ করছেন—বোধের ধর্ম কেবল বোধ; কিন্তু মনের ধর্ম চিন্তা ও ভাব। তা হল চিদাভাস। বোধে বোধ নিত্যসিদ্ধ; কিন্তু বোধ বাদে কেবল মনে মন বা ভাবে ভাব অশুদ্ধ, অপূর্ণ, ভ্রান্ত ও মিথ্যা। আবার বোধে যুক্ত মন বা ভাব শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। এটিই গুরুবাণী।

অখণ্ড এক সত্যকে আপনবোধে সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-কে ইংরাজীতে বলা হয় Adopation of all, adjustment of all and accommodation of all. These three 'A's make all acceptance complete and perfect, one with the Absolute। [২৭।১১।৭৭]

সচ্চিদানন্দগুরুকে সচেতন ভাবে সঙ্গে নিয়ে চলাই হল গুরুভজনের তাৎপর্য

গুরুকে সঙ্গে নিয়ে যে কোনও অবস্থায় চলা যায়। গুরু হলেন সত্যঘন, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দঘন, প্রেমঘন, স্নেহঘন করুণার প্রতিমূর্তি। তিনি তাঁর সব দিয়ে যান, অথচ মন এত বড় অকৃতজ্ঞ যে তাঁর কাছ থেকে সব পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে। গুরু অন্তরে সক্রিয় হন জপ, তপ, ধ্যানের মাধ্যমে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গান গাইলেন—

এ মিনতি করি মাগো/হাতে ধরে রাখিস মোরে।।

(স্বানুভবসুধা ১ম খণ্ড মাতৃতত্ত্ব ৭নং গান।)

গানের শেষে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন—এই মায়ের চাইতে আপন আর কেউ নেই। কোথায় তিনি? কেমন তিনি? বাইরের ইন্দ্রিয়-মন তা কোনও দিনই জানতে পারবে না। শাস্ত্রজ্ঞান না-থাকলেও গুরুকৃপায় হয় স্ববোধে তাঁর সঙ্গে মহামিলন। তিনি গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে মনকে টেনে নেন। সেই জন্য গুরুসেবায় মন গুরুর সঙ্গে একীভূত হয়। চৈতন্যের সেবাই হল যথার্থ গুরুসেবা। মনের সৌম্যতা হারিয়ে ফেললে গুরুভজন হয় না। গুরুকৃপা দেশ, কাল, কার্য-কারণের অপেক্ষা রাখে না।

সংসারে সর্ব অবস্থায় আপন আপন চিত্তকে শুদ্ধবোধের সেবায় যুক্ত রাখলে বা তাঁর চিন্তায় যুক্ত রাখলে মন, মুখ এক হয়ে যায়। তখন তাঁর কৃপা পেতে দেরি হয় না। গুরুসেবাপরায়ণ বা ভজনকারী ইন্দ্রিয়ের আসক্তি, বস্তুর আসক্তি, ব্যক্তি ও কর্মফলের প্রতি আসক্তি থেকে এবং দ্বন্দ্ব, বিকার থেকে মনকে সরিয়ে

আনে। মন তো কেবল বোধস্বরূপের সেবার জন্যই তৈরি হয়েছে। সেই জন্য মনকে ঈশ্বরসেবায় নিযুক্ত রাখা হল ভজনের অঙ্গ। এ ছাড়া শান্তি নেই। শান্তি আছে গুরুচরণে বা শুদ্ধবোধের অনুশীলনে। তাই ব্রহ্ম-আত্মরূপী চিদানন্দময়ী মায়ের কাছে বলা হয়েছিল।

পাই যদি মা তোর অভয়চরণ শুদ্ধবোধের আস্বাদন
কী করে আসে শমন[১] দেখব আমি সর্বক্ষণ। [২৫।১২।৭৭]

ভূমা আমির পরিচয় সদ্‌গুরুই ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করে দেন

ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে যা-কিছু গ্রহণ করা হয় তা অণুতমই হোক বা বৃহত্তমই হোক তা-ই জ্ঞান। তা কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ নয় জ্ঞানাভাস। জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং থাকে মন-বুদ্ধিরও পিছনে। তাকেই ভূমা-আমি বলা হয়। তা হল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। শুদ্ধসাত্ত্বিক সদ্‌গুরুগণ এই ভূমা-আমির পরিচয় জানেন। তাঁরা সেই বিজ্ঞান অপরকেও দেন এবং তাঁদের ভূমা-আমিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সেই জন্য পরমতত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা, গুরুরূপে পূর্ণতম—ইষ্টরূপে পূর্ণ। মাতৃবোধের সাধনার তাৎপর্য কেবলমাত্র আত্মগুরুর মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়, নতুবা নয়। সবাই বিশেষ ভাবে মনে রেখ যে সৎপ্রসঙ্গ নানা ভঙ্গিমায় হতে পারে, কিন্তু তার লক্ষ্য কেবল আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা। আত্মসিদ্ধি হল অদ্বৈতসিদ্ধি। তা-ই স্বানুভূতি। তদতিরিক্ত সত্যের কোনও অনুশাসন নেই, হয় না এবং হতেও পারে না। [২৭।১২।৭৭]

১। শমন—সর্ববিধ বিকার ভয় ভ্রান্তি ও মৃত্যু। মনকে ভয় বা ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায় যা তাই শমন। যে গুরুর সেবা করে অথবা আত্মার সেবা করে শমন তার কিছু করতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অধিকারীর অন্তরের সংস্কার অনুসারে সদ্‌গুরু অনুশাসন করেন

গুরুর কাজ বাইরে থেকে সাধারণত বোঝা যায় না। তিনি অধিকারীর অবস্থা বুঝে ভিন্ন ভিন্ন জিজ্ঞাসুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদেশ দেন। নির্দেশ ততক্ষণই দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত রূপ-নাম বা বাহির-অন্তর পৃথক থাকে। বাহির অর্থে বৈচিত্র্যময় জগৎকে বা বস্তুজগৎকে বলা হয়েছে। অন্তর হল শব্দময় বা নামময়। বাহির ও অন্তর বাদ দিলে সব একাকার হয়ে যায়। সেই জন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপে নাম-রূপ থাকে না। সর্বপ্রকার সাধনার উদ্দেশ্য হল নাম-রূপকে বাদ দিয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপে মিশে যাওয়া। তবে সচ্চিদানন্দস্বরূপের সঙ্গে মিশে একীভূত হওয়া জীবনের লক্ষ্য হলেও একটা নামকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে হয়; অর্থাৎ বিশেষকে ধরেই নির্বিশেষে যেতে হয়। গুরু অধিকারীর অবস্থা ও ক্ষমতা বুঝে কাউকে জপের, কাউকে ধ্যানের, কাউকে কর্মের বা সেবার নির্দেশ অথবা কাউকে নির্জনে একাকী থাকার নির্দেশ দেন। কাউকে আমিষ এবং কাউকে নিরামিষ খেতে বলেন। সকলের ক্ষেত্রে এক নির্দেশ দেওয়া হয় না।

জীবের অবিদ্যা হল কাল্পনিক অজ্ঞান। অজ্ঞান যে কী তা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ অজ্ঞান নির্ণীত হয়ে গেলে তা জ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হলেই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয় এবং অজ্ঞানরূপ কল্পনা সরে গেলে উভয় চৈতন্যই একাকার হয়ে যায়। উপাধিশূন্য হওয়ার শিক্ষা গুরু প্রথমেই দেন না। গুণমুক্ত হতে গেলে উপাধিশূন্য হতে হবে। জীব ও ঈশ্বর উভয় উপাধিই ত্যাগ করতে হয়।

মন যখন কল্পনাশূন্য হতে চায় তখন গুরু মহাবাক্য বিচার শিখিয়ে দেন। "তত্ত্বমসি" বা "সোঽহং" শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। এর দ্বারা দুই পদেরই শোধন হয়। জীবের স্তর থেকে ঈশ্বরীয় স্তরে যেতে হলে প্রথমে ধর্ম, কর্ম প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। তারপর প্রয়োজন হয় শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানের। ভক্তির মাধ্যমেও তা মেলে। কর্মের মাধ্যমে হয় ধর্ম। কামনা তৃপ্তির জন্য হয় কর্ম। কামনা আবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

প্রশ্ন—মানুষের ভিতরে চৈতন্য কী করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর—জিজ্ঞাসু মন নিয়ে গুরুর আশ্রয়ে থেকে নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে চৈতন্যের বিকাশ হয়। সাধনা গুরুসাপেক্ষ বলার কারণ হল—প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে আপনবোধে সামঞ্জস্য রক্ষা কবার জন্য গুরু নির্দেশ দিয়ে শিক্ষা দেন। তারপর গুরু ইষ্টের মধ্যে লীন হয়ে যান এবং ইষ্ট আত্মাতে লীন হন।

ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দ্বৈতের প্রাধান্য থাকে। ইন্দ্রিয়াতীতে যেতে হলে গুরুর থেকে যা নির্দেশ আসে তা মেনে চলতে হয়। [৩১।১।৭৮]

সত্যস্বরূপের বা আত্মস্বরূপের পরিচয় এবং সদ্‌গুরুর মহিমা

যা সত্য তা নিত্য, তা একই থাকে। কাল তার পরিবর্তন করতে পারে না। দেশ বা কোনও স্থান এবং ক্রিয়া বা গুণ তাকে বিকৃত করতে পারে না। এ-ই হল আত্মস্বরূপ। যে আমি হতে সব জাত হয় তা-ই হল সগুণ ঈশ্বর। এই সগুণ ঈশ্বর যাঁর বক্ষ থেকে ওঠে তাঁর সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিরাট স্তরকে মানুষ অনুমান করতে পারে না। গুরুবাক্য হল সেখানে যাবার একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য গুরুভজনের নির্দেশ সবশেষে আসে।

আমি কে? এই প্রশ্ন যখন কারও অন্তরে জাগে এবং তার উত্তরের সঙ্গে যখন সে একীভূত হয়ে যায় তখন সব সাধনার শেষ হয়। এই আমির (ভূমা আমির) পরিচয় দিতে পারেন একমাত্র সদ্‌গুরু। মুষ্টিমেয় কয়েকজনই সদ্‌গুরু লাভ করে। আবার সদ্‌গুরু লাভ করে তাঁর সেবা না-করলে ফল পাওয়া যায় না। নিজের ব্যক্তিগত বা সংসার ভাবনা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গুরুসেবার অধিকার লাভ করা যায় না।

সর্বসাধনার শেষে গুরুতত্ত্ব প্রকাশ পায়। গুরুসেবা খুব কঠিন। এমনকী দেবতাগণ বা মুনিঋষিগণও তা জানেন না। শাস্ত্রজ্ঞান না-থাকলেও একমাত্র গুরুসেবার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান ফুটে ওঠে। নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করলে গুরু তুষ্ট হন এবং সর্ববিকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে গুরুকে তুষ্ট করা দূরে থাক মনের মতো না-হলেই গুরুর বিরুদ্ধে সকলে অভিযোগ, অনুযোগ করে।

চরম দুর্গতির মধ্যেও যখন কেউ স্থির থাকতে পারে তখনই সে গুরুসেবা করে এবং তখনই তার মধ্যে গুরু নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করে দেন। দুঃখকষ্টরূপে গুরুই আসেন। গুরু ছাড়া আর কেউ নেই। গুরু হলেন বোধস্বরূপ। গুরুসেবা করলে আর কোনও দেবতার পূজার প্রয়োজন হয় না।

আপন আপন গুরুকে অখণ্ড চৈতন্যবোধে ভজন করা হল যথার্থ গুরুভজন। অখণ্ড চৈতন্যকে ধরা হলে নিজের আমিকে আর পৃথক করে রাখা চলে না। অভিনব ভঙ্গিমাতে অহংকার লয় হয়ে যায়। পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না।

অখণ্ড ব্রহ্মের মধ্যে, অখণ্ড আমির মধ্যে মৃত্যু নেই। মৃত্যু কী? —কল্পনাজাত কামনার ফল। ভোগ করার জন্য যে ইচ্ছা ও কর্ম হয় এবং তার ফলে যে বিকার হয় তা-ই হল মৃত্যু। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তন হল মৃত্যু। কামনার মাঝে থেকে পূর্ণতাকে পাওয়া যায় না। সাধনভজন করতে করতে সাধনভজনের নিষ্ঠা বাড়ে। কার জন্য সাধনভজন? আমি তো পূর্ণই ছিলাম। কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে আমি বদ্ধ। এই কল্পনা দূর করতে পারে একমাত্র গুরুবাক্।

গুরুবাক্ শ্রবণকালে যদি বিকার হয় তবে বুঝতে হবে যে ঠিকমতো শ্রবণ হয়নি বা বিকৃত ভাবে শ্রবণ হয়েছে। নইলে শুধু ভজন করার নির্দেশ দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হতো।

যে স্বকল্পিত বৃত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তা দূর করার কৌশল মানুষ হারিয়ে ফেলেছে; তা সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশেই জপ, ধ্যান, পূজা, পার্বণ প্রভৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়। অশান্ত মনে কিছু হয় না, যেমন ঘোলা জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। চঞ্চল অস্থির মন যখন শান্ত স্থির হয় তখনই আত্মসূর্যের বা একবোধের অনুভূতি হয়। নতুবা বহুবোধে বহু সূর্যের মতো বহু আকার প্রতীয়মান হয়। এরই নাম সংসার।[১]

এক প্রকার মাছ আছে তারা কখনও জালে ধরা পড়ে না। আরেকরকম মাছ জালে পড়ে কিন্তু জাল কেটে বেরিয়ে যায়। যারা সাধনমুক্ত জীব তাদের স্বভাব হল এই রকম। আরেক দল জাল নিয়ে গর্তে ঢুকে যায়। যারা গুরুমন্ত্র নিয়ে সাধন করতে ডুবে যায় তারা হল এই দলের। তারা এত হুঁশিয়ার থাকে যে কখন জাল কেটে বেরিয়ে যায়, কেউ টেরও পায় না। তারা সর্বদা মুক্তপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যেমন বড় জাহাজের সঙ্গে গাধাবোট বাঁধা থাকে। কামনায় পূর্ণ চিত্ত থাকলে গুরুকে ধরা যায় না, গুরুর পরিচয় পাওয়া যায় না।

[৫।২।৭৮]

অখণ্ড ভূমার আমি ও তার বিলাস

যিনি অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই ইন্দ্রিয়-মনকে পরিচালনা করেন। ইচ্ছার দ্বারা নিজেকে বাইরে ও ভিতরে নানা রকম ভাবে প্রকাশ করেন এবং নানা ভাবে প্রকাশ করেও তাঁর স্বরূপের কোনও পরিবর্তন হয় না। তিনি

১। সংসার—অবিদ্যা-অজ্ঞানবশত মানুষ আপন এক অখণ্ড ভূমাস্বরূপের স্মৃতি ভুলে গিয়ে যখন বহুবোধে চলে তখন তা-ই হল সংসার।

নিত্য সাক্ষিরূপে সব দর্শন করেন। যত অনুভূতি সব অনুভূতির সাক্ষী তিনি। কিছু পাওয়া বা কিছু না-পাওয়া ইন্দ্রিয়-মনের ব্যাপার। তিনি সব দেখেন এবং প্রয়োজন মতো ইন্দ্রিয়কে সব দেন, কিন্তু হিসাব রাখেন না। এই কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপকেই সুবিধার জন্য ব্রহ্ম-আত্মা বলা হয়। দ্বৈত ও অদ্বৈত রূপে তিনি নিজেকেই নিজে ব্যবহার করেন। প্রত্যেকের আমির মধ্যে সাক্ষিরূপে তিনিই আছেন। তত্ত্বত সব তাঁরই পরিচয়—

খুঁজতে গিয়ে আপনারে
পেলাম আমি তোমারে।

আমার আমিকে অনুভব করার জন্য আমার আমি-ই গুরুবেশে এসে তা সুসিদ্ধ করে দেন। (১) সর্বাত্মকোঽহম্ (২) সর্বোঽহম্ (৩) সর্বশূন্যোঽহম্ এবং (৪) সর্বাতীতোঽহম্—এই বিজ্ঞান হল সর্বসত্যের জনকজননী। আমি কে? এই আমি হল অখণ্ড ভূমা; স্বল্প বা খণ্ড বা ব্যষ্টি আমি নয়। এমনকী সমষ্টিও নয়। সমগ্র ব্যষ্টি-আমি ও সমষ্টি-আমি বা প্রকাশ যার বক্ষে লীলায়িত হয় তা-ই হল ভূমা আমি বা Absolute Reality। শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী হল আত্মার পরিচয়। [৭।২।৭৮]

সরস্বতী ও মহাসরস্বতীর তাৎপর্য

ভগবান জীবকে শোধনের জন্য গুরুমূর্তিরূপে আসেন। গুরুর মধ্যে সমগ্র তত্ত্ব প্রকাশ পায়। গুরু হলেন বেদের ঘনীভূত মূর্তি। এই জন্য গুরুর মধ্যে সব দেবদেবী, সব তত্ত্ব নিহিত আছে। গুরুশক্তির নামই আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা সরস্বতী। বেদের যুগের পরবর্তী কালে ব্রহ্মবিদ্যা আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, যথা—সরস্বতী ও মহাসরস্বতী। শুধু যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে সেই বিদ্যা ব্যবহৃত হয় তার নাম সরস্বতী এবং গুরুবাকের মাধ্যমে যখন প্রত্যক্ষ ভাবে সেই পরমতত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য বা অনুভবগম্য হয় তখন তাকেই মহাসরস্বতী বলা হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রবাণী হল সরস্বতী এবং হৃদয়ে তার অনুভূতি হল মহাসরস্বতী।

সরস্বতীর তাৎপর্য হল—স্বর = বাক্। যে চৈতন্য বাক্-এর মাধ্যমে উদ্গীত হয়, তা সরস্বতী। সব শক্তি বাক্শক্তির অন্তর্গত; অর্থাৎ সব শক্তির মূলে আছে বাক্। এমনকী বস্তুশক্তির মূলেও আছে বাক্শক্তি। তবে ব্যবহারের দোষে বাক্শক্তি জড়ীভূত বা আবৃত হয়ে যায়। এই কারণে বস্তুর মধ্যে যে শক্তি আছে তা অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেলেও বাকের শক্তির প্রাধান্য তার থেকে অনেক বেশি। আবার যে বাক্ সত্যকে অবলম্বন করে উদ্গীত হয় তার শক্তি আরও বেশি। গুরুবাক্ই হল সরস্বতী বা সত্যবাক্। সেই গুরুবাকের যথার্থ শ্রবণ ও তার ব্যবহার করা হল সরস্বতীর সাধনা ও উপাসনার তাৎপর্য। তা বোধের অন্তর্ভুক্ত। তন্ত্রের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র।

গুরুবাকের মর্ম

গুরুবাক্ই হল অক্ষরব্রহ্ম। অক্ষর = বাক্-এর স্বর অর্থাৎ চৈতন্যের বীজ। তা অতীন্দ্রিয় বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অথচ এর দ্বারাই ইন্দ্রিয়বর্গ পরিচালিত হয়। এ-ই হল মুখ্যপ্রাণ বা জীবচৈতন্য এবং স্বরের ঘনীভূত মূর্তি। এর থেকেই স্বর উদ্গীত হয়।

গুরুবাক্ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করে। সেখান থেকে হৃদয়ে বা স্বকীয় ভূমিতে প্রবেশ করে এবং স্বস্বরূপকে জাগিয়ে তোলে। তখন গুরুবাকের স্মৃতি অনুভূত হয়। এই হল মহাসরস্বতীর জাগরণ। সেই জন্য বলা হয় গুরু ও তাঁর বাক্ অভিন্ন। আবার বলা হয়েছে, গুরুর সূক্ষ্ম রূপই হল তাঁর বাক্। গুরুর লীলাভূমি হল চিদাকাশ ও হৃদয়াকাশ; কারণ বাকের উৎস হল হৃদয়াকাশ। আকাশতত্ত্বের আসন হল কর্ণে। সেই জন্য গুরু প্রথমে প্রবিষ্ট হন কর্ণে এবং সেই জন্য গুরুবাক্য শ্রবণ বিনা যে জ্ঞান লাভ হয় তা শুদ্ধ নয়।

যেমন ভাবে গুরুবাক্ শ্রবণ করা হয় তেমন ভাবে তা ব্যবহার করে অনুভব করলে গুরুবাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বা মহাসরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে গুরুভজনের গুরুত্ব অধিক; তা বলাই বাহুল্য। গুরু প্রীত ও তুষ্ট হন কেবলমাত্র তাঁর বাক্যের সদ্ব্যবহার যথার্থ ভাবে হলে। অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে সচেতন হয়ে গুরুবাণী যথার্থ ভাবে অনুশীলন করলে অন্তরে ও বাইরে গুরুশক্তি ও গুরুবোধের সম্যক্ প্রকাশ ও বিকাশ হয়। তখন গুরুভাব ও গুরুবোধের ঐক্য স্ফূর্তি হয়। তার ফলে স্বানুভূতি স্বতঃসিদ্ধ হয়। এ-ই হল গুরুভজনের যথার্থ তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য।

গুরু আর কিছুর দ্বারাই তুষ্ট হন না। তাঁর বাক্ যথাযথ ভাবে যে অনুধাবন করে তার প্রতি তিনি তুষ্ট হন। স্বানুভূতির বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে— চৈতন্য চৈতন্যের ব্যবহার দ্বারাই প্রীত হয়। মহাসরস্বতীর যে অভিব্যক্তি তা-ই চৈতন্যের প্রীতি। এ বস্তুও ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়, স্বতঃস্ফূর্ত।

গুরুবাক্ নিত্য। আবহমানকাল যাবৎ তাঁর নিত্যলীলা হয়ে চলেছে। গুরু সূক্ষ্ম দেহে নিত্যবর্তমান। যদিও স্থূল দেহ দেশ-কালাদিসাপেক্ষ। তথাপি নিত্যগুরুর (আত্মার) আবাসস্থল হল সবার হৃদয়ে। গুরুবাক্যের অনুশাসন মেনে চলাই হল সরস্বতী পূজা। কারণ গুরুবাক্ অনুশীলন করা হলে তা প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং সত্যস্বরূপের সঙ্গে পরিচয় হয়। [১২।২।৭৮]

নকল-আমি ও আসল-আমি অর্থাৎ কাঁচা-আমি ও পাকা-আমির প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলছেন—

রাধারানী কুঞ্জে উদ্ধবকে দেখে বলছিলেন—'তাঁর (কৃষ্ণের) মতো দেখায় বটে কিন্তু সে তো নয়। তাঁর বেশভূষা নকল করেছে মাত্র, কিন্তু সে কখনও নয়।'

হৃদয়ে একটামাত্র আসন আছে, গুরু তার চাবি রেখে দিয়েছেন। কাঁচা-আমি মরে গেলে, ভূমা-আমির সন্ধান মেলে। আজকাল ভক্ত বলে যারা পরিচিত তারা শুধু আদায় করতে চায়। তপস্যা করে যে বস্তু নিতে হয় গুরু তা বিনা তপস্যায় কী করে দেবেন?

অধ্যাত্মবিজ্ঞান ঘর সংসারের মতো লেনদেনের ব্যাপার নয়। একটু বেচাল দেখলে তিন জন্মের ফল নষ্ট হয়। সেই জন্য বাক্সংযমের দরকার, মনের সংযম দরকার। গুরুর সঙ্গে মনের যোগাযোগ রাখতে হয়, তা না-হলে হাতে ধরে নিয়ে যেতে পারেন না। সতী নারীর মতো হতে হবে। সৎ-এ বা এক-এতে মন না-থাকলে সতী হয় না। গুরুচরণে মন না-থাকলে অথবা সমত্ব থেকে মন সরে গেলে গুরুভজন হয় না। তখন নুন দিয়ে পায়েস খাবার মতন হয়। [২৮।২।৭৮]

ব্রহ্মানন্দই আত্মারূপী সদ্গুরুর পরিচয়

সংসারী মানুষ অনাবিল আনন্দ পেতে পারে না। যাতে নিরন্তর আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, তার জন্যই সদ্গুরুগণ চেষ্টা করেন। বিষয়ানন্দও ব্রহ্মানন্দের অংশ বটে, কিন্তু তা জীবের স্মরণে থাকে না। যদি তা স্মরণে রাখা যায় তাহলে ভেদজ্ঞান আর থাকে না। তখন বিষয়ানন্দের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা যায়। ব্রহ্মানন্দ হল আনন্দসাগর। এই আনন্দসাগরে একটি মাত্র আনন্দই আছে। [৫।৩।৭৮]

আত্মার পরিচয় গুরু, গুরুর পরিচয় আত্মা

গোলবারান্দায় ভক্তদের ভজন শেষ হলে কোথায় কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সে সব সংশোধন করতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাদের উদ্দেশ করে বললেন—গুরু কৃপা করে দেন বলেই সকলে সব কিছু

করতে পারছ। কারণ সকলের মধ্যে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি হল দেবতা, ঈশ্বর ও পরমেশ্বরের অধীন। কোনওটিই কারও নিজস্ব নয়। ভজন করতে করতে যখন ভজনের সুর ও ভাব ভিতরে বসে যাবে তখনই সেই ভাব যুক্ত করে দেবে বোধের সঙ্গে।

এখানে কারও কোন সাধনা বা নিষ্ঠা নেই। এ অবস্থায় গুরুকৃপা পাবে কী করে? এত অকৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও গুরু কিন্তু কাউকে ত্যাগ করেন না। কিছু বেদনা দিয়ে আড়ালে সরে দেখেন যে সেই অবস্থায় কে কী করছে। গুরুকে ছেড়ে কে কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত গুরুর কাছে ফিরে আসতেই হবে। সব শেষে মানুষ যখন তাঁর কৃপা ও মহিমা একটু বুঝতে পারে তখন কৃতজ্ঞতা জানাবার আর অবকাশ পায় না। গুরু তখন নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে নেন। [১৪।৩।৭৮]

গুরুবাক্যের মাধ্যমেই আত্মবোধের অনুশাসন

অনুভবসিদ্ধের সংখ্যা খুব কম। যাঁরা অনুভবসিদ্ধ তাঁদের চাওয়া-পাওয়া থাকে না। চাওয়া-পাওয়ার ফলে দেবতার স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রীরামচন্দ্র, যিনি অবতাররূপে ত্রেতা যুগে এসেছিলেন, তাঁর অজ্ঞানতা দূর করতেও বশিষ্ঠদেবকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছয়মাস ধরে কয়েক হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন যেখানে আর প্রশ্ন নেই। সব প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেলে তবেই তাঁর অনুভূতি খেলে। কিন্তু আজকাল গুরু শুধু মন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দেন। মন্ত্রের মধ্যে যে কী আছে, শিষ্যকেই তা আবিষ্কার করতে হয়। বশিষ্ঠদেবের মতন গুরু এখন আর নেই যিনি অনুভূতি অনুভব করিয়ে দেন। কী দিয়ে? বাক্ দিয়ে। সত্যের সর্বশেষ বাহন হল বাক্। তারই নাম শ্রুতি। ক্রিয়াযোগের অনুভূতিও তার অন্তর্গত এবং অনেক নিম্নভূমির সাধনফল। শাস্ত্রের নির্দেশ হল—জ্ঞানভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম এবং ক্রিয়া হল অধম। অবশ্য তা সাধারণের দৃষ্টিতে তর্কের বিষয় হতে পারে, সাধকের দৃষ্টিতে সাধনার বিষয় ও মানার বিষয়, সিদ্ধের দৃষ্টিতে সত্য ও পরমতত্ত্বের বিষয় এবং স্বানুভূতির ভাষায় তা নির্দ্বন্দ্ব অতর্ক্যমূর্তি। মনে অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়া অন্য কোনও বিষয় থাকলে অধ্যাত্মসাধনা হয় না। যেটা ধরেছ মন, প্রাণ দিয়ে পালন করার চেষ্টা করবে, তাহলে গুরু প্রীত হবেন। গুরুপ্রীতি[১] মানে অন্তরের সমতা সৃষ্টি হওয়া। এ নয় যে গুরু এসে বললেন 'আমি তুষ্ট হলাম'। [১৬।৪।৭৮]

গুরুভজনের প্রসঙ্গ

গুরুর মহিমা যার যতটুকু শ্রবণ করা হয়েছে মনটি যেন সেই গুরুভাবে, গুরুবোধে ভরপুর হয়ে যায়। গুরু বলতে পক্ষপাত রেখ না। ভেদাতীত ভাবাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরু নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সেই গুরুভজনে সবারই সমান অধিকার এবং সেই ভজনে গুরুর সঙ্গে মহামিলন হয় অথবা শিবভাবে আত্মভাবে বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৮।৪।৭৮]

কাঁচা-আমি ও পাকা-আমির পার্থক্য

কথাপ্রসঙ্গে নিজের কথা বলতে গিয়ে সহসা শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একজন এক সময় 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছিলেন তুমি ঠোঁটকাটা বলে তোমার কোনও চেলা হল না।

উত্তরে বলা হয়েছিল—'এ' নিজেই কারও চেলা হল না 'এর' চেলা কী করে জুটবে?

১। গুরুপ্রীতি—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

এ কথা শুনে ভদ্রলোক পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে বলা হল—এ তুমি কী করছ? তুমি বয়সে প্রবীণ। সত্যিই তো, কার চেলা 'এ' হবে। সবই যখন ভগবান স্বয়ং, কাকে 'এ' চেলা বানাবে? খেলছে চৈতন্যসাগরে চৈতন্য স্বয়ং। ভজনের মধ্যেই তো এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে--

ব্রহ্মসাগরে জীবনরূপ ধরে
আত্মচৈতন্য স্বভাবে লীলা করে।

(স্বানুভবসুধা ২য় খণ্ড, ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্ব গান নং ১৬)

মানুষের দেহধারণ বড় painful ব্যাপার। আমার সাধু হওয়ার দরকার নেই। আমার মধ্যে আমি থাকব। যে আমির মধ্যে অনন্ত ব্যষ্টি রূপ ফুটে ওঠে, আসা-যাওয়ার ভাবনা কেন ভাববে সে? 'আমি' বলাতে 'একে' (নিজের দিকে দেখালেন) ভুল বুঝো না, ব্যক্তি ধরে নিয়ে। 'আমি' দিয়ে কথা শিব, রাম, কৃষ্ণের মুখ থেকেও বেরিয়েছে। কিন্তু 'জীবের আমি' ও 'শিবের আমি' এক নয়। কাঁচা-আমি তো টক হয়; কাঁচা মিঠা আম তো খুব কম হয়। এই পর্যায়ের আমির কোনও চেলা বা গুরু নেই। কাঁচা-আমির গুরু বা চেলা আছে। কাঁচা আম গাছে থাকে। পেকে গেলে কারও বাবার ক্ষমতা নেই গাছে ধরে রাখে। পাকা হলে আপনিই রং ধরে ও মিঠা হয়। পাকা-আমি স্বয়ংপ্রকাশ। কাঁচা-আমি হল যেন সমুদ্রের তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্। তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র হল স্বর্গ। নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র হল অখণ্ড এক বোধময় সত্তা, সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ আমি বা ভূমা আমি। পাকা-আমিই হল ব্রহ্ম-আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন এবং কাঁচা-আমি হল দেহবুদ্ধিসম্পন্ন অভিমান-অহংকারযুক্ত বুদ্ধি। [২৩।৪।৭৮]

মনোবিজ্ঞানের রহস্য

মন যদি গুরুভাবনা করে তবে গুরু মনের ভাবনা নিয়ে নেন। সেরূপ মন যদি ইষ্টভাবনা করে ইষ্ট মনের ভার নিয়ে নেন। মন যখন মহাশূন্যে যায় এবং আবার নেমে আসে তখন মহাসত্য সাথে সাথে আসে। ধ্বনিলোক থেকে তা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

মন যদি বাইরে ছুটোছুটি করে তবে মনে বাইরের প্রভাব এসে পড়ে। বাহির অর্থ হল দেহ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। অন্তর অর্থ হল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যে জগতের পরিচয় মেলে। জপ-ধ্যানের সময় মনকে বাইরে থেকে ভিতরে নিতে হয়। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি দরজা আছে। সেখান দিয়ে মনকে কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। যেমন প্রত্যেকের একটা আশ্রয়স্থল আছে—সারাদিনের কাজকর্মের পরে সকলে যেমন সেখানে যায়।

যে মন ইন্দ্রিয়পথে বাইরে যায় তাকে প্রধান দ্বার দিয়ে ভিতরে নিতে হয়। তার জন্য গুরু সাহায্য করেন। গুরুকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভাবনা না-করলে গুরুর সাহায্য ধরা পড়ে না। আহারের সময়, কর্ম করার সময় সর্বদা একই নিয়ম। কারণ ভগবানের যোগনিকেতন হল এই বিশ্বভুবন। প্রতিটি জীব তাঁর মহানিমন্ত্রণশালায় যুক্ত। এই মহাযোগে বিয়োগ নেই। বিয়োগই[১] হল ভ্রান্তি। বাইরে মন থাকলেই ভ্রান্তি থাকে।

ভারতের মহা অনুভবসিদ্ধ বা মহাজনদের সত্যবাণীই হল জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়। কারণ তা ক্ষুদ্র অণোরণীয়ান ভাবকে মহতোমহীয়ান ভাবে পৌঁছে দেয়। জীব নিজের চেষ্টায় সেখানে পৌঁছতে পারে না, কারণ ভগবানের বাহ্যরূপ বড় দুর্বোধ্য।

১। বিয়োগ—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

সংসার রূপ হল তাঁর বাহ্য রূপ। তা মিথ্যা নয়; তবে সংসারের গভীরে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন হয় তাঁর সাহায্য, যে সাহায্য গুরুবেশে এসে পরমাত্মাই দিয়ে যান। সেই গুরুর রূপ অনন্ত। কোন বেশে এসে তিনি যে সাহায্য করেন তা কেবল ভজনকারী জানতে পারে। [২৫।৪।৭৮]

আত্মগুরুর পরিচয়

মন যখন তপস্যার মাধ্যমে গাঢ় নিদ্রারও পরের অবস্থায় গিয়ে বিশ্রাম লাভের যোগ্যতা অর্জন করে তখনই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়।

গুরুতত্ত্বের মধ্যে চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মা হলেন বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত, বিষ্ণু দ্বৈত স্তরের সঙ্গে যুক্ত এবং মহেশ্বর গাঢ় নিদ্রার সঙ্গে যুক্ত। এর কোনও স্তরই স্থায়ী নয়। তৃতীয় স্তরের অনুভূতি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের হলেও তা চরম অনুভূতি নয়। চরম ও পরম অনুভূতি হল যেখানে বিষয় ও বিষয়ী এক হয়ে যায়। তৃতীয় স্তরে বা সুষুপ্তিতে মন অ-মন হয়। অ-মন হল আত্মন বা ব্রহ্মণ। ব্রহ্মরূপী যে আমি সে নিজের মধ্যেই আছে; কিন্তু তাঁকে চিনেও সে চিনতে পারে না। মন নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেই আটকে যায়।

গুরুর সাহায্য ব্যতীত কিছু হয় না। গুরু স্থূল দোষত্রুটি শোধন করে দেন। সূক্ষ্মে অশ্রুতকে শ্রবণ করিয়ে দেন। কাজেই গুরুর দায়িত্ব অনেক। শিষ্য তো শুধু ফাঁকি দিয়েই চলে। কিন্তু গুরুপ্রদত্ত দান গ্রহণ করার দায়িত্বও শিষ্যের অনেক। তা না-হলে সব নষ্ট হয়ে যায়। পিতার দেওয়া সম্পত্তি নষ্ট করতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু গড়তে অনেক দিন লাগে।

খেয়াল রেখে চলতে হয়, যে যতই চতুর হোক আত্মারূপী গুরু হৃদয়ে বসে বাইরের সব কর্ম vigilant officer-এর মতো দেখছেন। মন তাঁর প্রতি যদি সচেতন হয়ে চলে তবে কাজ ভাল হয়। জগতে সকলকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও চৈতন্যসত্তাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। কারণ এই চৈতন্যসত্তাই হল সকলের গুরুর গুরু, আত্মগুরু।

সন্তান যেমন বাবা-মাকে ছাড়া অসহায়, সেইরূপ অধ্যাত্মজগতে গুরুকে বাদ দিয়েও চলা যায় না। শয়নে স্বপনে গুরুকে স্মরণ রাখতে হয়। মৃত্যুকে গুরুরূপে মানতে হয়।

'যস্মাৎ সর্বং যস্য সর্বং যতঃ সর্বম্
যেন সর্বং যঃ সর্ব সর্বশ্চ যঃ
যশ্চ সর্বময় দেবতস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ
তস্মৈ সর্বেশ্বরায় পরমব্রহ্ম গুরবে নমঃ।।'

এই গুরুর মধ্যে জগতের সবার গুরু রয়েছেন যিনি সর্ব শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের ঘনীভূত রূপ। তিনিই একমাত্র সকলের নির্ভরযোগ্য আপন প্রিয়তম ও সর্বোত্তম উপলভ্য ও আরাধ্য। তাঁর কৃপাতেই ব্যষ্টি জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ। যত পূজা-অর্চনা, যত মহৎ চিন্তাভাবনা সব তাঁকে কেন্দ্র করে হয়। তাঁর নিত্য স্থির আসন হল আপন আপন হৃদয়ে। সেখানকার কথা বিস্মৃত হয়ে যদি অন্যত্র সন্ধান করা হয়, তাহলে হয় বৃথা কালক্ষেপ।

তাই তো সাধক বলে—আমার দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সবই যদি তাঁর হয় তবে এখানেই তাঁকে ধরি, আমার আমিকে করি সমর্পণ। তার ফলে উভয়ের সাথে হয় নিত্যমিলন। নিত্যমিলন হল সব যোগের চরম কথা। তাতে কোনও দিন দ্বৈতও ছিল না, বিচ্ছেদও ছিল না। তাঁকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা হল ভ্রান্তি, যদিও

ভ্রান্তি তাঁরই বক্ষে বিরাজ করে। তাঁকে বাদ দিয়ে আমার কোনও কিছুই সম্ভব নয়। সবের মধ্যে তাঁকে দেখা হল ব্রহ্মবিহার বা গুরুভজন[১]। [৯।৫।৭৮]

'আমির আমি' বা আমিসত্তা হল সকলের গুরু, ইষ্ট বা আত্মা

অধ্যাত্মপথে গুরুর নির্দেশই হল শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যেমন নির্দেশ, সেই মতো ব্যবহার হওয়া চাই। শাস্ত্রের ভাল ভাল কথাও গুরুর সাহায্য ছাড়া কার্যকরী হয় না।

সব কিছুর মূলে আছে 'আমিসত্তা'। এই 'আমির আমি'-কেই শাস্ত্রে গুরু, আত্মা বা ইষ্ট বলে নির্দেশ করা হয়েছে। গুরু বিনা শান্তি লাভ কখনও হয় না। গুরুকে নিরন্তর প্রার্থনা জানাতে হয়; কাতর প্রাণে তাঁকে বলতে হয়—'গুরু, আমার এই মন কবে তুমি পূর্ণ করে নেবে? যেখানে আমার মন সমপদে, পরমপদে বা গুরুপদে লীন হয়ে যাবে।'

স্থূল গুরুকে বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ বলেই সাধারণ লোকে ভাবে, আসলে তা ঠিক নয়। বোধস্বরূপ স্বয়ং-ই স্থূল গুরুরূপে আবির্ভূত হন। তিনিই একমাত্র বোধস্বরূপকে জানেন এবং নিরন্তর যোগ রেখে চলেন। অখণ্ডের একটা point হল গুরু। মানুষ তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে প্রিয়বোধে যাদের সঙ্গ করে তাদের কাছ থেকেই আসে সুখ-দুঃখ ও অশান্তি। [২।৬।৭৮]

গুরুবোধের নিগূঢ় তাৎপর্য

গুরুবোধ হল সেই বোধ যা অজ্ঞানকে বিনাশ করে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে, অদৃষ্টকে দৃষ্ট করিয়ে দেয় এবং অজ্ঞাতকেও জ্ঞাত করিয়ে দেয়। শ্রবণের ফলে কতগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নের পর তার সমাধান হয় এবং জ্ঞান জাগ্রত হয়। সেই জ্ঞানে গুরুকে ধারণা করার যোগ্যতা বাড়ে। যা-কিছু বিদ্যা, তা যার কাছ থেকেই শেখা হোক না কেন, সবই গুরুর মূর্তি বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি। সাধনার চরমে উপলব্ধি হয় যে গুরুর কাছে যা পাওয়া যায় তা বোধের কাছ থেকে পাওয়া বোধই। তখন আর ব্রহ্মজ্ঞান দুর্বোধ্য হয় না।

শ্রবণ ব্যতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক-কে ধরা লক্ষ লক্ষ জন্মের সাধনাতেও হয় না। সদ্‌গুরুর মুখের বাণীই হল আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্য স্বল্পবিদ্যা নয়, সৃষ্টও নয়। তা স্বতঃস্ফূর্ত। যাঁদের মধ্যে এগুলি খেলে তাঁদের মধ্যে এ ভাবেই চলে। আবাব হঠাৎ তা কখনও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও তাঁদের থাকে প্রশান্তভাব। যদিও তাদের কাছ থেকে বাণী সব সময় পাওয়া যায় না। এইরূপ বক্তার নিকট শ্রবণ করা সৌভাগ্য। অনেকেই এ রকম শ্রবণের সুযোগ পায় না। আবার পেলেও অনেকে তা অনুভব করতে পারে না।

অবতার পুরুষের সৎসঙ্গে যারা আসে তারা কেউ বা চব্বিশ ঘণ্টাই সঙ্গ করতে পারে, কেউ বা দিনে দুই একবার, কেউ সপ্তাহে একবার, কেউ বা মাসে একবার অথবা বছরে একবার সঙ্গ পায়। সঙ্গ পেয়েও আবার অনেকের দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা ভাব জাগে।

কেউ তাঁকে সখা ভাবে, কেউ আত্মীয় ভাবে, কেউ বা আপন ভাবে নেয়। তিনি কিন্তু সব ভাবে থেকে সব ভাবকে পুষ্ট করেন। কারণ চৈতন্য সব কিছুর উপাদান ও বক্ষ। অজ্ঞানকেও তিনি বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন। এই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মসত্তা বা চৈতন্যসত্তাকেই 'আমির আমি' বলা হয়।

নিজেকে অখণ্ডরূপে ভাবনা করা বা পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দরূপে ভাবনা করা হল সব মন্ত্রের সার কথা।

১। গুরুভজন—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

কখনও নিজেকে রোগগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত ভাবতে নেই। তা হল গুরুবিরোধী বা অধ্যাত্মবিরোধী। আধ্যাত্মিক পথে চলার শুরু থেকেই নিজেকে অখণ্ড অমৃত আনন্দস্বরূপ বলে ভাবনা করতে হয়।

ভবরোগ চলে যায় ভবনাথের সঙ্গে পরিচিত হলে। অখণ্ডের ভাবনা না-করা হলে অখণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অধ্যাত্মসাধনায় নিজেকে অখণ্ড ছাড়া ভাবনা করা চলে না। অখণ্ড ভাবনা না-করলে গুরুর বা আত্মস্বরূপের প্রতি অবহেলা জানানো হয়। যার বিকার হয় সে আমি নয়। 'আমি'-র স্বরূপ হল অখণ্ড অনঙ্গ অভঙ্গ অসঙ্গ অলিঙ্গ ও অনন্ত। যে অঙ্গ দেখা যায় তা হল দৃশ্য। দ্রষ্টারূপ অঙ্গ কোথায়? দেহেতে পোশাক পরিধান করলেও আমি পোশাক নই। এই ভাবনার দ্বারা দেহ থেকে নিজেকে পৃথক করা যায়। জ্ঞাতার কোনও অঙ্গ নেই।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) কারও গুরু নয়। প্রত্যেকের গুরু হল প্রত্যেকের আত্মা। এই আত্মার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই হল 'এর' কাজ। আত্মার উপরে আর কোনও গুরু নেই। পরমাত্মার উপরে আর কোনও দেবতা নেই। সেই আত্মা প্রত্যেকের আমির মধ্যে আছে। আমিকে সঁপে দাও তাঁর কাছে বা আমিকে তাঁর কর। [৪।৬।৭৮]

ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তিতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ব্যবহার কী ভাবে ফলবতী হয়

ধ্যানের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, জ্ঞানের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ও ভক্তির প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কথা গুরুমুখে শুনতে হয়; তা না হলে stabilized হওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের মতো লোকেরও প্রজ্ঞাস্থিতি হতে যখন এত সময় লেগেছিল তখন সাধারণ লোকের পক্ষে এত সোজা হতে পারে না। কেবল গুরুমুখে শুনেই সহজ হয়। 'গুরু' মানে total absorbing power।

পরমাত্মবোধে সমস্ত বৃত্তির লয় হয়ে যায়

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ঃ গুরুশক্তি কী চিৎশক্তি?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উত্তর ঃ আনন্দশক্তিও বলতে পার। maniness-কে সে-ই কেবল absorb করে নিতে পারে। অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখে নয়, সুখ-দুঃখ সব কিছু নিয়ে সব বৃত্তিকে সে গ্রাস করে নেয়। তার ফলে individual identity বা individual sense আর থাকে না। সব বৃত্তি বা স্পন্দন dissolved হয়ে যায়।

গুরুবোধে চলতে চলতে শিষ্যের যখন 'আমি আমার বোধ' আর থাকে না তখনই বোঝা যায় গুরু তার সব রকম বৃত্তিগুলি গ্রাস করে নিয়েছেন। পরমাত্মবোধে 'আমি-তুমি বোধ' আর থাকে না। তা কেবল অনুভবসিদ্ধ। গুরু কেবল ইঙ্গিত দিয়ে দেন—এর বেশি নয়। শ্রবণের মাধ্যমেই শুধু এই সকল অবস্থা সম্ভব। শুনতে শুনতে স্বঘরে যাবার জন্য, 'প্রশান্ত নিলয়'-এর জন্য মন আঁকুপাঁকু করে। 'প্রশান্ত নিলয়' বস্তুসাপেক্ষ নয়। এ হল স্পন্দনরহিত অবস্থা। স্পন্দন থাকলে হয় দ্বৈত অবস্থা। দ্বৈত না-থাকলে কে আর ব্যক্ত করবে সেই অবস্থা? [৬।৬।৭৮]

স্বঘরে যাবার চাবি গুরুর কাছে মেলে

নিজের প্রকৃতিই নিজের বন্ধনের কারণ হয়। সত্তার বক্ষে সত্তার স্পন্দন প্রকৃতিরূপে খেলে। এই স্পন্দন রোধ করা খুবই কঠিন। এর জন্য একমাত্র সহায়ক হল গুরুশক্তি। বৃহৎ ও মহতের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভবপর হয় না। চাবি হারিয়ে গেলে চাবিওয়ালার সাহায্য নিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়, সেই রকম স্বঘরে প্রবেশের চাবিও

গুরুর কাছেই শুধু পাওয়া যায়। গুরু শিষ্যের ইচ্ছামতো হৃদয়ের দ্বার খুলে দেন না। পুনরায় চাবি না-হারায়, পূর্বে সেই ব্যবস্থা করে তবেই তিনি চাবি দিয়ে খুলে দেন। এই জন্যই বলা হয় জন্ম একবার হয় এবং মৃত্যুও একবারই হয়।

জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব

এই জন্ম[১]-মৃত্যু[২]র তাৎপর্য তাহলে কী? গুরু যখন শিষ্যকে আশ্রয় দেন তখন থেকেই তার যত বিকারের বীজ বা সংস্কার নাশ হতে থাকে। সব নাশ হয়ে গেলে শিষ্য যখন আপন ঘরে প্রবেশ করে তখনই তার আত্মবোধের জন্ম হয়। আর যে মুহূর্তে আপনস্বরূপ ভুলে আপন ঘর ছেড়ে বৈচিত্র্যের রাজ্যে প্রবেশ করে তখনই মৃত্যু হয়।

দেহখাঁচা ত্যাগ করা মানে মৃত্যু নয়। জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব যে জানে সে মৃত্যুকে ডরায় না। [১১।৬।৭৮]

তীব্র ইচ্ছা ও গুরুকৃপার ফলেই শুধু আত্মজ্ঞান লাভ হয়

তিন গুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে নিজেকে দেখা হল শুধু বোধে বোধময় অবস্থা। তার মধ্যে কোনও কিছুর মিশ্রণ সম্ভবপর নয়। এই সাধনা অতীব কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ তীব্র ইচ্ছা ও গুরুকৃপার সংযোগে কঠিন সাধনাও সম্ভবপর হয়। সবই নির্ভর করে কৃপার উপরে। কৃপাসিন্ধুর কৃপা ব্যতীত বা সদ্‌গুরুর সঙ্গ বা মাধ্যম ব্যতীত তাঁর পরিচয় লাভ করার আর কোনও উপায় নেই। সাধনার সব কিছুই কৃপাসাপেক্ষ।

তিনি যখন জেগে ওঠেন, তখন ইচ্ছা জাগে। তখন অন্তরে বাইরে গুরুরূপে তিনি আসেন। বাইরে বৈচিত্র্যের মধ্যে চলতেও অন্তরগুরু সবসময় guard দিয়ে নিয়ে যান। যাঁর হাতে লাগাম তিনি কখনও লাগাম ছাড়েন না। ভুলে গেলেও স্মরণ করিয়ে দেন। সেই জন্য ভরসা পাওয়া যায়।

সাধক হাল ছেড়ে দেয় কিন্তু কর্ণধার কখনও হাল ছাড়েন না। তিনি হলেন সব বৈচিত্র্যের মূল উপাদান। তিনি গুরুরূপে বা ঈশ্বররূপে আসেন। তিনি শিব, তিনিই শিবানী। তিনিই গুরু ও গুরুশক্তি, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীশক্তি। তাঁর কৃপাতে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বৃত্তি তৈরি হয়। আপন ইচ্ছাতে আপনি দেহে বাস করেন এবং আপন মহিমা আস্বাদন করেন। এই হল তাঁর নিত্যলীলার উদ্দেশ্য। লীলা হল নিত্যের মাধুর্য। লীলা মায়া নয়। লীলা ছাড়া কী দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন? বাহ্যদৃষ্টিতে পৃথক দেখালেও তা ভেদ নয় এবং অভেদও নয়। মহাপ্রভু একেই বলেছেন 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'। ভেদ বা অভেদ চিন্তনীয় নয়। ভেদাভেদকে কী ভাবে দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাস্ত্র পড়ে তা সবাই জানতে পারে।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) শুধু জানে, যা জানি তা সত্য এবং যা জানি-না তাও সত্য। তাঁর অনন্ত মহিমার সব জেনে শেষ করা যায় না এবং না-জানাতে অনুভূতিরও শেষ হয় না এবং তা অপূর্ণ এও প্রমাণিত হয় না; যদিও এক একজনের মধ্যে এক এক রকম ভাবে প্রকাশিত হয়। এই ভূমা এক অখণ্ড সত্তা কত রকম ভাবে নিজেকে আস্বাদন করছেন এবং করবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। [১৩।৬।৭৮]

কর্ম, বাক্ ও চিন্তার সংযমই হল অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি;

অন্তঃসত্তার শোধন না-করতে পারলে অধ্যাত্মসাধনা হয় না। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন হয় সংযম। কর্ম, বাক্ ও চিন্তা এই তিনের যে কোনও একটি গোলমাল হলে হয় অসংযম। এই তিনটিকে ঠিক রাখাই হল

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি। যে কোনও একটির গোলমালে অপর দু'টিও গোলমাল করে। ফলে ত্রিলোকেই ঘুরতে হয়। ত্রিলোকের তিন দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা বরুণ-অগ্নি-বায়ু দেবতা হলেন প্রধান।

হজমের চাবিকাঠি থাকে গুরুর কাছে। কী রকম সে গুরু? ভগবান যেখানে নিজে সত্যকে প্রকাশ করেন। বুদ্ধি দিয়ে যেখানে প্রকাশ করা হয়, সেখানে নয়; সেখানে থাকে ত্রিলোকের প্রভাব। তার ফলে সেখানে বিকারও থাকে। গুরু হলেন শুদ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তি; মন, প্রাণ ও বুদ্ধির নয়। সেগুলি স্পন্দনযুক্ত বা আরোপিত বা attributeful; কিন্তু Absolute হল attributeless। শাস্ত্র থাকা চাই হৃদয়গুহায়, বইয়ের পাতায় নয়। তবে গুরু যদি লিখিত নির্দেশ দেন তবে স্বতন্ত্র কথা। [২৭।৬।৭৮]

ধ্যানের বিশেষ একটি উপায়

নিজেকে মহাশূন্যে নিয়ে যেতে হলে ভাবতে হয় নীল আকাশকে। তা মহাশূন্যের এক প্রতীক। তার চাইতেও মনকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হয়, যেখান থেকে চন্দ্র সূর্য বিন্দুমাত্র প্রতীয়মান হয়।

দেহ যেমন একটি ঘর, জগৎও তেমন একটি স্থান বা আবদ্ধ ঘর। জগৎ হল দেহ-ঘরের মতো সমষ্টি নাম-রূপের একটি আবরণ। এর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হলে সাধনায় বসতে হয়। দেহকে নিয়ে থাকলে হয় না। দেহধারী আমির সাধ-আহ্লাদ পূরণের ক্ষমতা খুবই সীমিত। মনের মধ্যে জগৎ ওঠে, ভাসে ও ডোবে। এ ভাবে মনকে পুনঃপুনঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে তুলে নিয়ে মনের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে নিতে হয়। দেহের তোয়াজ করে কিছু হয় না। মনের এক প্রান্তে আছে দেহ বাড়ি জগৎ, আরেক প্রান্তে সব শূন্য—কিছু নেই। সেখানে যাওয়া হল সদ্‌গুরুর বা আত্মার সেবা করা। ফুল-চন্দনের পূজা ছেড়ে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হবে। স্থূল পূজাও ভুল নয়। তবে আত্মস্বরূপে উপনীত হতেই হবে। আত্মার পরিচয় গুরু ধরিয়ে দেন। গুরুই হলেন আত্মা। গুরুর জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নেই—গুরু বিশুদ্ধ বোধমাত্র। দেহেতে থেকেও গুরু দেহেতে নেই। তাঁর ত্রিপাদের একপাদে জগৎ আছে। [৪।৭।৭৮]

জাগতিক অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা সত্যবোধের শিক্ষা স্বতন্ত্র

সত্য হল সেই বস্তু যাকে কোনও কিছুর সঙ্গে মিশ্রণ করা চলে না। সত্য অবাধিত। পড়াশুনা বা ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে তা মেলে না। কেবল অনুভবসিদ্ধদের কাছে তা মেলে এবং এই জন্যই তা গুরুগত বিদ্যা। গুরুর কাছ থেকে যা-মেলে তা-ই একমাত্র অবলম্বন করতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনও অবলম্বন টেকে না। যেমন, গুরু যদি কোনও নাম বা ক্রিয়া দেন তা-ই হল সর্বোত্তম অবলম্বন। কেবল তার দ্বারাই নিজের ভ্রান্তি-বিলাস বা বিকার দূর হয় এবং মনের ঊর্ধ্বে নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

গুরু শিক্ষা দেন ভাল-মন্দ সব নিজের মধ্যে দেখতে, অপরের মধ্যে নয়। অপরের মধ্যে দেখতে হয় শুধু তার গুণ। সমগ্র সাধনার উদ্দেশ্য হল নিজের মনের মলিনতা পরিষ্কার করা। শিক্ষার উদ্দেশ্যও তা-ই হওয়া উচিত। যে শিক্ষার মাধ্যমে মনের কল্পনা বা ভ্রান্তি দূর হয় তা-ই প্রকৃত শিক্ষা। মন পরিষ্কার হলে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন আপনিই হয়। আত্মা বা ঈশ্বর বাইরের ধার করা বস্তু নয়। মন এত মলিন হয়ে গেছে যে সে আর সত্য অনুভব করতে পারে না। ধর্মচর্চা ও ভজনপূজনে মনের মলিনতা কিছু কাটে, কিন্তু সব দূর হয় না। একমাত্র গুরুর নির্দেশ পালন করে শাস্ত্রজ্ঞানে অজ্ঞ হলেও মনের মলিনতা দূর হয়।

গুরুকে ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে গুরুবাদ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা করা হয়। সাধারণ লোকে ভাবে তিনি যেন সকলকে ইচ্ছামতো বস্তু দেবেন। কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে যাদের একাত্মতা হয়েছে তারা কেবল বিশুদ্ধ বোধের আলোই দেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁদের কাছ থেকে objective form-এ কিছু পাওয়ার

আশা রাখে। তাদের এই মতের স্বপক্ষে পৌরাণিক উপাখ্যান থেকেও উদাহরণ দেখায় তারা। কিন্তু সত্যের সঙ্গে তা কিছুমাত্র মেলে না। কল্পনার মধ্যে সত্যকে পাওয়া যায় না। বস্তুজগতের বিষয়ের মতো যা লেনদেন হয় তা সত্য নয়। সত্যের অনুভূতিকে দেওয়া বা নেওয়া যায় না। শুধু প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্ব আরোপ করে নানা কল্পনা আরোপিত করা হয়। তার ফলে সমাধান আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

যথার্থ শিক্ষার তাৎপর্য

মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু হল শিক্ষা। সেই শিক্ষাই যদি বিকৃত হয়, তবে তার ফলও বিকৃত হবে। যে শিক্ষা অন্তরের জ্ঞান-আনন্দকে বৃদ্ধি করে না, তা শিক্ষাই নয়। যে শিক্ষা দ্বারা মন চঞ্চল হয়, সত্যবোধ জাগ্রত হয় না, জ্ঞানের বিকাশ হয় না, সহানুভূতি, করুণা, মৈত্রী জাগে না, তা শিক্ষাই নয়। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় এই ভাবগুলি আসে; অথচ পুঁথি-পুস্তকের সংখ্যাও বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মনের মল পরিষ্কার করা। বহু তথ্য জেনে মল পরিষ্কার হয় না। যদি নিজের গৃহে ঠিক মতো কর্তব্য করা যায় তাহলেই হয়ে যায়। অনেক আশ্রম দেখা হয়েছে; কিন্তু এই রকম শিক্ষা দেখা যায় নি। এজন্য 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) ধারণা হয়েছে যে—যে নিজের বাড়িকে সুন্দর করে রাখে, বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে, নিজের দেহের যত্ন করে তাহলেই তার বাড়ি হয় আশ্রম এবং দেহ হয় মন্দির। যিনি এই মন্দিরে বাস করেন সেই আত্মারাম তাতে তুষ্ট হন ও কৃপা করেন।

অহংকারের পূজা দিয়ে হবে না, অহংদেবের পূজা করতে হবে। মন কখনও যথার্থ সত্যকে ধারণ করতে পারে না, তলিয়ে যায়। অনন্ত মন বা আত্মন হলেই শুধু যথার্থ সত্যকে ধারণ করতে পারে। মন নাশ হলে হয় আত্মন। মনোনাশের চাবিকাঠি আছে গুরুর কাছে। গুরু ধাপে ধাপে তুলে এনে শিষ্যকে বোধে বোধময় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

একমাত্র সদ্‌গুরুর মধ্যে সব দেবদেবী মিশে আছেন। তিনি হলেন সব চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ বা Totality of Conscious power and active power। গুরুর ধ্যান অর্থ নিজের মধ্যে, নিজেকে কেন্দ্র কবে সমগ্র চৈতন্যশক্তি ও সত্তার ধ্যান। তা হয় দ্বিদলচক্রে যেখানে জ্ঞানগঙ্গা ও যমুনার মিলন হয়। গুরুর দু'টি চরণ হল জ্ঞান ও ভক্তি। দুই মিলে গেলে একের স্থানে পাওয়া যায় সম্পদ[1]। সম্পদ না-পেলে অভী হওয়া যায় না। গুরুভজন মানে সমানের ভজন।

সদ্‌গুরু এবং আত্মার আমির পরিচয় প্রজ্ঞানঘন কেবল জ্ঞানমূর্তি

বিশুদ্ধ চৈতন্য যাঁর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই হলেন গুরু। এই গুরু স্থূল স্তর থেকে সূক্ষ্মতম স্তর পর্যন্ত নিজেকে বিস্তার করে বসে আছেন। অজ্ঞানে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে কেবল জ্ঞানমূর্তি। এই হল যথার্থ আমির পরিচয়। এর পরিচয় দিতে গিয়ে গুরু একটা Torchlight[2] ধরিয়ে দেন। মন যখন চৈতন্যের সাধনা করতে চায় তখন কী রূপে, কী নামে ব্যবহার করবে এবং মন যখন মনের কল্পিত সৃষ্টি ব্যবহার করে তা কী ভাবে করতে হয়, তাও গুরুই ধরিয়ে দেন।

১। সম্পদ— সম+পদ। এর অর্থ হল সমত্বে বা একবোধে প্রতিষ্ঠা অথবা সমবোধে প্রতিষ্ঠা। এর পরিনামেই হয় মুক্তি, শান্তি ও অমৃতত্বলাভ।

২। Torchlight —গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের আলো যার দ্বারা বিশুদ্ধ চৈতন্যে বা স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

মন কল্পিত বস্তুর ব্যবহার করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনে। মনের জিনিস ব্যবহার হয় চিন্তার মাধ্যমে। গুরুর বা ঈশ্বরের ব্যবহার করতে হয় গুরুমুখে যেমন শোনা হয় ঠিক তেমন ভাবে। এই জন্য শম-দমকে অবলম্বন করে হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। একটি হল বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যবহার, যা কর্মরূপে অভিহিত হয় এবং তার একটি হল অন্তরেন্দ্রিয়ের ব্যবহার, যা চিন্তা নামে পরিচিত। কর্মের বা চিন্তার ঊর্ধ্বে রাখতে হয় গুরু বা বিশুদ্ধ চৈতন্যকে।

বর্তমান যুগে মানুষের চিত্ত বিষয়মুখী; কামাসক্ত বিষয়ী চিত্ত আত্মবিমুখী ও ভোগে রত। তার সুখ-দুঃখ বিলাসমাত্র। সংসারী মানুষের পক্ষে বিলাসিতা থেকে সুখ-দুঃখকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না। দুঃখ বাদ দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ পেতে হলে দুঃখকেও গ্রহণ করতে হয়। পরাসুখ লাভের জন্য সুখ-দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হয়। তখনই হয় আত্মসিদ্ধি ও পরামুক্তি।

চিদাভাস ও চিৎস্বরূপের মধ্যে পার্থক্য

বোধের ঘরে যাবার চেষ্টা না-করা হল আধুনিক যুগের বিলাসিতা। চেষ্টা করলে ভুল ভেঙ্গে যায়। গুরুপ্রদত্ত তত্ত্বের সারকে যথাবৎ গ্রহণ ও ব্যবহার করাই হল অধ্যাত্মসাধনা। গুরুপ্রদত্ত আলোতে প্রতি শব্দ চৈতন্যবান হয়। শ্রবণের মাধ্যমে গুরু চিত্তকে তপ্ত লৌহের মতো করে দেন। চৈতন্যের দিকে মন না-দিলে অণু-পরমাণুর মধ্যে চৈতন্য খেলবে কী করে? চিদাভাসে যুক্ত চিত্ত চিরকালই মলিন থাকে। চিৎস্বরূপের ভাবনায় ও ধ্যানে তা শুদ্ধ হয় ও মলশূন্য হয়। তখন চিদাভাসের বদলে চিৎস্বরূপই হয় স্বয়ংপ্রকাশমান। শুদ্ধ চিত্তে চিৎস্বরূপের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। [৩।৯।৭৮]

অখণ্ড পূর্ণবোধে সব ব্যবহারের তাৎপর্য

অখণ্ড ভাবে যা অনুভূত হয় তা-ই পূর্ণতা। মন কখনও অখণ্ড হতে পারে না। অখণ্ডের মধ্যে মন কখনও প্রাধান্য পেতে পারে না। অখণ্ডস্বরূপ করুণাপরবশ হয়ে ইষ্টের, অবতারের বা গুরুর রূপ ধরে আসেন। গুরু বলতে অখণ্ডবোধকে ধরতে হয়। গুরু কখনও খণ্ড হতে পারেন না। গুরু হলেন সব দেবদেবী, বেদের ঘনীভূত রূপ বা শিবস্বরূপ। শিব হলেন মঙ্গলময় প্রশান্ত সত্তা। সগুণ-নির্গুণ উভয়রূপেই তিনি আছেন। তিনি বিশ্বচৈতন্যরূপে, অখণ্ডরূপে বা গুরুরূপে আবির্ভূত হন।

অতীতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান পদ্ধতি ধরে গুরুর কাছে বসে শিখতে হতো। প্রথমে নিয়ম মতো চলে নিয়মকে অতিক্রম করতে হয়। কারণ স্থূলের যে নিয়ম, সূক্ষ্ম স্তরে সেই নিয়ম থাকে না। সূক্ষ্ম স্তরের সব নিয়ম সমান, uneven থাকে না। কিন্তু স্থূল স্তরে মনের ধর্ম অসমান বলে সব নিয়ম পালন করতে হয়। মনের ধর্ম হল—সে নিয়ম পালন না-করে ভাল জিনিস পেতে চায়। একমাত্র গুরুর কাছেই সব কিছুর right use শিখতে হয়।

প্রজ্ঞানগুরুর বক্ষেই বিজ্ঞানগুরু শুদ্ধবোধে শিক্ষা প্রদান করেন

বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার হল চৈতন্যবোধে চৈতন্যের দ্বারা সব কিছুর ব্যবহার করা, মন দিয়ে ব্যবহার নয়। গুরুর নির্দেশ ব্যতীত ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া হয়। ভ্রান্ত শিক্ষার জন্য বিকার সৃষ্টি হয়। এই বিকার হল (১) অনধিকার চর্চা, (২) যোগ্যতা না-বাড়িয়ে বা সাধ্য না-বাড়িয়ে সাধ বাড়িয়ে বৃহৎ বস্তু ভোগের ইচ্ছা। অধ্যাত্মসাধনায় গুরু বিকারমুক্ত করার বিজ্ঞান ধরিয়ে দিয়ে শিষ্যকে সংযত করে দেন।

শুদ্ধবোধের অনুভূতি গুরু দেন। এই বোধের ঊর্ধ্বে হল বিশুদ্ধ বোধ। Conventional দীক্ষায় কাজ হবে না বলে শুদ্ধবোধের তত্ত্ব দিয়ে সচ্চিদানন্দময়ী মা নিজেই সমস্ত ভার নিয়েছেন। সব কথার মূলে রয়েছে

অক্ষরব্রহ্ম। কথা দিয়ে অর্থাৎ বাকের মাধ্যমে চিদানন্দময়ী মা অন্তরে গেঁথে দেবেন। মানুষের বেশ ধরে সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই আসেন।

দড়ির মধ্যে যেমন সর্পভ্রম বেশিক্ষণ টিকতে পারে না, গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানালোকেও সেইরূপ নানাত্ব-বহুত্বরূপ ভ্রান্তি টিকতে পারে না। তাঁর হাতে এমন একটি candle আছে যার আলো কোনও দিন নেভে না।

[৫।৯।৭৮]

স্বভাব ও প্রকৃতির পার্থক্য

গুরুগত বা ইষ্ট, আত্মা ও ঈশ্বর অনুগত যে মন তা স্বভাব পর্যায়ের। বহির্জগতের অন্তর্গত মন হল প্রকৃতি পর্যায়ের। পুনঃপুনঃ নির্দেশ করা সত্ত্বেও প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত মন প্রকৃতির প্রভাব কাটাতে চায় না। সেই জন্য প্রকৃতিগত মনকে বহু দুঃখ ও আঘাত পেতে হয়। তারপর দুঃখ থেকে নিস্তার পাবার জন্য আশ্রয় নেয় স্বভাবের কাছে। শরণাগত আশ্রিত সন্তানদের গুরু নির্দেশ দেন বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিজ্ঞানকে অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানকে যথার্থ ভাবে সচেতন হয়ে ব্যবহার করতে। এই বিজ্ঞান ঠিক মতো ব্যবহার হলে স্বঘরে পৌঁছান যায়। কিন্তু সাধারণত মানুষ জীবনের এই বিষয়ে যথার্থ সচেতন না-হয়ে গতানুগতিক ধারায় চলে অভ্যস্ত; ফলে গুরুর প্রভাব কম হয়। যেমন আগুনের শক্তি বেশি হলে এবং জলের প্রভাব কম হলে আগুন জলকে শুষে নেয়; কিন্তু জলের মাত্রা বেশি হলে আগুন নিভে যায়। সেইরূপ প্রকৃতির অধীন মনের প্রভাব বেশি হলে স্বভাবের শক্তি দুর্বল হয় এবং গুরুর নির্দেশ কার্যকরী হতে পারে না। তখন আবার স্বভাবের প্রভাবে সাধনা করে প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হয়। কোনও কোনও আধারে প্রকৃতি জোর করে, তখন একটা সংগ্রাম হয়। একেই ঋষিরা নাম দিয়েছেন সুরাসুরের সংগ্রাম বা অন্তরের সঙ্গে বাইরের সংগ্রাম, জ্ঞানশক্তির সঙ্গে ক্রিয়াশক্তির সংগ্রাম বা স্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম।

গুরুর পরিচয় ও তাঁর মহিমা

ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি সব কিছুর পরিচয় যিনি দেন তিনিই গুরু। গুরুর মধ্যে ঈশ্বর ও দেবতা উভয়েই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর গুণাতীত জ্যোতিস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বিজ্ঞানাত্মা বলা হয়। তারপর প্রজ্ঞানাত্মা। সদ্‌গুরুর কাজ হল বিশুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া।

গুরুর কাছে, অমৃতস্বরূপের কাছে পাওয়ার কিছু নেই; শুধু হওয়ার কথা। এই হওয়ার অর্থে বোঝায় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বহুর ঘরে থেকে লোহার শিকল খুলে সোনার শিকলে বদ্ধ থাকা নয়। গুরু জগতে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পথে যত অন্তরায় সব সরিয়ে দেন।

গুরুর প্রতি কথাই অমৃতের ঘরে ফেরার চাবি। মুক্তপুরুষের কাছে যদি এক মুহূর্ত থাকতে পারা যায় তবে তা হাজার বৎসর স্বর্গবাস অপেক্ষা শ্রেয়। হাজার বৎসর স্বর্গবাসে কত বার যে জন্ম নিতে হয়! দেহে বাস করতে হলে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। পূর্ণানন্দ—স্থূল দেহের সাধনালব্ধ বস্তু নয় বা কোনও কিছুর মাধ্যমেও মেলে না। আনন্দ হল আপনস্বরূপ। তা অদ্বৈত—তা কোনও পাওয়ার বস্তু নয়।

সত্যের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হলে নিজের ঘরের অর্গল বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতির অন্তর্গত মন যে কী অন্যায় করে তা সে নিজেই জানে না। সেই জন্য গুরুর নির্দেশ যা পাওয়া যায় তাই স্মরণ-মনন করতে হয়। তদতিরিক্ত কিছু করতে হয় না এবং গুরুর বাক্যের প্রতি সচেতন থাকতে হয়। গুরুবাক্যের সঙ্গে অন্য কথার মিশ্রণ হলে গুরুশক্তি কাজ করে না। গুরুশক্তি কোনও অলৌকিকত্ব দেখায় না। সত্যের রাজ্যে miracle নেই। মিথ্যাকে বজায় রাখার জন্য শুধু miracle প্রয়োজন হয়।

আধ্যাত্মিক পথে বা সত্যের পথে চলার সময় miracle-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে আরও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। গুরুর কাজ হল মাঝখানের মেঘকে বা অন্ধকারকে সরিয়ে দেওয়া। অলৌকিকতার মাধ্যমে যদি মনকে বস্তুজগতেই আটকে রাখা হয় তাহলে তাকে দড়ির বাঁধন খুলে লোহার শিকল পরানো হয়। এর বেশি কিছু হয় না। miracle দ্বারা যে relief পাওয়া যায় তাতে belief সরে যায়।

জীবের পুনঃপুনঃ দেহধারণের কারণ

স্থূল দেহ ধারণের কারণ হল তার পূর্বকৃত ভুলভ্রান্তি শোধন করা ও ফল ভোগ করা। কর্মফল অন্য কেউ নেয় না; তা নিজে ভোগ করে শেষ করতে হয়। যদি কারও কর্মফল অপর কেউ নেয় তবে উভয় পক্ষেরই কষ্ট পেতে হয়। কর্মের ফল দিয়ে কর্ম শোধন হয় না। একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম ও তার প্রতিবন্ধককে অপসারিত করতে হয়। গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি বা শ্রুতিশিরোমণি সর্বতত্ত্বমালাবিভূষিত। বিশুদ্ধ জ্ঞান গুরুই দিতে পারেন। নিজের চেষ্টায় তা পাওয়া যায় না।

জন্ম জন্মান্তরের স্বকৃত কর্মের ফল হল কর্মের ইন্ধন। আগুন জ্বালাবার জন্য দরকার হয় লাক্ড়ি। জীবনকে জ্বালায় কর্মফল। এই ইন্ধনকে আত্মজ্ঞানের অগ্নি দিয়ে সরাতে হয়। কর্মফল বড় সাংঘাতিক। গুরু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সব কর্মফলকে ধীরে ধীরে শোধন করেন। এ হেন প্রেমময় গুরু বিনা প্রত্যাশায় শিষ্যভক্তের জন্য এত করেন, কিন্তু তারাই আবার গুরুর বিরুদ্ধে আলোচনা করে। তথাপি গুরু লাগাম ধরে থাকেন। ভক্ত ও জ্ঞানী যত উচ্চ স্তরে যায় তত গুরুর মহিমা বুঝতে পারে এবং তাদের কৃতজ্ঞতাবোধও বাড়ে। এই কৃতজ্ঞতাবোধই তাদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

গুরুশক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও নেই, তবে নিম্ন মনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকার জন্য শিষ্যের কখনও কখনও চিত্তের মলিনতা দূর হতে সময় বেশি লাগে। গুরু কালাতীত—নির্বিকার চিত্তে তিনি বসে থাকেন। নিম্ন মনকে ঊর্ধ্ব মনে তুলে নেওয়া কঠিন, যেমন শিশুকে যৌবনে তুলে আনা কঠিন। তা সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন একটি একটি করে ইট গাঁথা হয়, একবারে হতে পারে না, সেইরূপ প্রতিটি বোধ অমৃতত্বকে বিদিত করিয়ে দেয়। অমৃত মানে জ্ঞান। তা কর্মফলের জ্ঞান নয়। যে জ্ঞান গুরু দেন সেই জ্ঞানকেই অমৃত[১] বলা হয়।

সদ্‌গুরু ও কর্মীগুরুর প্রভেদ

সদ্‌গুরু দেন দীক্ষা ও কর্মীগুরু দেন কর্মের শিক্ষা। সদ্‌গুরুর কাজ হল আলো দেওয়া—যে আলো কোনও কিছুর দ্বারা বিকৃত বা প্রতিহত হয় না, যার ক্ষয়-বিকার বা আদি-অন্ত নেই। গুরু অখণ্ডবোধ দিয়ে সাজিয়ে দেন। তখনই অনুভূত হয় 'জ্ঞানামৃতং সমরসগগনোপম'। সমরস হওয়ার কারণ—এখানে অসমতার কোনও প্রশ্ন নেই। মৃত্যু ও অজ্ঞান সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তা হল স্বচ্ছ ও আকাশের মতো সর্বব্যাপী।

গুরু হলেন তিনিই যাঁর অনুভূতির মধ্যে জগতের সব কিছুর প্রকাশধারা সমান ভাবে মিশে আছে। অখণ্ড চৈতন্যধারার সঙ্গে যোগাযোগ হলে ত্রিবিধ জ্ঞান আর থাকে না, থাকে শুধু জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপের মধ্যে জানাজানির সীমানা থাকে না। তাঁকে পাওয়া যায় স্বভাবের কেন্দ্রে। শুধু মস্তকে বা হস্তে নয়। হাত দিয়ে হয় সর্বকর্ম।

১। অমৃত—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

চৈতন্যময়ী মায়ের যে রূপ কল্পনা করা আছে তা অতি অপূর্ব। মায়ের কোমরে রাখা হয়েছে একগুচ্ছ হাত। নাভিমূল হল তেজতত্ত্বের স্থান। অগ্নি, জল ও বায়ু এই তিন তত্ত্বের মধ্যে সর্বোত্তম হল অগ্নি। স্থূল জগতের সব কিছু প্রকাশ হয় অগ্নির দ্বারা এবং সূক্ষ্ম জগতের সব কিছু প্রকাশ হয় বায়ুর দ্বারা। অগ্নি ও বায়ুর পরে ইন্দ্র। ইন্দ্র হলেন সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। বায়ু হল বিষ্ণু। 'ত্বং বায়ু, ত্বমেব ব্রহ্ম'। তা সগুণ ব্রহ্ম বলে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়। কিন্তু বায়ুর ঊর্ধ্বে যিনি আছেন তাঁকে অনুভব করা যায় না। আকাশতত্ত্বের ঊর্ধ্বে মনকে নিতে পারলে 'একোঽহম্'-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করে খুশি মতো চলা যায় ও দেহধারণ করা যায়। 'একোঽহম'-এর ঊর্ধ্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা কী ভাবে যে থাকেন তা কেউ বর্ণনা দিতে পারে না। সেই জন্য সদ্‌গুরুর মহিমা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাঁরা out of love দেহধারণ করে আসেন। কিন্তু দেহ তাঁদের প্রতিবন্ধক হয় না। অপরের দেহেতেও যেন কোনও প্রতিবন্ধক না-হয় সেজন্যও তাঁরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের স্বভাবে টেনে আনেন।

গুরুর জ্ঞান প্রতি বস্তুর মধ্যে বোধকে recognize করতে সাহায্য করে। প্রতি বস্তু শুদ্ধবোধের মাধ্যমে যদি প্রকাশ ও ব্যবহার না-করা হয় তবে সত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। 'হরি হরি' নাম উচ্চারণ করে যে বোধের বিকাশ হয় সেই বিষয়েও গুরুমুখে জেনে নিতে হয়।

সদ্‌গুরুগণ যদি একটা কথাও না-বলেন তাহলে সত্যের বিজ্ঞান শিখবার উপায় নেই। 'ক্লীং' শব্দের বোধার্থ পেতে হলে ২৫ বৎসর সাধনা করতে হয়। এইটুকু শব্দের মধ্যে entire theory of creation আছে। এই একটি শব্দে যে কী রাখা আছে তা সদ্‌গুরু ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই কেবল সত্যের বিজ্ঞান জানা যায়। [১০।৯।৭৮]

গুরুবাণী অনুসরণের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃতি নিরসন হয়

সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম, মুক্তি-বন্ধন সবই ভ্রান্তি। এই উভয় ভ্রান্তি থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্ত সদ্‌গুরু জ্ঞানের আলোটি দেন। গুরুবাণী হল একটি আলো যার দ্বারা সত্যানুভূতি লাভ হতে পারে। সকলের সামনে এটি পরিবেশিত হবার কারণ হল—যুগ যুগান্তব্যাপী অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে যে-ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে এবং যার বিকার জমতে জমতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আজকাল বাকের থেকে সত্যকে আর নিতে পারা যাচ্ছে না। এখন বাক্ হয়েছে কলুষিত। তার ফলে মনের শোধন হবার আর উপায় নেই।

জগৎ ও তার অনুভূতি বাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত। গুরুবাক্ মনের অতীতে যাবার রাস্তা খুলে দেয়। আত্মাকে দেওয়া বা নেওয়া যায় না। শুধু মনের উপরে সঞ্চিত জন্ম জন্মান্তরের কর্মফলের আবরণকে বা মলকে অপসারিত করে দেয়। ভগবান হাতে তুলে দেবার বস্তু নয়। সদ্‌গুরুর বাণী হল অস্ত্রতুল্য, যথা শ্রীরামচন্দ্রের তীর, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র ও শিবের ত্রিশূল অস্ত্র এবং মা দুর্গার হাতে খড়্গ, তীরধনুক, চক্র, গদা প্রভৃতি।

গুরুবাণীর সাহায্য ব্যতীত অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হবার কোনও উপায় নেই। গুরু যে বাণী দেন তার ব্যবহারবিজ্ঞানও তিনিই ধরিয়ে দেন, যা ব্যবহারে অনুগত ভক্তের চিত্তমল বিদূরিত হয়। তাঁর সাহায্য ব্যতীত দেশ-দেশান্তর তীর্থ-তীর্থান্তর ভ্রমণ করে, অথবা ক্রিয়া-কলাপ বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে কিছুই মেলে না।

মন হল বৃত্তিজ্ঞান বা জ্ঞানাভাস, আত্মগুরু হলেন বৃত্তিশূন্য জ্ঞান/চৈতন্যস্বরূপ

গুরুবাণীর মাধ্যমে চিত্তের শোধন হলে প্রকৃতির প্রভাব বা নানাত্ব-বহুত্বের প্রভাব আর থাকে না। সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম উভয়ই ভ্রান্তি। মুক্তপুরুষগণ অসৎ-এর নিন্দা বা সৎ-এর প্রশংসা করেন না।

মন হল জ্ঞানবৃত্তি যার দ্বারা বৈচিত্র্যকে জানা যায়। শুদ্ধ অনুভূতিতে কোনও বৃত্তি থাকে না। বৃত্তিশূন্য চৈতন্য হল আত্মন এবং বৃত্তিযুক্ত চৈতন্য হল মন। মনকে কেন্দ্রাভিমুখী করা কঠিন। কেন্দ্রের দিকে একটুখানি টেনে নেওয়া সম্ভব হলেও পূর্ব পূর্ব বৃত্তি পুনরায় মনকে বাইরে টেনে নিয়ে যায় এবং তার ফলে মন পূর্ব অভ্যাসে চলে। মনের এরূপ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার উপায় হল সদ্‌গুরুর বাণী। সদ্‌গুরুবাণী ও সদ্‌গুরু এক। সদ্‌গুরু হলেন বিশুদ্ধ অনুভূতির সার। দেহধারী একটা পিণ্ড নয়। তিনি ব্যক্তি হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। তিনি স্ববোধে ও স্বভাবে থাকেন, প্রকৃতির প্রভাবে থাকেন না। তিনি দুই দেখেন না, কারণ মনরূপ দর্পণ তাঁর থাকে না। নিত্যচৈতন্যের ভাবনা দ্বারা অচৈতন্য ও মনের বিকার থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হয়। কাজেই গুরুবন্দনার একস্থানে বলা আছে—'আত্মজ্ঞানের অগ্নি দান করে জন্ম জন্মান্তরের কর্মফলকে দগ্ধ করে যিনি দেন সেই গুরুকে আমি বন্দনা করি।' অশুদ্ধ মন গুরুবন্দনা করতে পারে না।

দ্বৈতবোধে হয় দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও দুর্ভোগ, অদ্বৈতবোধে হয় তার নিরসন

যাঁর মাধ্যম দিয়ে গুরুবাণী বেরোয়, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ তৈরি হবেই। রামচন্দ্র, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের বিরুদ্ধেও পক্ষ ছিল। যত শুদ্ধ সদাত্মা তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষ থাকবেই। তবে তাঁরা প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেন না। সকলের কাছেই সমান ভাবে অনুভূতির বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করেন। তাঁরা জানেন নিজেকে নিজেই দিচ্ছেন। প্রায় প্রতি যুগেই দেখা যায় সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সদাত্মাদের জীবদ্দশায় খুব নির্মম ভাবে অত্যাচার করেছেন। 'মনের জ্ঞান'-কে ভিত্তি করলে এই ভুলই হয়। পরে জন্ম জন্মান্তর ধরে অনুশোচনা চলে ও ভুলের মাশুল দিতে হয়।

সৎ-এর কোনও ক্রমাদি নেই, অসতের ক্রম-ব্যতিক্রমাদি আছে

জাগতিক সৎ হল সৎ-এর মুখোশ-পরা আরেকটি অসৎ। এই কারণেই সদ্‌গুরুগণ যে আলো দেন তার মধ্যে কোনও আপোশ করা, গোঁজামিল বা জোড়াতালি দেওয়া চলে না।

শিক্ষা-দীক্ষা প্রসঙ্গ স্বানুভূতির দৃষ্টিতে

সদ্‌গুরুগণ বোধের আলো ব্যতীত আর কিছু দেন না। গুরু শিক্ষা দেন হাতেকলমে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। আর দীক্ষা দেন প্রাণে ও মনে। আর সদ্‌গুরু যিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ, তিনি দীক্ষা দেন জ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে। 'এখানে' (ফার্ণ রোডের গোলবারান্দা নির্দেশ করলেন) সচ্চিদানন্দ দীক্ষা দিচ্ছেন। কোনও মতবাদের দীক্ষা এখানে নেই। কিন্তু মন সহজে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছেড়ে উঠতে চায় না। তবুও এখানে বেশি কঠোর হওয়া যায় না। কারণ, বেশি কঠোর হলে সব বিগড়ে যাবে, আর চালুনী দিয়ে ছাঁকতে গেলে সব গলে যাবে। মন সহজে বোধের ঘরে যেতে চায় না। মনের প্রভাবকে অতিক্রম করার জন্য, মনের বিকারকে শোধনের জন্য গুরু 'বুদ্ধিযোগ' দেন। তা নিজের চেষ্টায় হয় না। গুরুর অস্ত্র বা গুরুবাণী দ্বারা তা সম্ভবপর। সদ্‌গুরুগণ বাণী দিয়েই অপরকে সদ্‌গুরুতে পরিণত করেন। তা ইতিহাসে দেখা যায়। সদ্‌গুরুর কাছে আছে একরঙের পাত্র শুধু অর্থাৎ অদ্বৈতবোধ। তিনি সব কিছুই এই রঙে রাঙিয়ে নিতে বলেন।

গুরুদক্ষিণার তাৎপর্য

একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়া গুরুদক্ষিণা হয় না। ভাগাড়ে মন দিয়ে গুরুভজন হয় না। শুদ্ধ মন দিয়ে বা সমবোধ দিয়ে গুরুভজন হয়। গুরু বারবার দেন, কিন্তু মন বারবার তা ফিরিয়ে দেয়।

গুরুভজন হল অখণ্ডের ভজন

যেখানে বলা হয় 'দুঃখ এর গুরুমূর্তি' সেখানে দুঃখ যে কী ব্যাপার তা কেউ ধারণা করতে পারবে না। দুঃখকে সবাই এড়াতে চায়। দুঃখ কার তৈরি? নিজেরই তৈরি জিনিস; তাই এত সহজে এড়ানো যায় না। যে দুঃখকে বরণ করে নেয়, জ্ঞান এসে তখন আপনিই ধরা দেয়। অখণ্ডকে যে ধরে সে-ই গুরুভজন করে।

ভক্ত শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার বললেন—শ্রবণ মাত্র যার অনুভূতি হয় সে-ই হল উত্তম অধিকারী। তোমাদের মন সেই অধিকারী কী হয়েছে? বহু অজুহাত সত্ত্বেও সচ্চিদানন্দময়ী মা বা প্রজ্ঞানঘন সদ্‌গুরু এত তো দিয়ে যাচ্ছেন তবু প্রতিমুহূর্তে সবাই সদ্‌গুরুকে আঘাত করছে আবার তাঁর কাছ থেকেই পেতে চাইছে। সদ্‌গুরু মানে বোধস্বরূপ স্বয়ং। ভেদজ্ঞান নিয়ে বা পরচর্চা করে সদ্‌গুরুর ভজন হয় না। একবোধ বা সমবোধ দিয়ে হয় সদ্‌গুরুর ভজন। [১২।৯।৭৮]

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের ধর্ম

আগুনের যেমন ধর্ম আলো দেওয়া বা তাপ দেওয়া, বায়ুর যেমন স্বাভাবিক ধর্ম প্রবাহিত হওয়া, ফুলের ধর্ম তার গন্ধ ও সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া, জলের ধর্ম শীতলতা ও সরসতা, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম হল—অপর কারও ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব থাকলে তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করা। সেই ভাব থেকেই সদ্‌গুরুদের মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। বোধের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক কিন্তু মনের ক্ষেত্রে তা ভ্রান্তিবিলাস। চৈতন্যবিহারে ভ্রান্তিবিলাস থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণ বা মুক্তপুরুষগণ ব্রহ্মবোধের অভাব দেখলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তা পূরণ করে দেন।

গুরুর সমগ্র বিষয় পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত হয় বিশেষ বিশেষ অধিকারীর মধ্যে। সেখানে শিষ্যের আরোপ করার কিছু থাকে না। গুরু হলেন all in all original—তাঁর কাছ থেকে পেয়েই শিষ্য original হয় এবং তা গুরুরই রূপ।

তত্ত্বস্বরূপ গুরুর চতুর্বিধ অভিব্যক্তি

গুরু হলেন পরমতত্ত্বস্বরূপ। এই গুরু চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আসেন। প্রথম Universal ideation অর্থাৎ সমষ্টি ভাবঘন মূর্তি। সমষ্টি ভাব নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন। তারপর নাদরূপে (সমষ্টি নাদ মূর্তি) আসেন। একে বলা হয় Cosmic Divine music। নাদ ও বিন্দুর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। নাদ হল totality of subtle sound অর্থাৎ তা হল শব্দ সমগ্র বা সমগ্র শব্দের একক মূর্তি। নাদ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এসে কলাতে পরিণত হয়। Cosmic mind-কে নাদের স্বরূপ বলা হয়। বিশ্বমনের পূর্ব অবস্থা হল মহত্তত্ত্ব বা Cosmic intelligence. চৈতন্যের আদি অভিব্যক্তি আপনার আনন্দে আপনি যখন আপনাকে প্রকাশ করলেন তাঁর রূপ হল আদিপুরুষ বা নারায়ণ। তাঁর প্রথম স্পন্দন বিস্তার লাভ করে ও ব্যাপক রূপ ধারণ করে হয় সমষ্টি মন। তাই বলা হয় বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। বিন্দু হল মন ও বুদ্ধির কেন্দ্রে যে চৈতন্য অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য। জীবাত্মা হল তাঁর ব্যষ্টি রূপ, বিশ্বাত্মা ও পরমাত্মা হল তাঁর সমষ্টি রূপ।

এক আমি বহু হতে গিয়ে যে স্ফুরণ হল তাই নাদ। এ সকল বিষয় এত সূক্ষ্ম যে চিত্তশুদ্ধি না-হলে প্রথম প্রথম এই সকল প্রসঙ্গ শুনে যথার্থ ধারণা হয় না; কাজেই কিছুই বোধগম্য হয় না। যদি সদ্‌গুরুর কাছে মনঃসংযমপূর্বক ধৈর্য সহকারে শোনা যায় তবে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। সমাহিত মনে গুরু যে স্পন্দন প্রকাশ করেন তা অনুভূতির রূপ নেয়। জ্ঞানের সাধনা শ্রবণসাপেক্ষ। তা ক্রিয়া-কলাপের উপরে নির্ভর করে না।

শ্রবণমাত্র যে অনুভূতি তা-ই হল শুদ্ধ জ্ঞান[১]। 'তুমিই সেই ব্রহ্ম' গুরুমুখে তা শুনতে শুনতে মন খোলসছাড়া হয়ে যায়। তবে এই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যাপক ভাবে আর হতে দেখা যায় না বহু কারণে।

গুরুর ব্যবহার

গুরুর ব্যবহার হল স্ববোধের ব্যবহার এবং তার ফল হল স্ববোধের মধ্যে স্ববোধের অনুভূতি। তাঁর রূপ হল 'স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি কেবলম্'—সৎ-চিৎ-আনন্দ। 'সৎ' মানে যা সব কিছুকে প্রকাশ করেও নিজের অস্তিত্বকে সমান ভাবে রাখে এবং যা কার্য-কারণ-কাল দ্বারা পরিবর্তিত হয় না ও নিত্য নির্বিকার হয়েও সব কিছুকে প্রকাশ করে। সেই 'সৎ' হল প্রকাশময়। তা-ই তার ভাতি রূপ বা চিৎ। সৎ ও চিৎ এই দু'য়ের যে যুগল রূপ তা হল আনন্দ। আনন্দ সৃষ্ট বস্তু নয়। তা নিত্যবস্তু ও স্বতঃস্ফূর্ত; ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়। 'স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি' হল—যে অনুভূতি সব কিছুকে প্রকাশ করেও নিজে যেমন ছিল তেমনই থাকে।

গুরুবাণীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য

প্রথম ভাগে রূপ, দ্বিতীয় ভাগে নাম। রূপ ও নামের অন্তরে থাকে ভাব। গুরুর প্রত্যেকটি সূত্র অজ্ঞানকে ভেদ করে। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা হল গুরুবাণী, যার মধ্যে সত্যবোধ নিহিত আছে। বোধের মতো সূক্ষ্মতম ও শুদ্ধ বস্তু আর নেই। আত্মবিদ্যার উপরে আর কোনও বিদ্যা নেই। এই আত্মবিদ্যাই সব কিছুকে প্রকাশ করে। সৎ-অসৎ ও সদসৎ-এর ঊর্ধ্বে যে তাঁকেও প্রকাশ করে। এ-ই হল গুরুবাণী। তা ধার করা বা চুরি করার উপায় নেই। সেখানে কোনও খণ্ডের ব্যবহার নেই। গুরু আদি, অনাদি ও পরমদেবতা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই সময়ে প্রেমানন্দে একটি গান ধরলেন—

প্রেমের ঠাকুর দয়াল গুরু আমার
আত্মারাম স্বয়ং আত্মারাম স্বয়মং
আত্মারাম নিত্যারাম ব্রহ্মারাম স্বয়ম্
হংসরাম লীলারাম প্রাণারাম স্বয়ম্।।

স্বানুভবসুধা ২য় খণ্ড, গুরুতত্ত্ব গান নং ১৮

গানটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার গুরুতত্ত্বের সাধনাপ্রসঙ্গে আরও সূক্ষ্মানুভূতির কথা বলতে লাগলেন—গুরুতত্ত্বের সাধনার অর্থ আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের সাধনা। আত্মার সাধনা হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সাধনা। যে সচ্চিদানন্দের কথা উপনিষদের পাতায় পাতায় ভর্তি আছে। তাকেই পুরাণে 'পুরুষোত্তম' বলা হয়েছে। যে চৈতন্যসত্তা স্বয়ং ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ ক্ষর,অক্ষর ও পুরুষোত্তম রূপে লীলা করে। 'ক্ষর' মানে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যা ব্যবহার করা হয়। অন্তরে যে চৈতন্যের ব্যবহার হয় তা হল 'অক্ষর'। অন্তর ও বাহির উভয়ের পিছনে যে Background Consciousness থাকে তাকে বলা হয় 'পুরুষোত্তম'। পুরুষোত্তম হল কূটস্থ ও সাক্ষিচৈতন্য।

বাইরের চৈতন্যকে কেউ কেউ বলে জড় বা অচিৎ এবং অন্তরকে বলে 'চিৎ'। অন্তর ও বাহিরকে আবার কেউ বলে পুরুষ ও প্রকৃতি। এই তত্ত্বকে আরও সহজ করে এনে 'এখানে' (ফার্ণ রোডের গোলবারান্দায়) বলা হয়েছে যে প্রত্যেকের 'আমি' হল পুরুষ এবং 'আমার' হল প্রকৃতি। 'আমি'-র গভীরে রয়েছে 'আমির আমি' বা পুরুষোত্তম। সেই আমি থেকে এই আমি অনুভূতি পায়। আবার এই আমি থেকে পঞ্চপ্রাণ ও

১। শুদ্ধ জ্ঞান—তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

মানসক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভূমার আমিকে উপনিষদের ভাষায় বলা হয় ব্রহ্ম, আত্মা; পুরাণের যুগে তাঁর নাম ঈশ্বর। সব মিলিয়ে নিয়ে বর্তমানে তিনিই সদ্‌গুরু স্বয়ং।

সদ্‌গুরুরূপে আসার প্রয়োজনীয়তা হল চৈতন্যের ব্যক্তিরূপ না-থাকলে চৈতন্যের সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবহার হয় না।।

সদ্‌গুরু হলেন great magician। তাঁর magic-এর tricks-গুলিকে যখন ভক্তসন্তানদের জানিয়ে দেন তখন তারাও অনুভব করতে পারে যে তারা এ জগতে বেড়াতে এসেছে।

গুরুকে নিত্যবর্তমান বলা হয়, কারণ গুরু কখনও লুপ্ত হয়ে যান না। শিষ্যের পূর্ণতা লাভের পরেও গুরু থেকে যান। সবার গুরু নিজের গুরু এবং নিজের গুরু সবার গুরু। বিশুদ্ধ সত্তা বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরু প্রতি অণু-পরমাণুতে আছেন। গুরুর স্থূল দেহ থাকুক বা না-থাকুক তা বড় কথা নয়। গুরুর স্মরণ-মনন করতে হয়।

প্রথম প্রথম গুরুর স্থূল দেহের প্রয়োজন হয়। তারপর ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে গিয়ে গুরু দেখিয়ে দেন সূক্ষ্মতমের মধ্যেও গুরু কী ভাবে আছেন। মনকে যত বেশি চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় ততই সত্যিকারের গুরুসেবী ও ভক্ত হওয়া যায়। এইরূপ ভক্তই যথার্থ জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী। জ্ঞানস্বরূপের কৃপায় জ্ঞানের বিকাশ হয়। গুরু সর্বত্র বোধরূপে ছড়িয়ে আছেন। বিশ্ব হল গুরুমূর্তি। জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন গুরু। যেখানেই সৎপ্রসঙ্গ শোনা যায় সেখানেই সচ্চিদানন্দ গুরু উদ্ভাসিত হন। যেখানে, যে অবস্থায়, যে বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই গুরু স্বয়ং। [১৭।৯।৭৮]

গুরুবাণীর ব্যবহার প্রসঙ্গে

ভৈরবী রাগিণী গুরুর কাছে শিখে নিয়ে ঠিক সেই ভাবেই বাজাতে হয়। সেখানে ইমনের সুর জুড়ে দিলে তা ভৈরবী হবে না। সেইরূপ সদ্‌গুরুদের কথায় অন্য কথা মিশ্রিত করলে তা ফলপ্রদ হয় না। কারণ, তাঁদের কথা মন, বুদ্ধির মাধ্যমে বেরোয় না। তাঁদের বাণী স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হতে থাকে। তাঁরা এমন ভাবে যোগযুক্ত হয়ে থাকেন যে যুক্তির জন্য তাঁদের ভাবতে হয় না।

সদ্‌গুরুগণ বলেন সর্বরূপে আমি; অর্থাৎ বোধের রূপে এগুলি সব বোধ। মন কেবল বাইরে আসতে চায়; আর গুরু বাইরের ছড়ানো মনকে তুলে নিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্তরে নিয়ে যান। বহির্মন হল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে মন অর্থাৎ বৈখরীতে যে চৈতন্য খেলে। সেখান থেকে মনকে গুরু মধ্যমায় নিয়ে যান এবং মধ্যমা থেকে পশ্যন্তিতে, তারপর আরও গভীরে পরাক্ষেত্রে। গুরু বাক্যকে মনে, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে বুদ্ধির শান্ত অবস্থায় নিয়ে যান। প্রকৃতির স্থির অবস্থায় বহু নেই।

সৎ হল যা নিত্য এক। সৎ-এ যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই সদ্‌গুরু। গুরুর স্বরূপ হল প্রত্যেকের আত্মা। তা অজর, অমর, আপাপবিদ্ধ। পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পাপ অর্থ বিকার। অর্থাৎ বৈচিত্র্যরূপ বিকার আমিকে স্পর্শ করতে পারে না।

গুরুবাণীই একমাত্র চৈতন্যের ঘরে পৌঁছে দিতে পারে। গুরুবাণী হল জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বা জ্ঞান অস্ত্র। ভোগেচ্ছা হল মৃত্যু বা যে ইচ্ছা বৈচিত্র্যের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যা একের দিকে নেয় তা অমৃত।

সদ্‌গুরুদের মহিমা নিরন্তর পাঠ ও আলোচনা করলে মনের প্রসারতা বাড়ে। কামনাবাসনার ফলে শান্ত মন অশান্ত হয়। মনকে চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করলে কামনাবাসনা থাকে না, তখন মন 'কালীমনা' হয়ে যায়। সে নিজেকে আর দেহরূপে দেখে না; দেখে সচ্চিদানন্দের লীলানিকেতনরূপে। যে আধারে সচ্চিদানন্দময়ী মা লীলা করেন তা ভোগের আধার হতে পারে না। মা কখনও মায়া হতে পারেন না। মন মায়া হতে পারে।

সম্পদ হল দুই যেখানে মিশে এক হয়েছে। এই এক অদৃষ্ট[১]। সেই জন্য বেদান্তে একে এক বলে না; দ্বৈতবিহীন বা দ্বৈতবর্জিত বলা হয়। আত্মা কারও বাইরে নেই। আত্মা-ই একমাত্র সত্য ও আনন্দ। দ্বিতীয় কোনও আনন্দের বস্তু নেই। এই আত্মার প্রতিফলনেই সব কিছু আনন্দময় হয়। [১৯।৯।৭৮]

যথার্থ ব্যবহারের প্রসঙ্গ

ভেদজ্ঞান রেখে গুরুভক্ত হওয়া যায় না। গুরুর কোলে বসতে হলে অভিমানের পোশাক বাইরে রেখে আসতে হয়। শরণাগত ভাব নিয়ে এলে গুরু তাকে গ্রহণ করবেনই।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি গল্প বললেন—

এক রাজা এক ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন। রাজকীয় ভাবে রাজকীয় পোশাকে ঘোড়ায় চড়ে তিনি আশ্রমের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই আশ্রমে প্রবেশ করতে চাইল না। তখন বাধ্য হয়ে রাজা আশ্রমের বাইরে ঘোড়াকে রেখে নিজে হেঁটেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন, কিন্তু ঋষির দেখা পেলেন না।

এ ভাবে সাত দিন চেষ্টা করেও ঋষির দর্শন তিনি পেলেন না। তারপর বাধ্য হয়ে তিনি মন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্রী! আমি কেন ঋষির দর্শন পেলাম না।

মন্ত্রী— মহারাজ, আপনার দরবারে আপনি যেমন রাজা, আশ্রমের দরবারে ঋষিও তেমন রাজা। সেখানে আপনাকে আশ্রমের সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

মন্ত্রী পরদিন রাজাকে অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে সাজিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেদিন রাজা ঋষির দর্শন পেলেন।

রাজা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সাত দিন দর্শন না-দিয়ে আমাকে কেন ঘোরালেন?

ঋষি—রাজা, আপনার দরবারে বিচার করে তো আপনি শাস্তি দেন। সে রকম ভগবানের দরবারে ভগবান শাস্তি দেন, অর্থাৎ নিজেকে আবৃত করে রাখেন। আমি তো এখানেই ছিলাম, আপনি দেখতে পাননি।

ভজনের গুরুত্ব ও তার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব

ভজনের মধ্যে চার স্তরের জিনিস রয়েছে—শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম। তবে চারটি একসঙ্গে খুব কম হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি সমানে এসে যায় তবে সব সাধনা সমান হয়ে যায়। তখন তাকে প্রয়োগক্ষেত্র বা গুরুচরণ বলা হয়। তার স্থান হল আজ্ঞাচক্রে। সেখানে প্রাণের তিন গতি মিলিত হয়। সদ্‌গুরু এই তিন গতির মিলনের বিজ্ঞান দিয়ে দেন। বাম, দক্ষিণ ও মধ্যমাঙ্গের যে ক্রিয়া বা গতি তার মিলনের স্থান হল আজ্ঞাচক্র। বাম অঙ্গে রয়েছে ক্রিয়াপ্রধান শক্তির অংশ এবং দক্ষিণ অঙ্গে রয়েছে জ্ঞানপ্রধান শক্তির অংশ। তার মাঝখানে রয়েছে সমানের অংশ; অর্থাৎ পৃথক পৃথক করে জ্ঞান বা কর্ম নয়। সেখানে সুসমতা বিরাজ করে। সুসমতা যেখানে বিরাজ করে তাই হল সুষুম্না। সামঞ্জস্য থাকার জন্য পৃথক করে সেখানে জ্ঞান ও কর্মের ফল থাকে না। কর্ম ও জ্ঞান যেখানে সমতা প্রাপ্ত হয় সেই আজ্ঞাচক্র হল জ্যোতির স্থান। তার মধ্যে আছে বিন্দু। বিন্দুর মধ্যে আছে ইষ্ট রূপ। বিন্দুর দর্শন পেলে সিন্ধুর দর্শন মেলে।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি হল গয়া। লোকে গয়াতে পিণ্ড দেয়। কিন্তু গয়ায় পিণ্ড দিলেও আত্মা পিণ্ড পায় না। পিণ্ড মানে হংসপদ। এই হংসপদ থেকেই উঠে এসে চৈতন্য স্থূল রূপ ধারণ করে। বুদ্ধির মূলে এই পিণ্ডের সন্ধান নিতে হয়। গুরুর নির্দেশে ভজনের মাধ্যমে আপনিই সব খুলে যায়। বিন্দু তখন প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য হয়। বিন্দু

১। অদৃষ্ট—যা দৃষ্ট হয় না। দুই যেখানে মিশে এক হয়ে যায় তা দৃশ্য বস্তু নয়। সেজন্য বেদান্ত একে এক বলে না। বেদান্তে দ্বৈতবিহীন বা দ্বৈতবর্জিত অথবা অদ্বয় বলা হয়।

এসে রূপ ধারণ করে। তখন মন আর মন থাকে না, মন অ-মন[১] হয়ে যায়। অর্থাৎ বোধসত্তায় মিশে বোধে বোধে বোধময় হয়ে যায়।

ব্রজের পথ মানে কী? গুরু নির্দেশিত পথ। গুরুনির্দেশ পালন করে চললেই রাধা-কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যায়। [১।১০।৭৮]

গুরুশক্তির অভিনব মহিমা

গুরুশক্তি মানে সেই জীবন যা তপস্যার মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে অখণ্ড ভূমার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয় কারণ সেই বাণীর ভিতরে দেবলোক, ঋষিলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক ও সিদ্ধলোকের শক্তি এবং এই সমস্ত লোকের অধিষ্ঠানচৈতন্য ও তার শক্তি সবই যুক্ত থাকে। যে যুগে তপস্যার অভাব হয়, সেই যুগে সত্যানুভূতির অভাব হয়। সত্যযুগ তপস্যাপ্রধান যুগ। ত্রেতায় তপস্যার অংশ কিছু কম। দ্বাপরে ও কলিতে তা আরও কম। সেই অভাবকে পূরণ করে দেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। সেই জন্য সদ্‌গুরুর করুণা ও অবদানের কোনও সীমা পরিসীমা নেই।

মনুষ্যজীবনে মানুষ কায়মনবাক্যে বহু দোষত্রুটি করে। ত্রুটি হল যা স্বকীয় বুদ্ধিদোষে নিজেকে অখণ্ড থেকে পৃথক করে শুধু নিজের ব্যক্তি রূপ বা আমি রূপ দেহপ্রীতির জন্য যে কর্ম করা হয় তা। তা ভ্রান্তিমূলক। তপস্যার মাধ্যমে এই ত্রুটি দূর হয় এবং গুরুবাণী ধারণের শক্তি হয়। কারণ চিত্ত শুদ্ধ না-থাকলে গুরুবাণী শুনলেই ধারণা করা যায় না। সেই জন্য গুরুগণ তাঁদের অনুভবকে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি নির্দেশ দেন যা বিধি ও নিষেধ রূপে প্রচলিত। গুরুর আদিষ্ট সাধন ও তার বিধি-নিষেধ পালন করে চলা হল তপস্যা[২]।

গুরু-শিষ্য উভয়ের যথার্থ স্বরূপের তাৎপর্য

'গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য না-মিলে এক'— প্রচলিত এই কথাটির তাৎপর্য হল যে সেরূপ শিষ্যের খুবই অভাব, যে গুরুর আদেশ প্রাণ দিয়ে পালন করে অর্থাৎ নিজের দোষত্রুটি শোধন করার জন্য কায়মনবাক্যে চেষ্টা করে যতদিন পর্যন্ত না পরিপূর্ণ শোধন হয়।

গুরুর স্বরূপকে যে-ভাবে ধাপে ধাপে ব্যক্ত করা হয়েছে সেগুলি কেবল অনুরাগী, জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু ভক্তের অগ্রগতির জন্য। গুরুর বিভাগ নেই, তবুও বিভাগ তৈরি হয়েছে শিষ্যের অবলম্বনের জন্য। ব্যষ্টিচৈতন্য যেন স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যেতে পারে তারই জন্য এই আয়োজন।

নিজের মধ্যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আবৃত আছেন। আবরণ ভেদ করার জন্য যা প্রয়োজন তা গুরু ধরিয়ে দেন।

'চৈতন্য' শব্দের শক্তি আসে গুরুর কাছ থেকে। এই তত্ত্ব বড় গোপনীয়। চৈতন্যশব্দ সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মতম অবস্থায় নিয়ে যায় এবং পরিশেষে বৈচিত্র্যের মূলে বা সৃষ্টির মূলে বা দ্বৈতের মূলে পৌঁছে দেয়। অথবা বলা যায় হৃদয়ের দরজা খুলে অন্তরের অন্তরে স্বস্থ করে ছেড়ে দেয়। আর শব্দাতীত অবস্থা? তা কল্পনায় আনা যায় না। যদি সদ্‌গুরুর নির্দেশ মতো চলা যায় তবে সদ্‌গুরু ধাপে ধাপে তুলে দেন শিষ্যকে, এবং তার পক্ষেই শুধু সদ্‌গুরুর মহিমা বোঝা সম্ভবপর হয়।

গুরুকে সরিয়ে যারা তাঁর স্থান নিতে চায় তারা অভিমানী এবং সেই জন্য তারা পদে পদে মার খায়। গুরু হলেন প্রত্যেকের নিজেরই বৃহত্তর আশ্রয় ও অভয় স্থান, যদিও ব্যক্তিরূপে তাঁকে কিছুকাল পাওয়া যায়। কিন্তু

১। অ-মন—অখণ্ড মন। মন যখন বোধসাগরে মিশে গিয়ে বোধে বোধময় হয় তখনই তা অ-মন হয়।

২। তপস্যা—অভিনব সংজ্ঞা।

এটাই গুরুর আসল রূপ নয়। ব্যক্তিরূপে ব্যক্তির কাছে আসতে হয়। তারপর গুরু নৈর্ব্যক্তিক অবস্থায় নিয়ে যান। তাঁর আসল পরিচয় বিশুদ্ধ চৈতন্য, ব্যক্তিরূপ হল তার আভাস। আভাসচৈতন্যকে অতিক্রম করে যাওয়া গুরুকৃপা ছাড়া সম্ভবপর হয় না। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে পূর্ণতা লাভের জন্য একান্ত ভাবে গুরুকৃপার উপরে নির্ভর করতে হয়।

এই গুরু দেশ-কাল, কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে। গুরু আছেন নিজের শ্বাসে শ্বাসে ও পাশে পাশে। নিজের অঙ্গে গুরুর সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ। নিজের মনে গুরুর মনে নিত্যকাল বেঁচে আছি গুরুর জন্য। ভবে আসা কিসের জন্য? গুরুর সঙ্গে মিলনের জন্য। গুরুপ্রীতি হল আত্মপ্রীতি বা ঈশ্বরপ্রীতি। এই প্রীতিলাভের জন্যই মানুষের দেহধারণ। নতুবা বিলাসের মধ্যে ডুবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে যেতে হয়। মনুষ্যদেহ পেয়ে যদি গুরুভজন বা আত্মভজন না-করে জড়ের ভজন করে, তবে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রেই ঘুরতে হয়। এই কথাগুলি যেন রক্ষিত হয় তার জন্য তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

সৎসঙ্গে হয় রজ-তমোগুণের মল অপসারণের আয়োজন। তাঁরই কৃপায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ আসে। যতটা সম্ভব তার সদ্‌ব্যবহার করতে হয়। তাহলে গুরুই রক্ষা করে এগিয়ে নিয়ে যান। বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও সৎ-এর মর্যাদা যেন দেওয়া হয়। সৎসঙ্গের কথাগুলি যথাযথ ব্যবহার হলে গুরুই এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করেন। যে আমির বা গুরুর ভজন করে তার আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। গুরু বলতে যেন একটা limited form না-আসে—সেদিকে সচেতন থাকবে। [১৭।১০।৭৮]

গুরুতত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দেবার কারণ

ইদানীং গুরুতত্ত্বের উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কারণ অন্যান্য তত্ত্ব গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা মুস্কিল; যদিও সব মতবাদের গুরুত্ব একই। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবার সময় মানুষের কী ভাবে অবলম্বনকে ধরা উচিত সেই বিষয়ে গুরুবাদে ভাল করে বলা আছে। সেই জন্য শুধু ব্যবহারের সুবিধার জন্য এই তত্ত্বকে সামনে রাখা হল। ভাব হিসাবে এক একটি তত্ত্ব এক একজনের পক্ষে সুবিধা হয় বেশি। সুতরাং বিশেষ একটি মাত্র তত্ত্বকে রাখলে একঘেয়েমি আসে এবং উন্নতি করা কঠিন হয়।

বেদান্তের মহাবাক্যেও চার রকম ভাবে বলা আছে। তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন যে একই তত্ত্বকে ঘুরিয়ে না-দিলে ব্যবহার করা কঠিন হয়। চারটি মহাবাক্য হল—(১) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", (২) "অহং ব্রহ্মাস্মি", (৩) "তত্ত্বমসি" এবং (৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। চতুর্বেদে সেই হিসাবে অনুশাসন করা হয়েছে।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক হলেও পদ্ধতি বা ভঙ্গিমা এক নয়। সেই রকম ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর ও গুরু বলে একই তত্ত্বকে চার রকম ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

সত্য যুগে ব্রহ্মবোধে ভজন করা হয়েছে; ক্রমশ আত্মা ও ঈশ্বরবোধে নিয়ে আসা হয়েছে। নিজের মধ্যে নিজের বোধকে অবলম্বন করা হয়েছে; কারণ ব্রহ্মবোধ আরও ব্যাপক।

সব কিছুর মধ্যে আমি হল বিশুদ্ধ চৈতন্য। সেই চৈতন্যকে 'গুরু' বলে ভজন করা হয়। গুরুস্তবে আছে—

"চৈতন্যং শাশ্বতং শান্ত ব্যোমাতীতোং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীততস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

অর্থাৎ গুরু হলেন চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত শান্ত ব্যোমাতীত নিরঞ্জন এবং নাদবিন্দুকলারও অতীত। সেই গুরুদেবকে আমি প্রণাম জানাই। আকাশ হল সর্বব্যাপী, তার থেকেও ঊর্ধ্বে হলেন এই চৈতন্যস্বরূপ গুরু। আকাশকেও জড় বলা হয়; তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম হল প্রত্যেকের সত্যস্বরূপ। মনকে শোধন করাই হল সাধনার উদ্দেশ্য। নিরন্তর শুদ্ধবোধের কথা ভাবতে ভাবতে মন শুদ্ধবোধের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য

প্রতিমুহূর্তে যে যে-রকম অবস্থাতেই থাকুক সবটা তাঁরই (চৈতন্যের) প্রকাশ। তা অনুমান নয়, অনুভূতি। তিনিই প্রত্যেকের পরিপূর্ণ সত্তা। সত্য স্বরূপত এক ছিল, আছে ও থাকবে। ভাগ সৃষ্টি হয় মনোবিলাসে। এক আমিই সকলের মধ্যে আছে। তা ব্যক্তির আমি নয়। ব্যক্তি চৈতন্যে লীন হয়ে যায়। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—'প্রাণের মধ্যে ক্রিয়ারূপে, মনের মধ্যে ভাবরূপে, বুদ্ধির মধ্যে চিন্তারূপে, প্রকৃতির মধ্যে কর্মরূপে আমি আছি।' গুণের প্রভাবেই এক-কে বহু দেখায়। মিথ্যা কল্পনা করে প্রকৃতি। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যেতে হলে বিশুদ্ধবোধের কথা চিন্তা করতে হয়।

মন যদি বোধের ভজন করে তবে মন বোধে মিশে যায়। শুদ্ধবোধে মন লীন হয়।

সর্ববোধের মূলে এক 'আমি' এবং এক 'আমি'-র মূলে সর্ববোধ

সব কিছুকে কী করে গুরুবোধে বা দিব্যবোধে দেখতে হয় তা গুরুই শিখিয়ে দেন। এ হল সদ্‌গুরুর বৃহত্তম কৃপা। ধাপে ধাপে দেহ-মন-প্রাণ শোধন করে জ্ঞানযোগে পৌঁছানো এ যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সবগুলি যোগের মিলিত রূপ হল 'পরমার্থযোগ' বা 'গুরুযোগ'। আপন আপন গুরুর মধ্যে আছেন সব গুরু। সেই গুরু আছেন নিজের মধ্যে। 'আমি'-র মধ্যে কী ভাবে সব আছে তা দেখা হল নিত্যলীলা বিহার[১]। নিত্যলীলা নিজের হৃদয়ে অনুভব করার চেষ্টা করতে হয়। যখন কোনও জড় বা বিকার আসে তখন তাকে চৈতন্য বলে ধরতে হয়। কোনও রূপ, নাম, ভাবই চৈতন্য ছাড়া নয়। চৈতন্যকে অবলম্বন করে চলা হল সর্বোত্তম অবলম্বন। [২২।১০।৭৮]

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধন হল গুরুভজন

বর্তমান যুগের যে প্রভাব তা মানুষের বিচারে হয়ত খুব খারাপ, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে খারাপ নয়। কারণ ঈশ্বরীয় দৃষ্টিতে সব কিছুই ঈশ্বর। এই সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন ঈশ্বরই স্বয়ং। তিনি মানবীয় বেশে বা সাধু বেশে বা মহাত্মার বেশে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেন। দেশ-কালের, কার্য-কারণের বা যুগের কোনও প্রভাব ঈশ্বরের মহিমাকে খর্ব করতে পারে না। যদিও এগুলিও ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এত বড় সত্যকে জীবের কাছে প্রকাশ করে, তা ধরিয়ে দিতে পারেন একমাত্র সদ্‌গুরু স্বয়ং। তাই গুরুভজন হল শ্রেষ্ঠ ভজন। এ ছাড়া শাস্ত্রপাঠ আলোচনা প্রভৃতি কোনও কাজে লাগে না।

বর্তমান প্যারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শারীরিক ও মানসিক বিকারের জন্য জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা করাও কঠিন। এ যুগের একমাত্র সার কথা হল 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'। এ ছাড়া মানুষ কোথায় কোন দেবতাকে খুঁজে পাবে? সদ্‌গুরু মানবীয় বেশে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দুর করেন। অজ্ঞান-অন্ধকার ও বিকারের মলকে সরিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন।

সদ্‌গুরুর কৃপা প্রথমে ধরা পড়ে না। গুরুকৃপায় পরে জ্ঞানের বিচার, ন্যায়ের বিচার, সদসৎ বিচার প্রভৃতি আসে এবং কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। সবশেষে অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় ও সত্য উপলব্ধি করে।

গুরুবেশে ভগবানই কৃপা করেন। এ যুগের মানুষের আয়ু, শক্তি সবই কম—এর মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনস্বরূপ উপলব্ধি করা বা মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করা সম্ভবপর নয়। পরমাত্মার কৃপাতে

১। নিত্যলীলা বিহার—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

যিনি সবার অন্তরে বসে আছেন তিনি গুরুবেশে এসে হৃদয়দুয়ার খুলে দেন এবং অন্তরে প্রবেশ করার আহ্বান জানান। এ-ই হল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাক, শ্রীরামচন্দ্রের ডাক। এর-ই মধ্যে লুকিয়ে আছে গুরুবাণী।

গুরু হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি আহ্বান করেন তাঁরই প্রকাশকে— যে প্রকাশকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মনোবিলাসে মানসক্ষেত্রে। গুরু তাই আশ্বাস দিয়ে বলেন—"তোরা আমাকে একটু মনে রাখিস; আমি তোদের অন্তরে সব প্রকাশ করে দেব। সেই আমির কথা ভাবিস যে আমির সঙ্গে তোদের আমি মিলতে পারে।" প্রত্যেকের আমি সেই পরম আমির সঙ্গে সহজে মিলতে পারে, কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধি পারে না।

প্রত্যেকের আমি যে তাঁর—এটুকু মনে রাখতেও যদি কেউ না-পারে, সে যথাসাধ্য সৎসঙ্গ করবে। কোনও মতপথের, যোগ্যতার বা সামর্থ্যের কথা বিচার না-করে সৎসঙ্গ করতে হয়। সৎসঙ্গের প্রভাবে তার মধ্যে যতই অসৎ বৃত্তি থাকুক তাতে সৎ বৃত্তি ঢুকে যায়। এই হল সদ্গুরুর মহিমা।

গুরুকে বা ভগবানকে মাপা যায় না বা ধরা যায় না। গুরু কিছু চান না। তিনি হলেন অখণ্ড ও পূর্ণ। তিনি ছোট-বড় সকলের মধ্যে আছেন। ভক্ত কী পারে বা কী পারে না সে বিচার তিনি করেন না। কারণ আমির সঙ্গে আমির সম্বন্ধ নিত্য অদ্বৈত। ব্রহ্ম কখনও বিভক্ত হয় না। গুরুকে বিস্মৃত হলেও গুরু একটুখানি খোঁচা দিয়ে অজ্ঞানের আবরণ সরিয়ে দেন।

গুরুবাণীর উপরে আর কোনও বাণী বা শাস্ত্র নেই। সব শাস্ত্র, দেবদেবী তাঁর অঙ্গ। গুরু তুষ্ট হলে সব পূর্ণ হয়, নইলে পূর্ণতা কেউ দিতে পারে না। জীবনের মহিমা, শাস্ত্রের, স্বভাবের, স্ববোধের ও আত্মার মহিমা গুরু প্রকাশ করে দেন। গুরু বড় রহস্যময়। পরমাত্মা হয়েও জীবরূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। আবার জীব হয়েও তিনি জীব নন—পোড়া দড়ির মতো থাকেন।

ভগবানের কখনও কারও প্রতি বিরুদ্ধভাব থাকে না; যদিও শাস্ত্রে, পুরাণে বিরুদ্ধভাবের কথা বা বিরোধিতার কথা বলা আছে। এর দ্বারা ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। জগৎকে মিথ্যা বললে জগতে সত্যের culture করা বৃথা হয়। জানতে গিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে যায়, পরে আর এক করা যায় না। এটাই মিথ্যা। এক করার formula গুরুর কাছে মেলে। তিনি বহু হয়েও এক। তাই সকলের মধ্যে এক গুরুই আছেন।

শাস্ত্র সহজে বোঝা যায়; কিন্তু যদি অনুভূতি লাভের পূর্বেই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তার ফলে তা দুর্বোধ্য হয়। তিনি যখন বেদরূপে নেমে আসেন কারও মধ্যে তখনই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা যায়। যতক্ষণ পৃথক আমি কর্তা থাকে, ততক্ষণ তিনি বহু দূরে থাকেন। এক হয়ে গেলে অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পায়। গুরুর নির্দেশ মেনে চললে এক হওয়া যায়।

প্রত্যেক আধার[১] গুরুর নিজের আধার। প্রত্যেকের মধ্যে বসে তিনি আধারকে ব্যবহার করেন। যে যা নির্দেশ পায় তা অন্যের সঙ্গে ভাল-মন্দ তুলনা না-করে পালন করে যেতে হয়। একটি গানে একসময় ব্যক্ত হয়েছিল 'জীবন আমার যন্ত্র তোমার, তোমার লীলা মাধ্যম'। তুমি আমাকে এত ভালবাস, তাইতো মাধ্যম বানিয়েছ। আমি আমার জন্য নই। আমি আমাকে আগে-পরে জানি না। আগে-পরে তোমাকে মানলে জানা হয়ে যায়। সাধনা হল শুধু মানা[২]।

১। আধার—'আ' মানে আনন্দ। আনন্দকে যে ধারণ করতে পারে তাকে আধার বলা হয়েছে। আনন্দ বলতে এখানে পরমানন্দকে বলা হয়েছে।

২। মানা—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

'মেনে, মানিয়ে চলা' গুরুর দেওয়া শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান

তাঁকে 'মেনে, মানিয়ে চলা' হল সাধনার সার কথা। সন্তান যেমন বাবা-মাকে জানতে পারে না সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ গুরুকেও জানা যায় না। মানলে তার প্রয়োজনীয় বস্তু মেলে এবং জ্ঞাতসারে কৃতজ্ঞতা বোধ জাগে। নইলে অকৃতজ্ঞতাবোধ দুঃখ, কষ্ট ও ব্যাধি বিকাররূপে আসে।

বর্তমানে মানার শিক্ষা নেই। গুরুর কাছে পাওয়া যায় মানার শিক্ষা—how to adjust, adopt and accommodate। গুরু বলেন 'আমি ছিলাম, আছি এবং থাকব। সর্ব দেশ-কাল, রূপ-নাম-ভাব আমার প্রকাশ। কাল আমাকে নাশ করতে পারে না। আমি স্বয়ংপ্রকাশ। এগুলি আমার অন্তর্গত প্রকাশেরও প্রকাশ। আমি কারণের কারণ নিত্যকারণ।' তাই গুরুভজনে সর্বনামের ভজন করার কথা বলা হয়।

মায়ের মুণ্ডমালার তাৎপর্য

মায়ের মুণ্ডমালায় রয়েছে সর্ববর্ণের বীজ। সর্বনামের গাঁথা মালা আছে তাঁর কণ্ঠে। গুরু যখন সন্তানকে সেই মালা পরিয়ে দেন তখন সে গুরু হয়। এই অপূর্ব মহিমা তাঁর কৃপা ছাড়া হৃদয়ঙ্গম হয় না। এযুগের মহাবাণী হল—'গুরু কৃপাহি কেবলম্'।

প্রশ্ন হল যে কী করে কৃপা পাওয়া যায়? কৃপার মধ্যে চতুর্বিধ স্তর আছে, যথা— দেহ-মন-প্রাণ-বোধ; অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান; স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-মহাকারণ; কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-সত্য; শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস।

গুরুর তপস্যা ও ভক্তের তপস্যা মিলে ফুটে ওঠে স্বানুভূতি

মানা কী ভাবে হয় তা গুরুই ধরিয়ে দেন। গুরু বলেন—'ব্যষ্টি, সমষ্টি ও অখণ্ড রূপে আমিই আছি। সর্বনাম প্রণবে পরিণত হয়। প্রণব খেলছে পরাক্ষেত্রে বা আমির বক্ষে। বিশ্বের কারণ-কার্য সবই আমি'।

উপরোক্ত যে কোনও একটি formula পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে গুরুবাণীর মধ্যে বিশদ্ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যে কোনও একটি formula অবলম্বন করে গুরু ব্যক্ত জীবজগতের অনুভূতিকে পরমাত্মানুভূতির স্তরে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, তাঁর অখণ্ড আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে। গুরুর তপোধারার সঙ্গে শরণাগত ভক্তের তপোধারা সংযুক্ত হয়ে শুদ্ধ, মুক্ত, পূর্ণ, অখণ্ড ও 'নিত্যাদ্বৈত' বোধসত্তায় মিশে একাকার হয়ে যায়। ফুটে ওঠে স্বানুভূতি।

ভাবের অভিব্যক্তির ক্রম

জীবের মধ্যে জীবভাব ছাড়া আরও তিনটি ভাব সুপ্ত আছে— দেবভাব, ঈশ্বরীয় ভাব ও পরমেশ্বরীয় ভাব। দেবভাব হল সমষ্টি সূক্ষ্মভাব, ঈশ্বরীয় ভাব হল সমষ্টি সূক্ষ্মতর এবং পরমেশ্বরীয় ভাব হল সমষ্টি সূক্ষ্মতম ভাব। এগুলি অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশের সিঁড়ি। এগুলি যাঁরা বেঁধে দেন তাঁরা হলেন ঋষি। এগুলি হল মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে, অজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানে যাবার সিঁড়ি। যে গুরু সমস্ত তত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে অনুভব করেন তিনি সেই পরমতত্ত্বের অধিকারী পুরুষ। তাঁর কাছ থেকেই জিজ্ঞাসু সাধক যোগ্যতা অনুসারে আত্মবিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞানী গুরুকেই সদ্‌গুরু বলা হয়। যদিও সদ্‌গুরু কথাটি খুবই প্রচলিত তথাপি এর সদর্থ বা তাৎপর্য বিশেষ অধিকারী ছাড়া অপরের কাছে সুবোধ্য নয়। সদ্‌গুরুর কাছে যা আসে তা তিনি স্বানুভূতির রসে জারিত করে আপনার পরমস্বরূপে মিলিয়ে নেন। পরমস্বরূপটি হল আনন্দঘন সর্বাধার। আধার অর্থে এখানে বলা হয়েছে—আনন্দকে ধারণ করতে পারে যে। আনন্দকে ধারণ করে যোগী, ভক্ত, শ্রদ্ধাবান প্রিয় ও অনুগত চিত্ত।

সম্বন্ধের ক্রম ধরে ভাবের উত্তরণ

প্রিয়তমের সঙ্গে হয় প্রিয়তরের সম্বন্ধ। দেহের সঙ্গে আছে প্রাণের সম্বন্ধ। কাজেই প্রাণকে বাদ দিয়ে দেহ হয় না। প্রাণের সঙ্গে আছে মনের সম্বন্ধ। দেহবোধকে অতিক্রম করতে হয় প্রাণের সাহায্যে। প্রাণের স্তর থেকে উঠতে হয় মনের সাহায্যে এবং মনের স্তর থেকে উঠতে হয় বোধের সাহায্যে। গুরু এই ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন স্তরের পর স্তর এবং তা মেলে ধরেন তাঁর প্রকাশরূপ সন্তানের কাছে।

অজ্ঞান ছাড়া প্রজ্ঞানের প্রকাশ হতে পারে না। অবতারলীলায় ভগবানকেও দেহধারণ করে আসতে হয়। দেহধারণ করলে প্রকৃতি তাঁকেও ছাড়ে না। দেহের ধর্ম ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ তাঁরও থাকে। ভগবানই এসে আবার তুলে নিয়ে যান। বোধ দিয়ে এমন ভাবে সাজিয়ে দেন যে দেহ, মন, প্রাণ আর দেহ, মন, প্রাণ নয়; অখণ্ড বোধে বোধময় হয়ে যায় সব। আমি, তুমি পৃথক পৃথক বোধ ছাড়া যে, সে-ই লীলায়িত হয়। তা যখন গুরু দেখিয়ে দেন তখনই হৃত বস্তু উদ্ধার হয় হৃদয়ে। হৃত মানে হারিয়ে গেছে যে বস্তু তা হৃদয়ে জাগিয়ে দেয়। 'কোঽহম্' নিয়ে যে প্রশ্ন এসেছিল তার উত্তর শুধু অনুভবস্বরূপ। আমি, তুমি নেই সেখানে।

তন্ময়চিত্তে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গান গাইলেন—

নমো নমো নমঃ পরমেষ্ঠিগুরু মম সচ্চিদানন্দ গুরু ভগবান
আদি ও অনাদি গুরু পরমদেবতা করুণাসাগর গুরু ভক্তি মুক্তিদাতা
ভূমা সুখ শান্তি গুরু অমৃতনিধান সচ্চিদানন্দ গুরু ভগবান॥

(স্বানুভবসুধা ২য় খণ্ড, গুরুতত্ত্ব, গান নং ১৯)

গানের শেষে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভাবাবেশে কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে। সহসা দেহে একটু কম্পন হল। মুহূর্ত কয়েক পরে সকলের প্রতি করুণাঘন দৃষ্টি মেলে তিনি বললেন—

শনৈঃ শনৈঃ গুরু তুলে নেন। গুরুর স্মরণ যে করে যমদূত তাকে নিতে পারে না, মৃত্যুকেও অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

মানার মাধ্যমে মায়াই হয় মা

জীবনের একমাত্র গতি 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'। তাঁর কৃপায় জড় বলে আর কিছু থাকে না, সর্বসমাধান মেলে। আপন আপন গুরুকে 'মেনে, মানিয়ে চলা' হল গুরুভজন করা। গুরু হলেন অখণ্ড এক। অজ্ঞান দিয়ে গুরুভজন হয় না। ষোলো আনা মন দিতে হবে। দুই এক আনায় হয় না। তাঁকে মানা হলে মায়া থাকে না, তখন হয় মা, যিনি প্রতিমুহূর্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও লয় করেন। [৫।১১।৭৮]

দীক্ষা প্রসঙ্গে

জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

'স্ববোধে স্ববক্ষে গুরু নিত্য করেন বিহার/স্ববোধ প্রেমবিগ্রহ তাঁর লীলা অবতার।' সেই ভগবান গুরুর মধ্যে আমি-তুমি নেই। তাহলে তিনি কী করে দীক্ষা দেবেন? যার জন্য 'এখানে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) দীক্ষার ব্যবস্থা নেই। সে নিজে খেলছে নিজের বক্ষে, আপনাতে আপনি। 'আমির মধ্যে আমি' এবং 'আমার ছাড়া আমি' এই দু'টি আমির কথা বলা হয়। বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শুধু অনুভবসিদ্ধগণ বলতে পারেন।

গুরুই সবার মধ্যে বসে শ্রবণ করেন, কিন্তু মন তাঁর নাগাল পায় না। কী মজায় আছেন আত্মারাম গুরু! তিনি সব দেখেও দেখেন না আবার না-দেখেও সব দেখেন। সব জেনেও জানেন না, আবার না-জেনেও সব জানেন। না সেখানে না-ও নয় বা হ্যাঁ-ও নয়; তাহলে কী? শিষ্যের এটা কী, ওটা কী, এই সব প্রশ্নের উত্তর

না-দিয়ে, প্রশ্ন বন্ধ করে দিয়ে নিয়ে যান আরও গভীরে। সেখানে দুনিয়ার কিছু থাকে না। থাকে শুধু দু'টি প্রশ্ন—গুরু কে এবং আমি কে?

চরম মীমাংসার জন্য গুরু ও শিষ্য এই ভাবে মুখোমুখি বসেন। এ বড় দুর্লভ দৃশ্য। ঠিক সেই মুহূর্তে 'তুমি' 'আমি'-তে মিশে যায়। অব্যক্ত বিরাজ করে। তখনই ঋষি যে সিঁড়ি তৈরি করেন তার শেষ ধাপে উঠে যায়। আর ধাপ নেই। ঋষিকে সব ধাপগুলি (all positive and all negative) দেখিয়ে দিতে হয়। নইলে ঋষি হওয়া যায় না। অজ্ঞানের চরম স্তর থেকে আরম্ভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত স্তর দেখতে হয়।

গুরু কিছু দেন না বা নেন না। যেমন ছিলেন তেমনই থাকেন; শুধু প্রকাশ হয়ে পড়েন। যে কথাগুলি এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে—এও তাঁরই প্রকাশ। আমিও নই, তুমিও নও—সর্বাতীত আমি, বড় দুর্বোধ্য। গুরুর প্রথম প্রকাশ—সর্বকর্মের মধ্যে বসে আছি সচ্চিদানন্দ আমি। যখন আমি তুমির মধ্যে ঢুকে যায় তখন গুরু বলেন—আমি কারও গুরু নই। 'পরমাত্মার শেষ নির্দেশ—সে কাউকে নির্দেশ করে না'। গুরু-শিষ্য ভাগ হয়ে যায় মনের স্তরে বা খেলাতে বা দ্বৈতরাজ্যে। দ্বৈতরাজ্যে আরম্ভ হয় খেলা। তা সমান সমান (draw) হলে আরম্ভ হয় নিত্যলীলা। আগে নিত্যের ঘরে যেতে হয়। সে সগুণও নয়, নির্গুণও নয়।

সত্য বা ভগবান বা গুরু যখন এক, তাঁর মধ্যে দুই নেই; তখন তিনি নিজেকে ছাড়া আর কাকে বলবেন? নিজেকেই বলেন। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে প্রেম হয় না।

গুরুকে দেশ-কাল, কার্য-কারণের সীমার মধ্যে আনা যায় না। যদিও তিনি আপনার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কত দেশ-কাল, কার্য-কারণ সৃষ্টি করেন! আসল কথা তাঁর রূপ নেই। সব রূপ তাঁর বক্ষে খেলে বলে সব রূপই গুরুর রূপ। গুরুর মধ্যে রূপ, নাম, ভাব ও বোধের চারটি স্তর আছে। গুরুর মধ্যে সব আছে। শুধু তাঁর মধ্যে তাঁরই লীলা হয়ে চলেছে।

গুরুভজনে প্রতিদিন, প্রতি ক্রিয়ায়, প্রতি শ্বাসে যা প্রকাশ হয় তাকে গুরুবোধে নিতে হয়। সেই জন্য গুরুকে সর্বদেবময় বলা হয়। শাস্ত্র পাঠ করেও সব সমাধান হয় না। তাই গুরুর প্রয়োজন হয় সব সমাধানের জন্য।

ষোলো আনা মানা হলে ষোলো আনা গুরুভজন হয়। গুরু শিষ্যকে দিয়ে দেন তাঁর পূর্ণতাকে। তার পরিবর্তে শিষ্য দেয় তার সামান্যতাকে। 'গুরুবাণী শুনে শুনে গুরুসেবা করলে তবেই হয় গোপীমন'। সবচেয়ে সহজ হল গুরুসেবা করা। অন্য দেবতার পূজায় ত্রুটি হলে দেবতা রাগ করেন, তার জন্য কয়েক জন্ম ভুগতে হয় বা ধ্বংস হয়। কিন্তু গুরু কখনও ধ্বংস করেন না। তিনি ধ্বংস করেন অহংকার, বিকার, অস্মিতা ও মলিনতাকে।

গুরুভজনের মহিমা

গুরুভজনের মজা হল—স্বল্প দিয়ে ভূমাকে পাওয়া যায়। জীবভাব দিয়ে শিবভাব পাওয়া যায়। যা দেখা যায়, চিন্তা করা যায়, সবের মধ্যে গুরুকে বসালে দিন কয়েক পর দেখা যাবে যে গুরু সব কুপ্রবৃত্তি সরিয়ে নিয়েছেন। কুবৃত্তি আর উঠবে না। যত বোধ সব গুরুবোধে গ্রহণ কর, তাহলে হবে সমবোধে সমরস আস্বাদন। ফলে জীবন হবে মধুর, মধুরতর, মধুরতম। হারাতে হয় অভিমান-অহংকার, যা পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। 'আমার আমি'-কে রক্ষা করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। [৭।১১।৭৮]

বোধস্বরূপ গুরুর মধ্যে সর্বব্যষ্টিভাবই লীন হয়ে যায়

ব্যষ্টি ভাব হল 'আমার আমার'-রূপ বৃত্তির প্রকাশ। তা গুরুই কেবল সরিয়ে দিতে পারেন। গুরু অনুভূতির জ্যোতিতে তা বিদূরিত করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে গুরুভাবের উপরে কেন এত জোর দেওয়া হচ্ছে? গুরুভাব তো আবহমানকাল থেকেই আছে। তার উত্তরে বলা চলে যে এখানে গতানুগতিক গুরুভাবের কথা বলা হচ্ছে না। ইতিপূর্বে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের গুরুমূর্তির কথা বলা হয়েছিল। এগুলি কিন্তু conventional ভাবে বলা হয়নি অর্থাৎ একেবারেই unconventionally বলা হয়েছে—সেখানে মতপথ নেই অথচ সমগ্রতা আছে।

গুরুভজনের মধ্য দিয়ে জীবভাব শোধিত হয়ে পরমতত্ত্বের অনুভূতি সম্ভব হয়

মানুষ সুখ চায় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে। বিষয়শূন্য সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা পরমসত্য বা পরমতত্ত্ব জীবভাব দিয়ে সাধনা করা সম্ভবপর নয়। গুরুভজনের দ্বারা সগুণ ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হলে পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিচয় জানা সম্ভবপর হয়। কারণ তখন জাগতিক মোহাকর্ষণের প্রভাব আর কিছু থাকে না। যেমন শৈশবের খেলার আকর্ষণ যৌবনে থাকে না। সেইরূপ জীবভাব ঈশ্বরীয় ভাবের সঙ্গে যুক্ত হলে ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম বা জাগতিক কোনও প্রতিষ্ঠায় বা কোনও কিছুতে তার পূর্বের মতো আসক্তি থাকে না।

দ্বৈতবোধেই কৃতজ্ঞতাবোধ অদ্বৈতবোধে তার অভাব

জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানযোগীদের অজ্ঞানীর প্রতি করুণা ও সহানুভূতি থাকে। এই ভাব হল গুরুভাব। গুরুর কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি হলেন জ্ঞানস্বরূপ। তিনি জ্ঞান দিতে পারেন। ফলে যাকে তিনি জ্ঞান দেন তার অজ্ঞান সরে যায় এবং গুরুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বাতীত স্তরে সে উপনীত হয় ততক্ষণ এই কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে। তারপর তুরীয় বা তুরীয়াতীত অবস্থায় কৃতজ্ঞতাবোধের প্রশ্নই ওঠে না—কারণ সেখানে সব একাকার অবস্থা। কে কাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে? সেই জন্য জীবন্মুক্তের ভজনের বা প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না।

মানার মাধ্যমে গুরুকৃপা হয়, জ্ঞান লাভ হয়

গুরু ছাড়া জ্ঞান হয় না, গুরুকে না-মানলে জ্ঞান মেলে না। গুরুকৃপা ছাড়া কোনও দেবতার কৃপা পাওয়া যায় না। গুরু কৃপা করলে তিন দেবতা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কৃপা করেন। মানবকল্যাণের জন্য মহাত্মাগণ নিজেরা আচরণ করে এই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেন। এর সঙ্গে যত বেশি পরিচয় হয় ততই কল্যাণ হয়।

স্বল্পে বিকার ও মৃত্যু; ভূমা নিত্য, নির্বিকার, অমৃত ও আনন্দ

সংসার ছোট নয়। যদি ঈশ্বরের কর্মরূপে সংসারের সব কর্মকে ধরা যায় তাহলে প্রত্যেক কর্মচিন্তা সমানে এসে যায়। সমানে এসে গেলে মৃত্যুকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায় এবং মৃত্যুতে দুঃখ হয় না। স্বল্পে মৃত্যু। মৃত্যু মানে বিকার। ভূমাতে বিকার নেই। বিকারের ভূমি থেকে ভূমাতে পৌঁছতে হবে।

অন্যান্য ভাবনায় অমিল থাকলেও বোধের ভাবনায় মিল থাকে

কারও ভাবনার সঙ্গে কারও ভাবনা মেলে না। তবে অন্যান্য ভাবনায় অমিল থাকলেও বোধের ভাবনায় মিল থাকে। অখণ্ড একবোধের ভাবনা করলেই শুধু সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান হয়।

গুরুবাণীর বৈশিষ্ট্য

গুরুবাণী নির্দেশ করে—'সব কিছুর মধ্যে আমিকে বসাও, আমির মধ্যে সব, আমির দ্বারা সব, আমির জন্য সব, আমি হতে সব।' এই আমিকে ভজন কর। তবে যাঁর মাধ্যমে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায় তিনিই একমাত্র

ভগবান এই ভাবে ধরলে সসীম হয়ে যায়। 'আমি' হল principle বা বৈচিত্র্যের মূল উপাদান। যেমন সোনার গহনার মধ্যে সোনাই মূল উপাদান।

গুরুই কেবল পারেন বিপদ থেকে সম্পদে নিয়ে যেতে। গুরু অনুভূতি দিয়ে অনুমানকে কেড়ে নেন। সাধনার লক্ষ্য দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব যেন না-হয়। সমত্ব যেন লক্ষ্য হয়, যে সমত্বের ভজন দেবতা, ঈশ্বর সবাই করেন।

জীবভাব বিনাশী, জীবাত্মা অবিনাশী

কলি যুগ হল সংসারের যুগ। এই যুগে থাকে কেবল দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ। সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য গুরু অধ্যাত্মবিজ্ঞান ধরিয়ে মনকে শুদ্ধ করে সমানে নিয়ে আসেন। ভাবগুলি শুদ্ধ করে এগিয়ে গেলে অখণ্ড সম্পদ অনুভব করা যায়। জীবভাবের নাশ আছে, জীবাত্মার নাশ নেই।

ভয় ভাবনা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় হল অখণ্ড ভূমার ভাবনা করা। অখণ্ড ভূমা মানে গুরু। গুরু কে? অধঃ, উর্ধ্বে, মধ্যে, শূন্যে গগনাকার, নির্বিকার, নিরাকার, নির্মল, নিষ্কল, নিরবলম্ব, নিরঞ্জন।

দ্বৈতবোধ অবলম্বনযুক্ত বলে বিকারী; অদ্বয়বোধ নিরবলম্ব ও নির্বিকার

গুরুভজন করতে করতে অবলম্বনশূন্য হতে হয়। অখণ্ড শান্তি আনন্দ পেলে নাম-রূপের স্মৃতি আর থাকে না। গাঢ় নিদ্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অখণ্ড শান্তি আনন্দ থাকে কিন্তু তা পাকাভূমি নয়। পাকাভূমিতে গুরু হাত ধরে নিয়ে যান। ভোগের দিকে যে মন থাকে সেই মনকে বা কামনাকে[১] গুরু কালীমনা করে দেন। অর্থাৎ কালের বা কর্মের বীজকে নাশ করে নাম-রূপের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেন।

সচ্চিদানন্দ গুরুকৃপায় ব্রাহ্মীস্থিতি স্বানুভূতি সিদ্ধ হয়

সচ্চিদানন্দঘন গুরুর কাজ হল জীবকে অসৎ থেকে সৎ-এ, অচিৎ থেকে চিৎ-এ, নিরানন্দ থেকে আনন্দে নিয়ে আসা। সবই আনন্দে মিশে আনন্দময় একাকার হয়ে গেলে হয় প্রেম[২]। এই প্রেম জীবভাব দিয়ে ধারণা করা যায় না, অসমানে থেকে তা উপলব্ধি হয় না। সমানে এলে তবেই হয় স্বানুভূতি। সেখানে শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির বিকৃতি নেই; আছে নিত্যস্থিতি। তারই পরিচয় হল প্রজ্ঞাজ্যোতি, ধ্রুবাস্মৃতি, ব্রাহ্মীস্থিতি।

ব্যষ্টিবোধে অকৃতজ্ঞ সমষ্টিবোধে কৃতজ্ঞ

যতক্ষণ জীবভাব আছে ততক্ষণ দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি দিয়ে সে তার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সমষ্টির প্রয়োজন সমষ্টি মিটিয়ে দেয়; কিন্তু ব্যষ্টি জীব কৃতজ্ঞ থাকে না বলে আবার নেমে আসে। ব্যষ্টি ভাব থেকে সমষ্টি ভাবে যেতে হলে প্রতি পদে পদে কৃতজ্ঞতাবোধ রাখতে হবে। এই হল প্রকৃত গুরুসেবা। গুরুকে পূজা করতে হলে বিশুদ্ধ চৈতন্যের পূজা (নিজের 'আমির আমি[৩]'-কে পূজা) করতে হবে; গুরুকে ব্যক্তিবোধে ধরলে ভুল হয় এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

১। স্বানুভূতির ভাষায়।

২। প্রেম—স্বানুভূতির ভাষায়।

৩। 'আমির আমি' হল—অখণ্ড ভূমা এক আমিসত্তা হল সমগ্র ব্যষ্টি আমি বা কাঁচা-আমি বা অহংকারের আমির এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল উপাদান। যেমন সর্বপ্রকার সোনার গহনার মূল উপাদান শুধু সোনাই। এই অখণ্ড ভূমা আমিসত্তার বক্ষেই সমগ্র প্রকাশবৈচিত্র্য ভাসমান।

গুরুকৃপায় ঈশ্বরলাভ হয়

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—তুমি যদি কৃপা না-কর তবে আমার কৃপা পৌঁছবে না। গুরুবেশে ভগবানের কৃপা বেশি ফলপ্রদ হয়। গুরুভাবে নিত্যানন্দরূপে ভগবান এসেছিলেন, তা process নয়, principle। Universal কৃপা না-করলে Transcendental-এর কৃপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু হলেন Transcendental এবং নিত্যানন্দ হলেন তাঁর first manifestation। প্রাণের গতিই নানা রকম বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিমায় ব্যষ্টিরূপ ধারণ করে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর সমষ্টি গতি হল নারায়ণ বা মহাপ্রাণ। [১২।১১।৭৮]

সমষ্টিভাবের অধিষ্ঠান ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠভাব হল গুরুভাব

ঈশ্বরকে গুরুস্বরূপ বলা হয়। ঈশ্বর যখন অনুভূত হন তখন গুরুরূপে গুরুভাব নিয়ে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরীয় অনুভূতি গুরুর মাধ্যমে হয়। গুরুর স্বরূপ কেবল জ্ঞানমূর্তি এবং অখণ্ড। খণ্ড বোধে গুরুভজন হয় না। গুরুকে অখণ্ড বোধে না-ধরলে ঈশ্বরভজন বা গুরুভজন করে ফল পাওয়া যায় না। গুরুকে ব্যক্তিবোধে ধরলে সহজে শোধন হয় না; কিন্তু অখণ্ড বোধে ধরলে খণ্ডের প্রভাব সহজেই হ্রাস পায়। এই কারণে দেখা যায় সদ্‌গুরুদের আচরণে কারও প্রতি অবজ্ঞা, কারও উপরে তাড়ন পীড়ন থাকে। এইরূপ আচরণের একমাত্র কারণ হল ব্যষ্টি ভাব[১] লাঘব করা। কখনও কখনও বিশ্রামের অবকাশ না-দিয়ে তিনি নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখেন। এগুলির মাধ্যমে গুরু শুধু ব্যষ্টি ভাব দূর করেন। দেহেন্দ্রিয়ের ভাব হল ব্যষ্টি ভাব।

মানুষের মহাদুঃখের কারণ হল আমি দেহ, আমার দেহ ও আমার সংসার—এই ত্রিবিধ ভাবনা। এই তিন ভাবের পরিণামে হয় সংসারবোধ। ঈশ্বরীয় ভাব ও ঈশ্বরীয় বোধ এই ত্রিবিধভাব থেকে মুক্ত করে।

ত্রিগুণের বন্ধন খণ্ডন ও মুক্তির উপায়

'আমি দেহ' এই ভাব সবচেয়ে বেশি তামসিক বন্ধনের লক্ষণ। 'আমার দেহ' হল রাজসিক বন্ধন এবং 'আমার সংসার' হল সাত্ত্বিক বন্ধনের লক্ষণ। শিষ্যের এই তিন বন্ধন কাটাবার জন্য সদ্‌গুরুর বহু পরিশ্রম করতে হয়। তা একজন্মে সম্ভব হয় না। বহু জন্মের সুকৃতি না-থাকলে তিন গুণের বন্ধন মুক্ত করে শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায় না। তিন গুণের বন্ধনের প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত করে, মনকে নির্মল শুদ্ধ করে সমানে নিয়ে আসা সাধনসাপেক্ষ, হঠাৎ একদিনে হয় না। বিজ্ঞানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। বিজ্ঞান মানে যার সাহায্যে অর্থাৎ যে পদ্ধতির মাধ্যমে ধাপে ধাপে ক্রম ধরে অগ্রসর হওয়া যায়। হঠাৎ করতে গেলে অন্তর-বাহির শোধন করা সম্ভব হয় না। এই জন্য সদ্‌গুরুগণ জ্ঞানের সাহায্যে ধীরে ধীরে চৈতন্যের বিকাশ সাধন করেন। [১৯।১১।৭৮]

গুরুর নির্দেশবাণী

গুরুবাণী বলে—'আমার আমি' সত্য হয় 'তোমার আমি'-র মাঝে বসে। তোমাকে ভুলে যাই যখন, তখনই হয় মৃত্যু। অন্তরে-বাহিরে যা-কিছু আছে, যা-কিছু উপলব্ধি হয় সব গুরুনাম দিয়ে ব্যবহার কর। গুরুনাম হল দেবতাদের অস্ত্র। সর্বোত্তম অস্ত্র হল সুদর্শন। দর্শন হয় জ্ঞানলাভ হলে। আত্মজ্ঞান প্রকাশ হলে অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়। [২১।১১।৭৮]

১। ব্যষ্টি ভাব—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

আমার বোধের শোধন হয় তোমার বোধের ভজনে

ভজন আরম্ভ হয় তোমার দিয়ে। তুমি শিব, তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, গুরু, আত্মা স্বয়ং। তারপর 'তুমির আমি'-র মধ্যে 'আমির আমি' মিশে যায়।

গুরুবোধে ব্যবহারের পরিণাম

দুঃখ-কষ্টে ভয় করতে নেই বা ঈশ্বর থেকে নিজেকে পৃথক করতে নেই। ঈশ্বরকে সর্বত্র বসান যায়; এমনকী কুপ্রবৃত্তির মধ্যেও বসান যায়। তার ফলে কুপ্রবৃত্তিও সরে যায়। এক সময় কোনও প্রবৃত্তি আর থাকে না।

দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি কাহিনী বললেন—একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক জীবনে অনেক খুন করেছে। একবার ঘটনাচক্রে এক মহাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কথায় কথায় মহাত্মা তাকে একদিন বললেন—তুই যে এত পাপ করেছিস, তোর গতি কী হবে?

খুনী বলল—কেন তুমি তো আছ।

মহাত্মা বিস্মিত হয়ে বললেন—তুই আমার কথা ভাবিস?

খুনী—হ্যাঁ, সব সময়ই ভাবি।

মহাত্মা—তুই আমাকে এত ভালবাসিস? আমিও তোকে খুব ভালবাসি। এই বলে মহাত্মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

এই ঘটনার পরে খুনী আর খুন করতে পারে না। খুন করতে গেলেই মহাত্মার কথা মনে পড়ে যায়। কিছুদিন পরে তার এই দুরাচার বৃত্তিরও পরিবর্তন হয়। তার খুন করার বৃত্তি একেবারে চলে যায়।

জ্ঞানের উদয় হলে দুরাচার বৃত্তি আর থাকে না। তখন এই সকল মানুষই আবার মহাত্মা হয়ে যান। এই সব কারণে গুরু তাড়াহুড়ো করে সহসা কিছু করেন না। গুরু ধৈর্য সহকারে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকেন। অশান্তির মধ্যে শান্তি, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানের, 'আমি আমার'-এর মধ্যে 'তুমি তোমার'-এর বোধ কী ভাবে উপলব্ধি হয় তার শিক্ষা দেন গুরু। [৫।১২।৭৮]

মন-বুদ্ধির সংযম বিনা স্বরূপের অনুভূতি হয় না

মহাজনবাক্য অনুযায়ী যখন মনের ব্যবহার করা হয় তখন হয় মন, বুদ্ধির সংযম। তার পূর্ব পর্যন্ত মন শুধু বন্ধন সৃষ্টি করে। সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ মনোবিজ্ঞানের উপরে যে-সকল তথ্য ব্যক্ত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে মনঃসংযম হলেই শুধু সাধনার চরম উৎকর্ষ লাভ হয় না। প্রত্যেকের True nature যা তাই প্রকাশ হয়। প্রত্যেকের স্বরূপ হল নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত; নির্বিকার, নিরাকার, অনঙ্গ, অসঙ্গ, অভঙ্গ ও অখণ্ড।

[১২।১২।৭৮]

অখণ্ড ভূমাবোধই হল নিত্যপূর্ণ ঈশ্বর, আত্মা, গুরুর পরিচয়

গুরুকে সব সমর্পণ করলে গুরু সব নিয়ে নেন। গুরু কে? অখণ্ড ভূমা বা এক আমি, যার মধ্যে বহু আমি, তুমি নেই। সব তাঁর, সব তিনি স্বয়ং। তাহলে বিকার কোথায়? আত্মজ্ঞান দিয়ে সাজিয়ে দিতে পারেন একমাত্র গুরুই—আর কেউ নয়। গুরু হলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ যা অজ্ঞানের এবং নানাত্ব-বহুত্বের প্রতিষেধক বা জন্ম-মৃত্যু ও দেহধারণের কল্পনার প্রতিষেধক, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার প্রতিষেধক —যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মানসিক নয়, অথবা গাঢ় ঘুমের মতোও নয়। তা শাশ্বত-ভাস্বর-জ্যোতির্ময় ও বোধে বোধময়, তা-ই হল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। [১৭।১২।৭৮]

সপ্তম অধ্যায়

পরমতত্ত্বের অনুভূতিই হল গুরুভজনের তাৎপর্য

আমি ব্রহ্মস্বরূপ—এই তত্ত্ব অনুভব করা হল গুরুভজন করা। এখানে পরমেষ্ঠিগুরুর কথা বলা হল। ইনি হলেন ইষ্টেরও ইষ্ট। তাঁর উপরে আর কোনও ইষ্ট নেই। পরম মানে Absolute; not even Infinite।

যে জ্ঞান চর্চা করে তদনুরূপ আচরণ করা হয় না তা জ্ঞান নয়। সেই জ্ঞানের সাহায্যে দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করা যায় না। খুশি মতো আচরণ করলে গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানে কাজ হয় না। যেমন ভাবে আচরণ করে গুরু জ্ঞানলাভ করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। [৩০।১।৭৯]

পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞানের পরিচয়

শাস্ত্রজ্ঞান হল পরোক্ষ (indirect) এবং আত্মজ্ঞান হল অপরোক্ষ ও অনুভবসাপেক্ষ (direct)—ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান হয় দেহ ও মন দিয়ে। ঈশ্বর দেহ-মনের অধীন নন। দেহ, মন হল ঈশ্বরের অধীন। কর্ম দিয়ে জ্ঞানের শোধন হয় না বরং জ্ঞান দিয়ে কর্মের শোধন হয়। তাই বলা হয় 'গুরুসে মিলে জ্ঞান'। গুরুর জ্ঞান যে মানে, তার সব হয়ে যায়। যে মানতে পারে না, সে শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকে। কিন্তু তর্কের পথে ঈশ্বরের হদিশ মেলে না। কারণ ইন্দ্রিয় হল জড়, মন হল গ্রন্থি। জীবের জড়গ্রন্থি খসে যায়। গুরুবাণীতে গ্রন্থি খুলে যায়। এই গুরুবাণীই শুদ্ধ করে দেয় শাস্ত্রপড়া জ্ঞানকে।

গুরুবাণী হল সর্বোত্তম অস্ত্র। সুদর্শনের অর্থ গুরুবাণী[১]। গুরুবাণী হল আত্মবাণী, মহাবাক্য বা ব্রহ্মবিদ্যা বা মহাসরস্বতী। গুরু দিয়ে দেন আলোর জ্যোতি যা-দিয়ে সব দেখতে হয়, শুনতে হয়। যা হারিয়ে ফেললে অজ্ঞানে পড়ে যেতে হয়, আর উঠতে পারা যায় না।

বোধের ঘর কী রকম জান? শাস্ত্র আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ হল বোধের ঘরের বৈঠকখানা। এ হল ইন্দ্রিয়ের স্তর।

গুরুর নির্দেশ মেনে নিষ্ঠা সহকারে ধর্মচর্চা করা বা ভজন-পূজন, ধ্যান-ধারণা করা হল বোধের ঘরের বারান্দা।

সমপর্যায়ের সমভাবের মন পরস্পর মিলিত হয়ে সাধনভজন যখন করে তখন হয় বোধের ঘরের রান্নাঘর।

যখন গুরুবাণীর উপরে আস্থা হয় বা গুরুবাণী নিয়ে পড়ে থাকে তখন হয় বোধের বাড়ির অন্দরমহলের শয়নঘর।

যখন গুরুবাণীর প্রতি সংশয় হয় এবং তার সঙ্গে অন্য কিছু চর্চা করা হয় তখন হয় বোধের বাড়ির dressing room।

যখন গুরুকৃপা অনুভব করে অনুশোচনা আসে, কৃতজ্ঞতা জাগে তখন হয় বোধের বাড়ির পূজার ঘর।

যখন কৃতজ্ঞতাবোধে গদগদ হয়ে সব ভুলে যায় এবং একটিমাত্র বোধ থাকে তখন বোধের বাড়িতে তার যবনিকা। [৪।২।৭৯]

১। গুরুবাণী—তত্ত্ববোধের দৃষ্টিতে।

সদ্‌গুরুই অখণ্ড ভূমার পরিচয় দেন

গুরু তাঁরাই যাঁরা চৈতন্যকে প্রকাশ করেন এবং তার ব্যবহারকৌশল বলে দেন। চৈতন্য স্বরূপত অখণ্ড ভূমা। তার মধ্যে বিকারের উদয়-অস্ত হয়। সুন্দর-কুৎসিৎ, জন্ম-মৃত্যু সব মনের। চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি ফিরাবার জন্যই বারবার চৈতন্যের কথা শোনানো হয়। চৈতন্য অতিরিক্ত অন্য বস্তুর দিকে যে মন দেয়, তার মন হল পশুমন। তা শোধন করাই হল প্রথম পর্যায়ের সাধনা। [৬।২।৭৯]

গুরুবাণী হুবহু মেনে চলাই হল সহজতম পথ

'All Divine for All Time, as It Is'-এ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বৈচিত্র্যের মধ্যে চৈতন্যকে দেখার অভ্যাস করলে সবই চৈতন্যময় দেখা যায় এবং বৈচিত্র্য মিথ্যা হয়ে যায়। সংসারী মানুষের পক্ষে negative theory-কে পূর্ণ ভাবে পালন করা সম্ভবপর নয়। কারণ সেখানে এমন কতগুলি condition করা আছে যা পরিপূর্ণ না-হলে negative theory[১] স্থায়ী হয় না। ঘুমের মধ্যে যেমন কিছুকাল স্থির থাকা যায় দীর্ঘকাল বা চিরকাল নয়, সেইরূপ চেষ্টা করে কিছুকাল 'নেতি-নেতি' করলেও কিছুকাল পর বৃত্তি ফিরে আসে। অর্থাৎ ক্রিয়া বা চেষ্টা-সাপেক্ষ perfection স্থায়ী নয়। ক্রিয়ার মাধ্যমে সংযম স্বল্পকাল স্থায়ী হয়; পুনরায় বিকার দেখা যায়। এতে বড় জোর প্রকৃতির লয় পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং এই সব কঠিন অনুশাসনের মধ্যে না-গিয়ে গুরুবাণীকে হুবহু অনুসরণ করাই হল সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। এ ছাড়া বিকল্প চিন্তায় পতন অনিবার্য। গুরুবাণী হল একমাত্র guarantee; কারণ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে বা কারণের কারণকে অতিক্রম করা যায় না। মনের কল্পনা চৈতন্যের দ্বারাই সৃষ্ট। ভজনে মনকে চৈতন্যকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গুরুকৃপার লক্ষণ

ভজন ছাড়া যখন একমুহূর্তও থাকতে পারবে না তখন বুঝবে গুরুকৃপা হয়েছে। তাঁর স্বভাবশক্তি দিয়ে গুরু কৃপা করেন। গুরুবাণী প্রতিমুহূর্তে মনে রেখে যদি চলা যায় তাহলে perfection প্রতিপদে, প্রতিস্থানে, সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করা যায়। কারণ বিশুদ্ধ বোধকে কোনও বোধ বা স্থান, কাল, পাত্র দ্বারা বিকৃত বা সীমায়িত করা যায় না বা আবৃত করা যায় না। Undivine বলে মন কল্পনা করবে। 'All Divine for All Time, as It Is'-এ কোনও unfavourable অবস্থাতেও গুরুকে বাদ দেওয়া চলে না। As It Is বলেই তাঁকে মানতে হবে। [১১।২।৭৯]

[শিবরাত্রি উপলক্ষে whole night ভজন করবে কী না এ কথা একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন—]

সারাজীবনই তো whole night। অন্ধকারে কী সারাজীবন কাটাবে? অজ্ঞান হল অন্ধকার; অথবা যতক্ষণ জীবভাব ততক্ষণ অন্ধকার বা রাত্রি। দেবভাব হল দিন। দেবভাব জীবভাবের ঊর্ধ্বে। দিব্যভাবে রাত দিন নেই।

যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত পরিপূর্ণ শান্ত না-হয়, ইন্দ্রিয় সংযত না-হয়, দোষদর্শন বন্ধ না-হয়, গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য না-হয়, অন্তরে সর্বধর্মের সমন্বয় না-হয়, জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা না-জাগে বা

১। Negative theory —জ্ঞানযোগের 'নেতি-নেতি' বাদ।

অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তীব্র বৈরাগ্য না-আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে ভজন করা কঠিন। অখণ্ড ভজন গতানুগতিক ভাবে কত জায়গায় হয়ে চলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অখণ্ড ভজন নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনোবৃত্তির একটি বৃত্তিও ভগবৎ বিষয়ের বৃত্তি ছাড়া না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অখণ্ড হয় না।

[একজন ভক্ত বলেছিল যে practical field-এ অর্থাৎ চাকুরী প্রভৃতি কাজকর্ম সব বজায় রেখে সব ঠিক মতো হয় না। তার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—]

ভগবান জগৎসংসার সব তৈরি করে ঠিক থাকতে পারেন এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কোথায়? কার মধ্যে আছে? বিরাট বিশ্বকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুশৃংখল ভাবে চালাচ্ছেন। নিজের মধ্যে নিজেই কু ও সু বৃত্তিকে যোগান (supply) দিচ্ছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও অনুভূতি সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর কাছ থেকেই চেতনা পায়।

এখন পর্যন্ত তোমরা গুরুর পাঠশালাতেই তো ভর্তি হতে পারনি। যে গুরু, গুরু সাজে না সেখানে ভর্তি হতে গেলে কী করতে হয়? তার জন্য গুরুভজনই সর্বোত্তম। তাহলে এই গুরু কে? গুরু হলেন সর্বদেবদেবীময়। গুরুকে ভজন করলে সর্বদেবদেবীর ভজন হয়। মন যেন গুরু চরণছাড়া না-হয়। নিজের সব কিছু গুরুর হয়ে গেলে বা সবটা বোধে পরিণত হলে গুরুর পাঠশালায় ভর্তি হবে। [১৩।২।৭৯]

গুরুপ্রসঙ্গ একটি গল্প—

এক পাগল ছোটবেলা থেকেই দেখত যে সবাই গুরুজনদের প্রণাম করে। পাগল সকলের প্রণাম দেখে নিজের মনে খিলখিল করে হাসত।

একদিন একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল—তুই কাউকে প্রণাম করিস না কেন?

পাগল—আমাকে তো কেউ প্রণাম করে না, আমি কেন করব?

ইতিমধ্যে এই পাগলাকে আরেক বড় পাগল এসে দীক্ষা দিয়ে দিলেন; তারপর তাকে কতগুলি নির্দেশ দিয়ে বললেন—তুই এই ভাবে, এই নিয়মে ভজন কর। কোনও মুস্কিলে পড়লে আমার কাছে আসিস। মহাত্মা (পাগল) তাকে প্রতিদিন প্রসাদ দিতেন আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

একদিন পাগল (শিষ্য) বলল—আমি আর ভজন করব না। তুমি মিছামিছি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও আর প্রসাদ দাও।

গুরু—আমার পাগলামিটা তোকে দিয়ে দিই, আর তোর পাগলামিটা আমি নিয়ে নিই।

এই প্রস্তাব শিষ্যের খুব ভাল লাগল; সে ভজন করতে রাজি হল। গুরু একদিন তাকে বললেন—তোর সব পাগলামিটা আমি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আমার পাগলামিটা তুই কতখানি নিয়েছিস? আমি দেহরক্ষা করলে তোকে কতগুলি কাজ করতে হবে।

এই বলে গুরু তাকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে তাঁর দেহত্যাগের পরে কী কী কাজ করতে হবে, কত সাধু ভোজন করাতে হবে, ভজন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনে সে বলল—তুমি এত করবে কেন? তুমি তো তখন থাকবে না, মরেই যাবে।

গুরু—আমি মরে কোথায় আর যাব? তোর মধ্যেই যাব।

পাগলা শিষ্য মনে মনে ভাবল— দেখাই যাক কী করে যায়?

শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা খুব ছিল। ফলে গুরুর দেহরক্ষার পরে তার মধ্যে সদ্‌গুণ প্রকাশ হয়ে পড়ল। যেখানে সদ্‌গুণ সেখানে সবাই ভ্রমরের মতো ছুটে আসে। গুরুর কাজের দিন সবাই উপস্থিত। গুরু তাকে যা বলেছিলেন সে নিষ্ঠাভরে সব করল। গুরু তাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন বলে সকলে তাকে প্রণাম করতে লাগল।

সারাদিন প্রণাম নেবার পর সে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল—গুরু এবার আমায় ক্ষমা কর। সারাদিন প্রণাম নিতে নিতে শরীর মন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। রাত্রিতে সে আবার ভাবতে লাগল—আমাকে এত লোক প্রণাম করছে কেন? তখন তার মনে পড়ল যে গুরু একদিন বলেছিলেন—একদিন আসবে যেদিন সবাই তোকে প্রণাম করবে। তুই আমাকে প্রণাম করেছিস্, আর আমি সারা দুনিয়াকে প্রণাম করেছি তাই সারা দুনিয়া তোকে প্রণাম করবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এবার বললেন—এই গল্পটির মধ্যে গুরুতত্ত্ব রয়েছে। সদ্‌গুরু মহাত্মাগণ পাগল[১]। তাঁদের পা গোল হয়ে যায়। 'পা' মানে গতিচক্র বা কর্মচক্র। গতিচক্র বা কর্মচক্র 'পা' দিয়ে চলে। চরণ—'ণ' যার মধ্যে চরে। 'ণ' শব্দের অর্থ আত্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি, মুক্তি, শান্তি। কার মধ্যে দিয়ে চলে? আত্মদানের মধ্য দিয়ে চলে। গুরু আত্মদানরূপ কর্ম শিখিয়ে দেন। শিষ্য তার ফলে একতত্ত্বে এসে পৌঁছায়। সদ্‌গুরু পাগল (পা + গোল), শিষ্যকেও পাগল (পা + গোল) হতে হবে। বিষয়ের পাগল নয়। বিশুদ্ধ বোধের পাগল। এই পাগল বস্তুর পাগল নয়, বস্তুতত্ত্বের পাগল। [৪।৩।৭৯]

যথার্থ গুরু

অনেককে বলতে শোনা যায় যে কেউ ভগবানের কোলে বসতে পায় আবার কেউ বা ভগবানকে দেখতেই পায় না। এই কথা যারা বলে, তারা নিজের থেকে ভগবানকে, ভগবান থেকে জগৎকে এবং জগৎ থেকে নিজেকে এই ত্রিবিধ ভেদ রেখে চলে। যাঁরা ত্রিবিধ ভেদকে দূর করার উপায় বলে দেন তাঁরাই হলেন যথার্থ গুরু। তাঁরা বলেন যে তোমার লক্ষ্যবস্তুকে কণ্ঠে নিয়েই তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। ভগবান প্রত্যেকের নিজের আমির মধ্যে বিরাজ করেন, তিনি পৃথক কোনও বস্তু নন। [১১।৩।৭৯]

গুরুর তাৎপর্য ও অজপা জপের রহস্য

গুরুর ভজন মানে গুণের ভজন নয়, গুণাতীত নিরঞ্জনের ভজন। নিরঞ্জন মানে যাঁর কোনও রঞ্জন হয় না। নির্গুণের ভজন দ্বারা গুণের প্রভাব, গুরুর ভজন দ্বারা লঘুর প্রভাব এবং অমৃতের ভজন দ্বারা মৃত্যুর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হয়।

গুরু হলেন নিজের বিবেক—আপনসত্তা। তিনি আমির কেন্দ্রে বসে সব পরিচালনা করেন এবং প্রতিনিয়ত অজপা জপ করেন। তিনি প্রতিনিয়ত অজপা জপ করেন বলেই জীবদেহ ধারণ করতে পারেন। অজপা জপে মন দিলে গুরুর সঙ্গ হয়ে যায়। শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করল অর্থাৎ পরমপ্রভু আমাকে বরণ করলেন। আর শ্বাস বাইরে আসার মানে হল বাইরে যে প্রভু সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন সেই পরমপদে আমাকে সঁপে দিলেন। প্রভু যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন আমার সব প্রভুর, অর্থাৎ আমার মন, প্রাণ, দেহ সব তাঁর। এই ভাবে মিলন হল বা রাস হল। প্রশ্বাসে তাঁর পদতলে নিজেকে সমর্পণ করা হল। কারণ প্রভু সব জায়গাতেই তো ছড়িয়ে আছেন। এ ভাবে মানার মাধ্যমেই যেতে হবে। মানা ছাড়া জ্ঞাননয়ন খোলে না। বাইরে পেতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে হবে। 'আমার করে' কোনও জিনিস রাখা চলবে না। 'আমার করে' তিনি আমাকে যা দিয়েছেন সে মন হল ব্যষ্টি। সব তাঁকে দিয়ে দিতে হবে। [১৮।৩।৭৯]

১। 'পাগল' শব্দের গূঢ়ার্থ হল জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছান অর্থাৎ আপন দিব্য, মুক্ত, পূর্ণ, অমৃতময়, অখণ্ড ব্রহ্মাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সোজা কথায় সমবোধে বা অখণ্ড এক বোধে স্থিতি।

গুরুর তাৎপর্য ও মহিমা

গুরু পুনঃপুনঃ আত্মা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন এবং শিষ্যের জট খোলায় সাহায্য অর্থাৎ মনের সংশয় দূর করতে সাহায্য করেন। যে জট পাকিয়ে আছে তা খোলার জন্য গুরুপ্রদত্ত আলো যদি কেউ ব্যবহার করতে না-পারে তার জন্য পর্যায়ক্রমে নির্দেশগুলি সাজিয়ে দেন। গুরু এমন ভাবে আপন অনুভূতির আলো দেন যা শুনে অপরেরও অনুভূতি খেলে এবং যার দ্বারা অপরেও অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ বা প্রবোধিত হয়, এ-ই হল গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান। এই জ্ঞানের একটি সমষ্টি রূপ বা একটি অসীম রূপ আছে। সেই রূপকেই ইষ্ট বলা হয়। এই রূপটি সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। তা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হয়ে যায় সব—সকলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তা আবৃত হয়ে আছে। যেমন বাড়িতে প্রতি ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো থাকা সত্ত্বেও ঘরের দরজা যদি বন্ধ থাকে বাইরে থেকে সেই আলো দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করতে হয়। সে রকম প্রত্যেকের হৃদয়াকাশে প্রজ্জ্বলিত এই জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য হৃদয়দ্বারও উন্মুক্ত করতে হয়। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যেই সহজে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হয়। [২০।৩।৭৯]

আত্মগুরুর অনুসন্ধান হল জীবনসাধনা, তাঁর সঙ্গে স্ববোধে মিলন হল আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন

'আমার গুরু' বলা অপেক্ষা 'গুরুর আমি' বলা ভাল। 'গুরুর আমি' হল I of the Absolute। তার মধ্যে সব মতপথ এক হয়ে যায়।

গুরুর মহিমা গাইতে গাইতে গুরুভাবের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। তা হল সমধর্মী দু'টি প্রকাশের মিলন। অচিন্ত্য রূপ হল আত্মার স্বরূপ। এই আত্মার মহিমা স্মরণ করার কথা সব শাস্ত্রে আছে। Guruhood নিজের ভিতরে কী ভাবে লুকিয়ে আছে তা-ই আবিষ্কার করতে হয়। [২৯।৪।৭৯]

সদ্গুরুর ভাববোধই জীবের সাধ্য, সাধন ও সিদ্ধি

অধ্যাত্মপথে বৃদ্ধবয়সে যাঁরা আসেন তাঁদেরও নিরাশ হবার কারণ নেই। তাঁদের জন্যও একটা passport দেওয়া হয়। যদি গুরুচরণে শরণ নিয়ে অথবা গুরুচরণ স্মরণ করে গুরুগত হয় কারওর প্রাণ, তাহলে সদ্গুরু পথের কাঁটা সরিয়ে দেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে যে তাঁর আশ্রয় নেয় সদ্গুরু তাকে টেনে নেন। এ-ই হল একমাত্র উপায়। গুরুবাণী বিকৃত না-করে তা ব্যবহার করার কৌশল হল—সত্য শ্রবণ করে তার ধারাকে জাবর কাটতে হয়। তার ফলে অলক্ষ্যে গুরুশক্তি তার মধ্যে কাজ করে।

সদ্গুরু হলেন পরমাত্মবোধের অভিব্যক্তি। তাঁর কাজ হল জীবের বন্ধনের কারণকে আত্মবোধের জ্যোতির দ্বারা সরিয়ে দেওয়া। এরই নাম হল জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বা spiritual fire বা আত্মবোধের অনুভূতির বিজ্ঞান।

গুরু শব্দের বৈশিষ্ট্য মনে গেঁথে গেলে জীবভাব আপনিই সরে যায়। মনের প্রভাবে যতদিন থাকা যায় ততদিন গুরুভজন বা চৈতন্যের ভজন হয় না। গুরুভজনে 'আমার বোধ' থাকতে পারে না। গুরু বলতে ব্যক্তির উপরে জোর দেওয়া হয় না। কিন্তু যার দ্বারা ব্যক্তি ফুটে ওঠে, যা নিত্য শুদ্ধ নিরাভাস নিরাকার অর্থাৎ যা বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না এবং সব আকারে থেকেও যার কোনও আকার নেই, তিনিই গুরু। অর্থাৎ গুরুর স্বরূপ হল সেই নিত্যবোধ চিদানন্দ বা Pure Consciousness। Pure হলে অখণ্ড হবে, অখণ্ড হলে নিত্য হবে—কাজেই নিত্য, শুদ্ধ ভাবনা করলে বোঝা যায় গুরু কাকে বলে এবং তার তাৎপর্য কী? নিজের রূপ আর যখন নিজের কাছে ফোটে না তখনই সে 'কেবলজ্ঞানমূর্তি'-র কথা বলতে পারে।

[১৩।৫।৭৯]

গুরু হলেন সকলের আত্মা স্বয়ং

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।"

গুরুগীতার এই স্তোত্রটি উল্লেখ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

এই গুরুই হলেন তোমাদের আত্মা স্বয়ং। অর্থাৎ গুরুভজনে তোমরা তোমাদের আসল স্বরূপকেই ভজন করছ গুরু নামে। একতত্ত্বই শুধু আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন নামে এক তত্ত্বকেই ভজন করা হয়। সত্য একটিই। এই সত্যকেই গুরু, ইষ্ট, আমি, তুমি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যবোধে পূজা করা হয়। নিজের পরিচয় প্রত্যেকের জানার অধিকার আছে। এইটুকু দেহের মধ্যে থাকার জন্য বারবার দেহ নিয়ে আসা হয়। নিজের আসল মহিমা জানার জন্য মানুষ বারবার আসে কিন্তু নিজের চেষ্টায় তা জানবার সুযোগ হয় না। যখন গুরুর সন্ধান পায় তখনই সে জানতে পারে আপন পরিচয়।

গুরু তাঁর অন্তরের অনুভূতির আলো দিয়ে ভেদজ্ঞান, বিকার, ভ্রান্তি প্রভৃতি বিদূরিত করে তাকে দেখিয়ে দেন যে সে আর তার গুরু একই সত্তায় কী ভাবে বিরাজ করে। সে নিত্য, তার কখনও অভাব হতে পারে না। সে বুদ্ধ, তার অনুভূতির অভাব হয় না, সে মুক্ত— সে একাই আছে, কে তাকে বাঁধবে?

এই অনুভূতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এর সন্ধান যিনি দিতে পারেন তিনিই সদ্‌গুরু। আর সব গুরু এটা ওটা দেন। সদ্‌গুরু জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে মানুষের understanding-কে expand করতে পারেন। একটা কথাকে গুরু হাজার রকম ভাবে প্রকাশ করে দেখাতে পারেন। তিনি নিজে নাচেন এবং জগৎকেও নাচান।

বুদ্ধি আপন ভাবে চলতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সদ্‌গুরু তা পরিষ্কার করে দেন। গুরু এমনই একজন যাদুগর বা magician যে তিনি ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত বা অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, নর হয়েও ঈশ্বর বা ঈশ্বর হয়েও নর। গুরু অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁর কৃপা ও করুণার কথা দেবতারাও জানে না। সদ্‌গুরুর কৃপার অপেক্ষায় দেবতারাও থাকেন। গুরু হলেন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের ঘনীভূত রূপ। তাঁর মধ্যে সূক্ষ্মতত্ত্ব (দেবতারা) অংশমাত্র। যিনি সৎ-এ ও চিৎ-এ প্রতিষ্ঠিত তিনি সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু। তিনি অংশ নন, তিনি অখণ্ড (Absolute), তাঁকে মাপা যায় না, তুলনা করা যায় না।

গুরুবাকের মধ্যে এমন শক্তি আছে যা শিষ্যের অন্তরে প্রবেশ করে তার সমস্ত মলিনতা দূর করে অর্থাৎ মনের অশুদ্ধ ভাবকে দূর করে শুদ্ধ মন তৈরি করে দেয়, যার দ্বারা সে নিজের অখণ্ডস্বরূপের অনুভূতি লাভ করতে পারে। গুরুবাক্ হল পরাবাক্ বা ইষ্টের বাণী যাকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তা-ই হল গীতাবাণী বা বেদবাণী, যা এতদিন মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল তা এখন সূত্রাকারে বেঁধে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ভাবে বেঁধে না-দিলে খণ্ড ভাবকে অখণ্ডে আনা যায় না।। তাঁর সূত্রকে কেউ খণ্ড বা নষ্ট করতে পারে না। তাঁর বিজ্ঞান কেবল প্রজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকে; অজ্ঞানের সঙ্গে নয়। আপনার বস্তুকে আপনি দিচ্ছেন আস্বাদন করবেন বলে। যা পূর্ণ দিব্য ও অখণ্ড তা তিনি নিজেই। মানুষ যেমন আয়না দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে আনন্দ পায় সেইরূপ আত্মজ্ঞানী নিজেকে আরেক ভাবে দেখে আনন্দ পান। নিজেকে জানার বা দেখার জন্য দরকার দিব্যনয়ন বা সমদৃষ্টি। দিব্যনয়ন বা সমদৃষ্টির চাবি থাকে গুরুর কাছে। গুরু এক মুহূর্তে সেটি দিয়ে দিতে পারেন। তিনি দেন না, কারণ কেউ চায় না। সকলেই চায় আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক বিষয়বস্তু। বুদ্ধির ওপরে কেউ যেতে চায় না।

গুরু কী করেন? জগৎকে শুধু উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেন। বহুমুখী গতির নাম জগৎ; একমুখী গতির নাম

প্রজ্ঞাস্থিতি, আত্মরতি, স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। বহুমুখী গতিকে উল্টো করলে একদৃষ্টি। গুরু চাবি দিয়ে ঘুরিয়ে দেন। এই গুরু হলেন সচ্চিদানন্দ স্বয়ং। এই গুরুকেই শিব, রাম বা কৃষ্ণ নাম দিয়ে সবাই ব্যক্তিরূপে দেখে।

[৩।৭।৭৯]

সদ্‌গুরুর উদ্দেশ্য হল শিষ্যের অন্তরের অনন্ত অনন্ত জন্মের সংস্কার বা মল শোধন করা

গুরু অনেক ভাবেই সাহায্য করেন। ইষ্টদর্শনের রাস্তা গুরু ছাড়া আর কেউ পরিষ্কার করে দিতে পারেন না। তবে মনুষ্যবোধে গুরুকে নিলে আসে অভিমান। গুরুর প্রতি আসে সংশয়, সন্দেহ ও নিষ্ঠার অভাব। অনন্ত জীবনের অনন্ত সংস্কার জমা থাকে। তার মধ্যে সামান্য কিছু কার্যকরী হয়েছে বর্তমান জীবনে। শুধু এই জন্মের সংস্কার থেকে রেহাই পেলেই হয় না। যত রকম মল বা সংস্কার জমে আছে সব কিছু শোধন করে দেওয়াই হল গুরুর লক্ষ্য। এই সংস্কারের জন্যই মানুষকে একবার উপরে ও একবার নিচে নামতে হয়। সেই সব সংস্কারকে গুরু নাশ করেন। নিয়তির উপরে আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নিয়তি[১] অর্থ হল ভগবানের সর্বোত্তম নীতি। একে ভগবান নিজেও খণ্ড করেন না। করলে লীলা সম্ভব হয় না। এমনকী তাঁর নিজের জন্যও করেন না। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভক্তের জন্য এমন করতে হয়েছে সত্য; কিন্তু ভগবানকেও পরে সেই ফল ভোগ করতে হয়েছে। তবে এও ঠিক যে এই উপকারে ভক্তের আত্মিক উপকার হয়নি। সদ্‌গুরু আত্মবোধ, সত্যবোধ ছাড়া আর কিছুতেই প্রীত হন না। সত্য অতিরিক্ত যা তা-ই মিথ্যা।

বর্তমান জীবনের যা ধারণা—সদ্‌সৎ, ধর্মাধর্ম সব কিছুই অন্তরের মল; সুতরাং সবই ছাড়তে হবে। গুরুনির্দিষ্ট বিধানের মাধ্যমেই সব ছাড়তে হবে। ইন্দ্রিয়, প্রাণ দিয়ে যা-কিছু করা হয় তা যদি অখণ্ডের দিকে না-যায় তবে লাভ হয় না। গুরু যা বলেন তা-ই আসল সত্য। নিজের মন যা চিন্তা করে তা মিথ্যার একটি রূপ।

জীবন উৎসাহ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না, এক পা চললে বুঝতে হবে তার পিছনে আছে অনন্ত উৎসাহের বৃত্তি। এই উৎসাহরূপী গুরু অনেক ভাবে ঘুরে বেড়ান। গুরুর আসল রূপ ধরা পড়ে অনেক পরে। গুরু ও আত্মা এক। মানুষ Self-কে প্রত্যাখ্যান করে। সেই জন্য গুরুর নির্দেশের উপরে মন্তব্য করে বা খুশি মতো কাটছাঁট করে। মনে ইষ্টনিষ্ঠা জাগে তখনই যখন গুরুর নির্দেশ ষোলো আনা মানার যোগ্যতা লাভ করে।

দুঃখকে যে ভয় করে সে গুরুকৃপা পায় না এবং যে দুঃখকে বরণ করে সে গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত হয় না।

সৎসঙ্গে যেমন শ্রবণ তেমন গ্রহণ হলে বিকার থাকতে পারে না। অন্যরূপ হলেই আর উপায় থাকে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন—"বারবার যেমন বলছি তেমন ভাবে যদি অনুসরণ করতে না-পার, যতই তুমি দেবতা হও কিছুতেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।"

যে বিজ্ঞান কখনও বিকৃত হতে পারে না ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বা তার ব্যবহার দ্বারা কলুষিত হতে পারে না, সেই বিজ্ঞানটি দেবার জন্য মানুষের বেশে ভগবান স্বয়ং আসেন। তাকে হুবহু অনুসরণ করতে হয়।

এগুলি সাবধান বাণী। ভয় দেখাবার জন্য নয়। গুরু বশিষ্ঠদেব বলেছিলেন—"রাম! তুমি দেবতা হতে পার, কিন্তু এই বিজ্ঞানে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।" এই হল গুরুর কাজ। শ্রীকৃষ্ণও এই বিজ্ঞান দিয়ে গেছেন অর্জুনকে যা শ্রীগীতা নামে সুপরিচিত।

১। নিয়তি—যে দিব্যশক্তি নিত্যপূর্ণ একের অধীনে সমবোধে বা একবোধে স্থিতির নিমিত্ত বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিতে সবকে সুনিয়ন্ত্রিত করে অন্তরে ও বাহিরে। তাঁর অধীন হল সর্বজীবজগৎ। মুক্তপুরুষগণ কেবল স্বতন্ত্র।

সর্বোত্তম বস্তুকে স্বয়ং ভগবান কৃপা করে বারবার দিয়ে·যাচ্ছেন জগতের সব জীবভাবকে নাশ করে শিব ভাবে নিয়ে যাবার জন্য। কে রাজা আর কে ফকির তা তিনি বিচার করেন না। স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করাই হল বড় কথা।

সর্বোত্তম দীক্ষা

প্রতিদিন শ্রবণের মাধ্যমে স্বয়ং তিনিই অন্তরে প্রবেশ করছেন এবং বাকের মাধ্যমে অনুভূতিকে ভিতরে জাগিয়ে দিচ্ছেন। এ-ই হল সর্বোত্তম দীক্ষা। শ্রবণের মাধ্যমে হয় যথার্থ সত্যের ধারণ, মনন ও অনুভূতি। ক্রিয়ার মাধ্যমে আংশিক হয়। শ্রবণের সাহায্যে তা পূরণ করে নিতে হয়। শ্রবণের মাধ্যমে যত সাধনা আছে তার যত ফল সব পূরণ হয়ে যায়। [৮।৭।৭৯]

প্রাণচৈতন্যের মহিমা

যে প্রাণচৈতন্য জীবভাবে আছে, সেটি সে নিজেই বরণ করে নিয়েছে। নিজের ভালমন্দ মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে। এই বৃত্তিগুলির নামই সংস্কার। কতগুলি বৃত্তি সংস্কার তৈরি করে এবং কতগুলি বৃত্তি সংস্কার নাশ করে। তা দ্বিতীয় কেউ দেয় না। এটা বোঝাবার জন্য যে অনুভূতি দরকার হয় তা আরেকজনের সাহায্যে নিতে হয়। তাঁর নামই গুরু। কোন কর্মের কী ফল তা গুরুই বুঝিয়ে দেন। তখন কর্মচিন্তা দূর হয়ে কর্মসংস্কার নাশ আরম্ভ হয় এবং অন্য রকম অভ্যাসের সংস্কার আরম্ভ হয়। গুরু হলেন তিনিই, যিনি সংস্কার নাশ করেন।

প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। বুদ্ধি, মন তার সাহায্যেই কাজ করতে সক্ষম হয়। এবং প্রাণই সব অনুভূতিকে ধরে রাখে। কাজেই প্রাণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রাণের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য বা জীবনের গতি অন্তর্মুখী করে দেবার জন্য গুরু প্রচেষ্টা করেন। পরে তিনিই প্রকাশ করে দেন যে অন্তর ও বাহির বলে কিছু নেই। একটাই শুধু আছে যা নিত্যসত্য বা যথার্থ স্বরূপের পরিচয়। এই নিত্যসত্যের সঙ্গে স্ববোধে সচেতন ভাবে মিলন না-হওয়া পর্যন্ত গুরুর কাজ চলতে থাকে স্থূলে-সূক্ষ্মে সর্বত্র। এই কারণেই গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। পিতামাতা কিছুদূর অগ্রসর করে দিলেও অন্তর্মুখী হওয়া যায় একমাত্র গুরুর সাহায্যেই। তিনি অনাদিকালের বন্ধন নাশ করে দিতে পারেন। দীক্ষা দেওয়া মানে দ্বৈত ভাবের বীজ দগ্ধ[১] করে দেওয়া। গুরু স্বাত্মবোধের স্বকীয় অভিজ্ঞতার অনুভূতি দ্বারা কর্মপ্রবৃত্তিকে নাশ করে দিতে পারেন। তাঁর স্বকীয় অনুভূতিতে পৃথকভাব ও ভেদ জ্ঞানের বৃত্তি গলে যায়। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান হল একমাত্র অবলম্বন যা সর্ববিধ কর্মবন্ধনকে নাশ করতে সক্ষম।

জগতের দিকে দৃষ্টি থাকলে বুঝতে হবে কর্মসংস্কার চলছে। আর যখন বিবেক-বৈরাগ্য জাগে তখন সংস্কার নাশ হয়। গুরুবাক্ অনুসরণ করে বা ভগবৎ ভাবনার সাহায্যে অন্তর্মুখী হতে হয়। দেহের প্রতি মন থাকলে তাকে কষ্ট পেতেই হবে। দেহ বিনাশী, তা দাহ্য বস্তু দিয়ে তৈরি, যা তিল তিল করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গুরুই শিষ্যকে বলে দেন দেহ চলে যাবে, কিন্তু তুই অমর। তুই হলি সেই আত্মা যা অবিনাশী, অবিকারী ও অমর। যা দৃশ্য তা বিনাশশীল। আত্মা মরেও না, কাউকে মারেও না। দৃশ্য পর্যন্ত সব চলে যায়। বুদ্ধি পর্যন্ত সবই দৃশ্য। এগুলি সব বারবার আসে আর যায়। গুরুর মুখে পুনঃপুনঃ এই ভাবে শুনলে এবং তদ্‌ভাবে বিচার করলে নির্বীজ হওয়া যায়। এক পর্যায়ের গুরু সূক্ষ্ম স্তরে যেতে এবং আর এক পর্যায়ের গুরু সূক্ষ্মতর অবস্থায় যেতে সাহায্য করেন। মনে রাখা দরকার যে এক গুরুই ভিন্ন ভিন্ন বেশে আসেন। কারণ গুরু বলতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই বোঝায়। তাঁর মধ্যেই আমরা আছি এবং আমাদের মধ্যেও তিনি আছেন।

১। দগ্ধ—কর্মসংস্কার নাশ করা।

যা যায় তার প্রতি লক্ষ্য না-রেখে সদ্‌গুরুগণ লক্ষ্য রাখতে বলেন অন্তরে হংসধ্বনির প্রতি, বেদবাণী বা "একোঽহম্", "শুদ্ধোঽহম্", "অমৃতস্বরূপোঽহম্" ধ্বনির প্রতি। এই অতীন্দ্রিয় ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। তা যদি কেউ শুনতে পায় তাহলেই তার মুক্তি।

এই ধ্বনি এখন শুনতে না-পারার কারণ হল জীব ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে মনকে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। এই অবস্থা থেকেই গুরু জীবশিষ্যকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। গুরু হলেন আত্মা নারায়ণ যোগীশ্বর। যা-কিছু শব্দ বা নাম. সব জুড়ে বসে আছেন গুরু স্বয়ং।

সদ্‌গুরুর মহিমা

যা হতে সব, যাঁর দ্বারা সব, যাঁর মধ্যে সব, সবেতে যিনি এবং যিনি সব তিনিই সদ্‌গুরু বা পরমেষ্ঠিগুরু। তিনি সর্বরূপে রূপময়; কারণ সর্বরূপে তাঁর বিস্তার। তিনি নামময়; কারণ সব স্পন্দনে তিনি আছেন। সব মনের বৃত্তির মধ্যে তিনি; তাই গুরু ভাবময়। সব চৈতন্যের মধ্যে তিনি, তাই তিনি বোধময়। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও রূপ-নাম-ভাব নেই। কেবল এই ভাবটুকু ধরে তাঁকে হৃদয়ে প্রকাশ হতে দিতে হয়। তাঁর কৃপাতে লক্ষ বছর এক মুহূর্ত এবং এক মুহূর্তও লক্ষ বছরে পরিণত হয়। সুখ-দুঃখ সব স্বপ্নের মতো ভেঙে যায়। নিজেকে ভাবনা করার জন্য দরকার অখণ্ডতা। খণ্ড হল ইন্দ্রিয়ের এবং অখণ্ড হল অতীন্দ্রিয়ের।

গুরু অলক্ষ্যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে এবং সূক্ষ্মতর হতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় নিয়ে যান। 'গুরুর অখণ্ডভাব' বা 'ব্রহ্মস্ফূর্তি' তখন শিষ্যের মধ্যে আপনিই জেগে ওঠে। গুরু জোর করে কিছু করেন না। কারণ সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন বলে তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতার সীমা নেই। তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর নিজের ভাব তরঙ্গায়িত হয়, আবার নিজের মধ্যেই লীন হয়। সাধারণত সদ্‌গুরুকে মনুষ্যরূপে দেখে তাঁর মধ্যে মনুষ্যভাবই আরোপিত করা হয়। কিন্তু তিনি অতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আকাশকে যেমন অতটুকু পাত্রে ধারণ করা যায় না, সেইরূপ সদ্‌গুরুকেও কেবল আধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। দেহ আধারকে তিনি ছুঁয়ে থাকেন মাত্র। আধার[১] অর্থ যেখানে আনন্দকে ধারণ করে থাকেন। স্বকৃত কর্মফল আস্বাদন করার জন্য প্রত্যেকেই দেহ আধার তৈরি করে কিন্তু পরে নিজে ঘরে ফিরবার রাস্তা ভুলে যায়। তারা 'চিচিং বন্ধ' জানে কিন্তু 'চিচিং ফাঁক' জানে না। গুরু এসে বলে দেন 'চিচিং ফাঁক এবং চিচিং বন্ধ'-এর তাৎপর্য[২]।

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করলে কোনও বাধা থাকে না। তাই অন্তর হল অন্ বা ন + তর, অন্ বা 'ন'-র অর্থ হল অভাব বা নঞ এবং তর হল দূরে বা তফাৎ-এ; এবং বাহির হল বা + হির। 'বা' মানে বাদ বর্জিত। অর্থাৎ নিজের ভাব বর্জিত যেখানে। নিজের অখণ্ডস্বরূপকে জাগ্রত করে দেন যিনি তিনিই গুরু। এই জন্য তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়—তিনি ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত। সব ভাবগুলি এক সঙ্গে একত্র করে তিনি আছেন। তাঁর মহিমা তিনি স্বয়ং। [১৫।৭।৭৯]

সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান জীবনের কাছ থেকেই পাওয়া যায়

কৃপার জন্য মানুষ পাঁচ জায়গায় ছোটাছুটি করে কারণ তারা জানে না যে, যে কোনও জায়গা থেকেই কৃপা মেলে, যদি সেই দৃষ্টি থাকে। পাথরকেও যদি গুরু বলে মানা হয় তবে সেখান থেকেও কৃপা পাওয়া

১। আধার— আনন্দের ধারকই হল আধার।

২। তাৎপর্য—বন্ধনমুক্তি তথা দ্বৈত ও অদ্বৈতের লক্ষ্যার্থ।

যায়। এই বোধ হলে সর্ববস্তুর মধ্যেই অনুভূতি পাওয়া যায়। অথচ এই অনুভূতির জন্যই মানুষের যত রকম প্রক্রিয়া, ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা। এগুলি সবই বিফল হয় যদি অখণ্ড বোধে না-মানা হয়। এই কারণেই দেখা যায় শাস্ত্রজ্ঞান অনেক থাকা সত্ত্বেও কার্যকালে তা কোনও কাজে লাগে না। অনন্ত দেবতার কাছে ঘুষ দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু অখণ্ড বোধে মানা ছাড়া তা কোনও কাজে লাগে না। অখণ্ড মানা হলে কোনও বিরুদ্ধভাব থাকে না। যার ফলে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে না।

মানুষ সদ্‌গুরু বলে যাঁদের মানে তাঁদের সম্বন্ধে ধারণা খুব কম। জীবন যদি আরেকটি জীবনকে পায় তার মাধ্যমে সহজে সমাধান খুঁজে পায়। কল্পনা করে পাওয়া যায় না। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানব। এখানে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে অভিব্যক্ত হবেন বলে তাকে এই ভাবে সৃষ্টি করেছেন। যতক্ষণ দেহ আধারে সেই যোগ্যতা না-হয়, তিনি খুশি মতো ভাঙ্গেন ও গড়েন। মানুষের মধ্যে পূর্ণ দেবতাকে না-পেলে ভগবান চিরকাল কল্পনাতেই থেকে যান। [২২।৭।৭৯]

গুরু হলেন প্রকাশক, জীব হল প্রকাশ; এটাই হল এক-এ দুই, দুই-এ এক—formula-র রহস্য

জীবচৈতন্য যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। বহু রাস্তা পরিভ্রমণ করে যখন নিজের ঘরে ফিরবে তখন দেখবে নিজের চাবি হারিয়ে গেছে। বহু পরিশ্রম করে চাবির সন্ধান পাওয়া যায়। এই চাবি কিন্তু নকল হয় না। চাবিকাঠি হল গুরু। এই গুরু হলেন সদ্‌গুরু, যে গুরুমূর্তির কাছে ভ্রান্তি, ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং মায়ার বিভূতি কিছু করতে পারে না।

রূপ, নাম, ভাব ও বোধের ঘরের চাবি গুরু স্বয়ং। কী ভাবে এই চারটি মূর্তি তিনি ধারণ করেন? সমগ্র রূপের একটি রূপ আছে তাই গুরু স্বয়ং। সেইরূপ সর্ব নাম, ভাব ও বোধেরও এক একটি রূপ আছে। গুরু হলেন সর্বরূপের রূপ অর্থাৎ গুরুকে বাদ দিয়ে কোনও রূপ নেই। সর্বনামের নাম গুরু হলেন সব ধ্বনির মধ্যে গুরু স্বয়ং। সর্বভাব গুরুর প্রতিভাব—স্বভাবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সর্ববোধের বোধ হল গুরু স্বয়ং। সুতরাং প্রতিবোধ হল তাঁর স্ফুলিঙ্গ। সর্ব রূপ, নাম, ভাব, বোধ এক করলে হয় গুরুবোধ। এই গুরুবোধের সাধনাই হল সর্বোত্তম। তা-ই হল ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের সারমর্ম।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নীরব হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে আবার বলতে লাগলেন—

গুরুভজন সম্বন্ধে এত দিন যা বলা হয়েছে তা যদি কারও মনে দাগ কেটে থাকে তাহলে তার আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। সর্বরূপ, সর্বনাম, সর্বভাব ও সর্ববোধের যিনি আধার সেই গুরু হলেন ভবনদী পারের কর্ণধার। গুরুকে কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে হেয় বা শ্রেয় করা হয়। অথচ তাঁর তুলনায় দ্বিতীয় কোনও বস্তুই নেই। ফলে তাঁর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টও কেউ নেই।

এ রকম একটি সুন্দর তত্ত্ব যদি পাওয়া যায় তাহলে আর সমস্যা থাকার কথা নয়; কিন্তু তবুও দেখা যায় মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। বোধের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ স্বস্বরূপকেই ভুলে গেছে। মনের কল্পিত জগতেই সে থাকতে চায়। ফলে তার বিড়ম্বনা আছে, কিন্তু বোধের মানুষের তা নেই। যত চাওয়া সব মনের চাওয়া। বোধস্বরূপ স্বয়ংপূর্ণ। সে কী চাইবে এবং কার কাছেই বা চাইবে। চাওয়া-পাওয়া হল মনের ধর্ম এবং তার সঙ্গে যা-কিছু যুক্ত আছে যেমন—না-চাওয়া বা না-পাওয়া তা-ও মনেরই ধর্ম। বোধের চাওয়াও নেই, পাওয়াও নেই। সে সর্বদাই সমান ও পূর্ণ। মন ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু জুড়তে পারে না; ভুল করতে পারে কিন্তু শোধন করতে পারে না। মন সব পারে কিন্তু পারে না শুধু বোধস্বরূপকে কাবু করতে। সেখানে মন নিজেই গলে যায়। সেখানে সংসার নেই—আছে সম+সার। কাজেই মন যেখানে রাজত্ব করতে চায় তা-ই হল সংসার। সেখানে মন একটা dummy গুরু সাজিয়ে রাখে। তাকে দিয়ে কাজ হয় না।

সদ্‌গুরুর কৃপা লাভের উপায়

এখানে একদিন 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—বাবা, গুরুকৃপা কী করে পাওয়া যায়?

তাকে বলা হল— তোমরা তো সৎসঙ্গ, সাধনভজন করেছ, নিশ্চয়ই জান।

জিজ্ঞাসু— সেই জানাতে কোনও কাজ হল না।

উত্তর—গুরুকৃপা পাওয়া যায় গুরুবোধে সব মানলে।

প্রশ্ন—গুরুবোধ কী করে মেলে?

উত্তর—গুরুঋণ শোধ হলে।

প্রশ্ন—গুরুঋণ শোধ হয় কী ভাবে?

উত্তর—অহংকার, অভিমান ক্ষীণ হলে।

প্রশ্ন—অহংকার, অভিমান ক্ষীণ হয় কিসে?

উত্তর—'আমার ভাব' ছাড়লে।

প্রশ্ন—'আমার ভাব' ছাড়ে কিসে?

উত্তর—'তোমার ভাব' বাড়লে।

প্রশ্ন—'তোমার ভাব' বাড়ে কিসে?

উত্তর—'আমার' জায়গায় তোমারকে মানলে।

প্রশ্ন—মানা যায় কী করে?

উত্তর—যে মেনে চলে তাঁর পাশে থেকে।

সে তখন আর প্রশ্ন করল না। বলল—সব উত্তর পেলাম; কিন্তু কে মেনেছে তা কী করে বুঝব?

বলা হল—যাঁকে গুরু বলে মেনেছ—তাঁকেই মানলে— তাঁকে কী মেনেছ?

প্রশ্নকারী—বলেন কী? তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি আর তাঁকে মানিনি?

বলা হল—গুরুকে তো দেখনি, গুরুর ছায়া দেখেছ। গুরুকে যেদিন মানতে পারবে সেদিন হবে যা দেখছি সব গুরুর রূপ, যা শুনছি সব গুরুর নাম। বলবে গুরু, এবার তোমার পদ্ধতি পেয়েছি।

প্রশ্নকারী এবার বলল—আর শুনব না।

জিজ্ঞাসা করা হল—কেন?

সে বলল—এ জীবনে হবে না।

উত্তরে তাকে বলা হল—এই মুহূর্তেই হতে পারে। এতদিন অকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুকে মেনেছ, অখণ্ডরূপে তাঁকে মাননি। গুরু বলতে বুঝায় যা বৃহত্তম, অজর, অমর, পুরাণপুরুষ, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, অখণ্ড, ভূমা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অদ্বয় ব্রহ্ম-আত্মা। এই অখণ্ড ভূমা ছাড়া গুরুর পরিচয় হয় না। যেমন সাগর কখনও ঝিনুক হয় না, সে রকম তাঁর ছায়াকে যদি অখণ্ড বলি তাও হয় না।

গুরুর ঋণ শোধ কর। গুরু মন্ত্র দিয়েছেন, এবার তাঁর যন্ত্র হয়ে যাও।

তখন সে বলল—আমার দ্বারা সংসারও হবে না, সাধনাও হবে না।

তখন তাকে বলা হল—তা না-হলে এবার তাহলে হবে। এতদিন 'আমার, আমার' করে ফাঁকি দিয়ে এসেছিলে। তাঁর যন্ত্র, তাঁর হাতেই শোভা পায়। প্রতি জীবন হল তাঁর যন্ত্র। গুরু মন্ত্রী। গুরুমন্ত্র পেয়েছ কিন্তু মন্ত্রী না-হলে চালাবেন কে? তাঁর জিনিস তাঁকে না-দিয়ে নিজে ব্যবহার করেছ। এই জন্য বলা হয় একটা ভাব দিয়ে তাঁকে ব্যবহার করবে। প্রয়োজন শুধু অখণ্ড মানা। সুখ-দুঃখের মূলে তিনি একাই ছিলেন, একাই থাকবেন।

আমরা শুধু আসি আর যাই। 'যতক্ষণ আছে প্রাণ, গেয়ে যাও তাঁর মহিমার গান।' তাহলেই গুরুর ঋণ শোধ হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। প্রতি ভাবে, প্রতি অণু-পরমাণুতে গুরুই স্বয়ং। এ ভাবে মানলে ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান শুধু কথার কথাই থাকবে না। এ শুধু শব্দ মাত্র নয়।

জীবনের প্রতি স্পন্দনকে এক করলে হয় অনুভূতি। মুখে 'জয় গুরু' বলে নিজের কর্ম খুশি মতো করলে হয় না। মানুষ নিজের মনের মতো কিছু না-পেলেই গালাগাল দেয়। যখন নিজের অনুকূলে থাকে তখন গুরুর প্রতি গদগদ ভাব থাকে। যখন প্রতিকূলে যায় তখনই বিরূপ ভাব।

মানুষের মধ্যে উপায় ও উপেয় উভয়রূপে তিনিই স্বয়ং; কারণ তিনি সর্বব্যাপী, অখণ্ড, অদ্বয়, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত আবার বিকারের মধ্যেও তিনি। যেখানেই মন যায় সেখানেই বসাও গুরুকে বা মাকে। খুব কষ্টকর অবস্থাও যদি হয় তাঁর মধ্যেও বসাও তাঁকে। যত বীভৎস বা সুন্দর রূপ তা-ও তিনি। কারণ তিনি সর্বরূপে রূপময়, সর্বনামে নামময়, সর্বভাবে ভাবময়, সর্ববোধে বোধময়, নির্গুণগুণময়। 'আমি, আমি' করে কী আর হবে! 'জয়গুরু, জয়মা' এই মহিমা নিরন্তর গেয়ে যাও—'মা গুরু, গুরু মা নাই তার তুলনা'।

'মা' বলতে যা বুঝায়—শাস্ত্র বহুমুখে তাঁর কথা কয়, কিন্তু কণা মাত্র নয়। তবে চতুর শিরোমণি যাঁরা, তাঁরাই আজীবন তাঁর মহিমার গান গায়। সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে শুধু তাঁকে মানা। গুরুকে মন দিতে হলে ষোলো আনা মন দিতে হবে, কণাতে হয় না। 'তুমি-তোমার' ভাব যখন অবিরাম ভাবে আসবে তখন বোঝা যাবে কৃপা-করুণার স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

গুরু যদি দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান রূপে না-আসেন, তবে সুখ, অমৃত ও জ্ঞানের আস্বাদন পাওয়া যায় না। সর্বসম্পন্ন হলেন একমাত্র গুরু স্বয়ং। সেই জন্য তিনি অধঃ, ঊর্ধ্বে পূর্ণ, যাঁর স্মরণ মাত্র জেগে ওঠে বোধের স্পন্দন বা সম্বিৎলহরী। তাঁর নাম উচ্চারণ করলে ring চলতে থাকবে। এই ring-এর মাঝখানে নিজেকে পাবে পূর্ণ অদ্বয়বোধে। [২৪।৭।৭৯]

আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই লব্ধ হয়

গুরুর কাছেই কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। গুরু হলেন তিনিই, যিনি জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র সম্বন্ধ বলে দেন। সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণের বাণীতে যে ধ্বনি নেমে আসে তা অবিমিশ্র; কল্পনার বস্তু মিশ্রিত। চিত্ত একমুখী না-হলে ঈশ্বরীয় ক্ষেত্র থেকে অনুভূতির ধারা নেমে আসতে পারে না। বুদ্ধি হল তাঁর প্রকাশের মাধ্যম। বুদ্ধিকে খুশি মতো ব্যবহার করলে সে নামতে পারে না। অর্থাৎ মলিন বুদ্ধিতে শুদ্ধবোধের প্রতিফলন হয় না। দীর্ঘকালের তপস্যায় বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়।

মাতৃঋণ ও গুরুঋণ কেবল নিত্যভজনের মাধ্যমেই কিছুটা লাঘব হয়

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরেও একটা জিনিস বাকি থেকে যায়। তা হল মাতৃঋণ বা গুরুঋণ। মাতৃঋণ বা গুরুঋণ শোধ করা যায় না। পূর্ণতা লাভের পরেও মা ও গুরুকে ভজন করে যেতে হয়। নিত্যভজনের মধ্যে মা গুরু, গুরু মা থাকবেই—

গুরুর মধ্যে আছে মাতা
মাতার মধ্যে গুরু সদা।
গুরুর মধ্যে আছে পিতা
পিতার মধ্যে গুরু সদা।

মাতৃপিতৃ মহাগুরু
একযোগে পরমগুরু।
তিনি আবার গুরু স্বয়ং
তাঁকে দিয়ে হয় তাঁর মহিমার গান॥

তাঁকে দিয়েই সব। নিজের কিছুই থাকে না। নিরানন্দের কারণ হল তাঁকে না-মেনে অহংকারে চলা। মানা এক মুহূর্তের ব্যাপার নয়। সব নিয়ে প্রতিমুহূর্তেই তিনি অখণ্ডরূপে বর্তমান; তাঁর আদি, অন্ত নেই। যেমন গুরুগীতায় আছে—

"গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

সৃষ্টির সর্বস্তরেই আত্মগুরু নিত্যবর্তমান

যাঁকে ব্রহ্ম-আত্মা বলা হয় সেই গুরু সর্ব রূপে, নামে, ভাবে বিরাজিত। প্রত্যেকের মধ্যে খণ্ড ভাবে ও অখণ্ড ভাবে তিনিই আছেন। শক্তি, জ্ঞান, আনন্দের মধ্যেও গুরু খণ্ড ও অখণ্ড ভাবে আছেন। ভক্তি, যোগ, জ্ঞানের মধ্যেও গুরু খণ্ড ভাবে ও অখণ্ড ভাবে আছেন। এতগুলি জিনিস গুরুই প্রকাশ করে দিতে পারেন। গুরুর মাৎসর্য্য নেই। দুই-এর মধ্যে মাৎসর্য্য হয়। কিন্তু অদ্বৈতে জ্ঞান-অজ্ঞান নেই। উভয়কে প্রকাশ করে স্বয়ং তিনিই আছেন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংই আছেন।

সর্ববিধ তত্ত্বের সমাধান ও প্রকাশ যাঁর মাধ্যমে হয় সেই আত্মগুরুই হলেন সর্বোত্তম আদর্শ

এদেশের রীতি ছিল মাতাপিতাকে পূজা করে গুরুর মাহাত্ম্য অনুভব করে গুরুর আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছান। জন্মদাতা গুরু, লোকপিতা গুরু। এ ভাবে গুরু উত্তরোত্তর নিজেকে প্রকাশ করে দেন যথা—মন্ত্রদাতা ও গুরুমন্ত্রের অন্তর্মুখী রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী গুরু, দেবতত্ত্ব ও ঈশ্বরীয় তত্ত্ব প্রকাশকারী গুরু এবং সবশেষে আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ 'একটি মাত্র আমিই আছে' এই সব তত্ত্ব প্রকাশাদির গুরু। আমি-তুমিশূন্য যে 'আমি' সেই 'আমি'-কেও গুরুই প্রকাশ করে দেন। এই জন্য শরণাগতি ছাড়া আর কোনও গতি, গতিই নয়। আর সব দুর্গতি।

গুরু আমাদের ছাড়া নন এবং আমরাও গুরু ছাড়া নই। তা অন্তরে গেঁথে নিলেই কাজ হয়ে যায়। বৃত্তির অন্তর্গত বৃত্তির মধ্য দিয়ে মানুষ চলছে। একমাত্র সুষুপ্তির অবস্থাতেই সব একাকার হয়ে নিবৃত্তি হয়ে যায়। গাঢ় ঘুমে মহাপ্রাণরূপী মা বা গুরু সচেতন হয়ে জেগে কাজ করেন। এমনকী জড় বস্তুর মধ্যেও তিনি প্রতিমুহূর্তে কাজ করছেন; কিন্তু তা স্থায়ী নয়। স্থায়ী অনুভূতি হয় সমাধিতে।

শক্তিরূপী মা-ই আবার গুরুশক্তি স্বয়ং

ক্রিয়াশূন্য কোনও সৃষ্টি হতে পারে না। সর্ববস্তুই ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। শক্তিরূপী মা ছাড়া কিছু হতে পারে না। বস্তুরূপে দেখা হয় ভ্রান্তিবশত। এই ভ্রান্তি মা-ই সরিয়ে দেন গুরুবেশে এসে। তখন বিষয় আর বিষয় থাকে না, বিষয় হয় তখন তাঁর আধার।

গুরুবাণীর মাধ্যমে গুরুশক্তি আত্মবিজ্ঞানরূপে অভিব্যক্ত হয়

শ্রবণের বিজ্ঞান অন্তরে খেললে বোঝা যাবে যে গুরুর অনুগ্রহ হয়েছে। শ্রুত বস্তুর মাধ্যমে গুরু জেগে ওঠেন। গুরুবাণীর মাধ্যমে মা কৃপা করেন। [১২।৮।৭৯]

গুরুর আমির সাহায্যেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আমির পরিচয় জানা সম্ভব

গুরুবাণী হল বাঙ্ময় জগৎ। বাকের উপরে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। বাক্ ছাড়া কিছু বলা যায় না বা ব্যবহার করা যায় না। গাঢ় ঘুমে বাক্ নেই, তাই জিহ্বার ক্রিয়া নেই। বাক্ ও রসনায় ভরা আপাদমস্তক। সেই জন্য মা জিভ কেটে দেখালেন (মা কালীর ছবিতে) এই পর্যন্ত জীবের নমুনা। তার ভিতরে এবং উপরে আর জানা যায় না। অর্থাৎ বহির্জগতের ব্যবহার হল জীবভাব। শুধু রসনা, বাক্যরচনা, উদর বা উপস্থ। পেটের জন্য এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির জন্য এত সংগ্রাম। এর যে কোনও একটি থাকলেই জীবভাব এবং উভয়ের অভাবে হয় দিব্যভাব। এর কোনও একটি থাকলে দিব্যভাব প্রমাণ করা যায় না।

কল্পনা দিয়ে নিজের সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের স্তর হল অজ্ঞানের বা কল্পনার রাজ্য।

অন্তর হল অনুভূতির রাজ্য বা জ্ঞানের রাজ্য। এও কল্পনা ও অজ্ঞান মিশ্রিত; সুতরাং দ্বৈত। দ্বৈত মাত্রই অসত্য। তার বাহির দিকে কল্পনা ও অজ্ঞানের রাজ্য। তা হল বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ। অন্তরে বা ঊর্ধ্বে হল বিজ্ঞানের রাজ্য। তা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান ও গুরুর রাজ্য। তার গভীরে বা ঊর্ধ্বে হল প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, অদ্বৈতের রাজ্য। তাঁর অনুভূতি শুধু গুরু জানেন। এই গুরু হল 'আদি আমি' বা 'মূলের আমি'। এই অনুভূতির আমির কাছে ইন্দ্রিয়াতীত গুরুর আমি সাধ্য এবং প্রজ্ঞানঘন গুরুর আমি দুর্বোধ্য ও কল্পনার বিষয়। কিন্তু গুরুর আমির সঙ্গে তুরীয় প্রজ্ঞানের আমি অভিন্ন। সেই জন্য গুরুর আমি ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত।

বিজ্ঞানঘন এই গুরুর আমির কৃপা ব্যতীত গুরুর আমিকে এবং প্রজ্ঞানঘন তুরীয়-আমিকে জানা যায় না। এমনকী অজ্ঞানমূলক কল্পনার অথবা কল্পনামূলক অজ্ঞানের আমি এবং অনুভূতিমূলক জ্ঞানের আমির স্বরূপও জানা যায় না। সুতরাং তার প্রভাবমুক্ত হওয়া যায় না। স্বরূপজ্ঞানের আমি হল গুরুর আমি। তাঁর লক্ষণ সমজ্ঞান, সমদৃষ্টি ও সমবোধ।

নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে দেবার বা নেবার কিছু নেই। 'এর' মধ্যে নিরন্তর গুরুবাণী উদ্গীত হচ্ছে। এই বাণীর মধ্যে অবগাহন করলে জানা যায় 'আমি' কে? 'আমি' দেহের নয়, যে দেহের ভাবনাতে জীব প্রতিমুহূর্তে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এই হল অমরবাণী, গুরুবাণী, মাতৃবাণী, বেদবাণী, যা স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে গড়া নয়।

বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কৃপাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাৎপর্য অভিব্যক্ত

জানা হল কল্পনা। কল্পনা ভাঙ্গতে পারলে 'মানা' হয়। 'মানা'-র বিজ্ঞানে এক সময় জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে, 'মানা'-তে মুখর হয়ে যাবে। 'মা' হবে গুরু। যে মা সরস্বতীর বীজ, তিনিই আবার সারস্বতবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, যোগবিদ্যা, গুরুবিদ্যা, উপনিষদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা। এই বিদ্যা এখন আবৃত আছে। কেননা জানা-জানি নিয়ে এ বিদ্যা প্রকাশ পায় না। বহু জানা মানে অজ্ঞান। এক জানাতে হয় সমজ্ঞান। আদির আমি হল মা। এক জ্ঞান হল মা। সেই জন্য মহাত্মাগণ বলেন 'মাতৃকৃপাহি কেবলম্', 'গুরুকৃপাহি কেবলম্'। [২১।৮।৭৯]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ তাৎপর্য

পরাশক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে যে সব মাকে দিয়ে কেন আরম্ভ করা হয়। সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই গুরু এবং গুরুই মা। মাকে বাদ দিয়ে গুরু dry হয়ে যায়। এই গুরু, জ্ঞানের গুরু নয়, বিজ্ঞানের গুরু।

হৃদয়ে বিজ্ঞানের দরজা খুলে না-যাওয়া পর্যন্ত কথা কথাই থেকে যায়। এগুলি মায়ের কথা, আমার নয়।

'ক'-এ[১] থাকলে মনে কালীকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়বে। 'ক' হল আদি। 'ক' Primal person। একোঽহম্ হল 'ক'; তারপর বহু অহম্। একের পর এক আসে। সমস্ত আমি হল 'এক আমি'-র প্রতিবিম্ব। 'এক আমি'-কে জ্ঞান দিয়ে ধরা যায় না। গুরুর স্বরূপ হল বিজ্ঞানঘন।

জ্ঞান, অজ্ঞান শব্দসাপেক্ষ এবং বিজ্ঞানও শব্দসাপেক্ষ। জ্ঞান ও অজ্ঞান কল্পনামিশ্রিত কিন্তু বিজ্ঞানে কল্পনা নেই।

জ্ঞানভূমি হল দেবভূমি, বিজ্ঞানভূমি হল ঈশ্বরীয় ভূমি এবং অজ্ঞানভূমি হল জীবের ক্ষেত্র। কাজেই দেবতারাও তোমাদের লক্ষ্য নয়। দেবতারা যখন অসুরের দ্বারা প্রপীড়িত হয় তখন ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হয়। কাজেই দেবতাদের উপরে নির্ভর করে বা আস্থা রেখে চলা মুশকিল। ঈশ্বরের সন্তান সবাই, কাজেই ঈশ্বরের উপরে আস্থা রেখে চললে ঈশ্বরই দেবতাদের নিয়োগ করে দেন সন্তানদের রক্ষার জন্য।

মানুষের সমস্যা cent percent physical, দেবতাদের সমস্যা cent percent mental আর ঈশ্বরের কোনও সমস্যাই নেই। ঈশ্বর ও সদ্‌গুরু একতত্ত্ব। সদ্‌গুরুদের কোনও সমস্যা নেই। সদ্‌গুরুর কাজ হল জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের যে unity বা oneness তা প্রকাশ করা। জীবের জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই তিনটি কল্পিত। বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে এই তিনটি হল identical। যে দিক দিয়ে যাবে এক-কেই পাবে। মা-বাবার সন্তান হারিয়ে গেলে মা-বাবা যেমন কষ্ট পান, সেইরূপ ঈশ্বরীয় ক্ষেত্র থেকে জীব যখন ভ্রষ্ট হয়ে যায় ভগবান তখন সদ্‌গুরুরূপে এসে আহ্বান করেন। সন্তান বাড়ি থেকে বেরিয়ে জ্ঞান-অজ্ঞানের রাজ্যে আটকে যায় যখন, তখন সহজে আর আপনঘরে ফিরতে চায় না। তখন সদ্‌গুরু এসে এমন জ্ঞানালোক দেন যার সাহায্যে জীবের জ্ঞান, অজ্ঞানের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান যদি কারওর অন্তরে একবার কাজ আরম্ভ করে তাহলে জাগতিক আকর্ষণ তার কমে যায়; তখন তার মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়। তখন বিজ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করে। সেই মনকে বহির্জগতের কোনও বস্তুই আর আকর্ষণ করতে পারে না।

জ্ঞানাগ্নি হল গুরুর দেওয়া বাণী। এই আগুনের কাজ হল সবাইকে rescue করা। Supreme import দিয়ে সবকে invest করা এবং finally convert করা। জ্ঞানাগ্নি সবকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়; কিন্তু বিজ্ঞান ছাই করে না। তাকে transform করে নেয়।

স্বরূপত জীব বিজ্ঞানঘন। ব্যবহারদোষে তার উপর কতগুলি অজ্ঞানের আবরণ পড়ে। সাধনার মাধ্যমে সেই আবরণকে বিজ্ঞান সরিয়ে দেয়। জ্ঞান কিন্তু আবরণকে শুধু নয়, সবকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ফলে জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হয়। জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হলে নিজের কল্পনা দিয়ে তা সৃষ্টি করে নেয়। বিজ্ঞানক্ষেত্রে তিনটি ভাগ আছে, যথা—rescue করা, import করা, ও invest করা। গুরু সেই বিজ্ঞানহৃদয়ে খেলতে চান বা বিজ্ঞান-হৃদয়ে উদ্ভাসিত হতে চান। তাকে নাশ করা যায় না। সেই জন্য হৃদয় হল 'ক'। 'ক'-কে বাদ দিলে কর্ম চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। কর্মশক্তি নেমে এসেছে পরাশক্তি থেকে। কর্ম নাশ করার কোনও শক্তি নেই। কর্মকে অতিক্রম করার শক্তি divine person-এরও নেই।

জানার বিজ্ঞান ও মানার বিজ্ঞানের তাৎপর্য

'মানা'-র বিজ্ঞান ও 'জানা'-র বিজ্ঞানে তফাৎ হয়। জানাতে কল্পনা থাকবেই। মানাতে যেমনটি বলা হয় তেমনটিই রাখতে হয়। অখণ্ডকে কল্পনা করা যায় না। খণ্ডের মানা হয় কল্পনাতে। অখণ্ডের মানা হয় বিজ্ঞান দিয়ে। বিজ্ঞানক্ষেত্রে

১। 'ক'-কে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ অধ্যাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। 'এক কথা'-র বিপরীতক্রম হল 'ক'-এ থাক। 'ক' মানে কালী, কৃষ্ণ, কেন্দ্র, কারণ, ব্রহ্ম, আনন্দ, হৃদয় প্রভৃতি। 'ক'-এ থাকা মানে আত্মবোধে থাকা। 'ক'-এর বোধই হল শুদ্ধবোধ। শুদ্ধবোধই হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর প্রভৃতি। সেজন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সকলকে 'ক'-এ থাকতে বলেন।

তাঁর প্রকাশের সূত্র বাঁধা রয়েছে। হৃদয়তে কান পেতে শোনে মন প্রজ্ঞাধ্বনি, গুরুবাণী, উদ্গীত সঙ্গীত আত্মবাণী। সেই বাণী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ যা বাণী তাই আমি। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান সমান। বিজ্ঞানগুরুর বিশেষত্ব হল এক ভূমিতে থেকেও তাঁর কর্ম সব স্বতন্ত্র; পরতন্ত্র নয়। তিনি অন্য ভাবে কাজ করেন না। স্ববোধে স্বভাবে, স্বনামে স্বরূপে কাজ করেন বা আপনবোধে, আপনভাবে, আপননামে, আপনরূপে সে কাজ করেন—

আপনাতে আপনি থাকে যদি যুক্ত
সেই সত্য শাশ্বত নিত্যমুক্ত
আপনাকে ছাড়িলে আপনাকে ভুলিলে
হয় আপনি বিকারগ্রস্ত।

জ্ঞানগুরুকে বা বিজ্ঞানকে ছাড়লে বিকার হবেই। আবার গুরুর কাছে গেলে সেই বিকার সরে যায়। গুরুর দৃষ্টিতে সংসার[1] হল সমসার আর জীবের দৃষ্টিতে সমসার হল সংসার, বিষ্ণু হল বিষয়, মানা হল কল্পনা। সেখানে জানা হল ভ্রান্তি।

নিত্যলীলার বিজ্ঞান

ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে মানুষ আনন্দ পায়। সে যদি চার-পাঁচজনের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং এটি যদি কেউ জানতে পারে তবে তার খুব আনন্দ হয়। সে রকম বিজ্ঞানক্ষেত্র থেকে গুরু মানুষকে সেই আলো দেন যে আলোর দ্বারা পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যেও মানুষ নিজের আমিকেই খুঁজে পায়। অর্থাৎ সকলের মধ্যেই এক 'আমি'-কেই সে তখন দেখে। তখন তার কত আনন্দ হয়, ভেবে দেখ। আর পৃথক পৃথক হয়ে যাবার ফলে তার হয় বিপদ। সকলের মধ্যে Self-কে খুঁজে পেলেই হয় নিত্যলীলা। সেখানে নিজেকে নিয়ে নিজে খেলছে। তাই নিত্যলীলাতে হয় 'বিকারবিহীন পরিণাম'[2]। সে নিজেই নিজের বিষয়। স্ববোধ-বোধে, স্বভাব-ভাবে, স্বনাম-নামে, স্বরূপ-রূপে নিত্যলীলা হয়। [২৯।৮।৭৯]

প্রত্যেকের হৃদয়ই হল কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য ঈশ্বর-আত্মা বিজ্ঞানময় গুরুর অধিষ্ঠান

প্রত্যেকের হৃদয়ে যে আসল স্থান অর্থাৎ প্রত্যেকের আমি-র মধ্যে যে শুদ্ধ পবিত্র কেন্দ্র রয়েছে সেখানে আছেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ সদ্গুরু—সত্য, শিব, সুন্দর। সেই হল ঈশ্বর-আত্মা বিজ্ঞানময়পুরুষ বা অক্ষরব্রহ্ম সেখানে দ্বিতীয় কারওর স্থান নেই। এই হল কূটস্থের পরিচয় (সাক্ষিচৈতন্য)।

কাঁচা-আমির হৃদয়কেন্দ্রেতেই পাকা-আমি অবস্থান করে

জীবের কাঁচা-আমি বা অহংকারের নকল-আমি হৃদয়ের সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান জানে না। কাজেই গুরু যখন সেই সন্ধান বলে দেন, জীব অবাক হয়ে ভাবে যে কী করে আমার মধ্যে গুরুর আমি আছে? আমার মধ্যে তো আমি আছি।

এই গুরুকে লক্ষ্য করেই জগৎগুরু শংকরাচার্য গুরুর দক্ষিণামূর্তি স্তব গেয়েছিলেন।

১। সংসার—গুরুর দৃষ্টিতে সংসার হল সম+সার। অর্থাৎ সমত্বই যেখানে সার। গুরু সংসারে থেকে সমবোধে সব কিছুর ব্যবহার করেন। কিন্তু অবিদ্যা, অজ্ঞানবশত জীবের কাছে সংসার = সং+সার। অর্থাৎ তার কাছে সংসারই থাকে; যেখানে সব কিছুই মিথ্যা।

২। বিকারবিহীন পরিণাম—আত্মাকে অবলম্বন করেই সর্বশক্তির প্রকাশ হয়। আত্মার কোনও বিকার হয় না। শক্তির বিকার, নির্বিকার আত্মা দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেই কারণে শক্তিযুক্ত আত্মলীলাকে 'বিকারবিহীন পরিণাম' বলা হয়েছে।

গুরুই দেন গুরুদক্ষিণা, শিষ্য নয়

গুরুর দক্ষিণা গুরুই দেন, শিষ্য দিতে পারে না; শিষ্যের নিজস্ব কিছু থাকলে তো দেবে? গুরু নিজেকে প্রকাশ করেন মানারূপ বৃত্তি দিয়ে বা অখণ্ড বোধকে আপনবোধে ব্যবহার করে। 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল তাঁর ব্যবহার। যা-কিছু আছে অন্তরে-বাইরে সব গুরু—তা মানা হল গুরুদক্ষিণা। না-মানলে ভাবের ঘরে চুরি করা হয়।

হৃদয়ের দ্বাদশপদ্মে যে বিজ্ঞানগুরু আছেন তিনি হৃদয়ের দ্বাদশ দ্বার খুলে দেন

অনুভূতি হলে হয় গুরুর প্রকাশ। হৃদয়ের গবাক্ষে একটু আলো এলে বুঝবে গুরুর আলো। এ ভাবে গুরু দ্বাদশ দ্বার খুলে দেন। তখন আত্মসূর্যের জ্যোতি বা দ্বাদশ আদিত্যের জ্যোতি একসঙ্গে প্রকাশ পায়। তা-ই আত্মগুরুর স্বরূপ। এক সূর্যই জগৎকে মাত্ করে রেখেছে, সেখানে দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশে যে অবস্থা হয় তা অকল্পনীয়। দ্বাদশ আদিত্যের স্থান হল 'গুরুর আমি'-র মধ্যে। সর্ববস্তুতেই গুরুকে মানা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় ভজনের মাধ্যমেই। জানাজানি বোঝাবুঝি দিয়ে তা হয় না।

গুরুবাণী শুনে হৃদয় কুম্ভ পূর্ণ হলে মানার মাধ্যমে আত্মবোধের জাগরণ হয়

সর্ববস্তুতে গুরুবোধ ফুটে উঠলে 'আমারবোধ'-এর ব্যবহার আর হয় না। খোলস আপনিই পড়ে যায়। যেমন কার্পাস তুলোর ফলের ওপরের আবরণ ফেটে গেলে তুলো আপনিই বেরিয়ে পড়ে। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব শুনতে শুনতে অন্তর বা হৃদয় কুম্ভ পূর্ণ হলে মানার মাধ্যমে এক সময় গুরুবোধ ও আত্মবোধ আপনিই ফুটে উঠবে। নকল-আমিকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'আমার আমি'-র লেজ খসে পড়তে সময় লাগে। গুরুর তেজ বা তাপ হৃদয়ে জেগে উঠলে 'আমার আমি' আপনিই খসে যায়। যতক্ষণ 'আমার আমি' বোধ আছে ততক্ষণ গুরুভাবটি আর আসে না।

হৃদয়ের দ্বার খুলে গেলেই হৃদ্‌পুরুষের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়

দ্বাদশ আদিত্যের পরিক্রমা পূর্ণ হলে এক এক করে হৃদয়ের দরজা খুলে যায়। প্রতি বন্ধ দরজায় গুরু জ্বেলে দেন একটি একটি করে প্রদীপ। তার নাম অব্যয়প্রদীপ। তার তাপে ভিতরের জ্ঞানদীপ[১] জেগে ওঠে। অর্থাৎ কল্পনার আবরণটি পুড়ে যায়। কল্পনা দাহ্যবস্তু, তা যখন পুড়তে থাকে তখন হয় যন্ত্রণা[২]। যন্ত্র-টা 'না' হতে থাকে। যত 'না' জাগে তত যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন সম্পূর্ণ 'না' তে চলে যায় তখন বেদস্বরূপ প্রকাশ পায়। [৪।৯।৭৯]

ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গে

ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর vital point-টি বললেন—তুমি যদি গুরুর কাছে অনুগত হয়ে থাক, তবে তোমার কোনও সমস্যা থাকে না। যদি তুমি ভগবানকে মান তাহলে তুমি এত চিন্তা করো না। তুমি যদি গুরুর কথা ভাব, তবে গুরু তোমার সব ভাবনা নিয়ে নেবেন। তাঁকে কৃপাবোধরূপে পেলে ব্রহ্মচর্য পালনের দুশ্চিন্তা আর থাকে না।

১। জ্ঞানদীপের অর্থ এখানে আত্মগুরুর কৃপানুভূতি।

২। যন্ত্রণা—জীব হল কূটস্থ আত্মার প্রকাশ মাধ্যম বা যন্ত্র। তা বুদ্ধিদোষে ভুলে গেলেই এই যন্ত্রের মধ্যে কূটস্থ সাক্ষী আত্মার প্রকাশ আর স্বতঃস্ফূর্ত হয় না; ব্যাহত হয় ও বিকৃত হয়। তখনই হয় যন্ত্রণা। তাই বলা হয়েছে গুরুর যন্ত্র না-হলে যাবে না জীবের যন্ত্রণা।

গুরুর উপরে নির্ভর করলে গুরুই সব ভার নেন। যাঁর দেহ তিনিই ভাববেন। মানুষ নিজে এই দায়িত্ব নিতে পারে না বলে আরেকজনের উপর দায়িত্বভার দিতে হয়। যেমন ডাক্তারকে রোগীর ভার নিতে হয়। বৃহৎ—যিনি সকলের 'দেহ' বানিয়েছেন, সকলের অলক্ষ্যে থেকে যিনি সব দেহকে চালাচ্ছেন এবং পরিশেষে সকলকে যাঁর কাছে যেতে হবে তিনিই তোমার সকল ভার নিয়ে বসে আছেন। সুতরাং তাঁর উপরে পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। বর্তমানের এই জীবন শুধু ক্ষণিকের স্বপন মাত্র।

গুরুর কৃপা ও সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে ব্রহ্মচর্য কেউ পালন করতে পারে না। যদি নিজেকে সচেতনবোধে গুরুর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ স্বকীয় পুরুষকার ও উদ্যম, উৎসাহের মধ্যে সদ্‌গুরুর উপস্থিতিকে বিশ্বাস করে মানতে পারলে দেখতে পাবে গুরুভাব কী করে অজ্ঞাতসারে কাজ করে। গুরু কী ভাবে মনকে divert করে নিয়ে যায় তা বুঝতেও পারবে না। তাঁকে ডাকতে ডাকতে দেহের কথা যদি বিস্মৃত না-হওয়া যায় তবে তাঁকে ডাকাই হয় না। মন যদি পরমপদে থাকে দেহের কথা আর মনে থাকে না।

গুরুকৃপাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এ যুগের আবিষ্কার যদি কিছু থাকে তা হল সত্যকে পেতে হলে মহাজনের কাছে তাঁর কৃপার মাধ্যমে তা পেতে হবে। কৃপা ছাড়া অসুরের মতো তা ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। [১১।৯।৭৯]

গুরুবাণী রোমন্থনের তাৎপর্য

সত্য আবৃত হয়ে যায় ব্যক্তিগত ব্যবহারদোষে। ব্যক্তিগত ব্যবহার সৃষ্টি হয় যুগ যুগান্তরের বহির্মুখী মনোভাব থেকে। তাকে অন্তর্মুখী করতে হলে গুরুবাণীর রোমন্থন করতে হয়। শ্রুত বস্তুর ভাবনাতে নিজের নকল ভাব (কাঁচা-আমির ভাব) আপনিই সরে যায়। এটাই হল আবরণ মোচনের বিজ্ঞান।

গুরুবাণী শ্রবণ করে তা মনে গেঁথে নেওয়া হল সত্যবোধে প্রতিষ্ঠা। গুরুবাণী ভাবতে ভাবতে কাঁচা-আমি অন্তর্হিত হয়। কল্পনা বা বিপর্যয় থেকেই সৃষ্টি হয় কাঁচা-আমি।

গুরুর পরিচয়

আসল গুরু কে? কাকে গুরুভজন করছি? যাঁকে ব্যক্ত কবা যায় না, তাঁকে মানুষ ব্যক্ত করছে। ভগবানকে ঘুষ দেওয়া হয়, কিন্তু গুরু এমনই একজন যিনি ঘুষ নেন না। তিনি সমানে থাকেন। তাঁর দেশও নেই, ক্রিয়াও নেই। তাঁকে কী দিয়ে মানুষ ঘুষ দেবে? তাঁর নাম ও ভাবনা ভাবতে ভাবতে মনের আবরণ সরে গেলে পুনরায় ফুটে ওঠে যে দিব্যভাবনা তা-ই যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিরূপে ফুটে উঠছে, সেই বিষয়ে সে সচেতন হয়। যেমন কাদামাটিতে জল ঢালতে ঢালতে চারাগাছ আপনিই ফুটে ওঠে তেমনি জীবরূপে তিনিই স্বয়ং প্রকাশ। তিনি'আছেন বলে মন, বুদ্ধি সচেতন হয়ে ক্রিয়া করে। তাঁর অস্তিত্বেই জীবন প্রাণরূপে ফুটে ওঠে। তাঁর অভাব কখনও হয় না। সব 'না' যেখানে 'না' হয় তা-ই নাই অর্থাৎ শূন্য। যেখানে সব 'হ্যাঁ' হয় (all acceptance) সেখানেও তাঁর পরিচয়। [১৫।৯।৭৯]

চিন্তা ও ভাবনার মাধ্যমে বিচার ও ধ্যান সিদ্ধ হয়

অন্তরে চিন্তা ও বিচার পরিপূর্ণ না-হলে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয় না। সাধনার সারমর্ম যদি কিছু থাকে তা হল চিন্তা। কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি সব কথার কথা মাত্র। চিন্ময়কে নিয়ে চিন্তা করা হল সাধনা। চিন্তামণি রয়েছেন চিন্তার গভীরে। চিন্তামণি স্বয়ং গুরু। তিনি ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম পরম।

গুরু সবিকার হয়েও নির্বিকার; কারণ সদ্‌গুরু নিত্য অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়কে জানেন। পূর্ণে থেকেও দুই-এ থাকেন। যে তাঁর ভাবটি পরিপূর্ণ গ্রহণ করে, তার ভিতরে তিনি তা-ই হয়ে যান। পরিপূর্ণ গ্রহণ হল All acceptance or all surrender।

পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা হয় গুরুবাণীর মাধ্যমে 'মেনে, মানিয়ে চললে'

যোলো আনা মন না-দিলে অদ্বৈতের ঘরে যাওয়া যায় না। পরিপূর্ণ ভাবে অন্তর্মুখী হয়ে যেতে মা বা গুরু হাতে ধরে নিয়ে যান। শৈশব থেকেই মানুষকে গুরুই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। শুধু বলেন—চল। থেমে গেলে আঘাত পাবে। ব্যথা, বেদনা আসে থেমে যাবার জন্যই। তাইতো গুরু বলেন—ক্রমের পথে বা ব্রজের পথে[১] এগিয়ে চল। বাহির ছেড়ে অন্তরে চল। অন্তরের পথ ফুরায় না। কিন্তু বাইরের পথ সীমিত। বাইরে মা হল অবিদ্যামায়া[২], অন্তরে বিদ্যামায়া[৩]। অর্থাৎ মা আয়া। মা-কে পেতে হলে গুরুবাণী দিয়ে অন্তরে যেতে হয়।

গুরুবাণীর অভিনব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

গুরুবাণী বা ধ্বনি হল রাই (মহাপ্রাণ রাধা)—যে রাই মিশে যায় শ্যাম সনে। 'রা' হল শব্দ। এই 'রা'-ই প্রণব, যা থেকে সব শব্দ উদ্গীত হয়। আবার যার মধ্যে সব বর্ণ মিশে যায়। তখন হয় 'ম'। 'রা'-এর সঙ্গে 'ম' যুক্ত হয়ে হয় রাম। অর্থাৎ মনকে গুরুবাণীতে ডুবিয়ে দিলে হয় রাম। যে মন দেহের বিকারে যুক্ত থাকে, সেই মনই গুরুবাণীতে প্রবেশ করলে হয় নির্বিকার।

শব্দ হয় চিদাকাশে। মন গুরুবাণীতে প্রবেশ করলে 'সোঽহম্'-ধ্বনি আপনিই উদ্গীত হয়। 'সোঽহম্' অর্থ হল সবই আমি।

'বাম' হলে লক্ষ্যভেদ হবে। 'রা' হল একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে 'রাধা রাধা' বাজে। রাধা অর্থাৎ যিনি 'রা'-কে ধারণ করে আছেন বা গুরুবাণীকে ধারণ করে আছেন। বহির্মুখী প্রাণধারা অন্তর্মুখী হলেই হয় রাধা।

এই গুরুবাণীকে ধারণ করে থাকতে হবে এবং আর সব ত্যাগ করতে হবে। গুরুবাণীর মধ্যে এমনই একটি light আছে। যত তত্ত্ব সবই 'রা'-র মধ্যে মিশে গেছে। তাঁর চলার পথ একটিই। গুরুরও এক—তাঁর দুই হয় না। গুরু হলেন তিনিই, যিনি 'গু'-কে রুদ্ধ করেছেন বা দ্বৈত ও অদ্বৈতকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছেন। [১৮।৯।৭৯]

ব্রহ্মানুভূতির বা আত্মানুভূতির স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞান

গুরু, ইষ্টকে ভালবাসা মানে সমগ্রতাকে আপনবোধে বরণ করে নেওয়া। সর্ব অঙ্গকে সর্ব অঙ্গ দিয়ে, সর্বনামকে সর্বনাম দিয়ে, সর্বভাবকে সর্বভাব দিয়ে এবং সর্ববোধকে সর্ববোধ দিয়ে বরণ করার নামই হল শাস্ত্রের ভাষায় ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি। [৬।১১।৭৯]

'মানুষ' শব্দের স্বানুভবসিদ্ধ তাৎপর্য

গুরু অন্তরকে দেখার দৃষ্টি খুলে দেন। তিনি বলেন—তুমি মানুষ, তুমি হুঁশ বা বিশুদ্ধ চৈতন্যকে মেনে চল। তাহলে দেখবে তুমি অনন্ত, অখণ্ড। তোমার কোনও সমস্যাই নেই। [১১।১১।৭৯]

গুরুর প্রকাশ গুরুবোধেই হয়

গুরুর নির্দেশ অনুসারে চলতে চলতে এক সময় নিজেই গুরু হয়ে যাবে। [২০।১১।৭৯]

গুরুর পরিচয়

গুরু হলেন embodiment of all laws, embodiment of all justice and peace। [৪।১২।৭৯]

১। ব্রজের পথে—মনের অন্তর্মুখী গতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

২। অবিদ্যামায়া—মলিনসত্ত্ব—রজোতমোপ্রধান।

৩। বিদ্যামায়া—শুদ্ধসত্ত্ব চিদাভাসযুক্ত; কেন্দ্রে হল মা—কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য।

সবার পরিচয় গুরুর মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়

সংসারে সত্যবস্তু যে কী তা যাঁর মাধ্যমে অন্তরে উদিত হয়, তাঁর নামই গুরু। এই গুরুর প্রথম স্তর হল পিতামাতা। সব দেবতার ঘনীভূত রূপ হল পিতামাতা। এই পিতামাতাকে বাদ দিলে সব হারিয়ে যায়।

বন্ধনমুক্তির কারণ জীব স্বয়ং

অধ্যাত্মসাধনক্ষেত্রে নিজের ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই দায়ী করতে হয় এই ভেবে যে ঈশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মার পরিচয় সকলেই পাচ্ছে, আমি কেন পাচ্ছি না। আত্মার পরিচয় অর্থাৎ দেহখাঁচার মধ্যে আত্মা কী ভাবে আছে? দেহের মধ্যে সাতটি আকাশ বা স্তর আছে, সেগুলি ভেদ করা খুব শক্ত। কেবলমাত্র তীব্র ব্যাকুলতা ও গুরুনিষ্ঠা থাকলে এই সপ্ত আকাশ বা সপ্তস্তর বা সপ্তস্বর্গ অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়।

সংযত জীবনে একমুখী ভাবে গুরুকৃপায় হয় মুক্তি

একমুখী ভাবে যেতে হলে বহুমুখী ভাবকে সংযম বা সংহরণ করতে হয়। বিনা সংযমে আধ্যাত্মিক পথে আসা বিলাসিতা। সেই জন্য গুরু নির্দেশ দেন—তুমি সংসারে থাক কিন্তু সংসারকে তোমার মধ্যে ঢুকতে দিও না। বিচার বা লক্ষ্য ঠিক রেখে সচেতন হয়ে সংসারে চলতে হয়।

গুরুকৃপায় সাধনক্রমে পঞ্চম স্তরে আত্মসত্তা পরমাত্মসত্তায় মিলে যায়

সাধনার পঞ্চম স্তরে গিয়ে টের পাওয়া যায় যে জগৎ হল প্রতিবিম্ব। সবটাই অন্তরের অভিব্যক্তি। পঞ্চম স্তর অতিক্রম করে তারপর পৌঁছান যায় পরাপ্রকৃতিতে। এই পরাপ্রকৃতি হল ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং আকাশতত্ত্বের উপরে যার স্থান। এখানে গুরুশক্তি দিয়ে যায় আকর্ষণীশক্তি। এই আকর্ষণী শক্তি দিয়ে যায় আত্মসত্তা। আত্মসত্তা পৌঁছে দেয় পরমাত্মসত্তায়।

গুরুকৃপায় মানুষ আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অভী হয়ে যায়

গুরুবাণী হল আগ্নেয়াস্ত্র বা ব্রহ্মাস্ত্র। গুরুবাণী নিয়ে যে চলে তার ভয়ের কিছু থাকে না। অভী না-হলে জীবভাব কাটে না। অচ্যুত ভাবে যেতে হলে তাঁর কৃপা প্রয়োজন। যতই গুণ থাক ঈশ্বরীয় কৃপা বিনা জীবন বৃথা। তাঁর কৃপা লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয়। মানুষ বস্তু জগতের অভাব পূরণের জন্য কত চেষ্টা করে, অথচ তার অংশমাত্র চেষ্টাও যদি মানুষ ঈশ্বরের জন্য করে তাহলে তাঁর মহিমা বুঝতে পারে।

অখণ্ড সত্য প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান হল 'All Divine for All Time, as It Is'

প্রাণ ছাড়া বস্তুর মূল্য নেই। মন ছাড়া প্রাণের ব্যবহার নেই। সত্য ছাড়া মনের অস্তিত্ব নেই। সেই জন্য অখণ্ড সত্যের বিজ্ঞান প্রয়োজন। এই কারণেই 'All Divine for All Time, as It Is' জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

গুরুবাণী হল মহামন্ত্র—তার অভিনব মহিমা

গুরুবাণী হল শ্রীরামচন্দ্রের তীর, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন, শিবের ত্রিশূল, চিদানন্দময়ী মায়ের হাতের খাঁড়া। জগতে প্রয়োজন হলে তাঁরা এই মহামন্ত্র দিয়ে কল্যাণসাধন করেন। হৃদয়ে বিজ্ঞানরূপী গুরু বা মা মহাতেজে জেগে ওঠেন। জেগে না-উঠলে শোধন আরম্ভ হয় না। জেগে উঠলে তমোরজোগুণের প্রভাব কেটে যায় এবং প্রাণের নিস্তেজতা, মনের অলসতা এবং দেহের জড়তাও কেটে যায়। [১৬।১২।৭৯]

অষ্টম অধ্যায়

বাক্ মন্ত্র, মন গুরু ও প্রাণ দেবতার অভিনব বর্ণনা

সচ্চিদানন্দময়ী মা এবার বাকের মাধ্যমেই সত্যকে প্রকাশ করছেন। বাক্ হল মন্ত্র। মন বাকের অন্তর্গত। সেই জন্য গুরুবাকের অনুভূতি হল দেবতা। বাক্ হল মন্ত্র, মন গুরু এবং প্রাণ দেবতা। যতক্ষণ সৃষ্টির মধ্যে থাকতে হয় এই তিনের বাইরে কেউ যেতে পারে না। তিনের ঊর্ধ্বে গেলে হয় বাক্শূন্য। তদূর্ধ্বের কথা বললে 'এর' (নিজের দিকে দেখালেন) বিশ্রাম হয়। সেখানে কোনও বাক্ নেই। সে হল গাঢ় ঘুম বা সুষুপ্তিরও উপরের স্তর। সেখানে কোনও অবলম্বন নেই। আছে শুধু বোধময়সত্তা। [৬।১।৮০]

যথার্থ জ্ঞানের পরিচয়

সদ্গুরুর পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মধুর কণ্ঠে তাঁরই মুখনিঃসৃত একটি ভজনের দু'টি মাত্র কলি গাইলেন এবং সেই প্রসঙ্গে বললেন—

আমার যে আপন সে যে নিত্য একজন
জুড়ে আছে বিশ্বভুবন
একেই বলে গুরু আত্মা হরি নারায়ণ।

পাণ্ডিত্য অর্জন করে অধ্যাত্ম সাধনার জ্ঞান দান করলে জ্ঞান দানের চাইতে অজ্ঞান দানই বেশি হয়। পাঠে অভিমান হয়। সেই জন্য যারা সহজ সরল কর্মী তাদের ক্ষেত্রে গুরুবাণী বেশি কার্যকরী হয়। গুরু যে অগ্নিকণা দিয়ে দেন তা নাশ হয় না বা আবৃত হয় না। এই জ্ঞানাগ্নি হল তাঁর সাধনসিদ্ধি। একে misuse করতে গেলে বিব্রত হতে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত এর misuse হয় না। দু-তিন জন্ম পরেও আবার এই জ্ঞান তার মধ্যে প্রকাশ পায়। জাগতিক জ্ঞান ধ্বংস হয় কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞান ধ্বংস হয় না। জাগতিক জ্ঞান হল জ্ঞানের আভাস। যথার্থ জ্ঞান হল অন্তরে। [১৩।১।৮০]

আত্মজ্ঞান লাভ না-করা পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বকৃত কর্মফল ভোগ করতে হয়

ভাগ্য কী তা মানুষ জানে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অধ্যাত্মবিদ্যা অনুশীলন করে কর্মময় জীবন থেকে ধর্মময় জীবনে পৌঁছায়। যখন ধর্মময় জীবনে উপনীত হয় তখনই আরম্ভ হয় নিজের দোষ খুঁজে বের করা এবং তা শোধন করার জন্য বিদ্যা অর্জন করা। এই বিদ্যা হল গুরুগত বিদ্যা। গুরুর নির্দেশ যথার্থ ভাবে পালন না-করে এই বিদ্যা লাভ করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ব্যতীত যারা গুরুর কাছে কোনও কিছু লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যায় তাদের সেই বিদ্যা আয়ত্ত হয় না।

নিজের স্বরূপের পরিচয় না-পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই তার নিজের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের জন্য নিজেই দায়ী। অতীতের কর্ম অনুযায়ী জীব তার কর্মফল ভোগ করে। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম অনুযায়ী ভবিষ্যতে ফল আসবে।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের তাৎপর্য

এক সত্যকে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা। সত্য হল গুরুবাণী; যেমন ভাবে গুরুমুখে শোনা হয় ঠিক তেমন ভাবে ধারণ করতে হয়। ভক্তি হল সেই শ্রুত বাণীকে পালন করা অর্থাৎ ভজন করা। ভক্তি দিয়ে হয় ভজন। তার মধ্যে থাকবে ষোলো আনা শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তার যে ফল উপস্থিত হয় তা হল বিশ্বাস।

গুরুবাণীর অভিনবত্ব

গুরুবাণী হল আদরিণী মা। তাই সিদ্ধপুরুষ কমলাকান্তের মুখ থেকে উদ্গীত হয়েছিল—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে/মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।' তার মানে হৃদয়ে যা রাখবে বাইরে কেউ যেন তা টের না-পায়। অর্থাৎ গুরুবাণী নিয়ে বাইরে আলোচনা করতে নেই। সত্যের বাণী হল মর্মের বাণী, হৃদয়ে রাখ। বাইরে প্রকাশ করো না। বেদনা ও আনন্দ অন্তরে জানাতে হয় এবং অন্তরেই রাখতে হয়।

গুরুর জীবন

আনন্দ দুর্লভ বস্তু। ধনুকের তীর একবার নিক্ষেপ করলে যেমন আর ফিরে আসে না, সেইরূপ হৃদয়ের জিনিস একবার বাইরে বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। এ ভাবে জীবনীশক্তি বিকৃত, মলিন ও আবৃত হয়। তখন কান্নাকাটি করলেও আর পাওয়া যায় না। কারণ গুরু কোমল হতেও কোমল আবার কঠিন হতেও কঠিন। এই দু'টি ভাব যাঁর মধ্যে আছে তিনিই সদ্‌গুরু।

সদ্‌গুরু হলেন জীবলোকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্তি। সদ্‌গুরু ব্যতীত ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যেমন গরুর শরীরে দুধ আছে কিন্তু তা শুধু বাঁটের মুখে মেলে। তা ছাড়া গরুকে dissect করে কোথাও পাওয়া যায় না। আবার দুধে মাখন থাকে তাও মন্থন না-করে পাওয়া যায় না। সেইরূপ বিশ্বজুড়ে ভগবান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁকে সদ্‌গুরু বা সিদ্ধ মহাত্মা ও মহাপুরুষদের মধ্যেই পাওয়া যায়। তা শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস মন্থন করে পাওয়া যায়। সেই জন্য মাখন হল কোমল। কঠিন হল তপস্যা। এই দুই মিলে হল গুরুর জীবন।

অনুগত শুদ্ধ ভক্তকে সদ্‌গুরু ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেন

জীব ব্রহ্মভাব পায় সদ্‌গুরুর কাছে। তিনি direct ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। এই গুরু সাক্ষাৎ বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসু জীবকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। জীবভাব কেড়ে নিয়ে অন্তরের ভাব শোধন করে দেন। 'আমি-আমার ভাব'-কে নিজে গ্রহণ করেন। নিজের জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা 'আমি আমার ভাব'-কে পুড়িয়ে ছাই করে তার মধ্যে 'ব্রহ্মের আমি'-কে বসিয়ে দেন। 'গুরুর আমি'-কে গন্ধর্ব কিন্নর, দেবতা, সিদ্ধ, সাধক, মুনি, ঋষি, মুক্ত, যোগী, সন্ন্যাসী, গুরুকর্মী সকলেই মাথা নত করে মেনে নেন। এই গুরুই হলেন ব্রহ্ম। গুরুগীতায় গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা আছে—

'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।
নিত্যশুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যমেকং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।'

মন দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে গুরুবাণী গ্রহণ করলে হৃদয়বোধের সন্ধান মেলে

গুরুবাণীকে শুধু মন দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। মন-বুদ্ধির খেলাতে গুরুপদে পৌঁছানো যায় না। একমাত্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম হয়। এ হল quintessence of Vedas; যতটুকু অব্যয়বীজ প্রয়োজন ততটুকু সচ্চিদানন্দময়ী মা ভজনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। জীব 'আমি আমার ভাব' নিয়ে চলে বলে তা ধরতে পারে না। জীব যখন ব্রহ্মভাবে আসে তখনই অব্যক্ত থেকে গুরুবাণী ব্যক্ত হয়ে জীবনে প্রকাশ পায় এবং জীবের জীবভাব কেড়ে নিয়ে গুরু আত্মতত্ত্বে ব্রহ্মতত্ত্বে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। [১৫।১।৮০]

গুরুর পরিচয়

গুরুর আসন হল হৃদয়ে। তোমবা যে প্রত্যেকে 'আমি', 'আমি' করে নিজের পরিচয় দাও, সেই 'আমি'-ই হল তাঁর আসন। 'আমি'-র মধ্যেই গুরু বসে আছেন। গুরুর মধ্যে আছে সব দেবতা, সব শাস্ত্র। যদি নিজের আমির পরিচয় প্রকাশ পায় তাহলে গুরুর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্যই হল শুদ্ধ আমির স্বরূপ। আমি বোধের লক্ষ্যার্থ হল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মা। বাচ্যার্থ হল অহংকার।

গুরু না-হলে কোনও সাধনা হয় না। গুরু হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং। তিনি আবার সগুণে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ; রূপময়-নামময়-ভাবময়। দেহে কুণ্ডলিনী শক্তি হল গুরুশক্তি। শ্বাস-প্রশ্বাস হল তাঁর দুই পদ। এক পদে বাইরে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন, আরেক পদে অন্তরে গুটিয়ে নিচ্ছেন। দুই পদ নিয়ে হল তাঁর বিশ্বসংসার। দুই চরণ আমিরূপে বসে আছে। আমি হল সমপদ—অন্তর ও বাহির জুড়ে বসে আছে।

সমপদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিন্দুতে। বিন্দু হল রূপ। শ্বাসের বাহির ও অন্তর গতির মাঝখানে। দুই চোখের মাঝে রূপের স্থান। ডান চোখে সূর্যের এবং বাম চোখে চন্দ্রের স্থান। দু'য়ে মিলে হয় আত্মতেজ। দিব্যরূপ আছে পিছনে বা বিন্দুর ঊর্ধ্বে। যাঁর বক্ষে বিন্দু লয় হয় সে-ই হল নিরঞ্জন। সে সবারই আপন ব্রহ্ম, আত্মা, কৃষ্ণ, গুরু, মা, বাবা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি যা বলবে তা-ই।

রূপের পশ্চাতে জ্যোতির্ময় পুরুষ হলেন গুরু। বাকের জ্ঞান গুরু, শব্দের প্রাণ হল গুরু। গুরুর সঙ্গে যুক্ত হলে নাম-রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়। গুরু হলেন জ্ঞানস্বরূপ। গু=গ+উ। 'গ' মানে আকাশ। এই আকাশে যে উদিত হয়। এই আকাশ হল সম্বিদাকাশ। 'রু'-বৈচিত্র্য। 'র'-গতি। তার সঙ্গে উ যুক্ত হল। সব কিছু প্রকাশ করেন যিনি তিনিই হলেন গুরু।

প্রাণের মধ্যে 'সোঽহং' ধ্বনিরূপে, শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে আছেন গুরু। মনের মধ্যে ক্রিয়ারূপে অর্থাৎ চিন্তারূপে বা মননরূপে গুরু। প্রতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে আছেন গুরু। হস্তে লেন-দেন, বাকে বচন, পদে চলন, উপস্থে সৃষ্টি প্রকরণ, পায়ুতে বিকারের নিঃসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া, সব গুরুর এবং এ সবের নিয়ন্তা হল বিচাররূপ বুদ্ধিবিজ্ঞান। তা-ই হল গুরুর প্রকাশ রূপ। মানুষ ভুল করে তখনই যখন কর্তা-ভোক্তারূপে নিজেকে ভাবে। ভোক্তা ও জ্ঞাতার মধ্যে বসে আছেন গুরু স্বয়ং। আর সবাই দ্রষ্টা। তোমাদের দ্রষ্টা করে তাঁর মহিমাকে দেখাবার জন্য আনন্দময় পুরুষই বসে আছেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে তিনি শুনছেন। প্রাণের মধ্যে বসে তিনি প্রাণায়াম করছেন। মনের মধ্যে বসে মনন করছেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিচালনা করছেন। ইন্দ্রিয়কে ঘুমের মধ্যে তিনিই নিষ্ক্রিয় করে রাখেন।

জগতে বৈচিত্র্যময় সব কিছু গুরুরই প্রকাশ

তোমাদের কারও কোনও কর্তৃত্ব নেই। গুরুই জীবনের প্রভু। তিনি কৃপা করলেই সব হয়। গুরু হলেন 'আমির আমি' অহংদেব। জ্ঞানের পরিচয় তার লক্ষণ। বোধ প্রকাশ হচ্ছে সর্ব ইন্দ্রিয়তে। বুদ্ধিরূপে, চিন্তারূপে, বিদ্যারূপে, স্মৃতিরূপে, গুরুরূপে গুরুই স্বয়ং।

গুরুভজনে অন্তর প্রসারিত হয়। তাঁর কোনও সাধনা নেই, তিনি নিজেকেই প্রকাশ করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। দোষ তিনিই নিয়ে নেন। তিনি না-নিলে কারও গতি হতো না, নরকে থাকতে হতো। নরক হল নর+ক। নররূপে তিনি প্রকাশ করেন। নররূপে হয় তাঁর সর্বোত্তম লীলা। তাই রূপ ধারণ করে তিনি নররূপে ব্যক্ত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন। পৃথক পৃথক করে যা প্রকাশ করছেন 'নর'-রূপের মাধ্যমে তা মিলিয়ে নেবেন আপন বক্ষে। নর হল নারায়ণ।

জীবনকে অবহেলা করার অর্থ আপনাকে আবৃত করা। নিজেকে ভালবাসা মানে আপনাকে আস্বাদন করা। অপরের নিন্দা করা মানে আত্মহত্যা করা বা গুরুকে আঘাত করা। কারণ আত্মগুরু সর্বব্যাপী, সবারই অধিষ্ঠান স্বয়ং। তিনি সবার আপনসত্তা, এই কারণেই পরনিন্দা পরচর্চা মহাপাপ। তাতে আত্মঘাতী হতে হয়। এই আত্মগুরুকে আঘাত দিলে কী করে গুরুকৃপা পাবে?

জ্ঞান না-থাকলেও গুরুকৃপায় মুক্তি লাভ হয়। গুরু যাকে হাত ধরে নিয়ে যান তার আর করার কিছু থাকে না। তার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই। কী হবে সাধনভজন করে যদি তিনি হাত ধরে না-নিয়ে যান।

জগৎ গুরু সবচেয়ে আপনজন
মনের মন হরি নারায়ণ।

রাম, কৃষ্ণ নিত্যকালের প্রাণের সখা, প্রাণ নিয়ে হয় তাঁদের লীলা। গুরুভজনে গুরুকৃপাতে সব পথ পরিষ্কার হয়। হৃদয়ের চাবি তো বন্ধ আছে। তিনি হৃদয়দ্বার খুলে না-দিলে কী করে খুলবে? লক্ষ চাবি আছে। তার মধ্যে কার কোন চাবি লাগবে গুরু বলে দেন।

ভগবান মুক্তির চাবিকাঠি নিয়ে আসেন গুরুবেশে। তিনি বলরাম, শিবরাম, প্রাণের প্রাণ। প্রাণারাম কী মধুর কথা! তিনি আদিত্যদেব— চোখের দেবতা। নয়নে বোধরূপে গুরু বসে আছেন বলেই দেখা সম্ভবপর। রূপ হল চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি। চোখে বসে দেখেন তিনি দেবতারূপে। শ্রবণে দিক্‌পালরূপে দশ দিকে তিনি! যেখানে ধ্বনি সেখানে তিনি। তাহলে কান কত বড় হয়ে যায়। তাঁর আসন হল ধ্বনি। এ ভাবে চিন্তা করলে ব্যক্তিরূপ হারিয়ে যায়। কারণ ব্যক্তির মধ্যেও তিনিই থাকেন।

মন মাত্রই জ্ঞান। মনের পিছনে আছে প্রাণ। প্রাণ হল বিজ্ঞান। অথচ মনপ্রাণ জুড়ে বসে আছে দেহ। দেহ হল অজ্ঞান। দেহ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে মন। প্রাণের পিছনে আছেন প্রজ্ঞানঘন গুরু। চিতিমাতা হলেন গুরু স্বয়ং। গুরুশক্তি কৃপা না-করলে এক পা-ও চলা যায় না। গুরু সর্বশক্তিসম্পন্ন। গুরু এবং শক্তি অভিন্ন।

গুরু হলেন ব্রহ্ম। গুরু ছাড়া কারও কোনও দিন সিদ্ধি হয় না। ভগবানকেও গুরুবরণ করতে হয়। এই তাঁর মহিমা। গুরুরূপে তিনি-ই স্বয়ং। তিনি নিজেই যশোদা, গোপাল ও নন্দলাল।

গুরুগীতা হল শাস্ত্রের সারাৎসার। গুরুকৃপা হল স্বঘরে ফেরার চাবিকাঠি। গুরুগীতায় এই চাবি পাওয়া যায়। এমন কোনও দেবতা নেই যিনি গুরুর মধ্যে নেই। ভগবান হলেন স্বয়ংগুরু। তিনি বিবেকরূপী প্রজ্ঞাস্বয়ং।

প্রেমাবেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গান গাইলেন—

আপনে আপন চিরনূতন অখণ্ড ভূমা স্বয়ং
সচ্চিদানন্দ পরম অচ্যুত নিরঞ্জন সদ্‌গুরু স্বয়ং
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত জীবন আপনে আপন সর্বদেবময় সর্বতত্ত্বময়
অক্ষর পরম আপনে আপন।।

[২৭।১।৮০]

স্বয়ং ভগবানই গুরুবেশে আসেন

ভগবান কৃপা করেন গুরুবেশে এসে। গুরুবেশে না-এলে ঈশ্বরের রূপ চরিতার্থ হয় না। গুরু অন্তর শোধন করে দিব্যবোধ জাগ্রত করেন। অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ বিশেষ নির্দেশের মধ্যে নিগূঢ় রহস্য হল গুরুবাণীর গুরুত্ব। মুক্তিশান্তি লাভের পরেও গুরুভজনের কথা বিশেষ ভাবে বলা আছে।

সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায়, বিকারের সম্ভাবনা তত বাড়ে। সেই জন্য গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা যেন বৃদ্ধি পায়। এই গুরুই হলেন ব্রহ্ম-আত্মা। চিত্ত একটু বিমুখ হলেই নিষ্ঠা কেটে যায়। সাধক যত উচ্চে ওঠে, তার চিত্ত যেন বিমুখ না-হয় বা ভ্রষ্ট না-হয় তাই গুরু তার চিত্তকে balance দেবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। শেষের দিকে গুরু balance না-দিলে কোনও সাধকের ক্ষমতা নেই final gate পার হয়। গুরুর প্রথম ও শেষ কাজ হল 'আমার ভাব'-এর যত প্রকার মল আছে তা শোধন করে জীবভাবকে শিব ভাবে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর কর্তব্য পূর্ণ হয় তখন-ই, যখন জীবচৈতন্য পরিপূর্ণ শিবচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। তখন গুরুও মিশে যান তার সাথে। তার আগে শিষ্যের অপূর্ণতা কেউ দূর করতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন—

গুরু যে ক্ষেত্রেরই হোক তবু সে গুরুই। এক গুণী যাদুকর অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা জানতেন। তিনি উৎসাহী এক যুবককে যাদুবিদ্যা শেখালেন। তার চেষ্টা, উদ্যম, উৎসাহ ও গুরুভক্তি দেখে যাদুকর স্বেচ্ছায় যাদুবিদ্যার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল শেখালেন এবং তাকে পারদর্শী করে তুললেন। তাকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে দর্শককে চমৎকৃত করে দিতে লাগলেন। একদিন যুবকের খুব অভিমান হল এই ভেবে যে আমি তো এবার self- sufficient হয়ে গিয়েছি।

খুব সুন্দর একটা খেলা সে দেখাত। গুরু একটা বংশদণ্ড নিজের হাতের তালুতে ধরে রাখতেন। যুবকটি গুরুকে একবার প্রদক্ষিণ করে এক লাফে এসে দণ্ডটি ধরত এবং ধীরে ধীরে বাঁশের মাথায় উঠে যেত। বাঁশের মাথায় গোল চাক্‌তির মতো একটি জিনিস বাঁধা থাকত। তার উপরে দাঁড়িয়ে সে নানা ভঙ্গিমায় খেলা দেখাত। তার গুরুও হাতের তালুতে রেখে এক আঙ্গুল থেকে আরেক আঙ্গুলে দণ্ডটি সরিয়ে নিতেন। এতেই বোঝা যায় যে গুরুর কতখানি concentration ছিল এই ব্যাপারে। আবার কখনও এক হাতের তালু থেকে কপালে ভ্রূ-দ্বয়ের মাঝখানে। এই অবস্থায় গুরু কখনও কখনও নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং সেই অবস্থায় যুবকটি চাকতির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাত।

অভিমানবশত যুবকটি গুরুকে একদিন একটা অসঙ্গত কথা বলে ফেলেছে খেলা দেখাবার আগে। শিষ্যের এই সামান্য ত্রুটিকেও শোধন করতে হয়। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য গুরু একদিন তাঁর আঙ্গুল থেকে বংশদণ্ডটিকে ছেড়ে দিলেন। যুবকটি পড়ে মরেই যেত কিন্তু গুরু তা হতে দিলেন না। পড়ে যাবার সময় চট করে ধরে ফেললেন এবং বললেন—আজ থেকে আর আমি তোমার গুরু নই।

শিষ্য নিজের ভুল বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ পরে গুরুর পা জড়িয়ে ধরে বলল—আমার ভুল হয়ে গেছে, এই ভুল আর হবে না। যতক্ষণ শ্বাস আছে, আমি তোমার। সব ভুলে গিয়ে আমি তোমাকে যে আঘাত দিয়েছি তা ফিরিয়ে নিতে চাই; কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নয়তো নাশ কর।

গুরু তো শিষ্যকে নাশ করতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সব জ্ঞান শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুর দায়িত্ব থাকে। সাধক শিষ্য যে কতবার ভুল করে এবং সেই ভুল যে গুরুকে কত আঘাত করে, শিষ্য জানতেও পারে না। এই কারণে সাধকের সাধনার ফল আবৃত হয়ে যায় এবং সে এগোতে পারে না।

সর্ব অবস্থায় গুরুকে বসাতে হয়

চরম দুর্গতিকেও গুরুর দান বলে যখন গ্রহণ করা হয় তখনই সাধনার পথ সুগম হয়। এ হল অভিমান নাশের একটি বিশেষ পদ্ধতি। গুরু চান শিষ্যের ব্যষ্টিভাবকে সমষ্টিভাবে লীন করতে আর জীব চায় সমষ্টিভাব থেকে পুষ্টি অর্জন করে ব্যষ্টিভাবকে রক্ষা করতে।

অনেক পর্যায়ের কথাই তোমাদের শোনবার সুযোগ হয়েছে; কিন্তু এ সব কথার সারমর্মকে যদি ধরে না-রাখা যায় তাহলে গুরু কাজ করতে পারেন না। গুরু কাজ করেন বাণীর মধ্য দিয়ে। সেই বাণী আবার বোধের মধ্য দিয়ে কাজ করে! ফাঁকি চলে না। অভিমানবশত ফাঁকি দেওয়া হয় কখনও কখনও, তার ফলে রহস্যগুলি আর ধরা পড়ে না। যেমন ভাবে শোনা হয়, ঠিক তেমন ভাবে গ্রহণ করতে হয়। জীবের যে জিভ্ আছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুর কাছে সমর্পণ না-হয় ততক্ষণ গুরুবাণী কার্যকরী হয় না।

গুরুবাণী গ্রহণের যোগ্যতা সবার সমান নয়

জনৈক ভক্ত—এক কথা সবাই শুনছে, কিন্তু সবাইতো এক অর্থে গ্রহণ করছে না।

ভক্তের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও পরিষ্কারভাবে বোঝাবার জন্য একটা গল্প বললেন—

এক রাজার এক অপরূপ সুন্দরী রানী ছিল। কিন্তু তার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল। সেই জন্য পাঁচজনে নানা ভাবে তার পরিচর্যা করত।

রানীর সন্তান সম্ভাবনা হল। তখন পরিচর্যার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। যথাসময়ে একটি শিশু সন্তান হল। রানীর স্বাস্থ্য আবও ভেঙ্গে গেল। প্রায় সর্বদাই শুয়ে থাকে। পরিচারিকারাও যথাসাধ্য সেবাযত্ন করে।

রাজা এই সময়ে কোনও এক বিশেষ কার্যোপলক্ষ্যে পাশের এক রাজ্যে গেলেন। দিন কয়েক পরে ফেরার পথে এক সরাইখানায় এক রাত্রি যাপন করলেন। সেখানে বিশ্রামের সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন এক বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবতী যুবতী মাথায় একটি বোঝা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যুবতীটি রাস্তার ধারে এক গাছতলায় বসল সেখানেই এক শিশুসন্তান প্রসব করল। নিজেই নাড়ী কাটল। তারপর শিশুটিকে একটু স্তন্য পান করিয়ে তাকে বোঝার মধ্যে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

রাজা দেখে অবাক। ভাবলেন একী অদ্ভুত! একে তো কোনও পরিচর্যাই করতে হল না, আর আমি রানীর জন্য কত ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করি। কত লোক রানীর পরিচর্যা করছে। রাজা ফিরে এসে সব ঘটনা রানীর কাছে বললেন। রানী খুবই বুদ্ধিমতী ছিল।

কয়েকদিন পরে রাজাকে আবার কার্যোপলক্ষ্যে বাইরে যেতে হল। রাজার একটা বাগান ছিল। যেদিন রাজা বাইরে চলে গেলেন সেদিনই রানী বাগানের মালীকে তাড়িয়ে দিল। কয়েকদিন পরে রাজা ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর অমন সুন্দর বাগান একেবারে শুকিয়ে গেছে। কেন এ রকম হল খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন রানী মালীকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজা গেলেন ক্ষেপে।

রানী তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলল—মহারাজ, আপনি যখন ভ্রমণে গিয়েছিলেন বনের মধ্যে কত রকম গাছ ফুল ফলের শোভা দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কী কোনও মালী জল দেয়? এত বড় বন যদি মালী ছাড়া হতে পারে তবে আপনার বাগান মালী ছাড়া হবে না কেন? মহারাজ দেখলেন এই যুক্তি খণ্ডন করা যায় না।

রানী আরও বলল—মহারাজ প্রকৃতির রাজ্যে প্রতি প্রকাশের গুণ, শক্তি ও সামর্থ্য পৃথক। যার যে রকম ব্যবহারের প্রয়োজন প্রকৃতি সে রকম ভাবেই তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা করবেন না মহারাজ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করে বলছেন—

এখানকার বক্তব্যগুলির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যার যেমন শক্তি-সামর্থ্য সে সেই অনুযায়ী গ্রহণ করছে। অপরে কী পারছে বা পারছে না তা দেখার দরকার নেই। তুমি কতটুকু গ্রহণ করতে পারছ তা-ই দেখ। যে যতটা accurate করে বা গুরুর মতো করে নেয়, তার তত আনন্দ হয়। যেমন, গুরু কয়েকজনকে গান শেখালেন। কেউ চার আনা গুরুর মতো করে গাইছে, কেউ বা আট আনা গুরুর মতো করে গাইছে। ষোলো আনা কেউ নিতে পারছে না। তবু যে যতটুকু গুরুর মতো করে গাইতে পারছে তার তত আনন্দ হচ্ছে।

গুরুবিদ্যা এমন যে গুরুর পূর্ণ জ্ঞানধারা শিষ্যের মধ্যে রূপায়িত হবে। গুরু নিজেকে শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন।

গুরুর জ্ঞানমূর্তি—জ্ঞান প্রবিষ্ট হয় শিষ্যের মধ্যে শিষ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং তদ্রূপ ধারণ করে।

দীক্ষা প্রসঙ্গে

দীক্ষা গ্রহণ করার অর্থ হল গুরুর ভাবধারাকে গ্রহণ করে তার পরিপূর্ণ রূপায়নের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করা। গুরুবাণীর এক বিরাট চিন্তাধারাকে রূপ দেবার জন্য যে চেষ্টা করে সে দীক্ষিত। কানে মন্ত্র দিয়ে যে দীক্ষা তাও ঐ শব্দ দিয়ে বিরাটকে (Infinite-কে) ইঙ্গিত (indicate) করে।

Infinite-কে তো কেউ নেয় না। Infinite-কে মানলে নিজে free থাকা যায়। গুরুর কাছে যা পাওয়া যায় গুরুর ধারা অনুযায়ী তা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে কোনও reaction আর হয় না। ঠিক relay race-এর মতো। মাঝখানে যদি কেউ আটকে রাখে তবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ধারাকে ব্যাহত না-করে সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রবাহিত হতে দিলে নিজেও মুক্ত থাকা যায় এবং তাতে জগতেরও কল্যাণ হয়।

গুরু হলেন ত্যাগ মূর্তি

গুরু হলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি। সেই জন্য তিনি চেষ্টা করেন যেন শিষ্যের মধ্যেও ত্যাগের ধারা প্রবাহিত হয়। যদি তা না-হয় তবে শিষ্য সাধনার মাঝপথে আটকে যায়। কিন্তু ত্যাগের ধারা প্রবাহিত হতে দিলে শিষ্যও গুরু হয়ে যায়।

নিষ্ঠা কি?

নিজের ভিতরে গুরুবাণী যেন ষোলো আনা কাজ করতে পারে সেই চেষ্টা করতে হয়। এর নামই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থাকলেই গুরুকৃপা অনুভব করা যায়। আর তা যদি না-হয় তবে বুঝতে হবে নিষ্ঠায় ত্রুটি আছে। গুরুর বাণী যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তা-ই গুরুকৃপা।

জনৈক ভক্ত—সত্যের কথা বই-এ আছে। অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং intellectual আছে যারা বই পড়ে জ্ঞান লাভ করে।

গুরু সান্নিধ্যে শ্রবণের মাহাত্ম্য

বই পড়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে কতগুলি special quality থাকা দরকার। সে রকম special calibre-এর সাধক হওয়া চাই। যার মুমুক্ষুত্ব জেগেছে অর্থাৎ সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে, জন্ম জন্ম সাধনার সংস্কার বা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে এবং যে গুরুর সঙ্গে থেকে সাধনা করার সুযোগ পেয়েছে, কেবল তার পক্ষেই সম্ভব বই পড়ে অনুভূতি লাভ করা।

গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী শব্দের মাধ্যমে অন্তরে প্রবেশ করে। নিজে নিজে পাঠ করলে ভুলটা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত মুমুক্ষু সাধক শাস্ত্রপাঠ করতে গিয়ে শাস্ত্র প্রণেতাকে জীবন্ত দেখতে পায়। কিন্তু সাধারণ অধিকারী তা পায় না বলে তার জন্য জীবন্ত গুরুর দরকার হয়।

ভক্ত—গুরু যদি ব্রহ্মজ্ঞ না-হয়, তার তো কোনও লাভ হবে না।

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছেন—প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী গুরু লাভ করে। একজন সাধারণ সাধক যদি ব্রহ্মজ্ঞানী পায়, তবে তার কোনও লাভ হবে না। মুমুক্ষুর জন্য প্রয়োজন হয় ব্রহ্মজ্ঞানীর।

ভক্ত—যার প্রয়োজন নেই সে যদি দেখা করে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের সঙ্গে?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উত্তরে বলে চললেন—

তার লাভ হবে না। ভিজে কাঠে আগুন লাগবে না। এখানে আবার হয়তো প্রশ্ন করবে—তবে কেন আসে? তার উত্তরে এই কথা বলা চলে যে—সময় বুঝেই সে আসে। Standard অনুযায়ী গুরুর stage সাজান আছে। পুরানো সংস্কারকে কমিয়ে নূতন সংস্কার জমা করার জন্য দেহেন্দ্রিয়-প্রাণের শোধনের প্রয়োজন। পূর্ব সংস্কার জমা থাকলে বর্তমান জীবনে অনেক সুবিধা হয়। ধর যে ছেলে চাকরি, গাড়ি, বাড়ি সব পেয়েছে তার কর্মলব্ধ বা সাধনলব্ধ ধন ছিল বলে তার খুব সুবিধা হয়েছে।

যে বুদ্ধি enlightened হয়ে গেছে সেই বুদ্ধি দিয়ে সমাধান হয়। জ্ঞানীদের তাই তাড়াতাড়ি হয়। ভক্ত হওয়া যায় আপনাকে জানার পরে। তার আগে ভক্ত হলে হয় ভোগে পোক্ত।

জ্ঞান ভক্তি ও প্রেম প্রসঙ্গে

আপনাকে জানা হল আত্মজ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। সেই জ্ঞানের ব্যবহার হল ভক্তি। আপনবোধে বাস করার নাম প্রেম। এর মধ্যে গোঁজামিল নেই। নদী যতক্ষণ সাগরে না-যায়, ততক্ষণ গতি থাকে। সাগরে পৌঁছে গেলে সাগর হয়ে যায়।

জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের সংজ্ঞা গতানুগতিক অর্থে 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) জানা নেই, কিন্তু স্বানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি আছে। এখানে এই আলো স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই দিয়ে যাচ্ছেন তোমাদের অন্তর আলোকিত করার জন্য।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এতদিন তো শোনা হল, আর কবে আলোকিত হবে? উত্তরে শুধু এটুকুই বলা চলে যে লক্ষ লক্ষ জন্ম কিছু না-করেই চলে গেছে। আরও লক্ষ লক্ষ জন্ম যাবে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে একঘণ্টা সৎপ্রসঙ্গ কিছুই নয়। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে তেইশঘণ্টা সৎপ্রসঙ্গ এবং একঘণ্টা অন্যান্য প্রসঙ্গ যখন হবে তখনই কাজ দেবে। অজ্ঞানের মধ্যে যে আগুন আছে গুরু সেই আগুন জ্বালিয়ে দেন।

এই কারণে বলা হয় যে গুরুর জন্য কান্নাকাটি করতে হয়, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করো না (do not weep before Guru, but weep for Guru)। হৃদয়ের আসনখানি গুরুকে দিও।

সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য

দেবতা, গুরু ও ইষ্টকে যে মনুষ্য জ্ঞান করে তার অনুভূতি সিদ্ধ হয় না। মানুষের বেশ ধারণ করেও গুরু তাঁর দিব্যচৈতন্যের বোধ হারান না। লোকে তাঁর উপর মনুষ্যবোধ আরোপ করে কতখানি নিচে নামিয়ে আনে!

এখানে ভজনগুলি দিয়ে তোমাদের ground তৈরি করা হচ্ছে। মনের ভিতরে তো সব জঙ্গল। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করা কী সোজা কথা? হয়তো গুরু একবার জঙ্গল পরিষ্কার করলেন এবং ভাবলেন কিছু

construction করবেন, কিন্তু আবার দেখেন আগাছায় জঙ্গল হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ গুরুর কাজ ভণ্ডুল করে আনন্দ পায়।

গুরু হলেন ক্ষমাঘন, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। তিনি কারও দোষ দেখতে পারেন না। এত ধৈর্য কারও নেই। তিনি শিষ্যের জন্য লক্ষ কোটি বৎসর অপেক্ষা করে থাকেন। গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে এ কথার অন্যথা হয় না।

জিহ্বায় তাঁর কথা ছাড়া অন্য কথা কেউ উচ্চারণ করবে না। কাউকে আঘাত দিলে জানবে তাতে গুরুকেই আঘাত দেওয়া হয়। [২৯।১।৮০]

সকলের যথার্থ পরিচয় হল সে সাক্ষিচেতোমাত্র

গুরু বলতে আত্মাকে নির্দেশ করা হয়। নিজের আত্মা, সত্তা, ঈশ্বর ও গুরু এক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে বহুত্বের আকর্ষণে জীব আটকা পড়ে যায়। এক একটি পদ্ধতি ধরে সাধনা করে মনের যোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে হয়।

জগতে বিস্ময়কর ঘটনা যদি কিছু থাকে তা হল এই যে মানুষ নিজের বন্ধন নিজেই সৃষ্টি করে। চাবি নিজের কাছে আছে তবু খুলে বেরোতে পারে না। খোলার রহস্য জানেন শুধু গুরু। গুরু আত্মবিস্মৃত শিষ্যদের অন্তর্নিহিত শক্তিতে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ হতে সাহায্য করেন। গুরুর কাজ হল অন্তরে। বাইরে শুধু তাঁর নির্দেশ আসে। দু'টিকেই এক করতে হয়। যতক্ষণ অন্তরে-বাইরে ভেদজ্ঞান থাকে ততক্ষণ নিজের অন্তঃসত্তার নির্দেশ বোঝা যায় না। সেই জন্য তার কাছে গুরু ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতি নিজের থেকে ভিন্ন থাকে। সতীর্থদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে 'এক'-কে গ্রহণ করা হল সর্বসাধনার মূল কথা। কিন্তু মন তো কিছুতেই তা মানতে চায় না। মন তার স্বকল্পিত ভেদকে গুরুর সাহায্য বিনা কোনও মতেই অতিক্রম করতে পারে না।

তোমাদের আসল পরিচয় অসাধকও নয়, আবার সাধকও নয়। তোমরা হলে দ্রষ্টা বা সাক্ষিমাত্র। নিজেরই বোধ যে প্রকাশ হয়ে পড়ছে তা সাক্ষিরূপে দেখে যেতে হয়।

এই বোধ সদ্‌গুরুই দিয়ে দেন। এই বোধের ধারাকে সচেতন ভাবে গ্রহণ করা হল দীক্ষা[১] গ্রহণ করা। সব জিনিসকে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না-দেখলে ত্রুটি থাকে। যেমন বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখলে খণ্ড খণ্ড দেখা যায়, আবার ছাদে উঠলে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। মহাপুরুষগণ এই ভাবে উপরে উঠে দেখার চেষ্টা করেন; ফাঁকি দিয়ে নয়।

সাধনা হয় অন্তরে

'সব এক', একথা মুখে বলা সোজা, কিন্তু অনুভবে আনা কঠিন। যত আপনাকে গোপন রাখবে তত পোক্ত হবে এবং অন্তরের বিকার সরে যাবে। বাইরে বেশি জল্পনা-কল্পনা নয়। এ-ই হল গুরুনিষ্ঠা। সামনে দেখিয়ে পালন কবা এক রকম এবং আড়ালে পালন করার ফল আরেকরকম। সাধনা হয় অন্তরে। অনুভূতি হয় অন্তরে এবং অনুভূতিকে ধরেও রাখে অন্তর। তাহলে আদি-মধ্য-অন্ত সমান্তরালে[২] চলে আসবে।

[৯।৩।৮০]

১। দীক্ষা—সদ্‌গুরুর মাধ্যমে বোধের ধারাকে সচেতন ভাবে গ্রহণ করাই হল দীক্ষা।

২। সমান্তরালে—স্বানুভূতির ভাষায়।

দীক্ষার প্রসঙ্গে

জনৈক ভক্ত এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন— 'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) কারও গুরু নয়। দীক্ষার দক্ষিণা দেবে কী করে? চিদানন্দময়ী মা পূর্বেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে তোমাদের কারও নিজস্ব বলে কিছু নেই। কী দেবে? দক্ষিণা না-দিলে দীক্ষা পূর্ণ হয় না। এখানে conventional দীক্ষা নেই। সে সব অনেক দেখা হয়েছে। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। তাদের সমদর্শন হয়নি।

সমদর্শন যাতে তৈরি হয় তার জন্য সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের এই পরিবেশন (গোলবারান্দায় এই ভাষণের ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করলেন)। এখানে একেবারে মধ্যপন্থা অর্থাৎ বিরক্তিও নয় এবং আসক্তিও নয়। আসক্তি থাকলে ভোগ করতে হয়। যোগ্যতা না-থাকলে অর্জন করা যায় না। অর্জনেতেও ব্যাধি এবং বর্জনেতেও মুশকিল, গ্রহণেও বাধা আবার তর্জন গর্জনেও বিকার[১]। সংসারে পাবারও কিছু নেই, হারাবারও কিছু নেই। শুধু দেখবার আছে। শুধু দেখে যাও।

কী হবে বড় একজন সাধু হয়ে? হয়তো দশ হাজার বছর এমন ঘুম পাড়িয়ে দেবে যে কোনও স্মৃতি থাকবে না। আবার এসে নূতন করে স্মৃতি তৈরি করে নিতে হবে। এত চিন্তা কেউ করে না। সকলেই জোড়াতালি (patch work) দিয়ে চলার চেষ্টা করে। যাঁর জিনিস তিনি যদি কৃপা করে নিয়ে যান তাহলেই রক্ষা। অবশ্য বললেই তো আর তিনি নেবেন না।

যাঁরা গুরু সেজে বসে আছেন তাঁদের চিন্ময়ী মা কিছুটা আবৃত করে রেখেছেন, তাইতো তাঁরা চলছেন। তাঁদের জন্যও যে শমন দাঁড়িয়ে আছে সে খবর তাঁরা রাখেনই না।

সর্বত্র ব্রহ্ম-আত্মরূপী গুরুকে দেখবার জন্যই জগতে আসা। ভোগের জন্য নয়, আবার ত্যাগের জন্যও নয়। অপূর্ব জগৎলীলা দেখবার জন্যই সবার আসা। তার জন্যই টিকিট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে টিকিট হারিয়ে গেছে। স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে এসে আবার টিকিট set করে দিয়ে যান। [১৩।৩।৮০]

গুরুপ্রদত্ত নামের মহিমা প্রসঙ্গে

একবার বাসে দুজন সাধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কোনও কার্যোপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে বাসের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এঁদের পরিধানে রয়েছে লেঙ্গটি কিন্তু কী রকম সুন্দর স্বাস্থ্য, দেখেছ? অথচ আমরা এত পুষ্টিকর খাবার খাই, ডাক্তারদেরও fees দেই তবুও স্বাস্থ্য আর ফেরে না। দিনরাত অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে।

একজন মনের ভাব চাপতে না-পেরে সাধুদের উদ্দেশে বলেই ফেলল—বাবাজীদের কোন আশ্রমে থাকা হয়?

সাধুদ্বয়—আমরা সর্বাশ্রমের।

প্রশ্ন—কোথায় কোথায় কাজ করতে হয়?

সাধু—সব জায়গাতেই ঘুরতে হয়।

প্রশ্ন—খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়া হয় নিশ্চয়ই।

সাধুদ্বয় হাসতে লাগলেন—তাঁদের হাসি দেখে ওরা জ্বলে গেল। একে তাদের অম্বলের জ্বালা, তার উপরে ঈর্ষার জ্বালা।

প্রশ্ন—কী আহার করা হয়?

সাধু—যা জোটে, তা-ই খাওয়া হয়। কখনও রুটি আবার কখনও বা তুলসী পাতা গঙ্গাজল।

১। বিকার— এই সব আত্মধর্ম নয়; আত্মধর্ম হল সমদরশন, অখণ্ড একবোধ সমবোধ, একরস বা সমরস।

(প্রশ্নকারিগণের স্বগতোক্তি—দেখেছিস্, সাধুরা মিথ্যা কথা বলছে।)

প্রশ্ন—এ রকম খেয়ে কী আর তোমাদের এই রকম শরীর হয়? লোকে যে ঘি, দুধ দেয় সেগুলি কোথায় যায়?

সাধুদ্বয়—ঘি দুধ তো গৃহস্থরা খায়।

প্রশ্ন—তোমাদের এ রকম স্বাস্থ্য কী করে হল?

সাধু—আমরা একটা সাল্‌শা খাই।

প্রশ্ন—কে দেয়?

সাধু-- সদ্‌গুরু দিয়েছেন আমাদের।

প্রশ্ন—কোন কবিরাজ বানায়?

সাধু—সদ্‌গুরুই দেন, এর নাম নামামৃত সাল্‌শা।

প্রশ্ন—নামামৃত সাল্‌শায় কী এত গুণ আছে?

সাধু—নামামৃত সাল্‌শায় গুণ কতখানি তা যে সাধু গুরুকৃপা পেয়েছে, সে-ই জানে। গুরুকৃপা যাঁর কাছ থেকে পায় তাঁকে সে মন-প্রাণ-হৃদয় সব সঁপে দেয়। ভজনে নাম, নামী ও নামকারী এই তিনের মধ্যে কী ভেদ আছে? অভেদ হলেই নামামৃত সাল্‌শার গুণ পাওয়া যায়। কিন্তু সব কিছুরই সময় ও মাপ ঠিক করা আছে।

গল্পটি শেষ করে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন—

'মেনে, মানিয়ে চলা'[১]-র কথা তোমাদের বারবার বলা হয়। 'মানা'-তে মনের আবরণ সরে যায়। তোমাদের চিত্তের এককোণে গুরু যেন ঠাঁই পান। যে চিত্তে দোষদৃষ্টি থাকে সেই চিত্তে গুরু ঠাঁই পান না। গুরু হলেন সর্বদেবদেবীদের প্রতিমূর্তি। গুরুই যদি আসন না-পান তবে কোনও দেবতাই খেলতে পারেন না এবং ঈশ্বরও আসন পান না। তখন অসুর ও অপদেবতা খেলে। তার লক্ষণ প্রকাশ পায় আচরণে।

অনেকে অনুযোগ করে—এতদিন সৎসঙ্গ করে কী লাভ হল? উত্তরে বলা যায়—সৎসঙ্গ করে তার ছাপটা ঠিক মতো মারা হয়নি। সৎ-এর ছাপ থাকলে তবে তো হবে সৎসঙ্গ। বাজারে গেলেই কী বাজারের থলিটা ভর্তি হয়ে যায়? পায়েসের হাতা সারাদিন পায়েসের বাটিতে ডোবানো থাকলেও পায়েস আস্বাদন করতে পারে না। এই পায়েসের হাতার মতো সৎসঙ্গে থাকলেই কী আর সৎসঙ্গ করা হয়? রসগোল্লার মধ্যে যেমন চিনির রস জড়িয়ে থাকে, সে রকম ঠিক মতো সৎসঙ্গ করা হলে সৎসঙ্গের রস জড়িয়ে যায়। এ হল চিদ্‌রস, অচিৎ নয়। চিদানন্দ না-খেললে নিরানন্দ খেলে বা অজ্ঞান খেলে; গুরু সেখানে খেলেন না। কারণ গুরু তো অজ্ঞানে খেলতে পারেন না। গুরু না-খেললে সেখানে ইষ্টও খেলে না।

এক গুরুমহারাজ 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) দোষারোপ করে বলেছিলেন—আপনি তো এদের সাধনভজন কিছু দিলেন না।

তাঁকে বলা হল— তোমরা তো সব দিয়েছ, তাতে কী হাল হয়েছে? 'এর' কাছে বীজধান নেই। 'এ' তো দেনেওয়ালা মালিক নয়। 'এর' function কিছু নেই, আছে শুধু ষোলো আনা 'মানা'। এই অব্যয়বীজটি 'এ' রেখে দিয়েছে, যা কোনও দিন নষ্ট হয় না। 'এর' কাছে কাল, কাল নয়। জগতের কাছে কাল একটা বিরাট factor, কিন্তু 'এর' কাছে নয়। যেখানে অহংকার অভিমান নেই সেখানে কালের প্রতিক্রিয়াও নেই। সেখানে কাল হল কালাতীত। আগুন যেমন আগুনকে পোড়ায় না, সে রকম কালও কালকে গ্রাস করতে পারে না। মাকে বরণ করলে মায়া গ্রাস করতে পারে না। অহংকার নাশ করতে হলে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় যে নিজের তো কোনও যোগ্যতা নেই।

১। 'মেনে, মানিয়ে চলা'—সর্ববস্তুর মধ্যে মাকে, মহেশকে, মাধবকে অথবা মহৎকে বা গুরুকে গ্রহণ করে ও বরণ করে সেই বোধে চলা।

'এ' কিছু দাবি করতে পারে না। জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দেবার মতো 'এর' কোনও যোগ্যতা নেই। যা আছে সবই সচ্চিদানন্দময়ী মা। ফলে মহাশূন্য, মহাশূন্যই থেকে যাচ্ছে।

ভক্তদের উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন—

উপরোক্ত কথাগুলি তোমাদের ভিতরে যেন আসন পায় তার জন্যই এত বলা। তা সাধনার ক্রটিগুলি অজ্ঞাতসারে শোধন করে দেবে, বুঝতে দেবে না। বুঝতে দিলে অহংকার অভিমান আরও বাড়বে।

[১৮।৩।৮০]

সংসারের সংজ্ঞা

অখণ্ড একটি মাত্র আমিই আছে; ব্রহ্ম-আত্মা-অখণ্ড-ভূমা প্রভৃতি সব তাঁরই নাম। এই আমিকে বাদ দিয়ে বা নিজেকে বাদ দিয়ে কল্পিত বস্তুর পিছনে ঘোরার নাম হল সংসার। 'নিজ' এমনই এক বস্তু যাকে দ্বিতীয় কোনও বস্তু দিয়ে replace করা যায় না।

মন বৈচিত্র্যেরও কারণ এবং একতা সমতারও কারণ

শুদ্ধ মনের বৈশিষ্ট্য হল—তাতে যতই ছাপ (impression) দেওয়া হোক না কেন, দাগ কাটে না। মন যা চিন্তা করে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য মনকে চিদ্‌ভাবনায় ডুবিয়ে দিতে হয়। খুশি মতো ভাবনায় মন অজ্ঞান অশান্তিতে ডুবে যায়। এই জন্য সদ্‌গুরুরা মনকে ক্রমশ টেনে নিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দেন যেখানে মন্ত্র, গুরু, ইষ্ট, স্বরূপ সব একাকার হয়ে যায়। তা ধ্যানের মাধ্যমে বা ভজনপূজনের মাধ্যমেও হতে পারে। সব কিছুর মধ্যে এই মনই হল বৈচিত্র্যের কারণ, আবার মনই হল একতা সমতারও কারণ।

[১৫।৪।৮০]

নৈর্ব্যক্তিক গুরুর পরিচয়

বাইরে যেমন personal গুরু আছেন, সেইরূপ অন্তরেও গুরু আছেন। এই অন্তরের Impersonal গুরুকেই সদ্‌গুরু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সদ্‌গুরু বলতে সর্বগুরুর গুরু বা সচ্চিদানন্দ গুরুকেই বোঝায়। তাঁকে লাভ করলে পাবার আর কিছু বাকি থাকে না, তাকে জানলে জানারও আর কিছু বাকি থাকে না। এই Impersonal গুরুর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে হয়। তাঁকে নিজের দখলে পেতে না-চেয়ে নিজেকে তাঁর মধ্যে লীন করে দিতে হয়। তিনি যদি যুক্ত করে নেন তবেই মুক্তি। বর্তমানের এই ক্ষুদ্র আমি তাঁকে কী করে ধরবে?' মহাশূন্যের ভাবনা করতে করতেই তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। [২২।৪।৮০]

আপনবোধে হয় সমদৃষ্টি

পূর্ণতার লক্ষণ হল সমদৃষ্টি। মনের চাওয়াতে হয় খণ্ডদৃষ্টি, সমদৃষ্টি হয় না। মনের নাম হল শয়তান[১]। সে ভগবানের জিনিস তাঁরই কাছ থেকে পেয়ে ভোগ করে কিন্তু তাঁকে মানে না। যতক্ষণ মন গুরুর বাক্য, গুরুভাব, গুরুনাম ও গুরুরূপকে আপন করে না-নিতে পারে, ততক্ষণ এই শয়তানদের বিকার যায় না।

আপনবোধে ভালবাসা বা এক করে দেখা, শোনা ও জানাই হল সমদৃষ্টি[২]। নিজবোধেব মধ্যে রয়েছে সব

১। শয়তান—শয়তান বলার কারণ হল—মনের গতি বৈচিত্র্যমুখী। তার মধ্যে একতানের পরিবর্তে শত শত তান বেজে ওঠে এবং ভোগাশায় বৈচিত্র্যের দিকে ধাবিত হয়।

২। সমদৃষ্টি—স্বানুভূতির ভাষায়।

মঠ-মন্দির-তীর্থ-দেবতা-মহাত্মা ও আত্মগুরু। নিজের ভিতরে না-দেখে বাইরে ছোটাছুটি করলে দেহের ও মনের বিকার হয়। নিজ বোধের মধ্যেই সব কিছু মেলে। এই কারণেই বলা হয়—এখানে সচ্চিদানন্দময়ী মা স্বয়ংই বলেন এবং নিজেই শোনেন। 'স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব কেবলম্'। 'এখানে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) গোঁজামিল আর চলে না।

এ সকল বিষয় কী ভাবে এক সময় মানুষের মধ্যে প্রকাশ পাবে তা চিদানন্দময়ী মা আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন—

'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।' (১৪/৩—গীতা।)

মম যোনি কে? অব্যক্ত অবস্থায় যে ভাবের উদয় হয়—অর্থাৎ জিজ্ঞাসু যখন আসে জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মধ্যে গুরু গর্ভদান করেন। গর্ভ অর্থাৎ চৈতন্যের বীজ (seed of consciousness) সঞ্চার করেন। সেই চৈতন্য নিয়ে তা অস্বীকার যারা করে তারা হল ভূতযোনি। তাদের দেহ-মন-প্রাণের বিকার যায় না।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) তোমাদের জন্য কেন করতে যাবে? মনের দরজা বন্ধ করলে 'এর' কাছে কেউ নেই। দুই কোথা থেকে আসবে? আমি একা। এই আমি হল 'ভূমার আমি'। 'অমুক চন্দ্র', 'অমুক আমি' নই। 'এই ভূমা আমি' নিত্য বিরাজ করছে শূন্যে। তার মধ্যে খেলে চিদাকাশ।

সৎসঙ্গের তাৎপর্য

অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন ওঠে—তাঁর এই আয়োজন (গোলবারান্দায় সৎসঙ্গের ব্যবস্থা) কিসের? এর উত্তরে বলা যায় ফুলের কলির মধ্যে মা নিজেই যেমন সৌরভ দিয়ে দিয়েছেন, সেইরূপ এখানকার এই আয়োজন নিজের জন্য নিজেই করেছেন। এখানকার বিষয় ইদানীং খুবই আলোচিত ও নিন্দিত হচ্ছে। 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) চিদানন্দময়ী মা গুরু সাজাননি। সাজালে 'একে'-তো সবাই কচুকাটা করত। তার আগেই চৈতন্যময়ী মা 'একে' কিমাকাটা করেছেন। এই চৈতন্যময়ী মাকে বাদ দিয়ে কোনও ঈশ্বর, দেবতা, ভূত, কিন্নর, গন্ধর্ব কারও কোনও গতি নেই। এই মা মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান নয়। ইনি হলেন সচ্চিদানন্দময়ী মা। এই মা-এর মধ্যেই আছে পূর্ণতা। এই মা-এর স্মৃতি কারও জেগে উঠলে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই মা এত আপন যে তাঁকে ভুলে থাকাই হল কল্পনা। মা যে সকলেরই হৃদয়ে রয়েছেন সেই স্মৃতি জাগিয়ে দেবার জন্যই এত কথা। সাধু, সন্ন্যাসী তৈরি করার জন্য সৎসঙ্গের এই আয়োজন নয়।

আশ্রম হল ভূতের বাসস্থান। 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) আশ্রম হল মহাশূন্যে। এই আশ্রমের জন্য ইট-পাথর লাগে না। ব্যবস্থাপনার জন্য কোনও কর্মচারীও লাগে না।

আমি ও আমার প্রসঙ্গে

অখণ্ডের বিজ্ঞানে পৃথক কোনও কর্ম জ্ঞান যোগ ও ভক্তি নেই। সেখানে 'আমার' শব্দটি বলাই চলে না। তখন আমার কথাটি রূপান্তরিত হয়ে 'তাঁর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

'আমার' বলতে কিছু নেই। 'আমি'-রও পিছনে আছে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা—যাঁকে মানুষ যুগ যুগ ধরে বন্দনা করে এসেছে। তাঁকে কোন স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেকে বাদ দিয়ে মানুষ কোন ধর্ম করবে? নিজের থেকে ভগবানকে পৃথক ভাবা বা নিজ অতিরিক্ত বস্তু দেখা, শোনা ও জানা হল পাপ। নিজ অতিরিক্ত ভাবনা হল দ্বৈতভাবনা।

শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান প্রসঙ্গে

তিনি অণুর মধ্যে অণুরূপে এবং মহতের মধ্যে মহৎরূপে বিরাজমান। এই হল তাঁর নিত্যলীলা। নিত্যের মধ্যে লীলার অভাব, কিন্তু লীলার মধ্যে নিত্যের অভাব হয় না। নির্গুণ নিরাকার অবস্থাই শেষ নয়। সাধারণত মানুষের মধ্যে যে ভক্তির প্রকাশ দেখা যায় তা যথার্থ ভক্তি নয়। নির্গুণ নিরাকার অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবার পর সাধকের মধ্যে যে ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তা-ই হল যথার্থ ভক্তি, পরাভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি। সেইরূপ নির্গুণ নিরাকার অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবার পূর্বে জ্ঞান বা কর্মও যথার্থ জ্ঞান বা কর্ম নয়। কাজেই প্রেমের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক অর্থবোধক। শুদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত নিষ্কাম কর্মও সাধিত হয় না।

এসব কথা শুনে এক মহাত্মা 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি এত যে পরিশ্রম করে বলছেন তাতে লাভ কী? কয়জন বোঝে?

কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে বলা হল—তুমি বুঝতে পেরেছ কী? বুঝলে ওদের নিজের থেকে পৃথক করে দেখতে না। এখানে যিনি পরিবেশন করেন তিনি কোনও বিশেষ ব্যক্তি নন। কে তাঁকে মানল বা না মানল সেই বিচার অখণ্ড করে না। হীন কাজ করছে জেনেও সে দিয়ে যায়। কারণ তা হল অখণ্ডের ধর্ম। যেমন বাবা-মা অবাধ্য সন্তানকে তাড়িয়ে দিলেও উইলে তাকে সম্পত্তির অধিকারী করে দিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলে চলেন—ভবের মানুষ হল ভাবের ফানুস। তাকে যে চালায় সেই চৈতন্যপুরুষ প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস করেন। তাঁর শরণ না-নিলে উপায় নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার দ্বারা কিছু উপকার মেলে সত্য, কিন্তু সব দেবতা তাঁরই অধীন।

প্রতিমুহূর্তে গীতা উদ্গীত হয়ে চলেছে। সেই নিত্যপুরুষের নিত্যগীতাকে না-ধরে মানুষ ইতিহাসের পাতার গীতাকে ধরে। জিজ্ঞাসু মনকে প্রতিমুহূর্তে বীজ দ্বারা সঞ্চারিত করে গীতাবাণী। জিজ্ঞাসু হৃদয়ে সেই বীজের দ্বারা নানাবিধ ফুল ফলের সম্ভার হয়। যেমন মাটি, জল ও আলো বৃক্ষকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করে, কিন্তু বৃক্ষ মনে করে এগুলি তার। সেই জন্য আদি-অন্তে কেউ বলতে পারে না তার সম্ভার কোথা থেকে এল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে চললে সুরলোকে চলে যাবে। এই সুরের সঙ্গে 'অ', 'ক', 'ম', 'শ' যুক্ত হবে না অর্থাৎ অসুর, কসুর, মসুর ও শ্বশুর হবে না।

উদ্গীত গীতাবাণীর একটিমাত্র কথাতেই কাজ হয়ে যায়। এককণা আগুন যেখানে সব জ্বালিয়ে দিতে পারে, সেখানে চৈতন্যের আগুন পারবে না? চৈতন্য তাপ দিয়ে উত্তপ্ত করে অহংকার অভিমানের ধোঁয়া আগে বের করে দেয়, তারপর ভক্তি আপনিই প্রকাশ পায়। তখন আর শুধু আত্মারাম নয়, একেবারে তত্ত্বারাম[১] হয়ে যায় অর্থাৎ তত্ত্বতে যে আরাম পায়।

এই কথাগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করে যেখানে যা পকেট করার করে দিচ্ছে অথবা যা record করার, তা record করছে। তারপর কী করবে? 'যাঁর হাতে তৈরি জগৎ তাঁর হাতেই চাবি।' চাবি পেলেও চাবির নম্বর জানা না-থাকলে চাবি কাজে লাগে না।

গুরু বিনা জ্ঞান মেলে না, জ্ঞান ছাড়া ভক্তি হয় না, মুক্তিও হয় না। 'আমি আমার' বোধের অবসানে হয় যথার্থ ভক্তি। ফলে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয় সমান হয় এবং অদ্বৈতে স্থিতি, প্রীতি ও গতি হয়। সেই ভক্তিতে আত্মসূর্য জাগে। তখন কেবল আনন্দে আনন্দ পরমানন্দ প্রেমানন্দ।

১। তত্ত্বারাম—স্বানুভূতির ভাষায়।

সবই গুরুর মহিমা। সর্বত্র হয়ে চলেছে গুরুর খেলা। গুরুভজন হয় অদ্বয়জ্ঞানে। গুরুভজনে ভেদ থাকে না। অদ্বয়জ্ঞানে সাধ্য-সাধন-সিদ্ধি-সাধক সব একতত্ত্ব অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-উপাসনা ও মন্ত্র একতত্ত্ব। উপাস্য ও উপাসককে যারা ভেদ করে, তারা মনে করে আমি আত্মা থেকে বিচ্যুত হয়েছি। উপাসনা করছি যাতে দেহান্তে আত্মাতে মিলিত হতে পারি। কিন্তু এও কল্পনা। দেহধারণের পূর্বে ও পরে অখণ্ডের মধ্যে সবাই ছিল, আছে ও থাকবে। [২৭।৪।৮০]

অদ্বৈতবোধ না-হওয়া পর্যন্ত শান্তি মেলে না

দ্বৈতভাব থেকে আসে অশান্তি। এর থেকে রেহাই পাবার জন্য এমন একজনকে দরকার যিনি দ্বৈতভাবকে নাশ করে দিতে পারেন। সেই একজন হলেন সদ্‌গুরু। যিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে দ্বৈতভাবকে নাশ করে দিতে পারেন। গুরুর দোষ দেখলে নিজের মুক্তিপথের দরজা নিজেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরণাগতি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই।

সদ্‌গুরুর কাজ হল মনকে শুদ্ধ করা। উত্তম অধিকারী না-হওয়া পর্যন্ত শ্রবণের মাধ্যমে গুরু যোগ্যতা বাড়িয়ে যান। যত বড় মহাত্মাই হোক গুরুকৃপা ছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। হরিনাম করলেও গুরু দীক্ষা না-দিলে নামে কোনও কাজ হয় না। অজ্ঞান যিনি বিদূরিত করেন তিনিই গুরু।

যে কোনও form-এই হোক না কেন, গুরুকৃপা মানা চাই। লালাবাবু কত জ্ঞানের কথা শুনেছেন, কাজ হয়নি। যথার্থ সময়ে রজকিনীর একটি কথাতেই[1] কাজ হয়ে গেল। রজককন্যার বেশে গুরুই ঐ ভাবে তাকে জাগ্রত করে দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ গুরুবাণী অন্তরে না-খেলে ততক্ষণ শ্রবণের প্রয়োজন হয়। গুরু অনাদিকাল থেকে কাজ করে চলেছেন। সদ্‌গুরু দেখতে পান যে তাঁর মধ্যে সব কিছু আপনা হতেই হয়ে চলেছে অর্থাৎ তিনি নিজে কিছু করেনও না এবং নিজে কিছু বলেনও না; সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই ঐ ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন।

বোধের স্বরূপ হল সব কিছুকে প্রকাশ করে দেওয়া। মনকে দেহের সঙ্গে জড়িত করলে মনকে সংকুচিত করা হয়। দেহ হল পোশাক। চৈতন্য ঢাকা আছে মন দিয়ে। চৈতন্যের দৃষ্টিতে দেহাবরণ নেই। সদ্‌গুরু এই দৃষ্টিভঙ্গিই বারবার ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মন নিজেকে হারাতে চায় না। অর্থাৎ আমি থাকব না বা আমার কিছু থাকবে না, এ ভাবে ভাবতে চায় না। কাজেই গুরুবাণীতে মনোযোগ দেয় না।

গুরু আদি-অন্তে শুদ্ধ, কেবল জ্ঞানমূর্তি। আত্মাই গুরুরূপে আসেন। গুরু মানুষের বেশে এলেও তিনি যে মানুষ নন এই সব প্রসঙ্গ বারবার শুনতে শুনতে flash খেলে যায়, যা দেখা হয়নি তা দেখা হয়ে যায়, যা শোনা হয়নি তা শোনা হয়; এক কথায়, সর্ব অভাবের নিরসন হয়। তবে নিজেদের দোষেই তা পুনরায় আবৃত হয়ে যায়, spiritual evolution involution হয়ে যায়। তখন সে বলতে পারে আমি গুরু, ছায়া কখনও নই। অজ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব তখন আর তার কাছে থাকে না। [৪।৫।৮০]

অধ্যাত্মবিদ্যার চাবিকাঠি সদ্‌গুরুর কাছেই আছে

অধ্যাত্মসাধনার রহস্য কোথায় লুকিয়ে রয়েছে পুঁথি-পুস্তকে তা কেউ খুঁজে পাবে না। গুরুর কাছে আছে তার চাবিকাঠি। গুরুকে যখন দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি এই চতুর্বর্গ সমর্পণ করা হয় তখনই তা পাওয়া যায়। এ

১। বাবা! বেলা যে যায় বাসনায় আগুন দেবে না?

ছাড়া যে যা-ই করুক রাক্ষুসী, আসুরী, মোহিনী এই তিন গুণের মধ্যে থাকতে হবে। তার শুচিতা, সৌন্দর্য, মুক্তি ও শান্তি নেই। গুরুবাদে কোনও বস্তু আরোপ করা চলে না। এ সব দেবত্বের বা ঈশ্বরত্বের মধ্যে চলে।

ঈশ্বর হলেন আদিগুরু। চিদ্‌সাগরে আনন্দের আতিশয্যে আদিনাদ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই নাদ অনুভূত হওয়া মাত্র হৃদয়ের সব বৃত্তি ঈশ্বরত্বে পরিণত হয়। সেই নাদ হল 'জ্যোতির্ময় সমরসসার একরসসার'। তার মধ্যে চৈতন্য পরিপূর্ণ ভাবে রয়ে গেছে। তার জন্য সাধনা করতে হয় না।

যে গুরুকৃপা ব্যতীত ধর্ম বা কর্ম কোনও ক্ষেত্রেই অগ্রসর হওয়া যায় না, সেই গুরু কী? এ হল অন্তরে শুদ্ধবোধের স্ফূরণ। অন্তরে যত স্তর আছে সে সবগুলিরই এক একটি personification-এর সম্ভাবনা আছে। শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ আনন্দ, শুদ্ধা ভক্তি personified হতে পারে। মানুষের দৃষ্টিতে যে নৃতত্ত্ব আরোপ হয় ঠিক সে রকম হতে পারে। শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্যমানবগণের চেহারা মানুষের মতো, কিন্তু তাঁরা মানুষ নন। কে বুঝবে যে তাঁরা মানুষ নন? যিনি ঐ রকম হয়ে গেছেন তিনিই শুধু বুঝতে পারেন। তা ছাড়া তাঁরা নিজের থেকে ধরা না-দিলে কেউ ধরতে পারে না। ভগবানের শক্তি ভগবানের সঙ্গে থেকেও ভগবানের মহিমা বুঝতে পারে না। অথচ সত্তা ও শক্তি অভিন্ন। তা সত্ত্বেও এমন হয় কেন?

যে বিদ্যা কেন্দ্র থেকে আসে তা গুরুবিদ্যা এবং যে বিদ্যা বাইরে থেকে চয়ন করতে হয় তা হল অবিদ্যা। গুরু দেন অখণ্ডতা। সেই জন্য গুরুর মহিমা কোনও কিছু দিয়েই তুলনা করা যায় না। গুরু হলেন সর্বদেবময়। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, কারণ তাঁর বাইরের আচরণ সাধারণ মানুষের মতো থাকে।

নারদকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন—'তোমার মতো ভক্ত আর হবে না।' নারদ উত্তরে বলেছিলেন—এ রকম ভক্ত হয়ে আমার হল কী? নারদের মনে তখনও একটু জট্‌ ছিল। সেটুকু খুলে দেবার জন্য ভগবান তাঁকে বললেন—নারদ, ভগবানের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি হল গুরুভাব। গুরুভাবকে অবলম্বন না-করে কিছু প্রকাশ করা যায় না। এতক্ষণ তোমার কাছে গুরুভাবে ছিলাম এবং এখনও আছি। এখন আমি তোমার জন্য কী করতে পারি বল।

নারদ—গুরুর মহিমা বলুন।

ভগবান—গুরু দ্বৈত হয় না। গুরুর কখনও নাশ নেই। গুরুর সৃষ্টি নেই। সে অসৃষ্ট, অবিনাশী। সৃষ্টি হলে বিনাশ হতো। আমার গুরুভাব অনাদি অনন্ত। ঈশ্বরীয় ভাব অনাদি নয়। সৃষ্টির লয় হলে ঈশ্বরও বিশ্রাম করেন। কেন? এর উত্তর সর্বোত্তম ভক্তকে ছাড়া বলা যায় না। গুরুকে যোগী এবং জ্ঞানীও সামনে রাখে না। ভক্তই শুধু রাখে। কিন্তু যথার্থ ভক্ত তো সচরাচর পাওয়া যায় না।

ভাবাবেশে মধুক্ষরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গান ধরলেন—

আমার আমিতে তুমি নির্গুণ-গুণী
যেমন ইচ্ছা খেলেও তুমি অপরিণামী।

(গান নং ১৭, তুমিতত্ত্ব স্বানুভবসুধা ২য় খণ্ড)

গান সমাপ্ত হলে তিনি বলতে শুরু করলেন—

এই গুরু হলেন স্বানুভবদেব স্বয়ং, শিবরাম, আত্মারাম, আনন্দঘনশ্যাম, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অন্তর্যামী নারায়ণ। এই হল প্রাণারাম। শুধু প্রাণ বা মন বা চিত্ত অথবা অহংকার নয়। গুরুকৃপা ছাড়া মন, প্রাণ, বুদ্ধির উপায় কিছু নেই। তাঁর জীবন তাঁর কাছে সঁপে দেবার ইচ্ছা না-জাগলে তাঁর দর্শন মিলবে কী করে? দর্শন হয় তখনই, যখন দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বৃত্তিগুলি এক সুরে, এক ভাবে ও একবোধে গতি লাভ করে বা সমত্বে স্থিতি লাভ করে। এ-ই হল আত্মরতি। তখন যা দেখবে, শুনবে ও বুঝবে সে সব কিছুর মধ্যেই থাকবে শুধু সমরস।

যে গুরুকে ভালবাসে, গুরু যার হৃদয়ে থাকেন তার দুঃখ আত্যন্তিক সুখে এবং অজ্ঞান জ্ঞানে পরিণত হয়। সব কিছু তাঁর হয়ে গেলে সব সহজ হয়ে যায়; নইলে বসে বসে অঙ্ক মেলাতে হয়। দিব্যনয়ন গুরু খুলে না-দিলে প্রতি পদে পদে তাঁর অভিব্যক্তি কী করে দেখা যাবে? তাঁর কাছে একমাত্র নয়ন বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী চিদ্‌ঘন কেবল জ্ঞানমূর্তি—

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন—

এক ভক্ত একবার তার গুরুমহারাজকে জিজ্ঞসা করল—তুমি আমাকে কিছু দিলে না তো।

গুরু বললেন—তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি। এই বলে গুরু চলে গেলেন। একঘণ্টা দু'ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল; গুরু আর আসেন না। একদিন দু'দিন করে একবছর দু'বছর, এই ভাবে সময় পার হয়ে যায়। শিষ্য আর অপেক্ষা করতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তখন গুরু এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে সেবা ও শুশ্রূষা করলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে শিষ্য বলল—কত যুগযুগান্তর পার হয়ে গেল। এত দিনে তুমি এলে?

গুরু বললেন—এই তো আমি গেলাম আর এলাম।

ভক্ত বলল—গুরু, লক্ষ বছর তোমার কাছে এক মুহূর্ত। এটা আমাদের কবে হবে?

গুরু—যেদিন 'আমার বোধ' ছেড়ে দেবে।

চাওয়ার যে কী সুখ কাঙাল জানে। গুরুকে যদি হৃদয়ে বসান হয়, তাহলে আর চাইতে হবে কেন? গুরু তো সর্ব্বব্যাপী।

সবার মাঝে তুমি হলে
'আমার আমি' কোথায় থাকে—

প্রতি ঘটে ঘটে বসে আছেন আত্মা স্বয়ং। এই অবিনাশী আত্মা হলেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। শুনতে শুনতে প্রথমে ক্লান্তি আসে। তারপর দেখবে তার কোথায় আদি, কোথায় কেন্দ্র, কোথায় অন্ত। যতক্ষণ সেই ভাব না-জাগবে ততক্ষণ শ্রবণধারার[১] প্রয়োজন। শ্রব+ণ। 'শ্রব ধারা' মানে চিদানন্দ ধারা। 'ণ' হল মূর্ধা। মূর্ধার স্থান হল সদ্‌গুরুর স্থান। তাঁর বাক্‌ধারা হল চিদানন্দধারা।

নদীতে যখন কেউ স্নান করতে যায়, তখন গাড়ু, কলসি প্রভৃতি যার যেমন পাত্র আছে তা-ই নিয়ে যায়। পাত্র না-পেলে কেউ গামছা ভিজিয়ে নিয়ে আসে। যদি হৃদয় ক্ষেত্রে unbiased mind নিয়ে কেউ গুরুবাণী শ্রবণ করে গুরু তার কাছে আপনিই ধরা দেবেন—

আপনার কাছে আপনবোধে আপনি দেয় ধরা
তাঁকে অপরবোধে অন্যবোধে যায় নাহি ধরা। [১৮।৫।৮০]

পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরমব্রহ্মের পরিচয়

নির্গুণস্বরূপে অর্থাৎ সগুণের উর্ধ্বে হলেন পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম। তিনিই আবার স্বয়ং নির্গুণগুণী পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁকেই ইংরাজীতে বলা হয় 'Supreme Personality of Godhead Absolute'। এক পরমতত্ত্বই গুণ ও ব্যবহার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পরমাত্মার মধ্যে (Pure

১। শ্রবণধারা—চিদানন্দ প্রবাহ

Consciousness-এর মধ্যে) অজ্ঞানবশত কল্পনার মাধ্যমে জীবত্ব আরোপ করা হয়। তার ফলে হয় ভ্রান্তিবিলাস অর্থাৎ একের মধ্যে নানাত্ব-বহুত্ব ও নাম-রূপের কল্পনা বা প্রতীতি। এ-ই হল ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য ব্রহ্ম-আত্মার স্বরূপ চিন্তন এবং তদ্‌ভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দভাব অনুশীলন করতে হয়। তার ফলে অবিদ্যা, অজ্ঞান ও কল্পনার ভ্রান্তিবিলাসের অবসান হয় বা সচ্চিদানন্দ আত্মার স্ফূর্তি হয় বা স্বানুভূতির বিজ্ঞান অনুভূত হয়।

Appearance বা division দূর হয় গুরুকৃপায়। গুরুর স্থান হল ঈশ্বরের উপরে। ঈশ্বর গুরুভাব ছাড়া নেমে আসতে পারেন না। গুরুভাবের মাধ্যমে তাঁকে নেমে আসতে হয়। গুরু হলেন সর্বদেবময়। যাঁর মাধ্যমে ব্যষ্টি জীবনের আত্মা জেগে ওঠে বা Lost Paradise regain করা যায়, তিনিই গুরু। মানুষ নিজেই নিজের ফাঁদ বানায় আর বেরোতে পারে না। গুরু সত্যবাকের মাধ্যমে আত্মবোধ জাগিয়ে দেন; ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে নয়। চৈতন্য ক্রিয়ানিরপেক্ষ। ক্রিয়া করে মন। মন মলিন হলে উপাসনাদি করতে হয়। বাকের মাধ্যমে সত্যানুভূতি লাভ করা উত্তম অধিকারীর পক্ষে সম্ভব। মলিন চিত্তে সম্ভব নয়।

গুরুবাক্যের বহু শ্রবণ হয়েছে যার, সে হল উত্তম অধিকারী এবং শ্রবণবশত যার অনুভূতি হয় সে সর্বোত্তম অধিকারী। তপ্ত লোহার উপরে জলের ফোঁটা ফেলা মাত্র লোহা যেমন তা শুষে নেয় সেইরূপ গুরুবাণী শ্রবণ মাত্র উত্তম অধিকারীর মধ্যে তা ফলপ্রদ হয়।

গুরু হলেন তিনিই যাঁর মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয়। কার বক্ষে? আপনবক্ষে। গুরুভাব দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। গুরুকে ব্যক্তিরূপে ধরলে ভুল হয়।

গুরু মনকে 'অ-মন'[১] বানিয়ে দেন। গুরু শুধু great soul নন, তিনি অণোরণীয়ান ও মহতোমহীয়ানের সঙ্গে যুক্ত; তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ[২]—thumbsized নন। তাঁকে size কে করবে?

জনৈক ভক্ত—তাহলে তাঁকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয় কেন? এ কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

বৃদ্ধাঙ্গুলের function কী? শুধু সাক্ষিমাত্র। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সাক্ষী হয়ে বসে আছেন। সাক্ষিপুরুষ হলেন unaffected ever free, মন-ইন্দ্রিয়ের দাস নন তিনি।

গুরু শিষ্যকে চিদাকাশ বানিয়ে দেন। গুরুর যদি Self-Realization না-হয় সেই গুরুর কাছে শ্রবণ হলে সংশয় আরও বেড়ে যায়। আত্মগুরু সংশয় কমিয়ে দেন।

সকলের প্রয়োজন সেই একজনকে যাঁকে পেলে মনের সব অভাব মিটে যায়। Godfather and Godmother সব অভাব মিটিয়ে দেন। মা ও বাবাকে প্রত্যক্ষ দেবতারূপে গ্রহণ করতে না-পারলে সাধনা হয় বিলাসিতা মাত্র। দেহধারণ করে যদি না-আসতে পারা যেতো তবে কোন অব্যক্তে পড়ে থাকতে হতো! মা বাবা-ই sacrifice করে দিয়ে যাচ্ছেন। দেহধারণ ছাড়া কলি যুগ থেকে সত্য যুগে পৌঁছবার আর কোনও রাস্তা নাই। মা-বাবাকে দিব্যভাব দিয়ে মানলে Absolute-এ পৌঁছে যাওয়া যায়। তাহলেই নিত্যযোগ হয়ে যায়। [২০।৫।৮০]

গুরুবাণীর অভিনব তাৎপর্য

গুরুবাণী ও নির্দেশ শুনে অভ্যাস বা সাধন করে 'আমার আমার' ভাবকে নাশ করতে হয়। গুরু বাণীর মধ্যে এমন জিনিস দিয়ে দেন যা, যে অনুশীলন করবে সে-ই ফল পাবে। তা ছাড়া আর সব তুক্‌তাক্।

১। অ-মন—অখণ্ড মন। মন তখন অখণ্ডবোধের সঙ্গে একীভূত হয়ে মিশে যায়।

২। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের অর্থ এখানে কেন্দ্রপুরুষ, পুরাণপুরুষ, প্রবুদ্ধ আত্মা (অনাদিকারণ)।

এগুলিতে সাময়িক কাজ হয়। দুঃসময়ে কেউ থাকে না। সাজা-গুরু সাহায্য করা দূরে থাক্ নিজেই পালায়। এক অন্ধ কী আরেকজন অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

গুরু কৃপা করেন বোধ দিয়ে। বোধ প্রতিষ্ঠিত আছে বাকের মধ্যে। বাকের দ্বারা মন স্পন্দিত হয় এবং নূতন স্পন্দন তৈরি হয়। তার প্রভাবে অসৎ বৃত্তি আপনিই সরে যায়। এ ছাড়া সৎ বৃত্তি লাভ করা কঠিন। Verify করার জন্য যেতে হয় আরেকজনের কাছে। জীব নিজে আবৃত করতে পারে কিন্তু আবরণ মোচন করার ক্ষমতা নেই তার। তখন প্রয়োজন হয় শিবকে, শিব হলেন গুরু। যেমন দেহ লাভ করতে হলে বাবা-মাকে প্রয়োজন হয়।

সাগর যেমন নদীকে টেনে আনে আপনবক্ষে, সেইরূপ গুরুও স্ববোধের বাণী দিয়ে শিষ্যকে টেনে আনেন। গুরু বলেন, আমি এই ছড়িয়ে দিলাম নিজেকে। এবার 'তোমার বোধে' সব ব্যবহার করে আমার বক্ষে তোমরা ফিরে এস।

এ-ই হল চৈতন্যময়ী মায়ের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই চিদানন্দময়ী মা 'এই মুখ' (নিজের দিকে দেখালেন) দিয়ে সব প্রকাশ করে দিলেন। অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে চিতিমাতা নিজেই অন্তরে প্রবিষ্ট হন। এ-ই হল 'নবপর্যায়ের দীক্ষা'। এই বোধ দিয়েই মা আমূল পরিবর্তন করে দেবেন। এ হল অব্যয়বীজ; কল্পনার বীজ নয়। নিজবোধ দিয়ে পারমার্থিক বোধ তৈরি হয়। 'পরম' সব সময়েই থাকে মৌলিক। তাই এই বীজ সময়ে মূলে নিয়ে আসে।

ইন্দ্রিয়ের টান যখন থাকে মূলের দিকে তখন পরমাত্মা স্বয়ং আসেন কৌলগুরু রূপে। 'ক' হল পরমাত্মা, 'উ' হল শক্তি, 'ল' হল ব্রহ্মে যে লয় হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্মে যে লীন হয়েছে সে-ই কৌল।

বর্তমানে এ সব তত্ত্ব 'এঁঠো' হয়ে গেছে বলে সচ্চিদানন্দময়ী মা এবার নূতন করে দিচ্ছেন। নইলে প্রাণসঞ্চার হবে না। প্রাণসঞ্চার না-হলে অনুভূতি হয় না। [২২।৬।৮০]

আত্মজ্ঞপুরুষর মহিমা

আত্মজ্ঞপুরুষ হলেন সর্বনীতিরই অধিকারী। সুতরাং তিনি রাজনীতির অধিকারী তো বটেই, তবে কূটনীতির নয়। রাজনীতির মর্মার্থ হল শ্রেষ্ঠ নীতি। আত্মজ্ঞপুরুষ না-হয়ে শ্রেষ্ঠ নীতি পালন করা অর্থাৎ রাজনীতি করা যায় না। একেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'চাপরাশ পেয়ে করা'।

কল্পনা ও গুরুবাণী

তোমরা সবাই জান যে গতানুগতিক ভাবে বলা হয় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দময়ী মা এবার প্রকাশ করলেন ছয় নশ্বর ধর্ম। তা দ্বারা সপ্তম ভূমিতে পৌঁছান যায়। সেখানে বিকার স্পর্শ করে না। এই অনুভূতিতে না-পৌঁছালে পূর্ণতা লাভ হয় না। যেমন আগুন আগুনকে পোড়ায় না। সেরূপ 'আত্মার আমি' সব কিছুর কারণ হলেও নিজে বিকৃত হয় না, সে কারণ হয় না, সে কারণাতীত। বিকার হওয়া মানে কল্পনা এবং কল্পনাই হল বিকার।

এই প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন—

একবার এক শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করল—বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী?

গুরু—মুক্তি? সেটি কী বস্তু?

শিষ্য—এই যে চারিদিকে দুঃখ-কষ্ট, এ-ই তো বন্ধন।

গুরু—কার বন্ধন?

শিষ্য—এই যে আমি ভোগ করছি।

গুরু—কে পায় দুঃখ-কষ্ট?

এই রকম ভাবে গুরুর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শিষ্য এক সময় আর এগোতে না-পেরে উত্তর দেওয়া বন্ধ করল এবং গুরুকে বলল—এবার আপনি বলুন।

গুরু—তোমার বলা শেষ না-হবার আগে বললে তুমি চুরি করবে। গুরুবাণী তোমার প্রথম গ্রহণীয়, যা তুমি আগে করনি।

যে মুক্তির কথা চিন্তা করে সে আত্মা নয়; তুমি স্বরূপত আত্মা। এই প্রশ্ন আত্মার নয়। কাজেই তুমি disqualified। জগতের অন্তর্গত সব প্রশ্নই বৃথা।

গল্পটি শেষ করে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলছেন—

বন্ধনের কথা কে বলে? যে বন্ধন ও মুক্তির কথা চিন্তা করে সে আত্মা নয়। আত্মাতিরিক্ত যে তার তো সত্য অস্তিত্বই নেই। সুতরাং তার প্রশ্নও নেই। এখন প্রশ্ন হল আমরা যে কথা বলি তা কী আত্মার কথা, না, অনাত্মার কথা?

জনৈক ভক্ত— দেহের কথা।

উত্তর—ওটা তো real নয়, ভাসমান।

প্রশ্ন—তবুও এই কথাগুলি প্রচলিত কেন?

উত্তর—একটা false idea থেকে মানুষ বলে।

প্রশ্ন—দেহের থেকে বলে?

উত্তর—মনের অন্তর্গত হল দেহ।

প্রশ্ন— মনের কী আলাদা অস্তিত্ব আছে?

উত্তর—যতক্ষণ আলোচনা আছে ততক্ষণ মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কী দিয়ে প্রমাণ করবে যে নেই? একমাত্র গুরুবাণী দিয়ে পারবে। নিজেদের চেষ্টা বা আলোচনা দিয়ে পারবে না।

প্রশ্ন—আত্মাই যদি সব হয়, তবে তো আর কিছু নেই।

উত্তর—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সব কল্পনা।

প্রশ্ন—কল্পনা কে তৈরি করে?

উত্তর—এতদিন তো এটা করেই এসেছ। আগে সত্যবাককে নাও। আগে light নাও। সেই light দিয়ে কল্পনাকে নাশ কর। প্রশ্ন করলে convention-এর মধ্যে পড়ে যাবে।

প্রশ্ন—হ্যাঁ, কিন্তু সত্যকে মানলেও convention তো চলতেই থাকবে।

উত্তর—তার কারণ, তোমরা convention-কেই follow কর। গুরুবাণী নাও না। বর্তমানে all through কেউ গুরুবাণী follow করে না।

প্রশ্ন—এই ইচ্ছা জাগে না কেন?

উত্তর—সাগরে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে, মনে সে রকম ভুরভুরি উঠবেই, মন maniness তৈরি করে। Oneness হল real। তবু Maniness-এর দিকেই সবাই যায়। এটাই হল মনের ধর্ম। কথা কে বলে? মন? না, আত্মা?

ভক্ত—কথা মনই বলে।

শ্রীশ্রীবাবা— সেই মন তৈরি করতে হবে, যে মন গুরুবাণী গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে পারে।

[২৪।৬।৮০]

Self-Divine এবং Self-Realization-এর তাৎপর্য

Self is Divine এবং Self-Realization is also Divine, সেখান থেকে আসল ধর্ম আরম্ভ। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—শুধু মুক্তি নয়, পরে রয়েছে মহামুক্তি।

মুক্তির পরে কর্তব্য কী? সদ্‌গুরুর জয়গান করা। যার ফলে Divine chapter open হয়। গুরু হলেন তিনি, যিনি সমস্ত কর্ম ও তার ফল থেকে মুক্ত করে দিয়ে শুদ্ধ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। শুদ্ধবোধ দিয়ে আরম্ভ হয় গুরুভজন। এই গুরু দেহধারী গুরু নন। ভাগবতে, যোগবাশিষ্ঠে, পঞ্চদশীতে যে গুরুর কথা পাওয়া যায় সেই গুরুরই ভজন করতে বলা হয়। মুক্তাত্মা উদাত্ত কণ্ঠে Divine-এর জয়গান করেন। বদ্ধজীব গাইতে পারে না। তারা শুধু বদ্ধজীবের সংবাদ নিয়েই জীবন কাটায়। গুরু এসে তাদের শুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে মুক্ত করে দেন। তারপর তাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হয়।

গুরুদক্ষিণার তাৎপর্য

গুরুদক্ষিণা না-দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি হয় না। গুরুদক্ষিণা কী? বিকারধর্মী কোনও বস্তুর প্রয়োজন গুরুর নেই। নিজের মুক্ত আত্মাকেই মুক্তপুরুষগণ গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ দিয়ে দেন এবং বলেন 'আমি আপনার দেওয়া জ্ঞানে মুক্ত, আমি আপনার দাসানুদাস। আপনার সেবায় আমি আমাকে নিয়োজিত করলাম।'

এই জন্য সাধকদের প্রথম জীবন হয় struggling life, তারপর হয় Divine life। সেই জীবনে হয় ভগবানের নিত্যলীলা। সেখানে limitation-এর কোনও প্রশ্ন নেই, জরা-ব্যাধিরও কোনও sense নেই।

আত্মবিস্মৃতি হল সবচেয়ে বড় ব্যাধি। আর সব ব্যাধি secondary। আত্মবিস্মৃতিরূপ ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসক সদ্‌গুরু। আর কোনও দেবতার সে ক্ষমতা নেই।

সদ্‌গুরুর ভজনেই কেবল সব রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় সংসারজীবনে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় না। সংসারজীবন থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা কারও জানা নেই। একমাত্র সদ্‌গুরু কৃপা করে জ্ঞানের আলো দিলে তবেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যায়। সদ্‌গুরু আবার তাঁর নিজের গুরুকেও ভজন করেন। কেন করেন? এই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি অতর্ক্যমূর্তি, অপরিমেয়। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। এঁদের ঋণ শোধ করা যায় না।

মনের কাজ হল শুদ্ধ বস্তুর চিন্তা করা; অথচ মন বিকারধর্মী বস্তুর চিন্তাই করে চলেছে। এই মনকে গুরু জ্ঞান দিয়ে শুদ্ধ স্তরে নিয়ে যান।

সদ্‌গুরুই স্বয়ং জীবন্মুক্তির উপায় ও উপেয়

গুরু হলেন পরমধাম—Supreme abode বা ভগবান স্বয়ং। তিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, নির্গুণগুণময়। তাঁর এমনই এক অদ্ভুত জীবন যাঁর মধ্যে সব সত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মেলে। গুরুচিন্তনে সমস্ত মল নাশ হয়। জন্ম জন্মান্তরের কত মল, কত সংস্কার যে সঞ্চিত থাকে কেউ তার খবর জানে না, এক গুরু ছাড়া। সংসারী মানুষের পক্ষে পরমধামে যাবার উপায় হল গুরুর শরণ নেওয়া। সদ্‌গুরুর কৃপায় কেবল যে মুক্ত হওয়া যায় তা নয়, দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় বা অমৃতময় জীবন আরম্ভ হয় তাঁর কৃপাতেই শুধু।

গুরুর সঙ্গে মিশে যাবার বিজ্ঞান গুরুর কাছেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মেলে। জীবের মালিক জীব নয়। গুরুর কাছেই শুনতে হয় তার ভিতরে কে আছেন। গুরু পরিষ্কার দেখিয়ে দেন যে তার ভিতরে বসে কে কর্ম করে এবং কে কর্মফল ভোগ করে। এগুলি শাস্ত্রে আছে; কিন্তু শাস্ত্র কথা বলতে পারে না। দেবতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র।

সকল মহাত্মাই এক বাণী দিয়ে যান যে আত্মবিস্মরণ হলে আত্মজাগরণের জন্য একটিই ওষুধ আছে। তা হল একবোধে এক-এর ঘরে যাওয়া। একবোধের নাম গুরু। গুরু হলেন আদিপুরুষ। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে যে ভাবকে অবলম্বন করেন তা-ই গুরুমূর্তি। গুরুমূর্তি ছাড়া ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না।

যখন, যাঁর মাধ্যমে, যাঁর দ্বারা, যে ভাবে সত্য প্রকাশ পায় তা-ই হল দিব্যজীবন। [৮।৭।৮০]

গুরুদক্ষিণার অর্থ

সদ্‌গুরুর বাণী রক্ষা করবে—এই হল মূল কথা। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে চল, অর্থাৎ গুরুবাণী নিয়ে থাক। কিন্তু এখন গুরুকে নিয়ে কে থাকে? গুরুবাণী গ্রহণ করে তা 'মেনে, মানিয়ে চলা' হলেই গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়। [১৫।৭।৮০]

শিক্ষা ও দীক্ষার তাৎপর্য

কতগুলি নূতন অভ্যাস গ্রহণ ও পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করা হল শিক্ষা ও দীক্ষার তাৎপর্য। জীবনের বাইরের আচরণ হল শিক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ আচরণ হল দীক্ষা। যে অন্তরবৃত্তির দ্বারা পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করে নূতন অভ্যাস গ্রহণ করা হয় তা হল দীক্ষা এবং ব্যবহারিক জীবনে পরস্পরকে গ্রহণ করার জন্য যে পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করে নূতন অভ্যাস গ্রহণ করা হয়, তা হল শিক্ষা।

বাকের মাধ্যমে সত্যকে direct পাওয়া যায়। কর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায় indirectly। মহাবাণী গুরুমুখে শুনলে direct Realization হয়। [২০।৭।৮০]

ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই হল গুরুভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

যে বারো বৎসর ঠিক মতো গুরুর নির্দেশ মেনে চলে সে-ই গুরুবাণীর ধন পাওয়ার অধিকারী হয়। নতুবা সত্যবাক্ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তার ফলে সত্যকে ধারণ করা সম্ভব হয় না বা শ্রদ্ধা[1] জাগে না। শ্রদ্ধার অভাবে ভক্তিও জাগে না।

মনকে guard দিতে হয় গুরুর ধ্যান ও চিন্তা দিয়ে। সৎসঙ্গে একটি idea নিয়ে যেতে হয়। যিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য দেবেন তাঁকে না-মানলে বিকার আসবেই। তাঁর অনুশাসন জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হয়। তাহলে গুরু তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করার দায়িত্ব দেন। গুরুর বিরুদ্ধে কথা বলে না এ রকম ভক্ত 'কোটির মধ্যে গোটিক হয়'। [২৯।৭।৮০]

সদ্‌গুরু ও সৎপ্রসঙ্গ

[শয়নঘরে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেবার সময় ঘরে কোনও ভক্ত এলে বিভিন্ন দিনে নানা রকম কথাবার্তা আলোচনাকালে গুরুপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর যখন যেমন বলেছিলেন তারই কিছু কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হল যথা সম্ভব তাঁরই ভাষায়—]

যাঁর কাছ থেকে, যাঁর সঙ্গ করে, যাঁর বাক্য বা বাণী শুনে অনুভূতির সমস্ত স্তর পরিষ্কার হয়ে যায়, জ্ঞানস্বরূপ সেই গুরুমূর্তিই হলেন সর্বোত্তম দেবতা। তিনিই সদ্‌গুরু। এই প্রত্যক্ষ সদ্‌গুরু পেয়ে যারা অন্য দেবতা বা অন্য অন্য মতপথের সন্ধানে ঘোরে ও ভজন করে, সেই সকল গোঁড়া, অন্ধ, মতলবিগণ সত্যের সন্ধান কোনও দিনই পায় না। তারা সত্যঘাতী, সত্যনাশী। তাদের সঙ্গ যারা করে তারাও দুর্ভাগা।

১। শ্রদ্ধা—সত্যকে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা।

প্রদীপের আলো দিয়েই প্রদীপকে জ্বালাতে হয়; সে রকম এখানে যে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে সেই জ্ঞান দিয়েই 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন) এবং শ্রুত বিষয়কে ব্যবহার করতে হবে। শ্রুত বিষয় দিয়েই শ্রুতিকে ব্যবহার করতে হয়। "যথাবৎ শ্রবণং তথাবৎ মননম্"। যেমন যেমন বলা হয় তেমন তেমন মানতে হয়। তাহলেই শ্রুত বস্তুর সঙ্গে ব্যবহারকারীর সমতা বা একতা অনুভব হবে।

জ্ঞানের সমতা অনুভব করাই হল সত্যদর্শন। সমান জ্ঞানই হল ভগবান বা আত্মার স্বরূপ ও পরিচয়। সমান জ্ঞানের মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ হয় না এবং হতেও পারে না; কারণ তা সর্বতোভাবে দ্বৈতভাব বর্জিত। দ্বৈতভাব থেকেই হয় দ্বন্দ্ববিরোধ। অদ্বৈত ভাবই হল নিত্য সমান, একভাব বা সমভাব। সুতরাং তার ব্যবহারের মধ্যে কোনও বিকারও হতে পারে না।

অসমান জ্ঞান হল দ্বৈত জ্ঞান। এই জ্ঞানের ব্যবহারে পরস্পরের মধ্যে বিকার ও প্রতিক্রিয়া হয়। তার ফলে জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। জ্ঞানবিরুদ্ধ আচরণ দ্বারা স্বরূপের সেবা করাও সম্ভব নয়, সাধন করাও সম্ভব নয়, তাঁর দর্শন ও অনুভূতিও সম্ভব নয়।

সমজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা সমজ্ঞানে স্থিতি পূর্বাপর সমান হয়। পূর্বাপর সমজ্ঞানে ব্যবহারের ফল হল সমদর্শন। সর্বজ্ঞতা হল ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ। সমদর্শন তার লক্ষণ। যে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে জানা যায়, জ্ঞানের বিবিধ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় এবং ব্যবহার অন্তে বা পরিণামে তা নির্বিকার ও প্রতিক্রিয়াশূন্য থাকে তা-ই হল সদ্‌গুরুবাণী। গুরুবাণী ও সদ্‌গুরু অভিন্ন। সর্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানবিগ্রহ, জ্ঞানমূর্তি ব্রহ্ম-আত্মা-গুরুরূপে স্বয়ং বর্তমান। গুরুর স্বরূপ, স্বভাব, তাঁর আচার-ব্যবহার ও সমগ্র জীবন হল শুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত উদাহরণ।

অদ্বৈতবোধে নিজেকে ব্যবহার দ্বারাই সদ্‌গুরু পূজা সিদ্ধ হয়

গুরুভাবের অংশ-বিশেষ হল দেবভাব। দেবভাবের দ্বারা হয় দেবভাবের পূজা এবং গুরুভাবের পূজা। অদ্বৈতবোধে নিজেকে ব্যবহারের নাম হল সদ্‌গুরু পূজা।

জড় ও চৈতন্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য

জড় থেকে কখনও চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না এবং চৈতন্য থেকেও কখনও জড়ের উৎপত্তি হয় না। জড় ও চেতন দুই-ই সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। যে বস্তু অন্য বস্তুর সংযোগে বা মিশ্রণে উৎপন্ন তাই হল জড় বা অচেতন। আর যা অন্য বস্তু নিরপেক্ষ, অসৃষ্ট, অবিমিশ্র, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংজ্যোতি তাই হল চৈতন্য। জড় বস্তু অনিত্য, অস্থায়ী, বিকারী ও বিনাশী। সদা পরিবর্তনশীল; সুতরাং অসত্য। চৈতন্য নিত্য, স্থায়ী, নির্বিকার ও অবিনাশী। তা অপরিণামী, অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, অচ্যুত, অখণ্ড। সুতরাং তা নিত্যসত্য।

চৈতন্যস্বরূপ অখণ্ড, ভূমা, নিরাকার, নিরবয়ব, নির্গুণ ও নির্বিশেষ। জড় বস্তু হল খণ্ড, সীমিত, আকার ও অবয়ববিশিষ্ট, গুণধর্ম সমন্বিত সবিশেষ। চৈতন্যের আশ্রয়ে, চৈতন্যসত্তার বক্ষে, চৈতন্যের আভাসে জড়ের অস্তিত্ব এবং চৈতন্যের প্রভাবেই তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রতীত হয়। চৈতন্যকে বাদ দিয়ে জড়ের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী অবগত হওয়া যায় না। সেই জন্য জড়কে অসৎ বা মিথ্যা বলা হয়। চৈতন্যের সান্নিধ্যবশত জড়ের মধ্যে চৈতন্যের ধর্ম এবং চৈতন্যের মধ্যে জড়ের ধর্ম অধ্যাসিত হয় বা আরোপিত হয়। ভ্রান্তিবশত তা-ই চিদ্‌জড়গ্রন্থিরূপে অনুভূত হয়। জড় ও চৈতন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংযোগ ও পরস্পর ধর্ম বিনিময়ও সম্ভব নয়।

বস্তু ও চৈতন্যের অধ্যাসিত ভ্রান্তি জ্ঞান বা বিপর্যয় জ্ঞানের পরিণামই হল জগৎদর্শন। জগৎদর্শনের ফলই হল সংসারদশা, জীবনবন্ধন ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনঃপুনঃ আগমন।

চৈতন্যের তত্ত্ব হল নিত্য অদ্বৈত। বস্তু তত্ত্ব হল দ্বৈত। দ্বৈতই হল ভ্রান্তি, ভীতি, দুঃখ-কষ্ট, জন্ম-মৃত্যু ও বন্ধনের কারণ। অদ্বৈত হল অভ্রান্তি, অভীতি, মুক্তি, শান্তি ও পরমসুখপ্রদ। অনিত্য অসত্য দ্বৈত বস্তুর সন্নিধান বা অভিনিবেশবশত চিদ্‌জড়গ্রন্থির মাধ্যমে আসক্তি মোহের সৃষ্টি হয়। এই আসক্তি মোহই হল কামনা। এই কামনা ঘনীভূত হয়ে ইচ্ছার রূপ নেয়। এই কামনাই হল কর্মের প্রেরয়িতা বা জননী। কামেচ্ছা থেকেই কর্তা ও কর্মের উৎপত্তি। কর্মের দ্বারা কর্তা কর্মফল সৃষ্টি করে তা ভোগ করে। ইচ্ছানুরূপ কর্মফল ভোগের অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলে অর্থাৎ কাম প্রতিহত হলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধের ফল হল সন্মোহ। সন্মোহের ফলে ধ্রুবাবোধের স্মৃতির বা আত্মস্মৃতির বা জ্ঞানের স্মৃতির বিভ্রম হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মবোধের অভাবে হয় অজ্ঞান ভ্রান্তি এবং তার ফল হল বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশের ফলে হয় জীব[১]চৈতন্যের পূর্ণ আবরণ বা বিনাশ বা ধ্বংস।

দ্বৈত ভাববোধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিণাম

কোনও প্রকার দ্বৈত ভাবের আগ্রহ বা অভিনিবেশ হলে বা থাকলে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা-ভগবান আবৃত হয়ে যায়। দ্বৈত স্মৃতির প্রভাবে শুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মার বক্ষে আবরণ পড়ে। যত সহজে এই আবরণ পড়ে তত সহজে এই আবরণ বা মল দূরীভূত হয় না। এই মল অপসরণ করার জন্য বহু কৃচ্ছ্রসাধন বা কঠোর সাধন করতে হয়।

দ্বৈত ব্যবহার দ্বারা দ্বৈত ভাবের বিস্তার হয়। দ্বৈত ভাবের বিস্তারে শুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মার মলাবরণ ক্রমশই বেড়ে যায়। দ্বৈতমলবিশিষ্ট চৈতন্যই হল জীবচৈতন্য। জীব চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে তার এই মলাবরণকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলে। তার ফলে তার জন্ম জন্মান্তর জীবদশা ভোগ করতে হয়। এই জীবদশা ভোগ থেকে নিজেকে নিজে কখনওই সে উদ্ধার করতে পারে না। এই জীবদশা থেকে মুক্ত হয়ে তার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে শুদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির প্রয়োজন তা সে একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপাতেই পায়। জীবের দিব্যমুক্ত আত্মস্বরূপ লাভের উপায় আত্মজ্ঞপুরুষ—সদ্‌গুরু বিশেষ ভাবে জানিয়ে দেন ও বলে দেন।

গুরুবাণীর মাধ্যমে গুরুবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়

গুরুবাণীর মাধ্যমে মুক্তির উপায়রূপে গুরু নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন। গুরুবাণীর মধ্যে তিনি নিজেই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে জিজ্ঞাসু সাধকের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং তার হৃদয়ে সাধকের আগ্রহ ব্যাকুলতা চেষ্টা ও সামর্থ্যের যোগ্যতা অনুসারে আপনার শুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করেন ক্রমধারায়।

জীব তার মুক্তস্বরূপ প্রাপ্ত হয় গুরুকৃপায়

গুরুভাবের স্মরণ, মনন, চিন্তন এবং তদনুরূপ অন্তরে-বাইরে ব্যবহারের দ্বারা মুক্তিকামী আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু সাধক জীবগুরুর মহিমা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় গুরুর কৃপায়। গুরুগত মনে, গুরুনির্দিষ্ট কর্ম সাধন ও পালন করে গুরুভক্তি এবং গুরুপূজা দ্বারা, গুরুর আশ্রয়ে থেকে, গুরুপরায়ণ হয়ে, গুরুর সঙ্গে

১। জীব—বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আত্মচৈতন্যই হল জীব

নিত্যযুক্ত হয়ে সে গুরুময় হয়ে যায়; অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে দিব্য পরমাত্মস্বরূপে মিশে যায়। এই ভাবেই জীব তার মুক্তস্বরূপ প্রাপ্ত হয় গুরুকৃপায়।

সদ্‌গুরুকৃপা লাভের জন্য বিশেষ নির্দেশ

সদ্‌গুরুর কৃপা লাভের জন্য বিশেষ নির্দেশ হল—গুরুর আশ্রয়ে থেকে গুরুমনা হও, গুরুভক্ত হও, গুরুকে পূজা, আরাধনা ও উপাসনা কর। গুরুকে প্রণাম কর এবং গুরুপরায়ণ হয়ে গুরুর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাক। তার ফলে হৃদয়ে আত্মগুরুর স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অজ্ঞানমোহ বিদূরিত হয়ে যায়। গুরু হলেন আত্মসূর্য। গুরুপ্রসাদে এই আত্মসূর্যের উদয় হয়। গুরুপ্রসাদই হল সদ্‌গুরুবাণী শ্রবণ, সেবন ও সদ্‌গুরুভাবন।

[২৬।৬।৮০]

দীক্ষার তাৎপর্য

[জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর স্বানুভূতির ভাষায় বলেছিলেন—]

যা মানুষের সত্য, মুক্ত, দিব্যস্বরূপকে জানিয়ে দেয়, অবগত করিয়ে দেয় এবং তার অন্তরায় অজ্ঞান মোহ আসক্তি পাশবন্ধন বিদূরিত করে দেয়, অপসারিত করে দেয় এবং সমূলে বিনষ্ট করে দেয় তা-ই হল দীক্ষার আসল তাৎপর্য।

যার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও অনাত্মার পাশবন্ধন অপসারিত হয় তা-ই দীক্ষা। যে জ্ঞানের সাহায্যে অনাত্মজ্ঞান সরে যায়, আত্মজ্ঞান লাভ হয়, মোহবন্ধন কেটে যায়, অজ্ঞানের প্রভাব বিনষ্ট হয় এবং মুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় তা-ই হল দীক্ষা।

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, অজ্ঞান ও মোহ মুক্ত হয়েছেন, তিনি অপরের অজ্ঞান, মোহ বিনষ্ট করে আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করেন। তাঁর অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান দানই হল দীক্ষা।

একটি প্রদীপ যেমন সহস্র প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে দেয় আপন জ্যোতির দ্বারা সেইরূপ আত্মজ্ঞানী স্বীয় আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্যান্য মোহগ্রস্ত অজ্ঞানীদের হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের দীপ জ্বেলে দেন। এই আত্মজ্ঞান দানই হল দীক্ষা।

ঈশ্বর-আত্মা অভিন্ন, ব্রহ্ম-আত্মা অভিন্ন। এই জ্ঞান যাঁর হয়েছে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, আত্মজ্ঞ। তাঁর বাণীই হল ব্রহ্মবাণী, আত্মবাণী, বিজ্ঞাবাণী, স্বজ্ঞাবাণী, সত্যবাণী। তা অমোঘ। সত্যবাণী অসত্যের প্রতিষেধক। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ প্রজ্ঞাবাণী বা সত্যবাণী দ্বারা ব্রহ্মভাব, সত্যভাব ও অমৃত ভাবের সঞ্চার করেন। তাঁর এই সত্যসঞ্চার অপরের মধ্যে দীক্ষারূপে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করে।

জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মের বীজকে বা সংস্কারকে ভস্মীভূত করে দেয়। যিনি অন্তরে সত্যাগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যিনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মজাত চিন্তা, বাক্ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদির সর্ববিধ মল সংস্কার বিধৌত করেন, তিনিই জ্ঞানীগুরু, তিনিই মুক্তিদাতা।

আত্মজ্ঞানীর কোনও বর্ণ, আশ্রম, জাতি, মত ও পথের ধর্ম ও দলীয় মতামত থাকে না। তিনি এ সবের উর্ধ্বে। তাঁর আচরণই হল শুদ্ধ আচরণ। তাঁর দ্বারা অপরের অজ্ঞানসংস্কার বিনষ্ট হয়। এও দীক্ষা পদবাচ্য। কোনও প্রকার কর্মানুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা, অজ্ঞানের মল বা সংস্কার বিনষ্ট হয় না। সুতরাং ক্রিয়া-কলাপের ফলে কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে না। মুক্তি আসে জ্ঞানের দ্বারা। অজ্ঞানে হয় বন্ধন, জ্ঞানে হয় মুক্তি। স্বার্থ ও কামনাপূরণ হল বন্ধন। নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ও নির্বাসনা হল মুক্তি। অনাত্মার প্রতি আসক্তি, মোহ হল অজ্ঞানবন্ধন এবং ঈশ্বর-আত্মপ্রীতি ও তৎপ্রতি আসক্তি হল মুক্তিশান্তি।

মোহবন্ধন অপসারণের চেষ্টা ও মুক্তির প্রস্তুতিই হল শিক্ষা। সমগ্র শিক্ষাই অবিদ্যাশক্তির অন্তর্ভুক্ত। মুক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় যার দ্বারা তা-ই বিদ্যাশক্তি। শিক্ষা হয় জাগতিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দীক্ষা হয় অধ্যাত্মজ্ঞানের সৌকার্যার্থে। [২৮।৮।৮০]

আত্মবোধের অভিনব বিজ্ঞান

যে নিজেকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ভাবে সে যথার্থই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হয়। সে-ই যথার্থ ভাগ্যবান। সে-ই কৃতকৃত্য হয়। সোজা কথায়, মন মানে হল 'আত্মার ভাব'। আর 'আমি' হল শুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মা। 'আমার ভাব' হল সংসার। 'আমি বোধ' হল শিববোধরূপী আত্মা। 'আমার' সঙ্গে 'আমি'-কে যুক্ত করে ভাবা ও জানাই হল অজ্ঞান, মায়া। অর্থাৎ 'আমার আমি' বা 'মনের আমি' হল অজ্ঞান। আবার 'আমার ভাব' বা মনের থেকে আমিকে অর্থাৎ 'আমাকে' ভিন্নরূপে ভাবা ও জানাই হল শুদ্ধ জ্ঞান। এ-ই হল জ্ঞানীর সাধন। ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁকেই বলা হয় যিনি 'আমার আমি' বোধ শূন্য। যাঁর মন নেই, তাঁর আমারও নেই, সংসারও নেই—তিনি মুক্ত।

এই মন কিন্তু আত্মাকেও জানে না, ঈশ্বরকেও জানে না। এর সবটাই কিন্তু কল্পনা। আত্মার কাছে ঈশ্বর কোনও কল্পনা নয়। আত্মা জানে আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন, দুই হতেই পারে না।

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন—অভিন্ন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—অভিন্ন তো বটেই, একই বস্তু। অভিন্ন অর্থে নিত্য এক-কেই বোঝায়। তা ভাল করে অনুধাবন করা দরকার। কেবল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে সত্যবোধ হয় না। শব্দের অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব ও সত্য তাকে বলে লক্ষ্যার্থ, তা জানা যায় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে। অন্য ভাবে লক্ষ্যার্থ সিদ্ধ হয় না। মন যে কথার মাধ্যমে কাজ হাসিল করে, সেই কথা ও সেই মন বাচ্যার্থ নিয়ে থাকে। তার কাছে লক্ষ্যার্থ অনুভবগম্য হয় না। আবার যে মন সংযম সাধনপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে গুরুবাক্য অনুশীলন করে এবং তার দ্বারা সত্যের সন্ধান করে, সে-ই অন্তরের ভাবশুদ্ধি লাভে সমর্থ হয়। ভাবশুদ্ধি মানে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের শুদ্ধি। তাকেই অন্তঃশুদ্ধি বলে। এই অন্তঃশুদ্ধি হলে, শুদ্ধ ভাবের লক্ষ্যার্থ অনুভূত হলেই সদ্‌গুরুবাণী অন্তরে সক্রিয় হয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তা আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। তখন সে বুঝতে পারে এই ঘরের আকাশ আর ঐ ঘরের আকাশ পৃথক নয়। দেওয়াল দিয়েও তাকে আলাদা করা যায় না।

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন—আমার আত্মা তো পরমব্রহ্ম, তাহলে সে তো অভিন্নই আছে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—আত্মা শব্দের অর্থ হল অ+তম=অত্মন বা আত্মা যা তম নয়, জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ তা-ই আত্মা। 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ হল যেখানে চৈতন্যসত্তা গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আত্মা কিন্তু গুণাতীত। ঈশ্বর হলন ঐশ্বর্য যুক্ত অর্থাৎ attributeful, আত্মা হল attributeless। আত্মাই বরং পরমব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অদ্বয়বোধে প্রকাশ করে চলেছে। সেই জন্য ঈশ্বরেরও একটা আত্মা দরকার হয়। আত্মাশূন্য ঈশ্বর হতে পারে না। আত্মার ঈশ্বরত্ব দরকার হয় না এবং ঈশ্বরের আত্মত্ব হারায় না।

'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) ঋষিদের সত্যানুভূতির স্তরের কথা বলছে। 'এ' পুরাণের স্তরের কথা বলছে না।

জনৈক ভক্ত—আমরা নিজেরা খালি সংসার-মায়ার কথাই বুঝি। এই যে আপনি বললেন রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি—এতেই তো আমরা সবাই ভুলে আছি।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—সেই জন্যই মনের ঊর্ধ্বে আত্মবোধের কথা বলা হল। সেখানে আমির আসল রূপ খুঁজে পাবে। সেই 'আমি' হল শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আত্মার আমি। এই জন্য গুরু 'সোঽহং' মন্ত্র দীক্ষা দেন। নিরন্তর 'সোঽহং' বলতে শিক্ষা দেন গুরু। এবার দেখ গুরু কেন বলেন, 'তুমি শিবোহম্ বল'। কেন

বলেন, 'তুমি ব্রহ্মাস্মি বল'। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং পরমব্রহ্ম সোঽহং' কেন বলতে বলেন? তার কারণ অখণ্ডের মধ্যে তুমি নিজেকে নিজেই কল্পনা করে খণ্ড করছ। এ ভাবে তুমি অপরাধ করছ। আবার তুমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছ। এ ভাবে অপরাধ করে আবার এই ভাবে অপরাধের শোধন হয় না। এরূপ অপরাধের শোধনটাও কল্পনা।

জনৈক ভক্ত—অপরাধ তো নিত্য করেই যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—তাহলে তোমরা সেই অপরাধী মন নিয়ে আবার বিচার করবার চেষ্টা করছ কেন?

জনৈক ভক্ত—বিচার আগে দরকার। বুঝতে পারলে তো অপরাধ আর করব না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—এই জন্যই যাঁরা অনুভবসিদ্ধ, তাঁরা সত্যকে সবার সামনে ধরে দেন। তাঁরা কখনও বলেন না যে তুমি আলাদা, তোমার ইষ্ট আলাদা। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথা বলছি তোমাদের বুঝবার জন্য। কেননা, আমি বুঝতে চাই না, আর বোঝাতেও চাই না। তবু আমি ইঙ্গিত করছি। গাঢ় ঘুমে যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তখন সত্যিকারের কোনও দেবতা, গুরু, ইষ্ট ও ঈশ্বরের আলাদা কোনও অস্তিত্ব থাকে কী? সেখানে থাকে only One existence–that is your Self। যখন ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন বল, first class ঘুমিয়েছিলাম, কোনও কিছু জানতে পারিনি। এটা হল সাক্ষিচৈতন্য আত্মার কথা। গাঢ় ঘুম বা সুষুপ্তি অবস্থা হল তিন গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এই অবস্থার লক্ষণ হল জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার বোধের অভাব, দৃশ্যাদি বোধের অভাববোধ, তার সঙ্গে বিঘ্নরহিত বোধের সুখানুভূতি। এটা কী ঈশ্বর বলছে, না তুমি বলছ? এই বলাটাই বা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে? কারণ সুষুপ্তির তুমি আর জাগ্রত অবস্থার তুমি এক হলেও দুই অবস্থার জ্ঞাতা মন ভিন্ন। আবার উভয়ের মধ্যে স্বপ্নের আর এক অবস্থা আছে।

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার জ্ঞাতা হল স্বভাব মন। আর আত্মা হল তিন অবস্থার সাক্ষী ও দ্রষ্টা। তা যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্‌গুরুসঙ্গ ও তাঁর মুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে মনের ভ্রান্তি কাটে না, অজ্ঞান দূর হয় না ও আত্মজ্ঞানও জাগে না। হৃদয়ে সবারই আত্মা আছে কিন্তু আত্মবোধের প্রতিফলন আভাসচৈতন্য মনের দ্বারা ঢাকা আছে। মন ও মায়ার এই পর্দা বা মলাবরণ যতদিন থাকে ততদিন হল সংসার দশা। এই আবরণ ভেদ বা ছিন্ন করতে হয় কেবলমাত্র গুরুবাণীর নিত্য অনুশীলন দ্বারা। এই গুরুবাণী হল 'আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা স্বয়ং, আমি দেহ-ইন্দ্রিয়-বাক্য-মনের অতীত'। আমার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই, প্রতিপক্ষও নেই। আমি অভোক্তা, অকর্তা, অজ্ঞাতা—কেবল সাক্ষিচেতা।

Guru is Atman personified. দ্বিতীয় কোনও গুরুকে মানতে 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) রাজি নয়। মানুষের মধ্যে যদি সেই আত্মা revealed হয়ে থাকে, he is no more a man। He is that Atman personified. সে কখনও মানুষকে বিভ্রান্ত করেনি, করবেও না। He will unfold the truth of the Divine Self। [১।১।৮৪]

গুরুবাণী সর্বদা কালের প্রভাবমুক্ত

আমি ধর্ম ছেড়েছি ধর্মসাধনা শেষ করে, কর্ম ছেড়েছি কর্মসাধনা শেষ করে, সিদ্ধি ছেড়েছি পরাসিদ্ধি লাভ করে। কেননা ও সবের আমার প্রয়োজন নেই। তবে এই যে কথা তোমরা শুনছ—এই কথা হল সেই অনন্তের বাণী যা কোনও দিন শেষ হবে না। এই হল অনন্ত বেদ। 'এই শরীর' (নিজের শরীরের দিকে নির্দেশ করে) নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই বেদ ভিতর থেকে উদ্গীত হতে থাকবে। এখানে কোনও দেবতা বা মতপথের বাধা বা গণ্ডী নেই। আছে শুধু স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, অখণ্ডতা। সেই অখণ্ড কিন্তু সব সময়ে পূর্ণ ও প্রশান্ত। তার অভাব নেই, কামনা বা চাহিদাও নেই, প্রয়োজনও নেই। [১৩।২।৮৬]

সদ্‌গুরুর কৃপাতেই দিব্যজীবন লাভ সম্ভব হয়

দিব্যজীবন লাভের জন্য বারবার আমরা জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের স্বকৃত ও ত্রুটিপূর্ণ আচরণের কারণবশত প্রতিবারই আমরা ফিরে যাই মৃত্যুলোকে। জীবনকে ধন্য ও বিকারমুক্ত করতে হলে ঈশ্বরের নিকট পূর্ণ সমর্পণ করে শরণাগত হতে হবে। কী করে? সাধু, গুরু ও মহাজনদের আশ্রয় নিয়ে তাঁদের নির্দেশে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের সত্য মূল্য ও যথার্থ আদর্শ সম্বন্ধে সাধুগণই অবহিত আছেন। সেই আদর্শ প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। বর্তমানের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নূতন পাঠক্রমে শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। এই শিক্ষার অন্তর্গত হল সমতা, একতা ও পূর্ণতার বিজ্ঞান। এখানে সর্বমত সহিষ্ণু হতে হবে। সবার সঙ্গে আমাদের যে নিত্য, পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, তা যে বোধ দিয়ে জানা যায় সেই বোধের অনুশীলন করতে হবে। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, সাধু, গুরুর সঙ্গ করে, সেবা করে ও তাঁদের নির্দেশ মেনে চলে তাঁদের কাছ থেকে এই বিজ্ঞান লাভ করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। খুশি মতো ঈশ্বরের সেবা করলে বা ধর্মচর্চা করলে স্বার্থসিদ্ধিরই বিজ্ঞান থেকে যাবে। স্বার্থের উর্ধ্বে পরমার্থে পৌঁছতে হলে, এই হল ভগবানের নির্দেশ। তিনি যুগে যুগে মানুষের মধ্যে আসেন, কখনও ছদ্মবেশে, কখনও বা প্রকটভাবে। তিনি এই এক-এর বিজ্ঞান মানুষকে ধরিয়ে দিয়ে যান। [২৭।৮।৮৬]

দীক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

দীক্ষা দেবার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেন—দীক্ষা দিতে হলে একধাপ নিচে নেমে আসতে হয়, কিন্তু ‘এর’ (নিজেকে নির্দেশ করে) Realization-এ কোনও ধাপ নেই। কেউ নিচে নেই, কেউ উপরেও নেই—সব-ই Self। ‘এ’ কাউকে নিচে দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই দীক্ষা দেবার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমি ‘নিত্যাদ্বৈত’।

কাঁকুলিয়াতে যা হয়েছে সেই chapter closed। নদী যখন এসে সাগরে মিশে যায় তখন নদীর কোনও নিজস্ব রূপ, নাম, ভাব থাকে না। তখন সবই সাগর। [৭।১২।৮৭]

নবম অধ্যায়

জ্ঞানভূমিতে উত্তরণের অভিনব বিজ্ঞান

বাড়ি তৈরি করতে হলে যেমন প্রথমে যে জায়গায় বাড়ি হবে সে জায়গাটা পরিষ্কার করে তারপর মাটি খুঁড়ে শক্ত ভিত তৈরি করে তার উপরে দেওয়াল গেঁথে, তার উপরে ছাদ তৈরি হয় এবং সবশেষে হয় finishing, সে রকম অজ্ঞানের স্তর থেকে বোধস্বরূপের স্তরে যেতে একটু একটু করে তৈরি করতে হয় নিজেকে। সেই জন্যই চাই সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থেকে তাঁর মুখ থেকে তত্ত্বকথা শ্রবণ। অবশ্য 'না-করে আচরণ হয় না তত্ত্বকথার জাগরণ'। দীর্ঘদিন ধরে সদ্‌গুরুর কাছে শ্রবণের ফলে memory-তে কিছু কিছু কথা গাঁথা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার থেকে কিছু কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। একে বলে remembrance। অবশ্যই remembrance এবং awakening এক কথা নয়। Awakening-এর জন্য চাই গুরুকৃপা। চাবি আছে গুরুর হাতে—তিনি চাবি না-ঘোরালে যে কিছুই পাওয়া যাবে না। অপরের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, অপরের দোষদর্শন করে realizer হওয়া যায় না। এটা একেবারেই antithesis to Self-Knowledge। এর জন্য চাই surrender—complete surrender to the Absolute। এখানে কোনও condition থাকতে পারে না। বুদ্ধির দোষেই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর conditioned হয়ে যান। তাই বলা হয়, জোর করে ঈশ্বর-আত্মার বিষয় চর্চা করা যায় না। জোর করে যোগ, ধ্যান ইত্যাদি করলে নানা রকম trouble দেখা দেয়। এই সব সমস্যার সমাধান ডাক্তারী বিদ্যার কাজ নয়। তাই সাধুসন্তের দ্বারস্থ হতে হয়। তাঁরাও অপাত্রে করুণা প্রদর্শন করে দোষের ভাগী হতে চান না। আসলে দোষদৃষ্টি থাকলে সদ্‌গুরুও তাদের তৈরি করতে পারেন না। ধর্মক্ষেত্রে এ ভাবেই চলে আসে politics। যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা না-করে আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা ও চেষ্টা অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন না-করেই গুরুবিদ্যা অপহরণ করে, তার উপর অত্যাচার নিপীড়ন করে তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গা দখলের হীন প্রচেষ্টা যুগে যুগে বিশেষ ভাবে হয়ে চলেছে। এমন কী বিশ্বামিত্র মুনিও বশিষ্ঠদেবকে সরিয়ে তাঁর পদলাভের কী হীন চক্রান্তই না করেছিলেন—তার মূলে ছিল দুর্দমনীয় লোভ ও প্রভুত্ব লাভের তীব্র ইচ্ছা। অবশ্য অতি মহান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের অশেষ কৃপায় তাঁরও পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

সাদা কাপড়ে দাগ লাগলে তা যদি সাধারণ সাবান-সোডাতে না-ওঠে তবে যার অভিজ্ঞতা আছে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই সে দাগ ওঠাতে হয়। তেমনি শুদ্ধ জ্ঞানে spot পড়লে তা সরিয়ে দিতে হয় সদ্‌গুরুর সাহায্যে।

সদ্‌গুরু সবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। দস্যু রত্নাকরের মধ্যে সম্ভাবনা আছে দেখেই তাকে উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা ও নারদ এগিয়ে এসেছিলেন। আসল কথাই হল আত্মজ্ঞান লাভ বা Right Knowledge পাওয়া। সাধন পথে চলতে যার যে রকম প্রয়োজন গুরু তাকে সে রকম নির্দেশ দেন। আত্মজ্ঞান লাভ না-করেই অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ না-হয়েই আজকাল অনেকেই গুরু সেজে বসছেন। তাতে কিন্তু অনেক বিপদ। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে—একবার এক ভদ্রলোক সারাজীবন দুষ্কর্ম করে তার পাপ স্খলনের আশায় এক মহাত্মার কাছে এল। সেই মহাত্মা সাধু সেজে ব্যবসা করছিল। তার তখনও আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি। কিন্তু নানা

উপদেশ সহকারে আগন্তুকদের আত্মজ্ঞানের কথা বোঝাচ্ছিল। এমন সময় এক পাগল সেখানে এসে বেশধারী সাধুকে বলতে লাগল—ভিতরের জ্বালা সারাবার আর কোনও ওষুধ পাওনি, গুরুগিরি করছ? তোমার গুরু কি তোমাকে কিছুই শেখায়নি? তোমার যে আত্মজ্ঞান হয়নি, তুমি যে শিষ্যের অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই জান না, এ সব জানা না-থাকলে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা যায় না—তাও জান না? কথাগুলো শুনে বেশধারীর শিষ্যরা তো তাড়াতাড়ি গুরুকে তোয়াজ করে বলতে লাগল—ও সব পাগলের কথায় কান দেবেন না, আপনি বলুন। বেশধারীর কিন্তু ততক্ষণে টনক নড়েছে। সে তৎক্ষণাৎ শিষ্যদের বিদায় দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে গুরুর সন্ধানে পাড়ি দিল। দীর্ঘ ২১ বৎসর মৌন হয়ে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে অবশেষে একদিন সে তার গুরুর দর্শন পেল। গুরু তাকে নির্দেশ দিলেন, কোনও একটি বিশেষ স্থানে বসে আত্মবিচার শুরু করতে। সেখান থেকে ওঠা চলবে না। তার আহারের ব্যবস্থা গুরুই করবেন। গুরু সাতদিনে একদিন পরিমিত পরিমাণে তার আহার পাঠাতে লাগলেন। সে আহারে দেহ বাঁচে কিন্তু পায়খানা প্রস্রাব হয় না। এ ভাবে চলতে চলতে সে এক সময় শূন্য অশূন্যের ঊর্ধ্বে চলে গেল। সেখানে মন পৌঁছায় না। গুরুরও বাস সেখানে। সেখানেই তাদের মিলন হল। তার আত্মজ্ঞান পূর্ণ হল।

গুরুকৃপাই হল আত্মজ্ঞানের আসল কথা। তবে এই কৃপা পেয়েও অনেকে তা অবহেলায় হারায়। মাতা-পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যেমন crime তেমনি গুরুর প্রতি অকৃতজ্ঞতাও crime। ভোগের মধ্যে লিপ্ত থেকে, কামনা-বাসনা তাড়িত হয়ে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় না।

গুরুবাণী আত্মবাণী—মুক্তিশান্তি লাভের বিজ্ঞান

সদ্‌গুরু হলেন বাক্‌ব্রহ্ম। তিনিই আবার নামব্রহ্ম, ভাবব্রহ্ম, বোধব্রহ্ম। গুরু তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে জিজ্ঞাসুর জ্ঞানচক্ষু বা বোধের দ্বার খুলে না-দিলে কোনও দিনই বোধস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে না। জগৎসংসারে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যেটুকু জানে তা চিদাভাস মাত্র। ছায়াকে দিয়ে তো কায়াকে ধরা যাবে না। ভাবের permutation and combination-এ মায়াকেও মন সেজে খেলা করতে হচ্ছে। মায়ার খেলা তো চিৎস্বরূপের কাছ থেকে ধার করা চিদাভাসের খেলা—তাতো নিত্যসত্য হতে পারে না। তাইতো জগৎলীলায় জগৎ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সবই সবিকারী। Individual থেকে universal-এ আসা হল দ্বৈত তত্ত্ব। আর universal থেকে Transcendental-এ যাওয়া হল নির্গুণ অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা ও আত্মজ্ঞান লাভ। তার জন্যই চাই সদ্‌গুরু (আত্মজ্ঞপুরুষ) কৃপা। তাই গুরুর কথা না-শুনে, তাঁর বারণ না-মেনে সাধন পথে এক পা-ও এগোনো যায় না। জোর করে অহংকারে এগোতে গেলে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে হয়। তার ফলে নিজের সঞ্চিত পুঁজিও শেষ হয়ে যায়। মানুষ অনেক সময় তাও বোঝে না। এটাই সংসারের ধর্ম। সংসারজীবনে মানুষকে যে পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয় বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে জীবনভর, তার সিকিভাগ পরিশ্রমও লাগে না আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। তা সর্বকালে সবার জন্যই এক অভিনব বারতা, পরম আশার কথা। এই প্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে হিতোপদেশের 'পুণর্মুষিকভব' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। তা হল—

একবার এক মুনি গাছের তলায় বসে ধ্যান করছিলেন। সে সময় কাকের মুখ থেকে একটি ইঁদুরছানা তার কোলের উপর এসে পড়ে। মুনি যত্নসহকারে ইঁদুরছানাটির প্রাণ বাঁচিয়ে তাকে আশ্রমেই পালন করতে থাকেন। ইঁদুরটি একটু বড় হলে সেই আশ্রমে এক বিড়ালের আবির্ভাব হয়। বিড়ালের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য মুনি ইঁদুরটিকে বিড়াল করে দিলেন। আশ্রমে বিড়াল দেখে একটি কুকুর তাকে তাড়া করল। মুনি কুকুরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বিড়ালটিকে কুকুর করে দিলেন। তারপর একদিন কুকুরটিকে একটি নেকড়ে তাড়া

করল। এবার নেকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি কুকুরটিকে নেকড়ে করে দিলেন। নেকড়ে আশ্রমেই ঘোরে। সবাই বলে ইঁদুর কেমন নেকড়ে হয়ে গেল মুনির দয়ায়। এ সব কথা আবার নেকড়েরূপী ইঁদুরের ভাল লাগে না। মুনি যে তার লোকনিন্দার কারণ এই ভেবে একদিন সে মুনিকেই খাবে বলে আক্রমণ করে বসে। মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আবার ইঁদুর করে দিলেন।

মুনির কৃপায় সামান্য এক ইঁদুর কীরূপে বাঘের রূপ প্রাপ্ত হল এবং অকৃতজ্ঞতা দোষে পুনরায় ইঁদুরে পরিণত হল—এটাই গল্পটির বিষয়বস্তু। প্রতিদানে কৃতজ্ঞতাবোধ না-থাকলে কৃপার ফল ধরে রাখা যায় না। জীবনযুদ্ধে মহতের মাধ্যমে ঈশ্বরের কৃপা জীবের কাছে আসে। তা ধরে রাখার জন্য জীবের কৃতজ্ঞতাবোধ সম্যক্‌রূপে জাগ্রত থাকা দরকার নতুবা কৃপার যথার্থ ফলের অধিকারী হওয়া যায় না। সেই জন্য জীবনযুদ্ধেও পূর্ণ ভাবে জয়ী হওয়া যায় না। অর্থাৎ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান, অমৃতত্ব লাভ, শান্তিলাভ হয় না। ঈশ্বরাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য ঈশ্বরের কৃপা, করুণা ও স্বকীয় প্রচেষ্টা উভয়ই সমান ভাবে দরকার। স্বকীয় প্রচেষ্টা বা পুরুষকার ছাড়া ঈশ্বরকৃপা লাভ হয় না। আবার ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া পুরুষকারও পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হতে পারে না। ঈশ্বর গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে তার সমাধান সুষ্ঠু ভাবে প্রদান করেন। সদ্‌গুরুর মহিমার তুলনা নেই। জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য এবং সংসাররূপ মোহ অন্ধকারে নিমগ্ন জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রয়োজন আপামর সবার জন্যই। [২৭।৫।৯২]

আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে অজ্ঞানজাত জগৎকল্পনা আত্মভ্রমের কারণ

মানুষের জগৎ হল কল্পিত কল্পনার জগৎ। এই কল্পিত কল্পনার জগতে বাস করে, চিত্তের মল অপসারণ না-করে গতানুগতিক ধর্মানুশীলনের পথে চললে কোনও দিনই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। Knowledge of Oneness বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চাই মনের তীব্র ব্যাকুলতা বা আগ্রহ। এ ছাড়া অন্য কোনও qualification না-থাকলেও কোনও প্রত্যবায় হয় না।। পুঁথি-পত্র পাঠ করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, মন্দির, মসজিদ, দরগায় ঘুরে, তীর্থ পর্যটন করে মনের কিছু শুভ্‌সংস্কার বাড়ে সত্য কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরুর কৃপা ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। বর্তমানে মানুষ মুক্তির আশায় অনেক জায়গায় যায়, অনেক তত্ত্বকথা শোনে, অনেক শ্লোক মুখস্থ করে—কিন্তু তাতে তো তাদের চিত্তের মল শোধন হয় না। অন্তরের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয় না। অন্তরের চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরুর বাণীর সঠিক আচরণেই জাগ্রত হয়—তাঁর কথা চুরি করেও হবে না আবার তাঁকে বাদ দিয়েও হবে না। তাঁর কৃপাই সংসারের জীবের একমাত্র পাথেয়।

মানুষ deceived হচ্ছে by himself and by others। ধর্মজগতে এমন অনেক গুরু আছেন যাঁরা নিজেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করেননি কিন্তু আত্মজ্ঞানের কথা বলে চলেছেন—তারা অন্যদের প্রতারণা করছেন। গতানুগতিক পথে চলে আত্মজ্ঞানের আশা নেই। মানুষের স্বকল্পিত বন্ধনমুক্তির আনন্দ একমাত্র আত্মজ্ঞ গুরুই দিতে পারেন তাদেরই যারা তীব্র ব্যাকুলতা সহকারে মুক্তি ও জ্ঞানলাভেচ্ছু হয়ে পূর্ণ ভাবে তাঁর শরণাগত হয়। এ রকম আত্মজ্ঞগুরুরা সংখ্যায় খুবই কম। বাইরে থেকে দেখে এঁদের চেনাই যায় না। এঁদের বাহ্যিক লক্ষণ বিশেষ কিছুই নেই আর সব সাধারণ মানুষেরই মতো। কিন্তু এঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। যথার্থ অনুভবসিদ্ধ পুরুষ সহজে ধরা দেন না। এঁদের জীবন ও আচরণ হয় most humble and most simple। তাঁদের submissive nature কাউকে বুঝতেই দেয় না—তাঁরা কে? তাঁরা কী? সাধারণ মানুষ এঁদের স্বভাবসুলভ সহজভাব ও সরলতার সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হলে তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে তা ব্যবহার করে প্রতারণা করে। তাইতো ধর্মক্ষেত্রই হল সবচেয়ে মতলববাজদের, প্রতারকদের আত্মগোপন করার ও আশ্রয় নেবার অন্যতম স্থান। ধর্ম নিয়েই হয় সবচেয়ে বেশি politics, নোংরামি ও ধোঁকাবাজি।

এই পৃথিবীতে মানুষ চলে ধার করা জ্যোতি নিয়ে। এই জগতে এসে মা, বাবা, ভাই, বোনেদের ফাঁদে পড়ে সবাই। কখনও কেউ ভাবে না সে এসেছে একাই, একাই যেতে হবে তাকে—কেউ তার সঙ্গে যাবে না। তাই সদ্‌গুরু সব সময় এক-এতে থাকেন, এক বলেন, এক জানেন, এক দেখেন, এক-এতেই সিদ্ধ তিনি।

সদ্‌গুরুর বাণীই হল জীবন্মুক্তির কবচ ও চাবিকাঠি

জাগতিক নীতি জগৎ কারাগারে বন্দী করে রাখে—এ ঘর থেকে ও ঘরে। কিন্তু ঘর ভেঙে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে যেতে পারে না। সদ্‌গুরু যিনি স্বয়ং মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত গগনে বিচরণ করেন তিনিই একমাত্র পারেন তাঁর অনুগত ভক্তকে মুক্ত গগনে নিয়ে যেতে। সদ্‌গুরু সর্বস্থানে সর্বকালে পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। সদ্‌গুরুর হাত ধরেই 'আপনারে ভুলে আপনার মাঝে মিশে যাবে'। প্রথম আপনি হল ব্যষ্টি আমি আর দ্বিতীয় আপনি হল সমষ্টি আমি। মানুষ এই জগতে নানা উপাধি নিয়ে অর্থাৎ কারও মাতা, কারও কন্যা, কারও পুত্র, কারও ভ্রাতা, কারও বধূ অর্থাৎ এরূপ আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত ভাব উপাধি নিয়ে বাস করছে। এই উপাধিই হল বন্ধন। উপাধিমুক্ত হতে হবে আর সেই সঙ্গে চলবে গুরুবাণীর সঠিক অনুসরণ—তাহলে আত্মজ্ঞান হবেই। তখন বলতে পারবে—

নহি আমি জীব কভু নহি আমি জীবের
নহি জীবত্ব আমি নিত্য সত্য সদাশিবের।

আত্মাই স্বয়ং সদ্‌গুরু এবং আত্মজ্ঞানই গুরুজ্ঞান ও গুরুবাণী

শিব হলেন নিত্য সত্য বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর নির্বিকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মা সনাতন। আপনস্বরূপই হল ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপকে বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। গুরু হলেন ব্রহ্মস্বরূপ। তাই তিনি ব্রহ্ম-আত্মারই কথা বলেন। নিজেকে ব্রহ্ম-আত্মা ছাড়া আর কিছুই ভেবো না। মানতে না-পারলেও এমনি খেলাচ্ছলে ভাবনা কর—এই ভাবনাই একদিন দৃঢ় হয়ে যাবে। জীবনে যত দুঃখ-কষ্টই আসুক সবই জেনো ব্রহ্মের বক্ষে অজ্ঞানের বৃত্তি মাত্র—আসবে আবার চলেও যাবে। এ ভাবে জীবনকে নিতে নিতে একদিন গুরুর কৃপায় তাঁর সাথে অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মার সাথে স্বানুভবে মিলে মিশে যাবে। গুরু অযাচিত করুণা দিয়েও কৃপাধন্য করেন অথবা জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েও তাকে কৃপা করেন। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গুরু সদা সর্বদা উৎসুক থাকেন। আবার জিজ্ঞাসু না-হয়েও অনেকে তাঁর কথা শুনবার সুযোগও পায়। তবে এ সুযোগ হেলায় হারানো পাপ। গুরুবাণী অবজ্ঞা করার মতো পাপ আর নেই। গুরুকে অসম্মান করার ফল যে কী ভীষণ হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'রামচরিতমানস'-এর কাকভুষণ্ডীর আখ্যানে। যদিও 'রামচরিতমানস' 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) পড়া নেই তবু যেটুকু আভাস পাওয়া গেছে তার থেকেই বলা হচ্ছে।

একবার এক ভক্ত শিবের মন্দিরে তার গুরুর উপস্থিতিতে গাত্রোত্থান করেনি। তাই দেখে শিব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না-করার জন্য তাকে অভিশাপ দিলেন যে তাকে পরবর্তী জন্মে এক নিকৃষ্ট জন্ম নিতে হবে। সে কাক হয়ে জন্মাবে। শিবের এই অভিশাপে ভক্তের জন্য গুরুর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি কাতর ভাবে শিবের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন—হে দেবাদিদেব, তুমি নগণ্য জীবের অজ্ঞানতার জন্য ওকে এত বড় দুঃখ দিও না। তোমার যদি অভিশাপ দিতেই হয় তুমি আমায় দাও, আমি মাথা পেতে নেবো। তুমি আমার ভক্তকে রেহাই দাও। এই কাতর প্রার্থনায় শিব প্রীত হলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমিই যথার্থ গুরু। গুরুকে এমনই হতে হয়। তবে আমার অভিশাপ তো ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না

তাই তুমি যখন বলছ তখন আমি ওকে আশীর্বাদ করছি এই কাকজন্মেই ওর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে ও ব্রহ্মবাদী হবে। সে ভাবেই কাকভুষণ্ডী কাকজন্ম লাভ করেও পরম আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিল।

গুরুবাণী স্বানুভবসিদ্ধ বলে সর্ববিধ মন্তব্য ও সমালোচনা নিরপেক্ষ

গুরুবাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ কর। মানুষের অন্তরেই আছে মানুষের দেবতা—অন্তরাত্মা। তিনিই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর পরম জানবে। এই অন্তরাত্মাকে বাদ দিয়ে মন্দিরে, মসজিদে মানুষেরই কল্পিত কল্পনাকে সত্যরূপ দেওয়ার বৃথা চেষ্টাই হল বর্তমানের লোক-দেখানো ধর্মসাধনা। পদে পদে ঘা খেয়েও মানুষের সে বিশ্বাস জাগে না। এই প্রকার ধর্মসাধনা যথার্থ ধর্মসাধনাই নয়। সবই ভোগবিলাস মাত্র। কল্পিত কল্পনার পিছনে ছুটে ছুটে দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম যে বৃথা যাচ্ছে। কে জানে পরের জন্মে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, কী হয়ে জন্মাবে! আর এই সুযোগ পাবে কি না বা কত জন্ম পরে পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্য সময় নষ্ট যেন না-হয় সেই বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকতে হয়। সারাদিন পরনিন্দা, পরচর্চা করে মিথ্যা মায়া-মোহের মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যায় একটু মালা জপ করলেই কি সাধনা হল? সাধনা কি এত সহজ ব্যাপার? তা ছাড়া এ যুগে সাধনা করার কোনও প্রয়োজনই নেই। আচরণকে শুদ্ধ করতে হবে। অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য, অপরকে দাবিয়ে রাখার জন্য, নিজের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বকে সবার উপরে স্থান দেবার জন্য যে বিরাট প্রচেষ্টা সদা সর্বদা সবাই করছে, তা ছাড়তেই হবে। এটাই হল সাধনা।

অবলম্বনসাপেক্ষ জীবনে অবলম্বনশূন্য হওয়াই হল আত্মবিজ্ঞানের তাৎপর্য

মনুষ্যজন্ম অন্ন দিয়ে শুরু ব্রহ্মতে শেষ। অন্ন চিন্তা ভয়ংকর। অন্ন চিন্তায় মগ্ন হলে আর ব্রহ্ম চিন্তা আসে না। অন্ন চিন্তায় থেকে ব্রহ্ম চিন্তা করা বিলাসিতা, এই সব বিলাসিতায় আখেরে কোনও কাজ হবে না। নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ চৈতন্যধারা সব সময় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যাঁর কথা তিনি কাউকে বলতে পারেন না এবং বাইরে থেকে তা কারও বোঝার ক্ষমতা নেই। সেই চৈতন্য স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বলে তাতে তত্ত্বত সকলেরই সমান অধিকার। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের এই দেহধারণ, তাঁর গতাগতি, প্রকাশমহিমা কেউ জানে না। জানতেও পারবে না। "It is a news to the world of Religion." এটা তাঁর অহংকারের কথা নয় তাঁর Realization-এর কথা। He has nothing to attain and nothing remains unattainable. I live in Me alone not in duality, space, time and causation. I am the Self. I live in the Self, by the Self, for the Self and in nothing else. কাজেই 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের) অনুগ্রহ যারা বিকৃত করবে তারা ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রী হত্যার পাপের ভাগী হবে। তিনি তাই গুরুবাণীর মাধ্যমে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন—দেবতারা এমনকী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রুষ্ট হলে গুরু রক্ষা করতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে। তা হল—একবার এক গরীব পরিবারকে এক অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরু অদ্বয়মন্ত্রে দীক্ষা দেন। দারিদ্র্যে তারা ক্লিষ্ট কিন্তু গুরুভক্তি ও গুরুপ্রীতি তাদের অটুট। তাদের একমাত্র সন্তানও খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ। একদিন শিশুটির মায়ের খুব অসুখ করল—কলেরা হয়েছে। সে তো বুঝতে পারছে তার মরণ কাল আসন্ন। সে তার স্বামীকে ডেকে বলল—ঘরে তো আর কিছু নেই একটু বার্লি জ্বাল দেওয়া আছে বাচ্চাটাকে দিয়ে তুমি খেও। স্বামী তো বার্লি দিতে গিয়ে অর্ধেকটা ফেলেই দিল। যতটা ছিল শিশুটিকে খাওয়াল। তারপর স্ত্রীর কাছে এসে বসল। স্ত্রী বলল—আমার অন্তিম কাল এসেছে আমি গুরুনাম জপ করছি, তুমিও কর। দু'জনেই নাম জপছে। তার জীবাত্মাকে নেবার জন্য দ্বারে যমদূত দাঁড়িয়ে আছে। সে ভিতরে আসতে পারছে না, কারণ সদ্‌গুরু তাঁর

ভক্তকে আগলিয়ে রেখেছে। এমন সময় স্ত্রী দেখল, গুরু তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে স্বামীকে বলল—আমি তো উঠতে পারছি না, তুমি গুরুকে আসন দাও বসতে। স্বামী কিন্তু গুরুকে দেখতে পাচ্ছে না—তাই ভাবল স্ত্রী বোধহয় রোগের ঘোরে ভুল বকছে। তখনও স্ত্রী বলে চলেছে—তুমি গুরুকে প্রণাম কর। গুরু যমদূতকে ভাগিয়ে দিলেন। যমদূত অনন্যোপায় হয়ে আরও পাঁচজন সহকর্মীকে নিয়ে এল জীবাধার থেকে জীবাত্মাকে নিয়ে যেতে—কারণ স্ত্রীলোকটির আয়ু শেষ হয়েছে। কিন্তু তারাও গুরুর কাছে ঘেঁষতে পারছে না, দূরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছে। গুরু তাদেরও তাড়িয়ে দিলেন। স্বামী তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।—তাই স্ত্রীর মুখের ঘটনার বিবরণও বিশ্বাস করতে পারছে না। বুঝতে পেরে স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, তুমি আমার হাত ধরে জপ কর। স্বামী তাই করতে করতে আবছা আবছা সবই দেখতে পেল। যমদূতরা দেখল ভাল বিপদ, তারা ছুটল যমরাজের কাছে। তারা যমরাজকে তাদের কর্তব্য পালনের অসুবিধার কথা বিস্তৃত ভাবে জানাল। সব শুনে যমরাজ ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে। উভয়ে গেলেন দেবাদিদেব শংকরের কাছে এবং স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করে শংকরের ধ্যান ভাঙালেন। তাঁকে জানালেন সৃষ্টির এই মহাবিপদের কথা অর্থাৎ মৃত্যুর নিয়ম লঙ্ঘনের কথা। শিব সব শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে চাইলেন। অগ্নি, বরুণ ও বৃহস্পতিও তাঁদের সঙ্গে এলেন। সবাইকে দেখে গুরু তাঁর গুরুকে স্মরণ করে সবাইকে বন্দনা করলেন। তখন বিষ্ণু গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন— কেন তিনি যমদূতদের এই স্ত্রীলোকটির আত্মাকে নিয়ে যেতে দিচ্ছেন না। উত্তরে গুরু জানালেন—এই স্ত্রীলোকটি সদ্‌গুরু আশ্রিতা—আমার ভক্তশিষ্যা। একে নিয়ে যাবার অনুমতি তো এরা গুরুরূপী আমার কাছে চায় নি। একথা শুনে শংকর রুষ্ট হলেন—কেন গুরুর অনুমতি ছাড়া তাঁর শিষ্যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? শংকর তখনই যমদূতদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা অনধিকার চর্চা করছ। যমরাজ তখন শিবকে শান্ত ও তুষ্ট করতে অনেক স্তবস্তুতি করলেন এবং স্বীকার করলেন তাঁর ভুল হয়েছে। কারণ গুরুবাদে আছে গুরুর আশ্রিতকে গুরুর অনুমতি ছাড়া নেওয়া যায় না। শিব তখন সেই গুরুকে অনুরোধ করলেন জগৎসংসার যেন ধ্বংস না-হয় তার জন্য তাঁকে সহযোগিতা করতে। গুরু বললেন তাঁর আশ্রিতা সন্তানকে ত্যাগ করলে তা গুরুবিরুদ্ধ ধর্ম হবে—গুরুর আচরণে দোষ হবে—তাতে সংসারের আরও অকল্যাণ হবে। গুরুর কথায় সকলেই প্রীত হলেন। এবং নিজেদের পুণ্যফল দ্বারা এই গুরুভক্তের জীবনের আয়ু বাড়িয়ে দিয়ে গুরুনিষ্ঠার ফলস্বরূপ সেই ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বচ্ছলতা ও দীর্ঘকাল সুষ্ঠু ভাবে ধর্মপথে জীবনযাপন করে অন্তে গুরুর সঙ্গে মিশে যাবার আশীর্বাদ করে সব দেবতারা অন্তর্ধান হলেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় কী ভাবে অসাধ্যসাধন হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে এই আখ্যানে।

গুরুমহিমার অভিনবত্ব

গুরু যেখানে রুখে দাঁড়ান সেখানে কারও কিছু বলার থাকে না। এরপরে দেবলোকে গিয়ে দেবলোক ও নরলোকের নূতন manifesto তৈরি হল। গুরুভক্ত, দেবভক্ত, আত্মযাজী, যোগসিদ্ধ, যোগসাধক, শরণাগত, আত্মানুসন্ধানরত, ইষ্টপ্রীতি ও গুরুপ্রীতি কার্যে রত—এরূপ বারোটি ক্ষেত্রে যমরাজ গুরুর আজ্ঞা ছাড়া গুরুর আশ্রিতকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

গুরুর দ্বিবিধ রূপ—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু দীক্ষা দেন না, দীক্ষাগুরু ঠিক মতো শিক্ষা দেন না। শিক্ষা ও দীক্ষা একই গুরুর কাছে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল হলেও আছে। শিক্ষাগুরু কী দীক্ষাগুরু কেউই সচ্চিদানন্দগুরু থেকে আলাদা নয়। তাই বিপদকালে আত্মগুরু বা সচ্চিদানন্দগুরুর স্মরণ নিলেই সব বিপদ

থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। বর্তমানে গুরুগিরি এক ব্যবসা। এরা সবাই কিন্তু যথার্থ আত্মবোধের অভাবে স্বকল্পিত অজ্ঞানজাত অভিমানের বলে নিজ নিজ কল্পিত ভাববোধের অধীন হয়ে ভেদবুদ্ধির প্রভাবে চলে বলে এদের কিছু মতলব থেকে যায়। সেই জন্য এদের মতলবী বলা যায় এবং সামগ্রিক ব্যষ্টিদৃষ্টির বশবর্তী হয়ে এরা স্বমতের ও স্বপথের গুরুত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করতে চায়। তার ফলে হয় পরস্পর বিরোধী ভাবদ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সবই আত্মজ্ঞানের অভাবেই হয়। আত্মজ্ঞানের উদয়ে এ সব আর থাকে না। তখন সমবোধ, সমদরশন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। সব রকম সম্প্রদায়গত ঝামেলার উৎস হল অজ্ঞানের প্রভাব। কোনও ব্যক্তিগত মতপথ বা সম্প্রদায়কে ঠেস না-দিয়েই এটুকু বলা যায় যে গুরু কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন। তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মার বিগ্রহ স্বয়ং।

লৌকিক দৃষ্টিতে দীক্ষাগুরুর উপরে আপন আপন ইষ্ট। গুরুগত স্বভাবভেদের তারতম্য অনুসারে ইষ্টেরও প্রকারভেদ হয়। কিন্তু শাস্ত্রমতে অনুভবসিদ্ধই একমাত্র গুরু। এমন অনুভবসিদ্ধকে তুষ্ট ও রুষ্ট করা যায় না, তিনি রুষ্ট-তুষ্টের ঊর্ধ্বে। তুষ্ট হওয়া, রুষ্ট হওয়া প্রকৃতির ধর্ম। তার উপরে স্বভাবের ধর্ম। তারও উপরে স্বরূপের ধর্ম। অনুভবসিদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। স্বরূপে রূপ, নাম, ভাব নেই। ছোট-বড় নেই, ভাল-মন্দ নেই। শুধু বোধে বোধে বোধময়।

তত্ত্বের দৃষ্টিতে সুধর্মের পরিচয়

স্বরূপের ধর্মই হল সুধর্ম। সুধর্ম হল এক-এর ধর্ম, ব্রহ্মের ধর্ম, ভূমার ধর্ম, অখণ্ডের ধর্ম, অমৃতের ধর্ম। সুধর্ম প্রাপ্ত হওয়া মানে স্বর্গে গিয়ে অমৃত আস্বাদন নয়। সে ক্ষেত্রে আস্বাদন পূর্ণ হলে আবার মর্তে ফিরে আসতে হয়। এ হল অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া, অমৃতস্বরূপ হওয়া। তখন আর আসা-যাওয়া নেই, বিকারও নেই। অমৃতস্বরূপ হল —Reality, Immortality—It is full of Love, Bliss and Peace. There is no second entity.

আত্মা ও অনাত্মার তাত্ত্বিক পরিচয়

আত্মা অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। মন-বুদ্ধির খেলাতেই আত্মা হয় অনাত্মা। বহুর খেলাতেই শিব হয় জীব। বুদ্ধিই শিবকে করে জীব। কিন্তু বোধের উদয়ে আত্মার জ্যোতিতে সেই জীবই আবার তার শিবত্ব ফিরে পায়। কাজেই আপনবোধে মন রেখে চললে আর কঠোর সাধনা করার প্রয়োজন হয় না। আমিই আত্মা, আমিই শিব এই ভাবে ভাবনা করে চলতে চলতে গুরুকৃপায় জীব একদিন শিব হবেই।

আত্মজ্ঞগুরু জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাত করেন না। সূর্য তার কিরণ সবার উপর সমান ভাবেই দেয়। তেমনই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর কোনও মতপথের তোয়াক্কা না-করে নির্বিচারে সবাইকেই তাঁর স্বানুভবসিদ্ধ আত্মবিজ্ঞানের কথা বলে চলেছেন। আত্মজ্ঞানীদের কাছে ব্যষ্টি ভাববোধের কোনও গুরুত্ব নেই।

[৩।৬।৯২]

নিত্যসত্য অমৃত আত্মার অভিনব মহিমা

শাস্ত্রে বহু দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্ব থেকেই আসছে গুরু-শিষ্যতত্ত্ব। ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা শাস্ত্রে রয়েছে তবে চর্চার অভাবে, উপযুক্ত ধারক-বাহকের অভাবে

সে সব এখন বিস্মৃতপ্রায়। সেই সব বিস্মৃত সত্যকে আবার জাগ্রত করার জন্য এখানে অনেক কথা অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে—কিন্তু কে আর তার মর্ম ধরে রাখে। সংসারী মানুষ অজুহাত দেয় সংসারের।

সত্য কখনও তিরোহিত হয় না। যা সত্য তা-ই নিত্য। এই সত্যকে বাদ দিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে অসত্যকে নিয়ে। তাই সে বিভ্রান্ত অস্থির চঞ্চল। কিন্তু কেন যে তারা জাগতিক ব্যাপারে বিব্রত তা তারা জানে না। কিন্তু প্রত্যেক কার্যের একটা কারণ আছে যেমন প্রত্যেক কারণের একটি পরিণতি আছে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধের পিছনে আছে একটি মূলসত্য।

আবার দেখ সংসারে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য তারা নিজের খবর যত না রাখে তার চেয়ে বেশি রাখতে চায় অপরের খবর।

মানুষ তো পৃথিবীতে এই প্রথম নয়—অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু সেটা জানা যাবে কী করে? বর্তমানকে জানলে অর্থাৎ আমি যে আছি এটা প্রমাণ করতে পারলে অতীতকে প্রমাণ করা সহজ হবে, ভবিষ্যৎকে জানতেও কষ্ট হবে না।

স্বপ্রকাশ আত্মা সর্বভাববোধের অধিষ্ঠান

প্রত্যেক মানুষেরই একটা সত্তা আছে। এই সত্তা তার দেহ-মনের অস্তিত্বের অতীত এক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। প্রত্যেকের বাহ্যদৃষ্টির দেহরূপ কারও আসল সত্তা নয়। কারণ এই দেহরূপ হল বিকারী পরিণামী—জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির অধীন। কিন্তু যার বক্ষে এই বিকারের খেলা চলছে সে কিন্তু এই বিকারের উর্দ্ধে। সে-ই হল সত্তাস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা। এই ব্রহ্ম-আত্মার কোনও দেশ-কাল-কার্য-কারণ নেই। ইনি থাকেন এঁদের স্বদেশে—এই স্বদেশ হল মানুষের হৃদয়গুহা। অন্তরে-বাইরে, সমগ্র আকাশ জুড়ে, সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করছেন এই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর। ব্রহ্মশূন্য কোনও জায়গা নেই। অথচ মানুষ এই ব্রহ্মকেই ভুলে আছে বা হারিয়ে বসে আছে।

মানুষের এই ভুল ভাঙ্গাবার জন্যই আজ গুরুশিষ্য প্রসঙ্গ করা হয়েছে। 'যে গুরু সে-ই শিষ্য— যে শিষ্য সে-ই গুরু'—এ কথা বেদান্তে বলা হয়েছে। কিন্তু কেন এ কথা বলা হয়েছে তা সদ্‌গুরুই বলতে পারেন তাঁর আত্মবোধের মাধ্যমে।

অদ্বয় আত্মার দ্বৈতবিলাস

অনন্ত ক্রোটি বছর ধরে যা আছে, ছিল, তা হল ব্রহ্ম-আত্মা। আবার অনন্ত কোটি বছর ধরে যা থাকবে তাও এই ব্রহ্ম-আত্মা। এই ব্রহ্ম-আত্মা কোনও লৌকিক ঈশ্বর নন—তিনি সর্বাতীত। নির্বিকার নিরাকার অজর অমর অদ্বয় অব্যয় নিত্যপূর্ণ অখণ্ড সত্য নিত্য অদ্বয়ই এই ব্রহ্ম-আত্মা। তিনি কোনও ব্যক্তি নন অথচ একজন ব্যক্তির সব কিছুই তিনি। তিনি হলেন প্রকাশক আর ব্যক্তি হল তাঁর প্রকাশ। সব প্রকাশের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেও তিনি প্রকাশের অতীত। তিনি সকলের আপনবোধের মূলে বিশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ। তিনি পূর্ণ তাই তিনি অমৃতঘন। তিনি চিৎস্বরূপ, সৎস্বরূপ ও তিনিই আনন্দস্বরূপ। তিনি পরমপ্রেমাস্পদ। তিনিই একমাত্র Reality আর সবই হল তাঁর reflection। Reflection কখনও real হয় না। সমগ্র সৃষ্টিতে একমাত্র তিনিই আছেন। বাহ্যপ্রকৃতির অন্তঃকরণের মধ্যে সত্তারূপে স্বয়ং তিনি। তাই বলা হয়েছে 'আমিই বলছি আবার আমিই শুনছি।' তাঁকেই পূর্ণ করে জানা এবং আপন করে পাওয়ার জন্যই মানুষের সাধনা। তাই মানুষ সাধনা করে। তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। তাই তিনিই গুরুরূপে এসে শিক্ষা দেন আবার নিজেই শিষ্যরূপে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

"ওঁ স্বর্গস্থিতি প্রলয় হেতুম্ অচিন্ত্য শক্তিম্
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বম্ অনন্ত মূর্তিম্।
নির্মুক্ত বন্ধনম্ অপার সুখাম্বুরাশিম্
শ্রীবল্লভ বিমল বোধঘনং নমামি।
যস্য প্রসাদাৎ অহমেব বিষ্ণু
ময়ি এব সর্বময়ং পরিকল্পিতঞ্চ
ইত্থনং বিজানামি সর্বাত্মরূপম্
তস্য শ্রীপদৌ প্রণতস্মি নিত্যম্।
তাপত্রয়ার্কে সন্তপং কিঞ্চিত উদ্বিগ্নমানসম
সমাধিসাধনে যুক্তং সদ্‌গুরুং পরিপৃচ্ছতি।
অনায়াসেন অস্মাদথ মুচ্চয়ে ভববন্ধনাৎ
তন্মেয়ং সংক্ষিপ্তিয় ভগবন্ কেবলং কৃপয়াবদ।।"

প্রণাম কে কাকে কেন করবে? আশ্চর্যের বিষয় 'এ' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) অনুভূতির গভীরে গিয়ে ঈশ্বর, আরাধ্য, গুরু কাউকেই পায়নি। নিজের মধ্যে শুধু নিজেকেই দেখেছে। ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য, অগ্র, পশ্চাৎ, অন্তর, বাহির—সব খানেই এই এক আমিকেই দেখেছে আর কিছুই পায়নি। তখন কাকে আর প্রণাম করবে আর কাকেই বা ভজন করবে।

গানটির ব্যাখ্যা করে বললেন—

বিশুদ্ধ বিমল বোধঘন চৈতন্যস্বরূপ অনন্ত সুখরাশিস্বরূপ যিনি তাঁকে আমি প্রণাম করি। তিনি শ্রীবল্লভ। শ্রী শব্দের অর্থ শক্তি সম্পদ ঐশ্বর্য। আর বল্লভ হলেন বিষ্ণু যিনি সর্বব্যাপী। তিনিই বিশ্বেশ্বর। Lord of all। তিনিই বিদিতবিশ্ব— all knowing। তিনি একদিন স্বেচ্ছায় অনন্তরূপ ধারণ করলেন তাঁর অচিন্ত্যশক্তির মাধ্যমে। আবার তিনিই হলেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারক—তিনিই বিশ্বের অধীশ্বর নারায়ণ। তিনিই কার্য তিনিই কারণ। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রত্যেক কার্যের যেমন কারণ আছে তেমনি কর্তাও আছে। কর্তাও তিনি, কার্যও তিনি, কারণও তিনি। এই নারায়ণই পরমাত্মার সবিশেষ অভিব্যক্তি। পরমাত্মার বক্ষেই তাঁর নিত্যস্থিতি ও অবস্থান।

কিন্তু মানুষের মনের বিশেষত্ব হল doubt and resolution—সংকল্প ও বিকল্প। তাই সতত তার মনে আসছে নানা প্রশ্ন—কী কেন, কোথায়, কবে, কখন—আবার এসব প্রশ্নের সমাধানও করছে মন। কাজেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন থেকেই যায়। মন দিয়ে তার পূর্ণ সমাধান কোনও দিনই হয় না।

ভজনের দ্বিতীয়পাদে বলা হচ্ছে—যৎপ্রসাদাৎ অর্থাৎ যাঁর প্রসাদে—কিন্তু প্রসাদ কে দেবেন কাকে? স্বয়ং বিষ্ণু নিজেই অনন্ত রূপ ধারণ করে নিজেকেই নিজে প্রসাদ দিচ্ছেন। আপন স্বভাবশক্তিযোগে, অন্তরশক্তিযোগে নিজের অনন্ত অনন্ত রূপের মধ্যে বসে নিজেই হাসছেন, কাঁদছেন, নিজেই চোর হয়ে চুরি করছেন, পুলিশ হয়ে ধরছেন আবার জজ্ হয়ে শাস্তি দিচ্ছেন। আবার নিজের দেওয়া শাস্তি নিজেই ভোগ করছেন। এটাই হল sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness। তাঁরই কৃপায় 'এ' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) নিজেই যে বিষ্ণু তা permanently জেনে ফেলেছে। সমগ্র বিশ্ব আমারই প্রকাশবৃত্তি, আমা হতে উঠছে আবার আমাতেই লয় হচ্ছে। এটাই হল 'অহমেব বিষ্ণু'। সবই আমার ইচ্ছা, অর্থাৎ নারায়ণের ইচ্ছারই প্রকাশ। যা-কিছু হচ্ছে সবই superimposed on ME। এটাই হল 'ময়ি এব সর্বময়ং পরিকল্পিতঞ্চ।'

পরবর্তী পাদে বলা হয়েছে—যদি কোনও একজন যিনি ত্রিতাপ অর্ক দ্বারা সন্তপ্ত অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন তাপ দ্বারা জর্জরিত, যিনি শান্ত জীবন যাপন করতে পারেন না; রাত

কাটে অনিদ্রায়; মনে আছে বিরুদ্ধ চিন্তার জট, যার মন-প্রাণ-বুদ্ধি উত্তেজিত হওয়ার ফলে রক্তের চাপ বেড়ে যায়, বায়ু ঊর্ধ্বগতি হয়; হজমশক্তির ব্যাঘাত ঘটে; দৈহিক, পৈটিক ও হৃদয়ঘটিত নানা বিকার বা disorder সৃষ্টি হয়; আবার সে কিছু কিছু অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ কিছু নামগানও করে, কিছু জপতপও করে, কিছু মন্ত্র উচ্চারণও করে, পূজাও করে, কিছু ধ্যানও করে আবার শম-দম-রতি-উপরতির মাধ্যমে সমাধির চেষ্টাও করে—বিচারও আছে বৈরাগ্যও আছে, কিছু ত্যাগও করে আবার কিছু ফিরিয়েও নেয়—এই রকম একজন সাধন সমাধিযুক্ত উদ্বিগ্নমনা কোনও সদ্‌গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলে—'হে কৃপালু দয়ালু আপনি দয়া করে আমাকে কৃপা করুন; আমার চেষ্টায় আর কিছু হবে না। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। দয়া করে আমাকে বিকার, ব্যাধি ও ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা দিন।' তখন সদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং বিষ্ণু (পরমাত্মার আমি) তাকে কৃপা করেন। এটা হল complete surrender of a manifested being to the Supreme Being। এটাই হল আপনবোধের খেলা। জীব হল অহংকার আর বিষ্ণুরূপী পরমাত্মা হলেন অহংদেব—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পূর্ণের আমি যা অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় সচ্চিদানন্দঘন স্বানুভবদেব।

গুরু তখন তাকে বলছেন—আমিও সাধ্যমত তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। খুব মন দিয়ে শোন। গুরুবেশে ভগবানই তাঁর খেলার সমাধান দিচ্ছেন। একান্ত মনোযোগ সহকারে না-শুনলে কিছুই হবে না। তোমাদের মাথাটা যত সব unnecessary বাজে কথায় ভরা তাতে গুরুবাণী রাখবার কোনও স্থানই নেই। তাই বারবার শ্রবণ করতে হয়। শ্রবণ করতে করতে যদি কোনও সময় কিছু একটা মনে গেঁথে যায় তাতেই কাজ হবে। আর তা-ই স্ফুলিঙ্গ হয়ে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। মন দিলেই বোধের প্রকাশ হয়, তখনই মনের দমন হয়। মন্দ[১] মানে মনের দমন, তা সম্ভব হয় বোধস্বরূপ আত্মাকে আত্মার মন ফিরিয়ে দেওয়ায়। (মন্দ শব্দের তাৎপর্য—(১) মনের দমন, (২) মনকে ফিরিয়ে দেওয়া।)

সমগ্র শাস্ত্র হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য ও সত্যানুভূতির record। এই যে বিষ্ণুরূপ পরমদেবতার কীর্তি, এই হল শ্রুতি। শ্রুতি হল দেববাণী। শ্রুতির প্রতিপাদ্য হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার তাদাত্ম্যজ্ঞান। এই একের জ্ঞান, অভিন্নের জ্ঞানই হল মুক্তির একমাত্র উপায়। গুরু বলছেন—তুমিই সেই ব্রহ্ম-আত্মা—Thou art that "তত্ত্বমসি", তুমিই সেই। তুমি কে? তুমি সেই যিনি বেদবাণী প্রকাশ করছেন—আবার তিনিই তুমিরূপে তার ব্যাখ্যা চাইছেন। নিজের মধ্যে নিজরূপে যে বৃহত্তর অংশ আছে তা-ই আপনস্বরূপ। আপনস্বরূপই হল স্বস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সত্তাস্বরূপ, এই ভাবে 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) মধ্যে, (এই আমির মধ্যে) অদ্বয়তত্ত্বের বিজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত খেলছে। সে ভাবেই তা ব্যক্ত হচ্ছে আবার।

শিষ্য আবার প্রশ্ন করছে—জীব কে? পরমাত্মা কে? তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য বা একাত্মই বা হবে কী করে? আমার পদের অর্থবোধ নেই। আপনি আমাকে প্রতিটি পদের অর্থবোধ বোধগম্য করে দিন।

গুরু বলছেন—বাক্যের প্রতিটি শব্দের অর্থ বা জ্ঞান না-থাকলে বাক্যের মর্মার্থ জানা যায় না। জীব আর কেউ নয় জীব তুমি। আবার তুমি স্বরূপত জীব নও তুমি স্বয়ং শিব, বিষ্ণু বা ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর। অন্য কেউ নও। এই হল Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge-এর তাৎপর্য।

শিষ্য বলল—আমিই ব্রহ্ম তার প্রমাণ কোথায়?

গুরু বললেন—প্রমাণ তুমি স্বয়ং। ব্রহ্ম ছাড়া তো আর কিছুই নেই। তিনিই তো সকল বস্তুর সার। তুমি নিজেও স্বয়ং ব্রহ্ম। নিত্য সত্য বস্তু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যা-কিছু জাগতিক, যার সত্য অস্তিত্ব নেই তাকে প্রমাণ করা যায় না এবং প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অসত্য বস্তুকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য প্রমাণের

১। মন্দ—স্বানুভূতির ভাষায়।

প্রয়োজন হয়। নিত্যবস্তুকে প্রমাণ করার জন্য অন্য বস্তু আনা পাগলামি। যেমন সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দেশলাই বা মাটির প্রদীপ দেখানো বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিষ্য আবার বলল—আমি ব্রহ্ম হলে আপনি কে? আর সব কে?

উত্তরে গুরু শুধু বললেন—আগে নিজেকে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত কর। নিজে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে অনায়াসেই অর্থাৎ কোনও আয়াস না-করেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তোমার ভিতরে যিনি আছেন তাঁর সম্পর্কে তোমার জানা নেই। আগে তাঁকে জান। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—আনন্দরূপে অন্তঃকরণে সাক্ষিচৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন। অন্তঃকরণে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী হল এই বিশুদ্ধ চৈতন্য। তুমি দেহ নও, মনও নও, ইন্দ্রিয় নও, প্রাণও নও, বুদ্ধিও নও, অহংকারও নও। তুমি স্বয়ং চৈতন্যসত্তাস্বরূপ। কিন্তু তুমি তোমার দ্বারাই বিভ্রান্ত হচ্ছ। কারণ তুমি মন, বুদ্ধি দ্বারা চালিত হচ্ছ। কারণ ও কার্য—source and supply যেখান থেকে আসছে সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী-আত্মারূপে গুরু তোমার অন্তরেই বসে আছেন।

প্রশ্ন শিষ্যের—তাহলে আমরা গুরু করি কেন?

গুরুর উত্তর—ভুল সংশোধনের জন্য। অবশ্য ভুলের কারণও তুমি স্বয়ং। তোমার ভিতরে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বসে আছেন তাঁর সঙ্গে একস্বরূপতার বোধ নিজের বুদ্ধিদোষে আবৃত হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত হয় না বলেই এত বিভিন্নতা। আপন অন্তঃশক্তি যোগে আনন্দের আতিশয্যে তিনি বহু হয়ে নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। আবার তাঁকে ফিরে পাবার শিক্ষা তিনিই গুরুরূপে দিতে আসেন। ব্রহ্ম-আত্মাস্বরূপে তিনি সব সময়ই ধ্যানমগ্ন। তিনি স্বয়ং জ্ঞানময় পুরুষ। Being is knowingness. Being continuously revealing Itself. Knowingness is witness and witness is Reality. Reality is Eternal—এটাই হল প্রকাশ cycle। পূর্বাপর সম্বন্ধে ব্রহ্ম একাই আছেন আর কিছুই নেই। Being থেকে আসছে becoming তাই উপনিষদে আছে 'একোঽহমং বহুস্যাম'। কী করে হলেন? এক ব্রহ্ম আনন্দের আতিশয্যে ইক্ষণের মাধ্যমে যখন বহু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন আপন অন্তরের স্পন্দনে বহুতে পরিণত হলেন। এতদিন যা ছিল সম্বিৎস্বরূপ, পরাবিদ্যা, পরমপ্রিয়তম, প্রেমাস্পদ, পরমানন্দস্বরূপ তাঁরই বক্ষে প্রকাশের পর প্রকাশ হতে হতে দেখা দিল obstruction। ফলে এল অবিদ্যা অজ্ঞান। পরার স্থান নিল অপরাবিদ্যা। এই ভাবে প্রজ্ঞানস্বরূপ থেকে বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ থেকে জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানাভাস জীবতত্ত্ব জীববিজ্ঞান) আর জ্ঞান থেকেই অজ্ঞান। আবার একই cyclic order-এ অজ্ঞান থেকে জ্ঞান (জ্ঞানাভাস), জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানস্বরূপে ফিরে যাওয়া যাবে। এই ভাবেই 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) ভিতরে 'নিত্যাদ্বৈত'-এর বিজ্ঞান অভিনব ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা অননুকরণীয়। তা বিশেষভাবে মনে রাখবে সবাই। নিষ্ঠা সহকারে সর্বান্তকরণে বিনা দ্বিধায় যে 'মেনে, মানিয়ে চলতে' পারবে তার মধ্যে এই নিত্য এক-এর বিজ্ঞানস্বরূপ 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হবে। এর অন্যথা সম্ভব নয়। কিন্তু নিষ্ঠার অভাবে, আপনবোধে 'মেনে, মানিয়ে চলা' সম্ভব না-হলে এই অদ্বয়তত্ত্বের যথার্থ ধারক ও বাহক হওয়া কোনও মতেই সম্ভব হবে না। সোজা কথায়, ভাবের ঘরে চুরি হলে ভাবাতীতের মূলে যাওয়া যাবে না। এটাই স্বানুভবদেবের নির্দেশ।

তুমি ছিলে জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞানের সাথে খেলতে গিয়ে হলে বহু। খেলতে খেলতে নিজেকে অজ্ঞানের সাথে identify করে নিয়ে তখন জ্ঞানের খোঁজ করছ। তোমার বর্তমান পরিচয় হল তোমার false identification। তুমি নিজেকে যা ভাবছ তা তুমি নও। অতএব জীবরূপী বর্তমান নিজের কথা, নিজের চিন্তা ছেড়ে গুরু নির্দেশিত পথে চল। গুরুর কথা শোন ও জীবরূপী নিজের কথা ছাড়। গুরুকে ধরলে সব লঘুই গুরু হয়ে যাবে। সব খণ্ডই অখণ্ডে পরিণত হবে। গুরুই একমাত্র ভরসা।

জেনো, সংসারে তুমি কেবল দ্রষ্টা। তোমা অতিরিক্ত যা-কিছু সবই দৃশ্য। তোমার দেহের, মনের, প্রাণের, বুদ্ধির ও অহংকারেরও তুমি দ্রষ্টা। দ্রষ্টা কখনও দৃশ্য হতে পারে না। রূপের দ্রষ্টা দৃশ্য থেকে বিলক্ষণ, পৃথক। Know it for certain permanently. It is said as a guarantee that you are Consciousness Itself—gross and subtle all are objects—seen। তুমি দেহরূপ দৃশ্য হতে ভিন্ন। পঞ্চভূতে গড়া এই দেহ—তুমি পঞ্চভূত বিলক্ষণ। তুমি তোমার দেহের কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা নও। তুমি তোমার অন্তঃকরণের সাক্ষিচৈতন্য। ইন্দ্রিয়রূপ দৃশ্যের তুমি বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ দ্রষ্টা। সেরূপ মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহংকার কোনওটাই তুমি নও অথচ তুমি সবেরই একমাত্র দ্রষ্টা।

মূলদেহ বিকারী। ষড়বিধ বিকার—যথা অস্তি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ দিয়েই দেহের গঠন। কিন্তু দ্রষ্টার কোনও বিকার নেই। সে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ—নিত্যবর্তমান, নির্বিকার নিরাকার সাক্ষিচৈতন্য। কাজেই তুমিই হচ্ছ the only Reality। তোমার অন্তঃবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সবেরই সাক্ষী তোমার চৈতন্য। তোমার চেতনায় তাদের সক্রিয়তা। সব কিছুর মূলে তুমিই স্বয়ং। তোমা অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেউ নেই।

গুরুর কাছে এলে তাঁকে দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু যিনি সদ্‌গুরু স্বয়ং তাঁকে আর কী দেওয়া যাবে। সদ্‌গুরু হলেন আত্মগুরু। তিনি স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। লৌকিক গুরুকে অর্থসম্পদ ইত্যাদি দক্ষিণা দেওয়া হয়। কিন্তু সদ্‌গুরুকে কী দেবে? নিজেকে চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারাই হল সদ্‌গুরুর দক্ষিণা। গুরুগত বিদ্যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তখনই হবে যখন এই বিদ্যার পূর্ণ possession নিয়ে গুরুজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হবে। গুরুর সঙ্গে অভিন্ন identity হবে। যখন জানবে আমিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা—'অহং আত্মা কেবলম্'। আমিই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নির্বিকার, নিরাকার, অজর, অমর, অব্যয়, অদ্বয়, অপাপবিদ্ধ, সত্য, সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, নিত্য, অখণ্ড, ভূমা, অমৃত, স্বানুভবদেব স্বয়ং। তখন 'এ' কে (নিজেকে ইঙ্গিত করে) পাবে মহাশূন্যের পিছনে—জাগতিক কোনও কিছুই 'একে' দেওয়া যাবে না! There is no power to please—জাগতিক কোনও কিছু দিয়েই 'একে' সন্তুষ্ট করা যাবে না।

নিজেকে জীব ভাবা গুরুকে অপমান করা। তুমি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ভাব। এটা কোনও theory, doctrine, thesis বা philosophy নয়। এটাই হল চরমতম পরমতম সত্য—Reality, as It Is। সমুদ্রজাত নদী যখন দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করে আবার সমুদ্রে এসে পতিত হয় তখন তার পরিচয় সমুদ্র। সেরূপ পরমাত্মার বক্ষে স্বভাবকল্পিত জীব সামগ্রিক রূপ-নাম-ভাবে এবং দেশ-কাল-পাত্র-কার্য-কারণে পরিক্রমা শেষ করে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা 'আমি সাগর'-এ মিলে অখণ্ড 'আমিময়' হয়ে যায়। তখন সে নিত্যাদ্বৈত, ভূমা, অখণ্ড, শাশ্বত, অচ্যুত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংপূর্ণ, ঈশ্বরাত্মা-ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তমরূপে, স্বানুভবসিদ্ধ প্রজ্ঞানপুরুষরূপে, 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' হয়ে সদা করে বিচরণ। [২৪।৬।৯২]

অদ্বয় আত্মগুরুর বক্ষে দ্বৈত জীবভাবের কল্পিত বিলাস

'আমি'-র খেলাই এই জীবন। জীবনকে 'জীব ন', 'জীব ন' করে বারবার উচ্চারণ করলে হয়ে যায় 'ন জীব'। অর্থাৎ তুমি জীব নও।

জীবন হল 'ন জীব'। অর্থাৎ জীবন হল আত্মসাধনচক্রের এক গতিময় রূপ। গতি যখন স্থিতিতে পৌঁছবে তখনই জীবনের তাৎপর্য বোঝা যাবে। তখন জীবন হয় শিবস্বরূপ, ব্রহ্মময় আত্মস্বরূপ। জীবন হল সুন্দর, একে সুন্দরতম না-করে সুন্দরকে মানুষ করে অসুন্দর। সত্যকে সত্যরূপে ব্যবহার না-করে মিথ্যা দ্বারা ব্যবহার করে। ফলে বুদ্ধিতে মিথ্যাই খেলে, সত্য খেলে না। এ সবের কারণ তোমাদের অভিমান।

গুরুজ্ঞান অভিমানকে নাশ করে। গুরুর সামনে (গুরুকে অবশ্যই আত্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ হতে হবে) দ্বৈতবোধ প্রাধান্য পেতে পারে না। তোমরা তো গুরুর সামনে এক রকম আর গুরু সামনে থেকে সরে গেলেই আবার শুরু হয় তোমাদের সেই দ্বৈতবোধের খেলা, সেই 'আমি-আমার' কচকচি। কী করে আর এ সব দূর হবে? এই 'আমি-আমার' সংস্কার তো আর এক জন্মের নয়। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারে ভরে আছে ভিতরটা। পাত্রে তো আর জায়গা নেই। এক সের জিনিস ধরে এমন পাত্রে দুই সের জিনিস রাখলে উপচে তো পড়বেই। তেমনি কামনা-বাসনা, দেহাত্মবুদ্ধি, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, অহংকার ভরা তোমাদের ভিতরটা। প্রতিদিন তাই এত যে গুরুবাণী শুনছ সবই উপচে পড়ছে বাইরে, ভিতরে কিছুই ঢুকতে পারছে না। জায়গা নেই। একটু কিছু ঢুকলেও কাজ হতো। Magnet-এর কাছে লোহাকে আনলে লোহাও magnet হয়ে যায়। কিন্তু লোহা কাদামাখা থাকলে তা হতে পারে না। তেমনি গুরুবাণীকে ভিতরে স্থান না-দিলে কামনা-বাসনা ভরা মনের অজ্ঞান মোহ নিরসন হয় না। নিজেই নিজের অন্তরের আলো জ্বালাবে এ ক্ষমতা মানুষের নেই। জ্ঞানের আলো জ্বালাতে 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'-ই একমাত্র পথ। কিন্তু গুরুকৃপা হবে কী করে? গুরুবাণী শোনার পর তা মনন না-করলে গুরুবাণী জাগে না। ভেজা দেশলাই দিয়ে কাঠি জ্বালানো যায় না। তাকে তাপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। গুরুবাণী হল তেমনই তাপ। গুরুতাপ দিয়ে অন্তর শুদ্ধ করে নিলে গুরুবাণী জাগ্রত হবেই। তাই আর অপরের সঙ্গে competition নয়—আর মন্তব্য নয়। মন্তব্য থাকলে গন্তব্যে পৌঁছান যাবে না। কর্ম থাকলে ধর্ম বা ধর্তব্য আবৃত থাকবে। অর্থাৎ কর্ম দিয়ে ধর্মকে আবৃত করো না। ধর্ম প্রকাশ না-পেলে তার সারমর্ম জানা যাবে না।

জীবনসমস্যার উদয় হয় দ্বৈতবোধে এবং তার সমাধান হয় অদ্বৈতবোধে

বেশির ভাগ লোকই গুরুর কাছে কিছু পেতে চায়। কিন্তু গুরুর আপন হতে চায় না। তাই গুরুও কিছু একটা নাম দিয়ে দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, গুরুকে আর আপন করে পায় না। যিনি গুরুর শরণাগত তিনি গুরুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দেন গুরু নিজেই তার জীবনের সব মলিনতা ধুয়ে তাকে আপন করে নেন। শুধু গুরুর কাছে complete surrender করে বলা—"জীবন আমার যন্ত্র তোমার, তোমার লীলামাধ্যম"। অথচ তোমরা তোমাদের কামনা-বাসনা নিয়েই নাচানাচি করছ, নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে পারছ না।

জিজ্ঞাসু যখন জিজ্ঞাসা করছে—ভববন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী?

গুরু প্রথমেই বলছেন—শোন, মন দিয়ে শোন। অর্থাৎ correct শ্রবণ না-হলে মনন ঠিক মতো হয় না ও শ্রবণের অন্তর্নিহিত বোধ বা অনুভূতি জাগ্রত হয় না। তাই শ্রবণের সময় অন্য কোনও চিন্তা মনে আনতে নেই।

গুরু বলছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক অদ্বয়। জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন। এই অদ্বয়জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র ওষুধ। জীবই আত্মা। তাই গুরু বলছেন—"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে একদিন জানবে 'সোঽহম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি, আত্মাস্মি', 'অহং প্রজ্ঞানাস্মি'।

বাক্যের অন্তর্গত পদের অর্থবোধ ঠিক ঠিক জানা না-থাকলে বাক্যের অর্থ মর্মগত হয় না। বাজার থেকে ভাল ভাল জিনিস কিনে এনে রান্না করলে তাতে যদি নুন ও মশলার পরিমাণ ঠিক ঠিক মতো না-হয় তো রান্নার স্বাদ হয় না। বাক্যের মধ্যেও পদের অর্থবোধ না-থাকলে বাক্যের কোনও মর্মই থাকে না। তাই শিষ্য প্রশ্ন করছে—কে জীব? কে পরমাত্মা? আর কী ভাবেই বা 'তত্ত্বমসি' হবে? এই সব প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলছেন, জীব তুমি স্বয়ং পরমাত্মা। ব্যবহারে তুমি জীবরূপে প্রতিভাত হলেও তুমি কিন্তু জীব নও, তুমিই ব্রহ্ম স্বয়ং। জাগ্রত অবস্থায় থাকে স্থূল দেহ, নিদ্রায় থাকে সূক্ষ্ম দেহ আর গাঢ় নিদ্রাকালে থাকে কারণ দেহ। কারণ দেহে সংসারের অভিমান অহংকার দেহবুদ্ধি থাকে না। তখন জীব হয় প্রাজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞানস্বরূপ, প্র + অজ্ঞ। আর

ঈশ্বর হলেন প্রজ্ঞ। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানস্বরূপ, প্র + জ্ঞ। গাঢ় নিদ্রা হল সমষ্টি অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতির সাম্য অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থা, তার অধিষ্ঠান হল ঈশ্বর। ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব হল মায়াধীন। জীবের উপাধি অবিদ্যা, ঈশ্বরের উপাধি মায়া। মায়া থেকেই আসছে অবিদ্যা, অজ্ঞান ও প্রকৃতি। প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্ব হল intelligence বা বুদ্ধি, রজ হল গতি বা সৃষ্টি আর তম হল স্থিতি, জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা। প্রকৃতির এই তিন গুণ মিলে মিশে এক হয়ে আছে। প্রকৃতির সব কিছুই এই তিন গুণের মিশ্রণ। এই তিন গুণের সাম্য অবস্থা হল সুষুপ্তি অবস্থা বা অব্যক্তপ্রকৃতি। সত্ত্ব অংশের প্রাধান্যে মায়া বা ঈশ্বর, রজ ও তম-এর প্রাধান্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানপ্রধান জীব। আর এই তিন অবস্থার সাক্ষিরূপে যিনি আছেন সেই কূটস্থচৈতন্যই হলেন ব্রহ্ম-আত্মা। তিনি নির্বিকার নিরাকার, সর্বসম একরসসার, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, অদ্বয়, অব্যয়, নিষ্কল, নির্মল, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমতত্ত্বস্বরূপ। তিনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি সৎ কারণ তিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে বিকৃত করার মতো শক্তি কোথাও নেই। তিনি চিৎস্বরূপ কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ংপ্রকাশ—তাঁর প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তিনি অখণ্ড, ভূমা, সর্বসম, তাই তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি পূর্ণ তাই তিনি আনন্দময় আর তিনি আনন্দময় তাই তিনি অমৃতময়, অমৃতস্বরূপ। ব্রহ্মবক্ষে শুধু ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি মায়া ও অবিদ্যারূপে ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই প্রকাশিত।

এই তত্ত্ব কারও কাছে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা হয়নি উপযুক্ত আধারের অভাবে। অতপস্বী, অভক্ত, অজিজ্ঞাসু, যে শুনতে ইচ্ছুক নয়, গুরু, ইষ্ট, ধর্ম ও বেদের যারা বিরোধিতা করে তাদের কাছে এ তত্ত্ব বলতে নেই। কেন যে এই তত্ত্ব 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের) মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—তা কেউ জানে না। গুরুবাদের কথা এ যুগে এত বলা হয়েছে তার কারণ এ যুগে ভগবান বা ঈশ্বরকে দেখা যাবে না। এ যুগের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হলেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। এ যুগে গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক। এ যুগে তেমন জিজ্ঞাসু কৈ? জিজ্ঞাসু না-হলে কি তত্ত্বকথা বলা যায়? না তার সদ্ব্যবহার হয়।

অভিমান অহংকারই অজ্ঞানতার কারণ। তুমিই যে স্বয়ং তিনি তা তুমি জান না। এই আত্মবিস্মৃতিই তোমার বিকারের কারণ। এই বিকার থেকেই আসছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। তুমি সব সময় তোমার মন, বুদ্ধি ও অহংকারবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছ। আত্মস্বরূপের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কথা একবারও ভাব না। তুমি যে তোমার অন্তঃকরণবৃত্তির ভাসক, দ্রষ্টা, সাক্ষী তা তুমি ভুলে গেছ বলেই জান না। তা জানলে আর তোমার দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি, অভিমান, অহংকার থাকে না—অর্থাৎ জীবভাবই খসে যায়। পৃথিবীতে যত উপাধি আছে—সবই rubbish identity। 'আমি'র অর্থ হল একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাই দেহাত্মবুদ্ধি ছেড়ে 'সচ্চিদানন্দবুদ্ধি সাক্ষিবোধ বিগ্রহ চিন্তয় নিত্যম্ তত্ত্বম্‌দেহাদিগা, ধ্যেয়ম্ সচ্চিদানন্দস্বরূপম্ কেবলম্।' আর এই স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হতে চাই শ্রীগুরুর শরণাগত হওয়া।

প্রকৃতির রাজ্য হল ভোগের রাজ্য। এখানে ছলে বলে, কলে কৌশলে, আড়ালে-আব্‌ডালে সবাই ভোগ করছে। এই ভোগের ফল যখন ফিরে আসবে তখন আর কেউ আসবে না সে ফল নিতে—তোমার ভোগের ফল আবার তোমাকেই ভুগতে হবে। বাজারে গিয়ে best জিনিসটি নেবে আর দাম দেবে না তা যেমন হয় না, তেমনি গুরুর কাছ থেকে সবচেয়ে দামি জিনিসটি নেবে আর কিছুই ত্যাগ করবে না—তাও হয় না। কাজেই ত্যাগ কর। কী ত্যাগ করবে? ত্যাগ কর তোমার কামনা-বাসনা, দেহাত্মবুদ্ধি; এককথায়, ত্যাগ কর তোমার দ্বৈত ভাব—তাহলেই জানবে তোমার আপনস্বরূপকে—সচ্চিদানন্দস্বরূপই তোমার আপনস্বরূপ। তুমিই আত্মাস্বরূপ। ঘটের দ্রষ্টা যেমন ঘট থেকে আলাদা তেমনি তুমি তোমার দেহের দ্রষ্টা—দেহ থেকে পৃথক। তুমি তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহংকারের দ্রষ্টা—এদের থেকে তুমি পৃথক। তোমারই চেতনার আলোতে এরা আলোকিত। তুমি হচ্ছ illuminator, প্রতিভাসক, illuminated বা প্রতিভাস্য নও।

[১।৭।৯২]

সাধারণ সংসারীদের প্রসঙ্গে

সংসারে মানুষ শোনা আধ্যাত্মিক কথারই পুনরাবৃত্তি করে বারবার। এ সব কথার সঠিক অর্থবোধও তাদের নেই। তাই সংসারী মানুষের উচিৎ একজন উপযুক্ত সদ্‌গুরুর কাছে এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করা। নিজে নিজে দু'পাতা শাস্ত্রপাঠ করে বিদ্যা জাহির না-করা। এ পথে আসতে হলে ভালভাবে প্রাণমন দিয়ে এ পথকে ভালবেসেই আসতে হবে। তার জন্য চাই গুরুর কাছে শোনার অভ্যাস। ওস্তাদি গান যেমন ভাল করে না-শুনে ও না-শিখে গাওয়া যায় না, তেমন। দীর্ঘ অভ্যাসের পরই গলা থেকে গুরুর মতো সুর আসবে।

এখানে যে বিদ্যার কথা বলা হয় তা হল পরাবিদ্যা। ব্রহ্ম-আত্মা অদ্বয়তত্ত্বের কথা। শাস্ত্রপাঠ করে বা বই পড়ে এই বিদ্যার যথার্থ অধিকারী হওয়া যায় না। যেখানে দ্বৈত সেখানেই সমস্যা, যেখানে অদ্বৈত সেখানেই সমাধান। একসময় একদল লোক বলেছিল—আপনি এত সহজে অদ্বৈতের সমাধান দেন যা আমাদের সমাজব্যবস্থা, আমাদের জীবনযাত্রা, আচার-নিয়ম বজায় রেখে ব্যবহার করা যায় না। তাদের বলা হয়েছিল—মুক্তির আর কোনও পথ নেই। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। 'একমেবাদ্বয়ম্'কে পাবার একটাই পথ। এক-এর জন্য একই পথ। লক্ষ পথ ছোটে লক্ষ দিকে। লক্ষ পথ হল দ্বৈতের পথ। এক-এর পথ হল অদ্বৈতের পথ। অদ্বৈতেব পথ হল শান্তির পথ। এ পথে চলতে হবে একলা। কোনও বন্ধু, কোনও comrade কারও প্রয়োজন নেই। Alone, only with one's own Self.। আর এ পথের একমাত্র পাথেয় হল গুরুবাণী ও গুরুকৃপা। অন্তর কামনাশূন্য হলে গুরুকৃপা আপনিই আসবে। 'আমি মুক্তি চাই'—এটাও তো কামনা। আত্মা তো সদা মুক্ত। তুমি যখন স্বয়ং আত্মাস্বরূপ তখন আত্মার মুক্তি কামনা তুমি কর কী করে?

বর্তমানের মানুষের মনে প্রশ্নও ওঠে না—আমরা মুক্ত হয়েও বদ্ধ হলাম কেন? সে বিচার করার লোকও বর্তমানে নেই। সাধারণ মানুষ বারবার জন্ম নিচ্ছে হেলায় খেলায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে ভোগসুখের মধ্য দিয়ে। শান্তিস্বরূপ-পরব্রহ্ম পরমাত্মার কথা একবারও ভাবে না। আমি কে? এই অশান্তিময় জীবনে শান্তির পথ কোথায়—এ সব ভাবেও না। শান্তি পাবার কোনও প্রচেষ্টাই তাদের নেই। ভোগের পিছনে, অর্থের পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মন্দির-মসজিদে যাচ্ছে—ডেলা চড়াচ্ছে—আর ভাবছে ভগবানকে ঘুষ দিয়েই জীবনের যত কামনা-বাসনা সব পূরণ করে নেবে। তারা আবার মাঝে মাঝে সৎসঙ্গেও যায়। কিন্তু সৎবাণী ঠিক মতো অনুধাবন করে না। তারা জানেও না প্রত্যেকের মধ্যেই নিহিত আছে সেই শক্তি, যে শক্তি জাগ্রত হলে মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। সে শক্তি তাহলে charged হবে কী করে? একমাত্র গুরুবাণীই সে শক্তিকে charged করতে পারে। সদ্‌গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত শব্দ অন্তরের অন্তঃস্থলে গেলে organic system গুরুতাপে heated হয়। সেই heat-এ জন্ম জন্মান্তরের সব সংস্কারের মধ্যে clash হতে থাকে। কামনা-বাসনা ভোগেচ্ছা আস্তে আস্তে গলতে থাকে তখন শরীরে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এই ব্যাধিই ভিতরের সব মল শোধন করে অন্তরকে শুদ্ধ করে। অধ্যাত্ম পথে এগোতে গেলে অনেক জ্বালা, অনেক বেদনা সহ্য করতে হয়। ব্যথা-বেদনাই মানুষকে করে শুদ্ধ নির্মল সুন্দর।

মানুষ সংসারে spring-এর পুতুলের মতোই চলছে। একবার দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে—চলছে তালে তালে মৃত্যু অবধি। সংসারে মানুষের কত চিন্তা কত অজুহাত। Science of Oneness-এ কোনও অজুহাত নেই, কোনও চিন্তা নেই। It is something exceptional। Oneness-এর বিজ্ঞান বাইরে থেকে আসে না—It reveals from within। গুরুবাণী যদি তোমাদের অন্তরে একটু জায়গা পেত তবে সব পরিষ্কার হয়ে যেত। 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) সব সময় চেষ্টা করে to charge others—কিন্তু 'এ'

সব সময়ই লক্ষ্য করে 'এর' কথাগুলো তোমাদের মাথায় থাকেই না। ঢুকেই আবার বেরিয়ে আসে। এখানে যে কথাগুলি বলা হয় তা স্মৃতিতে রাখতে চেষ্টা কর। এখানে যা পাচ্ছ তা হল uncompromising words— গতানুগতিক কোনও সাধুসন্তের কাছে তা পাবে না। সাধারণ ধর্মের কথার সঙ্গে এগুলোকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ঠিক যে ভাবে, যে অর্থে বলা হয় সেই ভাবেই নিতে হবে। You have got a golden chance— তার অপচয় করো না। যে লগনে এ সুযোগ এসেছে সে লগনেই এই শুভকাজ সম্পন্ন কর। এ সুযোগ হয়ত আর পাবে না।

সদ্‌গুরু ও সদ্‌শিষ্যের যোগ হল মনিকাঞ্চন যোগ। যে শিষ্য অদ্বয়জ্ঞান লাভের আশায় তপ্ত লৌহের মতো হয়ে বসে আছে, যেখানে এক ফোঁটা জল পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে শুষে যাবে, সদ্‌গুরুর বাণী তার কাছে এলেই তার অন্তর তা শুষে নেবে। আর hearing itself will lead to perfection। সদ্‌গুরুর বাণীই perfection-এর একমাত্র পথ। তবে 'এর' words-এর misuse কখনও করো না। 'এ' যে ভাবে বলবে সেই ভাবেই ব্যবহার করবে—নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করলে কোনও লাভ তো হবেই না বরং সমূহ ক্ষতি।

অ-আ-ক-খ না-পড়ে যেমন M.A. পড়া যায় না, তেমনি গুরুর কাছে শিক্ষা না-নিয়ে, তাঁর বাণী শ্রবণ না-করে অধ্যাত্মসাধনার পথে এগোনো যাবে না। আত্মজ্ঞানের পথে পা বাড়াতে যতটুকু চেষ্টাই কর না কেন, কিছুই ফেলা যাবে না। এখানে যা বলা হয় তার each and every word is Divine। শুধু কল্পনার জগৎ নিয়ে শূন্যে ইমারত গেঁথো না। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও আমির বক্ষে শুধু আমিই আছে। এই আমি হল আমারশূন্য আমি। তাই নিজেকে আমারশূন্য কর। তার জন্য তোমাকে সাহায্য করবেন তোমার গুরু। গুরুর আমি হল পূর্ণ আমি, ভূমার আমি। জীবের আমি নয়। জীবের আমি ছেড়ে পূর্ণ আমিকেই ধর। আপনবোধে, পূর্ণ বোধে পূর্ণ হও। [৮।৭।৯২]

গুরুপূর্ণিমার বিশেষত্ব

আজকের এই পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবান অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টির অধিষ্ঠান, স্রষ্টা প্রভু, নিয়ন্তা বিভু এবং সর্বাতীত পরমাশক্তি পরব্রহ্ম সনাতন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি তপস্যা দ্বারা আপনি আপনে মগ্ন থাকেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা জেগেছিল অন্তরের অন্তঃস্থলে আপনার অন্তঃনিহিত শক্তিকে আশ্রয় করে তাঁর অদ্বয় অব্যয় অজর অমর অপাপবিদ্ধ শাশ্বত সনাতন শুদ্ধ নিরঞ্জন স্বরূপে থেকেই তিনি তাঁর আত্মমহিমাকে আপনি প্রকাশ করবেন, সেই প্রকাশে আপনি বর্তমান থেকে, নিজেই আস্বাদন করবেন আপনার লীলা। এটাই তাঁর বিশ্বরূপ। স্বয়ং ঈশ্বর-ঈশ্বরী সত্তাশক্তিযোগে অনন্ত জীবন ধারণ করে নিজেই জীবরূপে থাকলেন আবার জীবের জীবন ধারণের জন্য নিজেকে শক্তি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধির ক্রমধারায় প্রকাশ করে নিজেই আস্বাদন করলেন নিজের লীলা মহিমা। এই হল 'নিত্যাদ্বৈত'-এর লীলা। শুদ্ধ অদ্বৈতে কোনও লীলা নেই। কি আছে কি নেই কিছুই জানা যায় না। অনেকটা সুষুপ্তি অবস্থার মতো। সুষুপ্তিতে থাকেন সগুণ আত্মা। অদ্বৈতে কোনও গুণের ক্রিয়াই থাকে না। আবার তিনিই সদ্‌গুরুরূপে জীবের জীবনে আবির্ভূত হন— জীবের মুক্তির জন্য। সগুণে জীবরূপ ধারণ করে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ নিজেকে প্রকাশ করে ক্রমধারায় নিজেই আস্বাদন করেন নিত্যলীলা। তিনি রসরাজ রসঘন পরমপ্রেমাস্পদ—আপনে আপন। তাই জীব সব সময় নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে—অপরের প্রতি ভালবাসা গৌণ। আপনার অস্তিত্ব, আপনার অনুভূতি সম্পর্কে সবাই সচেতন। পূর্ণতা হল আনন্দস্বরূপ। পূর্ণতা এলে আর কামনা-বাসনার দ্বৈত ভাবের ক্রিয়া থাকে না। তখন জীব অখণ্ডের গুণ কীর্তন করে। পরমাত্মা পরব্রহ্ম জীবের অস্তিত্ব,

চৈতন্য ও আনন্দ রূপে জীবের মধ্যেই আছেন, জীব থেকে তিনি পৃথক নন। জড়ের মধ্যে জড়রূপে, বৃক্ষের মধ্যে বৃক্ষের প্রাণ ও জীবন রূপে, প্রকৃতিরূপে তিনিই আছেন। জীবের হৃদয়ে নিজেকে প্রাণ মন বুদ্ধি রূপে ক্রমধারায় প্রকাশ করে আপনাকে দেখার জন্য তিনিই ব্যাকুল হন।

সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম-আত্মাস্বরূপ তাই আবার গুরুরূপে আবির্ভূত হন। জীবের জীবনে সদ্‌গুরুর প্রভাবে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি জ্ঞান আনন্দের বিকাশ হতে থাকে, ক্রমশঃ জীবের অন্তরে সত্যবোধ জাগ্রত হতে থাকে। আস্তে আস্তে তার জীবভাব চলে যেতে থাকে। এই ভাবে জীব হয় অতিমানব, তারপর দেবস্বরূপ, তারপর আসে ঈশ্বরভাব সবশেষে পরমেশ্বর ভাবে এলে আপনস্বরূপে আপনিই মিলিয়ে যায়।

সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিম্নতম রূপ হল matter। অর্থাৎ অন্ন। অন্নময়রূপে প্রাণ থাকে সুপ্ত। প্রাণে প্রাণ স্বপ্নময়। এই স্বপ্নময় অবস্থা থেকে আসে বৃক্ষলতা। তারপরের স্তর হল স্বেদজ অর্থাৎ কৃমি জাতিয় পোকামাকড়। স্বেদজ এর পর অন্ডজ—ডিম থেকে যাদের জন্ম। অন্ডজ এর পর আসে জরায়ুজ—অথাৎ জঠর থেকে যাদের জন্ম। যেমন, মানুষ। স্থাবর অবস্থায় কাটে ৩০ লক্ষ বছর, জঙ্গম অবস্থায় ২০ লক্ষ বছর, স্বেদজ অবস্থায় ৮ লক্ষ বছর, অন্ডজ অবস্থায় ৯ লক্ষ বছর ও জরায়ুজ অবস্থায় ৪ লক্ষ বছর।

মনুষ্য জন্ম থেকেই সত্যস্বরূপ আবার তাঁর স্বরূপে ফিরে যান। মানুষকে স্বরূপে নিয়ে যেতে সত্যস্বরূপই আসেন সদ্‌গুরুরূপে। সদ্‌গুরু আলোতে মানুষের অন্তরতম কালো আলো হয়ে যায়। সদ্‌গুরু হলেন তেজস্বরূপ। জীবের মধ্যে প্রথমে তমোগুণের প্রভাব থাকে বেশি। ধীরে ধীরে রজোগুণের প্রভাব বাড়ে তারপর হয় সত্ত্বগুণের প্রভাব। জীবের জীবনে তারপর আসে শুদ্ধসত্ত্ব গুণের প্রভাব। জীব যখন গুণাতীত অবস্থায় আসে তখনই হয় তার সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। তিনিই বারে বারে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে সদ্‌গুরুরূপে এসে আত্মবোধের বিজ্ঞান প্রকাশ করে দিয়েছেন, অধিকারী বিশেষে। যোগ্য অধিকারী ছাড়া আত্মবোধের বিজ্ঞান কেউ গ্রহণ করতে পারে না।

আত্মবোধের বিজ্ঞানে প্রথম হয় দ্বৈতবোধের খেলা। তারপর আসে অদ্বৈতবোধ। অদ্বৈতবোধের পর শুদ্ধাদ্বৈতবোধ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবোধের কথাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নিত্যাদ্বৈতবোধের উপর আর কিছু নেই।

জীব নিজেকে দুর্বল, প্রকৃতির অধীন, জন্ম-মৃত্যুর অধীন মনে করে। জীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, আত্মজ্ঞান তাই আবৃত থাকে। দেহ হল জড় পঞ্চভূতের মিশ্রণে তৈরি। দেহ থেকে প্রাণ শ্রেষ্ঠ, তবে প্রাণও জড়। প্রাণ বায়বীয় তবে এটা একটা force। তাই প্রাণের শুভাশুভ জ্ঞান থাকে না। প্রাণ থেকে মন শ্রেষ্ঠ। মন হল energy। মন সৃষ্টি করে তার জগৎ। তাই মনে আছে সংশয়, শঙ্কা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। কিন্তু মনের বিচার শক্তি নেই। বুদ্ধির মধ্যে আছে বিচার শক্তি। বুদ্ধিতে হয় চৈতন্যস্বরূপের প্রতিফলন। বুদ্ধি হল চিদাভাস আর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধির আভাস হল প্রকৃতি।

সদ্‌গুরু তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে জীবের আত্মবোধের দ্বার খুলে দেন। গুরু আত্মবোধের বাণী দিয়ে জ্ঞানস্বরূপের বিজ্ঞান দ্বারা জীবের আত্মবিস্মৃত স্মৃতিকে জাগিয়ে দেন। সদ্‌গুরু হলেন—নিত্যবর্তমান। তিনি প্রকৃতি, দেশ, কাল, কার্য কারণ দ্বারা বিকৃত হন না। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, অখণ্ড। সবাইকে প্রকাশ করেন। তিনি ভূমা, তাঁর মধ্যে কোনও কিছুরই অভাব নেই। ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর সচ্চিদানন্দঘন সর্ববস্তুতে, সর্বপ্রাণেতে, সর্বস্থানেতে সমান ভাবে বর্তমান। তিনিই জীবনরূপ নিয়ে—জীবনের সাথে খেলছেন। এক দিকে তিনি নররূপে খেলছেন অন্যদিকে তিনিই নারায়ণরূপে খেলছেন। জীবের স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যে সাক্ষিরূপে তিনিই আছেন। জীবের দেহের পঞ্চকোষে, পঞ্চভূতে, তিন গুণে (সত্ত্ব, রজ ও তম), তিন অবস্থায় (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি), শৈশব, যৌবন বার্ধক্য সব সময়, সব অবস্থায় তিনিই স্বয়ং আছেন। নারায়ণের এই অস্তিত্ব

অনুমান সাপেক্ষ নয়। এটা direct knowledge—যা সদ্‌গুরু যোগ্য অধিকারীকে জানিয়ে যান। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান পাই, তা indirect—অনুমানসাপেক্ষ। গুরু প্রত্যক্ষ ভাবে বা direct স্বানুভূতির দ্বারা স্বানুভবদেবকে অভিন্নরূপে জানেন। অন্তরে স্বানুভবদেব জীবভাবের আবরণে আছেন—সেই আবরণ সরে গেলেই তিনিই স্বয়ং বর্তমান। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নেই।

সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যা-কিছু বলা হয় তা তাঁর স্বভাবের কথা। স্ববোধস্বরূপের কথা ভাষায় প্রকাশ্য নয়, অনুভূতিসাপেক্ষ। জীবের সত্ত্বগুণে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আবৃত। তার নানাত্ব-বহুত্বের মধ্যে আছে রজোতমোগুণের খেলা। সত্য হল সেই light যা দিয়ে এই তিন গুণের আবরণ ভেদ করে সত্যস্বরূকে প্রকাশ করে। Motion হল রজোগুণের, matter হল তমোগুণের। বুদ্ধিতে হয় সত্ত্বগুণের খেলা, মনে প্রাণে হয় রজোগুণের খেলা আর দেহে ইন্দ্রিয়ে হয় তমোগুণের খেলা। যার বক্ষে এই দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বা তিন গুণের খেলা, সেই চৈতন্যস্বরূপ হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ—শাশ্বত, সনাতন, অচ্যুত, নিরঞ্জন পরমপ্রেমাস্পদ—তিনি প্রিয়তমোত্তম। এই প্রিয়োতমোত্তম—যাঁর উপরে আর কেউ নেই, কিছু নেই। তিনিই আত্মা, পরমপ্রেমাস্পদ, 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং', তিনিই স্বানুভূতি লক্ষণা। গুরু স্বানুভূতি দিয়েই স্বানুভূতি জাগান, আত্মবোধ দিয়েই আত্মবোধ জাগান। সদ্‌গুরু ব্যক্তি হয়েও কিন্তু তিনি ব্যক্তি নন। জীবের অভাববোধ আছে আর অভাববোধ মেটাতে তার চেষ্টা আছে। আত্মা কিন্তু নিষ্ক্রিয়। আত্মাকে তমোগুণ ঢেকে রাখে, রজোগুণ তার উপর খেলা করে স্বপ্নালোকে। গাঢ় নিদ্রায় ত্রিগুণা প্রকৃতি অব্যক্ত থাকে। জীবনে জীবের তিন গুণের খেলার অবসান হলে বুদ্ধ মতে যা থাকে তা হল শূন্য। শূন্যকে দেখে সবাই ভয় পায় কোথায় এলাম, কোথায় যাব ভাব। কিন্তু স্বানুভূতির আলোতে সর্বশূন্যই সর্বপূর্ণ। শূন্যের সাক্ষিরূপে তুমি পূর্ণ। মানুষের ভোগেচ্ছা, কাম মানুষকে বস্তুর মধ্যে জড়িয়ে রাখে। বস্তুতে আনন্দ নেই—আছে আনন্দের reflection ভোগের মধ্যে, বস্তুর মধ্যে আমরা যা পাই তা আনন্দস্বরূপ নয়।

We know that we exist। এই থাকা এবং জানা অভিন্ন। থাকা বা existence হল পূর্ণ। আর জানা to know the existence হল শিক্ষা। শিক্ষা হলে সমতা আসে আর সমতা মানেই পূর্ণতা বা আনন্দ। তাহলে আনন্দের অন্তরায় হচ্ছে অনাদি মায়া অবিদ্যা, আপন প্রকৃতি ও ইচ্ছা। কিন্তু যিনি মুক্তপুরুষ তিনি desireless। তাই তিনি আনন্দময়। মুক্তপুরুষ-এর কোনও চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। তিনিই একমাত্র পারেন জীবভাবকে অনুশাসনের মাধ্যমে পূর্ণ বোধে প্রতিষ্ঠা করতে। গুরু হলেন light, তার আলোতে illumined হয় enlightened হয় জীব। আর সেই আলোই অজ্ঞানতার আবরণ সরিয়ে জীবকে কবে পূর্ণ মুক্ত। হীরার মধ্যে জ্যোতি থাকে। কিন্তু সেই হীরা যদি কাদামাটি মাখা থাকে তবে সে হীরার মধ্যে জ্যোতি প্রকাশ পায় না। আবার কাদামাটি সরিয়ে দিল হীরে আপসেই জ্বলজ্বল করবে।

যে পঞ্চকোষ (অন্ন, মন, প্রাণ, বিজ্ঞান ও আনন্দময়) দ্বারা এ দেহ গঠিত তার মধ্যে বুদ্ধি বা intellect-এর মধ্যেই আত্মার reflection বা চিদাভাস বেশি। বুদ্ধি থেকে আসে মনে, মন থেকে এই reflection হয় ইন্দ্রিয়তে তার থেকে আসে বস্তুতে। এই ভাবেই বিপরীতক্রমে আবার বুদ্ধিতে ফিরে যায়। মানুষ ও ঈশ্বর উভয়েই মায়ার সৃষ্টি। পরমাত্মা 'এক অহং বহু স্যাম' হলেন তখন ঈক্ষণ এর মাধ্যমে তিনি প্রথম ঈশ্বর হলেন। ঈশ্বর মায়াপ্রকৃতিযোগে সত্ত্ব ও রজোগুণের খেলায় হলেন জীব ও তমোগুণের প্রভাবে হলেন জগৎ।

মনুষ্য জীবনে জাগ্রত অবস্থা থকে মুক্তি পর্যন্ত পরমাত্মা আত্মারূপে থাকেন সাক্ষিচৈতন্যরূপে। চৈতন্যের জ্যোতির কোনও শেষ নেই। পৃথিবীতে আমরা যত আলো দেখি সবই conditioned। যে প্রকাশকে সে আলোকিত করছে তার থেকে সে ভিন্ন—তারও energy ফুরিয়ে গেলে সে আর আলো দিতে পারে না।

এক্ষুণি যে load shedding হল তাতে কি হল, temporarily বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হল। সূর্য যে সমগ্র পৃথিবীকে illumine করে সেও কিন্তু conditioned, প্রলয় কালে সূর্যও লীন হয়ে যাবে। আত্মার শক্তি ঈশ্বরের মধ্যে বেশি পরিমাণে আছে। তবে মানুষের হৃদয়ে যখন তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ হন তখন তাঁর জ্যোতি সূর্য থেকেও বেশি।

সদ্‌গুরু যা বলেন সবই direct from the source। এগুলো imaginary ও নয় intellectual ও নয়। এ সবই beyond our intellect অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে এর বিচার বা বিন্যাস সম্ভব নয়। তিনি পরমতত্ত্ব স্বরূপ। বহুযুগ আগে এই বিশেষ পূর্ণিমার দিন গুরুরূপে এসে এই পরমতত্ত্ব তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণিমা— পূর্ণ যে মা। অর্থাৎ মা যেখানে শক্তি বিভূতিতে পূর্ণ। যদিও পরের দিন তার কলা কম হতে থাকে—কিন্তু সদ্‌গুরুর জ্যোতির কোনও ঘাটতি হয় না। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কেন্দ্রকে ছাড়িয়ে তুরীয়তে থাকেন। বহির্জগতের cause and effect এর বাইরে না-গিয়েও তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। জগৎ তার কাছে একটা dot-এর মতো। আকাশে যেমন লক্ষ লক্ষ তারার dot কিন্তু কাছে গেলে এই এক একটি তারার মধ্যে কতগুলো পৃথিবী ভরে দেওয়া যাবে তার ঠিক নেই। আত্মাকে তেমনি অজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে সসীম জড়। কিন্তু চৈতন্যের দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র আছেন—তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। হরিই সব। হরি বিনে আর কিছুই নেই। আত্মস্মৃতি, হরিস্মৃতি আমরা ভুলে আছি বলেই আমাদের এত দুঃখ কষ্ট। সেই হরিস্মৃতি জাগ্রত করবার জন্যই গুরু মন্ত্র দেন—কাউকে হরিওঁ, কাউকে শিবওঁ বা কাউকে গুরুওঁ। গুরু শিষ্যের অতীত জানেন বলেই অতীত অতীত জীবনের সংস্কার অনুসারে গুরু মন্ত্র দেন যার যেটা প্রয়োজন। গুরুই আত্মা স্বয়ং, আত্মাই গুরু। তাই আমরা যে বলি 'আমার গুরু' তা না-বলে বলা উচিৎ 'গুরুর আমি'। এই জগৎ সংসার সবই শিশুর হাতের খেলনার মতো। খেলনা পেলে শিশু প্রথম তা নিয়ে খেলে পরে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে। তেমনি যেদিন আত্মার ডাক আসবে সব ফেলে তাঁর কাছেই সবাই চলে যাবে জগৎ সংসারের কথা ভুলেও মনে পড়বে না।

[১৪।৭।৯২]

তত্ত্ব প্রসঙ্গে বিশেষ কথা

সদ্‌গুরুর অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানই হল তত্ত্ব[১]। তত্ত্বই সত্যস্বরূপ। তত্ত্বই অমৃতপূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান। এখানে কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, জরা, ব্যাধি, আসক্তি ও বিরক্তি নেই—এ সব তো দ্বৈতের খেলা। যতদিন দ্বৈতবোধ ততদিনই জন্ম, মৃত্যু, জ্বালা ও যন্ত্রণা। একবার অদ্বৈতে বা তৎবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে সোঽহম্ বা অহংব্রহ্মাস্মি বোধ জাগ্রত হলে তখন আর অজ্ঞানজাত, বিকারজনিত কিছুই থাকবে না।

'গুরু বিনা নাহি মিলে জ্ঞান, জ্ঞান বিনা নাহি মিলে মুক্তি'— যিনি most sincerely অসত্যকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করেছেন, যাঁর সমস্ত রকম attachment—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বিষয় বা বস্তুর প্রতি একেবারে শেষ হয়ে গেছে, one who has got rid of all attachment i.e. totally dispassionate to the worldly affairs অর্থাৎ যাঁর সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উৎপাটিত হয়েছে, যাঁর আসক্তি controlled হয়েছে ও ভোগের সংযম হয়েছে—এমন একজন যিনি, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সেই গুরুর সঙ্গ একবার যে পেয়ে আবার ছেড়েছে তার মতো মূর্খ আর জগতে নেই। সে যেমন নিজেকে বঞ্চিত করল তেমনি অপরকেও mislead করবে। এমন লোকের সঙ্গ করতে নেই।

১। তত্ত্ব—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

ইচ্ছা নির্মূল হলে আর কোনও attachment থাকবে না। ভোগেচ্ছা দমনের একমাত্র উপায় হল গুরুবাণী। এখানে সব সময় বলা হয় মুখে নাম কর হাতে কাম কর। শয়নে স্বপনে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, জিহ্বা জপবে—'জয়গুরু জয় মা ওঁ ব্রহ্ম-আত্মা'। [১৫।৭।৯২]

আত্মদৃষ্টি ও অনাত্মদৃষ্টির পার্থক্য

'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের) কাছে সমস্ত মানুষরূপে তিনিই (Divine Self) আছেন। Same one Divine Self in human form—suffers and enjoys। কিন্তু মানুষ তো আর মানুষ নেই। কত নিচে পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। তাদের এখন no guide to support, no training and no education। মানুষ এখন sub-human nature-এ বাস করছে। যে শিক্ষায় সে মানুষ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অতিমানব, দেবমানব বা মহামানব হবে সে শিক্ষা কোথায়? তেমন গুরু কোথায়? মানুষ অর্থ হল 'হুঁশ কে মান' অথচ হুঁশ বা Consciousness-এর সাথে তার যোগই নেই। Consciousness-ই হল Reality, but Reality is not man's ideal now। পরমার্থ নয় অর্থই এখন সংসারী মানুষের একমাত্র কাম্য। কিন্তু অর্থ দ্বারা আরাম মিলতে পারে, যথার্থ সুখশান্তি কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে অদ্বৈত ভাবনা ছেড়ে দ্বৈত ভাবনা নিয়ে লোকে কোনও দিনই তাঁকে খুঁজে পাবে না। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—কোনও যোগই এ যুগে সুগম নয়। যখন যে যোগেব ব্যাপক ভাবে প্রয়োজন হয় তখন তার প্রচলন হয়। বর্তমান যুগ হল মানার বিজ্ঞানের যুগ। শুধু image-এর পায়ে ফুল দিলেই পূজা হয় না। পূর্ণতাকে জানাই পূজা[১]। পূর্ণতাকে জানা ও পূর্ণে প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র উপায় হল মুক্তপুরুষ বা সদ্‌গুরু বাণী। নানা উপাধি নিয়ে মানুষ নিজেকে সংসারে জড়িয়ে রেখেছে—নিজেই নিজেকে বদ্ধ করে আবার মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। উপাধিগুলি তো সে নিজেই নিয়েছে। এসেছিল তো একলা—নিজেই ইচ্ছে করে দোকলা তেকলা হয়েছে আর অশান্তির আগুনে জ্বলে জ্বলে শান্তির আশায় ছুটছে মন্দিরে মসজিদে তীর্থে। মন্দিরের পাষাণমূর্তির কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। 'কেউ আমার নয়, কেউ আমার ছিল না—হবেও না, আমি নিত্যকালের একলা'। আমি চিরকালই একলা। আমার কেউ নেই, আমি কারও নই, আমার কেউ হবেওনা—এই অদ্বৈত ভাবনাই শান্তির একমাত্র পথ।

[২৯।৭।৯২]

স্বানুভূতির তাৎপর্য

জীবনটা হল একটা imaginary expression আর Realization হল continuous revelation of Consciousness। Self-culmination-এর dictionary-গত meaning-এর সাহায্যে 'Realization'-এর মর্ম হৃদয়ঙ্গম হবে না। 'Realization' word-টির implied meaning সব সময়ই original। বই পড়ে যা জানা যায় তাতে থাকে subject-object division। মন সব সময়ই এই রকম objective perception-এ অভ্যস্ত। এটাই হল duality। বহির্জগতের কোনও কিছু জানাই হল duality-কে accept করা। Self-Realization-এ duality-র কোনও স্থান নেই। Realization is neither subjective nor objective but the essence of both। Self কখনই objectified হতে পারে না। কারণ নিজেকে তো নিজ থেকে আলাদা করা যায় না। Realization হল Knowledge in essence। সাধারণ মানুষ

১। পূজা—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

তাদের limited reflected knowledge দিয়ে তা বুঝতে পারবে না। এর জন্য চাই একজন সদ্‌গুরু বা a perfectly realized person। একমাত্র তাঁর বাণী ও তাঁর কৃপাতেই Realization-এর অর্থ পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে।

Duality থাকলে Self-Realization কোনও দিনই আসবে না। নিজেকে subject করে even God-কে object করে পেতে চাওয়া তো illusory। কারণ যার nature non-duality তাকে duality দিয়ে কী করে ধরা যাবে। You are the Absolute whole–totality of the whole, any contradiction or unliken, unpleasant event আসলে যদি clash হয় তাহলে তো non-dual character ভঙ্গ হয়। কারণ Reality-তে পছন্দ-অপছন্দের কোনও স্থান নেই। In reality there is no place of heterogeneous nature, it is solely homogeneous in nature. You are Knowledge Absolute, Bliss Absolute and Peace Absolute. Eternal meaning of which is—you are the only Reality and a continuous process and can never be divided by the cause and effect। তুমি নিত্য ছিলে, নিত্য আছ, নিত্য থাকবে। প্রশ্ন হতে পারে change তো হচ্ছে। হ্যাঁ change হচ্ছে তোমার possessive nature-এর, তোমার character বা স্বভাবের, কিন্তু যে background-এর উপর তোমার এই অস্তিত্ব, সেই background Consciousness is eternal, unchangeable and constant. Knowledge Itself is always in the background and not in the foreground। Foreground-এ চলে intellect বা বুদ্ধির খেলা। Intellect-এ doubt delusion হবেই। তাই intellect সবসময়ই deluded। Reality-তে doubt-এর কোনও স্থান নেই। একবার যার Self-Realization হয় সে আর ফিরে আসে না। বলা হয় আত্মসূর্য একবার উদিত হলে আর অস্ত যায় না। অবশ্য Realization-এ তুলনা মূল্যহীন। There is none other in Reality। এই non-duality-ই হল অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদে আসতে যেমন গুরুর শরণাগতি একান্তই জরুরী, তেমনি অদ্বৈতবাদের উপর যে 'নিত্যাদ্বৈতবাদ'-এর কথা এবার বলা হচ্ছে তা একমাত্র গুরুকৃপা ছাড়া পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

স্বকল্পিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিভ্রান্ত জীবন আত্মজ্ঞগুরুর সাহায্যেই আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়

দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদে আসতে প্রচুর preparation-এর প্রয়োজন। Without preparation ideas will be confused and perverted। মনকে তৈরি করতে হবে। তার জন্যই চাই একজন সদ্‌গুরুর শিক্ষা। Doubt and delusion সব সময় মনকে disturb করে। তাই এই পথে এলে খুব সাবধানে থাকতে হয়। গুরুর প্রতি doubt, delusion এলে গুরু থেকে disconnected হয়ে যাবে। অবশ্যই গুরু কাউকে disconnect করেন না। তুমি নিজেই সরে যাবে। আর একবার গুরুর কাছ থেকে সরে গেলে আর কাছে আসা যাবে না।

গুরুকৃপা ছাড়া আত্মজ্ঞান জাগে না। যদি কারও ছলে বলে কৌশলে আত্মজ্ঞান জেগেও যায় তা স্থায়ী হয় না—Until you are recognised by a realized person, you are not a realized one।

নিজের থেকে অপরকে, অপর থেকে নিজেকে আলাদা ভাবাই হল দ্বৈতবাদ। এখানে যে 'নিত্যাদ্বৈতবাদ'-এর কথা বলা হয় তাতে দ্বৈতের কোনও গুরুত্ব নেই বলে তাতে দ্বৈতের কোনও স্থান নেই। এখানে শুধুই এক-এর কথা—কোনও দল, মত, পথের কথা নেই। Duality নেই সুতরাং কে কার কথা বলবে? তাইতো এখানে বারবার বলা হয় 'এ' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কারওর গুরু নয়, কেউ 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের) শিষ্যও নয়। ভেদজ্ঞান থাকলেই তো গুরুশিষ্য হবে। যাঁর কোনও ভেদজ্ঞান নেই, যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে

দেখে না, তাঁর আর কোথায় শিষ্য, কোথায় গুরু? তবে জ্ঞান যাদের আবৃত তাদের গুরু করার প্রয়োজন আছে। Realizer-এর সাধনভজনের প্রয়োজন নেই কিন্তু intellectual-দের প্রয়োজন আছে।

Realization হল 'বোধের বোধ'—'বোধে বোধে বোধময় তারে স্বানুভূতি কয়'। এসব word-এর কোন substitute নেই। আত্মা তুমি স্বয়ং। এই তুমি তোমার অন্তঃস্থিত তুমি—যে কোনও কালে, কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। বাইরের সবাই তো মোমের পুতুল, অন্তরে জ্ঞানাগ্নির সংস্পর্শে এলে গলে যাবে। Constant আত্মজ্ঞগুরুর সঙ্গ করলে এবং গুরুর নির্দেশ মতো চললে গুরুর কৃপায় সমাধির অতল তলে তলিয়ে গিয়ে তোমার আত্মবোধের দর্শন অবশ্যই পাবে। কিন্তু গুরু থেকে disconnected হলে বা গুরুবিদ্বেষী হলে আবার মনের দাস হয়ে যাবে। শয়তান মন আবার গ্রাস করবে তোমাকে। ঠিক যেমন গঙ্গাস্নানে নামবার আগে মনভূত চলে যায় গাছের ডালে আবার স্নান থেকে উঠে এলেই ঝুপ করে ঢুকে পড়ে দেহের ভিতরে। যতদিন মনের অধীন ততদিন nature-এর অধীন আর ততদিন Knowledge Absolute, Bliss Absolute and Peace Absolute থেকে দূরে। [৫।৮।৯২]

স্ববোধ ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য

নিজের কাছে নিজেই হল নিকটতম অস্তিত্ব। কিন্তু মানুষ আপন অন্তর ছেড়ে অনেক দূরে ঘুরে বস্তু জগৎ নিয়ে মাতামাতি করে। নিজের দিকে, অন্তরের দিকে ফিরে তাকাবার তার সময় নেই। মানুষ ব্যাপৃত থাকে তার স্বভাবের রাজ্যে, বহিঃপ্রকৃতি নিয়ে। স্ববোধের রাজ্যে, যা হল তার একান্ত আপনতম, তার হৃদয়গুহা, তার কাছাকাছি হতে পারে না। হৃদয়গুহা হল এক ভাবের বা সমভাবের বলয় বা কেন্দ্র। এই একভাব থেকে বেরিয়ে এলেই পা দেবে স্বভাবের রাজ্যে। স্বভাবের রাজ্য হল বৈচিত্র্যময় জগৎ, রূপ-নাম-ভাবের স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ। রূপ-নাম-ভাবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর—তিনটি করে stage আছে। এতগুলি stage পার হয়ে একমাত্র অনুভবসিদ্ধ ছাড়া আর কারও পক্ষেই হৃদয়গুহায় এক-এর বলয়ে প্রবেশ করা সুসাধ্য নয়। এই এক ভাববোধের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার জন্য গুরুবাণীই একমাত্র পথ।

শ্রুত বিষয়কে ধারণ করে রাখার শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে। আবার শ্রুত বিষয়কে নিজের জীবনে ব্যবহার করার শক্তি জন্ম জন্মান্তরের preparation না-থাকলে হয় না। তার জন্য চাই মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য। সহজ কথায়, চিন্তা ও বাকের সামঞ্জস্য। সাধারণ মানুষের মন, প্রাণ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য থাকে না। যখনই মন-প্রাণ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধিত হয় তখনই হয় সমাধি। সাধনার উচ্চতম স্তর হল এই সমাধি। মন যখন স্বস্বরূপ আত্মার খুব কাছাকাছি আসে তখনই সে সমাধির অতলে ডুবে যায়। অন্তরের অন্তরতম সেই শান্তিপ্রদ, মুক্তিপ্রদ, নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরলম্ব, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংপূর্ণ যিনি অর্থাৎ যিনি কোনও কিছুর মিশ্রণ ছাড়াই নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন অর্থাৎ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আপনা আপনি প্রকাশিত, সেই অন্তরতম আপনই হল আপনার একান্ত নিকটতম[১]।

বহির্জগতের রূপ, নাম, ভাব ও বোধের চারটি স্তরের—স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত বা তুরীয়র ব্যবহার মাধ্যম হল অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। অজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানকে (জ্ঞানাভাস), জ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান দিয়ে প্রজ্ঞানকে জানা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞান দিয়ে বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানাভাসকে এবং জ্ঞানাভাস দিয়ে অজ্ঞানকে জানা যায়। প্রজ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই

১। নিকটতম—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

থাকে না। এখানে 'সর্ববিদ্যামেকায় নমেব'— সর্ববিদ্যার সমগতি, সমস্থিতি ও সমপ্রীতি হয় হৃদয়গুহায়—যা হল আত্মার ভূমি, কূটস্থচৈতন্য বা সাক্ষিচৈতন্যের অধিষ্ঠান। সেখানেই হয় শিবগুরুর সাথে পরিচয়। আত্মা ও আত্মগুরু অভিন্ন। আত্মগুরুই মনুষ্যবেশে এসে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করে আবার আত্মার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যান। স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মগুরুর কৃপা পাওয়া যায় চারভাবে—আশিস্, কৃপা, করুণা ও অনুগ্রহ।

বুদ্ধিকে মার্জিত করে বোধস্বরূপে নিয়ে যাওয়া কল্পনা নয়। বোধস্বরূপকে পাওয়ার সাধনাই হল কল্পনা। তিনি অচিন্ত্য—চিন্তা দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায় না তিনি কখনও আলোচনার বিষয় হতে পারেন না। 'অচিন্ত্যখলু যে ভাবা, ন তর্কেন যোজয়ৎ'—তর্কের বিষয় করে নয়, আলোচনার বিষয় করে নয়, ব্রহ্মের ব্যাখ্যা একমাত্র মৌনতা দ্বারাই সিদ্ধ। আত্মগুরু নির্বিকার ও একাকীত্বের ও মৌনতার ভাষাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে পারেন। তাই তিনি বলেন—'অতি বাচাম্ বিগ্লাপণম্'—অবান্তর আলোচনা মনকে বিভ্রান্তই করে। তাই মনকে আত্মগুরু নির্দেশিত পথে চালাতে আজেবাজে কথা একদম বাদ দিতে হবে।

চতুর্বিধ গুরুর মহিমা

গুরু চার স্তরের—মহাগুরু, পরমগুরু, পরাপরমগুরু ও পরাৎপরমগুরু। মহাগুরু স্থূলজগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। পরমগুরু জগতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম nature সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দেন। স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত যে কারণ ও কারণাতীত স্তর তার সম্পর্কে যিনি জানান তিনি হলেন পরাপরমগুরু বা আত্মগুরু। আত্মগুরুর দ্বিতীয় রূপ হল পরাৎপরমগুরু। তিনি আত্মার পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করেন স্ববোধ বা আপনবোধের উৎকর্ষের মাধ্যমে। তা অতীব নিগূঢ় তত্ত্বের বিজ্ঞান বলেই একে গুহ্যতম বলা হয়। মহাগুরু ও পরমগুরু স্থূল, সূক্ষ্ম জগতেই যুক্ত থাকেন। Exceptional case থাকে দু' একটা। যতই না তারা সাধুসন্তের বেশ ধরে ঘুরে বেড়াক, মন তাদের পড়ে আছে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিয়ে। তার ঊর্ধ্বে তারা উঠতে পারে না। জাগতিক দাবি এবং সাধ থাকলে সাধু হওয়া যায় না। এ পথ হল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' এ পথে আসতে হলে সমস্ত ইচ্ছা, desire, will-কে ছাড়তে হবে। এমনকি মুক্তির ইচ্ছা, শান্তির ইচ্ছা এ সবও রাখা চলবে না। এ পথে intellectual arguments-এর কোনও স্থান নেই। কারণ আত্মবোধে দুইয়ের কোনও স্থান নেই। 'এক তো একেবারেই এক।' এই আত্মবোধের খেলা হৃদয়ক্ষেত্রেই শেষ হয়। হৃদয়ের কেন্দ্রে গিয়ে পূর্ণ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

মন সব সময় স্থূল রূপের পিছনে ছোটে। নামের রূপ, ভাবের রূপ, বোধের রূপ আলাদা আলাদা। কিন্তু বোধের ঘরে নাম, রূপ, ভাব, বোধ identical। রূপের ঘরে রূপ, নাম, ভাব, বোধ সবই gross। রূপের ঘরে চৈতন্য gross-রূপেই প্রতিভাত হয়। চোখ রূপ নেয়, কান রূপ নয়, শব্দ গ্রহণ করে। নাক আবার রূপ বা শব্দ নেয় না, নেয় গন্ধ। ইন্দ্রিয়দের এরূপ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদিত হয় মন দ্বারাই। মন না-থাকলে কোনও ইন্দ্রিয়ই কাজ করতে পারে না। মন না-থাকলে তাই দেহাত্মবুদ্ধিই থাকে না। তাই মনকে বলা হয় শয়তান। এই শয়তানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়গুহায় প্রবেশ করা সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কখনওই সম্ভব নয়। কান্তকবির ভাষায়—'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।' এ সংসারে আত্মা পরমেশ্বর ভিন্ন আপন তো আর কেউ নেই। অথবা বলা যায়—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর' 'প্রিয়তম হে প্রিয়তম'। এই সদ্‌গুরু হলেন—Pure Consciousness। যদিও তাঁকে ধরবার সুবিধার জন্য universalized বোধে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু Consciousness-এর কোনও object বা predicate হয় না। Predicate দিলেই আর Pure থাকে না। সদ্‌গুরু হলেন শুদ্ধবোধস্বরূপের পাগল। বোধ ছাড়া তাঁর আর কিছুই নেই। স্থূল পাগল

সবাইকে কষ্ট দেয়। কিন্তু যিনি বোধের বোধ, আত্মজ্ঞানে আত্মবোধে আপনি মগন থাকেন, বাইরের বৈচিত্র্য তাঁকে কোনও ভাবেই স্পর্শ করতে পারে না। তিনি হলেন আসল পাগল। তাঁর (Goal) গোল পাওয়া হয়ে গেছে অর্থাৎ যার পা গোল হয়েছে। ভক্ত তাই ভাবে—

কবে সেদিন আসবে আমার
আমি আপনবোধে থাকব মগন
আপনবোধ ছাড়ব না।

'তোমার বোধে হলে মগন আমার বোধ থাকবে না'। গুরু বলেন—ব্যস্ত হোস না। প্রাণ ভরে, মন দিয়ে শুনে যা। আপনা থেকেই সব আসবে। বাড়াবাড়ি করিস না। অল্প কিছু পেয়ে তাই নিয়ে আত্মহারা হয়ে গুরুর উপর খবরদারী করে সব হারাস না। Once a man becomes ungrateful to his Guru, no other Guru will take charge of him. unless the same Guru forgives him and takes him back as his disciple। এখানে তাই প্রথম থেকেই বলা হয়েছে দীক্ষা যারা নিয়েছে তারা আর ভোগের পথে পা দিও না। অহংকার বাড়িয়ো না, অহংকার ছাড়। জীবনে সুযোগ বারবার আসে না। বলা হয়, ৮৪ লক্ষ যোনি ভেদ করে মানুষ আত্মস্বরূপে বা স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতি চার লক্ষ বছর পর পর change হয়। তাই বলা হয় একবার chance পেলে তার best utilization কর— হেলায় নষ্ট করলে সেই সুযোগ আবার কবে পাবে তার আর কোনও ঠিক নেই।

তর্ক নয় প্রশ্ন নয়—be absolutely free from duality and relativity—thou art veriiy that—neither a man nor a God—you are beyond creation, space, time and causality, free from senses—inner or outer, beyond any doer, did and done বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান। আত্মগুরু তোমাদের elevate করার জন্যই বাণী দেন। তাঁকেই ধরে থাক। বাণীই মন্ত্র, যে মন্ত্র তোমাকে ত্রাণ করবে এবং পৌঁছে দেবে সেখানে— যেখানে 'অপ্রাপ্য মনসা সহ যত বাচা নিবর্ততে' অর্থাৎ এ হল এমন জায়গা যেখানে বাক্য মন প্রবেশ করতে পারে না। [১২।৮।৯২]

তত্ত্বস্বরূপই হল জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপই হল প্রজ্ঞানস্বরূপ, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম-আত্মা

জ্ঞানসাগরে জ্ঞানের লহরী নৃত্য করে আবার জ্ঞানের বক্ষেই মিলিয়ে যায়। এখানে দু'য়ের কোনও স্থান নেই। ইন্দ্রিয় বহির্জগৎ থেকে বিষয় সংগ্রহ করে ভোগের জন্য তা মনের কাছে পাঠায়, মন পাঠায় তা বুদ্ধির কাছে বিচারের জন্য। তারপর মন ও বুদ্ধি তা ভোগ করে। মন ও বুদ্ধি দেবতাও নয় real-ও নয়—reflection of Consciousness মাত্র। কিন্তু Consciousness বা বোধের ঘরে আছে শুধুই বোধ। সব সেখানে বোধে বোধময়। বোধসাগরে বোধের লহরী ওঠে আবার বোধেই মিলিয়ে যায়। 'বোধসাগরে বোধের লাগিয়া' গানটি যার মধ্যে বসে গেছে তার আর জীববৃত্তি থাকতে পারে না। কাজেই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এবং প্রকৃতি—এই আটটির (অষ্টবিধা প্রকৃতির) পিছনে যে প্রভু যে বিভু আছেন তাঁকে তোমরা যে নামেই ডাক না কেন, তাঁকে ইন্দ্রিয়ের অধীন করে সসীম করো না। বরং তাঁর চরণে তোমাদের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ আহুতি দাও। ইন্দ্রিয় দেয় মনেতে আহুতি, মন দেয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধি দেয় প্রকৃতিতে আর প্রকৃতি আহুতি দেয় পরমপুরুষের পায়ে। অথচ তোমরা, যিনি অন্তর জুড়ে আছেন তাঁকে সেখানেও পাও না, আবার যিনি বহিঃপ্রকৃতি জুড়ে আছেন তাঁকে সেখানেও পাও না। তাঁকে পাবার একমাত্র পথ হল সদ্গুরু শরণ। তিনিই গুরুবেশে এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা—'হাত ধরে এসে নিয়ে যাও আমি তো পথ জানি না, লক্ষ্য চিনি না। তুমিই লক্ষ্য, তুমিই উপায়, তুমিই সহায়, তুমিই সর্বসমাধান।'

গুরু ব্যাক্‌টেরিয়ার মতো ভক্তের ভিতরে প্রবেশ করে ভক্তের সব আধি ব্যাধি নাশ করে অধিযজ্ঞরূপে প্রকাশিত হন। তাঁর আশিস্, কৃপা, করুণা, অনুগ্রহ বা অনুকম্পা ভক্তের অন্তরের আধিভৌতিক, আধিদৈবিককে নাশ করে ভক্তকে আপন করে নেন। আশিস্, কৃপা, করুণা ও অনুগ্রহ—এই চতুর্বিধ ভঙ্গিমায় ঈশ্বর আত্মগুরুর স্বরূপমহিমা ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। চার সংখ্যার মাধ্যমে ঈশ্বরাত্মাব্রহ্মের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি হয় বলে ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বলা হয়। এই চারের গুরুত্ব অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই চারের মাধ্যমে বোধস্বরূপের অভিব্যক্তি বিশেষ ভাবে বোঝান হয়েছে। এ হল মাছের চার। চার না-পেলে বড় মাছ আসবে না। বড় মাছ ধরতে চার চাই-ই চাই। বড় মাছ হল আত্মজ্ঞান, তার চার হল—আশিস্, কৃপা, করুণা, অনুকম্পা। আত্মজ্ঞানের উদয়ে সব তোলপার। তার জন্য অহংকারকে ফেলতে হবে অহং যাঁর তাঁরই চরণে। অহংকার হল মোহ। মোহ কেন্দ্রবোধের দৃষ্টিতে হোম। মোহকে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করলে হোমই হয়। আত্মজ্ঞানই যজ্ঞ; তাতে আহুতিই হল অহংকার। [১৯।৮।৯২]

স্বজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত সংজ্ঞা

'পরি' মানে শ্রেষ্ঠ। 'পরিচয়'[১] হল— শ্রেষ্ঠের স্মরণ করে শ্রেষ্ঠের ব্যবহার। সেই জন্যই যাতে ভুল না-হয় কিছু পুরাতন শাস্ত্রমন্ত্রের বিকল্প বা নূতনরূপ দেওয়া হয়েছে। কারণ ব্যবহারদোষে এই সব মন্ত্রের মধ্যে কিছু বিকৃতি এসে যাচ্ছে। যেমন গুরুগীতার একটি শ্লোক—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বর্তমানে এই শ্লোকটি নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আমার গুরুই জগৎগুরু, আমার নাথই জগন্নাথ—এই অর্থ প্রতিপন্ন করে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ঝগড়া, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে।

একবার কোনও এক সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ভজন অনুষ্ঠানে 'একে' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে) নিয়ে যায়। বিশাল মাঠে সমাবেশ। একপাশে ভজন চলছে। 'এ' একটা আসনে উপবিষ্ট প্রায় সমাধিমগ্ন অবস্থা। হঠাৎ কানে এল ভক্তরা সুর করে উপরোক্ত শ্লোকটি গাইছে। একটা ধাক্কা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে থামানো হল, বলা হল এই ভাবে বল—

শ্রীজগন্নাথো মন্নাথঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ মদ্‌গুরুঃ
সর্বভূতাত্মা মদাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

তারপর—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

একথা শুনে তাদের অনেকেই খুব ক্ষুব্ধ হল। বললে আপনি কী সনাতন শাস্ত্র উল্টে দিতে চাইছেন। বলা হল—ধর্ম কোনও গোঁড়ামি নয়, fanaticism নয়। তোমরা mechanically ধর্মের অভ্যাস করে চলেছ মাত্র। এতে কী তোমাদের পরিবর্তন হয়েছে, না কাউকে নূতন কিছু দেখাতে পারছ। নিজের ত্রুটি নিজেরা শোধন করতে না-পারলে তো অভিজ্ঞতার জ্ঞান বাড়বে না। অভ্যাস দিয়েই মানুষের জীবন গড়া। বিকৃত অভ্যাসে জীবনের মল তৈরি হলে আবার উন্নত সদভ্যাসের মাধ্যমে ও অভ্যাসের পরিবর্তন দ্বারাই শোধন করতে হয়

১। পরিচয়—অভিনব সংজ্ঞা।

সেই মল। স্বভাব চলে তিন গুণ নিয়ে—সত্ত্ব রজ ও তম। জীবনে তমোরজোগুণের প্রভাব বাড়ে অভ্যাসের মাধ্যমে আবার সত্ত্বগুণের সাহায্যে অভ্যাসের পরিবর্তন করে জীবনের তমোরজোগুণের প্রভাব কাটিয়ে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। স্বভাবকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। তার উপরে আছে শুদ্ধসত্ত্ব। যেমন ভেজা কাঠ সহজে জ্বলে না। আগুনের পাশে থাকলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধোঁয়া বের হয়। তারপর তাতে আগুন জ্বলে। তেমনি তোমাদের তমোরজোপ্রধান জীবনে জ্ঞানাভাসই ঢুকতে পারে না তো শুদ্ধ জ্ঞান ঢুকবে কী করে? তবে ধৈর্য ধরে অভ্যাস ও ব্যবহার পরিবর্তন করলে তাও সম্ভব হবে।

গরু যেমন আহার পরিপূর্ণ ভাবে গলাধঃকরণ না-করে গলদেশের এক প্রান্তে গলস্থলীতে জমা রাখে এবং বিশ্রামকালে রোমন্থন করে তবে পাকস্থলীতে পাঠায়। তোমরাও তেমনি দিনের পর দিন যা-শুনছ তা মনন কর। মনন হল জাবর কাটা। এখন তোমরা গরুর সঙ্গেই তুল্য হবে গুরুর সঙ্গে নয়। অনেকে অবশ্য নিজেকে গুরুর সঙ্গে তুলনা করে ভুল করে। তোমরা গুরুবাণী চয়ন করে মনন করে তা জীবনে ব্যবহার করার অভ্যাস কর। Make yourself alert and conscious—নিজের দোষ-ত্রুটি নিজেই শোধন কর। গুরু তোমাদের light দিচ্ছেন। সেই light-এর wrong use করে নিজের ক্ষতি করো না। Right use of all that you know and know not —এটাই হল ধর্ম। নিজেকে জীবনে according to the words of Sadguru চালিত কর। জীবনবীণাকে গুরুবীণার অনুরূপ সুরে বেঁধে নাও। যদি প্রতিদিন একটু একটু করেও এগিয়ে যাও তাহলেই একদিন নিজেকে তৈরি করতে পারবে। তা না-হলে সব কিছুই বেসুরো বেতালা হয়ে যাবে। জীবনের তারে মরচে পড়ে যাবে। একটা সাধারণ তানপুরার চারটি তারকে সুরে বাঁধা কত কষ্টকর। প্রথমে লাগে হারমোনিয়াম, তারপর সুরে বাঁধা chord নামে একটা যন্ত্র। তাতেও হতে চায় না। কিন্তু যার কান তৈরি হয়ে গেছে তার এ সব কিছুই লাগে না। একবার তানপুরার কান মলেই সে সব সুর ঠিক করে নিতে পারে।

স্বভাব যদি শুদ্ধ না-হয় তার মধ্যে গুরুবাণী প্রতিফলিত হতে পারে না। গুরুবাণী সর্বশক্তিমান। He has thc power to control and power to shower grace. The Greatest God dwells in your heart. It is your mind which destroys you মন বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে তোমাকে বহির্মুখী করছে—আর কিছুতেই অন্তর্মুখী হতে দিচ্ছে না। স্বভাবকে শুদ্ধ করতে মনকে অন্তর্মুখী হতেই হবে। স্বভাব শুদ্ধ হবে তখনই যখন সব গুণের শোধন হবে। তম রজ ও সত্ত্বগুণের যত বিকার আছে তা শোধন করতে হবে। এখনই না-করলে আর পরে হবে না। তখন তো আর গুরুকে পাওয়া যাবে না। স্মরণ করে তো আর সাক্ষাতে এই রকম ভাবে পাওয়া যাবে না। গুরু হলেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি। তাই গুরুকৃপা বাছবিচার করে বর্ষিত হয় না—পাপী, তাপী, ভোগী, ত্যাগী, কেউই তার থেকে বাদ যায় না।

আত্মা বিভক্ত হয় না। বিভক্ত হয় অহংকার। অহংকারের যত ভাগ তত বিকার। প্রত্যেক ভাগের সাথে যত বিশেষণ লাগান হচ্ছে, যত গুণযুক্ত করা হচ্ছে ততই আত্মা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মন তত বিকারযুক্ত হয়ে পড়ছে। মনকে বিকারশূন্য করতে হলে চাই গুরুবাণী মননের অভ্যাস। বিচারশূন্য ভক্তি বা জ্ঞানশূন্য ভক্তি আসক্তি ও বিকার। এই বিকার শোধনের জন্য চাই পূর্ণ জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের জন্যই তোমাদের সাধনা। 'আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও দেবতা নেই', 'আত্মজ্ঞান অপেক্ষা কোনও জ্ঞানও নেই'। সাধনার শেষে সদ্‌গুরুই তা জানিয়ে দেন। যদিও সাধারণ গুরুরা বিশেষ বিশেষ দেবতার সন্ধান দেন। Particular unit of Consciousness is deity। এরা সবাই subordinate deity—titular God । এই সব Providential agent-রাই আনেন division। ফুলচন্দন দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তারা সবাই প্রকৃতির অংশ—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী। যেমন অজ্ঞানকে বাদ দিয়ে

জ্ঞান নয় তেমনি অলক্ষ্মীকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মী নেই। তাই বলে জ্ঞানকে বাদ দিয়ে অজ্ঞানের পিছনে ছুটবে তা তো হয় না। জ্ঞানস্বরূপকে পেতে তাই মনকে অজ্ঞান, অবিদ্যা, অনাত্মা থেকে সরে কেন্দ্রে fixed হতে হবে। মনকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করাই দুঃসাধ্য। মন হল শয়তান, মায়া। মনকে প্রশ্রয় দিলে গুরুবাণী কোনও দিনই ধরে রাখতে পারবে না।

স্বভাব ছেড়ে যখন স্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আপনাতে আপনিই মিশে যাবে। গুরুও তখন তোমাতে মিশে যাবেন। কারণ গুরু'ই হলেন স্ববোধ। সদ্‌গুরু যিনি, মুক্ত যিনি তাঁর কাজই হল সদা ভগবৎগুণ কীর্তন করা। কিন্তু সদ্‌গুরুর গুণ সংসারী গায় না। তাঁর কাছ থেকে সুবিধা নেবার বেলায় submissive হয় কিন্তু পরে হয় aggressive! [২৮।৮।৯২]

স্বকল্পিত মানসকামনাই আত্মবিস্মৃতির কারণ

আপনার মুক্তস্বরূপ আপনার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অনুভব করতে না-পারার মতো দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? এই যে এখানে যাদের শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে তা ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞগুরুর ইচ্ছা ছাড়া এ যোগাযোগ হতে পারে না।

মানুষের যত কষ্ট দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক—সকল দুর্ভাগ্যের কারণ হল তার মন ও তার অতীত অতীত জন্মের সংস্কার। এই বিকার থেকে উদ্ধারের জন্যই মুক্তপুরুষের সান্নিধ্য পাওয়া ও তাঁর উপদেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। দেহাত্মবুদ্ধির, প্রকৃতির ভোগের মজা মানুষ বেশি দিন ভোগ করতে পারে না। এই সুখভোগ ক্ষণিকের এবং তারপর বিকার আসবেই। আর এই বিকার থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল সদ্‌গুরু নির্দেশিত ইষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস পাকা করে নেবার অভ্যাস করতে পারা। একমাত্র সদ্-অভ্যাসযোগেই বিকার থেকে মুক্ত হয়ে যোগ্য অধিকারী হয়ে যাওয়া যায়।

বুদ্ধিকে যে পরমবোধের সাথে মিলিত করে থাকতে পারে সদ্‌গুরুর কৃপায় সে-ই তো পরমসাধক। নিজেকে সদ্‌গুরুর স্তরে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে নামিয়ে আনতে চায় নিজের কাছেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ পাতাতে চায়—এই সব তার ভ্রান্তিরই নমুনা। ঈশ্বরকে নিজের কাছে নামানো নয়, নিজেকে ঈশ্বরের স্তরে তুলতে হবে আত্মজ্যোতিকে জাগানোর জন্য। অলব্ধ বস্তুতে লব্ধবোধ জাগাতে হবে।

'সতত প্রাপ্ত আত্মা অপ্রাপ্ত হি অবিদ্যয়া'—আত্মাকে বিষয়বস্তুর মতো প্রাপ্তব্য মনে হয় অবিদ্যার জন্য। আর তার জন্য মনের উপর যত মলাবরণ সৃষ্টি হয় তা দূর করাই হল সাধনার উদ্দেশ্য। যা নেই তা পাবার জন্য তৃষ্ণা, আত্মাতিরিক্ত বস্তুকে পাবার ইচ্ছা—position, money, যশ, খ্যাতি— এসবই হল false idea। আত্মাকে খোঁজবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি তাঁকে ভুলে আছ স্মরণ করার চেষ্টা কর। বারবার সাবধান করা হয়—যে বিজ্ঞান শোনবার সুযোগ পেয়েছ তাতে pitfall হলে, দ্বিতীয় বার আর সুযোগ পাবে না। আর সদ্‌গুরুর সন্ধানও পাওয়া যাবে না। বহুকাল অসৎসঙ্গে কাটিয়ে কবে আবার সুযোগ আসবে তা আর কে বলবে? কথায় বলা হয় 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। এই সৎ হল নিত্য সৎ যা বিকারমুক্ত। আর অসৎ হল যা সৎ-কে আবৃত করে থাকে। সৎ ও অসৎ যেন দুই সতীন। তাই বলা হয়— 'দুই সতীনে ঘর করি—আমি বুঝি না পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, তাই আমি যাই গুরুর ঠাঁই। যাঁরে নিত্য করলে স্মরণ আমি পাব অমৃতত্বে ঠাঁই।' সাধারণ মানুষ এ সব বোঝার চেষ্টা করে না। সে অমৃতস্বরূপকে ভুলে দেশ থেকে দেশান্তরে, ভাব থেকে ভাবান্তরে, নাম থেকে নামান্তরে so called প্রিয়জনের চিন্তায় জন্ম জন্ম কাটিয়ে

১। গুরু—অভিনব সংজ্ঞা।

চলেছে। বর্তমান জন্মও চলে যাচ্ছে তবু আপন পরিচয়, পরমাত্মার কথা একবারও মনে হয় না। তাঁকে খোঁজ করবার চিন্তা একবারও মনে আসে না। আসে না আপনকে চিনবার ও জানবার ইচ্ছা। তোমার আপনতো একজনই। যিনি নিত্যপূর্ণ—যাঁর সঙ্গে তোমার নিত্য অভেদ সম্পর্ক। সে তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার বা প্রকৃতি নয়, সে তোমার আত্মা—তোমার আপনের আপন, সে তোমার স্বস্বরূপ স্বয়ং।

তোমরা এখানে এসেছো—দিনের পর দিন তোমাদের আত্মকথা শোনান হচ্ছে। গুরু যে-ভাবে বলেন সে-ভাবে চলতে শেখো। সে-ভাবেই অভ্যাস করো। গুরু যাতে প্রীত হন তাই করো। গুরু রুষ্ট হলে আর রক্ষা নেই। গুরুর অভিশাপ নিয়ে জন্ম জন্ম কেটে যাবে। গুরু যতদিন না প্রীত হয়ে অভিশাপ মুক্ত করেন ততদিনই চলবে এই ভোগময় জীবন।

সত্যের কোনও প্রতিরোধ নেই। যার প্রতিরোধ নেই সেই spontaneous স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ। তোমাদের বলা হয়েছে—তোমরা যে যেখানে যে-ভাবে থাক এক চিন্তা মনে রেখো—মা, ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, গুরু সবই এক-এরই অর্থাৎ আপনেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা ব্যবহার। আর তাঁকেই যখন ব্যক্তিরূপে আমাদের মধ্যে পাই তখন তিনিই সদ্‌গুরু, যেমন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিষ্ট, মহম্মদ ইত্যাদি। মহম্মদ ব্রহ্ম আত্মা শিব রাম কৃষ্ণ থেকে আলাদা নন। যিনি বহুবার সদ্‌গুরুরূপে এসেছেন মহম্মদ তার অন্যতম।

বলা হয়, প্রতিদিনের কাজ শুরু করার আগে তাঁকে স্মরণ কর, বল—'তুমি প্রভু বিভু। আমি তোমারই লীলামাধ্যম। এই আমিরূপ যন্ত্রকে তুমি তোমার প্রয়োজনে তোমার করে বাজাও, তোমার মতো করে ব্যবহার কর।'

তোমার জীবনের অনুভূতিরূপেই গুরু নিত্য তোমার সঙ্গ করেন। তোমার জীবনের প্রত্যেক দিনের যত experience সবই চিতিমাতার রূপ। Consciousness and experience are but one —তিনিই গুরু। তিনি গুণাতীত, রূপাতীত, ভাবাতীত, ভেদাতীত, দ্বন্দ্বাতীত। গুরু হলেন দ্বৈত, অদ্বৈত, বহুত্ব রূপ। মানসমল তথা অজ্ঞানের প্রতিরোধক। যিনি 'গু' নামক অন্ধকার, অজ্ঞানতা, নানাত্ব-বহুত্ব ইত্যাদির গতি রুদ্ধ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। গুরু = গ + উ + র + উ। তিনি 'উ' যুক্ত হয়ে উদ্ভাসিত, উন্মেলিত, উদ্বেলিত, উন্মুক্ত। 'র' হল গুরুর শক্তি। তাই তিনি গুরু। গুরু হলেন গুণাতীত, রূপাতীত, ভাবাতীত, নিত্যাদ্বৈত, অখণ্ড, স্ববোধাত্মা, সর্ব অবভাসক, সর্ববোধের অধিষ্ঠান, সর্বভাবের সমাধান। [৯।৯।৯২]

আত্মজ্ঞগুরুর কৃপায় আত্মবিস্মৃত জীব আপনবোধস্বরূপ আত্মসত্তার অনুভূতি পায়

আনন্দ, অমৃত ও চৈতন্য কেনা যায় না। আনন্দ নিহিত আছে হৃদয়ের গভীরে। সদ্‌গুরুর কৃপায় মনটা একবার সেখানে লাগাতে পারলেই সব পাওয়া হয়ে গেল। আবশ্যিক বস্তুটা হল সদ্‌গুরুর কৃপা। নিজে নিজে চেষ্টা করলে বিপদ হতে পারে। তাই অধ্যাত্মবিদ্যাকে বলা হয়েছে গুরুগতবিদ্যা।

গুরুর মাধ্যমেই আমরা লঘুকে গুরু করতে পারি। আর গুরুর প্রতি দোষদৃষ্টি বা সমালোচনা পতনের অনিবার্য কারণ। গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করলে তার ফল পেতেই হবে। আর কেউই তাকে এই পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

অখণ্ডবোধ হল সত্যবোধ। সত্যবোধ হল তা-ই যার পরিবর্তন বা রূপান্তর নেই। পূর্বাপর একই থাকে। আর তা-ই হল সমগ্র সত্তার মূলকেন্দ্র—আমাদের আত্মা বা আমি। যাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই সুতরাং জরা, ব্যাধি, সুখ ও দুঃখের অতীত। এ এমন এক ভাব যার প্রতিবন্ধ বা বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই—যার চাওয়া-পাওয়া নেই, যার হারাবার ভয় নেই। এই 'আমি'-কে সাধারণ গুরু ধরিয়ে দিতে পারেন না। অবতার-

পুরুষরাও অনেক চেষ্টা করেও এই সত্যের পরিচয় সবাইকে ধরিয়ে দিতে পারেন না। অনেক শুনেও সেই এক চক্রাকার ব্যবহারে জীবন ঘুরছে—তত্ত্বস্বরূপকে ধরতে পারছে না। এমন অনেক দেখা গেছে যে সদ্‌গুরু ও অবতারপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি। তাঁদের সঙ্গ করেও অনেকে জীবনে মুক্ত হতে পারেনি—আত্মজ্ঞানের অধিকারীও হয়নি।

আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অনুভূতিই সত্যের সাথে যুক্ত। অনুভূতিকে তোমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখ স্বভাবজাত বুদ্ধির দোষে। আর এই অনুভূতির প্রকারভেদেই হয় দর্শন, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি—কিন্তু সবার মূলে যে অখণ্ড, অদ্বয়, অব্যয়, শুদ্ধ চৈতন্য আছে তাঁর কাছে কেউ যেতে পারে না। অনেক সময় সদ্‌গুরুও biased হয়ে যেতে পারেন। বৃত্তিচৈতন্যের ফাঁদে পড়ে 'আমি চৈতন্যস্বরূপ' এই মূল কথাটিই তিনি ভুলে যান। আর তারই জন্য বিভিন্ন গুরু বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। মূল কথাটি ধরলে আর সম্প্রদায় গড়া যায় না। [২৫।১১।৯২]

ধর্ম ও কর্মের মৌলিক তাৎপর্য

ধর্মের মতো কর্মের উৎকর্ষ ও বিকাশও স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় হতে পারে শুদ্ধসত্ত্বগুণের মাধ্যমে। তাই ধর্মের মতো কর্মও হওয়া উচিত সমষ্টিগত স্বার্থে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। অর্থাৎ কর্ম হবে—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ'। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা হল সৎ কর্ম, বিষ্ণুযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। এটাই হল কর্মের universal approach। নিজের জন্য যত না করবে তার চেয়ে কোটি কোটি ভাগ বেশি করবে অপরের জন্য। তাই দেখা যায়, মহাপুরুষগণ প্রথম জীবনে কর্ম ত্যাগ করে সাধনা ও তপস্যা করেন সিদ্ধিলাভের আশায়। তারপর বাকি জীবনটা পৃথিবীর সবার জন্য দান করে যান। এই প্রসঙ্গে আসে বুদ্ধদেবের কথা। রাজার ঘরের অপার ঐশ্বর্য ও সুখের মধ্যে বড় হয়েও সব ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেন মানুষের দুঃখ দূর করবার উপায় বের করতে, সকল দুঃখের কারণ জানতে। দুঃখ হল common to all আর এর কারণ হল অজ্ঞান। আর তপস্যা হল স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহকে সংযত করে নিজের মধ্যে নিজে ঢুকে অন্তর থেকেই খুঁজে বের করা অন্তরের জিজ্ঞাসার উত্তর। এই কারণেই আবার প্রত্যেকের সাধনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের spiritual education different—general education-এর মতো নয়। তাইতো যারা সদ্‌গুরুর কাছে আসে শিক্ষার জন্য তাদের সংস্কার অনুযায়ী গুরু প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ দেন। কাউকে দেন জপতপ, কাউকে দেন কর্ম, কাউকে দেন শাস্ত্রপাঠ, কাউকে দেন সেবাকর্ম। আবার কারও জন্য থাকে শরীর তৈরির নির্দেশ, কারও মনকে সংযত করে তৈরি করার নির্দেশ। পদ্ধতি ভিন্ন হলেও লক্ষ্য কিন্তু এক। সমত্বে প্রতিষ্ঠা। General education হল stereotype কিন্তু spiritual education দ্বারা difference-এর মধ্যে সমতা একতা প্রতিষ্ঠা করাই হল ধর্মের ভিত্তি। এখানে যে ধর্মের কথা বলা হয় তা traditional বা গতানুগতিক ধর্ম নয়। এখানে ধর্ম হল supreme law—which sustains all human being and creation। ধর্ম হল সেই law যা instigate করে from the very beginning for the attainment of the ultimate goal or end of life।

To know is not education—to know what we do not know is also not education. Education হল যা জানি না তা জেনে অপরকে জানানো। শিক্ষা হল collect and distribute। তুমি যা পাচ্ছ তা নিজের বলে জমিয়ে রাখলে চলবে না। তা বিলিয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। গুরু বিনে এ কাজ হতেই পারে না। তোমার শীত করলে তুমি রাস্তায় সূর্যের তাপে না-গেলে গরম হবে কি করে? আবার গরম

লাগলে গাছের সুশীতল ছায়ার নীচে না-গেলে তো শীতল হবে না। গাছই যদি না-থাকে তো শীতল হবে কি করে? গুরু হলেন তেমন আশ্রয়। স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় তিনি যে বস্তুকে প্রকাশ করেন তা সর্বত্র নিখুঁত ভাবে, সমান ভাবে পাওয়া যায় না।

এখানে (সৎপ্রসঙ্গের মাধ্যমে) যে আলো দেওয়া হয় তার এক কণাও যদি তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে সেই আলোই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে অন্ধকারের পরপারে—ঋষির ভাষায়—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। 'আপনার ধর্ম আপনার চারিধারে আপনারে ঘিরে আপনি প্রকাশে বারে বারে'। অসীমের বক্ষে এটাই তাঁর লীলা। অসীম ছাড়িয়ে যখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কথা যায় থেমে। জ্ঞান হয় বৃত্তিশূন্য। ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহ অব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে আত্মসাৎ করে, নিজেরাও লুপ্ত হয়ে যায় নিরাকার ব্রহ্মবোধে। অর্থাৎ সদ্গুরু তোমার ভিতরে ঢুকে ভেদজ্ঞানের বৃত্তিকে আত্মসাৎ করেন, all maniness-কে absorb করে নিজের Oneness-এর মধ্যে নিয়ে নেন। এটাই তাঁর অনুকম্পা। অনুগ্রহ করে তিনি গ্রহণ করলেন, নিয়ে গেলেন তাঁর আলয়ে। তিনি আছেন goalpost-এর পিছনে। [১৬।১২।৯২]

জাতক মাত্রই ষড়বিধ প্রাকৃত নীতির অধীন

দেহের জন্ম হলে দেহের মধ্যে বাস করে যে দেহী তাকে ছয়টি বিকার ভোগ করতেই হয়। এই ছয়টি বিকার হল—জন্ম বা উৎপত্তি, নির্দিষ্টকালের স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অবক্ষয় ও নাশ বা মৃত্যু। এই ছয়টি বিকারের ঘনীভূত রূপই হল প্রকৃতি। এই সব বিকার একের পর এক চলতেই থাকে। অবশ্য এই সব বিকারের হাত থেকে রেহাই পাবার বা বিকার লাঘব করার উপায় আছে। যেমন মুক্তির কারণ আছে তেমন বন্ধনেরও কারণ আছে। আবার মুক্তির উপায় আছে যেমন বন্ধনেরও উপায় আছে তেমন। এই সব বিকারগুলিকে জন্মের পর মানুষের নানাবিধ অসুখের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এদেরই বলা হয় ভবরোগ। জন্ম হলেই মানুষ এই ভবরোগের শিকার হয়। মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, দেবমানবদেরও এই ষড়বিধ বিকার থেকে রেহাই নেই। তবে তাঁদের মধ্যে মুক্তির স্মৃতি থাকে বলেই অশান্তি ভোগ না-করেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন তাঁরা। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অসুখ করলে ডাক্তার ডাকে এবং তাঁর উপদেশ মতো রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ সেবন করে এবং পথ্য ও সেবা গ্রহণ করে। ঠিক তেমনি ভবরোগের ওষুধ হল অধ্যাত্মবিদ্যা।

মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত সামর্থ্য থাকে, যোগ্যতা থাকে ততক্ষণ নিজেকে নাস্তিক ভেবে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই চলতে চায়। কিন্তু বুড়ো হলে চলতে যেমন লাঠির দরকার হয় তেমনি আসে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। যুবা বয়সে লাঠি লাগে না-লাগে সাথী কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সাথী লাগে না, লাগে লাঠি। সাধারণ ভবরোগের সবচেয়ে কড়া ওষুধ হল এক-এর বিজ্ঞান (Science of Oneness) বা অদ্বৈত বিদ্যা। এই ওষুধ কখনও fail করে না—কারণ এ হল অদ্বয়, অব্যয়, অখণ্ড, অমৃতময়।

ভবরোগের ওষুধ যে অদ্বৈত জ্ঞান, তা শাস্ত্র পড়ে আহরণ করা যায় না। একমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ সদ্গুরুর কাছ থেকেই তার পাঠ নিতে হয়। সদ্গুরু তাঁর কথার মাধ্যমে শিষ্যের ভিতরে শক্তি charge করে দেন। সেই শক্তিই তাকে আত্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণ ব্যাধিতে যেমন ডাক্তার দেখিয়ে তার পরামর্শ মতো ওষুধ খেতে হয়, দোকান থেকে ইচ্ছামতো যে কোনও একটা ওষুধ কিনে এনে খেলে হয় না তেমনি সদ্গুরুও শিষ্যকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিধান দিয়ে থাকেন। কাকে কী ওষুধ কী dose-এ দিতে হবে তা তিনিই জানেন। যদিও ভবরোগের অনেক gradation আছে তবুও সদ্গুরু সাধারণ ভাবেই ভবরোগবৈদ্য। তিনি কোনও বিশেষ বিষয় নিয়ে চলেন না। তিনি কোনও specialistও নন।

জীবের সকল চিন্তা-ভাবনা, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সবই অজ্ঞানপ্রসূত। জ্ঞানী অজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন কিন্তু অজ্ঞানী জ্ঞান কী তা জানে না। জ্ঞানী তাই অজ্ঞানীর ভান করতে পারেন অজ্ঞানকে জ্ঞানের অংশ জেনে। কিন্তু অজ্ঞানীর জ্ঞানীর ভান চলে না। অজ্ঞানে থেকে জ্ঞানকে কখনওই পাওয়া যাবে না।

বেদান্তের বিজ্ঞান হল অদ্বৈতের বিজ্ঞান, অখণ্ডের বিজ্ঞান, অদ্বয় ব্রহ্ম-আত্মবোধের বিজ্ঞান—তা-ই eternal Oneness-এর বিজ্ঞান। সেখানে নানাত্ব-বহুত্বের কোনও স্থান নেই। জাগতিক সব বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থ, সৌর সবই দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব বিজ্ঞান কার্য-কারণ সম্পর্ক ধরে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক কার্যেরই একটি কারণ থাকে তাই এঁরা মনে করেন কারণ মাত্রেই কার্যবাহী। অদ্বৈতবাদী মনে করেন সমগ্র জগৎ সৃষ্টির যিনি কারণ তাঁর আর কোনও কারণ নেই। তিনি কারণাতীত কারণ, তিনি স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ—সকল কারণের কারণ। তবে জাগতিক বিজ্ঞান ততক্ষণই যতক্ষণ এই জগৎসংসার। এই জগতের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই তাদের। একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যাই পারে এই জগৎ ছাড়িয়ে যেতে। আইনস্টাইনের মতো যত বিজ্ঞানীই আসুন না কেন দ্বৈতবাদ দিয়ে এই 'একমেবাদ্বয়ম্ ব্রহ্ম'-এ কখনওই পৌঁছাতে পারবেন না। বিজ্ঞানবাদীদের যত আবিষ্কার তা প্রকৃতির জড়ত্বকে base করেই। তাদের science হল applied science। Applied sciencc দিয়ে Absolute Reality-কে কখনওই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই জগতের মধ্যে থেকে একমাত্র সদ্‌গুরুই পারেন শিষ্যের মনের সকল স্বকল্পিত অজ্ঞানজাত সন্দেহ, শঙ্কা, ভয়, দেহাত্মবুদ্ধি কাটিয়ে তাকে Absolute Reality-র সঙ্গে যুক্ত করতে।

'আমি মানুষ' এটি একটি বৃত্তিজ্ঞান। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আমি হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আবার আমি স্থূল, কৃশ, লম্বা, বেঁটে, অসুস্থ, অন্ধ, বধির, সবল, দুর্বল, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি উপাধি। এই সব উপাধির সাথে আরও নানা উপাধি। আর এই সব উপাধির ভারে মানুষ জন্ম জন্ম, দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধির cycle-এ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই ভোগ ও অশান্তির কারণ হল দ্বৈতবোধ। এই দ্বৈতবোধের উর্ধ্বে না-উঠলে শান্তি নেই। আর তার জন্য একমাত্র ওষুধ হল অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতের জ্ঞান কোনও শাস্ত্র পড়ে পাওয়া যাবে না। পুঁথিগত বিদ্যায় অজ্ঞান যায় না। মনের কামনা-বাসনা যায় না। উপরন্তু ভোগের উপকরণ—নাম, যশ, খ্যাতির বিড়ম্বনা বাড়তেই থাকে। শাস্ত্র পড়ে সাধু সাজা যায় কিন্তু সাধু হওয়া যায় না। সাধু হওয়া যায় অদ্বয় আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে। ত্যাগ ও ভোগ একসঙ্গে থাকতে পারে না। বিদ্যা-অবিদ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান একসঙ্গে থাকে না। বহুর জ্ঞান অজ্ঞান এবং একের জ্ঞানই হল শুদ্ধ জ্ঞান প্রজ্ঞান। এই প্রজ্ঞানই হল আপন আত্মার স্বরূপ। [৩০।১২।৯২]

দশম অধ্যায়

গুরুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার

যে গুরুর আশ্রয়ে আছ তাঁকে ষোলো আনা মানতে হবে। গুরুর বিশ্বাস অর্জন করতে না-পারলে গুরু কিছুই দেন না। শাড়ির দোকানে গিয়ে একটা শাড়ি নিয়ে এলে কিন্তু দাম দিলে না—তাহলে কী দোকানী পরে আর শাড়ি দেবে? গুরু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই শিষ্যকে কিছু দেন। আবার দিতে দিতে গুরুরও কখনও কখনও অধৈর্যভাব আসে। [৬।১।৯৩]

বিবেক-বৈরাগ্যের তাৎপর্য

ব্রহ্ম-আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার বেদান্ত মতে একটি পথ হল বিবেক-বৈরাগ্য। এই বিবেক-বৈরাগ্য আসে বিচারের পথ ধরে। বিচারের মাধ্যমে বিবেক জাগ্রত হলে বৈরাগ্য আপনা থেকেই আসবে। ভক্তিবিজ্ঞানে ইষ্টগুরুর কৃপাই একমাত্র ভরসা। সে কৃপা কবে আসবে ভক্ত তা জানে না। তাই ভক্তের sufferings বেশি। ব্রহ্মবাদী suffer করে কম। আত্মজ্ঞগুরু ব্রহ্ম অধিকার বুঝেই শিষ্যকে বিচারের শিক্ষা দেন। যার মধ্যে মোহ আসক্তি বেশি, তার বিচারে কাজ হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন যোগ্যতার বিচার হয় তেমনি আত্মজ্ঞপুরুষ জিজ্ঞাসুর অতীত অতীত জন্মের record বুঝেই তাকে অনুশাসন দেন। তবে বর্তমানে আত্মজ্ঞের বড়ই অভাব। সবই কমার্সিয়াল গুরু। তারা দীক্ষা দেন, উপযুক্ত শিক্ষা দেন না। তাই আসল দীক্ষা সবাই দিতে পারেন না। আসল দীক্ষা হল সমগ্র অস্তিত্বের স্থাবর-অস্থাবর, স্থূল-সূক্ষ্ম, অন্তর-বাহির সব কিছু পরিহার করে বা সমর্পণ করে, আলাদা করে নিজের মুক্তস্বরূপ, দিব্যস্বরূপকে জানবার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার মধ্যে কোনও ভান থাকবে না।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় মানুষ আপোসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গুরু নির্বাচন করে—দীক্ষা নেয়। কিন্তু আসল দীক্ষার মধ্যে কোনও selection নেই। সংসারের প্রতি যার আপনা থেকেই বিরাগ এসেছে, সংসারের ভোগসুখ থেকে যে বাইরে বের হবার রাস্তা খুঁজছে, তারই দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে। শাস্ত্রপাঠ করে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। পূর্ব জন্মের ভাল সংস্কার নিয়ে যে জন্মেছে, যার মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা, সে ঘুরতে ঘুরতে একদিন যথার্থ গুরুর কাছে পৌঁছে যায়। যাঁকে দেখেই সে বুঝতে পারে ঠিক জায়গায় এসে গেছে। এই গুরু-শিষ্যের যোগ হল মণিকাঞ্চন[১] সংযোগ। নিজের সমগ্র সত্তা-শক্তির একটা পরমপদে সমর্পণের লগন আসে। দেখা মাত্র চেনা আসে আপনবোধ থেকে।

আত্মার কোনও বন্ধন নেই। বন্ধন হয় মনের। Thought process is the source of our ignorance. Thought process হল অহংকারের। অহংকার যতক্ষণ মনও ততক্ষণ মায়ার পাশে বদ্ধ। মন হল—'সংকল্পাৎ কিল জায়সে নাহং সংকল্পস্যামি সমূল ন ভবিষ্যসি।' অর্থাৎ সংকল্প থেকে মন জাত হয়, আবার সংকল্প না থাকলে মনের উৎপত্তিও সম্ভব নয়। মনের দশটি দশাকে[২] (দশ বৃত্তি) শেষ করে আদি-মধ্য-অন্তে, জ্ঞানবিচার

১। মণিকাঞ্চন—স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

২। দশবৃত্তি—কাম, সংকল্প, বিচীকির্ষা (সন্দেহ), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভী, ধী।

বসিয়ে প্রতিদিন সদ্‌গুরুর সঙ্গ করে তাঁর বাণী শ্রবণ করে you can be established in your Self-Conscious Awareness। যে মায়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে মনকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সদ্‌গুরুর সামনে সেই মায়া মাথা নত করে থাকে।

তাই বারবার বলা হচ্ছে conventional knowledge দিয়ে বা relative knowledge দিয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করা যায় না। অন্ধকার দূর করতে চাই সদ্‌গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। এখানে যা বলা হয় তা হল Reality, as It Is। [১২।১।৯৩]

মানুষ ও মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ

মানুষ নিজেকে মানুষ বলে বটে তবে মনুষ্যত্ব ক'জনের মধ্যে আছে—তা প্রায় গুণে বলা যায়। নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করে দেখতে পার। এক একজন দিনে কতগুলো মিথ্যা কথা বল—কত কথা উল্টেপাল্টে twist করে বল—অন্যের কথা কিছু বাদ দিয়ে কিছু add করে বলছ। সত্যকে এই ভাবে বিকৃত করাই হল defects of mind। সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে শুনে শুনে এই সব defects দূর করতে হবে। গুরু তাকে সংযত হবার পদ্ধতি বলে দেন—অবশ্য শুধু বলে দিলেই হয় না, বারবার অনুশীলন করতে হয়।

সন্তান বাবা-মার কাছেই প্রথম শিক্ষা পেয়ে থাকে। মা-বাবার মতাদর্শ সন্তানকে প্রভাবিত করে। শুধু বাড়ির পরিবেশই নয় সেই সঙ্গে আহার, বিহার, বাক্য, আলোচনা, সঙ্গী, প্রতিবেশী, পরিবেশ প্রভৃতির প্রভাবও পড়ে। তবে অনেক সময়ই দেখা যায় আদর্শ পিতামাতার সন্তান আদর্শবান হয় না, আবার অতি সাধারণ মা-বাবারও আদর্শবান সন্তান হতে পারে। আবার কারও ঘষামাজা করেও কিছু হয় না। একটা বিশেষ point হল—one cannot change the inherent nature of a person। একমাত্র সদ্‌গুরুর কাছে ঠিকঠাক শিক্ষা পেলে inherent nature-এরও পরিবর্তন সম্ভব। 'এ' বারবার বলেছে—জপতপ, পূজাপাঠ দ্বারা বিশেষ ভাবে আত্মবোধের সম্ভাবনা নেই। সত্যের জন্য সত্যের পথে থাকতেই হবে।

পূজা বা সাধনা হয় মন দিয়ে। Self দিয়ে নয়। Self কারও পূজা করে না। Self-ই যে ইষ্ট বা ব্রহ্ম তা একমাত্র জানা যায় সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই। Self-Knowledge হল direct knowledge। Indirect knowledge হয় মন-বুদ্ধির মাধ্যমে—কাজেই তা unreal।

সত্যকে সত্য দিয়েই ব্যবহার করতে হয়। তা-ই হল বিবেক—Conscience, the highest one—যিনি বুদ্ধির উপরে উঠে বুদ্ধিকে গোলাম করে, অহংকারকে দাসানুদাস করে একমাত্র সত্যের শরণ নিয়ে সত্যের অনুগত হয়ে থাকেন। মানুষের কর্তৃত্ব, অহংকার, দম্ভ, দর্প সবই তাদের রাজসিক ও তামসিক গুণের প্রকাশ। সাত্ত্বিক ও শুদ্ধসাত্ত্বিক গুণে সবই হয় তোমার। তাই বলা হয়েছে—এখানকার কথা এখানকার বলেই ব্যবহার করবে—নিজের বলে কখনওই নয়। তখন গুরুশক্তি আপনা থেকেই তোমার মধ্যে প্রকাশ হতে থাকবে। নিজেকে গুরুর যন্ত্র করে তাঁর পরমপদে স্থান পাবার জন্য তাঁর লীলামাধ্যম হয়ে তাঁকেই প্রভু, তাঁকেই কর্তা-জ্ঞাতা বলে জেনো। [২০।১।৯৩]

কল্পনার ফল কল্পনা; বোধের ফল বোধ

সংসারে সুখবিলাস করে ধর্মচর্চা হয় না। এ ভাবে ধর্মচর্চা হল intellectual চুলকানি। এ ভাবে সত্যধর্মবোধ জাগতে পারে না। কারণ আমরা জীবদেহ ধারণ করে প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির অধীনে বাস করি। মনের গতি যতদূর প্রকৃতির পরিধিও ততটা। একমাত্র মনের গতি রোধ করতে পারলেই প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়। মনের গতি রোধ করতে দরকার একজন সদ্‌গুরুর। Demonstration of a Being personality। যিনি কৃপা করে

মনকে সংযত করার উপায় বলে দিতে পারেন; কিন্তু তেমন গুরু কোথায়? ব্যবসায়িক গুরু তো অনেক মেলে; কিন্তু সঠিক শিক্ষা দিয়ে ঠিক পথে চালিত করার মতো অনুভবসিদ্ধ গুরু কোথায়? [৩।২।৯৩]

সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য

সমস্ত অনুভূতির বিষয়কে জানতে হয় একজন গুরুর মাধ্যমে। তাই বলা হয় জ্ঞান হল গুরুগত। তবে কর্ম-যোগ-ভক্তি যে পথেই এগোও না কেন গুরুকে বাদ দিলে সব গুলিয়ে ফেলবে। যেমন প্রথম রান্না বা ছবি বা কোনও সেলাই সুন্দর বা perfect হয় না, কিন্তু কোনও শিক্ষকের under-এ practice করলে আস্তে আস্তে সুন্দর হতে থাকে।

যিনি এই life-এর আদি-মধ্য-অন্তে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণে, বাহির-অন্তর-কেন্দ্রে নিত্য অভেদে বিরাজমান, সত্তারূপে তিনিই ভূমা আমির পরিচয় এবং তিনিই ভূমা আমি স্বয়ং। এই পরিচয়কে যিনি এক অখণ্ড বোধে ধরিয়ে দেন তিনিই সদ্‌গুরু[১]। তিনি হলেন সমবেত সর্বভাববোধের ঘনীভূত রূপ। সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ভাববোধের মহাসমন্বয়সূচক অভিব্যক্তি। তাইতো অনুভবসিদ্ধের বা স্বানুভবসিদ্ধের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ কোনওটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে সবটাই চিনির পুতুলের মতো—যার আগে-পিছে, উপরে-নিচে সবটাই মিষ্টি। তেমনি মন যেখানে লাগবে সেখানে ব্রহ্ম আবার যেখানে লাগবে না, সেখানেও ব্রহ্ম। [২৮।২।৯৩]

প্রজ্ঞানঘন পরমেষ্ঠিগুরুর মহিমা অনবদ্য ও অভিনব

জ্ঞানকে অজ্ঞানরূপে ব্যবহারের ফলেই অন্তর্বৃত্তি তৈরি হয়। অন্তর্বৃত্তি বাড়ানো কমানো যায়—তবে শূন্য করতে গেলে যে অভ্যাসের দরকার হয় সেই অভ্যাস যথার্থ অনুভবসিদ্ধের কাছে তালিম না-নিলে সম্ভব হয় না। তাই বলা হয়—'গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক' আবার 'শিষ্য মিলে লাখে লাখে গুরু মিলে এক'। এই দু'টি কথার তাৎপর্য ভিন্ন কিন্তু গুরুত্ব সমান। যে শিষ্য অন্তরে পূর্ণ জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে তার পক্ষে গুরুর সামান্য সাহায্যই যথেষ্ট। তাকে আর প্রাথমিক যোগের শিক্ষা নিতে হয় না—এটা কর ওটা করো না, এটা খাবে ওটা খাবে না, এত জপতপ করবে বা এতক্ষণ ধ্যান করবে ইত্যাদি। কারণ এ সব তার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তার প্রয়োজন একজন অনুভবসিদ্ধ গুরুর প্রত্যক্ষ অনুভূতি। গুরুও একজন এমন উপযুক্ত শিষ্যের প্রতীক্ষায় থাকেন। এমন শিষ্য লাখে একজন মেলে।

বুদ্ধদেব মনের ভুলে রাজার ঘরে এসে পড়েছিলেন আবার ঘর ছেড়ে সেই ভুল ভাঙলেন। সবাই কী বুদ্ধ হতে পারে। কেন পারবে না? বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, মহাবুদ্ধ হতে পারে যদি মনের বিভিন্ন স্তরের চিত্তরূপ প্রদীপ নিভে গিয়ে নির্বাণ 'লাভ হয়। চিত্তরূপ প্রদীপ নিভে গেলে মন যে কোথায় যায় কেউ তা জানে না। গুরু শিষ্যের সঠিক যোগাযোগ হলে গুরুই মনের সব বৃত্তিকে জ্বালিয়ে দেন স্বানুভূতির জ্যোতি দিয়ে। তাকেই বলা হয় জ্ঞানাঞ্জনশলাকা[২]।

ব্রহ্মজ্ঞ আত্মজ্ঞগুরু তাঁর শিষ্যকে যে শিক্ষা দিয়ে তাকে তদ্‌বোধে প্রতিষ্ঠা করেন সেই শিক্ষাই হল আসল শিক্ষা। আর সব শিক্ষাই হল গতানুগতিক প্রস্তুতি। শিষ্যকে সঠিক পথে আনতে গুরু অনেক সময় শিষ্যের সব ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করে দেন অথবা বিভিন্ন ধাপ করে দেন।

চিত্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই ব্যাধিগ্রস্ত আর বিযুক্ত থাকলেই কোনও ব্যাধি নেই। তোমরা অখণ্ড ভূমার সঙ্গে বাস করেও তাঁকে স্মরণ কর না। Abiding-কে মনে না-করতে পারলেও অনন্ত 'একে'

১। সদ্‌গুরু—অভিনব সংজ্ঞা।

২। জ্ঞানাঞ্জনাশলাকা—তন্ত্রের দৃষ্টিতে।

(শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) স্মরণ করে নিজেকে খানিকটা relaxed কর। অন্য কোনও কথা 'এর' কথার পাশাপাশি কাজ করবে না। এই যে প্রতিদিন এখানে যা শুনে যাও তা প্রতিদিন একবার করে ভাববার চেষ্টা করবে। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) presence অনুভব করতে পারবে—otherwise All Divine-এর presence অনুভব করতে পারবে না। তোমাদের সকল দুঃখ, ভাবনা-চিন্তার মাঝে 'একে' বসিয়ে দিও—এক নূতন খেলা দেখবে। চিত্তে বিকার শান্ত হয়ে যাবে নিজেই টের পাবে। তোমাদের মধ্যে যাদের গুরুইষ্ট আছে তারাও গুরুইষ্টের মধ্যে 'একে' বসিয়ে দিও। সদ্‌গুরু ও ইষ্টে কোনও প্রভেদ নেই। এতে তোমাদের loss হবে না। তোমাদের গুরুইষ্ট তোমাদের উপর রাগ করবেন না—তার দায়ও 'এর'। [৩।৩।৯৩]

গুরুতত্ত্ব, গুরুভাব ও গুরুবোধের বিজ্ঞানভিত্তিক ফলশ্রুতি

প্রকৃতির স্তরে বৈচিত্র্য যত, সুরও তত, বেসুরও তত—একসুরে তাই বাজে না। তাই বিকারও বেশি। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহংকার সবের মধ্যেই বিকার। এমনকী আনন্দময় কোষেও হয় বিকার। তাইতো কারও ভাল ঘুম হয় না। এ সবই ব্যাধি। এ সব ব্যাধি স্বকৃত। সংসার বিদেশে এসে নিরন্তর চলছে মারামারি টানাটানি। অনেক কিছু চাই। এই চাওয়ার জন্য মূল্য দিতে হয়। সব সময় তাও দিতে পার না। এই বিশেষণের দেশে টানাটানি কামড়াকামড়ি করে বাস করছ। এটা একটা বিশেষ স্তর। এই স্তর থেকে উদ্ধার পেতে মানুষ আসে বড় আশ্রয়ের কাছে। যেমন অসুখ করলে ডাক্তার ডাকতে হয় তেমনই। প্রথমে হয়ত ছোটখাট কাউকে দেখাই। বেগতিক দেখলে আরও বড় ডাক্তার বা specialist-কে দেখান হয়। তাতেও না-হলে আরও বড় একেবারে একনম্বরকে দেখাতে হয়। তেমনি গুরুর খোঁজে এসে প্রথমেই একবারে সবচেয়ে বড় আশ্রয়কে ধরা যায় না।

গুরুবাদ ও ঈশ্বরবাদ এক বা অভিন্ন। সে কথা গুরু ছাড়া আর কেউই বলতে পারে না। তাই বলা হয়—"গুরু বিনে নাহি মিলে জ্ঞান, সাধন বিনা নাহি মিলে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বিনা নাহি মিলে প্রজ্ঞান, প্রজ্ঞান ছাড়া হয় না আত্মজ্ঞান।" গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। তিনিই ঈশ্বর-আত্মা স্বয়ং আবার তিনিই মানুষবেশে যখন আসেন তখন তিনিই অবতার সুতরাং অবতার ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই।

গুরুবাদ হল জীবনের চরমতম মূল্যবোধ। ব্যক্তি, বস্তু, দেশ, কাল, কার্য, কারণ, ব্রহ্ম, আত্মা, নিয়তি, প্রকৃতি, জ্ঞান, আনন্দ সব কিছু সামগ্রিক ভাবে যাঁর কাছে পাই তাকেই বলা হয় অবতার। যা-কিছু আছে সবই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর—সবার মধ্যেই সমান ভাবে স্বয়ং নিজেকে নিজেই আবৃত করে আবার নিজেই নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষবেশে। তাইতো মানুষের শান্তি নেই। আর এই শান্তির জন্য মানুষ গুরু-ঈশ্বরের খোঁজে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

বৃত্তির পরিশোধন হল শিক্ষা। এই শিক্ষা অন্তরের মলাবরণ, যা আসল স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে তাকে সরিয়ে দেয়। এতদিন ঈশ্বর-আত্মাকে নিজের থেকে পৃথক বলে ভেবে এসেছে—গুরুবেশে স্বয়ং ব্রহ্ম-আত্মা এসে জানিয়ে যান, 'তুমিই ব্রহ্ম-আত্মা স্বয়ং।' এমন অবতার পেয়েও তাঁকে মেনে নেওয়া কঠিন—তাঁর কথা মানাও কঠিন। তবে শুনতে শুনতে মনে গেঁথে যাবে—তারপর এমনিই মানতে পারবে।

কেউ সেবা করতে চায় আবার কেউ সেবা নিতে চায়—দু'জনেই সাধু গেরুয়াধারী। এমন সাধু কী আর সদ্‌গুরু হতে পারেন? সদ্‌গুরু হলেন ব্রহ্ম-আত্মা personified, যিনি মানুষকে পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারেন। পৃথিবীতে সাধক পাওয়া যায় অনেক কিন্তু সদ্‌গুরু নয়। নিজের দোষত্রুটি শোধনের নামই হল সাধনা[১]। যদিও সাধনা বলতে নানা জনে নানা মত দিতে পারে, তবে স্বানুভূতির দৃষ্টিতে দোষত্রুটির শোধনই সাধনা। দোষত্রুটির শোধন করতে যা করা হয় তারই নাম শিক্ষা[২]।

১। সাধনা—অভিনব সংজ্ঞা। ২। শিক্ষা—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

শিশু ও মায়ের মধ্যে আছে নাড়ীর যোগ। তাই জন্মের পর শিশু তার মা-কে চিনে নেয়। মা-ই পরে তার বাবাকে চিনিয়ে দেন। মা ছাড়া বাবাকে আর কেউ-ই চেনাতে পারে না। তেমনি আমাদের মধ্যে যে সৎ অংশ আছে তা দিয়েই আমরা গুরুকে চিনে নিতে পারি। বর্ণ পরিচয় করানোর জন্য B.A./M.A. পাশ লোকের দরকার হয় না। তবে যদি এমন লোকের কাছে বর্ণ পরিচয় হয় সে ভাগ্যবান। এই ভাগ্য হয় সেই পুত্রের যার বাবা-মা M.A. পাশ। আধ্যাত্মিক পথেও তাই দেখা যায় মানুষ গুরু পেয়ে যায়। বেশির ভাগকেই খুঁজে বের করতে হয়। অনেকে আবার একবারেই ব্রহ্মজ্ঞ আত্মজ্ঞগুরু পেয়ে যায় তবে শুধু পেলেই তো হল না— তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে, তাঁর মতো করে নিজেকে তৈরি করতে হবে নয়ত পেয়েও লাভ হবে না। পেয়ে হারালে আবার পেতে অনেক জন্ম কেটে যাবে। সদ্‌গুরুর অনেক 'গবেট শিষ্য'ও জোটে। শিষ্য যাই হোক না কেন তাঁকে মানিয়ে নিতে হয়।

জন্মের পর থেকে বড় হওয়ার স্তরে স্তরে দেখা যায় 'গুরু বিনে' জ্ঞান পাওয়া যায় না। গুরু বিনা এক পাও চলতে পারি না। অক্ষর পরিচয়ের জন্য চাই গুরু, বর্ণ পরিচয়ের পর primary education, secondary, higher secondary, B.A., M.A., PHD. করার জন্য ধাপে ধাপে আলাদা আলাদা উচ্চ উচ্চ স্তরের গুরুর প্রয়োজন। তবে এই সব গুরুরা যে শিক্ষা দেবেন তা সবই formal reflected knowledge–সবই চিদাভাস, জ্ঞানাভাস। Knowledge Itself বা জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞান তাঁরা দিতে পারেন না। তার জন্য চাই কোনও মহাপুরুষ। যাঁর কোনও limitation নেই, উপাধি নেই, আমি-আমার নেই অথচ আমিশূন্য নয়। যিনি সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হয়ে বিবেক-বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য নিম্নমানের গুরুদের বিবেক-বৈরাগ্য থাকে না। বিবেকবিচার তাঁরই আছে যিনি সদ্‌সতের মধ্য থেকে অসৎ-কে বাদ দিয়ে শুধু সৎ-কেই গ্রহণ করেন। এমন গুরুর আশ্রয় পেলে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে আর অত শত সাধনার প্রয়োজন হয় না। সদ্‌গুরুর সঙ্গ করতে করতে সচ্চিদানন্দ charged হয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দ charged হয়ে গেলে নিজেও balanced হয়ে যাবে। অবশ্য একদিনে এত-সব হয় না—একদিনে হলে burst করবে, সহ্য করতে পারবে না। তাই ধীরে ধীরে সইয়ে charge করা হয়। তার জন্য জন্ম জন্ম লেগে যেতে পারে। একটা বিশেষ জন্মে সমস্ত রূপ-নাম-ভাবের সমন্বয়ে সচ্চিদানন্দসাগরে রূপ-নাম-ভাবের হাটে একাকার হয়ে যাবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দসাগরে ঈশ্বরের আনন্দমেলায় অমৃতবাজারে—স্বস্বরূপে, স্বঘরে, আপন ঘরে, নিজ নিকেতনে ফিরে যাবেই। এই হল জীবনের সার্থকতা, পরম পুরুষার্থ লাভ এবং পরমার্থ গতি।

আনন্দস্বরূপের অনুভূতি কী ভাবে পাওয়া যাবে? অনুভূতি দেবে কে? দেবেন আত্মগুরু স্বয়ং। গুরুকে ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকে পড়বে। গুরু হলেন most humble one, তিনি কখনও grumble করেন না। তিনি grasp করেন না বরং গ্রাস করে নেন ভক্তের মনের মল। তারপর গুরু ঢুকে যান তারই অন্তরে। কারণ অন্তরে তিনি নিত্যস্থিত। তারপর একদিন নিজেই উদ্ভাসিত হন অন্তরে। কিন্তু ভুলেও যেন আমি-আমার করো না। কর্তৃত্ববোধ থাকলে গুরু পাশে থেকেও আড়াল হয়ে যাবেন। তখন তোমার দুঃখ হরণ করবে কে? তাই সব সময় বল—'হে প্রভু তুমি আমার সর্বস্ব নাও। মনের সব বৃত্তি সাজিয়ে দাও।' তাঁর পায়ে সেটাই হল মস্ত পূজা[১]। আর সব পূজাই ফাঁকি। তাই তাঁর কাছে কিছু চেয়ো না—। শুধু বোধগঙ্গায় অবগাহন করে অন্তরে-বাইরে, ঊর্ধ্বে-অধেঃ, ডাইনে-বাঁয়ে, বোধে বোধময় হয়ে যাও।

শুদ্ধবোধস্বরূপ সবার মধ্যে সবার আত্মসত্তারূপে বর্তমান। কিন্তু স্বভাবদোষে এই শুদ্ধবোধস্বরূপের অনুভূতি ও স্মৃতি আবৃত হয় অন্তঃকরণ বৃত্তি তথা মন-বুদ্ধির ভুল ব্যবহার মাধ্যমে। শুদ্ধবোধস্বরূপের সঙ্গে নিজের

১। পূজা—তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

তাদাত্ম্য লাভ হলে আত্মজ্ঞানী হয় জীব। আত্মজ্ঞানীর কাছেই আত্মজ্ঞানের পরিচয় অপরে জানতে পারে। কাজেই আত্মজ্ঞানের জিজ্ঞাসু ভক্ত আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে আত্মজ্ঞানীর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। যেমন একটা candle দিয়ে আর একটা candle জ্বালালে দু'টি candle-এরই সমান আলো হয় উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না, তেমনি গুরু ও ভক্তশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বত কোনও ভেদ বা পার্থক্য থাকে না। এই হল আত্মজ্ঞানীর ভাষায় 'মদধর্মপ্রাপ্ত, মদভাবম্ আগতা'। গীতার তাৎপর্য একমাত্র আত্মজ্ঞানীই অনুভব করতে পারে অপরে পারে না। কারণ গীতা হল আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি ঈশ্বর হয়ে যান। ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম অভিন্ন একতত্ত্বের পরিচয়। জীব তা ভুলে দলমতপথের গোঁড়ামিতে ভোগে। তা অজ্ঞানেরই লক্ষণ। [১৭।৩।৯৩]

তত্ত্বানুভূতির কোনও বিকল্প নেই; স্বানুভূতি তার সাক্ষী

পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বারবার বলা হয়েছে 'ক'য়ে থাক। এই অদ্বৈত বাণীতে মন আটকে রাখতে হবে। এখান থেকে মন সরে গেলে আবার সেই অজ্ঞানের চক্রে ঘুরতে হবে জন্ম জন্ম ধরে। আবার কবে chance পাবে তার আশায়। আজ হোক কাল হোক আত্মজ্ঞগুরুর কাছে আসতেই হবে একদিন না একদিন। এইবার chance পেয়েছ, তাকে avail কর—তাঁর grace বা কৃপাকে accept করে সংসারে এগিয়ে চল শুধু তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে।

জ্ঞানের জ্যোতি কোনও পার্থিব জ্যোতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অন্তরের জ্যোতিতে মন, আত্মার জ্যোতিতে আত্মা প্রকাশিত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ, বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, অনুভূত হয়। এই সব অনুভূতিকে আবার উপাধিযুক্ত করে বহুরূপে ব্যবহার করি আমরা। এই সব ignorance-এর ব্যবহার। এই সব ignorance থেকে যে মুক্ত তার ground তৈরি হয়েছে। আর যার ground তৈরি গুরুর একটি কথাতেই তার জ্ঞানসিদ্ধি হয়। By a single word from Guru, the most competent and efficient seeker, realizes the Self instantaneously.

গুরুর কাছে কাছে বেশি থাকলেই দ্বৈতপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। গুরুর মধ্যে নিজেকে, নিজের মধ্যে গুরুকে আপনবোধে ভাবনা করলেই সহজে মুক্ত ও সিদ্ধ হওয়া যায়। সর্বভূতে গুরুর বর্তমান চেহারা আরোপিত হয়। গুরুর দেহটাই তো গুরু নয়, গুরুবোধটাই গুরু। তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবকে বদ্রীনারায়ণ পাঠিয়ে দিলেন। উদ্ভব জানতে চাইলেন কেন তাকে প্রভুর পদতল থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ জানালেন—'অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়োজন আছে'। ব্রহ্মজ্ঞ আত্মজ্ঞগুরু কীটাণু স্তর থেকে ব্রহ্মত্বের স্তর পর্যন্ত সবার সঙ্গেই নিত্যযুক্ত।

গুরুর কাছে কাছে থাকলেই গুরু হওয়া যায় না। হৃদে (হৃদয়নাথ) তো অনেক উপরে উঠেছিল কিন্তু তার অহংকার তাকে শ্রীরামকৃষ্ণর সঙ্গে অভিন্ন হতে দেয়নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গেও তো কত সন্ত ছিলেন তারাও তো কেউ বুদ্ধদেব হতে পারেনি। [২১।৪।৯৩]

প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানের পার্থক্য

ইস্পাত magnet-এর পাশে থাকলে তা আপনা থেকেই magnetized হয়ে যায়। কিন্তু ইস্পাত যদি কাদামাখা হয় তো magnetized হতে পারে না। তাই ইস্পাতকে যেমন magnetized করতে তার উপরের কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে তেমনি সদ্গুরু সঙ্গের সবচেয়ে ভাল ফল পেতে মনের মল ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

ধর্ম কোনও ক্রিয়া-কলাপ নয়, আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। মন্দিরে, তীর্থে যা অনুষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে জ্ঞানবাদের কোনও বিরোধও নেই, সম্পর্কও নেই। মন হল বিবিধ কল্পনার সমষ্টি বা চিত্ত। আর চিত্তের বিস্তারই হল এই সংসার। সংসারের এমন formula কেন হয় তা সদ্‌গুরুর পায়ের কাছে বসে না-শুনলে তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

জ্ঞানবাদে কোনও দ্বৈত নেই—তাই শিক্ষা দেওয়া বা দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার নেই। কিন্তু কল্পিত জ্ঞানবাদে গুরু সেজে দীক্ষা দেওয়া হয়। প্রকৃতজ্ঞানী দীক্ষা দেয় না। তাঁর কাছে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি'। তা হলে কে কাকে শিক্ষা দেবে আর কাকেই বা দীক্ষা দেবে। এখানে সে নিজেই বলে নিজেই শোনে।

Maniness থেকে Oneness-কে পাওয়ার উপায় পাওয়া যায় জ্ঞানবাদের গুরুবাদে। যেখানে গুরু শিষ্যবোধে শিক্ষা দেন না—গুরু আপনাকে আপনি বলেন এবং আপনিই তা শোনেন।

বৈরাগ্য ছাড়া বিচার আসে না। আবার বিচার ছাড়া কর্ম, উপাসনা ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয় না। একবার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে অখণ্ড ভূমাতত্ত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। জ্ঞান হলে কর্ম করা চলে—সে কর্ম হয় নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু জ্ঞানশূন্য কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। সমগ্র কর্মের বিনাশ হয় জ্ঞান দ্বারা। তাইতো জ্ঞানীর কাছে, সদ্‌গুরুর পায়ে, তত্ত্বদর্শীর পায়ে প্রণিপাত হয়ে তাঁর সেবা করে তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে তিনিই জ্ঞানের দ্বার খুলে দেন। তাই বলা হয়—'গুরু বিনে নাহি মিলে জ্ঞান, জ্ঞান বিনা নাহি মিলে মুক্তি।'

জীবনের প্রথম দিন থেকেই আমাদের নানা রকম গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। তাঁদের শিক্ষায় জীবনে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। President থেকে শুরু করে artist, poet, businessman আরও কত কি। এরা সবাই ক্রিয়াবাদী। এমনকী philosopher-রাও জ্ঞানবাদী নয়। তারাও চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানের ভজনা করে কিন্তু যিনি অচিন্ত্য তাঁকে চিন্তা দিয়ে কী করে পাবে? তাই 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) কোনও দর্শনবিজ্ঞান, পুঁথি-পুস্তকের কথায় যেতে রাজি নয়। এখানে জ্ঞান হল সর্বপ্রয়োজন শূন্য—সেখানে অজ্ঞানের কোনও স্থান নেই। জ্ঞান আপনিই স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং নির্বিকার, নিরাকার, নিরবলম্ব। একমাত্র বৈরাগ্যবান পুরুষ ছাড়া জ্ঞানবাদের অন্য কোনও অধিকারী নেই। এই বৈরাগ্য হতে হবে আসল বৈরাগ্য। বিচার-বৈরাগ্য আসলে চারটি প্রশ্ন আসে মনে। আর গুরুর মুখে তার উত্তর শুনেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। প্রশ্নগুলো হল—১। কে আমি? ২। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে কে? ৩। এই বৈচিত্র্যের উপাদান কী? ৪। সৃষ্টির কর্তা কে?

গুরুর কাছে উত্তর পেলেই হয় না। Query শেষ হলেই হয় বিচারসিদ্ধ।

স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভবসাগর থেকে উদ্ধারের কোনও পথ নেই। এ পথে একমাত্র গুরুই ভরসা। তিনিই দিতে পারেন support। তাই বারবার বলা হয়েছে perfect realizer-এর সঙ্গ কর।

জ্ঞানী তর্ক করে না—তর্ক করে অজ্ঞানী। অদ্বৈতবোধে তর্ক নয় শুধু মানা। অখণ্ড একবোধে মানার অভ্যাস করতে হবে। জানতে হবে দুঃখে, দৈন্যে, দুরবস্থায় প্রপীড়িত হয়েও গুরুকে আশ্রয় করেই থাকতে হয়। সর্বদা সৎ ভাবনা কর। সৎ-এ মতি, গতি, রতি, স্থিতি রেখে সর্ববিস্থায় এক অবস্থা প্রাপ্ত হতে উপায় হলেন কেবল সদ্‌গুরু। তিনি হলেন জ্ঞান personified ব্রহ্ম-আত্মা। সর্বদেবতার দেবতা। জ্ঞানীর কাছে মুক্তিশান্তি হাতের মুঠোয়। যথার্থ অধিকারীকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। যথার্থ সৎ জিজ্ঞাসু ও সদ্‌গুরুর মিলন হল মনিকাঞ্চন যোগ। যথার্থ গুরু ও যথার্থ শিষ্য একসঙ্গে হলে আর ভাবনা থাকে না। Guru of the highest kind and Shishya of the same height হলে হয় মনিকাঞ্চন যোগ। [২৮।৪।৯৩]

আত্মজ্ঞগুরুর মাধ্যমেই আত্মবিজ্ঞান অনুশাসিত হয়

মনের বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী জ্ঞান দিতে পারে। কিন্তু মনের পশ্চাতের জ্ঞান মনোবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী বা intellectual class দিতে পারে না। এতে রাগ করার কিছু নেই। যে history-তে M.A. করেছে mathematics-এর জ্ঞান সে দিতে পারে না—দিতে হলে তাকে নূতন করে শিক্ষা নিতে হবে। তবে এমন কোনও বিদ্যা আছে কী যা জানলে সব জানা হয়ে যায়, জানার আর কিছু বাকি থাকে না? এমন জিজ্ঞাসা নিয়ে নানাজনের কাছে ঘুরে ঘুরে একদিন এমন এক গুরুর কাছে ভাগ্যক্রমে পৌঁছে যায় জিজ্ঞাসু যিনি ভূমাতত্ত্বকে, আত্মতত্ত্বকে আপনস্বরূপে উপলব্ধি করেছেন। তিনিই জিজ্ঞাসুর অন্তরের তীব্রতার মানের ভিত্তিতে অদ্বয় ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান তথা মুক্তিশান্তির বিজ্ঞান অনুভবসিদ্ধ করিয়ে তাকে অনুগৃহীত করেন। সেও তখন অদ্বয় আত্মবোধে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। এরূপ গুরুই হলেন Godhead Absolute personified—তাঁকে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। তাঁর জ্ঞানের নাগাল পায় না। সদ্‌গুরুরূপে তিনিই সংসারে বিচরণ করেন। বেশির ভাগ লোকই তাঁর পরিচয় সম্যক্‌রূপে জানতে পারে না ভ্রমবশত নিজেদের স্বার্থ ও বুদ্ধিদোষে। ফলে যতদিন পার্থিব দেহে থাকেন ততদিন তাঁকে অবজ্ঞা করে আর দেহাবসানে তাঁকেই আবার great soul বলে পূজা করে।

Self বা আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয় অহংকার। অহংটা কার? অহং আমার নয়। এই আমার ভাব কাটাতে হবে গুরুবাণী দিয়ে। গুরুবাণী হল fire of wisdom। সেই জ্ঞানাগ্নি দিয়ে সর্বকর্ম, কর্মফল, বস্তু, ব্যক্তিকে দগ্ধ করে দিতে হবে। জ্ঞানীর কাছে সংসার বলে কিছু নেই, আছে সমসার। অজ্ঞানীর সংসার ছাড়া আর কিছু নেই। অজ্ঞান শূন্য থেকে জাত হয় না। অজ্ঞানেরও একটা substratum থাকা দরকার। ইন্দ্রিয়-মন অজ্ঞানেরই বিষয়। তুমি ইন্দ্রিয়-মনের প্রকাশক কিন্তু তুমি ইন্দ্রিয়-মন নও। গুরুর এ সব কথা যখন শয়নে স্বপনে আসতে থাকবে, নিদ্রা আসবে না, মনের মধ্যে একই কথা ঘুরতে থাকবে, তখনই তোমার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার ধীরে ধীরে ঘুচতে থাকবে। মন হতে থাকবে বৃত্তিশূন্য। কবে আসবে সে দিন—যে দিন গুরুবাণী অন্তরে বসে অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাবে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে।

নিজেকে তদতিরিক্ত (আত্মাতিরিক্ত) কিছু ভেবো না। নিজেকে জীব ভেবো না। বারবার মুখে বল, 'জীবন' 'জীবন'। বারবার বলতে বলতে জীবন হবে 'জীব ন'। 'ন জীব' 'ন জীব' করতে করতে হয়ে যাবে শিব শিব। He is the wonder of all wonders। এই wonderful-কে ছেড়ে কেন wander করছ যথায় তথায়। তিনি তো সর্বনাথের নাথ, আপনাতে আপনি স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রিয়তমোত্তম। এই হল সদ্‌গুরুবাণী। গুরুবাণী মেনে চললে you will be absolutely free from blemishes, but if you go on according to your sweet will then you will not be able to come out of this Samsar Chakra। বাইরের বৈচিত্র্যকে সত্য বলে জানলে তোমার সত্য হারিয়ে যাবে। কিন্তু গুরুসত্যকে ধরলে বৈচিত্র্য হারিয়ে যাবে। [৫।৫।৯৩]

যোগ্যতার ভিত্তিতেই আত্মানুশীলন সম্ভব হয়

জীবনসংগ্রামের বহু স্তর অতিক্রম করে মানুষ এক বিশেষ স্তরে আসে যখন সে তার সুখদুঃখের পরিমাপের যোগ্যতা অর্জন করে। বর্তমানের সঙ্গে ভূত-ভবিষ্যতের বিচারের যোগ্যতা অর্জন করে। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, নিত্য-অনিত্য, স্থায়ী-অস্থায়ীর কারণ অনুসন্ধানের যোগ্যতা লাভ করে। তখন সে বাস্তব জগতের কার্য-কারণের অতীতে যাবার এবং বিকারের উর্ধ্বে গিয়ে শান্তিস্বরূপকে পাবার জন্য প্রযত্নশীল হয়। শান্তিস্বরূপকে

পাওয়াই মানুষের জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য। লক্ষ্য তো সবারই কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র গুটি কয়েক লোকই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কারণ শান্তি তো সবাই চায় কিন্তু শান্তি পাবে কোথায়? বস্তুজগতের বস্তুপ্রাপ্তির মধ্যে শান্তি খুঁজতে গিয়ে তাদের বিকার বাড়ে, প্রিয়তা-অপ্রিয়তাবোধের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ভাবনা-চিন্তা বাড়ে—কাজেই অশান্তি বাড়ে। তখন অনেকেই শাস্ত্রের আশ্রয় নেয়। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মুখস্থ করে তার মধ্যে আবেগ, উচ্ছ্বাস আসতে পারে কিন্তু স্থায়ী শান্তি বা আনন্দ পাওয়া যাবে না। শান্তিস্বরূপের পরাকাষ্ঠা হল ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম—নিজস্বরূপের যা পূর্ণ অধিষ্ঠান ও সত্য পরিচয়। এই শান্তিস্বরূপের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন একমাত্র তাঁরাই পারেন শান্তিস্বরূপের সন্ধান দিতে। অবশ্য সেই সব অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষদের কথার সাথে শাস্ত্রের কথার মিল থাকতে পারে তবে উভয়ের মধ্যে অনুভবসিদ্ধের কথার তাৎপর্য ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানের অনুভূতির যথার্থতার সঙ্গে অতীতের অনেক ঘটনার, অনেক জীবনীর সাথে মিলিয়ে নিতে গিয়ে আর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে তা এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে সেখান থেকে আর অনুসন্ধান হয় না।

তোমরা চাও বহুবার, পাও না একবারও। কারণ সত্য কল্পনা ও চেষ্টার ঊর্ধ্বে। সত্যকে অবলম্বন করে চেষ্টা সবাই করতে পারে না। মানুষের চেষ্টার পশ্চাতে কল্পনাই বেশি। কল্পনাভিত্তিক যে চেষ্টা মানুষ করে তার দ্বারা তার কামনাপূরণ সবটা হয় না। সেই জন্য চেষ্টা দ্বারা লব্ধ বস্তু যা-ই হোক না কেন তার দ্বারা তার দুঃখনিবৃত্তি ও শান্তি লাভ হয় না। তার কারণ মানুষ বুঝতে পারে না বলেই জীবনের যত সমস্যা এবং তার সমাধানের কোনও পথ তারা খুঁজে পায় না। সবই মানসজাত কল্পনার ফল। মনের লয়ে কল্পনার লয় হয়, সমস্যারও লয় হয়। আত্মজ্ঞানের উদয়ে মনের লয় হয়। তখন মনজাত সকল সমস্যার সমাধান হয়। কাজেই জীবনপথে চলতে গেলে উপযুক্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞর কাছ থেকে সত্যজ্ঞানের কথা জেনে নিলে অনেকটা সচেতন ভাবে জীবনপথে চলা যায়।

মানুষ নিজেদের সুবিধার্থেই দেবদেবীর concept তৈরি করেছে। যদিও শাস্ত্রে এদের উল্লেখ করে নির্দেশ দেওয়া আছে। অর্থাৎ এ সব দেবদেবীদের আশ্রয় করে আধ্যাত্মিক পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়া যায়। তবে এটা একটা মাঝখানের স্তর অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা। শাস্ত্র যাঁরা দিয়েছেন তাঁরাও জানেন কর্মের দ্বারা কর্ম সৃষ্টি হয়। কর্মনাশ হয় না, মুক্তিও আসে না। তার জন্য চাই জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারাই কর্মনাশ হয় ও মুক্তি লাভ হয়। তবে কর্মেরও প্রয়োজন আছে। কর্ম ছাড়া জীবন হল জড় মৃত্যুসমান অন্ধকারময়। কর্মের মাধ্যমেই এই জড়তা অন্ধকার দূর করতে হবে। এই পর্যায়ে অনেক বিকার আসবে ঠিকই, সেই সব বিকার সরাতে উন্নত পর্যায়ের জ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। তখনই প্রয়োজন হয় সৎসঙ্গের। সদ্‌গুরুই বুঝিয়ে দিতে পারেন কেমন করে'প্রকৃতি রজোগুণে কর্ম সম্পাদন করে আর তমোগুণে আত্মজ্ঞান আবৃত করে রাখে। মায়ার এই খেলা বোঝা খুব কঠিন। ঈশ্বর হাবুডুবু খান, দেবতারা হয় নাজেহাল, মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না। নিয়তি বা প্রকৃতি তিন গুণের মাধ্যমেই তাঁদের কার্য করেন।

পূজা ও ভক্তি

শাস্ত্রমতে দেবদেবীর পূজো করলেও দেহের বিকার, মনের বিকার দূর হয় না। কখনও-সখনও দেবতাদের কৃপায় কিছু অভীষ্ট সিদ্ধ হয় বটে তবে তাও যে পরমাত্মারই কৃপা, তা সকলে বোঝে না। তবে এই কৃপার দানও পরিণামী ও অস্থায়ী। দেবতার উপর নির্ভর করলে তাই অহংকার বাড়ে। অপর পক্ষে পরমাত্মার সাধনায় অহংকার, কর্ম, কর্মফল সবই তাঁর নামে surrender করতে হয়। তাঁকে পেতে তাঁর কৃপা লাভের যোগ্য করতে হবে নিজেকে। কর্ম করতে হবে বিচারের মাধ্যমে বিকার সরিয়ে; তার জন্য ধর্ম, সত্য ও জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে।

প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব হল দৈবীশক্তি, তামস বা তম হল আবরণশক্তি ও রজস্ বা রজ হল বিক্ষেপশক্তি। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে বিক্ষেপশক্তি আর আবরণশক্তিতে মায়া আবৃত করে রাখে আত্মজ্ঞান। কাজেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই দুই গুণের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে সত্ত্বগুণী করে তৈরি করতে হবে। দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, অভিমান, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান হল আসুরিক গুণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ২৬টি দৈবীগুণের উল্লেখ করেছেন। এই সব দৈবীগুণের উপরে আছে ছয়টি শুদ্ধসত্ত্বগুণ, তা হল—নিরন্তর প্রসন্নতা, স্বানুভূতি, প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, সদা আত্মনিষ্ঠা। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত না সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞানমুক্ত হতে পারবে না। পরমবোধের আশ্রয়ে এলেই অজ্ঞান পালাই পালাই করে। সদ্‌গুরুনিষ্ঠা ও সদ্‌গুরুপ্রীতিই হল অজ্ঞান বিনাশের অস্ত্র। বর্তমানে সেই রকম গুরুনিষ্ঠা একান্তই দুর্লভ। সদ্‌গুরু হলেন Absolute personified। সাধারণ গুরু পাওয়া যায় জীবনের প্রতিটি স্তরে। সাধারণ গুরু দেন indirect knowledge যা সব সময় অজ্ঞান দ্বারা অভিভূত ও subject and object-এর দ্বৈতবোধে সিক্ত। কিন্তু একমাত্র সদ্‌গুরুই দিতে পারেন direct knowledge বা অদ্বৈতবোধের জ্ঞান। অখণ্ডকে পেতে তাই ছাড়তে হবে খণ্ড প্রীতি। অখণ্ড প্রীতি হল ভক্তি। ভক্তি ভালবাসার দু'টি সূত্রের উল্লেখ করা যায়—(১) শাণ্ডিল্য সূত্র ও (২) নারদীয় সূত্র। (১) শাণ্ডিল্য সূত্র হল—'সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে'—Extreme love for the Lord or the God or the Supreme Self indeed. ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হলে আর দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি ভালবাসা চলে না। (২) নারদীয় সূত্র হল—'সা কিঞ্চিৎ পরমপ্রেমাস্পদম্'—Who is of the nature of love to some being.

আর অদ্বৈতের ভক্তি হল—'স্বস্বরূপং অনুসন্ধানম্' বা 'স্বাত্মানুসন্ধানম্'। সেখানে আরও বলা হয়েছে 'মোক্ষা শাস্ত্রনাং সমগ্রাং ভক্তি অতিগরিয়সী'। Seeking one's own nature is Bhakti. Immortality is the Love Divine. Immortality দ্বৈতে হয় না। অদ্বৈতেই হয়। মোক্ষই হল Love। আবার বলা হয়—'স্বাত্মানুসন্ধানম্ ভক্তিরুচ্চতে'— enquiry into the truth of real life–ই হল ভক্তির ব্যাখ্যা।

সদ্‌গুরু যা দেন তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে হয়। লোকে misuse করতে পারে, কারণ right use-এর training তো তাদের নেই। গুরুর সামনে তাই আসতে হয় humble হয়ে—তাঁর কাছে হতে হয় submissive and devotional।

আত্মার ধর্ম

আত্মার বাইরে কোনও কিছুই সিদ্ধ নয়। যা অনুভবসিদ্ধ হয় না তা থাকতে পারে না। আত্মা ভিন্ন কোনও অনুভবই সম্ভব নয়। আত্মা ভিন্ন আর যা-কিছু সবই উপাধি। দেহ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অহংকার, তিন গুণ (সত্ত্ব রজ তম), তিন অবস্থা (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি), পঞ্চকোষ, পঞ্চভূতাদি সবই উপাধি—সবই perishable, সবই impermanent, একমাত্র permanent entity হল আত্মা। তোমার আত্মাকে আবৃত করে রেখেছে তোমার মানসবৃত্তি ও কল্পনাবৃত্তি। Thoughts are only the cause of all mischief–সংকল্পই সকল দুঃখের কারণ। সংকল্প বর্জন করলেই তুমি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। দীর্ঘকাল ধরে কল্পনার যে জালে নিজেকে, স্বস্বরূপকে আবৃত করে রেখেছ, সামান্য কিছুদিনের অভ্যাস দ্বারাই কিন্তু সেই আবরণ উন্মুক্ত করা যায়। তা সত্ত্বেও আত্মজ্ঞান লাভের তীব্র ইচ্ছা সবার জাগে না। মৃত্যুকে তোমরা প্রশ্রয় দিয়েছ তাই মৃত্যু তোমাদের ঘিরে আছে। তোমরা তোমাদের sense of pleasure-কে প্রশ্রয় দিয়েছ, তোমাদের desire for enjoyment-কে প্রশ্রয় দিয়েছ তাই মুমুক্ষুতা বা intense urge for liberation তো তোমাদের হয় না। যখন মুমুক্ষুতা আসবে তখন গুরু আপনি এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

গুরুর presence নিজেই অনুভব করবে— presence is denoted by বিবেক ও বৈরাগ্য। যার বিবেক-বৈরাগ্য জাগেনি সে গুরুকে চিনতে পারে না।

গুরু ও গুরুদক্ষিণা

গুরু হলেন স্বয়ং বেদ বা জ্ঞানস্বরূপ। তিনি হলেন বেদ (জ্ঞান) personified। He is full of Bliss, reservoir of love, sinless, egoless, free from pride and arrogance, desire, anger, error. His spontaneous love does not depend on anything, not with any motive. He is the liberated soul who unfolds the Oneness of the Self to the seeker, who is humble and submissive. He delivers the most precious thing in a very lucid manner. তিনি অভয় দেন 'মা কৃষ্ট মা ভ্রষ্ট'। শিষ্যকে বলেন, তোমার সব ভবব্যাধি থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারি কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, দক্ষিণা দিতে হবে, আজীবন আমরণ অনুসরণ করতে হবে। তোমাকে হতে হবে an eternal follower of Oneness–এ-ই হল গুরুদক্ষিণা।

দ্বৈতবোধে হৃদয়দুয়ার খোলে না। সবাইকে অখণ্ড আপনবোধে মানলে আর দোষদর্শন হয় না। আবার দোষদর্শন করলে অখণ্ড আপনবোধে মানা হয় না। তাই তো তোমাদের প্রথম থেকেই অখণ্ড আপনবোধে মানার কথা বলা হয়েছে। জীবনে এই ভাবে চললে গুরু তাঁর fire of wisdom দিয়ে তোমার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বকে পুড়িয়ে নাশ করে দেবেন। সেই জন্য গুরুর কাছে, তাঁর পদতলে—'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' থাকতে হবে। হতে হবে completely self-surrendered। কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ। সেখানে last speck of desire-ও থাকবে না। গুরুও অনেক পরীক্ষা করবেন, সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সরিয়ে নেবেন। হয়ত জীবনের only support-কেও সরিয়ে দেবেন। second support থাকলে complete surrender হয় না। প্রথমে গুরুবাণী হৃদয়ে বসবে, তারপর হৃদয় থেকে যাবে হৃদয়ের গভীরে। ধীরে ধীরে ধ্যানে ও পরে সমাধিতে—সর্বত্র এক গুরুই বিরাজ করবেন। এক ভাব দ্বারা নিরন্তর ভাবিত হলে বিরুদ্ধতা চলে যায়। সমভাবে প্রতিষ্ঠিত মন হয় শান্ত। সেখানে থাকে না কোনও বিকার, আকার, অহংকার। সর্বসম, শান্ত, নির্বিকার, নিরাকার, চিদাকাশে হয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। যা তোমরা বাহ্যত দেখ তা হল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও বুদ্ধি। বুদ্ধির innermost chamber-এ আছে চিদাভাস or the unmanifest বা অব্যক্ত। And in the centre of the unmanifest lives the Supreme I, All Divine I—which is eternally One, has no second, no parallel, no shadow, no imitation—the alfa and omega of your spiritual Sadhana.

অহংকার ও অহংদেব প্রসঙ্গে

অহংকার চলে দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে তাই অখণ্ডের আমিকে ব্যবহার করতে পারে না, নিজের আপন বলেও ভাবতে পারে না সে। বলতে পারে না—তোমার সৃষ্টিতে আমি তোমার যন্ত্র মাত্র, তুমি আমার যন্ত্রী। তাঁকে মানতে পারলে সবই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড, এক অহম্ হয়ে যাবে। সেখানে শুধুই 'অহম্', 'ত্বম' বলে কিছুই নেই। কারণ 'ত্বম' বা তুমিভাবও কল্পনা। 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'-কে মানলে জানার আর কিছু বাকি থাকে না। একমাত্র অধিকারী পুরুষই তাঁকে জানতে পারে। অধিকারী পুরুষ হবে humble, simple, honest and truthful অর্থাৎ যা শোনা হয় তা ঠিক ঠিকভাবে বলা ও আচরণ করা। একটুও বাড়িয়ে বা কমিয়ে নয়।

একমাত্র সমবোধে, অখণ্ড একবোধের অনুশীলন দ্বারা অনাত্মার বৃত্তিকে ও ক্রিয়াকে সরানো যায়। আপনবোধ দিয়েই দ্বৈতবোধ সরে যায়। এই আপন অর্থ ego নয়—Supreme Knowledge—স্ববোধ, স্বয়ংতা, আপনতা,

নিত্যতা, পূর্ণতা—these are only the marks or indication of পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। Enlighten yourself with the light and gradually you will be enlightened। শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশে নির্মল সত্য জাগ্রত হবে। মলিনসত্ত্ব নিয়ে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। সংসারের দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যখন আসবে তখন আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ইন্দ্রিয় সুখসাগরে তোমরা সাঁতার দিচ্ছ, কল্পনা দিয়ে জীবন চালাচ্ছ, কল্পনা সরে গেলে থাকবে কোথায়? মৃত্যু যখন আসবে তখন চোখ আপনি বন্ধ হয়ে মন স্তব্ধ হবে, প্রাণ অচল হয়ে দেহ শীতল হবে সব, পড়ে থাকবে পিছনে। তুমি কোথায় চলে যাবে তুমি তাও জান না—এটাই চরম অজ্ঞান।

যারা worldly সুখকেই চরম ভাবে তারা তামসিক। কলি যুগে তো সবাই প্রায় তামসিক। তাই কলি যুগে দুঃখ বেশি, problem বেশি। To rise above the worldly problems, you should blame yourself, not others. Make yourself the cause and not the effect—try to become the ultimate cause of all effects. Then you will be the universal cause. And being universalized you can overcome the individuality. Then you will be 'সত্যম্ পূর্ণম্ কৃতকৃত্যম্'— the summom bonum of All—the Brahman, Atman Itself। [১৯।৫।৯৩]

উত্তম সংস্কারই জীবন্মুক্তির সহায়ক

বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনা বা পরমাত্মার সাধনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। এর জন্য চাই পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনার সংস্কার। যারা সত্যের সংস্কার, তত্ত্বের সংস্কার, আত্মার সংস্কার, ধর্মের সংস্কার ও জিজ্ঞাসা নিয়ে জন্মেছে তারা তপস্যা করবেই।

পরম সত্যের বক্ষে বৈচিত্র্য ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভ্রম থাকলে তার শোধন করা যায়। ভ্রম না-শোধন করলে বা ভ্রমকে না-জানলে সত্যকে কোনও দিনই জানা যাবে না।

অদ্বয়সত্যের বক্ষে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কোনও বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করতে কল্পনার বিষয় পরিহার করতে হয়। কল্পনা দিয়ে সত্যকে কখনও পাওয়া যায় না। সত্যকে পেতে হবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা যার ব্যবহার হয় তা-ই বিজ্ঞান—তার দ্বারা ভ্রান্তি নিরসন হয়। এর একমাত্র উপায় বিচার। অবশ্য বিচাবপ্রধান পথ সবার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আর একটি পথের কথা বলা যেতে পারে যেখানে কল্পনাকে মার্জিত হতে হবে এবং সত্যকে নির্দেশ করে কল্পনা লয় হয়ে যাবে। এ দ্বৈতবাদের পথ। পথ অনন্ত হতে পারে—কিন্তু সত্য অনন্ত নয়—সত্য এক অখণ্ড, নিত্য, পূর্ণ, নির্বিকার।

যোগ্যতার ভিত্তিতেই জীবন সমস্যামুক্ত হয়

নির্বিকারে কী ভাবে বিকারী থাকে এবং বিকারের মধ্যে নির্বিকার কী ভাবে থাকে—এ সব নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামায় না। জীবন যেমন চলছে তেমনি চলেছে, ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই চায় না। একদল ভাবে পৃথিবীতে এসেছে ভোগ করতে, চুটিয়ে ভোগ করে। কেউ কেউ অবশ্য ভাবে, বিচার করে—মানুষের ভোগ যত, দুর্ভোগ তার চেয়ে বেশি। তাই তারা দুর্ভোগ থেকে মুক্ত হতে ত্যাগের পথ গ্রহণ করে। যারা ভোগের পথে আছে তারা বহুত্ব ও দ্বৈতবাদ আশ্রয়ী। দ্বৈতের মধ্যে তারা শ্রেয়কে খোঁজে—সাধ্যের মধ্যে যা পায় তা নিয়ে থাকে। তবে একটা সময় আসে যখন ভোগের পথ আর ভাল লাগে না। সে সময়টা কারও কৈশোরে, কারও যৌবনে, কারও বা বার্ধক্যে আসে। অবশ্য বার্ধক্যে প্রায় সবার না-হলেও অনেকেরই আসে। বার্ধক্যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিভীষিকায় পীড়িত হয়ে, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই

পাওয়ার যোগ্যতা না-থাকায় ভোগের পথ ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হয় কিন্তু যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অভাবে তা সম্ভব হয় না। তার জন্য চাই সাধনা। সাধনায় যোগ্যতা ও সামর্থ্য বাড়ে। যথার্থ সাধনা হয় সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সচেতন ভাবে চলতে পারলে নতুবা নয়। [২৬।৫।৯৩]

মুক্তিলাভের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

সনাতন ধর্ম যে মুক্তির পথ দেখায় সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করে না। কারণ তার জন্য চাই সংযম। সংযম দ্বারাই মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। বহির্মুখী মন বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভোগের সন্ধান করে। তার জন্য নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপায়, অপরের সমালোচনা করে। অপরকে দোষী করা একটা crime। এ যুগে এর থেকে কারও রেহাই নেই। এমনকী যে সাধক সত্যের সন্ধান পেয়েছে তাঁকেও পূর্ব পূর্ব জন্মের প্রারব্ধ ভোগ করেই শেষ করতে হয়েছে। অনেকে আবার সদ্‌গুরুর পায়ে সঁপে দেয় তাদের কৃত কর্মফল—বিনিময়ে চায় কল্পিত সুখ। গুরু কল্পিত সুখ দিতে আসেন না। আর যিনি বিভূতি সহযোগে মানুষকে কল্পিত সুখ দেন, তিনি সদ্‌গুরু নন। সদ্‌গুরুর পায়ে সর্বপ্রকার আশ্রয় ত্যাগ করতে পারলে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি সম্ভব। কারণ কর্ম করে কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ কখনওই সম্ভব নয়। সংসারে থেকে সংসারী হয়ে মুক্তির আশা করে মুক্তি সম্ভব নয়। ঐশ্বর্য বা অর্থের দ্বারাও মুক্তি সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বত্যাগ দ্বারাই মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এই অমৃতত্ব বা মৃত্যুর অতীত মুক্তিস্বরূপ সমত্ব, একত্ব, নিত্যতা—তা-ই Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge। [২।৬।৯৩]

গুরুর কৃপায় দেহবোধের লয় ও আত্মবোধের উদয় হয়

আত্মবোধ হল প্রিয় ও শুদ্ধ। অন্য দিকে দেহবুদ্ধি, দেহজ্ঞান ও দেহপ্রীতি হল অশুদ্ধ। সদ্‌গুরুর কাছে সঠিক শিক্ষা না-পেলে এই প্রতীতি আসে না। সদ্‌গুরু তিনি-ই যিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুকে যিনি মানেন না। তাঁর কাছে সব-ই সৎ। সৎ-এর কোনও দ্বিতীয় নেই। দ্বিতীয় থাকলেই আসবে ভ্রান্তি। তোমার ভ্রান্তি তোমাকেই নাশ করতে হবে। [৯।৬।৯৩]

জগৎবোধে গুরুবোধের অভাব ও গুরুবোধে জগৎবোধের অভাব

প্রকৃতির আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরে কেন্দ্রীভূত ব্রহ্মকে সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। মন মেতে থাকে বাহ্য রূপ, নাম, ভাবের বৈচিত্র্য নিয়ে। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আরও চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছার ঘূর্ণাবর্তে মন ঘুরতে থাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে। যেদিন মনের সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ হবে সেদিনই আসবে তার সত্যকে জানবার, সত্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষা। আর সেই মনকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন হয় সদ্‌গুরুর। জীবনে সত্যের অনুভবের জন্য যে জিজ্ঞাসা, যে প্রশ্ন আসে তার সঠিক উত্তর একমাত্র সদ্‌গুরুই দিতে পারেন।

জ্ঞান কোনও চেষ্টাসাপেক্ষ শিক্ষা নয়। একমাত্র বৈরাগ্য ও বিবেকে প্রতিষ্ঠিত চিত্তই জ্ঞান লাভের অধিকারী। সেখানে মন আর মন থাকে না, গলে অ-মন হয়ে যায়। সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সত্য জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞান লাভের জন্য নিঃসঙ্গ একা হতে হবে। শাস্ত্রপাঠ করে নিজে নিজে চেষ্টা করে জ্ঞান লাভ হয় না। অর্থাৎ গুরু বিনা জ্ঞান লাভ হয় না। প্রজ্ঞানে ব্রহ্ম, বিজ্ঞানে ঈশ্বর, জ্ঞানে জীব, অজ্ঞানে জগৎ কিন্তু সদ্‌গুরু সদা বর্তমান।

পৃথিবীর যত রূপ, নাম, ভাব সবই বোধের reflection। আর বোধে বোধময় মূর্তিই হল গুরুমূর্তি। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি আছেন সবার আপন হৃদয়ক্ষেত্রে—সেখানে যেতে হয় তপস্যার মাধ্যমে। তপস্যা হল

সেই সাধনা যার তাপে দ্বৈতবোধ পুড়ে যায় ও অদ্বয়বোধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পায়। দ্বৈতবোধশূন্য হলে subject-object complex থাকে না—তখনই আসে সমত্ব।

যে গুরুর শরণ মাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হয়, লঘুভাব আর থাকে না, জিজ্ঞাসা থাকে না, সর্বকর্মের পরিসমাপ্তিতে আসে শান্তি, সমতা, পূর্ণতা, অখণ্ডতা, যে গুরুর কোনও জিজ্ঞাসা নেই, উদ্দেশ্য নেই, যাঁর অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আপনিই প্রকাশিত হয় সৎবাণী, যে সৎবাণী অসৎবাণীর প্রভাব মুক্ত করতে পারে, তাঁর শরণাগত হও। পূর্ণতা, অখণ্ডতা, নিত্যতা হল সদাশ্রয়ী আর পঞ্চভূত থেকে ঈশ্বর অবধি সবই অসদাশ্রয়ী। সৎবাণী দিয়ে এই অসদাশ্রয়ীকে দূর করতে পারলে নির্গুণ স্তরে পৌঁছে যাবে। সেখানে অন্তরের অন্তঃস্থলে পাবে পরমগুরুর দেখা। সেখানে আর কিসের জিজ্ঞাসা—সেখানে বক্তা, শ্রোতা সবই একাকার।

গুরুর symbol যোগ ও তন্ত্র মতে গুরুপাদুকা। পাদুকা হল সেই স্থান যেখানে গিয়ে অন্তরের সব জিজ্ঞাসা পরম ও চরমের চরণ আশ্রয় করে। একের দু'টি চরণ—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। এই দুই শক্তি যেখানে meet করে সেটাই হল saturated point।

ব্রহ্মের দৃষ্টিতে শক্তি হল মা। যাঁর কাছে দেহীং দেহীং করা হয় না, যাঁর কাছে সব ফিরিয়ে নেবার আকুতি। যিনি ত্যাগে সাহায্য করেন, কারণ 'ত্যাগ্যাৎ শান্তি'। গুরু আচরণ দ্বারা তা-ই দেখিয়ে যান। তাঁর মতো কেউ হতে চায় না, অথচ তাঁকে পেতে চায়। তাঁকে পেতে তাঁর মতো হতে হবে। [৩।৭।৯৩]

জীবনে প্রবৃত্তির পথ ও নিবৃত্তির পথের পার্থক্য

এখানে সব সময় আত্মবোধের কথাই বলা হয়। অন্তরের গভীরে, মনের গভীরে যে অমৃতময় শান্তি আছে তার কথাই বলা হয়। এই অমৃত, শান্তিকে ফেলে বৈচিত্র্যের পিছনে ভেদ জ্ঞানের পিছনে বা দ্বৈত জ্ঞানের পিছনে ছোটাই হল পশুবৃত্তি। এই পশুবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির জন্যই পশুপতির খোঁজ করতে হয়। পশুপতি হলেন শিব। যিনি সর্বকল্যাণময়, সর্বমঙ্গলময়। তিনিই একত্ব, সমত্ব ও পূর্ণত্ব। তিনিই শিবগুরু। শিবগুরু বা আত্মার মহিমা নানা ভজনের মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শান্তি প্রসঙ্গে

মানুষের ইন্দ্রিয় মন কিন্তু আত্মানুভূতি চায় না। চায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করতে। কিন্তু কোথা থেকে কী ভাবে তা সিদ্ধ হবে তা সে জানে না। ভোগের জন্য তার থাকে একটা দাবি। তার দাবিপূরণের জন্য ছোটে এদিক থেকে ওদিকে। শান্তি তো দাবি করে পাওয়া যায় না। জোর করে যেমন ঘুম আসে না—আপনা আপনি আসে, তেমনি শান্তি, যা হল আরও গভীরের, তাও আসে আপনা আপনি। শান্তি জোর করে, ধার করে, চুরি করে, পাওয়া যায় না। কারও কাছ থেকে ছিনিয়েও আনা যায় না। শান্তি কারও কাছে পাওয়া যায় না—শান্তি হল একান্ত নিজস্ব বস্তু। কারও উপর নির্ভরশীল নয়। এ কথা একমাত্র তিনিই জানেন যিনি শান্তি পেয়েছেন। তিনিই সদ্‌গুরু। তিনিও অপরকে শান্তির নির্দেশগুলিই ধরিয়ে দিতে পারেন—তার বেশি কিছু দিতে পারেন না। আর সেই গুরুর নির্দেশগুলি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে পারলেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে অন্যথায় নয়। শান্তির যথাযথ demonstration হল নিঃসঙ্গতা। সাধারণ মন নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু শান্তিকামী মনের পক্ষে নিষ্ক্রিয়তা, নিষ্কামতা, নিস্পৃহতা ও নিঃসঙ্গতা একান্ত দরকার। যিনি আত্মজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন তিনি তুষ্ণি অথবা মৌন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। যে মন মৌন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, সংযত হয়েছে, সে মনে আত্মজ্ঞান আপনি নেমে আসে ঐকান্তিকতা, একতা, সমতা ও পূর্ণতা রূপে। আত্মজ্ঞানের নির্দেশ দেওয়া যায় না তবে তার অন্তরায়গুলিকে নির্দেশ করে সচেতন করান যায়। অন্তরায়গুলিকে সচেতন ভাবে দূর করতে পারলেই সাধনা সিদ্ধ হয়।

আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞ

আত্মজ্ঞ কখনও ছলনা করেন না। আর যে ছলনা করে সে আত্মজ্ঞ নয়। কারণ আত্মজ্ঞানী দ্বৈত ভাবে চলতে পারেন না—তিনি সর্বদাই সব কিছুকে আত্মাতে ও আত্মাকে আপনভাবে দেখেন, শোনেন, মানেন ও জানেন। তা-ই Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge। 'আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং' ভাব। এটাই আত্মজ্ঞানের নির্দেশক। কাজেই আপনবোধে আপনার মধ্যে সব কিছুকে দেখা, শোনা, জানা ও মানার সাধনাই হল আত্মজ্ঞানের সাধনা। তোমাদের জপ-ধ্যানের সময় চিত্ত চঞ্চল হয়, মন স্থির হতে পারে না—এ সবই হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত। এর মূলে আছে কর্তৃত্বাভিমান, প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা, অহংকারের বিকার। মন জগদাত্মা, অখিলাত্মা, সর্বভূতাত্মা ব্রহ্মগুরু বলে যাঁকে নির্দেশ করে তাঁকে জানেও না, বোঝেও না। তাই তো বলা হয়েছে, প্রথম থেকেই মনকে অখণ্ডের সেবায় নিযুক্ত রাখ। ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যা আসে তাকে অখণ্ড একবোধে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র অভ্যাস কর। এতদিনের দ্বৈত-বোধের অভ্যাসকে একবোধের অভ্যাস দ্বারা নির্মূল কর। যদিও অখণ্ড প্রচেষ্টানিরপেক্ষ। তবে প্রথম প্রথম সচেতন ভাবে অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। খণ্ড চেতন নয় প্রত্যেককে পূর্ণস্বরূপের চরমতম অনুভূতির স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

এক একটা যুগ আসে যেখানে পূর্ণের অনুভূতি দিতে এমন সব মহাপুরুষরা আসেন যাঁরা সত্যবোধে প্রবুদ্ধ করে যান—সমগ্রবোধে নিত্য, পূর্ণ, একবোধের মহিমা দিয়ে যান। তারা মতপথের কথা বলেন না—শুধু অনুভূতির স্মৃতিকে ধরিয়ে দিয়ে যান। শুধু সত্যানুভূতির কথা, আত্মানুভূতির কথাই বলে যান।

তুমি ও আত্মবোধ

তোমার সর্বানুভূতির কেন্দ্র তুমি, তাই অপরের সঙ্গে আচরণে ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। অন্যথায় অনুভূতির স্থিতি নষ্ট হয়। নিজেকে নিজেরই বশ করতে হবে। অন্তরের এই আমিকে পূর্ণ করে বাইরের এই দেহের মধ্যে পাবে না। অন্তরের অন্তঃস্থলে খুঁজে পাবে নিজের সত্যের আমি, পূর্ণের আমি, অখণ্ডের আমি, ভূমার আমিকে। এই ভূমার আমিই হল ব্রহ্ম-আত্মা-পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-পরমেশ্বর। আত্মজ্ঞানীর কাছে শুধু এই আমির স্বরূপমহিমা নিত্য অদ্বয়বোধে স্ফূরিত হয়। এই আত্মবোধের কোনও বিকল্প নেই, বিকৃতিও নেই এবং প্রত্যবায়ও হয় না। গুরুমুখে শ্রবণের মাধ্যমে উত্তম জিজ্ঞাসু ভক্তের হৃদয়ে সত্য আত্মবোধের স্মতি জাগ্রত হয়। এই স্মৃতিকে সচেতন ভাবে বিচারপূর্বক নিরন্তর ধ্যানের মাধ্যমে আপন করে দেখা, জানা ও মানাই হল আত্মবোধের সাধনা। পরিণামে আত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বানুভূতিরূপে ফুটে ওঠে। এই স্বানুভূতি হল প্রত্যক্ষানুভূতি। এর অপর নাম অপরোক্ষানুভূতি।

যুগে যুগে সত্যের রূপ

সত্য যুগে এই জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মা বিতরণ করেছিলেন। সেখানে ব্রহ্মা ছিলেন বক্তা ও ঋষিরা ছিলেন শ্রোতা। তখনও এই নিত্য, সত্য, ভূমা, এক, অখণ্ড তত্ত্বই প্রকাশ হয়েছিল।

ত্রেতা যুগে মহাঋষি বশিষ্ঠদেব এই এক আত্মতত্ত্ব, আত্মকথা একনাগাড়ে রাজদরবারে বলেছিলেন জীববোধে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রকে স্ববোধে প্রতিষ্ঠা করতে। সত্য, ত্রেতায় যা বলা হয়েছিল সবই ছিল শ্রুতি—সদ্‌গুরু মুখনিঃসৃত মহাবাণী।

দ্বাপরে ব্যাসদেব তৈরি করেছিলেন স্বীয়পুত্র শুকদেবকে বিশেষ ভাবে এই আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে। সেই সময় থেকেই শুরু হয় গুরুপূজা।

কলি যুগেও অনেক মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ এসে দিয়ে গেছেন তাঁদের মত, পথ ও আদর্শ। তবে এ যুগের অদ্বৈতবাদের সর্বোত্তম অধিকারী পুরুষ, অদ্বয়জ্ঞানের নির্দেশক—আচার্য শঙ্কর। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

সদ্‌গুরুরা হলেন সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা। তাইতো ব্রহ্মা যখন আপন সৃষ্টির জালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি তার চেয়ে শ্রেয় বিষ্ণুর আশ্রয় নেন। বিষ্ণু আবার তার চেয়েও শ্রেয় শিবের আশ্রয় নেন। তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হলেন একই মূলের তিনধারা। একে অপরের পরিপূরক। ব্রহ্মাকেও মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভ, মহিষাসুর দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয়েছে।

ব্রহ্মার পর বশিষ্ঠদেবকেও অনেক resistance দিতে হয়েছে। বিশ্বামিত্র যখন তাঁর শতপুত্রকে ধ্বংস করলেন তখনও তিনি জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানস্বরূপ যাঁর ইষ্ট তিনি কেন গুণের কাছে, প্রকৃতির কাছে, অহংকারের বিকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন? স্ত্রী অনসূয়াকে সবটুকু সহ্যক্ষমতা দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রম ধ্বংস করে, কামধেনু চুরি করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে অবিচল বশিষ্ঠদেব বলেছিলেন—আত্মশক্তিই আসল শক্তি। আপন শক্তি দিয়েই আপনাকে উদ্ধারে রত হও। কামধেনু সেই আপন শক্তিতেই আপনাকে রক্ষা করেছিল।

সেই একই কথা দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও বলেছিলেন।

ব্যাসদেব, শুকদেব এবং রাজর্ষি জনকের জীবন ও আচরণে পরবর্তী কালে শঙ্করের জীবনে ও আচরণে একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। উৎপীড়িত হয়েও সকল উৎপীড়ন সহ্য করে সগৌরবে মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন আত্মজ্ঞানের কথা। বুদ্ধদেবকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুই তাঁকে তাঁর প্রবুদ্ধত্ব থেকে সরাতে পারেনি।

তোমরা গুরুভজন কর। গুরুভজন আসলে হয় আত্মজ্ঞান লাভের পর। অন্তরে অন্তরাত্মা পরমগুরুর দর্শন পেলে আত্মানন্দে পরম আশ্চর্যময় পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের স্তবস্তুতি আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

[৪।৮।৯৩]

গুরুবাণীর মাধ্যমে জিজ্ঞাসুর অন্তরের অজ্ঞান অপসারিত হয়

গুরু যোগ্য অধিকারীকেই জ্ঞান দেন। অধিকারী যোগ্য না-হলেই misuse করে। অতীতে গুরুর কাছে যে জ্ঞান পেয়েছে তা বর্তমানে নিজের বলে চালালে বা professionally use করলে তা হয় absolutely false। তোমাদের বারবার বলা হয়েছে—'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) যা দেয় তা কোনও দিনই conventional নয়। চিরাচরিত convention-এর বিরুদ্ধে 'এ' চিরদিনই বিদ্রোহ করে এসেছে। অগ্নি তার দাহিকাশক্তি দ্বারা সব কিছু পুড়িয়ে ফেলে কিন্তু নিজেকে পোড়ায় না। তেমনি জ্ঞানাগ্নি অজ্ঞানের মূল পর্যন্ত বিনাশ করে সব কিছুকে জ্ঞানময় করে তোলে।

কলি যুগে গুরু বিনা জ্ঞান অসম্ভব। আবার কলি যুগেই আছে গুরুমারা বিদ্যার অভ্যাস। এর কারণ হল কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব। অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চায় কৃতজ্ঞতার একটি বিশেষ স্থান আছে। ধর্মবিজ্ঞানে অকৃতজ্ঞ হলে চলবে না।

অজ্ঞানকে সরাতে গুরুকে বা কোনও living personality-কে সামনে রাখতেই হবে। শাস্ত্র পড়ে অজ্ঞান দূর হয় না। বরং আরও বাড়ে। Living realizer-এর direct বাণী ছাড়া অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার যাবে না। আত্মজ্ঞানী গুরু কোনও মতবাদকে প্রশ্রয় দেন না। সনাতন একের ধর্মই এঁদের ধর্ম। যারা ভান করে তারা আছে অবিদ্যার বিদ্যা নিয়ে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী আছেন পরাবিদ্যা নিয়ে।

যিনি একবার বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর আর কোনও কর্মের সু কী কু সে কথা মনে থাকে না, থাকে না কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব। শুধু থাকে আত্মমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য। এই আত্মমহিমা প্রচারই হল ভজন। তোমরা সেই সব অনুভবের ভজন পেয়ে গেছ আগেই কিন্তু গুরুদক্ষিণা দাওনি। তবে একবার আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার আর কিছু থাকে না। তাইতো তোমাদের কাছে দক্ষিণা আগেই নেওয়া হবে— Sincerity, devotional and faultless হয়ে অভিমান অহংকার বর্জন করে একান্ত সংগোপনে তাঁর ভজনই হল দক্ষিণা। জ্ঞান তো তোমাদের হৃদয়ে নিহিত আছেই ভজনের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধ হলে তা-ই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ হবে বিজ্ঞানরূপে। বিজ্ঞান হল বিশুদ্ধ জ্ঞান অথবা জ্ঞানস্বরূপ। [১৮।৮।৯৩]

আত্মজ্ঞগুরুর মাহাত্ম্য

নিজেকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করতে you will have to follow the methodical means and process and this should be done according to the sayings of your Master। এই Master তিনিই যিনি আপন অন্তরে আত্মজ্ঞানের অনুভব করেছেন। যাবা পুঁথিপুস্তকের সাহায্যে জ্ঞানের কথা বলেন তাদের কথা নয়। এমন পুঁথিগত জ্ঞানের গুরু আজকাল অনেকেই সেজেছে। তারা সংসারবদ্ধ জীব। গুরুগিরি তাদের ব্যবসা। আত্মজ্ঞানী সর্বদা সংসার বিষয়ে untouched and unaffected থাকেন—তাঁর কাছে দুই নেই। তিনি কী করে আসক্ত হবেন আর কার প্রতিই বা আসক্ত হবেন। তাঁর কাছে everything besides the Self is imagination। Imagination হয় মনে। মনেই ওঠে রূপ, নাম, ভাবের বুদবুদ। জলের বুদ্‌বুদ্‌ যেমন জলে ওঠে আবার জলেই মিশে যায় তেমনি নাম, ভাব, রূপের জগৎ মনেই ওঠে আবার মন সরে গেলে সব মিলিয়ে যায় বোধস্বরূপে।

এই সূত্রের অনুভূতি সবার হয় না। Until they follow and live in these words and enter into the essence of these words. এই যে দিনের পর দিন শুনছ এই শোনা থেকে সারবস্তুটুকু নিতে না-পারলে কোনও লাভই হবে না।

বিকার সৃষ্টি হয় মন থেকে। যদিও মন আছে সত্যেরই বক্ষে। সত্যের বক্ষে থেকেও মন কিন্তু সত্যকে জানতে পারে না নিজেরই দোষে। মনের দোষ দূর করার একমাত্র পথ হল সৎসঙ্গ এবং সৎগুরুর সঙ্গ করা ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলার নিরন্তর অভ্যাস করা।

বর্তমানের তথাকথিত গুরুরা হলেন professional কেউই devotional নন।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেকে তৈরি করতে কতগুলি বিধি ও নিয়ম পালন করতে হয়। বিধি হল সে সমস্ত law যা আমাদের আচরণ করতেই হবে। আবার কতগুলি নিয়ম আছে যা আমাদের বর্জন করে চলতে হবে। অবশ্য আচরণ ও বর্জন এ দু'টিই হল কল্পনা। ক্ষুদ্রতর কল্পনাকে সরাতে বৃহত্তর কল্পনা চাই। এই বৃহত্তর কল্পনা দেন গুরু। বর্তমানে মানুষ গুরুকেই control করতে চায় নিজের মতো করে। তাইতো religion and spiritual science বর্তমানে politics-এর কবলে। ধর্ম হল এখন ব্যবসাক্ষেত্র। সবাই চায় প্রাধান্য পেতে। আর প্রাধান্য নাশের জন্যই আছে Science of Oneness।

প্রতিটি জীবকে যে গুরুরূপে নিতে পারে সে-ই সদ্‌গুরুর প্রতি সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠাবান। তারই গুরুজ্ঞান লাভ হয় অপরের নয়।

সংসারীদের মতো আত্মজ্ঞানী বা আত্মগুরুর কোনও duty থাকতে পারে না। দেবতাদেরও অনেক obligatory duty আছে। কেন 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কোনও গুরুও নেই শিষ্যও নেই এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—'এর' থেকে ছোটও কেউ নেই। 'এর' থেকে বড়ও কাউকে পায়নি। I am born with

this Oneness and made of that Oneness. I am talking of myself, not of my individual appearance; I am talking of that 'I' dwelling in all। দেহ Consciousness ছাড়া চলে না। 'এ' আছে তোমাদের সবার Consciousness-রূপে তোমাদের আমির মধ্যে আমি হয়ে। কাজেই সনাতন ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম নয়। তা হল Supreme Knowledge। 'এর' মধ্যে এই Supreme Knowledge-ই জীবনরূপ নিয়ে আছে। তাইতো 'এর' কোনও সম্প্রদায়ও নেই, শিষ্য-প্রশিষ্য নেই।

সূর্যের আলোতে আলোকিত সবাই। কিন্তু সেই আলোকে তো কেউ অতিক্রম করতে পারে না। সবকে আলো দিয়েও সূর্য কিন্তু সবার থেকে স্বতন্ত্র। সে রকম আত্মা কোটি কোটি সূর্যকে প্রকাশ করে কিন্তু আত্মাকে অন্য কেউ প্রকাশ করতে পারে না। আত্মার জ্যোতি কোটি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের চেয়েও সুশীতল, নিত্য একে প্রতিষ্ঠিত শান্ত সমাহিত। উপাধি দিয়ে একে ব্যবহার করা যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরু নির্দেশিত পথে তাঁর নিয়ম পালন করলে এই অখণ্ড আত্মাতে, আমিতে জীবন মিশে যাবে। নদীর যেমন সাগরে পতিত হয়ে মিলে মিশে যাওয়াই জীবনের সার্থকতা তেমনি মানুষেরও অখণ্ড, পীযূষপূর্ণ ব্রহ্মসাগরে মিশে যাওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে সাগরে হেয়-উপাদেয়, অতিরিক্ত-ভিন্ন কিছুই নেই। নিরন্তর সচ্চিদানন্দধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। সমত্ব, একত্ব, নিত্যপূর্ণতাই তার নির্দেশ বা লক্ষণ।

ষড়ৈশ্বর্য

জ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রী, যশ, শৌর্য ও বীর্য—এ হল ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্য। অপরপক্ষে Love, Lord, Liberty, Light and Law হল পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য। তিনি স্বয়ং বিগ্রহ। তাই তিনি 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন, পরমে পরম'। তাঁকে পেতে one must be loyal to the Guru। এখানে intellectual jugglery-র কোনও স্থান নেই। কর্তৃত্বের বাহাদুরি করলে বিকার ভোগ করতেই হবে। শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত না-হয়ে গুরু সাজলে বিকার অনেক বেশি ভোগ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে

গুরু সাজে সেজো না মন
গুরুসাজে সাজলে ইচ্ছামতো।
পাবে গুরু সাজা জনম জনম।

আত্মগুরুকে সাজতে হয় না। সাজা গুরু হলেন subject to nature আর আত্মগুরু হলেন Lord of nature—ruled by Himself।

মন ও মনের অধিষ্ঠান

মনের অধিকারী মনের অধিষ্ঠানকে ধরতে পারে না। বিশুদ্ধ অধিষ্ঠানকে মন জানে না। আবার মন তাকে ছাড়া থাকতেও পারে না। যেমন আকাশ ছাড়া কোনও বস্তু থাকতে পারে না কিন্তু আকাশ তো বস্তুর অধীন নয়। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের বক্ষ থেকে উঠে আবার সমুদ্রবক্ষেই লীন হয়। এতে সমুদ্রের কিছু যায় আসে না। মনের বৃত্তি সমূহের সমষ্টি হল মানুষ। মানুষের দু'টি দিক—একটি কর্তা, অপরটি বিষয়। অপর পক্ষে মনের অধিষ্ঠান আত্মা হলেন 'স্থানুরচলং সনাতন'—যার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি নেই, তিনি নিত্য অবিকারী, অপরিণামী, নিষ্কল, নির্মল, নিরঞ্জন। এর বোধার্থ না-খুললে জ্ঞাননয়ন খুলবে না। তাই বলা হয় পিশাচের মতো বিষয়ের পিছনে ধাবিত হয়ো না।

আত্মাকে অবজ্ঞা করে অহংকার নিয়ে চললে, মহৎকে সরিয়ে অভিমানকে নিয়ে চললে মনের মল কোনও দিনই নাশ হবে না। মনের মল নাশ করার জন্য চাই জ্ঞান অসি। নিজের মনকে দমন করে গুরুপদে যে

সমর্পণ করতে পেরেছে, গুরুনির্দিষ্ট অনুশাসন দ্বারা মনের মল নির্মূল করেছে—সে জ্ঞানী। জ্ঞানীর কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানালে তিনিই করুণা করে পথ বলে দেবেন।

মন বোধের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হলে ব্যক্তিসত্তা সমষ্টিসত্তায় মিশে যায়। যাকে জানা হয় নাই, মানা হয় নাই তাকে জানা মানাই হল সাধনা। সাধনা হল অন্তর-বাহিরের ভেদকে একের নির্দেশে নিয়ে আসা। সেখানে বিরোধিতা, শত্রুতাকেও গুরুরূপে নিতে হবে। একজ্ঞানে থাকার জন্য আত্মজ্ঞানী অপরের আচরণে আঘাতপ্রাপ্ত হন না। তাঁর শত্রুও নেই মিত্রও নেই। [২৫।৮।৯৩]

আত্মজ্ঞপুরুষের বৈশিষ্ট্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে চলে এক-এরই খেলা। Oneness দিয়ে বৈচিত্র্যের খেলা Oneness-কে না-পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হয় না। তখন সে আপনার বক্ষে দেখে আপনাকে। আপন অন্তরের harmony, melody সকল বৈচিত্র্যকে আপনবক্ষে ধারণ করে আদর করছে। যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বর্তমান তাঁর শক্তি অনাত্মরূপে সব supply করে যাচ্ছেন। অনেকের চোখে যা দোষের, আত্মজ্ঞ প্রেমিকের কাছে তা সমভাবে গ্রহণীয়। ত্যাজ্য বলে তাঁর আর কিছু থাকে না। মৃত্যু হল জীবনের চরম ভয়, যাকে জীব সব সময়ই পরিহার করতে চায়। মৃত্যু মানুষের কাছেও সর্বাধিক ভয়ের বস্তু। সেই মৃত্যুকেও আত্মজ্ঞ অমৃতস্বরূপ বলে জানে। তা তাঁর কাছে কোনও ভয়ের কারণই নয়। কারণ ভয় মাত্রই হল কল্পিত মনের ভ্রম। যা ভেদরূপে অনুভূত হয়। আবার অভেদজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা-ই অভেদরূপে অনুভূত হয়। তাইতো তিনি দিয়ে যান 'অভী' মন্ত্র। জীবকে যিনি অভী মন্ত্র দিতে আসেন তিনিই সদ্‌গুরু। এই তত্ত্ব এতই ব্যাপক যে সসীম জ্ঞান দিয়ে ধরা যায় না।

অজ্ঞানজাত কর্ম হল দুঃখের কর্ম। জ্ঞানজাত কর্ম হল আনন্দময়। এই জগৎ সৃষ্টির কারণ হল আনন্দ। আনন্দ থেকে সৃষ্ট, আনন্দে স্থিত আবার আনন্দেই তার লয়। এই আনন্দেই শক্তি ও জ্ঞানের বিজ্ঞান অধিষ্ঠিত। আনন্দই তাদের অধিষ্ঠান। আত্মাই হল আনন্দস্বরূপ। যা সব কিছুর অধিষ্ঠান, যাকে কেন্দ্র করে বা অবলম্বন করে এই জগৎ সৃষ্ট, যা নিত্যস্থিত, স্থায়ী, ভূমা, নির্বিকার, নিরাকার, সর্বসংস্কারের ঘনীভূত রূপ। এই হল ভূমার আমি বা পূর্ণের আমির পরিচয়। যিনি কর্তা নন, যে আমি নিত্যবর্তমান যাঁকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরও সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে অনেক ধাক্কা আসলেও তিনি নির্বিকার থাকেন। তাঁর মধ্যে বিকারের অভিব্যক্তি বাহ্যত প্রকাশ পায় বলে সবাই তাঁকে সাধারণ মনে করে। কেউ পূজা করে, কেউ হেয় করে। কেউ চায় শক্তি, কেউ চায় অর্থ। তিনি নীরবে হাসেন। শিশুর অত্যাচার যেমন পিতামাতা আনন্দের সঙ্গে সহ্য করেন সদ্‌গুরুও তেমনি শিষ্যের অত্যাচার আপনবোধে গ্রহণ করেন। শাসনও করেন পরম প্রেমে পরম আদরে।

অতীতে শিষ্যকে কঠোর শাসনের মধ্যে রেখে তৈরি করতেন গুরু। তারপর নিজের আসনে বসিয়ে দিয়ে যেতেন। শাসনের বদলে যে স্নেহ ও প্রেম তারা পেয়েছেন তার জন্যই তারা চিরকৃতজ্ঞ। ভোলাগিরি, কাঠিয়াবাবা, সন্তদাসবাবার জীবনে তা মূর্ত। মহাপ্রভুর জীবনেও দেখা যায় যবন হরিদাসকে বুকে নিয়ে বলছেন, আমি শুদ্ধ হলাম, মুক্ত হলাম। আবার ছোট হরিদাসের কিছু ব্যবহারে বিশেষ রুষ্ট হয়ে তিনি তাকে ত্যাগ করেন। পরে হরিদাস প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন—সে আমাতেই ছিল, আমাতেই আছে। [৮।৯।৯৩]

আত্মবোধ ও অনাত্মবোধের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

জানা ও অজানা হল মনোধর্ম। আত্মার অভিব্যক্তি আত্মাই। অনাত্মাও আত্মার বক্ষেই অবস্থান করে। তবে এ কথা একমাত্র আত্মজ্ঞানী না-হলে জানা যাবে না। আত্মায় যা প্রকাশিত তা আত্মা নিজেই। অদ্বয়-বোধের অনুভূতি পাবার জন্য অদ্বয় ভাবেই চলতে হয়। মন যাতে অন্য কোনও দিকে চলে যেতে না-

পারে এবং বৈচিত্র্যের মাঝে হারিয়ে না-যায় তার দিকে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। তার জন্যই প্রয়োজন সৎসঙ্গের, গুরুসঙ্গের। গুরুবাণী কর্ণের মধ্য দিয়ে মরমে পশবে, গুরুর আচরণ যা তিনি জীবনে রেখে যান, তা তোমাদের উদ্বুদ্ধ করবে। যদিও বাস্তবে দেখা যায় আত্মজ্ঞকে যুগে যুগে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কারণ আত্মজ্ঞর বাহ্য ব্যবহার অজ্ঞানীর মতো, পার্থক্য করা কঠিন। এই পার্থক্য অনুভূত হয় অনুভূতির গভীরে।

অপরের দোষ দেখতে দেখতে নিজেই দোষী হবে। আবার অপরের গুণ দেখতে দেখতে নিজেই গুণী হয়ে যাবে। নিজেকে অপরের চেয়ে ভাল শ্রেয় মনে না-করে অপরকে শ্রেয় মহান দৃষ্টিতে দেখতে পারলেই হয় সঠিক গুরুভজন। গুরু হলেন জ্ঞানমূর্তি। গুরু সর্বভূতে নিত্যবর্তমান। অপরকে হীন দৃষ্টিতে দেখলে হয় গুরুনিন্দা। স্বতত্ত্বই হল গুরুতত্ত্ব। আবার গুরুতত্ত্বই হল আত্মতত্ত্ব।

কর্মজাত স্বভাবের মনের মল শোধনের জন্য সচেষ্ট ও সচেতন হওয়া দরকার। বিনা সচেতনতা অজ্ঞানজাত কর্ম বিকৃত ফল দেয়। কর্মজ্ঞান যুক্ত হলে বিকারমুক্ত হয়। স্বভাবকে স্ববোধের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে গুরুবাণী। ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে জাগাতে যে অনুভূতি তার ঘনীভূত রূপই হল গুরু। গুরুর কল্যাণদৃষ্টি, সহৃদয়তা, করুণার্দ্র ব্যবহার যত কঠিন ও কঠোর হোক উদ্দেশ্য শরণাগতকে বহির্মুখী ভাব প্রবণতা থেকে অন্তর্মুখী করা, অন্তরের বৃত্তিকে শুদ্ধ করা। অন্তরের দৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয় স্বরূপকে অভিন্ন ভাবে অনুভব করান, তারপর নিজেই মিশে যান শিষ্যের ভিতরে। গুরুর কোনও প্রতিপক্ষ নেই। তিনি অজ্ঞানকে, জ্ঞানকে গ্রহণ করে নিজেই প্রজ্ঞানঘনরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রেমঘন, এক-এর বিজ্ঞানের প্রকাশক। তাই বলে তিনি যথেচ্ছাচারী নন। তাঁর দেহ, মন, প্রাণ, অহংকার, চিত্ত একবোধে জাড়িত হয়ে সমবোধে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত।

কামনা মানুষকে বহির্জগতের অনাত্মার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়ে দেয়। ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে সবাই যুক্ত হয় এই কামনার মাধ্যমে। কামনার প্রভাবেই মানুষ অন্তর্মুখী হতে পারে না। স্বভাবদেবতা এমন ভাবে এই দেহ সৃষ্টি করেছেন যে ইন্দ্রিয় বৃত্তি বহির্মুখী হবেই। এই ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করতে চাই সদ্‌গুরুর সাহায্য। অসৎকে সৎ করার ইচ্ছা গুরুই জাগ্রত করেন। তদনুরূপ কর্ম করলে ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী প্রবণতা কমে এবং ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে অন্তর্মুখী হয়। তখন আর 'আমার আমার' ভাব থাকে না। নির্জনতা, একাকীত্ব, অন্তর্মুখী ভাব আনতে সাহায্য করে। অথচ সাধারণ মানুষ নির্জনতায় ভয় পায়, তারা শব্দ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। চোখ খুঁজে বেড়ায় রূপ বাইরের জগতে। আর এই সব ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে একমাত্র আশ্রয় হল গুরুশক্তি। গুরুর প্রতি আস্থা, গুরু নির্ভরতা যদি ঠিকঠাক থাকে ইন্দ্রিয় শান্ত হতে বাধ্য। তখন সংসার বৈচিত্র্যের ভিন্ন ভিন্ন মত, পথ, ভাবনা ও কর্মের মধ্যে একত্বকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। গুরু সেই ভাব দিয়ে দেন। ঈশ্বর-আত্মা অভিন্ন বলে ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি নিষ্ঠা হয় এক অভ্যাসের মাধ্যমে। বহির্মুখী অভ্যাস, অন্তর্মুখী অভ্যাস ও সমান অভ্যাস একই ইচ্ছার তিনটি গতি।

অনুভবসিদ্ধ বলেন, খুঁটি ধরে থাক। খুঁটি ছেড়ে যেও না। এ জীবনে যে সুযোগ পেয়েছ আগামী জন্মে তা হয়ত নাও পেতে পার। তাই এ সুযোগ কাজে লাগাও। সাধারণ মন বৈচিত্র্যকে সত্য বলে ভাবে। কিন্তু বিচার করে দেখবে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি নেই। আমি দেহও নই, মনও নই, প্রাণও নই, অহংকারও নই, চিত্তও নই—আমি কর্তাও নই, ভোক্তাও নই, জ্ঞাতাও নই, জ্ঞেয়ও নই। আমি জ্ঞানস্বরূপ। এটাই গুরুভাব। এই গুরুভাব যার আসে গুরু তাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করেন, তার হারানো স্মৃতি ফিরে পেতে ও পূর্ণ মহিমায় সচেতন ভাবে অবস্থান করতে। তোমার আদর্শকে লক্ষ্য করে আরও অনেকে প্রেরণা পাবে। সব সময়

এক-এর কথাই বলবে, অন্য কথা নয়। অপরের মনের ভ্রান্তি দূর করতে সদা এক-এর মহিমা,গুরুর মহিমা, ইষ্টের মহিমা গান করবে। [১৫।৯।৯৩]

শ্রদ্ধাযুক্ত মন দ্বারা গুরুবাণী অনুভূত হয়

দ্বৈত ভাববোধে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকে এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার আশায় মানুষ ঘুরে বেড়ায় কত মন্দিরে, মসজিদে, তীর্থে। শাস্ত্র পড়ে পুঁথিপত্র ঘেঁটে নানা মতপথের আচরণ করেও যখন চিত্ত প্রশমিত হয় না তখন আসে অনুভবসিদ্ধের কাছে। শ্রদ্ধা সহকারে গুরুর শরণাগত হলে আত্মজ্ঞান পাওয়া যায়। যে বস্তু অনুভবসিদ্ধ ব্যাখ্যা করেন তাকে অবিকল ভাবে গ্রহণ করাই হল শ্রদ্ধা। এটাও ঠিক যে অনুভবসিদ্ধের কথা দ্বৈতবোধে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দ্বৈতবোধে আছে অভিমান, অহংকার, কামনা-বাসনা ও সংশয়। পরমাত্মা, পরমেশ্বরই আবার সদ্‌গুরুরূপে এসে সত্যবোধ আত্মবোধের কথা শুনিয়ে মনের অহংকার, অভিমান, কামনা, বাসনাদি দূর করেন। তাই তো এত শ্রবণের আয়োজন।

বৈচিত্র্য থেকে মনকে ফিরিয়ে শান্ত করে চিন্তাশূন্য করে রাখাই হল সাধনা। এ কাজ বড় কঠিন বলেই বলা হয় সাধনসংগ্রাম। মানুষ অখণ্ডকে খণ্ড করে ভোগ করে আবার তাকেই পেতে চায় অখণ্ডবোধে। সাধনার পথে তাই দীর্ঘদিন সদ্‌গুরুর মুখে আত্মজ্ঞানেব কথা শুনতে শুনতে যোগ্যতা তৈরি হয়। যোগ্যতা যত বাড়তে থাকে ততই ভোগের আশা হয় নিরাশা, ভোগের ইচ্ছা হয় অনিচ্ছা। মনের সকল চিন্তা দূর হয়ে মন হয় চিন্তাশূন্য আর চিন্তাশূন্য মনে আপনিই নেমে আসে সত্যানুভূতি আত্মানুভূতি। আর একবার অখণ্ডানুভূতি হলে আর কিছুই ঢাকা থাকে না। তবে এ পথ বড় কঠিন—দ্বার পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয় অনেকে।

আত্মা হল শূন্যবৎ। মহাশূন্যকে যেমন ভাগ করা যায় না আত্মাকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। আকাশকে দেওয়াল দিয়ে ভাগ করলেই আকাশ ভাগ হয় না। দেওয়াল ভেঙ্গে দিলেই আবার সেই এক আকাশ। আকাশের মতো আত্মাকে হাত দিয়ে ধরা যায় না, আগুন দিয়ে দহন করা যায় না, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা যায় না, ক্রিয়া দ্বারা disturb করা যায় না। চিন্তা দ্বারা অচিন্ত্যকে পাওয়া যায় না—আত্মাকে তাই পাবার কোনও প্রশ্ন নেই। অধরা তো ধরা দিয়েই আছে। তুমি তাকে ধরতে পারছ না। তাই তিনিই আবার গুরুবেশে এসে স্বয়ং ধরিয়ে দিয়ে যান। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আবার তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। [২২।৯।৯৩]

আত্মজ্ঞান লাভের গুরুত্ব প্রসঙ্গে

অখণ্ড, পূর্ণ, ভূমার নিজস্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত করতে ভূমাসত্তার প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস দরকার সেটা আসে গুরুবাণী থেকে। আত্মতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব হল অভিন্ন তত্ত্ব। এখানে যে গুরুর কথা বলা হয় তিনি কোনও personal গুরু নন। গুরু হলেন আত্মগুরু।

জীবনের এত problem, এত দুঃখকষ্টের কারণ কী? দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, প্রীতি-অপ্রীতি ইত্যাদি একই coin-এর দু'টো দিক। একটার সঙ্গে আর একটা আসবেই। নিজেকে একমাত্র ঠিক মনে করে অন্যের ভুলকে দেখাই হল মূর্খতা। ভুলের দৃষ্টিতে সত্যকে ভুলই দেখায়। কিন্তু নির্ভুলের দৃষ্টিতে সত্য নির্ভুলই থাকে, কখনও ভুলে যায় না বা ভুল হয় না। ঠিক ও বেঠিক হল মনোধর্ম। মন আত্মার বক্ষে ওঠে, ভাসে, খেলা করে ও ডুবে যায় বা লয় হয়। আত্মা নিত্য সাক্ষিরূপে, কূটস্থরূপে সব সময়ই বর্তমান থাকে। তাই সমগ্র বৈচিত্র্যকে এক-এর রঙে রাঙিয়ে নাও। It is the main contribution of Atmaguru। দেখো যেন কোনও অবস্থাতেই

গুরুর গুরুত্ব খর্বিত না-হয়। গুরুকে খর্ব করার চেষ্টাই হল সবচেয়ে বড় পাপ। সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে কত জন্ম যে লেগে যাবে তা তোমরা জানই না।

গুরু কাউকে সন্দেহ করেন না। কারও ইচ্ছায় বা অহংকারে হস্তক্ষেপ করেন না। আবার এমন কিছুও করেন না যা দ্বৈত ভাববোধ দিয়ে maintain করা যায়। কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এই দ্বৈত হল মিথ্যা। এক আত্মাই সত্য।

তোমাদের বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে—আত্মজ্ঞানের কথা শুনবার অধিকার পেয়েছ, সুযোগ পেয়েছ—তোমরা এ সুযোগ হেলায় নষ্ট করো না। তোমাদের মধ্যে যারা এত কথা শুনেও তাঁকে অনুসরণ করো না, করার চেষ্টাও করো না, যারা গুরুর কথা অমান্য করে সরে যাও আপন স্বার্থের পথে, তারাই কিন্তু ঘোর পাপী। এছাড়া পাপ বলে আর কিছু নেই।

আত্মার তো বিনাশ নেই। আত্মাকে না-জানলে তা জানা যাবে না। আত্মজ্ঞান দিতে পারেন একমাত্র আত্মজ্ঞগুরু। লক্ষ জন্মের তপস্যায় দেবতাদের সন্তুষ্টি হয়, তাঁদের কৃপা পাওয়া যায় কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। মানুষের জীবনের ভুল ধরিয়ে তাকে ঠিক পথে চালাবার অধিকার আছে একমাত্র আত্মগুরুরই, আর কারও নেই।

বিনা তপস্যায় সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞানের কথা readymade পেয়ে যাচ্ছ। এর অপচয় হলে আর supply পাবে না। সব হাটেতে এই পসরা মেলে না।

দেখতে পার জগৎ ঘুরে—যাচাই করে ভববাজারে—
এ সম্পদ আছে কার ঘরে।
সত্যজ্ঞান বলে পাবে যাহা আসলে মেকী তাহা
যা নিয়ে সবে ধর্মের কারবার করে
তা নিয়ে পারবে না যেতে অমৃতের ঘরে।
মেকী জ্ঞান যে ফাঁকি জানবে তাহা
শমন এসে যখন ধরবে শিরে।।

[২৯।৯।৯৩]

সৎ-এর তাৎপর্য

সত্যের যথাবৎ স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই সেই সত্যকে পাওয়া যায়। সংযম ছাড়া সত্যের ব্যবহার হয় না। সদ্‌গুরুকে বরণ করাই হল সংযম। অসৎকে ছাড়ার জন্য অর্থাৎ 'আমার আমার' ভাব ছাড়ার জন্য চাই সত্যের বাণী, সদ্‌গুরুর বাণী। সৎ হল সব কিছুর উর্ধ্বে এক-এ থাকা—সমতা, একতা। সত্যের মধ্যে অসৎ নেই। অসৎ-এ কিন্তু সৎ আছে। 'রাম'—'মরা'। রাম হল অদ্বৈত, অমৃত। 'মরা' হল বিকার, মৃত্যু. পরিবর্তন।

[৮।১২।৯৩]

আত্মবোধ তথা আপনবোধের কথা সূর্যের আলোর মতো স্বচ্ছ

সূর্য যেমন নির্বিচারে সব কিছুর উপর আপন কিরণ বর্ষণ করে সব কিছুকে প্রকাশ করে, এখানেও তেমনি আপন অনুভূতির কথা নির্বিচারে সহজ ভাবে সবার কাছেই প্রকাশ করা হয়। সূর্যের প্রকাশ্যবস্তু সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে তাদের পক্ষে কখনই সূর্যকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তেমনি অন্তরের কূটস্থচৈতন্য, যা সব কিছুকে প্রকাশ করে অথচ যা সবার থেকে ভিন্ন সেই কূটস্থচৈতন্যকে জানার জন্যই প্রয়োজন হয় একজন সদ্‌গুরুর।

দেহাত্মবুদ্ধি থাকলে আত্মদৃষ্টি খোলে না। ইন্দ্রিয়, মনের দৃষ্টি হল ভৌতিক দৃষ্টি। এই ভৌতিক দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হলেই আত্মদৃষ্টি খোলে। 'আমিই চৈতন্যস্বরূপ'—এটাই গুরুবাণী। এটাই তত্ত্ব-অগ্নি যা সব কিছুকে পুড়িয়ে এক-এ আনে। এই তত্ত্ব-অগ্নি মনও নয় অহংকারও নয়। এ অসঙ্গ, অবিমিশ্র, একাকী।

গুরুর কাছে complete surrender না-করলে গুরু সেই perfection-এর চাবি কাউকে দেন না। দ্বৈতবোধ, কামনা-বাসনা, অহংকার যার আছে তাকে কী করে গুরু চাবি দেবেন। গুরুর সঙ্গে থেকে সামান্য কিছু পেয়ে অনেকেই লাফায়। পুঁটি মাছ গণ্ডুষ জলে লাফায়, গভীর জলে লাফাতে পারে না।

আমরা সংসারে অনেকেই ঈশ্বরকে মানি। আমাদের এই মানামানি হল পোশাকী। অর্থাৎ favourable হলে ঈশ্বর মানি, unfavourable হলে ঈশ্বর মানি না। ঈশ্বরকে জানা ও মানার জন্য চাই আত্মজ্ঞগুরু ও তত্ত্বজ্ঞগুরু। এই আত্মজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞ গুরু কোথায় পাবে? যিনি নিজেই নিজেকে মধুস্বরূপ জানেন, তিনি আর ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করবেন কেন? শোবার ঘর, বসার ঘর. খাবার ঘর—বাড়ির সব ঘরের আকাশই তো এক—শুধু শুধু ভিন্ন মনে করা কেন? আর আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম যে আত্মা তা আবার ভিন্ন ভিন্ন হয় কী করে? Qualified and true aspirant-এর কাছে গুরুবাণীর একটুই যথেষ্ট। তপ্ত লৌহশলাকা যেমন এক ফোঁটা জল নিমেষে শুষে নেয় তেমনি গুরুর একটি কথাই যথার্থ শিষ্যকে আত্মজ্ঞান দিতে পারে। কিন্তু those who cherish the feeling of ego must surrender to Sadguru in order to realize the unity of Self with all। শরণাগতি হল এর একমাত্র উপায়। গুরু চরণাশ্রিত ভক্ত অচিরে অনায়াসে হয় সংসারমুক্ত। এই সত্যবাণীটি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে, এই বাণীর অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নিজের সমস্ত অনুভূতিকে সাজিয়ে নেওয়াই হল সদ্‌গুরুর ভজন। ভজনে আত্মগুরু তৃপ্ত হলে চিত্ত শান্ত ও বিকারমুক্ত হয়। গুরু করার পরেও যদি অহংকার সমান ভাবে থাকে তবে তার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই বুঝতে হবে। সে গুরুর উপরে নিজের অহংকারকে নিয়ে যেতে চায় দায়িত্ব, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে।

আমরা ঈশ্বরের পৃথক ভাবনা করে মন্দিরে, মন্দিরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজি না। যথার্থ জ্ঞানী, আত্মজ্ঞানী নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। আত্মাই হল মা, আত্মাই হল গুরু। সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে তুমি তোমাকেই দেখ—গুরু এই কথাটিই তাঁর আলোতে তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যান। গুরুর এই আলো হল—the light of Oneness। আমাদের অহংকার সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি দিয়েই সেই আলোকে নিজের থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। [১৫।১২।৯৩]

একাদশ অধ্যায়

আত্মবোধের উদয়ে হয় জীবনের পরিপূর্ণতা

মানুষের জীবনের দুঃখ, অভাব, জরা, ব্যাধি তাকে শুধু ধাক্কা দিয়ে যায় আর সদ্গুরু তাঁর বাণী শুনিয়ে তাকে এই দুঃখ অভাবের পরপারে, মৃত্যুর পরপারে অমৃতস্বরূপে যাবার বিজ্ঞান, যাবার উপায় ধরিয়ে দেন।

মানুষের বর্তমান জীবন হল জড়ভাবাপন্ন, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। এখানে মানুষ সদা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে চলেছে। প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করছে, প্রভুত্ব পাবার চেষ্টা করছে। অপরকে শোষণ করে নিজে পুষ্ট হচ্ছে। এ সবই হল পশুবৃত্তি, অজ্ঞানের ফল। এ সবের জন্যই আসছে নিরন্তর অভাববোধ ও দুঃখ। এই দুঃখ থেকে উদ্ধারের উপায় তাদের জানা নেই। ভগবান কতবার এসে কত ভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তা নিতে পারেনি। নিতে রাজিও হয় না। মানুষ ব্যস্ত আপন স্বার্থরক্ষায়। কিন্তু যে নিজের এই দেহ, এই জীবন কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারে না, সে তার এই স্বার্থের রাজ্য কী করে রক্ষা করবে? তারা তো প্রাণ খুলে ভগবানকেও ডাকতে পারে না। ডেকে আনে কলিকে। কলি হল দুঃখ, অভাব, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতার ঘনীভূত রূপ। এই ভাবে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকলে দুঃখ কোনও দিনই যাবে না, যদি না পরের দুঃখে চিত্ত কাতর হয়, অপরের জন্য সহানুভূতি না-জাগে। অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে না-পারলে, সমষ্টির স্বার্থে জীবন ব্যবহৃত না-হলে এই জীবনের ঘুম ভাঙ্গবে না। তাইতো মা ঘুম ভাঙ্গানোর গান গেয়ে, ভজনের মাধ্যমে সবাইকে শুনিয়ে যাচ্ছেন, মনের মধ্যে সংকীর্ণতা থাকলে অমৃতত্ব পাওয়া যাবে না। সব সময় দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে থাকলে, রূপ-নাম-ভাবের চর্চা করলে, স্বার্থ নিয়ে থাকলে অমৃতত্ব পাবে কী করে? অমৃতত্ব তো বাইরে কোথাও নেই, আছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। একমাত্র অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তার জন্য চলতে হবে গুরুনির্দিষ্ট পথে। নিজের খুশি মতো চললে হবে না।

অখণ্ড একবোধে সর্ববস্তুর মধ্যে ঈশ্বরকে মানাই হল যথার্থ সাধনা। সমস্ত রূপ, নাম, ভাব ও সকল অনুভূতির ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রে তাঁর দ্বার খোলা আছে। প্রত্যেকের অন্তরে বাজে তাঁরই ধ্বনি। অন্তরে কান পেতে যে সে ধ্বনি শুনতে পায় সে ভাগ্যবান। তোমরা অন্তরে তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাও না তার কারণ তোমরা মনকে অন্তর্মুখী করো না—করবার চেষ্টাও করো না; অথচ অন্তর্মুখী মনই অখণ্ড অদ্বয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সচ্চিদানন্দ আস্বাদন করতে পারে। সচ্চিদানন্দই তোমাদের গতি, সচ্চিদানন্দই তোমাদের স্থিতি, সচ্চিদানন্দই তোমাদের পরিণতি। প্রত্যেক মানুষই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। আর মানুষই তাদের জাতি, বর্ণ, লিঙ্গের সঙ্গে জুড়ে সেই সত্যধর্মকে কলুষিত করছে। এই সত্যধর্ম কোনও জড়ভাব নয়। তা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মাই আত্মার আসল গুরু। যিনি আত্মাকে জানেন—এমন সদ্গুরুর কাছে পাওয়া যাবে আত্মার নির্দেশ। আত্মাতেই আছে সকল সুখ-শান্তি। তাই তো তিনি পরমপ্রেমাস্পদ। [১৫।২।৯৪]

সত্যধর্মের অভিনবত্ব

সত্যধর্মে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও স্থান নেই। ধর্ম হল গুরুনিষ্ঠা। সত্যের পথ হল ধর্মের পথ। মিথ্যার পথ হল সংসারের পথ। ধর্ম কোনও অনুমানের বিষয় নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। সংসার হল অজ্ঞান। যারা এই

অজ্ঞানকে, সংসারকে ত্যাগ করতে পারে তারাই একমাত্র সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে মিলিত হতে পারে। সত্যধর্ম হল এক-এর ধর্ম, এক-এর বিজ্ঞান। এক-এর বিজ্ঞানে সংসার থাকতে পারে না—থাকে সমসার। এখানে অভাব নেই, অপ্রাপ্ত নেই; দেখা, শোনা, জানার আর কিছু বাকি থাকে না। এক-এর ধর্ম হল অমৃতত্ব, তাতে মৃত্যুর কোনও স্থান নেই। নানাত্ব, বহুত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদ হল প্রবঞ্চক—অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত, এক, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মাতে কোনও দুই নেই, তাই দ্বন্দ্ব নেই—অখণ্ড এক বোধসাগরে একই বোধস্বরূপ আত্মা উঠছে ভাসছে।

"কর্তব্যদুঃখ মার্তণ্ডজ্বালা দগ্ধান্তরাত্মন্
কৃত উপসম পীযূষধারা সারামৃতে সুখম্ (নিবৃত্তম দুঃখম্)।।"

সূর্যের প্রখর তাপে যেমন শরীরে জ্বালা হয় তেমনি সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্যাদিও মানুষকে দগ্ধ করে। এই জ্বালার কী ভাবে উপশম হবে তা মানুষের জানা নেই। সে ওষুধের খবর দিতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞানী গুরু। So called Guru cannot supply you that। এর জন্য চাই শান্তির পীযূষধারা—বোধসাগরে বোধের ঘরে ঝরে পড়ছে সে ধারা। বোধের ধর্মে বোধ প্রকাশ হয়েই চলেছে। বোধ ছাড়া বোধকে কেউ জানতে পারে না। আত্মা ছাড়া আত্মাকে কে জানবে। আত্মার কোনও বেত্তা নেই। আত্মাই সবার বেত্তা। আত্মার উপরে আর কোনও আত্মা নেই। গুরুর উপরে আর কোনও গুরু থাকতে পারে না। যদিও বলা হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে গুরুরূপে যারা পায় তারা ধন্য। এঁদেরও সময় কিন্তু limited—বর্তমান কল্প পর্যন্ত স্থায়ী। এঁদের কথা যদি বা fail করে Supreme Consciousness-এর বাণী কখনও fail করে না।

দেবতাদের কৃপালাভের প্রয়াস 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) কোনও দিনই ছিল না। কারণ 'এ' স্বরূপধর্ম কখনওই ছাড়তে পারেনি। Nothing can lose its own nature। জগতের ধর্ম হল unreality and non-existence আর আত্মার ধর্ম হল reality and existence। আত্মা হল the substratum of all। জগতের সত্য আত্মাতে আছে জগতে নেই। নাম-রূপ জগতের অধিষ্ঠানই আত্মা। অধিষ্ঠান ছাড়া নাম-রূপের পৃথক কোনও সত্তা নেই। সেই জন্য আত্মা অতিরিক্ত নাম-রূপের জগৎ মিথ্যা। আত্মাই নাম-রূপের জগৎরূপে প্রকাশমান। জগৎ আত্মা ছাড়া নয়। সাধারণ মানুষ এই আত্মার খোঁজ করে না। তারা ছোটে লৌকিক গুরুর পিছনে। কিন্তু গুরুবন্দনায় যে গুরুর কথা বলা হয়েছে তিনি তো আত্মগুরু।

"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।"

এই দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত, জ্ঞানস্বরূপ গুরুমূর্তির কথা তোমরা ভাব কী? এই অদ্বয়বোধে ভোগও নেই, ত্যাগও নেই, চিত্ত এখানে শান্ত, শুদ্ধ, কামাতীত। এখানে কর্ম নেই, কর্তৃত্বও নেই, কর্মফলের আশাও নেই। It is a science beyond taking and giving। বুদ্ধি বিকৃত হয় আত্মা কখনও বিকৃত হতে পারে না। প্রকৃতির গুণের খেলায় রজ-তমোগুণে মানুষ সংসারী, সত্ত্বগুণে দেবতুল্য, শুদ্ধসত্ত্বগুণে মানুষ হয় আত্মজ্ঞানী। একজন perfect realizer-এর কথা মতো চিত্ত নিবেশিত করতে পারলে আত্মজ্ঞানস্বরূপ গুরুর সন্ধান অবশ্য পাওয়া যাবে। [২৩।২।৯৪]

গুরুতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব অভিন্ন

মানুষের প্রয়োজন অনেক। তবে কোন প্রয়োজনটি যথার্থ ও কোনটি নয়—এই বোধ বা সিদ্ধান্ত সবার পক্ষে নেওয়া ঠিক সম্ভব নয়। এই সব চাহিদাপূরণের সময় সে ঘোর সংসারী। তখন আর তাদের ভগবানের, ঈশ্বরের বা সত্যের কথা মনেই থাকে না। মনের ভিতর যে সমস্ত মিথ্যা, সংকল্প-বিকল্পাত্মক সংস্কার জাত হয়ে

কর্মরূপে বাসা বেঁধে আছে সেগুলো সরাতে না-পারলে সত্যকে কোনও দিনই জানা যাবে না। তা সদ্‌গুরুর শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়।

মানুষের মনে নিরন্তর উঠছে লক্ষ লক্ষ বৃত্তি। এই বৃত্তি যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে সংসার আর দুঃখ। এই সব বুদ্ধি বিচারের কথা নয়—অভিজ্ঞতার কথা। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এ সব জানা যায় না। প্রত্যেক মানুষই কামনার বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছে। যা নেই তা পাবার ইচ্ছে আর যা আছে তা ধরে রাখার চেষ্টা সবারই। এ জন্যই মানুষের এত দুঃখ। এর থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল গুরুবাণী ও গুরুর প্রতি আনুগত্য। সত্যাশ্রয়ে আনুগত্য অটুট থাকলে অকৃতজ্ঞতা বা স্বার্থের কথা আসতেই পারে না। এ জিনিস সাধনার নয়। চেষ্টা করে জ্ঞানস্বরূপকে পাওয়া যায় না। আবার চেষ্টা না-করে বসে থাকলে আসবে পশুবৃত্তি। তাই এ জিনিস পেতে চাই constant গুরুসঙ্গ। কিন্তু এমন গুরু কোথায় পাবে?

নিজেকে দুঃখী মনে করলেই তুমি দুঃখী। দুঃখ তুমি নিজেই চাষ কর। You cannot experience good or bad what you have not created। তুমি যা সৃষ্টি করনি তা তুমি ভোগ করতে পার না। আর অদ্বৈতে you are not a doer, not an experiencer but the essence of all which cannot be divided. Until there is division you cannot create. Division is creation. জ্ঞান উদয়ের জন্য সাধনভজন লাগে না। জ্ঞান উদয়ে অবিশ্বাস হয়ে যায় বিশ্বাস, দ্বৈত হয় অদ্বৈত, নানাত্ব হয় একত্ব। আমি কর্তারূপ, অভিমানরূপ মহাসর্প দ্বারা দংশিত চিত্ত, আমি জ্ঞানরূপ বিশ্বাস পীযূষধারায় হব অমৃতময়। অজ্ঞানমুক্তি হল দ্বৈতমুক্তি। এর চাবিকাঠি আছে গুরুর কাছে।

কার্য, মন ও বাক্যের মধ্যে একতা সমতা বজায় রাখতে হবে। তুমিই আনন্দস্বরূপ কাজেই তোমাতে আনন্দের অভাব হতেই পারে না। ভ্রান্তিবশত কল্পিত কল্পনার পিছনে ছুটছ তাই সংসারে দুঃখ পাচ্ছ। কল্পনা ছাড়, তাহলেই হবে সমসার। সত্যপ্রীতি হল জ্ঞানদৃষ্টি—Love of Oneness is Truth and Truth is One. এর চেয়ে বড় সাধনা আর কী হবে? গুরুকৃপা পাবে কী করে? এক-কে ভালবাসাই গুরুকৃপা।

সাজাগুরু সংশয়, দ্বৈতবোধ থেকে মুক্ত করতে পারেন না। আশ্রমে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে কিন্তু গুরুবোধে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বললে তিনি সংকুচিত হতেন। কে কার গুরু? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।

Truth, God, Self is one। অজ্ঞানী এক-কেই বহু দেখে এবং জ্ঞানী বহুকে এক দেখে। যত যুক্তিই আমরা দেখাই না কেন অজ্ঞানের for-এ, যুক্তি দিয়ে সত্য পাওয়া যায় না। আত্মবোধে হয় সত্যবোধ। যে কোনও negative finding হল বুদ্ধিনির্ভর—তাতে সংশয়, শঙ্কা থেকেই যায়। বুদ্ধি অজ্ঞানজাত। কিন্তু positive finding কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়। তা স্বানুভবসাপেক্ষ। তাই তাতে সংশয়, শঙ্কা থাকে না। সংশয়, শঙ্কা হয় দ্বৈতবোধে, বুদ্ধির ব্যবহারে। একমাত্র অহংকারশূন্য হলে মন সংশয়শূন্য হয়। তা গুরুকৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়। গুরুকৃপা উত্তম অধিকারী ভিন্ন কেউ directly পায় না।

সংসারে মন জ্ঞানগুরুকে বাদ দিয়ে অজ্ঞানগুরুকে নিয়ে চলে সংসারচক্রে জন্ম জন্ম ঘোরে। জ্ঞানগুরু একবারই হয়। তাঁর কৃপায় আর মনকে মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হয় না। তিনিই ব্রহ্ম, আত্মা স্বয়ং। গুরুতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব অভিন্ন। [২।৩।৯৪]

গুরুকে বরণ এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলার তাৎপর্য

মানুষ গুরু করে কিন্তু তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান সে দিতে পারে না। গুরু ও ঈশ্বরকে আলাদা করে, গুরুর কথা ঈশ্বরের কথা বলে না-মেনে গুরুকে অপমান করে। কোনও কিছুরই সঠিক শিক্ষা তাদের হয় না।

তারা কী চায় তা তারা জানে না। কিন্তু যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, যাঁকে জানলে আর জানার কোনও কিছু বাকি থাকে না, যা হলে সব হয়ে যায়—তাঁর খোঁজ মানুষ করে না। মানুষ ব্যস্ত থাকে কর্মকাণ্ড নিয়ে। জ্ঞানকাণ্ডের খবর রাখে না। কর্মকাণ্ডে আছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের খেলা। আর জ্ঞানকাণ্ডে হয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা। এই জ্ঞানকাণ্ডের কথা একমাত্র অনুভবসিদ্ধগুরুই ধরিয়ে দিতে পারেন। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দিয়ে জ্ঞানের কথা হয় না, তাতে থেকে যায় পক্ষপাতদোষ। এমনকী নিষ্কাম কর্মও যথার্থ জ্ঞানের কথা নয়। আত্মা নিষ্কামও নয় সকামও নয়। গীতাতে কর্মকাণ্ডে যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছে, এক-এর বিজ্ঞানে তাও ঠিক নয়। এমনকী বৈদান্তিক যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে তাও এক-এর বিজ্ঞানে সিদ্ধ নয়।

কোনও বিশেষ মতবাদ মনে পোষণ করলে এই আত্মজ্ঞানে আসা যাবে না। আত্মা ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত। তাঁকে মতবাদ দিয়ে পাবে কী করে, সর্বশূন্যই হল নিজের পরিচয়। অখণ্ড একেই সর্বশূন্য হওয়া যায়। তাই অখণ্ড এক-এ লয় হওয়াই আত্মজ্ঞান। এই Science of Oneness হল সমস্ত মতপথের অধিষ্ঠান। এই এক-কে নিয়ে দল হয় না। বহু লৌকিক গুরু আছেন যারা দীক্ষা দেন কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা তারা দিতে পারেন কৈ! [৯।৩।৯৪]

সদ্‌গুরুর কৃপায় জীবের জীবত্ব নাশ হয় ও শিবত্ব লাভ হয়

মানুষের পক্ষে তার দৈহিক, প্রাণিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র যদি আত্মজ্ঞ গুরুর প্রীতিভাজন হতে পার তবেই সম্ভব। এর জন্য কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির সাধন করতে হয়—তাও খুব জটিল। বিশেষ করে এই কলি যুগে যখন অনুভবসিদ্ধ গুরু পাওয়া এবং যোগ্য অধিকারী পাওয়া দুর্লভ।

অমৃতত্ব হল পরমতত্ত্ব পরমসত্য, তা সর্বজীবের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় নিহিত থাকা সত্ত্বেও তা জীবের বোধগম্য বা অনুভবগম্য হয় না। কারণ স্বভাবজাত দোষে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে যায় পরমতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব। জীব নিজেব স্বভাব অনুযায়ী চলে বলে স্ববোধ আত্মার স্মৃতি ভুলে থাকে। ঈশ্বর-আত্মা গুরুবেশে এসে তা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেই জীবের জীবত্ব ঘুচে শিবত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। স্বভাবের দোষ হল কাম, কর্ম, কর্তৃত্ব। এই তিনটি মিলেই হয় অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দিয়েই জীবের জীবত্ব তৈরি হয় ও পরিচালিত হয়। সে তার যথার্থ যোগ্যতা হারিয়ে গুণাধীন হয়ে সসীমবোধে সংসারে চলে। এই অজ্ঞান নাশ করতে তপস্যার মাধ্যমে যোগ্যতা লাভ করতে হয়।

যোগ্য অধিকারীর পক্ষে পর্যায়ক্রমে দেহবুদ্ধি, প্রাণবুদ্ধি, মনোবুদ্ধি ও মহৎবুদ্ধি অতিক্রম করা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর (আত্মগুরু) নির্দেশ পালন করে ও অনুসরণ করে। পরমতত্ত্ব ও অমৃতত্বের জ্ঞান হয় (১) শাস্ত্রকৃপা (২) গুরুকৃপা (৩) আত্মকৃপা ও (৪) ঈশ্বরকৃপার সমন্বয়ে। ঈশ্বর-আত্মাই হল আসল গুরু। সদ্‌গুরু হলেন তাঁরই প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। গুরু বিনা নাহি মিলে জ্ঞান, নাহি মিলে ভক্তি প্রেম। জ্ঞান বিনা ঈশ্বর-আত্মার কৃপা লাভ হয় না। অন্তর্যামী আত্মার কাছ থেকেই জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে বাহ্যগুরুর সাহায্য ব্যতীতই আত্মকৃপা লাভ হতে পারে। যদিও এরূপ দিব্য অধিকারী দুর্লভ তথাপি অসম্ভব নয়। শাস্ত্রকৃপা ও জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র সদ্‌গুরু অন্তর্যামী দেবতার অহেতুক কৃপা ও অনুগ্রহলাভে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়েছে এমন উদাহরণও বিরল নয়। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য ও কৃপা লাভে উত্তম অধিকারীর স্বল্পকালের মধ্যেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মধ্যম অধিকারীর বহু তপস্যার মাধ্যমে এক জীবনেই তা সিদ্ধ হয় আর সাধারণ অধিকারীর তিন চার জন্ম লেগে যায় সিদ্ধিলাভ করতে। আর সাধারণের চেয়েও যারা নিকৃষ্ট তাদের সম্বন্ধে কোনও সময়ের নির্দেশ করা যায় না।

তীব্র ব্যাকুলতা ও অনুরাগ সহকারে যাদের চিত্তে প্রেমভক্তির সংস্কার জাগ্রত হয় তারা ঈশ্বরকৃপা লাভে সহজেই সমর্থ হয়। সবই ঈশ্বর-আত্মার কৃপাসাপেক্ষ। তা জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মী সবার পক্ষেই প্রযোজ্য। যার চিত্তে যেমন ভাব তার তেমন গতি লাভ। আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে একক ভাবে বা সমবেত ভাবে গুরুরূপে পেয়েও যদি অধিকারী সাধক সর্বত্যাগ না-করে, তারও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নেই। পরমসিদ্ধি লাভ অর্থ পরমতত্ত্বের অনুভূতি লাভ। তা সর্বত্যাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভোগ থেকে যেমন আসে বন্ধন সেরূপ সম্যক্ ত্যাগ থেকে আসে মুক্তি, অত্যন্তসুখ ও পরমশান্তি। বিবেক-বৈরাগ্যের জীবন্ত আদর্শ হলেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। পরমাত্মদেবতা সদ্‌গুরুবেশে এসে জীবকে অমৃতত্ব লাভ ও মুক্তিশান্তির বিজ্ঞান ও সিদ্ধি দিয়ে যান। সাধুসন্তের মাধ্যমেই তিনি নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। সেই জন্যই সাধুসেবার ফল ও মাহাত্ম্য অমোঘ। তা সর্বধর্ম, মতপথেরই বিশেষ নির্দেশ।

'ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবান'—একতত্ত্বের চার নাম। এই পরমতত্ত্বই আবার গুরুতত্ত্ব। অর্থাৎ গুরুতত্ত্বই হল ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মতত্ত্ব। গুরুকে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিগ্রহ বলে যারা গ্রহণ করে তাদের আর অন্য কোনও দেবতার আরাধনার প্রয়োজন হয় না। সদ্‌গুরুকে লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা অপরাধ। অর্থাৎ মনুষ্যবুদ্ধিতে গুরুকে দেখতে নেই—মনুষ্যবুদ্ধিতে দেখলে গুরুর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জাগতে পারে না। গুরুর স্বরূপ হল কেবল জ্ঞানমূর্তি—দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত, গুণাতীত, নিত্যশুদ্ধ, নিরাভাস, নিরাকার, নিরঞ্জন। এই বোধেই গুরুকে দেখা, শোনা, মানা, জানা ও ভজনা করতে হয়। গুরুভজনে এই সব তত্ত্বের বিশেষ উল্লেখ আছে। সেগুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করলে চিত্তশুদ্ধি আপনিই হবে।

সব ধর্ম, মত, পথকে আপন করে নিতে হবে। বিকৃত চিত্তের কাছে সবই বিকৃত। কিন্তু শুদ্ধ চিত্তে সবই সমাহিত। চিত্তকে শান্ত করতেই হবে। গুরুই একমাত্র সহায়। তিনি অনেক সময় পীড়ন করে শিষ্যকে তৈরি করেন। আবার শিষ্যকেও মেহনত করে গুরুর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হয়।

গুরুপদ যেন থাকে তোমাদের শিরে, কখনওই যেন উল্টো না-হয়। গুরুশূন্য জীবন হলে জীবন হয় বিব্রত আর গুরুযুক্ত জীবন হল পূর্ণ জীবন। [১৬।৩।৯৪]

যোগ্যতার মাধ্যমেই শিষ্য গুরুকৃপালাভে সমর্থ হয়

অন্তরের ব্যাকুলতা না-থাকলে শিষ্য হওয়া যায় না। বর্তমানে এখানে (ফার্ণ রোডের সৎসঙ্গে) তো ধর্মের দ্বার সকলের কাছেই খোলা। সব রকম বিকার নিয়েও এখানে সবাই ধর্ম করছে। ধর্মের মূল কথা হল শ্রদ্ধা। কুটিলতার উপরে নির্ভরশীল নয়। বুদ্ধি নত করে সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর পায়ে নিঃশর্তে আশ্রয় চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহাদুরি কর্তৃত্ব দেখালে আশ্রয় পাওয়া যাবে না।

ব্রহ্মত্ব সবার মধ্যেই আছে। তাকে জাগানো সদ্‌গুরু ভিন্ন সম্ভব নয়। If there is any God who can save you is the Guru, a perfectly realized life।

ব্রহ্মের প্রথম মূর্তি হল গুরুমূর্তি। গুরু বলতে তোমরা কোনও মূর্তির কথা ভাবলেও ব্রহ্মের কোনও আকার নেই।

মানুষের প্রতিটি কর্ম পরিচালিত হয় দৈব দ্বারা। আর দৈব কী করে, পুরুষকার তা জানতে পারে না। পুরুষকারকে তোমাদের জানা নেই। গুরু যে পুরুষকারকে ধরিয়ে দেন অন্য কোনও বোধ তা ধরিয়ে দিতে পারে না। সেই গুরুর কথা ভুলে পৃথিবীতে একলা এসে দোকলা তেকলা চোকলা হয়ে দুঃখ অভাবে হিমসিম খাচ্ছ। [২৩।৩।৯৪]

আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞান নিরপেক্ষ

শাস্ত্রপাঠ করে মানুষ নিজেকে কিছুটা তৈরি করতে পারে। তাদের বুদ্ধি মার্জিত হতে পারে কিন্তু কখনওই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। আবার শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে গুরু হওয়া যায় না কারণ জীবত্ব maintain করে আশ্রম হয় না। সৃষ্টি করতে এসে ভগবানই বোকা বনে গিয়েছেন। তাইতো তাঁর দু'হাত দু'রকম—এক হাতে অস্ত্র আর এক হাতে বরাভয়। তিনি সৃষ্টি করছেন আবার তিনিই দিয়ে যাচ্ছেন মুক্তির বিজ্ঞান।

এখানে এসেছ নিজেকে তৈরি করতে। নিজে নিজেকে গুরু নির্দেশিত পথে তৈরি কর, নিজে গুরু সাজতে যেও না। 'সাজলে গুরু ইচ্ছামতন সাজা পাবে জন্ম জন্ম।' মানুষ গুরু সাজতে চায় কর্তৃত্ব প্রভুত্ব করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন অপরের উপর কর্তৃত্ব করা বা 'গুরুগিরি করাই হল বেশ্যাগিরি।'

ধর্ম হল righteousness। পাঁচটি right use-এর কথা বলা হয়েছে। (1) Right use of life energy, (2) Right use of education, (3) Right use of money, (4) Right use of time, and (5) Right use of environment। Life energy হল সত্তার শক্তি। Education হল শিক্ষা—শিক্ষাই সরস্বতী, বোধাত্মা স্বয়ং। Money হল অর্থ যা স্বরূপত পরমার্থ তাই হল লক্ষ্মী, তিনি শ্রী বা মুখ্যপ্রাণ। Time হল কাল—যিনি কালকে সম্বরণ করে আছেন তিনিই কালী। Environment হল পরিবেশ—যার সঙ্গে যুক্ত আছে সবাই, তা-ই যোগ। এ-ই হল পঞ্চতন্ত্রসার—All Divine যা হল সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। এই ভাবে বিচার করে সংসারে চললে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে। অনাত্মপ্রীতি জ্বলে তিরোহিত হলে আত্মপ্রীতি জাগবে। অনাত্মপ্রীতি হল দেহপ্রীতি, মনপ্রীতি, প্রাণপ্রীতি, অহংকারপ্রীতি, কর্তৃত্বপ্রীতি ও বুদ্ধিপ্রীতি। বুদ্ধিকে নিবেদন কর আত্মজ্ঞগুরুর কাছে, 'বল এই নাও গুরু তোমার জীবন'। এই বিকৃত বিকারগ্রস্ত অজ্ঞান শিশুকে তুমিই গ্রহণ কর, মৃত্যুকে অমৃত কর—মুক্তির বিজ্ঞান দাও। সদ্‌গুরু হলেন Self-personified godhead কোনও individual person নয়। সদ্‌গুরু হলেন 'অহংকারশূন্য আমি'—Self-shun I am, Sun I am, Son I am, Sa (subject-object idea) nai। [৩০।৩।৯৪]

গুরুই স্বয়ং ঈশ্বর-আত্মা, সত্যধর্মের বিগ্রহ

গুরু হলেন ঈশ্বর, ঈশ্বরই গুরু। ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ মধুর হলেও তাঁকে বোঝা কঠিন। বোঝ বা না-বোঝ কোনও ব্যক্তিবিশেষকে যদি ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করতে পার তাহলে ঈশ্বর ভজনারই ফল পাবে। তোমরা মানুষকে ঈশ্বরবোধে গ্রহণ করতে পার না। কিন্তু শিবজ্ঞানে, নারায়ণজ্ঞানে জীবকে দেখা, জানা, মানা ও সেবার ফলে তোমাদের মুক্তি, সিদ্ধি আপনিই আসবে।

'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) জীবনে কোনও পুঁজি ছিল না, সম্বল ছিল না, উপাধিও ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল না। তবু নিজের পুঁজির মধ্যেই, নিজের মধ্যে নিজেকে সন্ধান করেছে; দেহে, মনে, প্রাণে, অহংকারে ও প্রকৃতির মধ্যে সন্ধান করেছে তাঁকে, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, যাঁকে জানলে সব জানার অবসান হয়, যা হলে হওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না। তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে আপনবোধে, আপন অন্তরে, আপনার মাঝে পূর্ণ করে। তিনি জগদাতীত—তাঁরই মাঝে জগৎ উঠছে ভাসছে। তাঁকেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম, আত্মা, মা, গুরু, ইষ্ট, ভগবান। যার যেমন খুশি সে নামেই ডাক তাঁকে।

[৬।৪।৯৪]

গুরুতত্ত্ব ও মাতৃতত্ত্ব অভিন্ন

মা-কে ভোলার মতো অপরাধ আর নেই। যে মা শুধু উজার করে দু'হাত ভরে দিয়েই চলেছেন সেই মাতৃঋণ শোধ করা যায় না। এই মা কোনও নারীমূর্তি নন। ইনি হলেন সর্ব অনুভূতির সারাৎসার। স্বানুভূতি

যাঁর কৃপায় নির্গুণ-সগুণের পরিচয় পায়, সেই ক্ষমাঘন-করুণাঘন জগৎজননী মাকে নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয় কারণ একমাত্র নারীরই আছে সন্তান প্রসবের ক্ষমতা। আর জগৎজননী মা, যিনি সমগ্র জগৎকেই প্রসব করেছেন। তাঁকে মাপবে কী করে? এই মাতৃতত্ত্ব থেকেই আসে গুরুতত্ত্ব। লঘুত্বকে গুরুরূপে স্বীকার করাতে তিনিই আবার গুরুরূপে আসেন।

পূর্ণ বস্তুর বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে মন আপনিই পূর্ণতার মধ্যে ঢুকে যাবে। গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে, শরণাগতি প্রকাশ করলে, গুরু অনুভূতির মধ্যে অনুভূতি ঢেলে দেবেন। নিজেরা ভুল করবে যদি এক-এর মধ্যে ভাগ করে ফেলো। এখানকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। এক-এর মধ্যে থাক, স্মরণে মননে এক-কে রাখ, এক-এর প্রতি নিষ্ঠা রাখ, বুড়ি ছুঁয়ে থাক। অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের বা কর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টা হল আত্মবোধের অন্তরায়। শরণাগতিই হল গুরুকৃপা লাভের একমাত্র উপায়।

রাজনীতি ও ধর্মের বিরোধ মেটাতে অখণ্ড একবোধের সাগরে মিশবার বিজ্ঞান তিনিই দিয়ে চলেছেন। এর যথার্থ ব্যবহার হল মনুষ্যত্বের বিজ্ঞান। আত্মার বিরুদ্ধাচরণ করে আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করো না। আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সম্ভব। আত্মাই আত্মার বন্ধু। গুরুবেশে সেই আত্মাই এসে শিক্ষা দিয়ে যান। তুমি পক্ষপাতদুষ্ট হলে গুরুকৃপা পাবে না। গুরু হলেন সদ্‌গুরু। এমনিতে যেমন বলা হয় 'গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক' অথবা 'শিষ্য মিলে লাখে লাখে গুরু মিলে এক'। দু'টোই খুব খাঁটি কথা। সত্যিকারের গুরু ও সত্যিকারের শিষ্য দু'টোই অতি দুর্লভ।

সত্যিকারের গুরু পেলেও মন মানতে চায় না। মানবদেহধারী দিব্য অভিব্যক্তিকে মানাই মানুষের সাধনা। ঈশ্বরকে আপনবোধে মেনে মানিয়ে নিতে হয়। গুরু হলেন দাতা, শিষ্য হলেন গ্রহীতা। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হল সূর্যের মতো। সূর্য যেমন কোনও বিচার না-করেই তার এক তাপধারা, জ্যোতিধারা আপামর সবাইকে দিয়ে যাচ্ছে আর living being সেই তাপ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। [১৩।৪।৯৪]

ভোগ ও ত্যাগের তাৎপর্য

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই বিকারী। কর্মলব্ধ বিষয়ও বিকারী সুতরাং কর্মময় সংসারে যা-কিছু সবই বিকারী ও পরিণামী। এই বিকার দিয়েই নির্বিকার আবৃত, অর্থাৎ কামনা দিয়ে ঢাকা। ভোগের মাধ্যমে তা উঁকি-ঝুঁকি মারে, প্রার্থনায় কিছুটা আলগা হয় আর ভোগ ত্যাগ করলে তিনি অনাবৃত হন। কিন্তু কী ত্যাগ করবে? ত্যাগ করবে false আমি-আমার ভাব। আর অপরের থেকে নিজেকে পৃথক করে ভোগের ইচ্ছা। সব তাঁরই চরণে ঢেলে দাও—তোমার every movement, every moment, every appearance that comes to you as subject and object, তোমার সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, right-wrong সব। তিনি দু'দিকেই আছেন। ভালতেও তিনি খারাপেও তিনি, আবার খারাপ ভালর উর্ধ্বেও তিনি। তাঁকেই পাবে সদ্‌গুরু, মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, মুনি, ঋষির মধ্যে, যথার্থ জ্ঞানী, যোগী, কর্মী ও ভক্তের মধ্যে। এই জ্ঞান, যোগ, কর্ম ও ভক্তি হল একই ঘরের চারটি দেওয়াল। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নেওয়া যায় না। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নেই।

একবার শুদ্ধসত্ত্বগুণের অধিকারী হলে দেখবে সবেতে তিনিই আছেন, যিনি বিশ্বাতীত প্রাণনাথ হয়ে বিশ্বরূপ ধারণ করে আছেন। নতুবা কে কোথায় থাকত? তিনিই এই জীবদেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সৃষ্টি করেছেন তাঁর মধ্যে তাঁর সত্যস্বরূপ অনুভব করার জন্য, আস্বাদন করার জন্য। কারও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এই তিনিই হলেন অন্তর্যামী পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, নারায়ণ, গুরু, মা—যিনি নিত্যবর্তমান। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নেই।

সত্য স্ফুরণ গুরুকৃপা ভিন্ন হবার নয়। গুরুর কাছে তাই humble হতে হবে। Unconditional surrender না-হলে তা হবে না। তোমরা যাঁর কাছে আসছ তাঁর তো মতামতের কোনও বালাই নেই, স্বার্থবুদ্ধি নেই, সসীমতা ও গতানুগতিকতার প্রভাব নেই। যাঁর মধ্যে সাধুও নেই, অসাধুও নেই, যিনি কারও গুরুও নন, শিষ্যও নন অর্থাৎ যার দুই-ই নেই। যাঁর ইচ্ছা হল সব সময় একনিষ্ঠ। নিজেকে যে মনে করে কনিষ্ঠ—smaller than the smallest। তাঁর গতি সর্বত্র। সে humble বলে grumble করে না। Try to be the free channel of the Lord and try to be possessed by the Lord। গুরুর কৃপায় ভক্তি আসবে, ছলনা করলে হবে না। নিজের সব দোষত্রুটি অকপটে স্বীকার করতে হবে! তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। তবেই গুরুকৃপা পাবে অন্যথায় কৃপা পাওয়া মুশকিল। [২৭।৪।৯৪]

প্রচলিত বিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে আত্মবিজ্ঞানের পার্থক্য

বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক কিছু করেছে বটে কিন্তু মানুষ নিজের সম্বন্ধে যথার্থ সচেতন হতে পারে নি। তোমরা বলতে পার আমরা কী অচেতন হয়ে সংসারে চলেছি? উত্তরে বলা যায়—এ সংসারে তোমাদের চলা হল ঘুমঘোরে, অজ্ঞানঘোরে চলা। এখানে তোমরা যা আপন নয় তাকেই আপন করে আর যা আপনতম আপন তাঁকে ভুলে রয়েছ। কে তোমাদের তা বোঝাবে? একমাত্র সদ্‌গুরুই পারেন বলে দিতে কে তোমার আপন আর কে তোমার আপন নয়। সাধারণ গুরুর পক্ষে তা বলা কখনওই সম্ভব নয়। তোমরা তথা পৃথিবীর মানুষেরা ছোট পথহারা শিশুর মতো আপন ঘর হারিয়ে পৃথিবীর পথে পথে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরছ। আর কদাচিৎ কখনও যদি কোনও মহাত্মা মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁর সাহায্যে মুষ্টিমেয় দু'ই একজনই আবার আপন ঘরে ফিরে যেতে পারে। তোমরা আত্মার ঘর ছেড়ে অনাত্মার ঘরে বাস করছ আর tax দিচ্ছ। এই অনাত্মার ঘরে বাস করতে করতে কদাচিৎ কারও কারও অন্তরে জাগে আপন ঘরে, আত্মার ঘরে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা চরম হলে হয়ত সে পথ পেয়েও যেতে পারে। তার জন্যই তারা সৎসঙ্গে ঘোরে। সৎসঙ্গে এলেই যে মুক্তিলাভ হবে এমন কথা কখনওই বলা যায় না। তার জন্য চাই গুরুকৃপা। গুরুর হাতেই আছে মুক্তির চাবিকাঠি।

ভক্তির দ্বার সবার জন্যই খোলা। যার ভক্তি আসে না সেও ভক্তির ভান করতে পারে। শুদ্ধা ভক্তি হল লজ্জাবতী লতার মতো, সামান্য ত্রুটিতে সামান্য কামনার স্পর্শে গুটিয়ে যায়। শুদ্ধা ভক্তিতে দ্বৈত ভাবের বা ভোগের সামান্যতম স্পর্শ থাকতে পারে না। যদি বা সদ্‌গুরুর কৃপায় সামান্য ভক্তি আসে আর তা নিয়ে মাতামাতি করলে গুরু চাবিকাঠি বন্ধ করে দেন। নরেনের আত্মস্মৃতি জাগ্রত না-হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মায়ের কাছে কত কান্নাকাটি করেছিলেন। আবার গুরুকৃপায় নরেন সামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে তা নিয়েই যখন বন্ধুদের কাছে বাহাদুরী নিতে শুরু করলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এখন থেকে তোর ইচ্ছায় আর কিছু হবে না, হবে আমার ইচ্ছায়।' বিবেকানন্দ তপস্যার মাধ্যমে মাত্র দু'বার সমাধিতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

ভুল করলে ভুলের মাশুল দিতেই হবে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই—তা তুমি জেনেই দাও আর না-জেনেই দাও। মনুষ্যজন্ম পেয়ে তা রাতুলচরণে নিবেদন করতে না-পারলে যত নামী দামী শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিক, গায়ক, লেখক হও না কেন তাতে মুক্তি হবে না। তাই বলা হয় গুরুপদে মন কর সমর্পণ। "গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নম্ ততঃকিং ততঃকিং ততঃকিম্"। পরমাত্মগুরুর চরণে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেকে নিবেদন করা না-হলে জীবন হবে বিকারী। আর যে মন্ত্রে মানুষের বিকার নাশ হয় তা হল এক-এর মন্ত্র, এক-এর বিজ্ঞান—'All Divine for All Time, as It Is'।

সকাম চিত্তে নিষ্কামের কথা ঢোকে না। সকাম চিত্তের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। ভোগ না-করলে কর্মফল নাশ হয় না। ভোগ নিবেদন করে যে এক-এর বিজ্ঞান নেয় সেই পূর্ণ। গুরুপদে নিবেদিত চিত্ত, গুরুধ্যানে রত দেহ, গুরুর অনুমতি ভিন্ন যমদূতও নিতে পারবে না—গুরুশক্তি এমনই শক্তি।

একবার যমরাজ তাঁর দূতকে একজন সাধকের দেহ আনতে পাঠালেন। দূত এসে দেখল সে গুরুর ধ্যানে মগ্ন। গুরু তাঁর শিষ্যের দেহ নিয়ে যেতে যমদূতকে বাধা দিলেন। দূত ফিরে গিয়ে তার রাজাকে তা জানাল। যমরাজ তখন নিজে এলেন সেই সাধকের দেহ নিতে। গুরু তাঁকেও বাধা দিলেন। যমরাজ তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরাও এলেন যমরাজের সঙ্গে তাঁর কাজে সাহায্য করতে। গুরু তাদেরও বাধা দিলেন। গুরু জানালেন শিষ্যটি তাঁর আশ্রিত। শিষ্যকে রক্ষা করার ভার তাঁর। তাঁর অনুমতি না-নিয়ে কী করে তাঁরা তাঁরই শিষ্যের দেহ নিতে চাইছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তা স্বীকার করলেন এবং গুরুতত্ত্বকে সর্বোত্তম তত্ত্ব বলে স্বীকার করলেন। তখন থেকেই ঠিক করা হল ইষ্টনামে রত দেহ, সমাহিত দেহ, গুরুমূর্তি ধ্যানে রত দেহ তাঁদের গুরুব অনুমতি না-নিয়ে যমদূত নিতে পারবে না। গুরুভক্ত, ইষ্টভক্ত, সিদ্ধপুরুষ, মহাত্মা, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানীর দেহ থেকে প্রাণ নিতে যমদূতকে গুরুর অনুমতি নিতে হবে। [৪।৫।৯৪]

মানুষ সমস্যা বাড়ায়, সদ্‌গুরু সমাধান দেন

এই যে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত হয় সেখানে জাগতিক দৃষ্টির পৃথকভাব কিন্তু বজায় থাকে। এই পৃথকজ্ঞান মানুষের বহুজন্মের সঞ্চয়। এই পৃথকভাব দূর করা অত সহজ নয়। একজন অনুভবসিদ্ধ-গুরুর নির্দেশ ঠিক ঠিক ভাবে পালন না-করলে তা সম্ভব নয়। অনুভবসিদ্ধ গুরু ও লৌকিক গুরুর মধ্যে পার্থক্য হল অনুভবের। লৌকিক গুরু বুদ্ধি নির্ভর। আত্মজ্ঞান বুদ্ধি বিচারের অধীন নয়।

জীবনের goal মানুষ নিজে নিজে কখনওই পাবে না। দেখা যায় জীবনপথে চলতে যতক্ষণ না-ঠেকে ততক্ষণ কারও সাহায্য সাধারণত মানুষ নিতে চায় না। তবে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে আত্মজ্ঞানী সদ্‌গুরুর সাহায্য নিতেই হবে। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে জীবনের পথে পথহারা মানুষ স্বঘরের যে চাবি হারিয়ে ফেলেছে তা আছে সদ্‌গুরুর হাতে। তিনিই একমাত্র তা ফিরিয়ে দিতে পারেন।

জীবনের পথে চলতে তাই কিছু ভুল ভাঙ্গানোর দরকার। জীবনে শুধু ভুল ভাঙ্গান নয়, যিনি ভুল ধরিয়ে তা আবার শোধন করিয়ে দেন এমন একজন গুরুর দরকার। শূন্যের God নয়, এমন একজন living personality চাই যিনি কোনও একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দেন না। যিনি ঈশ্বরদর্শনকে convince করাতে পারেন। শুধু অনন্তকালের সঙ্গে পরিচয় নয়, যাঁর কাছে অনন্ত প্রশ্নের সমাধান হয়। এক কথায়, ইষ্ট যাঁর বশে। ইষ্ট হল the highest good। এমন সদ্‌গুরু জগতে বহুবার, বহুবেশে এসেছেন কিন্তু মানুষ তাঁদের কাছে চরম বস্তু চায়নি, চেয়েছে জাগতিক সুখ ও দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান। [২৫।৫।৯৪]

যোগসিদ্ধির তাৎপর্য

যোগতত্ত্বে বলা হয় মস্তকে মনঃসংযোগ করতে। এই মস্তকই হল শিবের স্থান, গুরুধাম, সহস্রার বা কৈলাস। যে মন দেহ ছেড়ে নড়ে না, সে মন যাবে কৈলাসে? হিমালয়ে আছে কৈলাস। সেখানে বাস করেন দেবাদিদেব শংকর ভগবান। আসলে এটা হল একটা indication। কৈলাস হল তোমাদের আত্মার পীঠস্থান সহস্রার। সহস্রারে আছে সহস্রদল কমল। মন একাগ্র হলে তাঁর দেখা পেতে পারে। 'মনসেব আপ্তব্যম্'—মন দিয়েই তা প্রাপ্ত হবে। মনের ক্রিয়াকে স্তব্ধ করে ব্যাকুল চিত্তে গুরুনির্দেশিত পথে এগোতে হবে। যোগতত্ত্বে

শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের উপর মনোনিবেশ করে ধ্যান করতে বলা হয়। আনাড়িরা তাদের ইচ্ছা মতো শরীরের নানা জায়গায় মন একাগ্র করে ধ্যান করতে বলেন। অনেকেই ত্রিপুটী ধ্যানের কথা বলেছেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে মনঃসংযোগ—এটা মোটেই সহজ কাজ নয়। যাঁরা বলেন তাঁরা তো বলেই খালাস। বিকার হলে সামাল দিতে তাঁরা আসেন না। আজকালকার গুরুরা তো নিজেদের মতো নির্দেশ দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব সারেন। তারপর ভাল কিছু ফল হলে নিজে কৃতিত্ব দাবি করেন আর খারাপ হলে শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে শিষ্যকে দায়ী করে নিজে সব দায় এড়িয়ে যান। কিন্তু সদ্‌গুরু হাত ধরে নিয়ে যান তোমাদের শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অমৃতস্বরূপে। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে নিজের liking, disliking থাকলে তিনি সরে যাবেন। সদ্‌গুরুর কাছে চাই unconditional self-surrender—তা না-হলে হবে না।

তোমরা যেখানেই যাও না কেন সংস্কার যাবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। গুরু কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্বত্রই বিরাজ করেন। [১।৬।৯৪]

মানুষের হুঁশ জাগে গুরুকৃপায়

জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান। জ্ঞানশূন্য মানুষ হল জড়। কিন্তু জ্ঞানের সন্ধান মানুষ জানে না। মানুষ আছে জ্ঞানাভাস নিয়ে। পুরো হুঁশ মানুষের সহজে জাগে না। হুঁশ জাগাতে চাই গুরুর আশ্রয়। [৮।৬।৯৪]

সদ্‌গুরুর অভিনব বৈশিষ্ট্য

এই বিশ্বসংসার ভ্রমে গড়া, ভ্রমে ভরা। তুমিবোধে গড়া তুমিবোধে ভরা। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞর আশ্রয়ে না-থাকলে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে না-দিলে জ্ঞানের জ্যোতি পাবার সুযোগ নেই। জ্ঞানের জ্যোতি ভিন্ন ভ্রম অপসারণের পথ নেই। আর সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েও যারা অভিমান, অহংকারে সরে যায় তাদের দুর্গতির শেষ নেই। দেবতারাও তাদের কিছু করতে পারেন না। আবার সদ্‌গুরুর আশ্রিতকে যমও গুরুর অনুমতি ভিন্ন নিতে পারে না। তাই বলা হয়েছে—"ন দেব গুরোপরি"। গুরু হলেন সর্বজ্ঞ, সর্বধারী, সর্বভূতের, সর্ব রূপ, নাম, ভাবের অধিষ্ঠান। তাঁর কাছে না-গিয়ে আর কার কাছে যাবে?

Self ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সম্পর্ক, পার্থক্য ও যা জ্ঞাতব্য একমাত্র সদ্‌গুরুই বলে দিতে পারেন। Self is inactive while Ishwara is active—এই সূক্ষ্ম বিচার একমাত্র সদ্‌গুরুই demonstrate করতে পারেন। শাস্ত্র বলে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু যিনি Self-realized তিনি বলবেন—আমিই ঈশ্বর, ঈশ্বরই আমি। এ-ই হল 'আমি'-র পরিচয়।

Undisturbed থাকাই হল গুরুর আশ্রয়। তাঁর আশ্রয়ে থাকলে লঘু-গুরু সরে যায়। তাঁর শরণাগত হও। তিনি-ই তোমার সমগ্র শক্তিসত্তা। তদতিরিক্ত যা-কিছু তাও সব তিনি। তিনিই সব। সবই তাঁর। এই সংসারও তাঁর। তাহলে তুমিও তাঁর। তিনিই তোমার মালিক। তাহলেই তুমি শান্ত। নিশ্চিন্ত হলেই অভী হবে। যিনি অসীমকে হৃদয়ে ধরে আছেন তিনিই আমাকে ধরে আছেন। কী দেখে বিশ্বাস করবে? living example চাই। [১৫।৬।৯৪]

সদ্‌গুরুর অনন্যসাধারণ মহিমা

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হল সংসার। এখানে প্রতিদিন মানুষ ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু এই সংসারের বাইরে মন বের হতে পারে না। যদি কেউ এই সংসার থেকে বের হতে চায় তাকে অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষের সাহায্য

নিতেই হবে। অন্য সাধারণ গুরুর শিক্ষা নিলে চলবে না। যিনি সংসারে আবদ্ধ নিজেই, তিনি আবার সংসার-মুক্তির পথ দেখাবেন কী করে? তাতো হবে এক অন্ধের অপর এক অন্ধকে পথ দেখানোর মতো। একমাত্র যিনি বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি শুধু পারমার্থিক কথাই বলেন সংসারের কথা নয়।

সংসারে মানুষ এক-কে ভুলে বহুকে নিয়ে বসে আছে। আর আরও অর্থ, সামর্থ, বস্তু, ব্যক্তির সন্ধান করছে। এ সবই তো ভ্রম। ভ্রমে ভরা ভ্রমে গড়া তোমাদের জীবন। এই দুঃখময় জীবন থেকে রেহাই পেতে, এই ভ্রমকে জেনে, তাকে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু তোমরা নিজেরা কী ভাবে নিজের দোষ শোধন করবে? তার জন্যই প্রয়োজন একজন সদ্‌গুরুর যিনি অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অপ্রাপ্ত বস্তুকে দেখিয়ে, জানিয়ে, মানিয়ে দেন। এই অপ্রাপ্তকে পেয়ে তার সঙ্গে মিশে যেতে সাহায্য করা একমাত্র সদ্‌গুরুর পক্ষেই সম্ভব। অন্য কোনও সাধারণ গুরুর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ গুরুরাও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে বিষয় আশয় নিয়ে বদ্ধ।

কর্মফল তো ভোগ হচ্ছেই। তাকে আর বাড়াও কেন? তুমি কর্তাও নও, কর্মও নও। নিজেকে অর্কতা, অভোক্তা ভাবতে পার না। কেন নিজেকে এত উপাধি জড়িয়ে নিয়ে ভাবছ। যেখানে কোনও উপাধি নেই, সেখানেই আছে শান্তিধাম। মনকে কবে নিয়ে যাবে সেই শান্তিধামে। নিজের মধ্যে নিজে যে গুরুকে খুঁজে পাবে সেই আত্মগুরু কোনও দিনই ভুল পথ দেখাবে না। গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। কর্মক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে পরনিন্দা, পরচর্চা করে, স্বার্থপর হয়ে এ রকম গুরুর সঙ্গ করা সম্ভব হবে না।

মন নিয়েই সংসারীর কারবার। এই মন ভাড়া দেওয়া আছে বৈচিত্র্যের মাঝে। এই বহির্মুখী মনকে ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী করাই হল সাধনা। তার জন্য একান্ত ভাবে সদ্‌গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। গুরুর কাছে আছে জ্ঞানামৃত, সমরসসার। শিষ্যদের অন্তর গরলভরা। গরলশূন্য করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা গুরুকেও গরল দিতে দ্বিধা করে না। এ রকম উদাহরণের অভাব নেই। [২৬।৬।৯৪]

গুরুমহিমার সর্বোত্তম ঘোষণা

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সভ্যতার যত স্তর আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হল গুরুসাধনা।

মহাত্মারা প্রশ্ন করলেন 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে)—গুরুকরণ হয়েছে? তাঁদের বলা হল 'না'। গুরু করলে কী হবে? কে গুরু? কাকে গুরু করা হবে? কী করে চিনবো? গুরুকে তো চেনা যায় না। তাহলে তো গুরুকরণের জন্য অন্যের উপর বিশ্বাস করতে হবে। আর যার উপর বিশ্বাস করলে সে যে ঠকাবে না তার কী guarantee আছে? তাই অপরকে নয়, 'এ' নিজের মধ্যে নিজেই খুঁজে পেয়েছে আত্মগুরুকে। যিনি কোনও দিনই তোমাকে ধোঁকা দেবেন না। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিনীদের দোষারোপ করলেন, তারা কুলটা, তারা রাত-বেরাতে তাঁর বাঁশী শুনে ঘর সংসার ফেলে বেরিয়ে আসে তখন গোপিনীরা তাঁকে উল্টো প্রশ্ন করে, আমাদের কুলটা বানাল কে? এখন তো তুমি আমাদের অন্তরে বসে গেছ। হৃদয় থেকে বের হবে কী করে? আমাদের হৃদয় ছেড়ে বের হয়ে দেখাও তো। যেই কৃষ্ণ, সেই রাম, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ—যে নামে ডাক, যে রূপেই দেখ না কেন এঁরাই তোমাদের আত্মাস্বরূপ। আত্মাকে তো জীবন থেকে ভাগ করা যায় না। সেই অবিভক্তেরই 'এ' ভক্ত। সেই অদ্বয়, অব্যয়, অখণ্ড, ভূমা আপনই 'এর' গুরু। সেই আপন বস্তুর সন্ধান একমাত্র আপনই দিতে পারে। তাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, তাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, তাঁ হলে হওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না। সেই পরমতম আপনই 'এর' গুরু। 'এর' মধ্যেই ছিল, 'এর' মধ্যেই আছে, 'এর' মধ্যেই থাকবে। এই বোধই 'এর' মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ। এটাই এর প্রমাণ।

'অভিমান করো না'। অভিমান করলে পরমধন কোনও দিনই পাবে না। মানুষের আছে পদে পদে অভিমান। চাওয়ার অভিমান, পাওয়ার অভিমান, না-পাওয়ার অভিমান, প্রিয়জনের প্রতি অভিমান, আত্মার প্রতি অভিমান,

গুরুর প্রতি অভিমান। কত জন্ম জন্মের তপস্যা ও সুকৃতি থাকলে এমন গুরুসেবার সুযোগ পাওয়া যায়, তা তোমরা জান না। গুরুর নির্দেশ মতো গুরুকে সঙ্গে করে চল একদিন দেখবে গুরুও dissolve হয়ে গেছেন। একমাত্র আত্মাই আছে। [২৭।৭।৯৪]

ধর্ম ও বিজ্ঞানের অভিন্ন অভেদ মহিমা

প্রতি পদে পদে, প্রতি বোধে বোধে অনুভব করা হয়েছে ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্মকে। তাই দেখা গেছে অনেক বিজ্ঞানীকেই মৃত্যুকালে বলে যেতে হয়েছে—ঈশ্বরকে জীবনে না-মানলেও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেই জীবনে অনেক শান্তি পাবে। অদ্বয়জ্ঞানের দৃষ্টিতে এখানে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে ঈশ্বর হলেন background of all. We are Divine in reality and man in appearance. তোমরা তোমাদের sub-human nature নিয়ে human body নিয়ে ঘুরছ। Sub-human থেকে হবে human, তার থেকে superhuman, তার থেকে divine, তারপর super-divine, তারপর Absolute। এতগুলো stage এখনও বাকি। এর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে একমাত্র সদ্‌গুরুই সাহায্য করতে পারেন আর কেউ না। সদ্‌গুরুর সঙ্গ কিছুদিন করে, কিছুদিন কথা শুনে গুরুসঙ্গ ত্যাগ করে যারা, তারা আর যোগ্যতা কৃতজ্ঞতার মানে দাঁড়াতে না-পেরে গুরুমারা বিদ্যা জীবনে ব্যবহার করে। তার ফলে নিজেরা কষ্ট পায় ও যাদের সঙ্গে থাকে তাদেরও কষ্ট দেয়। তাদের সংস্পর্শে যারা আসে তারাও কষ্ট পায়। জোনাকি পোকা তো সূর্যের আলো দিতে পারে না।

একমাত্র গুরুই পূর্ণতা, অমৃতত্বকে, আপনস্বরূপকে, ঈশ্বর-আত্মাকে ধরিয়ে দিতে পারেন। ঈশ্বরই গুরুবেশে আসেন নিজেকে ধরিয়ে দিতে। গুরু বলেন ঈশ্বরকে আপনবোধে সঙ্গে নিয়ে চললেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হয়। প্রেমই ঈশ্বর। আপনবোধেই হয় ভক্তির সাধনা।

ঈশ্বরভাবনা করেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। গুরু ধরিয়ে দেন ভাবনার একটি সূত্র। গুরু নির্দেশিত পথে চললে তিনিই পরবর্তী স্তরের কথা বলে দেন। গুরুনির্দেশিত পথে এগোলে পাওয়া যাবে পরম প্রেমাস্পদকে যাঁকে জানলে জানার আর কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে পেলে পাওয়ার আর কিছু থাকে না, যা হলে হওয়ার আর কিছু থাকে না, কোনও অভাব, ব্যথা, বেদনা থাকে না। তাঁর সঙ্গে দেখা না-হলে এ জীবনই অপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার একটি পথ হল ভজন। সকল কাজের মাঝে গুণগুণ করে ভজন করলে কাজ হয় সহজ, সরল, সতেজ ও ফলপ্রদ।

তোমাদের সাধনা হল ইন্দ্রিয় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে বোধস্বরূপ আত্মার মধ্যে একটা unity আবিষ্কার করা। যিনি এই unity আবিষ্কার করেছেন তাঁর সঙ্গ করলে তোমাদের সকল কর্ম জ্ঞানে পৌঁছে যাবে। গুরু লঘুকে গুরু করেন। তিনিই জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও প্রেম পরিবেশন করেন। ঈশ্বরই গুরুরূপে নেমে আসেন এবং নিজেকে প্রকাশ করেন গুরুর মাধ্যমে। কী করে করেন তা তিনি না-জানালে জানা যায় না। তিনিই আছেন আদি-মধ্য-অন্তে। তিনিই শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমরূপে সবার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে কেউ ছোটও না, কেউ বড়ও না। প্রত্যেকেই এক সত্য দ্বারা বিধৃত। কোনও দল, মত, পথে যাবার প্রয়োজন নেই—নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাক। নিজের মধ্যে পাবে সেই অরূপরতন। তার জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। [৩১।৭।৯৪]

গুরু ও ইষ্টের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

গান শিখতে হলে আগে শুনতে হয়। শুনতে শুনতে গুরু ঢুকে যায় ভিতরে, পরে তিনিই গান হয়ে, ভজন হয়ে বেরিয়ে আসেন। গুরুরূপে যে মা আসেন তার ঋণ শোধ করা যায় না। সাধনা করে ইষ্টদর্শন হলে আর

গুরুকে খুঁজে পাবে না। গুরু তখন ইষ্টের সঙ্গে মিলে মিশে যান। আর প্রাণের বৃত্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যে গুরুর মহিমা গাইবে সেই গুরুর সাথে মিশে যাবে। গুরুকে পেলে ইষ্টকেও পাওয়া যায়। তবে ইষ্টকে পেলে গুরুকে নাও পেতে পার। তাই সব ভজনের শ্রেষ্ঠ ভজন হল গুরুভজন। [১৯।৮।৯৪]

শিক্ষা ও দীক্ষার তাৎপর্য গুরুর কৃপায় জানা যায়

অনেকেই 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) দীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। 'এর' কাছে ব্যক্তিগত অভ্যাসের আর প্রয়োজন নেই। অভ্যাসক্রিয়া হয় জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের মাধ্যমে। সত্য লাভের জন্য নূতন অভ্যাস গড়তে হবে। কিন্তু নিজের স্বভাব, নিজের ভাললাগাকে অতিক্রম করবে কী করে? তার জন্য চাই বৃহত্তর শক্তির সাহায্য। সেক্ষেত্রেও আত্মাই গুরুরূপে আসেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, তবে তিনি কোনও condition নিয়ে আসেন না। সংসারী মানুষের এমনই অভ্যাস তাঁকেও condition-এর ছাপ দিয়ে নেয়। গুরু যা-কিছু করেন বা বলেন, অভিমান, অহংকার ও দেহাত্মবুদ্ধি দিয়ে তা আচরণ করতে গেলে তা কখনওই ফলপ্রসূ হয় না। যতই না জপতপ কর, পূজাপার্বন কর, দেবদেবীরা কখনওই তোমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। এ কথা জোর দিয়ে কেউ কোনও দিন বলেনি। এখন বলা হচ্ছে তার কারণ তোমাদের হারানো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা দরকার। একমাত্র নিজের আত্মা বা আত্মগুরু ভিন্ন তোমাকে সাহায্য করার কেউ বা কোনও কিছু নেই। তার জন্য চাই নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব গুরু। অবশ্য নিরপেক্ষ গুরু দীক্ষা দিতে পারেন না।

সংসারের চাওয়া, পাওয়া, না-পাওয়া সবই হল artificial want। আসলে কোনও চাওয়া-পাওয়া থাকতেই পারে না। সেই জন্যই জীবনকে বলা হয়েছে struggling agent। কিন্তু এ কথাটির অর্থ তোমরা ঠিক ভাবে নিতে পারনি। সকলেই নিজের ফাঁদে নিজে জড়িয়ে আছ। স্বভাবের রূপান্তর মহতের মহিমা ছাড়া হয় না। স্বয়ংপ্রকাশ নিজে এসেই নিজেকে খুলে দিয়ে যান সদ্‌গুরুরূপে। সদ্‌গুরুকে ধরা সহজ নয়। তিনি আত্মার সঙ্গে মিশে থাকেন। জীবনে গুরু মেলে অনেক। কেউ শিক্ষা দেয়, কেউ দীক্ষা দেয়। কেউ দীক্ষা দিয়েই ছেড়ে দেয় শিক্ষা দেয় না। অবশ্য ভাল কিছু হলে তিনি তার credit নিতে চান আর মন্দ হলে শিষ্যের discredit। কিন্তু সদ্‌গুরুর কাছে শিক্ষা ও দীক্ষা উভয়ই পাওয়া যায় একসঙ্গে। যদিও লৌকিক দীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—তাঁদের আচরণের মাধ্যমে শিক্ষাই দীক্ষা। এই দীক্ষা হল universal।

গুরুকে খুঁজে বেড়ানোর প্রয়োজন হয় না। গুরুই তোমাকে খুঁজে নেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কতকাল দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন—তিনি কী বেড়িয়েছিলেন গুরুর খোঁজে? না, গুরুরাই এসে তাঁকে দীক্ষা শিক্ষা দিয়ে গেছেন।
[১৪।৯।৯৪]

হৃদয়গুহায় আত্মগুরুর সাথে হয় অভেদে মিলন

যখন সমস্ত নিজ অতিরিক্ত চিন্তা কল্পনা লয় পাবে, চিত্ত হবে বৃত্তিশূন্য, সংসারের কোনও দৃশ্য যখন আর কাজ করে না, অন্তর হয় শূন্য, তখন সেই শূন্যের শূন্য মহাশূন্যে বা মহাকাশে বা মহাব্যোমে, হৃদয়াকাশে, হৃদয়গুহায়, হৃদয়গুম্ফায় মন প্রবেশ করবে যেখানে প্রবেশ করতে চাই বিনয়, নম্রতা, ব্যাকুলতা, কাতর প্রার্থনা—সর্বোপরি চাই গুরুকৃপা। তখনই সত্য আত্মস্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তবে সদ্‌গুরুর কৃপা পাওয়া সহজ কথা নয়। সে সত্যের বিজ্ঞান শ্রবণমাত্রেই অনুভব হওয়ার কথা—তা অনুভব করতে মানুষের জন্ম জন্ম লেগে যায়। গুরুর কাছে শ্রবণের পর যে অনুভূতি হয় তা আবার সদ্‌গুরুর কাছে verify করতে হবে। এ তো কত জন্মের ব্যাপার। 'শ্রবণাৎ মুক্তি', 'শ্রবণাৎ শান্তি' 'শ্রবণাৎ সত্যানুভূতি' অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি হল স্বপ্নের খেলাঘর। একমাত্র Science of Oneness-ই এ কথা বলতে পারে। দ্বৈতবোধে ঈশ্বরকে আপন থেকে পৃথক করে আবার তাঁকে পাবার সাধনা করে। ব্রহ্ম-আত্মা তাই গুরুবেশে এসে বলে যায়—'আমাকেই পূজা কর, ভজন কর। আমি তোমার মধ্যেই আছি। আমিই আমাকে প্রকাশ করব—তাই আমার আশ্রয়ে থাক।' কিন্তু গুরু যতই বলুন না কেন, তোমরা তা মানতে পারবে না, নিতেও পারবে না। যতদিন এ রকম দ্বৈতবোধে থাকবে ততদিন আত্মজ্ঞান কখনওই নিতে পারবে না। গুরু আরও বলেন—self-effort cannot be performed without My grace। আমার বক্ষে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে। আমি আছি কেন্দ্রের মহাব্যোমে, যাকে বলা হয়েছে হৃদয়াকাশ। এই হৃদয়াকাশে যেতে হবেই। হৃদয়াকাশে বা হৃদয়গুহায় প্রবেশ করতে না-পারলে যতই ব্রহ্মকথা বল, সবই ফিরে আসবে। এতদিনের ভুলের মাশুল দিতেই হবে। গুরুকৃপা ভিন্ন একপাও এগোনো যাবে না। আপনাতে আপনি স্বয়ং গুরুকৃপা ছাড়া হবে না। তাই এত গুরুভজন দেওয়া হয়েছে। গুরুভজন করলে মনের অহংকার, দম্ভ, দর্প কমে আসবে। তখনই গুরুকৃপায় lost paradise regain হবে। Then you will discover your own nature, যা covered হয়ে আছে। এর জন্য দু'টি পথ—হয় তোমার চিন্তাভাবনাকে dissolve করা অথবা তোমার power of discrimination দ্বারা সব চিন্তাভাবনাকে কাটিয়ে এক-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। [২১।৯।৯৪]

দ্বাদশ অধ্যায়

আত্মগুরুর কৃপাতে আত্মবোধের অনুভূতি সিদ্ধ হয়

Goal-এ পৌঁছবার পথে গুরুর স্থান বড় কঠিন। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের সামান্য ভাঁটা পড়লে চলবে না। আর একবার ভাঁটা পড়লে তার আর জোয়ার আসে না। তার জন্য যে দুর্ভোগ তা দেবার ব্যবস্থা করে প্রকৃতি। প্রকৃতি তার ভার নিয়েছে। 'এ' আছে neutral-এ। ধর্মজগৎ সম্পর্কিয় যা-কিছু তত্ত্ব 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে তা অতি দুর্লভ। এই তত্ত্ব পেতে চাই একনিষ্ঠতা ও শরণাগতি। Complete surrender ছাড়া গতি নেই। সত্য থেকে এক চুল সরে গেলে আর সে অধিকার থাকে না। মানুষ তো ব্যক্তিগত আরাম, সুখ-সুবিধা ছাড়া আর কিছুই চায় না। যাদের ত্যাগ নেই, বৈরাগ্য নেই, আছে শুধু ধর্মকে কব্জা করার ইচ্ছা, অথচ ধর্মের জন্য কোনও অবদান নেই, তারা কী করে পাবে আত্মজ্ঞান? কর্ম দিয়ে ধর্ম পাওয়া কঠিন। কারণ স্বার্থ, ভোগলিপ্সাযুক্ত কর্ম হল অকর্ম। জ্ঞানের পথেও ধর্মকে পাওয়া কঠিন। ঘষে মেজে জ্ঞান পাওয়া যায় না। যথার্থ বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া জ্ঞান আসে না। ভক্তির পথকে সবাই মনে করে সহজতম পথ। কিন্তু পরিপূর্ণ একনিষ্ঠতা না-থাকলে মনের সমস্তটা ঈশ্বরাত্মার পায়ে না-দিলে ভক্তি পূর্ণ হয় না। Part by part করে নয়, চাই complete perfect and unconditional surrender। তা না-হলে যা হয় তা হল অভিমান বা আসক্তি। আবার অধ্যাত্মসাধনার পথ হল এক-এর পথ, কোনও রকম জল্পনাকল্পনা এখানে থাকতে পারে না। দল বেঁধে ধর্ম করা হল বিলাসিতা, শৌখিনতা। দুইকে নিয়ে ধর্মপথে চলা যায় না। দুই মানেই দ্বন্দ্ব। কাজেই ধর্ম অত সহজ নয়। বর্তমানের ভক্তরা ভোগে পোক্ত। দৈহিক, প্রাণিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—সব ভোগই তাদের পূর্ণ হওয়া চাই। তাব জন্যই হয় জাঁকজমক সহকারে পূজা। এই রকম ভক্তি হল সকাম ভক্তি। বর্তমান মানুষের ভক্তি হল সকাম ভক্তি। সকাম ভক্তি ভক্তির পর্যায়ে পড়ে না। এরা দেবদেবীর পূজা করে কামনা-বাসনা পূরণের আশায়। আর কামনাপূরণ না-হলে রাগ বা অভিমান করে গুরুর উপর, ইষ্টের উপর। দেবতারা তো ভয়ে পালাতে পারে কিন্তু গুরু বা ইষ্ট কোথায় যাবে? আসল গুরু হলেন Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge। পুতুল পূজা ধর্ম নয়। আসল ধর্ম হল প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান অর্থাৎ স্ববোধ বা আপনবোধ দিয়ে বোধস্বরূপের ব্যবহার। পূজা হল পূর্ণতার মধ্যে জেগে থাকা। অথবা পূর্ণের সাহায্যে পূর্ণতাকে জানার চেষ্টা। Knowledge of Oneness ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাতেই কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তি সিদ্ধ হয়। স্বার্থের জন্য কর্ম হল অকর্ম, স্বার্থের জন্য ধর্ম হল অধর্ম, সত্যকে follow করলে সত্যই পাওয়া যায়, মিথ্যাকে follow করলে মিথ্যাই থাকে।

দীক্ষাগুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। 'এ' কারও গুরু নয়, 'একে' দক্ষিণা দেবার ক্ষমতাও কারও নেই। 'এর' কাছে আত্মদান বা total surrender-ই হল গুরুদক্ষিণা।

এখানে তাই বলা হয় 'গুরু সাজে সেজো না; সাজা-গুরুর অনেক সাজা'। গুরু হওয়া অত সহজ নয়। গুরু সেজে উপদেশ দেওয়া, suggestion দেওয়া চলে কিন্তু তাতে ধর্মলাভ হয় না। উপদেশ, suggestion ইত্যাদি অভিমান অহংকারের কাজ। শুদ্ধ জ্ঞানে অভিমান অহংকার থাকতেই পারে না। অভিমান অহংকার হল অজ্ঞানের। একমাত্র জ্ঞান ছাড়া মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধির হাত থেকে রেহাই নেই। এই জ্ঞান

শাস্ত্র-পড়া জ্ঞান নয়। ঈশ্বর লাভের জন্য চাই অনুভবসিদ্ধের বাণী। একমাত্র অনুভবসিদ্ধ ছাড়া আর কেউই ভগবানের পথ দেখাতে পারেন না। অনুভবসিদ্ধের ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা জিজ্ঞাসুর মনের বৃত্তিকে নাশ না-করলে জ্ঞান লাভের আর কোনও উপায় নেই। মনের বৃত্তিকে মনই শান্ত হতে দেয় না। মনকে শান্ত করতে, মনকে হতে হবে একনিষ্ঠ—তার সঙ্গে চাই বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগ। বৃত্তিশূন্য মন হল শুদ্ধ মন। তা-ই যথার্থ ধর্ম ধারণের যোগ্য।

ভাবের ঘরে চুরি করে, এখানকার কথা নিজের নামে চালাতে গেলে ধরা পড়বে নিজেরই কাছে। নিজের আত্মশক্তি কখনওই ছেড়ে দেবে না। গুরুবাণী হল আত্মশক্তি—সে পূর্ণকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করে না।

'এ জীবন' দুঃখ বেদনাকে এড়িয়ে যায়নি। আমাকে যত বেদনা, যত দুঃখ দেবে দাও—দুঃখই আমার গুরু, বেদনাই আমার গুরু। এই পুঞ্জীভূত বেদনার মধ্যেই 'এ' বেদকে খুঁজে পেয়েছে। পালিয়ে নয়, এড়িয়ে নয়—এই বেদনার মধ্যেই হয়েছে আপনবোধের বিকাশ। তারই মধ্যে পেয়েছে Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge-এর অভিব্যক্তি। [১৮।১।৯৫]

গুরুজ্ঞানে আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানে গুরুজ্ঞান

যথার্থ সৎসঙ্গ কিন্তু গতানুগতিক ধর্মের মাথায় আঘাত হানতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভই যদি উদ্দেশ্য হয় তো সৎগুরুর সন্ধান করতেই হবে। কেননা সৎগুরুর শিক্ষা ও কৃপা ভিন্ন মুক্তির উপায় নেই। Professional-দের কাছ থেকে devotional science পাবে না। [৪।২।৯৫]

কৃতজ্ঞতাবোধ পূর্ণ হলেই আত্মগুরুর সঙ্গে মিলন হয়

আত্মজ্ঞান কোনও প্রাপ্তির বস্তু নয়। তা নিত্যপ্রাপ্ত নিত্যলব্ধ। এই জ্ঞান হল স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। প্রত্যেকের হৃদয়গুহাতেই বর্তমান। কিন্তু সবাই তাঁকে জানতে পারে না। তত্ত্বস্ফূর্তি যাঁর হয়েছে সেই জানে তাঁকে। আত্মজ্ঞান লাভের পথে আগে মনকে তৈরি করতে হয়। মন তৈরি করা কঠিন! মন তৈরি হবে মনের মল অপসারিত হলে। মনের মল অপসারিত করতে চাই সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গে এসেও যদি মনের মল অপসারিত না-হয় তো বলার কিছু নেই। এখন প্রশ্ন সৎসঙ্গ কখন হবে। সৎসঙ্গ হল অনুভবসিদ্ধের সঙ্গ অবশ্য অনুভবসিদ্ধ নিজে ধরা না-দিলে অন্যে তাঁকে জানতেও পারে না, মানতেও পারে না। যারা শাস্ত্রপাঠ করে, পূজাপাঠ করে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে দেবদেবীর পূজা করে, যাদের তত্ত্বস্ফূর্তি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জাগ্রত হয়নি, তাদের সঙ্গ কখনওই সৎসঙ্গ নয়।

মানুষ জন্ম জন্ম সাধনা করে যে ব্রহ্ম-আত্মাকে পাবার জন্য, তার চাবিকাঠি আছে সদ্‌গুরুর কাছে। তিনি একমুহূর্তেই পারেন জ্ঞাননয়ন বা বোধির দ্বার খুলে দিতে। কিন্তু দেন না। শিষ্যের ব্যবহারদোষই তার কারণ।

একমাত্র বিদ্যাশক্তির সাহায্য ব্যতীত সত্তাস্ফূর্তি কখনওই সম্ভব নয়। তাই গুরুইষ্টকে ধরে থাকতে হয়। গুরুনিষ্ঠা, ইষ্টনিষ্ঠা থাকলে শুদ্ধসত্ত্বগুণের স্ফূর্তি হবেই। কোটি কোটি জন্মের সুকর্মের ফলেই একজন অনুভবসিদ্ধ গুরুর সঙ্গ করার সুযোগ মেলে। সে সুযোগ হারানো বা গুরুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যে কত দোষের তা তোমরা বুঝতে পারছ না। অকৃতজ্ঞকে উদ্ধার করা খুব কঠিন। [৮।২।৯৫]

জীবের সর্বোত্তম কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ

ঈশ্বর যে সব কিছুতেই বিদ্যমান এটা অনুভবসিদ্ধের অনুভবজাত এক সহজ সরল ঘোষণা। তাঁদের এই ঘোষণার পিছনে তাঁদের কোনও মতলব নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নেই, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, যশ,

খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা নেই। সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই তাঁরা ঈশ্বর প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গ তাঁদের জীবনের অঙ্গ। ঈশ্বর নিজের সাথে নিজেই লীলা করছেন। 'এখানে' (ফার্ন রোডের সৎসঙ্গে) যে সব কথা বলা হয় তা প্রত্যেকের নিজের শিক্ষার জন্য, অন্যের প্রতি ব্যবহারের সমর্থনের জন্য নয়। তা নিজের জীবনে ও আচরণে ব্যবহার করে সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। এখানকার সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এই সৎসঙ্গে যারা আসবে এখান থেকে সৎ-কে আহরণ করবে নিজের ভিতরের অসদ্‌বৃত্তিকে অপসারণ করার, পরিহার করার জন্য। সত্যের প্রতিষ্ঠা হলে চিৎ ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা হবেই। তবে তত্ত্বস্ফূর্তি সবার হয় না। অভিমানী, অহংকারীর তো নয়ই। যার তত্ত্বস্ফূর্তি হয়নি তার শিক্ষা দেবার অধিকার নেই। অধিকারী পুরুষ বিনা শিক্ষা দেওয়া অপরাধ।

আনুগত্য নিয়ে এসে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে কিছুই হবে না। চাই পরিপূর্ণ আনুগত্য—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। জেনো, এখানে জানার ব্যাপারটাই futile, কোনও কাজে লাগবে না। এখানে মানাই সব। জীবনের সকল অবস্থায় সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মকে স্মরণে-মননে রেখে, তাঁর নামে, তাঁর হয়ে জীবন কাটিয়ে দাও। কখনও তাঁকে নিজের মতো করে চেয়ো না। তাঁর আপন হও। বুদ্‌বুদ্‌ যদি সমুদ্রকে আপন করে নিজের মধ্যে নিতে চায় তা কী সম্ভব? বরং সেই সমুদ্রে মিলে মিশে এক হয়ে সমুদ্র হয়ে যাবে।

ঈশ্বর তোমাদের জিভ দিয়েছেন তাঁর গুণগান করার জন্য, বাহাদুরি নিতে নয়, পরনিন্দা পরচর্চা করার জন্য নয়। চোখ দিয়েছেন সর্বরূপে তাঁকেই দেখার জন্য। কান দিয়েছেন তাঁর মহিমা শোনার জন্য, আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনার জন্য নয়। ইন্দ্রিয় দিয়েছেন তাঁর সেবার জন্য, নিজের ভোগে ব্যবহার করার জন্য নয়। এ সব ধরিয়ে দেবার জন্য তেমন সদ্‌গুরু কোথায়? সবাই ছুটছে বিষয়-আশয় ও অর্থের পিছনে। পরমার্থের জন্য ছুটছে কয়জন? পরমার্থের দৃষ্টিতে অন্তরের কাম, কর্ম ও কর্তৃত্ব খসে যায়। অন্তরের বহির্মুখী ধারা তখন হয় রাধা। প্রত্যেকটি জীব যদি রাধা হয় তবেই তো কৃষ্ণকথা হরিকথার মর্ম বুঝবে। নিজের যে আত্মস্মৃতি হারিয়ে মানুষ আজ দিশাহারা তাকে ফিরে পেতে শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈব হবার দরকার নেই—be sincere to your own Self। [১৫।২।৯৫]

তত্ত্বস্বরূপের সঙ্গে পরিচয় হলে ঈশ্বরের জীবজগৎ লীলা অনুভূত হয়

Self is in Self। চিৎশক্তি বা পরাচিৎ শুদ্ধসত্ত্বগুণে হলেন ঈশ্বর, মলিনসত্ত্বগুণে হলেন জীব আর তমোগুণে হলেন জগৎ। জীব হল প্রকৃতির দাস। কিন্তু ঈশ্বর হলেন প্রকৃতির প্রভু। জীব হল বদ্ধ, ঈশ্বর হলেন মুক্ত। জীবের মলিনসত্ত্বগুণ শোধন হলে জীবও ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হতে পারে কিন্তু পৃথক ঈশ্বর হতে পারে না। জীবের মলিনসত্ত্বগুণ শোধনের জন্যই অনুভবসিদ্ধ গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন কী পদ্ধতিতে বিচার করলে মনের মল, চিন্তার মল, বুদ্ধির মল, কর্মফল, দেহাত্মবুদ্ধি, মোহ, প্রিয়তাবোধ, ধর্মাধর্মবোধ সরে যাবে। উচিৎ-অনুচিৎ, সত্য-মিথ্যা, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী ভাব সরে গেলে অন্তরে এক-এর বোধ বা এক-এর বিজ্ঞান জাগে।

এক-এর ভাবনা দিয়েই অন্তরের সব ভাবনা সরে যায়। মানুষকে বিকারমুক্ত হতে তাই একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরুই সাহায্য করতে পারেন। কারণ তিনি নিজেকে ব্রহ্ম-আত্মা বলে অনুভব করেছেন। যার আত্মজ্ঞান জাগেনি তার পক্ষে অন্যকে জ্ঞান দেওয়া ভ্রান্তিবিলাস। এ হল এক অন্ধকে আর এক অন্ধের পথ দেখানোর মতো।

Realization কখনও হারায় না, হারায় নাই। তুমি মুক্ত ছিলে, মুক্ত আছ, মুক্ত থাকবে। তুমি পূর্ণ ছিলে, পূর্ণ আছ, পূর্ণ থাকবে। শুধু আবৃত আছে—তুমি তো ভুলে আছ তোমার পূর্ণস্বরূপকে। একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরুর কৃপা ছাড়া বা অনুগ্রহ না-পাওয়া পর্যন্ত কোনও দেবদেবী, সাধুসন্ত সে চাবি তোমাদের দিতে পারবেন

না। কারণ তাঁদেরও চাহিদা আছে। তাই তাঁরাও অপূর্ণ। পূর্ণতার লক্ষণ কিছু জানা, কিছু না-জানা নয়, কিছু করা, কিছু না-করা নয়। পূর্ণতা হল সমতা, একতা।

সত্য কোনও রূপ নয়, নাম নয়, ভাব নয়। সত্য হল বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। তোমরা অচিৎ হয়ে আছ। তাই চিৎস্বরূপকে ধরতে পারছ না। কচ্ছপকে চিৎ করে দিলে আর কিছু করার থাকে না। তেমনি চিৎস্বরূপ হলে আর কর্ম থাকে না। কাজেই মন যে ভুল করে তা মনের স্বভাব, অহংকার কর্তৃত্ব করে তা অহংকারের স্বভাব, বুদ্ধি বিচার করে তা বুদ্ধির স্বভাব। স্বভাব তার কাজ করে চলেছে কিন্তু শান্তি পাচ্ছে কী? মন, বুদ্ধি, অহংকার এত চিন্তাভাবনা করছে কিন্তু শান্তি পাচ্ছে কী? তোমার মন-বুদ্ধি-অহংকারকে শান্ত করতে চাই এমন একটা মন-বুদ্ধি-অহংকার, যা একজন আত্মজ্ঞর আছে। যাঁর মন হয়েছে অ-মন, অহংকার হয়েছে অহংদেব। যাঁর বুদ্ধি হয়েছে ধী-সাগরে বিলীন। বুদ্ধি হল ধীসাগরের বুদ্‌বুদ্। চৈতন্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে বুদ্ধি হল বিজ্ঞানস্বরূপ। এই বিজ্ঞান দিয়েই প্রজ্ঞানে যাওয়া যাবে। সংসারী বিজ্ঞান নিতে পারে না। কিন্তু সমসারী পারে। সংসারী করে 'আমার আমার' আর সমসারে 'তোমার আমার' নেই, সব এক-এর। তাই বলা হয়, 'আমার পূর্ণ' হল জীব আর 'আমার শূন্য' হল শিব। এই সদ্‌বাণী দিয়ে রাঙিয়ে নিতে হবে জীবন। জানবে আদি, মধ্য, অন্তে, ডাইনে, বাঁয়ে, উত্তরে, দক্ষিণে এক চৈতন্যই আছে। অখণ্ডবোধে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল তার সাধনা।

[২২।২।৯৫]

যোগ্য অধিকারী জ্ঞানীগুরুর কৃপায় অজ্ঞান মুক্ত হয়

আধ্যাত্মিক জীবন হল বাছাই করা চালুনী দিয়ে ছেঁকে নেওয়া জীবন। চালুনী দিয়ে যেমন জিনিসের মল বাছা হয় তেমনি নিজেকে সব রকম দোষগুণ মুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে দেহের মল, মনের মল, প্রাণের মল, বুদ্ধির মল, প্রাকৃতিক মল, কায়িক মল শোধন করতে হবে। কিন্তু এই মল মুক্ত হবে কী করে? সাধারণ গুরুর কাছে গেলে তিনি হয়ত মালা জপা বা কতগুলি বাধা অভ্যাস করতে দেবেন। তাতে কী হবে? এ সব নিয়ে তো সবার সঙ্গে চলতেও পারবে না। তখনই আসবে দ্বন্দ্ব—আমি ঠিক অন্যে বেঠিক। ধর্ম কোনও ঠুন্‌কো ব্যাপার নয়—ধর্ম দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হয় না, স্বার্থনাশ হয়। এই জ্ঞান দেবে কে? কর্ম দিয়ে অজ্ঞান নাশ হয় না। একমাত্র জ্ঞানীগুরুর কৃপা ভিন্ন অজ্ঞান নাশ হয় না। অবশ্য যোগ্য অধিকারী ভিন্ন জ্ঞানীগুরুর কৃপা আসে না।

[১৫।৩।৯৫]

অন্তরে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে আত্মজিজ্ঞাসুর আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হয়

'আত্মাই ব্রহ্ম' মুখে বললে অথবা শুনে বা জেনে বললে অবিদ্যা ছাড়ে না। একমাত্র আত্মজ্ঞর কাছে শুনে নিজে অনুভব করেই তা বলা যায়। 'আমি কূটস্থ আত্মা' একথা শুনে বলা আর অনুভব করে বলা এক নয়। 'মা' না-হয়েই নিজেকে 'মা' বলা আর যে 'মা' হয়েছে তাঁর মাতৃত্বের অনুভূতি দু'টো কী কখনও এক হয়? কাজেই ভণিতা না-করে নিজের অন্তরের সব দোষত্রুটি শোধনের চেষ্টা কর। সারাদিন নিজে কি করেছ, কি করছ না, কটা মিথ্যে কথা বললে এ সব স্মরণ করে শোধন করার চেষ্টা কর। নিজের দোষত্রুটি শোধনের চেষ্টা যে করে সেই সাধক। সাধককে গুরু সব সময়ই সাহায্য করেন। আবার আত্মারূপে তিনিই সাধকের অন্তরে নিত্য বিদ্যমান। তিনিই শিষ্যকে ভবচক্র পার হতে, মিশ্রণ থেকে বেরিয়ে আসার পথ বলে দেন:

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রকৃতি অন্তর্মুখী না-হয় ততক্ষণ গুরুর অনুশাসন বোঝার যোগ্যতা হয় না। বারবার বলা হয়েছে গুরু কেবল জ্ঞানমূর্তি। তোমাদের গুরু হলেন ব্যক্তিবিশেষ। তাই তোমাদের অজ্ঞান যায় না। তোমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আত্মজ্ঞান যাঁর জাগ্রত হয়েছে তাঁর পক্ষে গুরুগিরি করা সম্ভব নয়। চৈতন্যসাগরে তো সবই চৈতন্যময় সেখানে দীক্ষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কে কাকে কিসের দীক্ষা দেবে। [২২।৩।৯৫]

আত্মনিষ্ঠাই হল আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম উপায়

জানবার আসল বস্তু কী? যাঁকে জানলে জানার আর কিছু বাকি থাকে না, সেই তো তোমার এবং সবার নিজস্বরূপ (আত্মা)। নিজ অতিরিক্ত কিছু মানলেই জানার বাকি থাকে। নিজেকে ব্যক্তিরূপে, দেবতারূপে, বা বিশেষ কোনও রূপে নয়, নির্বিশেষ রূপে বা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে যখন জানবে তখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ভাব লয় হয়ে যাবে, তখন আর জানার কিছু বাকি থাকবে না। কখনও জানতে চাইবে না—জানবার বা পাবার ইচ্ছা হল অহংকারের। এটাই অজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের ব্যবহার। এই অহংকারকে ছাড়া সম্ভব হয় একমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ গুরুর সান্নিধ্যে ও গুরুকৃপায়। সাধারণ গুরু এমন জ্ঞান দিতে পারেন না। স্বপ্নশূন্য নিদ্রা অর্থাৎ গাঢ় ঘুম হল অজ্ঞানের চরম অবস্থা। তা জানলে কী দিয়ে? সেই কূটস্থ আত্মা আছে বলেই না। একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরুর অনুভবসিদ্ধ কথার বা বাণীর মাধ্যমেই এই সাক্ষী কূটস্থ আত্মায় পৌঁছান যাবে। অজ্ঞানীর চাই অভ্যাস ও প্রযত্ন। কিন্তু যোগ্য অধিকারীর গুরুর একটি কথাই যথেষ্ট। যোগ্য অধিকারীকে তাই তপ্ত লৌহশলাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তপস্যার দ্বারা জ্ঞানানলে যার অন্তর তপ্ত হয়ে আছে তার কাছে সদ্‌গুরুর একটি বাণীই হয় মুক্তিপ্রদ। মুক্তি, শান্তি সব সময়ই আছে। এ সব কোনও কর্মফল নয়। তোমার কাছে যা আবৃত অনুভবসিদ্ধ গুরুর কাছে তা-ই স্বচ্ছ।

জ্ঞান সর্বতোভাবে গুরুসাপেক্ষ। 'আচার্যবান লভতে জ্ঞানম্।' গুরু মানুষের কাছে কামধেনুর মতো। মানুষ গুরুর কাছ থেকে গরুর মতো দুধ নেয় আর পয়সা দিয়ে যা পাওয়া যায় না সেই সব বিপদ উদ্ধারের মতো ফল চায়। [২৯।৩।৯৫]

গতানুগতিকতার প্রভাবমুক্ত হতে গেলে সদ্‌গুরুর শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ উপায়

গতানুগতিকতা সমতা, একতার অন্তরায়। যে সাধনপথে অনুভবসিদ্ধ গুরুর সঙ্গ পেয়েছে ও তাঁর কাছে শরণাগত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে, তার সব অন্তরায় কেটে যায়। To follow sincerely and devoutly a true realizer all through his life is the highest state of a seeker।

গুরু তো ঈশ্বর স্বয়ং—তাই গুরু সাজা যায় না। আর লৌকিক গুরু কী দীক্ষা দেবেন। মন্ত্রের শব্দের তাৎপর্য, লক্ষ্যার্থ ও কেন্দ্রের সাথে পরিচয় না-হলে এই দীক্ষা মন্ত্র বহু জন্ম অভ্যাস করলেও কোনও ফল হবে না। এখানে দীক্ষা দেওয়া হয় না, শিক্ষা দেওয়া হয়। সব গুরু যখন failure হবেন তখন 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে শরণাগত হয়ে এলে 'এর' কাছে তার সমাধান পাবে। তবে সে ক্ষেত্রে শরণাগতি বা total surrender চাই।

আত্মানুভূতি ব্রহ্মানুভূতির অন্তরায় হল মানুষের অন্তরের মল। মানুষের এই তামসিক রাজসিক সাত্ত্বিক মল (কাম, কর্ম, কর্তৃত্ব, অহংকার অভিমান) গুরু বিনা শোধন হয় না। যোগ্যতা লাভ না-হলে কৃতজ্ঞতা লাভ হয় না, কৃতজ্ঞতা লাভ না-হলে গুরুবাক্য অনুধাবন করা যায় না। অকৃতজ্ঞতা হল অযোগ্যতার লক্ষণ।

গুরুর সান্নিধ্য ও গুরুর নির্দেশ যথাযথ মেনে চললে অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আসে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকেই আসে জ্ঞান। বিনয়, নম্রতা, একনিষ্ঠতা, শুচিতা, সমতা, একতা হল শ্রদ্ধার পরিণাম। [১৯।৪।৯৫]

যোগ্যতার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা লাভ হলে গুরুকৃপায় বিবেকযুক্ত বুদ্ধির উদয় হয়

তোমাদের সকল অনুভূতির মূল আছে আপনতাতে—তা সে এই দেহে থাকুক কি অন্য দেহে থাকুক। 'এ' যেখানে যে-ভাবেই থাকুক এখানকার এই সব কথার মূল 'এর' সাথেই থাকবে। এ-ই হল গুরুতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে যেতে বুদ্ধি সাহায্য করে, কিন্তু তার উপরের বিষয় বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। কারণ বুদ্ধি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে যেতে ইন্দ্রিয়মাধ্যম লাগলেও কারণাতীতে ইন্দ্রিয়ের কোনও স্থান নেই। একমাত্র গুরু শরণাগতকে গুরুই কারণাতীতে নিয়ে যান। তবে কাকে কী ভাবে গুরু অতীন্দ্রিয় স্তরে নিয়ে যাবেন তা গুরুর বিচার্য বিষয়।

গাঢ় ঘুম হল অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়ার মূলভূমি বা মায়ার ক্ষেত্র বা অজ্ঞানক্ষেত্র। বিদ্যামায়া শুদ্ধসত্ত্ব—আছে ঈশ্বরের বক্ষে। আবার ঈশ্বর আছেন নির্গুণব্রহ্মের বক্ষে। ঈশ্বর হল সগুণ conditional কিন্তু ব্রহ্ম-আত্মা নির্গুণ unconditional। ঈশ্বরের বক্ষে আত্মা নিষ্ক্রিয় কিন্তু মলিনসত্ত্বযোগে জীব ঈশ্বরের বক্ষেই সক্রিয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ, অন্তঃকরণ, মূল অজ্ঞান ও জ্ঞানসত্তা এই নিয়েই জীবের কারবার। জীব তাই ইন্দ্রিয়, মনের বন্ধনে আবদ্ধ আছে। ইন্দ্রিয় মন শোধন হলেই হবে জীবের জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয় মন শোধনের বিজ্ঞান সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পেতেই হবে। সদ্‌গুরু এই বিজ্ঞান ভোগীদের দেন না। এখানে কোনও মতবাদের কথা নয় একটা light দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

শুদ্ধবুদ্ধি তৈরি করেন গুরু। ব্রহ্ম/আত্মা জ্ঞান গুরুগত। বুদ্ধি বিবেকযুক্ত হলে হয় ব্রহ্মজ্ঞান। বিবেকশূন্য বুদ্ধি শুদ্ধবুদ্ধি নয়।

যে আমিতে বুদ্ধি চিদাভাস মিশে যায় বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে, তাই জ্ঞানের জ্ঞান। এই জ্ঞান কোনও বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কর্মফলের জ্ঞান নয়—তা-ই স্বানুভূতি। জ্ঞানস্বরূপই হল ব্রহ্ম-আত্মা। জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞান হল স্বানুভূতি যা কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। জগৎরূপ design, pattern যেখানে insignificant—উপাদানই সব। চিনির পুতুলের পুতুলটির design insignificant—চিনিই সব। সোনার গয়নার design insignificant—সোনা উপাদানই সব। এই জ্ঞান হল গুরুগত। তাঁর নামে ব্যবহার হলে প্রত্যবায় হয় না। যোগ্যতাই হল কৃতজ্ঞতা। যে অযোগ্য সে অকৃতজ্ঞ। নিজেকে যোগ্য, efficient, competent না-করতে পারলে কৃতজ্ঞতাবোধ আসবে না। তাই গুরুর ব্যবহার হবে 'আমার-গুরু' করে নয়। নিজেকে গুরুর পায়ে সঁপে দিয়ে সব সময় গুরুর আমি, ঈশ্বরের আমি, ঠাকুরের আমি বলে নিজেকে ব্যবহার করবে। তুমি হবে গুরুর যন্ত্র। তিনি তোমায় বাজাবেন, তুমি নিজে নিজেকে বাজাবে না। তাই এখানে বলা হয়—'Don't try to understand, but try to stand under.' আগে service দেবে গুরুকে। শিক্ষা না-পেলে right use হবে কী করে? যন্ত্র হিসাবে গুরুর কাছে থাকবে, গুরু তাঁর ইচ্ছা মতো তোমাকে ব্যবহার করবেন, তুমি গুরুকে ব্যবহার করবে না। গুরুবাদ তাই ঈশ্বরবাদেরও উপরে।

সংসারের বোঝা গুরুকে দিয়ে দিলে নিজের আর করার কী থাকে? তোমরা নিজেরা সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে patchwork করে চলেছ। গুরু বিজ্ঞান দেন patchwork করার জন্য নয়, খণ্ডন করার জন্য। দেহ যখন ছাড়বে তখন কোথায় থাকবে তুমি? তুমি তো above all dreams and manifestations। Reality যদি কিছু থাকে তো তা তুমি স্বয়ং। এই 'আমি'-কে মন দিয়ে ব্যবহার করলে হবে না। গুরু বিবেক দিয়েই মন নাশ করেন। ভুল করলে ভুলের মাশুল তোমাকেই দিতে হবে। জেনো, বিবেকবানের ভুল হয় না। [১০।৫।৯৫]

সর্ববোধের মূলে হল হৃদয়বোধ, তার সন্ধান মেলে গুরুর কৃপাবলে

প্রজ্ঞান বা পূর্ণতাকে পেতে অজ্ঞান দিয়েই শুরু করতে হয়। যদিও এই পূর্ণতা বা প্রজ্ঞান সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত বা প্রকাশ করতে পেরেছে খুব কম লোক। যদিও সম্ভাবনা সবার মধ্যেই আছে। এই ভাবে পূর্ণতাকে অথবা নিজেকে জানতে বেদান্ত সবাইকেই প্রবোধিত করে বা উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু পায় কয়জন। যেহেতু বেদান্ত কোনও intellectual exercise নয় তাই বুদ্ধি দিয়ে বেদান্তের সারকে বা ব্রহ্ম-আত্মাকে পেতে পারে না। একমাত্র intellect-কে refine করে, under the guidance of a perfect master এই পূর্ণ আমি বা ব্রহ্ম-আত্মাকে জানা যায়।

বুদ্ধির শোধন সদ্‌গুরুর পদতলে বসে না-করলে গোঁড়ামি বাড়ে। অহংকার, অভিমান ছাড়ে না বরং বাড়ে। এই ভাবেই তৈরি হয় সম্প্রদায়। যদি কেউ সাধনার দ্বারা এই সম্প্রদায়ের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে সে-ই পারে অন্যদের বোঝাতে সম্প্রদায়কে কী ভাবে অতিক্রম করতে হয়। সম্প্রদায় মানেই attachment। বুদ্ধির শোধন করতে সব রকম attachment, মোহ্-আসক্তি, কামনা-বাসনাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সংসারে সবটাই তো গোঁজামিল, কিছু জানা কিছু না-জানার দ্বন্দ্ব-বিরোধ। এ সব কিছুকে গুরুদত্ত light দিয়ে পুড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অনেকে ভাবে গুরু শরণাগত হয়েছি—গুরু সব করে দেবেন। গুরু করে দেন না। গুরুদত্ত light নিয়ে যা-করার তোমাকেই করতে হবে। আমারবোধে আমির সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমিকে বেঁধেছে মন। মনই তোমাকে তোমার দেহের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে দেহের সুখ ও আরামের জন্য। কিন্তু তোমার স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ—কোনও দেহই তুমি নও। আত্মা দেহকে স্পর্শ করে নেই, দেহই আত্মাকে স্পর্শ করে আছে। যেমন আকাশের বক্ষে ভেসে বেড়ানো মেঘ আকাশকে স্পর্শ করতে পারে না, আকাশের তাতে কিছু এসেও যায় না, আকাশ যা ছিল তাই থাকে তেমনি আত্মারূপ তুমিও নির্বিকার নিরাকার নিরবলম্ব—তোমার বক্ষে তোমারই জ্যোতিতে দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধির খেলা চলছে। এ হল অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাসের খেলা। তাতে আত্মারূপী তোমার কিন্তু কিছু এসে যায় না। অবশ্য সদ্‌গুরু চাবিকাঠি না-ঘোরালে এই আত্মস্বরূপকে জানাও যাবে না। [১৭।৫।৯৫]

অবিদ্যামায়াজাত জীবনের মুক্তি গুরুগত

বিবেক ঈশ্বর আত্মা আছে প্রত্যেকেরই অন্তরে। বাইরে আছে শুধু ছায়াবাজি। জ্ঞানীর কিন্তু এই ছায়াবাজির সংসার নেই। তিনি আছেন ঈশ্বরাত্মাকে নিয়ে। অপরপক্ষে অজ্ঞানীর কাছে সংসারই একমাত্র সত্য। অজ্ঞানী অন্তরের খবরও রাখে না, তার সন্ধানও করে না।

সংসার না-ভুললে চেতনা জাগে না। তোমরা এখনও ঘুমঘোরে তামসিকতার মধ্যে অবিদ্যামায়ার মধ্যেই আছ। তাই সামান্য একটু সুকর্ম করলে বাহাদুরি নেবার জন্য কত যত্নবান হও আর নিজের অপকর্ম বা কুকর্মকে স্বীকারই কর না। প্রত্যেকের নিজের পরীক্ষা নিজেরই কাছে। আমি কি করছি, কি করেছি এবং কি করব—এই তিনটি জিনিসকে একেবারে চাবি মারতে হবে। তোমার নিজের করার কিছু নেই, একমাত্র সদ্‌গুরুর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া। অবশ্য একবার দিলে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সদ্‌গুরু তোমার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত। তিনি যেমন চালান তেমনি করেই চলতে হবে। নিয়ম ও কষ্টের যাঁতাকলে কোনও বিশেষ চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে নয়—জীবনের সবটুকু gap তা fill up করে তিনিই তুলে আনবেন তাঁর মতো করে।

বোধ দিয়েই হয় মনের চিন্তা, মনের কর্ম, ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা ও বুদ্ধির কার্যকারিতা। বোধের জ্যোতিতেই মন ও বুদ্ধি হয় জ্যোতিষ্মান। তবে মনের বোধ হল reflected light। মন হল তমোগুণাত্মক। বুদ্ধি সত্ত্বগুণী

হলেও সংসারীরা বিষয় বিষে তাকে করে ফেলেছে তামসিক। অহংকার হল রাজসিক। তপস্যার মাধ্যমে এই মনবুদ্ধিকে রাজসিক করে তারপর সাত্ত্বিক করতে হয়। বিনা তপস্যায় স্বভাবের দিব্য রূপান্তর হয় না। নিষ্ঠা ও গুরুর আনুগত্য ভিন্ন তপস্যা ফলপ্রদ হয় না। গুরু তুষ্ট হলে গুরুকৃপায় শিষ্যের যোগ্যতার মান বাড়ে। যোগ্যতার উৎকর্ষের ফলে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। তার ফলে অনুগত শিষ্যের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ফল লাভ হয় গুরুকৃপায়। গুরুকৃপা ভিন্ন মনকে শুদ্ধসাত্ত্বিক করা যায় না। মন শুদ্ধসাত্ত্বিক হলে তমোরজোগুণের প্রভাব কাটে। তারও উপরে উঠলে মন হয় গুণাতীত। একমাত্র গুণাতীত বোধে ব্রহ্ম-আত্মাকে জানা যায়।

গুণাতীতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'এর' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) সঙ্গে ব্রহ্ম-আত্মার একটা free channel তৈরি হয়েছে। সেখান দিয়ে ব্রহ্ম-আত্মার বাণী স্বতঃস্ফূর্ত এই দেহে প্রকাশিত হয়। সেখানে অহংকারের কোনও স্থান নেই। [৭।৬।৯৫]

আত্মগুরুর কৃপায় আত্মবোধ তথা আপনবোধের তাৎপর্য অনুভূত হয়

মানুষের মিশ্র জ্ঞানেই হয় যত দুঃখ অশান্তি। শুদ্ধ জ্ঞানে কোনও অশান্তি নেই। কারণ সেখানে দুই নেই, দ্বন্দ্ব বিরোধ আসবে কোথা থেকে। অজ্ঞানই মানুষকে করে অভিমানী। অজ্ঞান মানুষকে নামিয়ে আনে। নামিয়ে আনাই অজ্ঞানের খেলা। অপরপক্ষে, জ্ঞান হল স্বতন্ত্র সম্বিৎস্বরূপ যার কোনও প্রতিবন্ধ নেই, প্রতিপক্ষ নেই, বিকার নেই। তারই নামান্তর হল কূটস্থ চৈতন্য যা আছে প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয়ের গভীরে। অন্য কোনও কিছু দিয়ে তাকে জানা যাবে না। শুদ্ধবোধের সঙ্গে যাঁর একাত্মতা সিদ্ধ হয়েছে সে-ই শুদ্ধ জ্ঞানী। একমাত্র তিনিই পারেন শুদ্ধবোধের কথা বলতে। আর মুমুক্ষু সাধক, যাঁর চিত্ত শুদ্ধবোধকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে সেই শুদ্ধ জ্ঞানীর সঙ্গ করে তাঁর কৃপাতেই শুদ্ধবোধের অধিকারী হতে পারে।

মানুষের দেহবুদ্ধি থেকেই আসে আমার-আমার ভাব। নিজেকে, দেহ থেকে আলাদা ভাবতেই পারে না। এটাই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই শুদ্ধস্বরূপে যে আবরণ সৃষ্টি করে তার উপরে অবিদ্যামায়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের যে খেলা খেলছে তা-ই হল বিক্ষেপ। অজ্ঞানের কার্য হল আবরণ ও আবরণের কার্য হল বিক্ষেপ। এই অজ্ঞান আবরণ ও বিক্ষেপই হল জীবের বন্ধনের কারণ। এই বন্ধনদশা ভোগ করে চিদাভাস বা জীব। তাই সে সব কিছুকে আমার আমার করে ভোগ করতে চায়। সে মানে না, মানতে পারে না যে সে যাকে আমার বলে তা তার নয়, প্রকৃতির। ফলেই হয় তার দুঃখ, কষ্ট, জরা, ব্যাধি, শোক ও মৃত্যুযন্ত্রণা।

এই বিক্ষেপ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে মানুষ যায় সদ্‌গুরুর কাছে। একবার সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলে তিনিই বলে দিতে পারেন এই বিক্ষেপ থেকে বেরিয়ে আসবার উপায়। এই direct knowledge-এর একটা impact হয় তার জীবনে, যা তাকে বিক্ষেপ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে।

জ্ঞান লাভের পূর্বের ভক্তি হয় আসক্তি পর্যায়ের। কিন্তু জ্ঞান লাভের পরের ভক্তি হল শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞান বা ভক্তি দুই ক্ষেত্রেই মনের বহির্মুখী প্রবণতাকে রুদ্ধ করে অন্তর্মুখী করতে হয়। মনকে অন্তর্মুখী করতে একমাত্র সহায়ক হল সদ্‌গুরুর বাণী। কামনা-বাসনা মুক্ত মনে সদ্‌গুরুর বাণী সহজে জায়গা করে নিতে পারে। যেমন মাটির দেওয়ালে পেরেক গাঁথা সহজ। পাথরের দেওয়ালে পেরেক গাঁথাই যায় না, বেঁকে যায়। তেমনি তোমাদের মন হল পাথরের দেওয়াল। সেখানে সত্যবাক্ ঢুকবার পথই পায় না, বেরিয়ে আসে। এক কে.জি. দুধের পাত্রে দুধ কে.জি. দু' ঢাললে যেমন তা উছলে পরে, তেমনি তোমাদের চিত্ত তো কামনা-বাসনায় পূর্ণ সেখানে গুরুবাণীর জন্য কোনও জায়গা নেই।

প্রযত্নশীল হয়ে নিষ্ঠা সহকারে পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা নিজের অন্তরের দোষত্রুটি শোধন করে অন্তরকে শুদ্ধ করলে তার কাছে অন্তরের জ্যোতি কৃপা করে উদ্ভাসিত হবে। এ-ই হল গুরুকৃপা, এ-ই হল আত্মকৃপা।

সংসার ছেড়ে আরও বড় সংসার পাতা গুরু তো অনেক আছে। তারা তো motivated গুরু। একমাত্র নিজবোধস্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কেউ-ই motiveless নয়। আত্মাই হল আসল গুরু। যে গুরুর motive আছে তিনি আত্মজ্ঞগুরু নন।

জ্ঞানস্বরূপকেই নাম দেওয়া হয়েছে গুরু, ব্রহ্ম, আত্মা ও মা। এই শাশ্বত, সনাতন ধর্মকে বিকৃত করে ব্যবহার করে ব্যবসা করছে সাজাগুরুর দল। তারা আশ্রম বানাচ্ছে, শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু তাতে কারও আত্মিক কল্যাণ হচ্ছে কী? জেনো, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হতে মন্দির, মসজিদ্, তীর্থ, আশ্রম কিছুরই দরকার হয় না। তোমার গৃহই তোমার শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তোমার দেহই হল শ্রেষ্ঠ মন্দির, তোমার মনই হল শ্রেষ্ঠ পূজারী আর আত্মদেবতা হলেন তার বিগ্রহ।

নিজেকেই নিজের মধ্যে ঢুকতে হবে। নিজে না-ঢুকলে কী করে কে ঢোকাবে? অজ্ঞান তোমাদের গ্রাস করছে। তোমার অজ্ঞান তুমি নিজে তাড়াবে। গুরু তোমাকে আলো দেবেন তুমি তা ব্যবহার করবে। তবে না তাড়াতে পারবে অজ্ঞানকে! তুমি কারও নয়, কেউ তোমার নয়। তুমি একা। একা এসেছ একা যাবে। তুমি কারও ছিলে না, কারও নও, কারও হবেও না। তোমার কেউ ছিল না, কেউ নেই, কেউ হবেও না। ব্রহ্মের কোনও প্রত্যবায় নেই। তুমি যদি ব্রহ্মস্বরূপ হও তো তোমার সাথী আবার কে হবে? 'স্ববোধে ন অন্যবোধেচ্ছা'— আপনবোধে আপন ভিন্ন আর কিছুই নেই। তুমিই 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং'।

[১৪।৬।৯৫]

জ্ঞানীগুরুর স্বরূপ অনবদ্য

জ্ঞানের কোনও বিকল্প নেই। জ্ঞান হল গুরুগত। অর্থাৎ নিজের খেয়াল খুশি মতো নয় বা কাউকে oblige করে নয়—একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত জ্ঞানের বাণীই শিষ্যের অজ্ঞানবন্ধন দূর করতে পারে। অবশ্য গুরুর কথার উপর নিজের কথা মিলিয়ে নিলে সেই বাণী তত্ত্বাশ্রয়ী থাকে না। যদিও তত্ত্বজ্ঞ যোগ্য গুরু এ যুগে পাওয়া সত্যিই কষ্টকর। যোগ্য শিষ্য বা সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু বা আত্মজিজ্ঞাসুও বিরল। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য হলেই হয় জ্ঞানসিদ্ধি।

মানুষের মন তো বিষাক্ত। তোমাদের মনের অসাবধানতাবশত যে ত্রুটি হয় তা থেকেই তৈরি হয় মনের দোষ, মনের মল। আমার মনকে দিয়েই করতে হবে মনের সব দোষ ত্রুটি শোধন। নিজের দোষ ত্রুটিকে শোধন করতে চাই গুরুকৃপা। আবার কৃপা পাওয়ার জন্যও নিজেকে সেই ভাবেই তৈরি করতে হবে। নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে হবে। দেবতাদের কৃপায় শান্তি হতে পারে, আর্থিক স্বচ্ছলতা হতে পারে কিন্তু অবিদ্যা অজ্ঞানের বিনাশ হবে না। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা অজ্ঞান বিনাশ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হতে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনকে শোধন করতে হবে।

এখানে ধর্মলাভের জন্য চরিত্রগঠন করতে বলা হয়েছে। বাইরে সাধুর বেশ থাকলেই কী সাধু হয়? অন্তরে সাধু না-হয়ে জটাধারণ করে বা মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া পরে ঘুরলেই কী সাধু হওয়া হল? তারা তো জানেই না জটা, মুণ্ডন বা গেরুয়ার অর্থ কী? একমাত্র অনুভবসিদ্ধ গুরু ছাড়া এ সব কে তাদের বোঝাবে? সাধারণ গুরু যাঁরা তাঁরা তো মন্ত্র দিয়েই তাঁদের কাজ শেষ করেন। কিন্তু প্রতি পদে পদে সচেতন করতে কদাচিৎ দু-একজন পুরুষই আসেন।

জ্ঞানের পরিচয় হয় সমাধির মাধ্যমে। সমাধিলব্ধ জ্ঞান একমাত্র সমাধিবান পুরুষই দিতে পারেন। একমাত্র এই জ্ঞান দিয়েই অজ্ঞান বিনাশ হতে পারে। জ্ঞানী চলেন স্বাধীনভাবে। কোনও রকম আসক্তি, মোহ জ্ঞানীকে টলাতে পারে না। জ্ঞানী আপন আনন্দে আপনি বিভোর থাকেন। তাঁর কোনও অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু সংসারীর একটা অবলম্বন চাই-ই। অবলম্বনশূন্য একাকীত্বে সংসারীর ভয়। অজ্ঞানী জ্ঞানীর কাছেই তার অজ্ঞান বিনাশের জন্য দ্বারস্থ হয়। ভাবের উপরে উঠতে গুরু বিনা গতি নেই। তাই বলা হয়েছে 'আচার্যবান লভতে জ্ঞানম্'। এই আচার্যবানের উপরে আছেন আপ্তপুরুষ যিনি দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহবুদ্ধি, স্বার্থ, অহংকার, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, কাম ও বিষয়াসক্তি মুক্ত। তাঁর বিবেক-বৈরাগ্য সদাজাগ্রত। [২১।৬।৯৫]

জীবের জীবত্ব নাশ হয় গুরুকৃপায়

মানুষের সত্যস্বরূপ হল Divine Self। মজা লুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এখন তারা ঘরে ফেরার চাবি হারিয়ে জীবনের পথে পথে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরে ফিরবে কী করে? ঘরের রাস্তাও হারিয়েছে আবার চাবিও হারিয়েছে। কারও পথের সন্ধান আছে চাবি নেই, কারও চাবি আছে পথের সন্ধান নেই। এই ঘরে ফেরার প্রচেষ্টাতেই মানুষ গুরুর কাছে যায়, দীক্ষা নেয়। গতানুগতিক দীক্ষা তো একজায়গায় থেমে আছে। কারণ তার পরের রাস্তা তো আর কারও জানা নেই। দীক্ষা is not a process। যেমন school-এ ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে বসে অনেকে নকল করে। যারা ঠিক মতো সাহস করে নকল করতে পারে না তারা একে ওকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের জানা না-থাকায় process-টা ঠিক হয় না কিন্তু উত্তরটা ঠিক লিখে রাখে। যিনি খাতা দেখেন তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তেমনি perfect গুরু ব্যবহার দেখেই শিষ্যকে চিনে নিতে পারেন। সাধারণ গুরু যাঁরা, তাঁরা দীক্ষা দিয়েই খালাস। শিক্ষা তাঁরা দেন না বা দিতে পারেন না। শিক্ষা ছাড়া দীক্ষা কার্যকরী হয় না।

এই জীবনচক্রে থেকে বেরিয়ে আসবার ব্যাকুলতা সবার হয় না। অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ভিন্ন এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসবার আর কোনও রাস্তা নেই। কোনও বিশেষ দলমতপথ ধরে এগোলে এক জায়গায় এসে থেমে যাবে আর এগোতে পারবে না। এই ব্যাপারে তাই হতে হবে uncompromising। সাধারণ গুরু বা মতপথের শিক্ষা থেকে যা পাওয়া যাবে তার ফল অতি সামান্য, তা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তাই মূলকে ধরতে হবে। অনেকেই ভক্তির কথা বলেন। ভক্তি কি অত সহজ? ভোগের গতি রোধ হলে হবে ভক্তি। ভোগের গতি রোধ হয় জ্ঞান দিয়ে। তাই জ্ঞান দিয়ে আগে জমি তৈরি করতে হবে। যেমন রুক্ষ্ম জমি থেকে ফসল তুলতে গেলে আগে জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে তা থেকে কাঁকর পাথর ইত্যাদি বেছে তারপর মাটিকে ধূলার মতো করে সার দিয়ে জমিটি তৈরি করতে হয় অর্থাৎ তা বীজ বোনার উপযুক্ত হয়; তেমনি জ্ঞান দিয়ে তোমার জীবন জমি তৈরি করে তাতে ভক্তির বীজ বপন করার উপযুক্ত কর। লৌকিক ধর্মে পূজা পাঠ জপতপ ইত্যাদি দিয়ে কিছুটা এগোনো যায়—কিন্তু তা দিয়ে মূলের সন্ধান পাবে না। মূলের সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র সদ্‌গুরু।

শ্রদ্ধা নিহিত আছে স্বভাবের মধ্যে। সমাজে একদল লোক আছে যারা অপরের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়—তারা পাষণ্ড। আবার একদল আছে যারা শ্রদ্ধা বাড়াতে সাহায্য করে। শ্রদ্ধাকে বাড়াতে শ্রদ্ধাবান হতে হবে। তার জন্য নিন্দুকের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। নিন্দুক শ্রদ্ধা নষ্ট করে। যে অপরের শ্রদ্ধা নষ্ট করে তার এবং যার নষ্ট হয়, উভয়েরই ক্ষতি। একমাত্র গুরুই বলে দিতে পারেন কী ভাবে কর্ম করলে, চিন্তা করলে, ফল নিজের কাছে বা অপরের কাছে যায়। সে-ভাবে চিন্তা বা কর্ম করা উচিৎ নয়। যে-ভাবে চিন্তা বা কর্ম করলে ফল কারও কাছে যায় না, তা করা কর্তব্য। তাকেই বলা হয় সুধর্ম। [২৮।৬।৯৫]

শিক্ষাদীক্ষার তাৎপর্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

তথাকথিত দীক্ষাগুরুদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—দীক্ষা অনেকেই দিতে পারে, শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা ছাড়া দীক্ষা ফলপ্রদ নয়, আবার দীক্ষা ছাড়া শিক্ষাও অপূর্ণ। সন্তানের জন্ম দিয়ে পিতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

সন্তানকে ঠিক মতো প্রতিপালনও করতে হয়। একবার সেই সব গুরুদের বলা হল—তোমরা কোন স্তরের? তা তারা জানেন না। বলা হল—তা যদি না-জান তো কী অধিকার তোমাদের দীক্ষা দেবার। Light নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ। আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়ে তোমরা মানুষদের ভোলাতে পার কিন্তু তাদের ভুল ভাঙ্গাবে কী করে? আর ভক্তির কথা বললে বলা হবে জ্ঞান বা শিক্ষা ছাড়া ভক্তি তো আসক্তি। অনুভূতি তৈরি হয় শুদ্ধ অভ্যাস দ্বারা। অনুভূতি না-জাগলে ভক্তি কিসের? যে ভগবানকে জান না, চেন না, তাঁকে ভালবাসবে কি করে? All these are nuisance. তারা তাদের দোষ স্বীকার করে বলল—ভুল হয়েছে। বলা হল, এই ভুল শোধন করবে কি করে? যাদের দীক্ষা দিয়েছ তাদের উদ্ধার করবে কী করে? শিষ্যদের 'এক'-এ প্রতিষ্ঠা করবে কী করে? নিজেরাই তো বহুর মধ্যে বাস করছ। এবার বলল—primary lesson দেওয়া হয়েছে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই বলা হল, ধর্মে কোনও division নেই, ধর্ম হল অখণ্ড সত্য। কেউ যদি মনে করে সগুণ ঈশ্বরের সঙ্গে relation পাতিয়ে তাঁকে ভক্তি করাই হল ধর্ম তাহলে বলা হবে এটা লৌকিক ধর্ম। ঈশ্বর কিন্তু লৌকিক নন, তিনি অলৌকিক। তা না-হলে তাঁর তাৎপর্য কোথায়? তাহলে তোমাদের আরাধ্য কী? উপাস্য কে? যত মতপথের লোক তারা তাদের মতো উত্তর দেবে। শাক্ত বলবে কালী, শৈব বলবে শিব, বৈষ্ণব বলবে কৃষ্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন হবে—সত্য কী তবে এতগুলি? উত্তর হবে—না সত্য এক। বলা হল—আগে যোগ্যতা বাড়াও, তারপর অন্য কথা।

God is original One—তাঁর কোনও আদি নেই। 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) যখন জিজ্ঞাসা করেছে—তুমি কেন দীক্ষা দাও না— উত্তরে বলা হয়েছে—'এ' নিজের চেয়ে ছোট বা বড় বা সমান কাউকেই পায়নি, তাই। 'এর' কাছে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নেই বলে। যে মূল উপাদানে সব গড়া 'এ' আছে সেই উপাদানকে নিয়ে। Design pattern is very much insignificant to me. উপাদানটাই সত্য, তা-ই ব্রহ্ম। ঈশ্বরও যদি ব্রহ্ম থেকে আলাদা হন তো সেই ঈশ্বরকেও 'এ' চায় না। মানতেও পারবে না।

সেই গুরুদের আরও জিজ্ঞাসা করা হল—তোমরা দীক্ষা দেবার permission কোথা থেকে পেয়েছ? কে তোমাদের purmission দিয়েছে? তোমরা কী Lord দ্বারা appointed? 'যে ব্যক্তি সরকারী চাকরীতে appointment পায় সরকার তার সব রকম দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু যে নিজেই নিজেকে সরকারী চাকুরে বলে বেড়ায় সরকার তার দায়িত্ব নেবে কেন? কাজেই তোমরা যদি Lord দ্বারা appointed না-হও তো why should He back you?

তখন তারা 'এর' সাহায্য চাইল। বলা হল, আমি সাহায্য করব কেন? ফুটো পাত্রে জল ঢালব কেন? না-বুঝে বোঝা বইছ। বোঝার চাপে নিজেই একদিন শেষ হবে। একবার গুরু সাজলে গুরুর দায় অনেক। যত শিষ্য করেছ তাদের সবার উদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত তোমার রক্ষা নেই। কিন্তু Knowledge of Oneness-এ এ সবের বালাই নেই। কে কাকে কেন দীক্ষা দেবে? সবই তো এক Self-এর খেলা। সবই sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness। Self plays with the Self alone। গুরু সেজে অন্যদের দীক্ষা দেওয়ার পিছনে একটাই মানসিকতা—তা হল নিজেকে অন্যদের থেকে superior মনে করা। কিন্তু Knowledge of Oneness-এ এক ছাড়া দুই নেই। Oneness হল Knowledge of all Knowledge, Light of all Light —ব্যক্তিত্ব সেখানে মুখোশ। ধান সেদ্ধ করলে তার চেহারা পালটায় না কিন্তু তার বীজক্ষমতা লোপ পায়, ডিম সেদ্ধ করলে তাতে আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বীজ থাকে না। তেমনি যিনি জ্ঞানসিদ্ধ কী যোগসিদ্ধ তাঁর আর maniness, duality থাকে না। দীক্ষা দেবে কী করে?

গুরু হবেন তিনিই যিনি শিষ্যকে greater মনে করেন অর্থাৎ একজন perfect realizer বিশ্বাস করে যাঁকে সব দিচ্ছেন। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মতে এটাই দীক্ষা। কোনও হিং টিং ফট্ মন্ত্র দেওয়ার কোনও তাৎপর্য 'এর' কাছে নেই। [৫।৭।৯৫]

ধর্ম ও কর্মের মর্মার্থ

ধর্মের জগৎ হল মানুষের অন্তরের জগৎ। সেখানে লৌকিক জগতের সব কিছু পাওয়া যায় না। লৌকিক জগৎ হল কর্মের জগৎ। কর্মের জগৎ থেকে ধর্মের জগতে যাওয়া যায় না। ধর্মের জগতে যেতে মন, বুদ্ধির শোধন প্রয়োজন হয়। কর্মজগৎ কী ধর্মজগৎ কেউ স্বনির্ভর নয়। তাদের সাহায্যকারীর দরকার হয়। বর্তমানের মানুষ এই সাহায্যকারীকেই গুরু বলে মনে করে, অনুভব করে না। মনে করা আর অনুভব করা এক নয়। মনের ঘরে হয় বোধের প্রতিফলন তাই মন হল আভাসজ্যোতি। আভাস কখনও সত্যি হয় না। কিন্তু অনুভব হয় বোধ দিয়ে। বোধ দিয়ে হয় বোধের অনুভব, তাই স্বানুভব। বোধের ঘরে আছে স্বয়ং জ্যোতি—বোধে হয় তাই স্বানুভূতি। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া স্বানুভূতি সম্ভব নয়। অনুভূতি হয় মিশ্রবোধে আর স্বানুভূতি হয় শুদ্ধবোধে।

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য

গুরুপূর্ণিমা—গুরুকে পূর্ণ করে মানাই হল তার উদ্দেশ্য। একতা, পূর্ণতা, সমতা হল আত্মবোধ—তাকেই এখানে গুরু বলা হয়েছে।

অজ্ঞানেও লোক গুরুবরণ করে। আদিমকালে বর্বরযুগেও এই প্রথা ছিল। নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা, নিপুণতা ও দক্ষতা যাঁর একটু বেশি তাঁকেই তারা ওস্তাদ বলে মেনে নিত। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে এ রকম ব্যক্তির নাম পালটিয়েছে। তাঁদের কেউ বলে মোড়ল, কেউ বলে মন্ত্রী, কেউ বলে মুখিয়া। সাধারণত মানুষ এঁদের পরামর্শ নিয়েই চলতে অভ্যস্ত থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে এরাই গুরু।

বেদান্তের দৃষ্টিতে গুরুর মহিমা

বেদান্তের গুরুবাদ এ সব থেকে স্বতন্ত্র। এখানে বেদান্তের গুরুবাদের কথাই বলা হয় বিশেষ করে। তন্ত্রের গুরুবাদ, কর্মের বা যোগের গুরুবাদের সঙ্গে বেদান্তের গুরুবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। বর্তমানের ধর্মজগৎ সবকে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যেখানে ধর্মের অর্থই হারিয়ে গেছে। বেদান্তে গুরু বলতে কোনও special-মূর্তির স্থান নেই। যতক্ষণ মূর্তি ততক্ষণই দ্বৈতভাব। এই মূর্তি মানে হয় নারী না হয় পুরুষ। এই নারীর বা পুরুষের conception বেদান্তে অচল। বেদান্তে 'চৈতন্য' বা Consciousness-ই হলেন গুরু। সমস্ত জীবজগৎই হল চৈতন্যের পুতুল। চৈতন্যে গড়া, চৈতন্যে ভরা। চৈতন্য হল অনুভূতিগ্রাহ্য। এই অনুভূতির জগতে মনের স্থান কতটুকু? অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানী, ভক্ত তাই মনকে অবলম্বন করে চলেন না। মনই হল মানুষের বন্ধনের কারণ, আবার মোক্ষের কারণও বটে। বহির্মুখী মন করে বন্ধন, অন্তর্মুখী মন আনে মুক্তি। বহির্মুখী মনকে যারা প্রাধান্য দেয় তারা অজ্ঞানী।

গুরুর আলোতে Oneness-এ প্রতিষ্ঠিত হলেই ধন্য ও কৃতকৃত্য হবে

মানুষের কর্ম হয় physical body-তে, অন্তঃপ্রকৃতিতে হয় ধর্ম আর সত্যের অনুভূতি হল মর্মবাণী। এই মর্মবাণীকে পাওয়া যাবে একমাত্র Science of Oneness-এর মাধ্যমে। অন্য কোনও ভাবে নয়। গুরু এই Oneness-এর light ধরিয়ে দেন সত্য কিন্তু অনধিকারীকে সব কিছু তিনি supply করেন না। তাই বলা হয় Science of Oneness is for all, but all are not for Science of Oneness। গুরুর আলোতে Oneness-এ প্রতিষ্ঠিত হলে ধন্য ও কৃতকৃত্য হবে।

এক-এর চর্চা করলে হয় গুরুভজন। এক-কে স্মরণ করলে গুরুপূর্ণিমা পালন করা হবে। যদি Perfection, liberation, মুক্তি, শান্তি ও স্বানুভূতি চাও, তবে তোমায় এক-এর ভজন গাইতেই হবে। এই এক হল স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ। সেই গুরুর কথাই তোমাদের বলা হয়। [১২।৭।৯৫]

সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য

সদ্‌গুরু ও সাধারণ লৌকিক গুরু কিন্তু এক স্তরের নয়। দু'জনকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সদ্‌গুরু তিনিই যিনি সমস্ত রকম কামনা-বাসনা, অভিমান অহংকার মুক্ত ও ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত নন, যার মধ্যে ভোগ বর্তমান তিনি কখনওই সদ্‌গুরু নন। লৌকিক গুরুদের যোগ্যতার অভাবেই নানা সম্প্রদায় তৈরি হয়। যোগ্যতা বাড়ে কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে। কৃতজ্ঞতা না-থাকলে যোগ্যতা থাকতেই পারে না। যোগ্যতা ও কৃতজ্ঞতা পাশাপাশি চলে। একে অন্যের পরিপূরক ও সম্পূরক।

মন তার অভাবপূরণের জন্য একটি second entity-র কাছে সাহায্য চাইছে—তাকেই সবাই ভাবে ভক্তি। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে আপনবোধের ব্যবহারই হল ভক্তি। স্বাত্মানুসন্ধানই ভক্তি। এই ভক্তি পেতে অহংকার, অভিমান ও আমার ভাব ছাড়তে হবে। সংসার ছেড়ে হতে হবে সমসারী। সমসারীর আকার নেই, বিকার নেই, কার্য-কারণ নেই। তিনি সর্বকারণাতীত।

বুদ্ধি কারণের স্তরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গাঢ় নিদ্রা হল কারণের স্তর। গাঢ় নিদ্রায় মন-বুদ্ধি ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে থাকে কিন্তু তাঁকে জানতে পারে না। যে জায়গায় গিয়ে বুদ্ধিও আর যেতে পারে না, যখন বলতে বাধ্য হয় 'আমি জানি না' সেই not knowing state-কে জানা যায় সমাধির মাধ্যমে। সমাধির মাধ্যমে গাঢ় ঘুমের state-কে পেরিয়ে একেবারে জ্ঞানের রাজ্যে মন যখন যায় তখন মন আর মন থাকে না, অ-মন হয়ে যায়। তখন আর কাম, কর্ম ও কর্তৃত্ব থাকে না। যতক্ষণ মনের plane-এ আছে, ততক্ষণই থাকে কর্তা, কর্ম ও কামনা। একমাত্র যখন বুদ্ধি শরণাগত হয়ে, আনুগত্য নিয়ে, সদ্‌গুরুর কাছে সম্পূর্ণ বিনাশর্তে নিজেকে surrender করে তখনই গুরুকৃপায় তার পরমবোধি প্রাপ্তি হয়। কোনও রকম মতলবী বুদ্ধি থাকলে surrender unconditional হয় না। যদি একবার কেউ সদ্‌গুরুর শরণাগত হয় তবে তিনি তাঁর আশ্রিতের ঘুম, আহার, অভিমান, অহংকার ধীরে ধীরে কেড়ে নেবেন, তার তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে সরিয়ে আবার সত্ত্বগুণ দিয়ে রজোগুণকে সরিয়ে দেবেন। তারপর শুদ্ধসত্ত্বগুণের সাহায্যে সত্ত্বগুণকেও সরিয়ে তাকে শুদ্ধসত্ত্ববোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করবেন। [১৯।৭।৯৫]

ক্রমবিকাশের মাধ্যমে অন্তর্বোধের উদয় হয়

মানুষের জীবনে মানুষ স্থূল দৃষ্টিতে প্রথম জীবন শুরু করে। তার মুক্তস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ তার অন্তরে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সে জানতে পারে না। তার কারণ তার ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনের গতি, প্রাণের গতি থাকে বহির্জগতের প্রতি, বিষয়ের প্রতি। বহু জন্মের দুঃখভোগের পর তার বিচার জাগে এবং একটু একটু করে সে বুঝতে পারে তার বিষয়প্রীতিই তার সকল দুঃখের কারণ। তখন তার বিষয়ের প্রতি হেয়ভাব জাগে। অভিজ্ঞতার মান বাড়তে বাড়তে বুদ্ধির বিচার শক্তিও বাড়তে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝতে পারে তার সকল দুঃখের কাবণ হল ভোগ। ভোগ হয় আসক্তি থেকে, আসক্তি আসে মোহ অজ্ঞান থেকে। বুঝতে পারে অজ্ঞানকে নাশ করতে পারলেই দুঃখের কারণ নাশ হবে আর দুঃখকষ্ট থাকবে না। মানুষের স্থূল দেহ থেকে অব্যক্তপ্রকৃতি পর্যন্ত সবটাই অজ্ঞান। আর বুদ্ধি হল অজ্ঞানের হাতিয়ার। বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপের খুব কাছে বলে বুদ্ধিতেই পরমবোধির জ্যোতি প্রথমে পড়ে। বুদ্ধি সেই জ্যোতি পাঠায় মনকে, মন পাঠায় ইন্দ্রিয়তে, ইন্দ্রিয় থেকে পড়ে বস্তুতে। তখনই হয় বস্তুর জ্ঞান।

মানুষের অন্তঃকরণ হল মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তকে নিয়ে। জীবমাত্রেই অন্তঃকরণের অধীন। তবে এই অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্য প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যায়। কারও দেহেন্দ্রিয় বৃত্তির প্রাধান্য, কারও মনোবৃত্তির প্রাধান্য, কারও বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য। যাদের মনোবৃত্তির প্রাধান্য বেশি থাকে তারা হয় ভক্তিধর্মী। যাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বেশি তারা হয় বিচারধর্মী।

আবার প্রকৃতির তিনগুণের খেলাও মানুষের মধ্যে তারতম্য আনে। সাধারণ মানুষের তমোগুণের প্রকাশই বেশি। সত্ত্বগুণের প্রকাশ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত। রজোগুণের প্রকাশ হয় মনে। জ্ঞান হয় বুদ্ধিশুদ্ধি দ্বারা আর ভক্তি হয় মনশুদ্ধিতে। ভক্তিতে মন হয় ইষ্টের পায়ে শরণাগত। জ্ঞানযোগে বুদ্ধি বিচার, বিবেক-বৈরাগ্যের মাধ্যমে শোধন করে হয় বিবেকসিদ্ধ। তমোগুণের ধর্ম হল আবরণশক্তি যা জ্ঞানস্বরূপকে আবৃত করে রাখে। তার ফলে মানুষ হয় নিষ্ক্রিয়, অলস ও জড়প্রকৃতির। রজোগুণের ধর্ম হল বিক্ষেপশক্তি। এই বিক্ষেপের ফলে মানুষ হয় অস্থির ও চঞ্চল। তার অভিমান, দম্ভ, দর্প থাকে চরমে। আর সত্ত্বগুণের ধর্ম হল প্রকাশশক্তি। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ বাড়লে সে হয় শান্ত, ধীর, স্থির। তার অন্তরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়ে। তখন সে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুসন্ধান করতে চায়। কার্য-কারণের ঊর্ধ্বে মহাকারণের সন্ধান করে। যাদের মধ্যে এই সন্ধানের ইচ্ছা জাগে তারাই আধ্যাত্মিক পথে আসে। কারণের কারণকে জানাই হল অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য। বস্তুজগতের কারণকে জানে material science, কারণের কারণকে জানতে চায় spiritual science। আর কারণাতীত কারণের সন্ধান হল আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব। যারা আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েছেন তাদের বুদ্ধি পরমবোধির সঙ্গে মিশেছে। তাদের মধ্যেই বিশুদ্ধ চৈতন্য পরিপূর্ণস্বরূপে প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য গুণাতীত। তিনিই পরমতত্ত্বস্বরূপ।

সাধারণ মানুষ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের তফাৎ বোঝে না। তারা দু'টোকে এক বলে গুলিয়ে ফেলে। নির্গুণব্রহ্মই শুদ্ধসত্ত্ব মায়াযোগে হন ঈশ্বর—তিনি সগুণব্রহ্ম। সগুণসাধক হল ভক্তিমার্গের সাধক। আর নির্গুণসাধক হলেন জ্ঞানমার্গের সাধক।

আবার ঈশ্বর ও দেবতাও এক পর্যায়ের নন। ঈশ্বর হলেন জগত্বের অধিপতি আর দেবতারা হলেন তাঁর subordinate agent। এতবড় সৃষ্টি পরিচালনা করতে তাঁকে বিভিন্ন department-এ ভাগ করে দেবতাদের প্রত্যেককে এক একটি department-এর head করা হয়েছে। এদের দিয়েই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।

পুঁথিপুস্তক পাঠ করে এ সব জানা যায় না। তার জন্য চাই যথার্থ অনুভবসিদ্ধের স্বানুভূতিলব্ধ জ্ঞান। প্রথমে সদ্‌গুরুর মুখে শ্রবণ করে তা আপন অন্তরে অনুসন্ধান করে পরে তা বহির্জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। ভোগের রাজ্যে বাস করে ও এটা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্নও সম্ভব নয়।

তত্ত্বকে সগুণে আনলে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—শক্তি, সত্তা, ব্যাপক ও গুরু। শক্তি থেকে শাক্ত, সত্তা থেকে শৈব, ব্যাপক থেকে বৈষ্ণব ও গুরু থেকে মহৎ। শাক্তের মাতৃকাভাব হল মা, শৈবের সত্তাভাব হল মহেশ, বৈষ্ণবের ব্যাপকভাব হল মাধব ও গুরুর ভাব হল মহৎ। [৯।৮।৯৫]

সত্যের প্রতিষ্ঠা ত্যাগে

সত্যের পরিচয় বাইরে নেই আছে অন্তরে। নিজের মধ্যে নিজেই হল তাঁর পরিচয়। তাঁকে জানতে তাই প্রয়োজন হয় সর্বত্যাগের। সর্বত্যাগ ভিন্ন ধর্ম হল বিলাসিতা। সত্য হল স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁকে পাবার জন্য কোনও কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। একমাত্র অজ্ঞানের আবরণ সরে গেলেই জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এই অজ্ঞানের আবরণকে সরানোই হল সাধনা। মানুষ নিজেকে নিজে বুঝতে পারে না। বোঝার জন্য চাই একজন আত্মজ্ঞগুরু। সাধারণ লৌকিক গুরু যার আত্মজ্ঞান হয়নি, তার দ্বারা হবে না। লৌকিক গুরুর স্তরজ্ঞান নেই। আর আত্মজ্ঞগুরুর ব্যক্তি, বস্তু, কর্ম, কর্মফল ও অনুমিত বস্তুর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

জীবত্বের প্রকাশবিকাশ অনুভূতিতে আরম্ভ ও স্বানুভূতিতে শেষ

গুণ হল ভাব যা বোধসত্তার বক্ষে কল্পিত। ভাবের কোনও সত্তা নেই, ভাব মনের মাধ্যমে কল্পিত। মন হল ভোগী, এই মনকে অতিক্রম না-করলে জীবত্বনাশের কোনও উপায় নেই। বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা প্রকৃতিজাত গুণের মাধ্যমে বস্তুতে প্রতিফলিত হয় তখন তাকে নানা ভাবে অনুমিত করা হয়, তাকেই বলে জীবত্ব। অনুভূতি ও অনুমানের মধ্যে অনেক তফাৎ। আবার অনুভূতি ও স্বানুভূতিতেও বিস্তর তফাৎ যা সাধারণ মানুষ জানে না। মানুষ কর্মময় ভোগের সংসারে ডুবে আছে। তাতে তার দেহ কল্পিত, সংসার কল্পিত, ঈশ্বরও কল্পিত। ব্রহ্ম-আত্মাতে কোনও কল্পনা নেই। চৈতন্যের অধিষ্ঠান মানুষের কেন্দ্রসত্তায়। মানুষের বাইরে আছে পঞ্চভূতে গড়া স্থূল দেহ, ভিতরে সূক্ষ্ম দেহ বা অন্তঃকরণ, তারও ভেতরে আছে কারণ দেহ, মূল অজ্ঞান বা অব্যক্ত অবস্থা, তারও পেছনে আছেন ঈশ্বর ও তুরীয়াতীতে আছেন ব্রহ্ম-আত্মা। অর্থাৎ বাইরে স্থূল দেহ, অন্তরে সূক্ষ্ম দেহ, কেন্দ্রে কারণ দেহ ও কূটস্থচৈতন্য, তুরীয়তে ঈশ্বর ও তুরীয়াতীতে ব্রহ্ম-আত্মা। তাই হল হৃদয়গুহা। হৃদয় হল দেহের আকাশ বা চিদাকাশ, তার মধ্যে আছে চিত্তাকাশ, তার মধ্যে ভূতাকাশ। হৃদয় হল সেই, যে হৃত বস্তুকে ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ আত্মার অনুভূতির বা আত্মস্মৃতিকে যে ফিরিয়ে দেয়।

জীব, জগৎ, আত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ

আত্মা বোধস্বরূপ, নির্গুণ, নিরাকার। তাঁর বক্ষে তাঁরই স্বভাবশক্তির মধ্যে থেকে প্রকৃতিশক্তি তম, রজ যুক্ত মলিনসত্ত্বে জীব, শুদ্ধসত্ত্বগুণে ঈশ্বর, শুদ্ধসত্ত্বের অতীতে তিনিই ব্রহ্ম-আত্মা।

আপনবোধে আত্মা নিত্যসিদ্ধ

আত্মজ্ঞান-লাভের পথে নিজবোধ ছাড়া আর কোনও কিছুরই কোনও তাৎপর্য নেই। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ভাব হল অজ্ঞানের। কাজেই যে true seeker সে একমাত্র জ্ঞানীগুরুকেই অনুসরণ করে। জ্ঞানী তুষ্ট হলে তুমিও জ্ঞানী হতে পারবে। তোমাদের wishful thinking কিন্তু জ্ঞান নয়। কাজেই ঋষিবাক্য হল—'জ্ঞানীর কাছে জ্বালানি কাঠরূপে আসতে হবে।' বলা হয়েছে, সত্যান্বেষী 'সমিতপাণি' হয়ে গুরুর কাছে এসে বলবে, 'হে দেব আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে, দুঃখকষ্টের ভোগ থেকে, অজ্ঞানসাগর থেকে উদ্ধারের পথ চাই আপনি আমায় উদ্ধার করুন। আমি সর্বতোভাবে আপনারই শরণাগত। আমাকে দুঃখসাগর থেকে, বিকার থেকে রক্ষা করুন।' আত্মজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞগুরু মহাযোগ্য সত্যান্বেষীকে বলেন, তোমার অজ্ঞান, মোহ মুক্তির জন্য যে আর্তি তা যথার্থ, তুমি সুধী, তুমি ধন্য। কিন্তু তোমার আনুগত্য ও সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষা নিয়েই তোমাকে সেই বিজ্ঞান দেওয়া হবে। তাকে কিছুকাল কাছে রেখে তার ভাববৃত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গুরু তাকে নির্দেশ দিতে শুরু করেন। আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভের কতগুলি নির্দেশ আছে। সর্বত্যাগ হল তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বত্যাগেরও কতগুলি লক্ষণ আছে। এই লক্ষণগুলি সিদ্ধ হলে জিজ্ঞাসু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে গুরুর কাছে নিজেকে নিবেদন করে। অষ্টবিধা প্রকৃতির অষ্ট অঙ্গকে একবারই প্রণামের মাধ্যমে শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করা যায়।

গুরু জিজ্ঞাসুকে পরীক্ষা করেন সে যথার্থ জিজ্ঞাসু কিনা, মুক্তিকামী কিনা ও ভোগী কিনা। তাই প্রশ্ন করেন, কেন তুমি এখানে এসেছ? শিষ্য করজোড়ে বলে—অজ্ঞান-মোহ নিবৃত্ত্যর্থে, জন্ম-মৃত্যু নিবৃত্ত্যর্থে, ভবচক্র অতিক্রমার্থে এবং 'কৃপয়া ভগবন্ মাম্ উদ্ধার'। এই ভাবে শিষ্য 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' গুরুর কৃপালাভে সমর্থ হয়। আত্মজ্ঞান লাভের পথে আচরণ, কথা বলার ঢঙ, সেবা ইত্যাদি ব্যাপার অতি গূঢ় তাৎপর্যবোধক। তবে মানুষ নিজে নিজেরই সেবা করতে পারে না, গুরুর সেবা করবে কী করে? তাই বলা হয়ে থাকে 'গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক।' যেমন অধিকারী দুর্লভ তেমনি গুরুও দুর্লভ।

তত্ত্বানুশাসনের মাধ্যমে গুরু সকলকে আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন

অদ্বয়জ্ঞান শাস্ত্রসাপেক্ষ নয়। শাস্ত্রপাঠ করে যা পাওয়া যায় তা হল দ্বৈত জ্ঞান। এই দ্বৈত জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় গুরুসেবার মাধ্যমে এবং যথার্থ সদ্‌গুরুর কৃপা ও অনুগ্রহে এই দ্বৈত জ্ঞান বাধিত হয়। যিনি সদ্‌গুরু তিনি তত্ত্বজ্ঞ। যিনি তত্ত্বজ্ঞ নন তিনি কখনওই direct knowledge দিতে পারেন না। আর direct knowledge ভিন্ন অদ্বৈতসিদ্ধি সম্ভব নয়। সাধারণ গুরু যে জ্ঞান দেন তা হল indirect knowledge। একমাত্র যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিই বলতে পারেন 'তুমি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং'। তুমি তা ভুলে আছ এটাই তোমার অজ্ঞান, এই ignorance সরে গেলে 'তুমি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং' এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হবে। কিন্তু তার জন্য চাই ব্যাকুলতা ও আত্মজিজ্ঞাসা। ভোগের মধ্যে থাকলে আত্মজিজ্ঞাসা আসতেই পারে না। আত্মজিজ্ঞাসা আসে সর্বত্যাগের শেষে। ভোগীর থাকে ভোগের জিজ্ঞাসা। কিন্তু তত্ত্বান্বেষী বা জিজ্ঞাসুর কোনও জাগতিক ভোগের জিজ্ঞাসা থাকে না। সমস্ত জিজ্ঞাসা মার্জিত হলেই আসে সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা 'কে এই আমি?' আর গুরুকৃপাতেই একদিন জানতে পারবে অসঙ্গ, অভঙ্গ, অখণ্ড, অলিঙ্গ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ, নিষ্কল, নির্মল, নিরঞ্জন এই আমিই 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্।' আমি দেহ, নই, মন নই, প্রাণ নই, ইন্দ্রিয় নই, বুদ্ধি নই, অহংকার নই, প্রকৃতি নই, ভাব নই, বৃত্তি নই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বাতীত, অদ্বয় বোধস্বরূপ কেবলম্। এ কথা যে বলবে সে ব্রহ্মজ্ঞ। না-জেনে, না অনুভব করে এ সব কথা বলা তো মিথ্যাচার।

কোনও একদিন, কোনও এক গুরু তাঁর শিষ্যদের এই সব মহাবাক্যেব কথা ব্যক্ত করছিলেন। কাছেই বসে একটি পাগল সে সব কথা শুনছিল। পাগলটি হঠাৎ বলল, কে কাকে জ্ঞান দিচ্ছে? যার মধ্যে অহংকার আছে তার মধ্যে আছে অবিদ্যা। অবিদ্যা থাকলে বিদ্যার কথা হয় না। জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানগ্রহীতা দু'জনই দ্বৈতবোধে থাকে। দ্বৈতবোধ থাকলে অদ্বৈতের কথা কী ভাবে বলবে? যারা বলে তারা সবাই ভণ্ড। এ কথায় গুরুর টনক নড়ল। পাগলের দেওয়া বীজ তার বোধ খুলে দিল। সে তখন পাগলকে জড়িয়ে ধরল। পাগল আরও বলল, জগৎ সংসার সবই মিথ্যা। তুমিও মিথ্যা, আমিও মিথ্যা। এই কথাটি তুমি জান না, আমি জানি। তুমি যখন জানবে তুমিও পাগল হবে।

এখানে পাগলের কথা হল প্রজ্ঞানের বিজ্ঞানের অর্থাৎ Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge-এর। যাঁর মধ্যে এই বিজ্ঞান set হয়ে যায় তার আর জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। সব একাকার হয়ে যাবে। [২৩।৮।৯৫]

অজ্ঞানদোষজাত জীবের মুক্তি আসে গুরু কৃপায়

মানুষের কল্পিত দুঃখকষ্টের অভাবেরই আর এক নাম অজ্ঞান। অজ্ঞান থাকে দ্বৈতবোধে। দ্বৈতবোধকেই যে স্বীকার করেনি তার কাছে অজ্ঞান কী করে থাকে। যে Science of Oneness-কে আপন করেছে তারই আত্মানুভূতি সম্ভব। এছাড়া আরও একটি পথ আছে যা হল বিচারের পথ। যারা বিবেকবিচার করতে পারে না, তাদের জন্য হল শরণাগতি। গুরুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে যে ছেড়ে দিতে পারে গুরু তার ভার নেন। ইষ্ট গুরুর মাধ্যমেই স্ফুরিত হন। সদ্‌গুরু যে ভক্তের দায়িত্ব নেন তাকে ইষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে গুরু অন্তর্ধান হন। শিষ্য তার ইষ্টকে পায়, গুরুর দেখা আর পায় না। একমাত্র যারা গুরুকে ধরেই গুরুভজন করে তারাই গুরুর দর্শন পায়। তাই হল স্বানুভূতি। এই আসল অনুভূতিতে দ্বৈত ভাববৃত্তি থাকে না। এখানে পৌঁছতে হলে ব্রহ্মবৃত্তি, আত্মবৃত্তিকে আশ্রয় করেই চলতে হয়। ব্রহ্মবৃত্তিতে সংসার টেঁকে না।

আসলে মূলে যাবার জন্য কেউ চেষ্টাই করে না। মূলে যাবে কী করে? সদ্‌গুরুর মুখে শুনতে শুনতে শোনার মধ্য দিয়ে যে light পাবে তাই হল Light of Oneness, যা দিয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। একেই বলে শ্রবণ

সিদ্ধি। তারপর আসে মহাবাক্য বিচার। মহাবাক্য হল 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানংব্রহ্ম', 'অহংব্রহ্মাস্মি' ও 'অয়মাত্মাব্রহ্ম'। তারই সিদ্ধিস্বরূপ আসে পূর্ণের মন্ত্র। ব্রহ্ম হলেন পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই পাওয়া যায়। পূর্ণ সব সময়ই পূর্ণ। পূর্ণ হল আত্মা। মন কখনও আত্মার প্রকাশক হতে পারে না। কারণ মন হল আত্মার reflection। বিশ্বমন বা Universal mind হল জ্ঞানশক্তি—তাও চিদাভাস, চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ নয়।

অদ্বৈত সিদ্ধির জন্য অদ্বৈতবেদান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। চাই সদ্‌গুরুর প্রতি আনুগত্য। আনুগত্য না-জাগলে সমতা, একতা ও পূর্ণতার বিজ্ঞান পাবে না। অজ্ঞানে বাস করা মানে নিজের স্বার্থকে আঁকড়ে থাকা। নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই হল স্বার্থ। এই সমত্বের বা পূর্ণের বিজ্ঞান পেতে তাই স্বার্থের কথা, সাধুর নিন্দা, তত্ত্ববিজ্ঞানের বিরোধিতা, ধর্ম ও ঈশ্বরের সমালোচনা ইত্যাদি শুনলেই সেখান থেকে সরে যেতে হবে। অজ্ঞানের অজ্ঞানে যারা বাস করে তারা অপরের শ্রদ্ধা নষ্ট করে। শ্রদ্ধা এমন একটি বস্তু যা দেবার মানুষ খুব কম; নষ্ট করার লোক অনেক। তাদের কাছ থেকেও সরে থাকবে। তারা ধর্মের ভান করে থেকে অপরের ধর্মভাবকে বিকৃত করে। তোমার ধর্মভাব তোমার একান্ত আপন বা নিজস্ব—তা কখনওই অপরের কাছে ব্যক্ত করবে না। তাই তো শাস্ত্রে আছে আয়ু, বৃত্ত, গৃহছিদ্র, মান, অপমান, দান, মন্ত্র, তপ ও সিদ্ধি—এই নয়টি বিষয় গোপন রাখতে হয়। [৩০।৮।৯৫]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বৈতবোধে সংসার অদ্বৈতবোধে অভিন্ন ঈশ্বরাত্মার প্রতিষ্ঠা

ঈশ্বরকে আত্মা থেকে আলাদা করে নিলে হয় দ্বৈতবোধ। দ্বৈতবোধে জগৎ হল ঈশ্বরের আনন্দলীলা। লীলাতে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা সবই আছে। কিন্তু আত্মাতে কোনও লীলা নেই। জগৎলীলায় ভক্তই ভগবানকে ডোবায়। সংকটে পড়লে বিষ্ণুকেই ছুটতে হয় মহেশ্বরের কাছে। দ্বৈতলীলা মানেই সংসার। সংসারই মানুষকে ডোবায়। তাই তো শংকরাচার্য বললেন—নাহি স্রষ্টা, নাহি সৃষ্টি, সবই সচ্চিদানন্দ কেবলম্। এই সচ্চিদানন্দকে মন্দিরে, মসজিদে, আকাশে, বিগ্রহে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ। তিনি যে আত্মস্বরূপ হয়ে আছেন প্রত্যেকেরই হৃদয়গুহাতে। এই সত্যকে পেতে কল্পনা ছাড়তে হবে। কল্পনা দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না। তাই তোমাদের ভাললাগা, ভালবাসা, প্রিয়তা, অপ্রিয়তা সব ছাড়তে হবে। সত্য হল অচিন্ত্য। চিন্তা দিয়ে তাকে কী করে পাবে? সাধনার দ্বারাও সত্যকে জানা যাবে না। কারণ ঈশ্বরাত্মা সাধনার অতীত। লৌকিক গুরুরা দীক্ষা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে নিজ অতিরিক্ত অন্য একটি আত্মাকে কল্পনা করে তাঁকে পাবার জন্য সাধনা দেন। কিন্তু আত্মজ্ঞগুরু কোনও সাধনাকেই স্বীকার করেন না। আত্মা নিত্যলব্ধ—তাঁকে পাওয়ার জন্য আবার সাধনা কিসের? তাঁদের কাছে আত্মার উপরে কোনও দেবতা, কোনও ঈশ্বর নেই, থাকতে পারে না। দ্বৈতবাদীরা এ কথা মানতে পারবে না। তাদের কল্পিত ঈশ্বরকে তারা নাম, জপ, তপস্যা ইত্যাদির মাধ্যমেই পেতে চায়। তারা কল্পনাকেই সত্য বলে মনে করে।

কিন্তু শ্রীগীতাতেও আছে—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুবাত্মনঃ।।" (৬/৫)

(আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না, কেননা আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।) [২৫।১।৯৬]

সুখ-দুঃখ হল আত্মবোধেরই বিশেষ রূপ

'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথায় আকৃষ্ট হয়ে 'এর' কাছে এসে প্রথমেই অনেকে প্রশ্ন করে, আপনার গুরু কে? তাদের বলা হয়েছে—আমার জন্মদাতা পিতামাতাই আমার প্রথম গুরু। দ্বিতীয় গুরু হল আমার সমষ্টি দুঃখমূর্তি। তারা কিন্তু এটা মানতে পারে না। Total sufferings-কে জানতে সবাই আমার গুরু। আসলে দুঃখের প্রতিষ্ঠা আছে অত্যন্ত সুখে। অত্যন্ত সুখে এক-ই আছে দুই নেই। আর দুঃখ হল এক-এর বক্ষে অনন্ত কল্পনা। কল্পনা সরে গেলে এক-ই থাকে। কিন্তু সংযম না-থাকলে, শূন্যেতে না-গেলে এই তত্ত্ব খোলে না। তাই আমার গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। তিনিই ব্রহ্মানন্দ। এই অখণ্ড জ্ঞানসত্তা ছাড়া আমি কাউকেই মানতে পারি না। এই জ্ঞানসত্তার কোনও duplicate নেই। আরও বলা হল, মা-বাবা ছাড়া পৃথিবীতে এমন স্বার্থশূন্য আর কে আছে? তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সন্তানকে মানুষ করা। তার জন্য তাঁরা যে কোনও রকম ত্যাগে প্রস্তুত। তাঁদের এই আত্মত্যাগ, আত্মদান—এ তো একেবারে স্বার্থশূন্য। তাঁদের দেখে, শুনে

বুঝেছি এমন স্বার্থশূন্য আর কেউ হতে পারে না। তাই পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করেছি, আমায় তোমার সেই কল্যাণদৃষ্টি দাও যাতে আমার সব অকল্যাণ ডুবে যায়।

এরপর আসে ব্রহ্ম/আত্মগুরুর কথা। অনেকে দেবগুরুর কথাও বলেন। তবে দেবগুরু একটা certain stage পর্যন্ত। সবার উপরে ব্রহ্ম/আত্মগুরু। ব্রহ্মতত্ত্বকে পেতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বকে বাদ দিতেই হবে। এখানে এলে জ্ঞানক্রিয়া, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়ভাব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। তথ্যের প্রয়োজনে থাকে subject-object, কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে subject-object difference থাকেই না। তত্ত্বই হল জ্ঞানস্বরূপ। তাকেই এখানে Oneness দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে অনেক একেবারে নূতন term introduce করা হয়েছে যে term-গুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, কিন্তু বর্তমানে তার misuse হচ্ছে। কারণ বর্তমানে লোকেদের আছে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছে, ব্যষ্টি ভাবের স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা, বাহবা নেবার, বাহাদুরি দেখাবার প্রচেষ্টা, কর্তৃত্ব দেখাবার এক প্রতিযোগিতার ভাব।

একবার কয়েকজন অদ্বৈতবাদী 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) বলেছিলেন—আপনি তো মজায় থেকে কথা বলছেন, আমরা পাচ্ছি সাজা। বলা হল—তোমরা নিজেকে আত্মার দাস ভেবে অনাত্মাকে সরাতে চাইছ। জ্ঞানাভাস নিয়ে মাতামাতি করছ কিন্তু জ্ঞানস্বরূপকে ভুলে আছ। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার কোনও সাধন নেই। আত্মা তো ever-perfect। আত্মাতে কোনও অভাব নেই—It does not require to be fulfilled বরং আত্মার দ্বারাই সব পরিপূরিত। তোমরা তাকে object করে জানতে চাইছ। তা কী করে হবে? তারা 'একে' (শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর) 'আচার্য' বলে সম্বোধন করলে বলা হল—আমি আচার্য নই। আমি কাউকে degrade করতে পারি না। সবাই এক। জ্ঞানসত্তা তার সত্তাস্বরূপ কখনও হারায় না। গুরু সংজ্ঞায় তাই তো বলা হয়েছে গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। তিনিই ব্রহ্মানন্দ, তারপর বলা হয়েছে—'গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম'—এ কথাটা কিন্তু সবাই মানতে পারে না। [১৪।২।৯৬]

সত্য আদর্শনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর অভিনব বৈশিষ্ট্য

ধর্মজগৎ প্রতিষ্ঠিত man of character-দের নিয়ে। এ নিয়ে তর্ক হতে পারে বিস্তর কিন্তু সমাধান এক-আধজনের কাছেই পাওয়া যায়। মানুষের জীবনে নানা দিক আছে যেখানে তারা নিজেদের মতো করে চলতে পারে। কিন্তু জীবন্মুক্তি, ঈশ্বরানুভূতি বা সত্যানুভূতির দিক হল uncompromising। সমাজজীবনে আছে মেকি সম্বন্ধ পাতাবার সম্ভাবনা। কিন্তু যারা সত্যান্বেষী অর্থাৎ ধর্মকে যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট তাদের জীবন কিন্তু আদর্শপূর্ণ হওয়া দরকার। তাই বলা হয় জীবনকে সুদৃঢ় করতে জীবনের foundation strong করতে হয়। সেখানে কোনও রকম ফাঁকি চলে না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে না-চলে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপরে উঠতে হবে। এখানে profession-এর কোনও স্থান নেই। লোকদেখানো উপায়ে নয়, absolutely devotional হতে হবে। তা না-হলে লোক প্রবঞ্চনা তো হবেই, নিজের নরকগতিও কেউ রুখতে পারবে না। যুগে যুগে মহামানবদের বৈশিষ্ট্যই হল তাঁদের আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলচাতুরী, কৌশল ইত্যাদি পরিহার করে চলা। কিন্তু বর্তমান ধর্মজগতে সবচেয়ে সহজ ব্যাপার হল গুরু সাজা। গুরু হবার মতো তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য তার নাই বা রইল। অথচ এ সব না-থাকলে তো গুরু হওয়াই যাবে না। অবশ্য 'এর' কাছে গুরু হওয়া যত কঠিন শিষ্য হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এটা 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) অনুভূতিতেই ধরা পড়েছে।

সত্যের, জ্ঞানের আত্মার একমাত্র অন্তরায় হল মিথ্যা, অবিদ্যা ও অজ্ঞান। জীবনে অবিদ্যা, অজ্ঞানকে পোষণ করে যথার্থ ধর্মজীবন কখনওই হয় না। ঋষিযুগে তাই গুরু শিষ্যকে নিজের কাছে রেখে তাকে শাসন

করে, মেরে ধরে তার নিম্নপ্রবৃত্তিকে দমন করে তাকে খাঁটি করে নিয়ে তারপর শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে তো আর তা হয় না। বর্তমানে গুরু শিষ্যকে কিছু বললে, শিষ্যই গুরুকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়। আবার নিজের জীবনে ঠেকে গেলে সেই গুরুর কাছে এসে অনুনয় বিনয় করে সমাধান চায়।

যথার্থ গুরু যোগ্য অধিকারী ছাড়া ধরা দেন না। গুরু যখন সত্যধর্মে দীক্ষা দেন তখন তিনি দেখে নেন শিষ্য কতটা এগোতে পারবে। একমাত্র real গুরু বা সদ্‌গুরুই পারেন শিষ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখে নিতে। বর্তমানের সাজাগুরুরা তো কোনও রকম বাছবিচার না-করেই সবাইকে দীক্ষা দিয়ে দেন। তাই বর্তমানে গুরু সাজা খুব সহজ। সত্যিকারের মহাত্মারা গুরুপদ নিতেই চান না। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) এক মহাত্মাকে জানে যাঁকে প্রণাম করলে তাঁর জ্বর এসে যেত। এমনই আরও একজনকে দেখেছিলাম বেলুড় মঠে। তাঁর নাম জ্ঞান মহারাজ, বিবেকানন্দের আশ্রিত। তাঁর ঘরে কেউ ঢুকতেই পারত না। কেউ ঢুকছে দেখলে তিনি ভীষণ ভাবে চিৎকার করতেন। তিনি বিছানায় শুয়ে দেওয়ালের উপরে পা তুলে রাখতেন। অবশ্য যদি কেউ তাঁর কাছে বসবার সুযোগ পেত তবে অনেক ভাল কথা শুনতে পেত।

তত্ত্বানুভূতির তাৎপর্য

তত্ত্বের কথা বই মুখস্থ করে বলা যায় না। যাঁর তত্ত্বস্ফূর্তি হয়নি সে তত্ত্বকথা বলার যোগ্যই নয়। তাই বলা হয়ে থাকে আলোচনার সময় ব্রহ্মকথা এনো না। অবশ্য সদ্‌গুরু যোগ্য অধিকারী পেলেই তাকে স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন। 'এখানে' (ফার্ন রোডের সৎসঙ্গে) অবশ্য যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারেই স্বরূপের কথা বলা হয়।

গুরু-শিষ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হলে বহির্জগতের দৃশ্যাবলী সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে গুরু হল আত্মা আর শিষ্য হল মন ও বুদ্ধি। আত্মার একমাত্র অনুগত শিষ্য হল মন ও বুদ্ধি। এ সব হল 'এর' নিজবোধের কাহিনী। বইয়ের পাতার সঙ্গে বা শাস্ত্রের কথার সঙ্গে মিলতেও পারে, নাও পারে। [২১।২।৯৬]

আত্মবোধের সর্বোত্তম সাধনাই হল আপনবোধে আত্মচিন্তা

আত্মচিন্তা, আত্মভাবনাই হল আত্মজ্ঞানের একটি বিশেষ সোজা পথ। এ ছাড়া অনেক পথ নিশ্চয়ই আছে। অনেক প্রকার তপস্যাও আছে। বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তা সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। সবার পক্ষে কমবেশি যেটা সম্ভব তা হল নিত্য আত্মস্বরূপের চিন্তা। শুধু recognize করা I am verily this। অনেক অভ্যাসের সাথে এটাও অভ্যাস কর। এটা হল positive অভ্যাস। Infinite cannot be negative। তুমি-ই সেই Infinite One। Infinite-কে finite করে দেখে মন। মন যে-ভাবে দেখছে দেখুক—তাতে Infinite finite হয়ে যাবে না। নিজেকে Infinite ভাবনা করার জন্য প্রেরণা যোগায় গুরুশক্তি।

একবোধের সাধনা আপনবোধেই সিদ্ধ হয়

Sincerity is intense urge, firm faith is Bhakti। ভক্তির par excellence হল Love and that is your True Nature। তুমি প্রেমে গড়া প্রেমে ভরা। মনই তোমার স্ববোধস্বরূপ আত্মাকে ঢেকে রেখেছে। মনকে বহির্জগত থেকে তুলে নিয়ে সেখানেই বসাও—তখন তোমার শত্রুমনই হবে তোমার মিত্র। তা-ই হল গুরুবাণী। গুরুবাণীর বৈশিষ্ট্য হল এই বাণী মনে বসালে এই বাণীই তোমাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপে পৌঁছে দেবে। সব সময় আপন ভাবনা কর—ধীরে ধীরে এই আপনতার পরিধি বাড়াও। আপনতাই হল Oneness and Oneness is always original। Oneness-কে পেতে জপতপ helpful ও তার সঙ্গে এই কথাগুলো আরও helpful। [২৮।২।৯৬]

সত্যধর্মের বোধেই গড়ে ওঠে জীবন

অজ্ঞানে থেকে তোমরা যা-করবে তা অজ্ঞানই হবে। অজ্ঞান থেকে নিজেকে আলাদা করে না-নিলে মুক্তির স্বাদ কোনও দিনই পাবে না। জেলখানায় থেকে মুক্তি হল কল্পনা। সংসারের পাকে জড়িয়ে থেকে মুক্তিও তেমনই কল্পনা। আর যারা মুক্তির খোঁজে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে সামান্য কী একটু শক্তি পেতেই আশ্রম করে বসে সাধু সেজে গুরু হয়ে শিষ্য পরিবৃত হয়ে আছে, তারা তো একটা ছোট সংসার ফেলে এক বড় সংসারের দায়িত্ব নিচ্ছে। তাদের তো আরও কত সমস্যা। সম্পত্তি রক্ষা, সম্পত্তি বৃদ্ধি, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি করতেই তো সময় যায়—ইষ্টের কথা ভাববার সময় কোথায়?

একমাত্র গুরুশক্তিই মানুষকে বিকার থেকে নির্বিকারে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অনাত্মা থেকে আত্মাতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, ভেদ থেকে অভেদে নিয়ে যায়। মুক্তপুরুষের চাওয়ার কিছু নেই আর যারা মুক্ত নয় তাদের পাওয়ার শেষ নেই। মুক্তপুরুষের কাছে অর্থ, বিদ্যা, রাজশক্তি ইত্যাদির কোনও মূল্য নেই—সবই আজ আছে কাল নেই। তাই মুক্তপুরুষের হারাবারও কিছু নেই। বম্বেতে একজন বলেছিল—অর্থ দিয়েই তো সমাজের সব হয়, আর আপনি অর্থ স্পর্শই করেন না। এটা কী করে সম্ভব? বলা হল—যে নদী সাগরে মিশে গেছে সে কী আবার ফিরে যাবে পথের কষ্ট ভোগ করতে? লোকে বলে কয়লা ধুলে তার ময়লা যায় না। কিন্তু 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) জানে কয়লা কী ভাবে সাদা করতে হয়। কয়লাকে আগুনে পুড়ালে পুড়ে পুড়ে সাদা হয়ে যাবে। তা-ই হল তপস্যা। তবে চাওয়ার fulfilment-এর জন্য যে তপস্যা তা কোনও তপস্যাই নয়। তপস্যা হল প্রকৃতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাববার সচেতন প্রচেষ্টা। তার জন্য প্রয়োজন এক সদ্‌গুরুর। গুরুর প্রতিটি নির্দেশ একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে। আরে বাবা! গীতা, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থই তো হল গুরুর নির্দেশ। এ সব আজ আর কয়জন follow করে। বর্তমানে তো অনেক অনধিকারী পুরুষ অর্থের জন্য প্রচুর ধর্মের বই ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করছে। অর্থের ভিত্তিতে ধর্ম হয় না। আসল ধর্মকে তাই মানুষ নিতে পারে না। পৃথিবীতে কটা যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণর মতো জীবন হয়েছে। আসল ধর্মকে যাঁরা গ্রহণ করে, আত্মার আদর্শের চরম উৎকর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরাই। [৬।৩।৯৬]

সংসারে জড়িয়ে পড়া সহজ কিন্তু সংসারমুক্ত হওয়া কঠিন

কৃপা কর্মী, যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসে। তাহলে what is কৃপা? এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর একমাত্র অনুভবসিদ্ধ ছাড়া আর কারও কাছেই পাওয়া যাবে না। Divine grace from the universal standpoint-এ এক রকম, individual standpoint-এ আরেক রকম। শাস্ত্রপাঠ করে, পুঁথিপত্র পড়ে যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান মানুষকে তার জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। এই goal-এ যেতে কোনও desire বা aspiration থাকতেই পারে না। এইগুলি একমাত্র কোনও যথার্থ যোগী, জ্ঞানী বা ভক্ত step by step বুঝিয়ে না-দিলে clear হবে না। আসলে জগৎ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করা যায় কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধনসিদ্ধ, পূর্ণমুক্ত ও স্বানুভবসিদ্ধ গুরুর শরণাগত হচ্ছ। শরণাগতিও সবার সমান হয় না। এক একজন ঋষির হাজার শিষ্য—তাদের মধ্যে আবার হাজারও gradation। শুধুমাত্র সাধুর বাইরের বেশ দেখেই, তার সাধু সাধু ভাব দেখেই বেশির ভাগ মানুষ ভুল করে ও তাদের ফাঁদে পড়ে।

বর্তমানের সাধনায় তাই যা জান তা ফেলে দিয়ে যা জান না তার জন্যই ব্যাকুল হতে হবে। তার জন্যই প্রয়োজন হয় সৎসাধুর (সৎগুরু) সঙ্গ। সাধুসঙ্গে থাকলে আসে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে আসে রুচি, রুচি থেকে আসে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা থেকে হয় ভাব। ভাব কিন্তু বহুমুখী। ভাবের পরিপক্ব অবস্থা হল মহাভাব। এই মহাভাব

থেকে আসে প্রেম। এই প্রেমকেই এখানে বলা হয়েছে Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge। যাকে আর এদিক-ওদিক করা যাবে না।

শাস্ত্রের সারকে ধরতে না-পারলে স্বানুভূতি মিলবে না। নিজের অনুভূতির ভিতরে ঢুকতে হবে। তার জন্য এক এক করে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের স্তর ভেদ করে একেবারে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। কেন্দ্রের যে স্তরে পৌঁছলে তাকে আর refute করা যায় না, তাই হল তোমার সত্তা। তুমি হলে সেই সত্তাস্বরূপ যাকে তুমি কখনওই demolish করতে পারবে না। প্রকৃতির অতীত নিজের সত্তাকে যে জানতে পারে সে-ই সম্রাট। তাকে কোনও বিশেষণে বিশেষিত কবা যাবে না। অবশ্য বাইরের জগৎ বা প্রকৃতিকে সব সময় বলেছে—'এই সব অনাত্মাতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যা আছি তা-ই থাকব।' নিজেকে নিজের মধ্যে রাখার জন্য প্রকৃতির কাছে অনেক test দিতে হয়। একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না এই সব test উত্তীর্ণ হওয়া। তাই সদ্‌গুরুর বাণী হল—Get yourself always conscious, aware and fully alert about the Truth। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) সমস্ত বক্তব্যের সার আছে এই কথাগুলোর মধ্যে। [১৩।৩।৯৬]

ত্রিগুণে গড়া এবং ত্রিগুণে ভরা জীবসংসার

ধর্মজগতে প্রত্যেকেরই কথায়, কার্যে ও অনুভূতিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। অবশ্য যারা সদ্‌গুরুর সঙ্গ করে তাদের মধ্যে সদ্‌গুরুর প্রভাব বেশি পড়ে। তারা কিন্তু সাধনভজনের অপেক্ষা রাখে না। তবে এ কথাও ঠিক সদ্‌গুরুর প্রভাব ধরে রাখা কঠিন। ক্রমবর্ধমানকে সীমার মধ্যে রাখলে তার বৃদ্ধি হয় না। এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে বুদ্ধি দিয়ে জানা কঠিন। বুদ্ধি হল তমোরজোগুণের বিকার, যদিও তাতে সত্ত্বগুণ মিশ্রিত থাকে। কঠোর তপস্যা বা সাধনার দ্বারা সত্ত্বগুণ থেকে তমোরজোগুণের বিকারকে নির্মূল করতে হয়। তমোগুণ দেহধারণ করে, রজোগুণ প্রাণশক্তি ধারণ করে, সত্ত্বগুণ মনবুদ্ধিকে ধারণ করে। দেহের ব্যবহার হয় তমোগুণে, প্রাণের প্রাধান্য বা activities-এ আছে রজোগুণে আর চিন্তা, ভাব ও অনুভূতিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বেশি। মনকে সত্ত্বগুণী করতে তমোরজোগুণের প্রভাবকে সচেতন ভাবে পরিহার করতে হয়। সচেতনতার অভাব হলে তমোরজোগুণ আবার ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে কচুরিপানার তুলনা দেওয়া হয়। কচুরিপানা সরিয়ে দিলেও আবার সে ফাঁকা জায়গা দখল করে। অবশ্য সংসারে তমোরজোগুণী লোকের সংখ্যা বেশি হলেও সত্ত্বগুণী একেবারেই দুর্লভ। এরা সংসারে প্রায় থাকেই না। নির্জনে বনে একাকী থাকতে চান। কারণ সংসারের তমোরজোগুণী মানুষের সংস্রবে থাকলে তমোরজোগুণের প্রভাব বাড়ে। সংসারে এই সব লোকেদের মাছির সঙ্গে তুলনা করা হয়, যারা dustbin-এও বসে আবার মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহে ও প্রসাদেও বসে। সংসারে ভ্রমরেব সংখ্যা নিতান্তই কম যারা শুধু সুগন্ধী ফুলেই বসে। ফুল ছাড়া অন্য কোথাও বসে না। শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানীরা অবশ্য এই সব তমোরজোগুণীদের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ তমোরজোগুণ সত্ত্বগুণকে সরাতে পারে কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বগুণকে সরাতে পারে না। আর সদ্‌গুরুর কাছে তামসিক, রাজসিক গুণ মাথা নত করবেই। তাই তো রত্নাকর নারদের কাছে, জগাই মাধাই প্রভু নিত্যানন্দের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়

চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর সদ্‌গুরুরূপে যখন আসেন তখন তাঁকে মানুষ বা ঈশ্বর যে-ভাবেই দেখ, তিনি হলেন Saccidananda personified। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপারের কারণ হলেও তিনি তার সাথে attached হয়ে যান না। জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক magician ও তার magical game-এর মতো। যেমন—

জলে মাছ থাকে কিন্তু মাছের গায়ে জল লাগে না, পদ্মপাতায় জল টলটল করে তাকে ভেজাতে পারে না, তেমনই সদ্‌গুরুও সংসারে থেকেও সংসারের অতীত। কোনও রকম তমোরজোগুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম। যা বিশুদ্ধ চৈতন্য তা-ই সৎ আবার তা-ই প্রেম, অমৃত ও শান্তিস্বরূপ। তমোরজোগুণের প্রভাবে দেহধারী হয়েছ, জীবনে সত্ত্বগুণের প্রভাব বাড়ালে অর্থাৎ সত্ত্বগুণী হলে ঈশ্বরের দর্শন হবে এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাবে পরব্রহ্ম, পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে।

মানুষ বদ্ধ দেহ-ইন্দ্রিয়ে কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রিয় হল সচ্চিদানন্দ। তিনি কারও উপর প্রভুত্ব করেন না। তিনি নিজেই নিজের রাজা। তিনি গুণাতীত তাই তিনি রাজার রাজা—সম্রাট। তাই তিনি 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। একজন স্বানুভবসিদ্ধের বাণীকে অপর একজন স্বানুভবসিদ্ধই বুঝবেন। একজন realizer-ই direct realization-এর কথা ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু মলিন চিত্ত তা ব্যবহার করতে পারে না।

সত্যানুভূতি আবৃত আছে গুণ দিয়ে। গুণকে অস্বীকার করলে সত্য আপনিই প্রকাশিত হবে। গুণ দ্বারা আবৃত এই মলিন মন নিয়ে চললে জন্ম জন্মান্তরের দুঃখকষ্টের চক্রে ঘুরতেই হবে until and unless your Self-God favours you, you cannot get out of this bondage। তার জন্য চাই গুরুকৃপা। অবশ্য গুরু তো সর্বস্তরেই মিশে আছেন—পাঠশালার গুরু থেকে বিদ্যাশিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের গুরু, দেবদেবীর স্তরের গুরু, ঈশ্বরের স্তরের গুরু, পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্তরের গুরু। তবে ব্রহ্মগুরুকে কে আর সাধন করে? একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বগুণীই ব্রহ্মগুরুর সেবা করেন, কারণ তিনি কোনও অবলম্বন নিয়ে সাধনা করেন না। অপরপক্ষে তামসিক, রাজসিক সাধকদের একটা অবলম্বন চাই-ই চাই।

দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে পরমপুরুষের যে সম্পর্ক তা গুরু একটা একটা করে ধরিয়ে দেন। তাদের কার জন্য কী ধরনের আহারের প্রয়োজন তাও গুরুই বলে দেবেন। গুরু নির্দেশিত পথে constant একই রকম থাকবে। অন্তর-বাহিরশূন্য, নির্বিকার, নিরাকার, প্রশান্ত ও সমাধিমৌন যে আত্মা তাঁর প্রতি মুখ্যভক্তি বা pure love, শুদ্ধ জ্ঞান বা pure wisdom সত্যিই দুর্লভ। এটাই সত্য বস্তু—এটাই তোমার স্বরূপ। এটা যখন অন্তরে উপলব্ধি করবে তখনই হবে Realization। [২০।৩।৯৬]

অহংকারবোধে সংসারজীবন, আত্মবোধে মুক্তজীবন

মানুষ সব সময় আরাম ও সুখের পিছনেই ছোটে। এই সুখ বা আরাম হল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির। কিন্তু অমৃতশান্তি আছে একমাত্র আত্মাতে। সেখানে কোনও মিশ্রণই সম্ভব নয়। প্রাণের পশ্চাতে আছে মন, মনের পশ্চাতে আছে বুদ্ধি, বুদ্ধির পশ্চাতে আছে অব্যক্তপ্রকৃতি। তারও পশ্চাতে আছেন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। মানুষের অধ্যাত্মসাধনা এই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাবার জন্যই। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার না-থাকলে মানুষের অধ্যাত্মজগতের বিষয় নিয়ে চর্চা করে লাভ হয় না। সাধারণ মানুষের মন সদা বৈচিত্র্যময় বহির্জগতের দিকেই ধাবিত হয়। তার উপর সংসারীর আছে দু'টি অজুহাত— দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের তাৎপর্য যে কী তারা বোঝে না। তার জন্য চাই প্রাজ্ঞবিজ্ঞের সাহায্য। পূর্বজন্মের সংস্কার, নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও ঈশ্বরের কৃপা দিয়েই একমাত্র প্রাজ্ঞবিজ্ঞ হওয়া যায়। কিন্তু সেদিকে না-গিয়ে, কল্পনার বা চিন্তার দ্বারা এক জগৎ গড়ে, যাতে তার স্বরূপ আরও আবৃত হয়ে যায়। কাজেই কল্পনা হল অধ্যাত্মসাধনার প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়কে সরাতেই চাই সদ্‌গুরুর বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ how to stop continuous thought process which is mainly for the hankering after worldly objects and things।

মানুষের বাহ্যিক আচরণ হয় মানুষের মনের স্তর থেকে। মানুষ সে বিষয়ে একেবারেই সচেতন নয় বলেই তারা কী বলছে, কী করছে এ সবের কোনও হিসাবই রাখে না। তাদের আচার-আচরণ ও চালচলনে থাকে ত্রুটি—এই সব ত্রুটিই তার সকল দুঃখের কারণ। কাজেই মানুষের সব দুঃখের কারণই হল মন। মনের দর্শন হল বাইরের রূপরসের বৈচিত্র্যময় জগতের দর্শন—তা দুঃখদায়ক। এই দুঃখের কারণকে দূর করতে চাই মনের অন্তর্দর্শন। মনকে হৃদয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হৃদয়ে বসে যে দর্শন তা-ই হল আধ্যাত্মিক দর্শন বা অন্তর্দর্শন। মন ও বুদ্ধিকে তাই বলা হয়েছে দুই দৈত্য। এরা তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে বৃত্তির দাস বলে এদের বলা হয় বৃত্তাসুর। এই বৃত্তাসুরকে দমন করতে জন্ম জন্ম সাধনার দরকার হয়। এই সাধনার বিজ্ঞান পাওয়া যাবে একমাত্র সদ্‌গুরুর কাছে। কলি যুগে মানুষের সাধনা হল the lowest limit of understanding—এ যুগে পুঁথিগত বিদ্যাই বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু জ্ঞান কখনওই পুঁথিগত বিদ্যা নির্ভর নয়। Book knowledge সব সময়ই insufficient অথচ সাধারণ মানুষের কাছে book knowledge-এর importance খুব বেশি।

মন ও বুদ্ধির দৃষ্টিতেই হয় সৃষ্টি। বোধের দৃষ্টিতে এক আত্মাই বর্তমান। আত্মাতে মন, বুদ্ধির কোনও স্থান নেই। আত্মাতে তাই আহার, বিহার, বাক্, চিন্তা ইত্যাদির স্থান নেই। দীর্ঘদিনের সংযম দ্বারা গুরুনির্দিষ্ট পথে দীর্ঘকাল চললে তবে তুমি qualified হবে। আবার তার সঙ্গে চাই আত্মাকে জানবার জন্য ব্যাকুলতা। সৎপ্রসঙ্গ না-শুনলে ব্যাকুলতা জাগে না। ব্যাকুলতা না-জাগলে qualified হবে না। তার জন্যও চাই proper training—তুমি কী রূপ গ্রহণ করবে? কী রকম রস আস্বাদন করবে? কি করবে কি করবে না, কি খাবে কি খাবে না—তা কিন্তু সদ্‌গুরু তোমাকে একটা একটা করে নির্দেশ দেবেন। গুরুর নির্দেশ নিয়মিত ভাবে পালন করলে মন অন্তর্মুখী হবেই। তোমাদের দৈনন্দিন পূজা-আর্চা, জপ, ধ্যান ইত্যাদিতে মনের গোঁড়ামি বাড়ে, মন অন্তর্মুখী হয় না। দীর্ঘদিন অভ্যাস করেও তোমাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। স্বভাবের পরিবর্তন করতে হবে। নূতন অভ্যাস গড়তে হবে। তোমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের সঙ্গে যে প্রিয়তাবোধ তা ছাড়তে হবে। হৃদয় যাদের অনুর্বরা তাদের মুখে আধ্যাত্মিক কথাই মতলবী।

নিরন্তর গুরুবাণী স্মরণ-মনন দ্বারাই প্রজ্ঞা তৈরি হয়। তার জন্যও পরিবেশ প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবেশ না-থাকলে বাইরের প্রভাব মনকে আবৃত করে দেবে, ভাবনা করতে পারবে না। তাই গুরুবাণী ধ্যান করে বুদ্ধিকেও মার্জিত করতে হবে। অধ্যাত্মভাব সব সময় গোপন রাখতে হয়। অধ্যাত্মভাব হল গোপীভাব—গোপীরা যে-ভাবে কৃষ্ণকে তাদের অন্তরে বন্দী করেছিল সেই ভাব আনতে হবে। প্রবৃত্তির মুখে গুরুবাণী বসাতে হবে। সংসারীর পারিবারিক অশান্তি হল তার লালসার ফল। মুক্তপুরুষের যোগ্যতা আছে কিন্তু সাধ নেই তাই তাঁর অশান্তিও নেই।

যদি বল তোমাদের সাথে আমার গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ, আমি বলি—এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হল মনের, আত্মাতে গুরুও নেই, শিষ্যও নেই, শুধু আত্মাই আছে। হৃদয় থেকে কথা আসে আবার হৃদয়েই তা মিশে যায়।

[২৭।৩।৯৬]

স্বভাবগত রুচি অনুসারে সাত্ত্বিকাদি খাদ্যের প্রিয়তা নির্ভর করে

আহার শুদ্ধ না-হলে চিত্তশুদ্ধি কখনওই সম্ভব নয়। চিত্তবৃত্তি শোধনের জন্য চাই সাত্ত্বিক আহার। তবে যে তমোগুণী সে তামসিক আহারই পছন্দ করে। রজোগুণী রাজসিক আহার ও সত্ত্বগুণী সাত্ত্বিক আহার পছন্দ করে। সত্ত্বগুণীর তামসিক বা রাজসিক আহার সহ্য হবে না, আবার তমোগুণীর রাজসিক বা সাত্ত্বিক আহার চলে না, যেমন রজোগুণীর তামসিক বা সাত্ত্বিক আহার চলে না। এখন এই সাত্ত্বিক আহার কী এবং কেমন

করে তা পাওয়া যাবে তা একমাত্র অনুভবসিদ্ধ সৎগুরুর কাছেই জানা যাবে। আহারের ক্রম কীরূপ হবে তা একমাত্র তিনিই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরিয়ে দিতে পারেন। সত্যের সন্ধান একমাত্র সত্যসিদ্ধই দিতে পারেন। যারা সত্যের সাধক তারাও দিতে পারে না। সংসারী পরামর্শ নেয় আনাড়ির কাছে। আর আনাড়ির পরামর্শে চললে বিকার বাড়ে বৈ কমে না।

যার মধ্যে যেমন গুণের প্রাধান্য সে সে-রকম খাবারই পছন্দ করে। কিন্তু আহার সংযমের মাধ্যমেই গুণের মানের পরিবর্তন হয়। যেমন তামসিক লোক তার মধ্যে রজোগুণকে বাড়িয়ে তার তামসিকতা দূর করবে। আবার রাজসিক লোক তার মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশপ্রকাশ দ্বারা রজোগুণের আক্ষেপ-বিক্ষেপকে বিকারমুক্ত করবে। আর সত্ত্বগুণী তার মধ্যে যে সূক্ষ্মরূপে রজ ও তমোগুণের লেশ আছে তা শুদ্ধসত্ত্বগুণ দিয়ে নাশ করলে শুদ্ধসত্ত্ব আত্মজ্ঞানী হতে পারবে। কিন্তু সংসারীর পক্ষে তা কোনও ক্রমেই সম্ভব হয় না। একমাত্র যার মধ্যে বিবেক-বৈরাগ্য জেগেছে সে-ই সদ্‌গুরুর কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বগুণের অধিকারী হতে পারে।

সৃষ্টির কর্ম অংশে জাত এই দেহ। আর জ্ঞান অংশে হয় কর্মের বিকার শোধন ও বিকার মুক্তি। এই দেশের culture অতীব পুরাতন। সেই ঋষিযুগের culture আছে যথার্থ সাধুর কাছে। এই culture হল আদর্শের চরম ব্যাপার। এর জন্য চাই যথার্থ নিষ্ঠা। দীর্ঘকাল সদ্‌গুরুর পদতলে বসে তাঁর নির্দেশমত সাধন-ভজন করলে তাঁর কৃপায় সেই আদর্শকে পাওয়া যায়।

মানুষ সব কিছু জানতে চায় তার মন ও বুদ্ধি দিয়ে। মন, বুদ্ধি object নিয়ে থাকে তাই তার চিন্তাধারা হল objective—তারা subjective হতেই পারে না। আর যা super subjective মন, বুদ্ধি তাঁকে ধরবে কী করে? তাঁকে ধরতেই মন, বুদ্ধিকে শোধন করে মার্জিত করে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কারণ জ্ঞান হল summit of all ideals—It is Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge। এই জ্ঞান কখনওই intellectual নয়। তা হল Super intuitional এবং তা সব সময়ই গুরুকৃপা সাপেক্ষ। একমাত্র সংযত চিত্তেই গুরু তাঁর শক্তি সঞ্চার করেন।

মানুষের তিনটি দেহ—স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ। স্থূল দেহের ভিতরে আছে heart, stomach, liver, kidney ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন কার্যাবলী। এই সমস্ত doctrine-কে একসঙ্গে করেই আমাদের এই gross cosmic body বা individual being। এই gross body-র মধ্যে আছে আবার subtle cosmic body বা individual being। তারও মধ্যে আছে causal cosmic body। কিন্তু causal individual being হয় না। কাজেই causal-কে সে জানে না। যে cause-কে জানে না সে cause of cause-কে জানবে কী করে। মন হল জ্ঞান, বুদ্ধি হল বিজ্ঞান। কিন্তু এই cause of cause হল মন, বুদ্ধির অতীত, অব্যক্তপ্রকৃতির অতীত, যা একমাত্র অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরুরই জানা আছে। যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—অর্থাৎ তিনি সূর্যসম স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি যাঁর কিরণ স্পর্শে আঁধারের অবসান হয়। তিনি জ্ঞানচক্ষু, জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তিনি কোটি সূর্যকে প্রকাশ করতে পারেন। সেই প্রজ্ঞাস্বরূপ, সম্বিৎস্বরূপকে সাধারণ মন বা biased মন কখনওই নিতে পারে না। বিষয়াসক্ত মন বিষয়চিন্তা ছাড়া বিষ্ণুচিন্তা করতেই পারে না। বিষ্ণু হলেন all-pervading Reality। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বগত সত্তা, Infinite, in the true sense of the term। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। একমাত্র যাঁর eye of wisdom অর্থাৎ ঋষিদৃষ্টি খুলেছে তিনিই জানতে পারেন। আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, গুরুগত বিদ্যা গুরুর অধীনে না-থাকলে পাওয়া যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরু প্রীত হয়েই এই বিদ্যা বিবেক-বৈরাগ্যবান শিষ্যকে, যার বিবেকসিদ্ধি হয়েছে, তাকে দিতে পারেন। তিনি হলেন সুখ একরূপ, তেজ একরূপ। 'যস্য

বোধোদয়ে স্বপ্নবৎ ভ্রমতি তাবৎবিশ্ব। তস্মাৎ সুখএকরূপায় শান্তায় তেজসে'। এখানে তেজ হল স্বয়ংপ্রকাশতা যাকে বলা হয়েছে self-effulgent light of all light। যাকে বলা হয়েছে কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও কোটি চন্দ্রের মতো সুশীতল। তাই বলে তা চন্দ্রের মতো আভাস নয়। তাঁর জ্যোতিতেই সব প্রকাশমান। এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মজ্যোতিকে পেতে সদ্‌গুরুর কৃপাই একমাত্র উপায়। তাই এই সংসার দুঃখক্ষেত্র থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর আশ্রয়। [৩।৪।৯৬]

আহারশুদ্ধির উপরে তত্ত্বানুভূতি নির্ভর করে

সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক আহারের উপযুক্ত করে নিজেকে তৈরি না-করলে Science of Oneness-কে গ্রহণ করতেই পারবে না। শুধু সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করলেই হবে না। খুশি মতো সাত্ত্বিক আহারও হয় না। সাত্ত্বিক আহারের মধ্যেও আবার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভাগ আছে। সেগুলো কার কোনটা দরকার তা গুরু নির্দেশিত হওয়া দরকার। জীবনের চরম ও পরম স্তরে উঠতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা আচার্য গুরুর কাছে অনুশীলনের মাধ্যমেই একমাত্র পাওয়া যেতে পারে। তা না-হলে গতানুগতিক যে শিক্ষা তাতে চরম জ্ঞান কোনও দিনই হবে না। সৎসঙ্গের সাহচর্য না-থাকলে কোনও শিক্ষাই পূর্ণ হয় না। গতানুগতিক সংসারের শিক্ষাতে intellectual gain হয় ঠিকই but intellectual gain is a bar to the realization of Self-God। [১০।৪।৯৬]

সদ্‌গুরুর শিক্ষায় উত্তম অধিকারী সিদ্ধিলাভ করে

সত্যের কোনও বিকল্প নেই; কোনও বিকল্প ঠিক করে তা দিয়েও সত্যের পরিচয় জানা যায় না। স্ববোধে অন্য কোনও বোধের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। 'স্ববোধে ন অন্যবোধেচ্ছা'। স্বাত্মবোধই হলেন পুরুষোত্তম। সমস্ত পুরুষের মধ্যে যিনি পুরুষ—যাঁর দ্বারা, যাঁর মধ্যে সব পরিপূরিত। In Me, by Me, all are fulfilled। সেখানে কোনও ইচ্ছা, কামনা, বাসনা থাকতেই পারে না। এরই নাম পরমাত্মবোধ। এ-ই হল শুদ্ধ বোধসাগর। The infinite ocean of Bliss and Wisdom—where there is no second entity—that is the Self । এই Self-কে ভুলে তোমরা তোমাদের দেহকে নিয়ে মেতে আছ। নিজেকে ছেড়ে অপরকে নিয়ে ব্যস্ত আছ। তাদেরই নিজের বেশি আপন বলে মনে কর। অথচ যে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বসে আছেন তাঁকে অবহেলা করে মন্দিরে, মসজিদে আবার তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছ। তুমি তো নিজেই ঈশ্বর। অথচ তাঁকেই তোমরা ভুলে আছ। একমাত্র সদ্‌গুরুই পারেন তোমাদের এ ভুল ভাঙাতে। বিনা সদ্‌গুরু ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায় না। কিন্তু সদ্‌গুরু কী সবাইকেই কৃপা করেন? না, যার চিত্ত ঈশ্বর জিজ্ঞাসায় তপ্ত লোহার মতো হয়ে আছে, তাতে সদ্‌গুরুর বাণী এলেই এমন করে শুষে নেবে যেমন তপ্ত লোহায় জলবিন্দু পড়া মাত্র শুষে নেয়—তাকেই সদ্‌গুরু কৃপা করেন। নিজেকে তাই এমন করে তৈরি করতে হবে যাতে গুরুর প্রতিটি কথা ধারণের যোগ্যতা হয়। গুরুর সঙ্গে ইষ্টের ভেদ জ্ঞান হল অজ্ঞান। অনেকের ধারণা মানুষকে ইষ্টরূপে মনে করা পাপ। তারা ধাতু, মাটি, ইট, কাঠের মধ্যেই ইষ্টকে দেখতে চায়। কিন্তু 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মতে if there is any God at all, man is the highest God। God is no other than Consciousness. If you have not been supplied by the Consciousness, where will you go। তাই তো 'এ' প্রথমেই মন ও অহংকারের বীজ নষ্ট করেছে। কামনা-বাসনাকে জ্ঞানানলে দগ্ধ করে নিজের মধ্যেই যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে তাঁকে ফেলে আর অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হয়নি। When I am the truth, what else I require, why should I run after the shadows? [৮।৫।৯৬]

উত্তম গুরু এবং উত্তম শিষ্য উভয়েই দুর্লভ

জীবনে সত্যই যদি সত্যকে পেতে চাও তো conventional path থেকে সরে আসতেই হবে। আর right path-এর নির্দেশ শাস্ত্র পড়ে আসে না। একমাত্র কোনও realized person-এর বাণীর মাধ্যমেই আসে, তা ছাড়া অন্য কোনও medium মারফৎ হয় না। এটাই আবার শাস্ত্রের সার কথা। তাই বলা হয়েছে 'গুরু বিনা নাহি মিলে জ্ঞান'—সেই জ্ঞান যা-দিয়ে অজ্ঞান ভ্রান্তিবিলাস দূর হয়। স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য যে মিথ্যা তা ঘুম ভাঙলেই জানা যায়। তেমনি সদ্‌গুরুর মাধ্যমে মানুষের যেদিন সত্যোপলব্ধি হয় সেদিন তার জগৎস্বপ্ন ভঙ্গ হয়। সে অনুভব করে 'এক ছিলাম, এক আছি, এক ই থাকব।'

যে আমি মন, বুদ্ধির অতীত তা-ই অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সাধারণ মানুষের এই ভাবনা কী করে আসবে? নিজেকে মন, বুদ্ধির অতীত ভাবনা করাও কঠিন। এই ভাবনা করার বল একমাত্র পাওয়া যাবে সদ্‌গুরুর কাছে। কিন্তু গুরুকে ধরা কঠিন। গুরুকে পেতে স্বার্থশূন্য হয়ে গুরুসেবা করতে হয়। আবার তেমন স্বার্থশূন্য গুরুই বা পাবে কোথায়? বর্তমানের গুরুরা তো আত্মজ্ঞানী নয়, গুরু সেজে বসে অপরের কাছ থেকে advantage আদায় করে। কিন্তু Self-realized গুরু কোনও advantage নেন না। তাই তো first-graded গুরু যাঁরা তাঁরা আশ্রম করতে পারেন না। আশ্রম করেন second-graded গুরু। [১৫।৫।৯৬]

জ্ঞানী জানে জ্ঞানের মর্ম, অপরকেও সে জানাতে পারে

সাপে যাকে কাটে সে তো মরবেই, কিন্তু বিষয়ের প্রতি যার নজর সেও বিষয় বিষে জর্জরিত হয়ে মরবে। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর upper থেকে lower সবটাই জ্ঞান। তাই বাইরের বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম, কর্মফল, দেশ, কাল, কার্য, কারণ তাঁকে ছুঁতেও পারে না। তাঁর জ্ঞান কোনও কিছু সাপেক্ষ নয়, causal নয়—তা হল continuous। এটাই হল Right Knowledge। 'ন অয়ং ইদম্, ন অয়ং মিদম্'— 'আমি এটাও নয়, ওটাও নয়—কিন্তু উভয়েরই প্রকাশ'। এই জ্ঞান নিজে পাওয়া যায় না। গুরু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না-দিলে, ধরিয়ে না-দিলে তা কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। তাই বলা যায় 'গুরু বিনে নাহি মিলে জ্ঞান, জ্ঞান বিনা নাহি মিলে মুক্তি।'

জ্ঞানের ধর্ম জ্ঞানী জানে

মহাপুরুষদের সঙ্গ সবারই কাম্য। দেবতারাও চায় মহাপুরুষের সঙ্গ। কিন্তু অনুভবসিদ্ধ ছাড়া পথ দেখানোর লোক নেই। সত্যের সঙ্গে মোকাবিলা যাঁর হয়েছে সেই জানে সত্য কী। যে বল অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তার সঙ্গে যুক্ত হলেই তোমার realization হবে। অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত যে বল তা-ই বোধের বল। এই বোধের বলের সঙ্গে যুক্ত করতে একমাত্র realizer-ই পারেন। এই বোধের বল বাইরে কোথাও পাবে না। পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন কেউ দিতে পারবে না। পাবে না মন্দিরে, তীর্থে, দেশে বা বিদেশে। একমাত্র দিতে পারেন অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরু। আবার motivated হয়ে এলে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মতলব থাকলে তাও পাবে না। যেমন পায়নি শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসহচর হৃদয়রাম। শুধু মহাপুরুষদের পাশে থাকলেই হবে না—নিজেকে তাঁর নির্দেশ মতো তৈরি করতেই হবে। নয়তো চিরকালই 'পায়েসের হাতা' হয়ে অমৃত বিতরণ করবে, অমৃত আস্বাদন হবে না। [২২।৫।৯৬]

জড়প্রকৃতি ও চেতনপ্রকৃতি স্বভাবের অভিব্যক্তি, স্বভাব স্ববোধের অভিব্যক্তি

জড়প্রকৃতি ও চেতনপ্রকৃতি—এই দুই প্রকৃতির কথা জানা যায়। তবে জড়প্রকৃতি চেতনপ্রকৃতি ছাড়া, এবং চেতনপ্রকৃতি জড়প্রকৃতি ছাড়া থাকতেই পারে না। অর্থাৎ আমাদের জীবন হল জড় ও চেতনের মিশ্রণ। মানুষ

অন্তঃকরণের (মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত) মাধ্যমেই দেহজগৎ বা জড়জগৎ ও চেতন আত্মার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই অন্তঃকরণের ঊর্ধ্বে উঠে শুধু মাত্র চেতন প্রকাশকে জানা সম্ভব নয়। আবার জড়ের মধ্যে চেতনের অভিব্যক্তি জড়ত্বের জন্য প্রকাশ হয় না। এই চেতন প্রকাশকে জানা তাই সদ্‌গুরুর হাতে। মানুষের জড়ত্ব বা জড়গ্রন্থি ছিন্ন করার জন্যই তার যত সাধনা। অনেক সাধনার পরেও তার জড়গ্রন্থি থেকেই যায়। তার জন্যই প্রয়োজন হয় সদ্‌গুরুর কৃপা।

চৈতন্য মোহযুক্ত হলেই হয় জীব। তার কাছে জগৎবোধই একমাত্র সত্য। কিন্তু শুদ্ধ চেতনকে পেতে জগৎবোধের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে জগৎবোধের ঊর্ধ্বে যাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন।

জড় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণ, প্রাণ থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি (দেবতা), বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। মানুষ তারাই যারা মন নিয়ে চলে। মন শুদ্ধ হলে তা দেবতার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাণের স্তরের অনুশীলন হয় মন দিয়েই কিন্তু বুদ্ধির স্তরের অনুশীলন মন দিয়ে হয় না। প্রাণের ধর্ম প্রাণী, মনের ধর্ম মানুষ, বুদ্ধির ধর্ম বিজ্ঞান, সেখানে আছেন দেবতারা ও ঈশ্বর। বুদ্ধির উপরে আছেন পরমবোধি—তিনিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। সত্ত্বগুণের অনুশীলনে তাই শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরের দেখা পাবে। সাধনার দ্বারা ঈশ্বর লাভ হলেও থামবার কোনও প্রশ্ন নেই আরও চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমবোধির দর্শন মেলে। ঈশ্বরতত্ত্বের উপরে যে ব্রহ্মতত্ত্ব তা পেতে সদ্‌গুরু বা Realized Guru-র সাহায্য একান্তই দরকার। যে গুরু ঈশ্বরতত্ত্বের পরিচয় পেয়েছেন তাঁর পক্ষে তত্ত্বস্বরূপের পরিচয় করানো কখনওই সম্ভব নয়। তাঁরা মতপথের পথিক, গুণাধীন, তাঁরা ব্রহ্মবাদের কথা কী করে বলবেন। একমাত্র যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন সে রকম স্বানুভবসিদ্ধ গুরুই হলেন সদ্‌গুরু—তিনিই পারেন অপর একজনকে ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে।

মহাভক্ত ধ্রুবের কথা তোমরা জান। রাজা বৃষধ্বজের দুই রানী—সুনীতি ও সুরুচি।.সুনীতির পুত্র ধ্রুব ও সুরুচির পুত্র উত্তম। সুরুচি ছোট রানী কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ। রাজা একদিন ধ্রুবকে আদর করছেন দেখে তার মনে ঈর্ষা হল। তিনি রাজাকে বাধ্য করলেন সুনীতি ও তাঁর পুত্র ধ্রুবকে নির্বাসিত করতে। সুনীতি বনে এসে কুটির বানিয়ে নিভৃতে একাকী দিন কাটাতে লাগলেন। শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে তাঁরা ভয়ে ভীত হয়ে দিন কাটান। রানী ছোট্ট ধ্রুবকে সান্ত্বনা দেন এই জঙ্গলে তার এক দাদা আছেন—তিনি তাদের একমাত্র সহায়। তাঁকে ডাকলেই তিনি এসে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তাঁর নাম মধুসূদন।

ছোট্ট শিশুর চিত্তে কোনও complexity নেই, একেবারে pure। সরল বিশ্বাসে তাই জঙ্গলময় সে মধুসূদনকে ডেকে ফেরে। কখনও একমনে ডাকতে ডাকতে রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে পারে না। তবু ডাকে। ক্রমে শিশু একপায়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনে মধুসূদনকে ডাকতে ডাকতে বিভোর হয়ে যায়। ছোট্ট শিশুর ডাকে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির প্রাণে দোলা লাগে। তিনি আর থাকতে পারেন না। কিন্তু সশরীরে এলে যদি ভক্ত তাঁকে চিনতে না পারে? শুদ্ধসাত্ত্বিককে সে চিনবে কী করে? তাকে তো আগে চেনাতে হবে। শ্রীহরির তখন একমাত্র নারদের কথা মনে হল। নারদ এলেন। শ্রীহরি নারদকে বললেন—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। নারদ হেসে বললেন—আমাকে দেখলেই তোমার কাজের কথা মনে হয়। শ্রীহরি বললেন—তোমাকে দিয়ে যে কাজ হয় অন্যদের দিয়ে তা হয় না। নরলোকে ধ্রুব নামে একটি বালক আমায় প্রাণভরে ডাকছে—আমি আর থাকতে পারছি না। তুমি তার কাছে যাও। তাকে তুমি আমার কথা শোনাও। আমার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না-হলে আমি তো যেতে পারি না। তোমার কথায় ধ্রুবর মনে আমার ছাপ হবে, তারপর আমি দেখা দেব।

আসলে এখানে শ্রীহরি গুরুবাদের কথা বলেছেন। গুরু বিনা ইষ্টদর্শন হয় না। গুরুই শিষ্যের মনে ইষ্টের ধারণা তৈরি করেন। সেই মতো ইষ্টদর্শন হয়। এটা গুরুবাদের একটা বিশেষ উদাহরণ।

শ্রীহরির নির্দেশমতো নারদ সেই বনে প্রবেশ করে ভক্ত ধ্রুবর দেখা পেলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এই গভীর অরণ্যে এতটুকু শিশু কী ভাবে হরির ধ্যানে মগ্ন। নারদ তাকে ডেকে বললেন—হে বালক, অরণ্যে এত রাতে তুমি কী করছ, বাড়ি যাও। সে বলল—আমি মধুসূদনকে ডাকছি। মায়ের কাছে শুনেছি তিনিই আমার একমাত্র আপনজন। তাই তাঁকে ডাকছি। নারদ তার ধ্যান ভঙ্গ করায় সে বিরক্ত হয়ে বলল—আমি ডাকছি, তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ কেন? বিরক্ত করছ কেন? তুমি যাও। নারদ ভাবলেন, শিশুটির মধ্যে কত ভাল সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য তার প্রাণ এমনি করে কাঁদে। তারপর বললেন, তুমি একাকী এই অরণ্যে এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কোনও বিপদে পড়লে তোমায় কে দেখবে? বালক চটপট বলল—দেখবে আমার মধুসূদন দাদা। নারদ দেখলেন এমন দৃঢ় ভক্তি তো দেখা যায় না। তখন তাকে বললেন—তুমি যাঁকে ডাকছ তাঁর কথা আমি অনেক জানি, তুমি শুনবে? ধ্রুব খুশি হয়ে তার মধুসূদনের কথা জানতে চাইল। নারদ যতই হরিগুণ গান করেন, ধ্রুব আরও শুনতে চায়। ধ্রুবর তৃপ্তি যেন আর আসে না। নারদ শ্রীহরির সগুণতত্ত্বের সব কথা বলে ভাবলেন এবার ধ্রুবর তৃপ্তি হবে। কারণ মানুষ তো একটু জপধ্যান করেই, একটু আধটু দর্শন স্পর্শ পেয়েই কত অহংকারে গর্বে ফেটে পড়ে। অনেকেই ভাবে তাদের জ্যোতিদর্শন হয়েছে। আসলে Divine-জ্যোতি অত সহজ ব্যাপার নয়। তারা যে জ্যোতি দেখে তা হল দেহ অভ্যন্তরস্থ পাচকরস যখন পাঁচ প্রকার পিত্তরসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার মধ্যে যে জ্যোতি দেখা যায় সেই জ্যোতি। তা কখনওই ঈশ্বরজ্যোতি নয়। ঈশ্বরজ্যোতি 'অরূপং জ্যোতি আকার'—তা দেখা অত সহজ নয়।

যা হোক এবার নারদ ধ্রুবকে তাঁর নির্গুণতত্ত্বের কথা বলতে লাগলেন। তাঁর যতটা জানা ছিল তা বলার পর ধ্রুব আরও জানতে চায় দেখে প্রীত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন—এবার তোমার ইষ্টদর্শন, ইষ্টস্ফূর্তি হোক। নারদের মতো গুরুর আশীর্বাদধন্য হলেন ধ্রুব। চিত্ত যার সহজ সরল তার আর কিসের ভয়! সে তখনও তার মধুসূদনকে ডেকেই চলল। নারদও ধ্রুবর মতো ভক্ত শিষ্য ও যোগ্য আধার পেয়ে বিশেষ খুশি ও আনন্দিত মনে ফিরে গেলেন।

শ্রীহরির সগুণ ও নির্গুণতত্ত্ব প্রাণভরে শোনার পর ধ্রুবর অন্তর illumined হতে লাগল। তার হৃদয়দ্বার খুলে গেল। শ্রীহরি এলেন। তিনিও ভক্তকে পরীক্ষা করতে চান। প্রথমে তিনি নানা হিংস্র জানোয়ার, রাক্ষস ইত্যাদির বেশে আসতে লাগলেন। ধ্রুব যাকেই দেখে তাকেই আলিঙ্গন করে বলে তুমি কী আমার শ্রীহরি? এ সব গল্প নয়—যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তাঁর কাছে everything is real। তার বাসুদেব হরিই সব।

অবশেষে শ্রীহরি দর্শন দিয়ে বললেন—তুমি গুরুকৃপা পেয়েছ তাই তুমি আমায় পেলে। বল তুমি আমার কাছে কী চাও? ধ্রুব সরল ভাবে বলল—তুমি এসে গেছ আর আমি তো কিছুই চাই না। আমার চাইবার আর কিছু নেই। শ্রীহরি তবুও বললেন—তোমার মতো ভক্তকে কিছু দিতে না-পারলে আমার ঐশ্বর্য-মাধুর্য কিসের জন্য? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-মাধুর্য জাগতিক কিছু নয়। ধ্রুব বলল—তুমি যা দেবে তার ভার তোমাকেই নিতে হবে। শ্রীমধুসূদন তাকে বর দিয়ে বললেন—তুমি রাজার ছেলে, তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে। আর তোমার নাম অমর করে রাখব ধ্রুবলোকে।

গুরুকৃপা যাঁর আসে সে-ই ধন্য। মাতৃগুরু কৃপা যাঁরা পায় তাঁরা fortunate। জীবনের প্রথম গুরু হলেন মা-বাবা। মায়ের কৃপা ভিন্ন অন্য কৃপা আসে না।

নিজেকে জানতে জপধ্যান, পূজাপাঠের প্রয়োজন নেই, আছে desireless হওয়ার অভ্যাসের। কী ভাবে এই desirelessness আসবে তা একমাত্র সদ্‌গুরুর কাছেই শিক্ষা নিতে হবে। সাধারণ গুরুরা যে হিং টিং ছট্ মন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দেন তা দিয়ে কোনও উপকারই হয় না। তাঁরা দীক্ষা দেন কিন্তু শিক্ষা দেন না। আর যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের আর দীক্ষা দেবার প্রয়োজন হয় না। তাই সদ্‌গুরু ভুরি ভুরি শিষ্য করেন না। তাঁদের থাকে

বাছা বাছা কয়েকটি শিষ্য। যাঁরা লক্ষ লক্ষ শিষ্য করেন তাঁরা সবাই পাঠশালার ছাত্র। বর্তমানের গুরুদের গুরুগিরি হল ব্যবসা। ধর্মজগতে আজ এ সবই চলছে বেশি। অর্থের জন্য তারা পরমার্থকে ভাঙিয়ে ব্যবসা করছে। এরা পরমার্থকে মন্দিরের দরজায় নামিয়ে এনেছে। তাই তো হৃদয়মন্দিরে দেবতার দরজা তাদের খোলে না। আসলে নিজের মধ্যে নিজে প্রবেশ করাই হল অধ্যাত্মবিদ্যা—spiritual science। আর material science মানুষকে বাইরে নিয়ে ঘোরায়। সেখানে কতরকম বৈচিত্র্য, তার কত রকম study—আপনকে দিয়ে আপনের ভজন সেখানে হয় না। একমাত্র আপন অন্তরেই হয় বোধ দিয়ে বোধের ব্যবহার। তাই অখণ্ড ভূমা এক-কে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। That is to remain constantly aware of the infinite Self. When you are conscious nothing can touch you, but when you are attached with your mind and intellect you are bound in the world. তাই তো বলা হয়েছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'—মন, বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে সেই পরমগুরুকে বরণ কর যিনি তোমাকে পরমবোধে প্রতিষ্ঠা দেবেন। পরমগুরু personified হলেন সদ্‌গুরু। পরমগুরু হলেন তোমার আত্মা। There is no God other than your Self. Self-এর মহিমা, God-এর মহিমা হল—What you are not in appearance but in Essence। তিনি আছেন সবার হৃদ্দেশে—তিনিই পরমেষ্ঠিগুরু, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই মা।

আত্মজ্ঞান আবৃত হলে তা সরানো গুরু ছাড়া সম্ভব নয়। মায়ার খেলা খেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে, খেলায় মেতে নিজের ঘরের রাস্তাই ভুলে গেছ। রাস্তাও হারিয়েছ, চাবিও হারিয়েছ। তোমাকে এখন পথ দেখিয়ে দেবে কে? তার জন্যই চাই একজন সদ্‌গুরু। আর তার সঙ্গে চাই তোমার নিরলস প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা। আর সময় যখন হবে গুরুই ফিরিয়ে দেবেন ঘরের চাবি।

চিত্ত যে দিন সত্যিই ব্যাকুল হবে, গুরুর কাছে সব সমর্পণ করবে সে দিন পাবে তাঁর আশীর্বাদ। চিত্ত ভণিতা করে, সত্যিকারের শরণাগতি, ব্যাকুলতা, দেবার ইচ্ছা তার জাগে না। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আসা গুরুভজন, গুরুশরণাগতি সত্যিই দুর্লভ। গুরুকে 100% মানতেই পার না। গুরু হলেন Absolute personified—তিনিই পারেন bondage of mundane existence থেকে উদ্ধার করে Real existence-এ প্রতিষ্ঠা দিতে। মনুষ্যবেশে ঈশ্বরবোধে গুরুকে মানা খুব কঠিন। তাই তো গুরুকে না-মেনে ইট, কাঠ, মাটি, পাথরে, মন্দিরে, তীর্থে আজও চলেছে তোমাদের ঈশ্বরকে খোঁজা, শান্তির উদ্দেশে। সত্যিই যদি শান্তি চাও, ঈশ্বর চাও, খোঁজ আপন অন্তরে। বাইরের ধর্ম সত্যধর্ম নয়—বাইরের তথাকথিত মতপথের ধর্ম যুগে যুগে পালটায়—কিন্তু সত্যধর্ম যা তা-ই, একই আছে অনাদি অনন্তকাল থেকে। সত্য হল eternal by Itself। [৫।৬।৯৬]

দিব্যবোধের বৈশিষ্ট্য

একমাত্র জ্ঞানের উদয়েই অজ্ঞানের বিনাশ হয় তখন একবোধ বা সমবোধ প্রাপ্ত হয়। যখন বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সামঞ্জস্য বা একতা প্রাপ্ত হয়, একসুর হয় তখন তাকে বলা হয় পরম দিব্যভাব। এই ভাবে দেহবোধ থাকে না, লিঙ্গবোধ থাকে না, বস্ত্রবোধ থাকে না, স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ, সুখ-দুঃখ ভেদ, আপন-পর ভেদ থাকে না। এ সব ভাব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, কারণ বুদ্ধি হল এমন এক মলিন বস্তু যা স্বচ্ছ শুভ্র বস্তুকেও মলিন করে দেয়। এখানকার কথা দিয়ে যদি স্বভাবের রূপান্তর না-হয় তাহলে বুঝতে হবে এ সব তোমাদের মধ্যে প্রবেশই করেনি। আর যদি এ সব কথার কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে তবে তাদের আর বিদ্যাভিমান, অর্থাভিমান, স্বার্থবুদ্ধি ও পরশ্রীকাতরতা থাকতে পারে না। গুরুকৃপা পেলে এ সব থাকতে পারে না। গুরুকৃপা না-পেয়েও পেয়েছে বলে অনেকেই গর্ব অনুভব করে—তাদের আচরণই জানিয়ে দেয় তারা কত মিথ্যাচারী। গুরুকৃপা

পেলে স্বভাবের পরিবর্তন আসবেই, সংযম আসবে, পূর্বের সমস্ত অভ্যাস পরিত্যাগের চেষ্টা আসবে—জীবনধারাই পাল্টে যাবে। পূর্ব অভ্যাসের জন্য তার লজ্জা হবে, দুঃখ হবে, নিজদোষে সে যে আত্মবিস্মৃত তা প্রত্যক্ষ হবে, পরনিন্দা পরচর্চা পরিত্যাগ করবে, যাদের সঙ্গ করলে মনে বিকার আসে, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে, যা খেলে শরীর রুগ্ন হয়, দুর্বল হয় তা খাবে না। এ সব ফাঁকি দিয়ে হয় না। ফাঁকি দেওয়া সহজ। মন দিয়ে সৎসঙ্গ করলে তার প্রভাব আপনা থেকেই আসবে। আর সৎসঙ্গ যদি খেলা হয় বা সময় কাটাবার জন্য হয় তা হলে কোনও ফলই পাবে না।

শিক্ষা ও দীক্ষা প্রসঙ্গে

আজকালকার গুরুরা দীক্ষা দেন ভুরি ভুরি কিন্তু শিক্ষা দেন না। আর যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁরা দীক্ষা দিতে চান না। দীক্ষা হল এক বিশাল দায়িত্ব। সংসারের দায়িত্বের চেয়ে লক্ষ গুণ কঠিন দায়িত্ব। সংসারের দায়িত্ব হল নিম্নতম দায়িত্ব, তার উপরে দেবতাদের দায়িত্ব, তার উপর প্রজাপতির দায়িত্ব, তার উপরে ঈশ্বরের দায়িত্ব। যাঁরা ঈশ্বরকে পেয়েছেন তাঁরা যাদের দায়িত্ব নেন তাদের উপরে টেনে তোলেন। তবে ঈশ্বরকে পেতে যোগ্যতার মান বাড়িয়ে এগিয়ে চলতেই হবে। এক জন্মে সদ্‌গুরু পেলেও ভেবো না প্রতি জন্মেই এমনটি হবে। এক জন্মে ঈশ্বরদর্শন হলে যে তা প্রতি জন্মে হবে তাও নয়। যেমন নারদকেই ধর না, নারদ এক জন্মে ঈশ্বরদর্শন পেয়েছিলেন। কিন্তু পরের জন্মে আর তার প্রভুর দর্শন না-পেয়ে ব্যাকুল হয়ে আছেন—একদিন দৈববাণী শুনলেন—এ জন্মে আর হবে না।

অজ্ঞানে যার আরম্ভ, জ্ঞানেই তার পরিসমাপ্তি

তোমরা সংসারে সং সেজে অভিনয় করে চলেছ। অভিনয় আসে অহংকার থেকে, অহংকার থেকে অভিমান, অভিমান থেকেই আসে দোষদর্শন, পরচর্চা, পরনিন্দা। সংসারের এই সব অভিমান, অহংকারকে প্রশ্রয় দিয়ে অধ্যাত্মচিন্তা, অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চা হল তামসিকতা। সংসারের এই সব অভিমান, অহংকারকে সরিয়ে রেখে আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করতে করতে অন্তরে এমন একটা নিয়ম আপনিই তৈরি হবে যা হল শুদ্ধসাত্ত্বিক। এই শুদ্ধসাত্ত্বিক স্তরে যেতে তাই ত্রিগুণের অতীতে যেতে হবে। সংসার হল তিন গুণের খেলা। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বললেন—'নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব'। অর্থাৎ সংসারের সত্ত্ব, রজ ও তমর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এ কাজে একমাত্র সহায়ক হলেন সদ্‌গুরু। গুরুগত হয়ে গুরুর নির্দেশ মতো চললে অন্তরে refinement আসবে। তার ফলে আসবে uniformity–দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য না-আসলে কিছুই হবে না।

মানুষ লেখাপড়া করে এক বিশেষ তাগিদে। কিন্তু মহাজনবাণী শুনে বোঝা যায় এ সব লেখাপড়া কত খেলো। কিন্তু অভ্যাস যায় না। যে সৎসঙ্গকে ultimate ধরে, সে অধিকারী হয়। একবার একজন এক সিদ্ধ-পুরুষের শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গ করছে, বেশ কিছুদিন কেটে গেছে কিন্তু সে গুরুকৃপা অনুভব করতে পারছে না। সে গুরুর কাছে এ কথা বলতেই গুরু বললেন—হবে না। কারণ তুমি এখান থেকে যা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছ, ঘরে গিয়ে তা বর্জন করে শাস্ত্রপাঠ করে তার থেকে সংগ্রহ করে তা-ই গ্রহণ করছ—তোমার তো এ সব ভাল লাগবেই না। সে বুঝল তার গলদ। সে সব শাস্ত্র ফেলে দিল। মানুষ তার পূর্ব অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তাই তার গুরুকৃপা আসে না। পূর্ব অভ্যাস বজায় রাখলে কৃপা পাওয়া যায় না। স্বভাবের বা অভ্যাসের পরিবর্তনই হল তপস্যা এবং তা হবে একমাত্র সদ্‌গুরুর সঙ্গে থেকে তাঁর নির্দেশ মতো চলে। আর তোমরা অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছ, বাজে আলোচনা করছ, কুপথে চলছ আবার সৎসঙ্গও করছ। সত্যের পথে, অমৃতের পথে এ সব চলে না। অমৃতের পথে মৃত্যুর কারণকে বর্জন করতে হবে। নিজেকে ঢেলে নূতন করে তৈরি করতে হবে—কোনও রকম ফাঁকি এ পথে চলে না। [১২।৬।৯৬]

জীবনের পূর্ণতাসিদ্ধির পূর্ব পর্যন্তই চাওয়া-পাওয়ার প্রাধান্য

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। তার অনেক চাওয়ার মধ্যে কিছু পূরণ হয় কিছু পূরণ হয় না। কিন্তু কামনা, আশা বেড়েই চলে। একমাত্র শুদ্ধ আত্মবিচার দ্বারা এই কামনার জাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। আত্মবোধের দৃষ্টিতে রূপ, নাম, ভাব সবই কল্পনা। এই সংসার হল জাগ্রতস্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখ তা জাগ্রতস্বপ্নেরই একটা দিক। অজ্ঞানের সাতটি ভূমির মধ্যে জাগ্রত অবস্থা একটা ভূমি। এখানে দেহ, ইন্দ্রিয় অজ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, পোষণ করে, ও তাকে ভোগ করে। তাই এই অবস্থাতেই হয় বিকার। স্বপ্নেও বিকার হয়। একমাত্র সুষুপ্তি হল সমষ্টি অবস্থা। দুর্বল মনে আবার সমাধি হয় না। একাগ্র শান্ত মন সমাধিস্থ হয় একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপাতেই। গুরুর কৃপাতেই গুরুনির্দিষ্ট পথে চলেই ভক্তের চিত্তের মল শোধিত হয়। গুরু অনেক সময় প্রয়োজন বুঝেই শরণাগত ভক্তের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তার অন্তরের মল শোধনের জন্যই। বাইরের এই দেহ ও পরিবেশ শুদ্ধ করলেই হবে না; তার জন্য অনেকে বারবার স্নান করে, গঙ্গাজল ব্যবহার করে। এতে বিকার বাড়ে বৈ কমে না। কারণ এ সবই অজ্ঞানের ব্যাপার, ধর্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হল অন্তঃশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি সম্ভব একমাত্র সংযম দ্বারা। তার সঙ্গে চাই গুরুভক্তি, গুরুনিষ্ঠা ও গুরুসেবা। চিত্তশুদ্ধির আরও একটি উপায় হল সৎসঙ্গ। একমাত্র সৎ-এর সঙ্গে যার identity হয়েছে তাঁর সঙ্গ না-করলে সৎসঙ্গ হয় না। ধর্মের কথা তো অনেকেই বলে। তাদের সঙ্গ করলে সৎসঙ্গের উপকার কখনওই হবে না। আবার যাদের আত্মজিজ্ঞাসা, ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে, চিত্ত উদ্‌গ্রীব হয়েছে তারা সৎসঙ্গে আসলে বেশি লাভবান হবে। চুম্বকের পাশে ইস্পাত থাকলে যেমন ইস্পাত চুম্বকে পরিণত হয়, তেমনি ব্যাকুলচিত্ত সদ্‌গুরুর কৃপা সহজেই পায়। সৎসঙ্গ অধিকারী পুরুষকে তৈরি করতে পারে, অনধিকারীকে নয়। যেমন ভেজাকাঠ আগুনের পাশে থাকলেও তাতে আগুন ধরে না, ধোঁয়া বের হয়, শুকনো কাঠ সহজেই জ্বলে ওঠে। আবার কাদামাখা ইস্পাত চুম্বকের পাশে থাকলেও তা চুম্বকিত হয় না। একমাত্র পরিষ্কার ইস্পাতই চুম্বকে পরিণত হতে পারে। সে রকম কামাসক্ত দুর্বলচিত্ত মানুষকে কোনও যথার্থ সাধুও সাধু বানাতে পারে না। ঘোর সংসারী মুক্তপুরুষের সাথে সারাজীবন সঙ্গ করলেও মুক্ত হতে পারে না। তমোরজোগুণের প্রভাবে চললে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। তমোরজোগুণে মুক্তি, শান্তি আসে না।

Degree, তুলনা, পূর্বাপর বিচার যেখানে হয় সেখানেই হয় গুণের খেলা। কিন্তু অদ্বৈতে কোনও গুণের খেলা নেই। কাজেই অদ্বৈতে পৌঁছবার একমাত্র পথই হল গুরুকৃপা। কিন্তু গুরু তো সবাইকে কৃপা করেন না। যার চিত্তে আছে মতলব, উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছা, কামনা-বাসনা তাকে তিনি কৃপা করেন না। আবার গুরুকে দুষেও অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। অধিকারী পুরুষ ছাড়া অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায় না।

[১৯।৬।৯৬]

সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ পেলেই জীবনের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়

মানুষের মধ্যে জড়ত্ব, পশুত্ব, জীবত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মত্ব নিহিত আছে। কিন্তু মানুষের অল্পবিদ্যার বাহাদুরিই তাকে সামগ্রিক পতনের দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগৎকে সুন্দরতর করতে মানুষের দিব্য রূপায়ণের সব পথই খোলা রেখেছেন, কিন্তু মানুষ সঠিক গুরুর অভাবেই ঠিক পথে না-চলে ভুল পথে চলতে অভ্যস্থ হয়েই বিকার সৃষ্টি করে। কাজেই সঠিক পথের নির্ণয় একমাত্র সদ্‌গুরুর আশ্রয়েই হতে পারে। তাই বিশেষ করে অধ্যাত্মপথে চলতে আচার্যবরণ বা গুরুবরণ করতেই হয়। তাই শাস্ত্র বলেছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'।

সদ্‌গুরুর কৃপায় সত্যবোধের পরিচয় মেলে

মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি হল একই প্রকৃতির দু'টি ভাগ। বহিঃপ্রকৃতি আত্মজ্যোতির অনেক দূরের কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি আত্মজ্যোতির খুব কাছের। এই অন্তঃপ্রকৃতি হল স্বভাবের স্ফূর্তি। তার স্বভাবের মধ্যেই স্ববোধের প্রকাশ হয়। 'স্বস্বভাব তৎ অধিগম্যতে' বা 'স্বভাবেন ব্রহ্ম অধিগম্যতে'। স্বরূপত ব্রহ্ম হলেন সর্বব্যাপী, অখণ্ড, পূর্ণ, ভূমা। ভূমা শব্দটি এসেছে 'ভৌম' শব্দ থেকে। ভৌম অর্থ সর্বব্যাপী অর্থাৎ যার ছেদ নেই অবিচ্ছিন্ন, ভেদ নেই বা ভাগ নেই—অবিভক্ত অ-ভেদাভেদ তত্ত্ব সত্তাই হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মে কোনও গুণের কথা নেই। তিনি গুণাতীত। ঈশ্বর হলেন গুণাধীশ আর জীব হল গুণাধীন। এ সব তত্ত্ব একমাত্র অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন জানা যায় না। কৃপা হল অনুগ্রহ। কৃপা চার ভাবে নেমে আসে—আশিস্, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা।

অকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুকৃপা লাভ হয় না

সত্তা অর্থ সৎ, যা হল নিত্য। এই সৎ-এর মধ্যে চিৎ ও আনন্দও আছে। কিন্তু জড়ত্বে যে অস্তিসত্তা আছে তাতে চিৎ নেই বলে তার স্ফূর্তি হয় না। তাতে আনন্দও নেই। জীবের মধ্যে সৎ, চিৎ আছে কিন্তু আনন্দ নেই। ঈশ্বরে সৎ, চিৎ, আনন্দ আছে কিন্তু তিনি সগুণ। জীব স্বভাবে অপূর্ণ কিন্তু স্ববোধে পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। জীব ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বর জীবের অধিপতি। কাজেই জীব স্ববোধে ব্রহ্ম-আত্মা, স্বভাবে ঈশ্বরের অধীন। জীবকে ঈশ্বরের মাধ্যমেই গুণাতীত ব্রহ্ম-আত্মা হতে হবে। পরমতত্ত্ব গুণাতীত—'যদেব গুণাতীত তদ্দেব ব্রহ্মপরমাত্মা স্বয়ং'। যারা intellect বা বুদ্ধির বিচার দিয়ে এ সব জানতে বা বুঝতে চান তাদের পক্ষে এ সব বোঝা অসম্ভব। আত্মজ্ঞান বুদ্ধির অতীত। সত্যের দৃষ্টিতে তুমি সর্বাতীত—এটা একমাত্র অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরু ধরিয়ে দিতে পারেন অন্যথায় ক্রিয়া-কলাপ, জপতপ, পূজাপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তা কখনওই জানা যাবে না। ক্রিয়া-কলাপ, জপতপ ইত্যাদি হল গুণাধীন। তবে ধ্যান ইত্যাদিতে চিত্ত স্থির হয় ও বিচার দ্বারা বিবেক জাগ্রত হয়। তাই জপতপ হল ক্রিয়াকাণ্ড, ভক্তি হল মানসকাণ্ড আর বিচার হল জ্ঞানকাণ্ড। ভক্তিতে সবার অধিকার থাকলেও জ্ঞানবিচারে সবার অধিকার নেই। ভক্তি নিয়ে যতই মাতামাতি করো না কেন, ভক্তি হল একটা process এবং ভক্তি Itself is the end। জ্ঞানবিচারও একটা process and Knowledge Itself is the end। সদ্‌গুরুর কাছে যোগ্য অধিকারী গুরুকৃপায় এ সব clearly বুঝতে পারে কিন্তু বুদ্ধির বিচার দ্বারা এ সব বুঝতে গেলে গণ্ডগোল হয়ে যাবে কারণ বুদ্ধি মানুষকে ভেদের মধ্যে টেনে আনে।

অধিকাংশ মানুষকেই দেখা যায় যে কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সেই নাম মন্ত্র জপ করে। বেশির ভাগই জপ করে mechanically—কাজেই জপের ফল তারা পায় না। আসলে কী ভাবে জপ করবে তা তারা জানে না। জপ হবে শ্বাসে শ্বাসে। প্রতিটি মানুষের দিনেরাতে ২১৬২০ বার প্রাণের beating হয়। প্রাণের বায়ু হল জীবন। তার সাথে আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই। আত্মা আছে background-এ। তার বক্ষেই চলছে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির খেলা।

শাস্ত্রে এমন অনেক কিছু বলা আছে যা শাস্ত্রেও ঠিক মতো খুঁজে পাবে না, তা পাবে অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরুর কাছে। তাহলে নারদের কথা শোন। নারদ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চতুর্বেদ, ষড়দর্শন, অষ্টাদশপুরাণ অধিগত করেও শান্ত হতে পারলেন না। অশান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। কী যেন পাননি। তার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করতে অনেকের কাছে গেলেন। কেউই তাকে শান্ত করতে পারল না। অবশেষে তিনি সনক ঋষির কাছে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোনও বিদ্যা জানা আছে কী যা জানলে আর জানার কিছু বাকি থাকে না। ঋষি বললেন, তিনি জানেন তবে তিনি দিলে নারদ নিতে পারবে

তো। নারদ রাজি হলেন—গুরুর অনুশাসন শুরু হল। নারদ দেখলেন এতদিন তিনি সব objective knowledge সংগ্রহ করেছেন, কতগুলি শব্দ সংগ্রহ করেছেন কিন্তু আসল বস্তুই সংগ্রহ করা হয়নি। গুরু তাঁর সব শিক্ষা শেষে জানালেন—সব কিছুর সমাধান, অধিষ্ঠান হল অখণ্ড ভূমা। ভূমা কী? ভূমা তিনিই যিনি আছেন উর্ধ্বস্তাৎ, অধঃস্তাৎ, সম্মুখস্থ, পশ্চাদস্থ, দক্ষিণস্থ, বামস্থ, অর্থাৎ সর্বস্তাৎ—তুমিই সেই ভূমা অখণ্ড অনন্ত—তুমিই অহম্। এই জ্ঞান পেয়ে নারদ তৃপ্ত, কৃতকৃত্য ও সম্পূরিত হলেন পরমসত্য দ্বারা এবং অনুভব করলেন সত্য ও আমি অভিন্ন। এই পরম ও চরম জ্ঞান একমাত্র অনুভবসিদ্ধ দিতে পারেন এবং যাদের যোগ্যতা আছে তারাই তা নিতে পারে। Mass scale-এ জ্ঞান কখনওই সম্ভব নয়।

গুরুর কথা শুধু শুনলেই তো হয় না তাকে ঠিক ঠিক follow করতেও হবে। এক শিষ্য তার গুরুর সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করে দেখল তার তো কিছুই হচ্ছে না। সে গুরুকে গিয়ে সে কথা জানাতে গুরু বললেন—তুমি তো শুনেছ, অভ্যাস করেছ কী? একদিন সে গুরুকে বলেই ফেলল এতদিন আপনার কাছে আছি আমার তো কিছুই হল না। গুরু বললেন—তুমি আমার শরীরের কাছে ছিলে আমার কাছে ছিলে না। তখন শিষ্য তার ভুল বুঝতে পারল। [২৬।৬।৯৬]

মানুষের অভিজ্ঞতার মান কল্পনাজাত, আত্মজ্ঞান কিন্তু গুরুগত

মানুষের বুদ্ধি চয়ন করে শক্তি ও বুদ্ধির উপকরণ অর্থাৎ পুঁথিগত জ্ঞান এবং চিন্তা ও কর্ম থেকে কিছু অভিজ্ঞতা। তবে এগুলো শুদ্ধ জ্ঞান নয়, জ্ঞানসত্তার বক্ষে শক্তির বিকার। পরিদৃশ্যমান জগৎ, রূপ, নাম, ভাব সবই হল শক্তির বিকার। ঠিক এ ভাবে ভাবতে না-পারলে বোধের ঘরের দরজা খুলবে না। একমাত্র সদ্‌গুরুর মুখে শোনা কথা থেকে যে অভিজ্ঞতা তা-ই সর্বোত্তম। তবে তাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে জারিত করে নিতে হবে।

সত্তার বক্ষে ত্রিগুণাত্মক শক্তির reflected light হল অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এদের বাদ দিয়ে কোনও জগৎ দর্শন হয় না। কিন্তু এদের মাধ্যমে কোনও real light পাওয়া যাবে না। এই real light-এর সবটাই নির্ভর করে গুরুর কৃপার উপর অর্থাৎ তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের উপর। কিন্তু গুরু সবাইকে কৃপা করেন না, তার জন্য চাই যোগ্যতা ও গুরুর প্রতি আনুগত্য। অধ্যাত্মবিদ্যা সব সময়ই গুরুগত বিদ্যা। বর্তমানে তা গুরুমারা বিদ্যা হয়েছে। গুরুর মুখে শুনে তা অনেকেই নিজের নামে ব্যবহার করে। আবার বেশ কিছুদিন গুরু নির্দেশিত পথে চলার পর নিজের উন্নতি না-দেখলে তারাই গুরুর নামে সব দোষ দেয়। গুরুকে দোষারোপ নয় নিজের যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা কর।

শব্দচয়ন আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দচয়ন হয় গুরুর কাছ থেকে এবং প্রকৃতির কাছ থেকে। প্রকৃতি থেকে যা পাওয়া যায় তা হয় রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু গুরুর বাক্য হল সাত্ত্বিক। তোমরা যতই শাস্ত্রপাঠ কর, পুঁথিপুস্তক পড় না কেন—তা থেকে কখনওই সাত্ত্বিক জ্ঞান পাবে না। একমাত্র গুরু নির্দেশিত শাস্ত্রপাঠ এবং গুরুর কাছে শাস্ত্রপাঠ করলেই তা হবে সাত্ত্বিক।

ভাবের ঘরে চুরি করো না—করলে গুরুইষ্টের কৃপা পাবে না। কামাহত, ভোগাসক্ত, অশুদ্ধ চিত্ত, ইষ্টগুরুর স্মৃতি ভুলে চুরি করে, কারও কথা মানে না। [১৭।৭।৯৬]

সংসারবোধে মুক্তি নেই আর মুক্তিবোধে সংসার নেই

সংসারে থেকে পূর্ণ সত্যের কথা চিন্তা করা বিলাসিতা। পূর্ণ সত্যকে নিয়ে একমাত্র মুক্তপুরুষেরই থাকা সম্ভব। গৃহীরা মুক্তপুরুষের সঙ্গ করে ঠিকই কিন্তু তাঁর কথা নিতে পারে না। গৃহীরা আত্মধর্ম মানে না।

প্রকৃতির মধ্যেই জড়িয়ে থাকে। এই সংসারে থেকে সংসারের অতীতে যাবার চেষ্টাও করে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ সংসারে একেবারে জড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে কিন্তু পথ পায় না। কারণ একমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা যায় না। মানুষের এই কাজে দেবতারাই অন্তরায় হয়।

সাধনভজন অনেকেই করে। কিন্তু সাধন অনুরূপ ফল সবাই পায় না। তার কারণ সবার সাথে আলোচনা করা যায় না। অধিকারী ভেদের কথা মাঝে মাঝে আসে। তোমাদের মনের বৃহত্তর অংশই যুক্ত থাকে বহির্জগতের সঙ্গে। সেখান থেকে তুলে এনে আর কতটুকু সময়ই বা দিতে পার ইষ্টচিন্তায়। আবার বহির্জগতের কামনা-বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত তামসিক মন দিয়ে কতটুকু ইষ্টচিন্তা হবে? মনে তো সহজেই বিক্ষেপ চলে আসবেই। সাত্ত্বিক মন ছাড়া ইষ্টচিন্তা হয় না। তা ছাড়া পুঁথিপুস্তক পড়ে, শাস্ত্রপাঠ করে অনেকেই পথের সন্ধান করে। কোন পথে কার উন্নতি বা কে কোন পথ নেবে তা একমাত্র সদ্‌গুরুই নির্দেশ করে দিতে পারেন। সেইসঙ্গে গুরু সম্বন্ধে যার যে রকম ধারণা গুরুকৃপাও তদনুযায়ী হয়। অবশ্য গুরু সম্পর্কে ধারণা হয় তার সংস্কার অনুযায়ী। তামসিক সংস্কারযুক্ত মন, সাত্ত্বিক গুরু পেলেও লাভ হয় না। আবার সাত্ত্বিক সংস্কারযুক্ত মন তামসিক গুরু পেলেও অনেক উপরে উঠতে পারে। একজন বিশেষ উচ্চ সংস্কারযুক্ত ভক্ত মহাত্মা তাঁর গুরু সম্পর্কে বলেছিলেন—'যদ্যপি মোর গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' নিত্যানন্দ এখানে নিত্য আনন্দস্বরূপ। যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনি একটা বিশেষ character-যুক্ত বলেই তাঁর এ কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু যার character-ই ঠিক নেই তার কোনও কথা বলার অধিকার নেই। আসল কথাই হল চরিত্র বা character। বৈচিত্র্যের মধ্যে ডুবে থাকলে এক-কে কোথায় খুঁজে পাবে। এক-এ মতি, গতি, রতি ও স্থিতি না-হলে character তৈরি হয় না। সারাজীবন ভগবানের সঙ্গ করেও যদি character ঠিক না-থাকে তো কিছুই হবে না।

যে এক-এর কথা এখানে বলা হয় সেই এক-কে খুঁজে পাবে বাইরে নয়, অন্তরে নয়, একেবারে কেন্দ্রে—যেখানে সব প্রশ্নের শেষ। তোমরা তো প্রশ্ন করতেও পার না। প্রশ্ন করবে কাকে? প্রশ্ন করবে নিজেকে যেখানে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে তোমারই আত্মগুরু। অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে শুধু দু'জন—তুমি ও তোমার আত্মগুরু, ঠিক বিসর্গের দু'টি বিন্দুর মতো। আর কিছুই সেখানে নেই। সাগরে কত তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্ উঠছে—সাগর কিন্তু only the witness not the performer। যে আমির কথা এখানে বলা হয় সেই আমি এই দেহের মধ্যে বাস করেও অকর্তা, অভোক্তা, তার কোনও অভাব নেই। সে অক্রিয়, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দ কেবলম্। মন, বুদ্ধির সাধ্য কী তাঁকে ধরে। বুদ্‌বুদের কী সাধ্য সমুদ্রের পরিমাপ করে। মন যেটুকু ধরে তা একটা portion-মাত্র। মনের কী সাধ্য যে অখণ্ড, অনন্ত আত্মাকে গ্রহণ করে? তা হলে কী করতে হবে? সদ্‌গুরুর মুখনিঃসৃত কথাগুলি একমনে ভাবতে ভাবতে আত্মগুরুর reflection-এ অন্য বিকারগুলো আস্তে আস্তে সরে যাবে তার ফলে অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিকাশ হবে। যে অর্থে সত্ত্ব-রজ-তম-গুণ, গুণ; শুদ্ধসত্ত্ব সেই গুণ নয়। গুণ হল attribute কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব হল attributeless। তোমাদের মন তো কয়লার মতো কালো। এ কথা শুনে একজন বলল—কয়লা তো কোনও দিন সাদা হবে না। বলা হল—কেন হবে না, কয়লাকে আগুনে দিলে পুড়ে তা সাদা হয় তেমনি জ্ঞানাগ্নিতে মনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে অমল, ধবল, বিমল, শুভ্র কর—সব বিকার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। [২৪।৭।৯৬]

চতুর্দশ অধ্যায়

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য

সবাই আনন্দময়ী মায়ের সন্তান। আনন্দের স্রোতে সবাই ভেসে চলেছে তাঁরই পানে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যেও তিনি। তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তিনিই গুরু। সবাই সেই গুরুরই আশ্রিত। শিবগুরু গুরুশিবের সন্তান সবাই। গুরু হলেন আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপের মধ্যেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। আনন্দেই শুরু, আনন্দেই শেষ। আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নেই। মানুষ এই আনন্দকে ঠিক ভাবে পায় না। তাই কষ্ট ভোগ করে। মানুষের জীবনের এত দুঃখ, কষ্ট, বেদনার পশ্চাতে কী আছে, মানুষ তাও জানে না। আবার যাঁরা জানেন তাঁদের কথাও এরা মানতে পারে না।

এই জগৎসৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার পিছনে কারণ আছে। আমাদের এই জন্মের কারণ কী? কোন প্রয়োজনে এখানে আসা—এ সব আমরা জানি না, জানতেও পারি না। কিন্তু আমাদের মধ্য দিয়েই তার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। জীবমাত্রেই আনন্দময়ী মায়ের সন্তান। মানুষ জীবনে আনন্দের পিছনেই ধাবিত হয়ে চলেছে। তাকে এই আনন্দ দেবে কে? একমাত্র আনন্দস্বরূপই আনন্দ দিতে পারেন। আনন্দস্বরূপ তো সবারই অন্তরে রয়েছেন অন্তর জুড়ে। পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে তাদের সমস্ত মায়া, মমতা, প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখেন, তাকে বড় করেন, তাদের যা-কিছু আছে সবই রেখে যান সন্তানের জন্য। ভক্তের সঙ্গে ভগবানেরও ঠিক এই রকমই সম্বন্ধ। ভগবানই বুঝিয়ে দেন তাঁর ভক্তসন্তানের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা। ভক্তের সঙ্গ করে ভক্তই হয়। জ্ঞানীর সঙ্গ করে জ্ঞানীই হয়, যোগীর সঙ্গ করে যোগীই হয়। মানুষ এই সৎসঙ্গ করে কেন? তাদের দৈনন্দিন দুঃখ, কষ্ট, বেদনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই। এই কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবার একটাই উপায় তা হল ভক্ত, যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীর সংবাদ মানা। মহাজনবাক্য মানতে হবে, গুরুবাক্য মানতে হবে। যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক ভক্ত, জ্ঞানী ও মহাজন এসেছেন। যাঁরা এখনও বর্তমান তাঁরা হলেন যুগের কর্ণধার—তাঁদের অনুসরণ করতেই হবে। যাঁরা নেই তাঁরা আমাদের আদর্শ। আদর্শকে সামনে রেখে তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলতে হবে। পিতার সম্পদ যেমন সন্তান পায় তেমনই গুরুর সম্পদ শিষ্য পায়, ভক্তের সম্পদ ভক্তই পায়। এই যে আমরা আজ সবাই মিলিত হয়ে গুরুর কথা, কৃষ্ণকথা, হরিকথা, শিবকথা শুনলাম, নামকে অন্তরে, প্রাণে, চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে কাটালাম কিছুক্ষণ এর মূল্য যে কত তা সবাই বোঝে না।

আজ গুরুপূর্ণিমা। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। আনন্দস্বরূপ ভগবান কোনও এক বিশেষ দিনে জগতে গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে চৈতন্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অমৃতের বাণী দিয়ে ভক্তকে আনন্দস্বরূপের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই দিনটিকে পালন করা হয় নামগান ও গুরুমহিমা কীর্তনের মাধ্যমে। এই সুযোগে ভক্ত পায় ঈশ্বরীয় ভগবৎ আনন্দলাভের সুযোগ। দৈহিক আনন্দ স্থায়ী হয় না। আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর, সমস্যাসঙ্কুল জীবনে জরাব্যাধি, শোক-দুঃখ আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। আমরা শান্তি পাই না। জীবনে পূর্ণ শান্তি আসে একমাত্র ঈশ্বরের নামে। এই ছোট কথাটি আমাদের সুখে-দুঃখে ভগবানই ধরিয়ে দিয়ে যান বারেবারে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাওয়া দোষের নয়। তবে জীবনের

প্রতিপদে আমরা যে ভগবানের দানেই পুষ্ট তা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভগবানের দানকে ভোলা উচিৎ নয়। ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা ভগবানকে সৃষ্টি করি না। এ সব কথা যিনি স্মরণ করিয়ে দেন তিনিই গুরু। ভগবানই গুরুরূপে আসেন। ভগবান তথা গুরুই হলেন আমাদের সবচেয়ে আপন, অন্তরতর। গুরুই আমাদের অজ্ঞানমুক্ত করে জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞানস্বরূপই হলেন ভগবতী মাতা। এই 'মা'-কে যারা 'মায়া' ভাবে তারা মায়ের স্নেহ পাবে কী করে? মাতৃস্নেহ-ই গুরুস্নেহ। মাতা গুরু, গুরু মাতা। হৃদয়বত্তাতেই এর অনুভব হয়। বুদ্ধি দিয়ে নয়। হৃদয় হল মাতৃস্থান, মস্তিষ্ক পিতৃস্থান। মা আছেন সকলের হৃদয়ে। গুরু আছেন সবার অন্তরে। এই আত্মগুরুর হদিশ সবাই পায় না। অথচ তিনিই অন্তরে বসে শিষ্যকে স্পর্শ করে আছেন। গুরু ও শিষ্যের এই অপূর্ব সম্বন্ধের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান করতে পারে না। গুরু কখনওই শিষ্য ছাড়া নয়। গুরুর আশীর্বাদ সততই শিষ্যের উপর বর্ষিত হয়। যেমন সন্তান কখনও মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের হৃদয়ের স্পর্শ ছাড়া হয় না। তাই সর্বদা মা-কে মানতে হয়। গুরুতত্ত্ব গুরুবাণী নিয়ে চললে কখনওই জীবনে ঠকবে না। যে মা-কে মানে মাও তাকে দেখেন, তাকে রক্ষা করেন। যে গুরুকে মানে গুরুও তাকে আগলে রাখেন। গুরু যে শিষ্যকে আগলে রাখেন তার উদাহরণ অতীতে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। কত দুরারোগ্য ব্যাধি, কত দুর্ঘটনা থেকে মা, গুরু রক্ষা করেন তা তো কেউ বুঝতেও পারে না। বর্তমানে গুরুর স্মরণ মননই হল গুরুকৃপা লাভের একমাত্র উপায়। তার জন্যই গুরুমহিমা কীর্তন। এই সব অনুষ্ঠানে দেখা যায় অনেকের ইচ্ছা না-থাকলেও অংশগ্রহণ হয়ে যায় আবার অনেকে শত ইচ্ছা থাকলেও যোগ দিতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে, ঈশ্বরের মহিমা গানের সঙ্গে, ভক্তের সঙ্গে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক তা সাধারণের বোঝবার বাইরে। এই যে এখানে হরিকথা, গুরুমহিমা, মায়ের কীর্তন হল তা তোমাদের অন্তরে charge করার জন্যই। এ হল বর্তমানের একমাত্র ওষুধ। এই ওষুধের প্রয়োজন সবারই আছে। ভগবানের আশীর্বাদ নানা রকম হয় না। তাঁর আশীর্বাদ পেতে তাঁর শরণাগত হতেই হবে।

বৈকুণ্ঠ আছে আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে। সংসারের সব কিছুর মূল আছে এই হৃদয়ক্ষেত্রে। আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নারও মূল হল এই হৃদয়ক্ষেত্র। আবার শান্তির মূলকেন্দ্রও হল এই হৃদয়ক্ষেত্র। কাজেই মনকে নিবদ্ধ কর এই হৃদয়ে। বহির্মুখী মন ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, সেই মন দিয়ে হৃদয়কে জানা যায় না। তার জন্য মনকে অন্তর্মুখী হতে হয়। নামগান, কীর্তন ও ভজনের মাধ্যমে মন অন্তর্মুখী হলে অনেক কিছুই পাবে। পাবে সাহস, ধৈর্য, সহ্য, বিশ্বাস। আরও গভীরে গেলে ফিরে যাবে স্বঘরে বা আপনঘরে।

সভ্যতার আদিকাল থেকেই শান্তি, মুক্তি ও অমৃতের দ্বার খোলা আছে একমাত্র মানুষেরই জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে। আমরা জড় নই—আমাদের মধ্যেই আছে চৈতন্যের সর্বময় প্রকাশ। তাঁকেই স্মরণ কর। দীক্ষা থাক বা না থাক মাতা-পিতাকে স্মরণ করে কোনও বিশেষ একটি ঈশ্বরীয় নামকে অবলম্বন করে তাঁকে ডাকলেই হবে। অবশ্য ঈশ্বরীয় নামের সঙ্গে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও সৎসঙ্গের প্রয়োজন আছে। নির্জনে বসে শুধু তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কীর্তন কর, তাঁর ভজনা কর। ডাকতে ডাকতে একদিন তাঁর ডাক আসবে, আমাদের ডাকও তাঁর কাছে পৌঁছবে। এই বিশ্বাস সবার হোক। সবাইকে আপন কর। আপনতাই যে তাঁর ধর্ম। আপনতা হৃদয়ের ধর্ম। মা ধূলামাখা, হেগো-পোদের ছেলেকে যেমন কোলে তুলে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন না তেমনি গুরুও তাঁর আশ্রিতকে কখনও বর্জন করেন না। গুরু শাসন তো করবেনই। আবার স্নেহ দিয়ে কাছে টেনেও নেবেন। গুরুর স্নেহের পরশ হৃদয় দিয়েই অনুভব করবে।

দেবতাদের অবদানকেও স্মরণ করতে হবে। দেবতাদের পূজা করে ভজনা করলে দেবতারাও ভজন করবেন। শুধু নেওয়া নয়, দিতেও হবে। দেওয়া-নেওয়া দু'টোই চাই। দুই নিয়েই দুনিয়া। দুনিয়ার একদিকে জীব অন্য দিকে ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম।

আজকের দিনটি আরেক দিকেও মূল্যবান। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই সব পূজা, অর্চনা, নিয়ম-নিষ্ঠা কিন্তু বৃথা নয়। এগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সব নয় তবে একটা বিশেষ chapter তো বটেই। ব্যক্তিগত গাফিলতিতেই এরা এদের তাৎপর্য হারিয়েছে—আবার তাকে জাগ্রত করতে হবে। আমাদের চেতনাকে সচেতন করতে হবে। এই যে সামনে আসছে দুর্গাপূজার উৎসব—দেবীপক্ষে দেবীর বোধনে হবে দেবী মায়ের আহ্বান। আজ থেকে শুরু হল মা-কে আহ্বানের প্রস্তুতি—পূজার আগে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে মায়ের বোধনের প্রস্তুতি। মায়ের পায়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ইচ্ছা জাগুক। অন্তরের দুঃখকষ্টের সঙ্গে সদানন্দময়ী, চিদানন্দময়ী মা-কে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা জাগুক। দুঃখ, কষ্ট, বেদনার মাঝে মা-কে তো ডাকতেই হবে। পূজা তাই বারেবারে ফিরে আসে। দুঃখের প্রয়োজন আছে। চেতনাকে জাগাতে বেদনা চাই। দুঃখের মাঝে যা জাগ্রত হয় সুখের মধ্যে তা হয় না। আমাদের কৃতকর্ম থেকে আসে কর্মফল, কর্মফল থেকে আসে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাই হল ব্রহ্ম-আত্মা। দুধকে সাঁজা দিয়ে দৈ পাততে গেলে অপেক্ষা করতে হয়। দুধকে তখন নাড়া দিলে দৈ পড়ে না। মনকে তেমনি জমতে দিতে হবে, নাম-এ থিতু হতে দিতে হবে। দৈ জমলে তাকে মন্থন করে মাখন তৈরি করতে হয়। জীবনকে অবলম্বন করেই ধর্ম। অর্থাৎ কর্মকে অবলম্বন করেই ধর্ম কাজেই ধর্মশূন্য কর্ম বা কর্মশূন্য ধর্ম নয়। ধর্ম ও কর্ম চলে এক সাথে। ধর্মের সার্থকতাই হল আপনভাবে গ্রহণ করা ও আপন হয়ে যাওয়া।

ধর্মাচরণ মানেই সবাই জানে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা। শাস্ত্র বড় কঠিন—তার অর্থ উপলব্ধি করে আচরণ করা আরও কঠিন। তাই মহাজনবাণীকে বিশ্বাস করে, আদর্শ করে চলতে হবে। চরমতম আদর্শে পৌঁছতে একটা অবলম্বন তো জীবের নিশ্চয়ই দরকার। জীবের অবলম্বন হল নাম। যে কোনও একটি নামকে আশ্রয় করে শুরু কর। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'—আর কত ঘুমাবে? এতদিনের ভাবনাকে ঝেড়ে ফেলে অন্য ভাবে নূতন করে ভাবতে হবে। জ্ঞানীগুণীর আশ্রয় তো নিতেই হবে। তার জন্যও প্রস্তুতি চাই। চাই শরণাগতি। তাঁর কাছেও আমাদের প্রয়োজন আছে—যেমন আছে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অভাব, চাওয়া অনন্ত। তবু তার থেকে বেছে বেছে কিছু আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে, মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালে মা নিশ্চয়ই শুনবেন। তাতে মনের গতি নিশ্চয়ই ফিরবে। আর মনের গতি ফিরলে আস্তে আস্তে রক্ষা পাবে। ঈশ্বর বহুমুখী। সবেতেই বর্তমান। তবুও মানুষের প্রয়োজন অনুসারে একদল যাঁকে উৎকৃষ্ট, পাবার যোগ্য মনে করে অপর কারও কাছে সেটাই আবার নিকৃষ্ট—গ্রহণের অযোগ্য। পৃথিবীতে কোনও কিছু শুধুই উৎকৃষ্ট নয় আবার কোনও কিছু শুধুই নিকৃষ্ট নয়। ঈশ্বরের জগৎলীলা তাই দুর্বোধ্য। কী দরকার ঈশ্বরের জগৎলীলা বোঝবার? তাঁর লীলা তিনি করছেন—তুমি তো দ্রষ্টা। তোমার বিপদে আপদে মায়ের আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালে মা ফিরাবেন না। [২৮।৭।৯৯]